ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্র

সন্দেশ

ষান্মাসিক সূচীপত্র

নবম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

মে ১৯৬৯—অক্টোবর ১৯৬৯

বৈশাখ ১৩৭৬—আশ্বিন ১৩৭৬

হাসির ছবি——(শেষ পৃষ্ঠা দেখ !)

নবম বর্ষ—প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৭৬/মে ১৯৬৯

সবার জায়গা হবে

শঙ্কর রায়চৌধুরী

বানিয়েছি এক বাগান ঘেরা ছোট্ট মতন বাড়ি,
তার মাঝেতে থাকতে যে চায় আমার মটর গাড়ি।
গরু ঘোড়া, কুকুর বেড়াল, তারাও তখন আসে,
খেলবে সবাই আনন্দেতে লনের সবুজ ঘাসে।
মাছরাংগা আর চড়ুই পাখি, নরম সাদা বক,
তাদের হল এই বাড়িতে থাকতে বড়ই সখ।
মামা, কাকা, খোকাখুকু, তারাও থাকতে চায়,
জায়গা হেথা হবে না আর বলিনে লজ্জায়।
বাড়িখানি ভরে গেছে জায়গা তো নেই মোটে,
তবু কত অতিথি রোজ থাকতে এসে জোটে।
'আপদ এল' এমন কথা মুখে কি আর খাটে,
ছিঃ ছিঃ ছিঃ ভাবতে গেলে মাথা আমার কাটে।
যতক্ষণ এই বাড়ির ভেতর দখল আমার মেলে,
চলে এসো বিনা দ্বিধায় ক'লকাতাতে এলে।
কোন রকমে হলেও জেনো জায়গা সবার হবে,
চিঠি পেলে খুশি হব, আসবে সবাই কবে?

(জুলু দেশের গল্প)

উপেন্দ্রকিশোর রায়
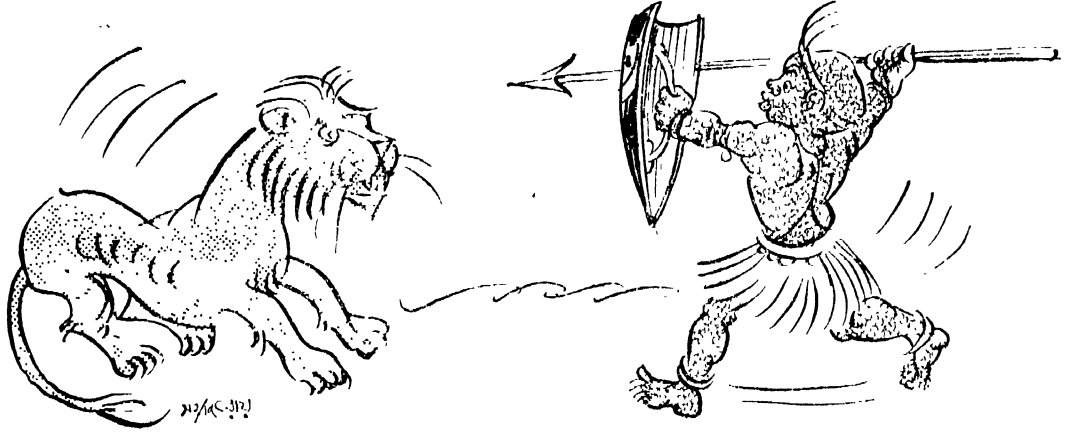
এক যে ছিল ছোট ছেলে, তার নাম ছিল কামা। সে এতটুকু মানুষ ছিল, তার পেটটি ছিল বড়, হাত পা ছিল কাঠি কাঠি। সে অন্য ছেলেদের সঙ্গে জোরে পারত না, খেলতে গেলে খালি তাদের হাতে মার খেত। বেচারা চুপ করে সে সব সয়ে থাকত, তার গায়ে জোর ছিল না, কাজেই কি নিয়ে ঝগড়া করবে? তার ইচ্ছা হত যে সে খুব ভারি ভারি কাজ করে, খালি গায় জোর ছিল না বলে সেসব কিছু করতে পারত না।

গ্রামের লোকেরা তাকে বলত ভীতু কামা। তারা চাইত যে গ্রামের ছেলে পিলে খুব ষণ্ডা আর সাহসী হয়। তাদের সর্দার যখন দেখল যে কামা তার কিছুই হচ্ছে না, তখন সে তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিল।

কামা ভাবল—ওমা! কি হবে? আমি কোথায় যাব? গ্রাম থেকে ত আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে এখন পরীর পাহাড়ে গিয়ে দেখি পরীরা আমাকে কি করে!

সে দেশে একটা গোলপানা পাহাড় ছিল, তাতে পরীরা থাকত। সেখানকার লোকেরা তাদের ভয়ে কেউ সেখানে যেত না। কামা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেই পরীর পাহাড়ে গিয়ে উপস্থিত হল, আর অমনি খুদে খুদে কালো সব পরী এসে তাকে ঘিরে ফেলল,– তারা জুলু দেশের পরী কিনা, তাই কালো, তাদের ফড়িংএর মতন ডানা আর হাতে ঢাল আর বর্শা। কামাকে তাদের পাহাড়ে আসতে দেখে তারা এমনি চটেছে যে কি আর বলব। তাদের রাজা এসে তাকে বলল—'তুই যে আমাদের পাহাড়ে এলি? দাঁড়া এখনি তোকে মেরে ফেলছি!'

কামা কাঁপতে কাঁপতে হাতজোড় করে বলল—'দোহাই রাজামশাই, আমাকে মারবেন না। আমি ভীতু কামা, আপনাদের কোন ক্ষতি করবার ক্ষমতা আমার নাই, আমাকে মেরে কি হবে?'

পরীর রাজা বলল—'বটে? তুই ভীতু কামা? হাঁ হাঁ তোর কথা শুনেছি বটে। তোর গায় জোর নাই, কিন্তু তোর মনটাতে সাহস আছে। আচ্ছা বাছা, তোর আর অমনি করে ভয়ে কাঁপতে হবে না, আমি তোকে পালোয়ান করে দিচ্ছি।'

বলে পরীর রাজা মাটিতে একটা সিংহের চামড়া বিছিয়ে কামাকে বলল—'এর উপর শুয়ে একটু ঘুমো দেখি।' কামা সেই সিংহের চামড়ার উপরে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর যখন তার ঘুম ভেঙ্গেছে, তখন সে দেখে তার আর সেই কাঠি কাঠি হাত পা নাই, সে ভারি এক পালোয়ান হয়ে গেছে, আর তার মনে হচ্ছে যেন সে এক থাপ্পড়ে হাতি মেরে ফেলতে পারে!

তখন কামা চারিদিকে চেয়ে দেখল যে সেই পাহাড়ের উপর সে একলাটি দাঁড়িয়ে আছে। পরীদের একজনও সেখানে নাই, তার জন্য মস্ত বড় ঢাল আর বর্শা রেখে কোথায় চলে গেছে।

সেই ঢাল আর সেই বর্শা হাতে করে কামা পাহাড় থেকে নেমে তার ঘরের দিকে চলল। খানিক দূর এসে সে দেখল যে ভয়ঙ্কর একটা সিংহ হাঁ করে তাকে খেতে এসেছে। সে কি আর এখন সিংহকে ডরায়? তার বর্শার এক খোঁচা খেয়েই সেই সিংহ জিব বার করে, চোখ উলটিয়ে মরে গেল।

সেই সিংহটাকে কাঁধে ফেলে, ঢাল আর বর্শা হাতে যখন কামা গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছে তখন ত তাকে দেখে আর কারু মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। গ্রামের জোয়ানেরা এসে তার ঢাল আর বর্শা আর সিংহটাকে নিয়ে কত টানাটানি করল, কিন্তু কেউ তাকে একটু নাড়তেও পারল না!

গ্রামের সর্দার আগে কামাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এখন সে তাকে কি করে আদর দেখাবে, তাই ভেবে ঠিক করতে পারছে না! তখনি সে তাকে একখানি চমৎকার ঘর আর অনেকগুলি ষাঁড় দিয়ে দিল।

এখন আর কামার কোন দুঃখ নাই। সে সেই ঘরখানিতে তার মাকে নিয়ে থাকে। আগে যারা তাকে বলত 'ভীতু কামা'—এখন তারা বলে 'কামা পালোয়ান।'

কাকু গেলেন, হাঁস শিকারে—নিয়ে এলেন, জ্যান্ত একটা কুমীরছানা ! উঠোনের চৌবাচ্চায় তাকে রাখলেন—নাম দিলেন, 'জগমোহন।'

জগ্‌মোহন প্রকাণ্ড হাঁ করে, কাকু টপাটপ্‌ খাবার দেন, সে কপাকপ্‌ গিলে খায়—বাব্‌লু টুব্‌লু মজা দেখে।

এখন জগ্‌মোহন বেশ বড় হয়েছে—চৌবাচ্চায় কৈমাছ, উঠোনে শালিক চড়াই, শিকার করে। হঠাৎ একদিন সে কেমন করে রাস্তায় পালিয়ে গেল !

তারপর যা কাণ্ড—হাঁউমাঁউ করে ছেলেপিলেরা ছুটল, ঘেউঘেউ করে কুকুর ডেকে উঠল, দুম দাম করে দরজায় খিল পড়ল, 'মারমার' করে কেউ কেউ লাঠি হাতে বেরিয়ে এল—যেই জগ্‌মোহন খ্যাঁক্‌ খ্যাঁক্‌ করে তেড়ে গেল, অমনি তারা হুড়মুড়িয়ে পালাল !

এবার এল, দরোয়ান ভীম সিং—মুগুরটা বাগিয়ে ধাঁ-ই করে মারবে, এমন সময়ে কাকু ছুটে এলেন 'মেরোনা! মেরোনা! আমার পোষা কুমীর !'

একটা কৈমাছ জগমোহনের নাকের সামনে দোলাতে দোলাতে কাকু ছুটলেন—সুড়সুড়্‌ করে জগ্‌মোহন তাঁর পিছনে চলল।

পাড়ার লোকে বল্‌ল—'কি বিদ্‌ঘুটে শখ্‌ বাপু! কুমীর আবার কেউ পোষে নাকি?' 'না মশাই, ওটাকে বিদায় করুন—কোনদিন কাকে কামড়াবে!' বাবাও বললেন, 'ওকে নাহয় আলিপুরে চিড়িয়াখানায় দিয়ে এসো!'

কাকু বেচারা এখন প্রতি রবিবার চিড়িয়াখানায় যান—বোতলভরা কৈমাছ নিয়ে, তাঁর সাধের জগ্‌মোহনকে খাইয়ে আসেন।

(প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি থেকে—বোলিভিয়ার কোচাবাম্বা শহর থেকে ১৩০ মাইল দূরে ভূমিকম্পের ফলে একটা পাহাড়ে গুহা আবিষ্কৃত হয় এবং তার মধ্যে প্রাচীন মানুষের আঁকা ছবি পাওয়া যায়। আমার বন্ধু প্রোফেসর ডামবার্টনের নিমন্ত্রণে এসেছি, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে। স্থানীয় প্রোফেসর কর্ডোবার সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করে গুহায় ঢুকে আমরা আশ্চর্য সুন্দর এবং উজ্জ্বল ছবি ও নকশা দেখেছি। অনেক প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের ছবি আছে। ড্রাইভার পেড্রোকে গুহার বাইরে পাহারায় রেখে এসেছিলাম। আর্ত চিৎকার শুনে বাইরে এসে তার মৃতদেহ চোখে পড়ল। পাশেই একটা বিশাল কাঁটার মতন পড়ে আছে—যেটা কোন ধাতুর তৈরি নয়! প্রবল ঝড়বৃষ্টির জন্য পরদিন ঘরেই বসে গুহার মধ্যেকার ফোটো পরীক্ষা করে স্তম্ভিত হলাম—সেই নকশাগুলি আসলে অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক ফরমুলা! যেটাকে প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের কাঁটা ভেবেছিলাম সেটা প্লাস্টিকের তৈরি! এসব কার কীর্তি! পরদিন আর একটা জীপ নিয়ে গুহার পথে যেতে কর্ডোবার জীপটা পড়ে থাকতে দেখলাম। গুহার মুখে পাথর চাপা কর্ডোবার চিঠি—আমাদেরই সম্বোধন করে লিখছেন যে তিনি গুহার মধ্যে অনুসন্ধানে ঢুকেছেন, হয়ত বা বিপদে পড়েছেন।)

(৩)

এই একটি চিঠিতে আমাদের মনের ভাব একেবারে বদলে গেল, আর নতুন করে একটা অজানা আশঙ্কায় মনটা ভরে গেল। কিন্তু কাজ বন্ধ করলে চলবে না। বললাম, 'চলো হিউগো, ভিতরে যাই। যা থাকে কপালে!'

কিছুদূর গিয়েই বুঝতে পারলাম এখানে কর্ডোবা এসেছিলেন, কারণ মাটিতে পড়ে আছে একটা আধ খাওয়া কালো রঙের সিগারেট, যেমন সিগারেট একমাত্র কর্ডোবাকেই খেতে দেখেছি। কিন্তু এ ছাড়া মানুষের আর কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না। পাথরের উপর যখন পায়ের ছাপ পড়ে না, তখন আর কী চিহ্নই বা থাকবে?

সেই বিরাট হল ঘরের ভিতর এসে, এবারে আর না থেমে সোজা বিপরীত দিকের সুড়ঙ্গ ধরে চলতে লাগলাম। সুড়ঙ্গ হলেও, এখানে রাস্তা বেশ চওড়া, আর মাথা হেঁট করে হাঁটতে হয় না।

একটা আওয়াজ কানে আসছে। একটা মৃদু গর্জনের মত শব্দ। ডামবার্টনও শুনল সেটা। গর্জনের মধ্যে বাড়া কমার ব্যাপারও লক্ষ্য করলাম। আসল আওয়াজটা কত জোরে, বা সেটা কতদূর থেকে আসছে, তা বোঝার কোন উপায় নেই। ডামবার্টন বলল, 'গুহার ভিতরে জানোয়ার টানোয়ার নেই ত?' সত্যিই আওয়াজটা ভারী অদ্ভুত—একবার উঠছে, একবার পড়ছে—অনেকটা গোঙানির মত।

সামনে সুড়ঙ্গটা ডানদিকে বেঁকে গেছে। মোড়টা পেরোতেই দেখলাম আরেকটা বড় ঘরে এসে পড়েছি। টর্চের আলো এদিক ওদিক ফেলে বুঝলাম এ এক বিচিত্র ঘর, তার চারিদিকে অদ্ভুত অজানা যন্ত্রপাতি দিয়ে ঠাসা, আর তার দেওয়ালে ছবির বদলে কেবল অঙ্ক আর জ্যামিতিক নক্শা আঁকা। যন্ত্রপাতিগুলোর কোনোটাই কাঁচ বা লোহা বা ইস্পাত বা আমাদের চেনা কোন ধাতু দিয়ে তৈরি নয়। এছাড়া রয়েছে সরু সরু লম্বা লম্বা তারের মত জিনিস, যেগুলো দেয়ালের গা বেয়ে উঠে এদিক ওদিক গিয়েছে। সেগুলোও যে কিসের তৈরি সেটাও দেখে বোঝা গেল না।

মেঝেতে কিছু আছে কিনা দেখবার জন্য টর্চের আলোটা নিচের দিকে নামাতেই একটা দৃশ্য দেখে আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

দেয়ালের কাছেই, তার ডান হাত দিয়ে একটা তার আঁকড়ে ধরে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন প্রোফেসর কর্ডোবা। কর্ডোবার পিঠে মাথা রেখে চিৎ হয়ে মুখ হাঁ করে পড়ে আছে তাঁর জীপের ড্রাইভার, আর ড্রাইভারের পায়ের কাছে ডান হাতে একটি বন্দুক আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে আরেকটি অচেনা লোক। তিনজনের কারুরই দেহে যে প্রাণ নেই সে কথা আর বলে দিতে হয় না।

আমার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে এলো—'ইলেকট্রিক্ শক্!' তারপর বললাম, 'ওদের ছুঁয়োনা, ডামবার্টন।'

ডামবার্টন চাপা গলায় বলল, 'সেটা বলাই বাহুল্য, তবে তাও ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ কর্ডোবাকে, কারণ ওর দশা না দেখলে আমরাও হয়ত ওই তারে হাত দিয়ে ফেলতে পারতাম। কর্ডোবাকে বাঁচাতে গিয়েই অন্য দুজনেও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছে, কী সাংঘাতিক ব্যাপার বলত!'

আমি বললাম, 'একটা জিনিস প্রমাণ হচ্ছে এথেকে—ফরমুলাগুলো কর্ডোবার লেখা নয়।'

সেই মৃদু গর্জনটা এখন আর মৃদু নয়। সেটা আসছে আমাদের বেশ কাছ থেকেই। আমি টর্চ হাতে এগিয়ে গেলাম, আমার পিছনে ডামবার্টন। গর্জনটা বেড়ে চলেছে।

যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বাঁচিয়ে অতি সাবধানে মিনিট খানেক হাঁটার পর সামনে আরেকটা দরজা দেখতে পেলাম। এবং বুঝলাম যে সে দরজার পিছনে আরেকটি ঘর, এবং সে ঘরে একটি আলো রয়েছে। ডামবার্টনকে বললাম, 'তোমার টর্চটা নেভাও ত।'

দুজনের আলো নেভাতেই একটা মৃদু লাল কম্পমান আলোয় গুহার ভিতরটা ভরে গেল। বুঝলাম ঘরটায় আগুন জ্বলছে, এবং গর্জনটাও ওই ঘর থেকেই আসছে। ডামবার্টনের গলা পেলাম—

'তোমার বন্দুকটা তৈরি রাখো।'

বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে অতি সন্তর্পণে গিয়ে আমরা দুজনে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। প্রকাণ্ড ঘর। তার এক কোণে একটা চুলিতে আগুন জ্বলছে, তার সামনে কিছু জন্তুর হাড় পড়ে আছে। ঘরের মাঝখানে একটা পাথরের বেদী বা খাট, তাতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে একটি প্রাণী, ঘুমন্ত। গর্জনটা আসছে তার নাক থেকে।

আমরা একেবারে নিঃশব্দে এক পা এক পা করে খাটের দিকে এগিয়ে গেলাম।

প্রাণীটিকে মানুষ বলতে বাধে। তার কপাল ঢালু, মাথার চুল নেমে এসেছে প্রায় ভুরু অবধি তার ঠোঁট দুটো পুরু, থুৎনি চাপা, কান দুটো চ্যাপ্‌টা, আর ঘাড় নেই বললেই চলে। তার সর্বাঙ্গ ছাই রঙের লোমে ঢাকা। আর মুখের যেখানে লোম নেই, সেখানের চামড়া অবিশ্বাস্য রকম কুঁচকান। তার বাঁ হাতটা বুকের উপর আর অন্যটা পাশে খাটের উপর লম্বা করে রাখা। হাত এত লম্বা যে আঙুলের ডগা গিয়ে পৌঁছেছে হাঁটু অবধি।

ডামবার্টন অস্ফুটস্বরে বলল, 'কেভ ম্যান! এখনো বাঁদরের অবস্থা থেকে পুরোপুরি মানুষে পৌঁছায় নি।'

গলার স্বর যথাসম্ভব নীচু করে আমি জবাব দিলাম, 'কেভ ম্যান শুধু চেহারাতেই, কারণ আমার বিশ্বাস গুহার মধ্যে যা কিছু দেখছি সবই এরই কীর্তি।'

ডামবার্টন হঠাৎ কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'শ্যাঙ্কস—ওটা কী লেখা আছে পড়তে পারছ?'

ডামবার্টন দেয়ালের একটা অংশে আঙুল দেখাল। বড় বড় অক্ষরে কী যেন লেখা রয়েছে। অক্ষরগুলো ফরমুলা থেকেই চিনে নিয়েছিলাম, সুতরাং লেখার মানে বার করতে সময় লাগল না। বললাম, 'আশ্চর্য!'

'কী?'

'লিখছে—'আর সবাই মরে গেছে। আমি আছি। আমি থাকব। আমি একা। আমি অনেক জানি। আরো জানব। জানার শেষ নেই। পাথর আমার বন্ধু। পাথর শত্রু।''

ডামবার্টন বলল, 'তাহলে বুঝতে পারছ—এই সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরই একজন—কোন আশ্চর্য উপায়ে অফুরন্ত আয়ু পেয়ে গেছে।'

'হুঁ—আর হাজার হাজার বছর ধরে কেবল জ্ঞান সঞ্চয় করে চলেছে। কেবল চেহারাটা রয়ে গেছে সেই গুহাবাসী মানুষেরই মতন।...কিন্তু শেষের দুটো কথার কী মানে বুঝলে?'

'পাথর যে এর বন্ধু সে ত দেখতেই পাচ্ছি। এর ঘর বাড়ি আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি সবই পাথরের তৈরি। কিন্তু শত্রু বলতে কী বুঝছে জানি না।'

আমারই মত ডামবার্টনও বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হয়ে গিয়েছিল। বলল, 'গুহায় থাকে, তাই দিনরাত্রের তফাৎ সব সময়ে বুঝতে পারে না। হয়ত রাত্রে জেগে থাকে, তাই দিনে ঘুমোচ্ছে।'

ছবি তোলার ঠিক সাহস হচ্ছিল না—যদি ক্যামেরার শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। আমাদের মত মানুষকে হঠাৎ চোখের সামনে দেখলে কী করবে ও? কিন্তু লোভটা সামলানোও ভারী কঠিন হয়ে পড়ছিল। তাই ডামবার্টনের হাতে বন্দুকটা দিয়ে কাঁধের থলি থেকে ক্যামেরাটা বার করব বলে হাত ঢুকিয়েছি, এমন সময় নাক ডাকানোর শব্দ ছাপিয়ে গুরুগম্ভীর ঘড়ঘড়ানির শব্দ পেলাম। ডামবার্টন খপ্ করে আমার হাতটা ধরে ফেলে বলল, 'আর্থকুয়েক!'

পরমুহূর্তেই একটা ভীষণ ঝাঁকুনিতে গুহার ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

কয়েকমুহূর্তের জন্য কী যে করব কিছু বুঝতে পারলাম না।

গুড় গুড় গুম্ গুম্ শব্দটা বেড়ে চলেছে, আর তার সঙ্গে ঝাঁকুনিও।

'বন্দুক!' ডামবার্টন চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

আদিম মানুষটার ঘুম ভেঙে সে খাটের উপর উঠে বসেছে।

আমি ডামবার্টনের হাত থেকে বন্দুকটা নিয়েও কিছু করতে পারলাম না। কেবল তন্ময় হয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইলাম।

লোকটা এখন উঠে দাঁড়িয়ে তার লোমশ ভুরুর তলায় কোটরে ঢোকা চোখ দুটো দিয়ে একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে দেখছে। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ফলে বুঝতে পারলাম সে লম্বায় পাঁচফুটের বেশি নয়। তার কাঁধটা গোরিলার মত চওড়া, আর পিঠটা বয়সের দরুণই বোধহয় কুঁজোর মত বেঁকে গেছে। তার চাহনি দেখে বুঝলাম সে আমাদের মত প্রাণী এর আগে কখনো দেখেনি।

ভূমিকম্পের ঘন ঘন ঝাঁকুনির ফলে লোকটা যেন ভয় পেয়েছে। একটা কাতর অথচ কর্কশ আওয়াজ করে সে হাত বাড়িয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

একটা প্রচণ্ড শব্দ পেয়ে বুঝলাম গুহার দেয়ালে কোথায় যেন ফাটল ধরল। আমরা আর অপেক্ষা না করে উর্ধ্বশ্বাসে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পরমুহূর্তেই আদিম মানুষের ঘরের ছাতটা ধ্বসে পড়ে গেল।

কর্ডোবা আর তার সহচরদের মৃতদেহের পাশ কাটিয়ে দৌড়তে দৌড়তে ডামবার্টন বলল, 'শেষ কথাটার মানে বুঝলে ত? পাথর চাপা পড়েই ওকে মরতে হল!'

ঝাঁকুনি থামছে না। কী ভাবে আমরা বাইরে পৌঁছাব জানিনা। এখনো হামাগুড়ি দেওয়া বাকি আছে। বড় হল ঘরটার কাছাকাছি এসে দেখি সামনে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে। কিরকম হল? পথত একটাই। ভুল পথে এসে পড়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

আমরা এগিয়ে গিয়ে দেখি ভূমিকম্পে ঘরের দেয়ালে একটা বিরাট ফাটল হয়ে বেরোবার একটা নতুন পথ তৈরি হয়ে গিয়েছে।

পাথর ভাঙ্গার ফলে কিছু আশ্চর্য ছবি ও নকশা যে চিরকালের মতো ধ্বংস হয়ে গেল, সেটা আর ভাববার সময় ছিল না। গুহার নতুন মুখ দিয়ে দুজনে দৌড়ে, ভাঙা পাথর ডিঙিয়ে বাইরে—বেরোলাম।

বাইরে এসে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দিক্‌ভ্রম হয়েছিল, তারপর অ্যাণ্ডিজের চূড়োয় সাদা বরফ দেখে আবার হদিস পেয়ে গেলাম। আমাদের বাঁ দিক ধরে চলতে হবে—তাহলেই গুহার আসল মুখ ও আমাদের বেরোনর রাস্তায় পৌঁছতে পারব।

মাঝে প্রায় আধ মিনিটের জন্য ঝাঁকুনি থেমেছিল ; আবার গুম্ গুম্ শব্দের সঙ্গে প্রচণ্ডতর ঝাঁকুনি শুরু হল।

কিন্তু ভূমিকম্পের শব্দ ছাড়াও যেন আরেকটা শব্দ পাচ্ছি। সেটা আসছে আমাদের ডানদিকের ওই ভয়ংকর জঙ্গল থেকে। শব্দটা শুনে মনে হয় যেন অসংখ্য দামামা একসঙ্গে বাজছে, আর তার সঙ্গে যেন অজস্র অজানা প্রাণী একসঙ্গে আতঙ্কে চীৎকার করছে।

জঙ্গলের দিকে চেয়ে থেমে পড়েছিলাম, কিন্তু ডামবার্টন আমার আস্তিন ধরে টান দিয়ে বলল, 'থেমো না! এগিয়ে চলো!'

পথ খানিকটা সমতল হয়ে এসেছে বলে আমরা আমাদের দৌড়ের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু ডানদিক থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছিলাম না, কারণ সেই ধুপ্‌ধুপানি আর তার সঙ্গে সেই ভয়াবহ আর্তনাদের শব্দ ক্রমশ বাড়ছিল, এগিয়ে আসছিল।

হঠাৎ দেখতে পেলাম জানোয়ারগুলোকে। জঙ্গল থেকে পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে আসছে। হাজার হাজার জানোয়ার। প্রথম সারিতে ম্যামথ—অতিকায়, লোমশ, প্রাগৈতিহাসিক হাতি। চীৎকার করতে করতে হুড়মুড় করে এগিয়ে আসছে জঙ্গলের বাইরে খোলা জায়গায়—অর্থাৎ আমাদেরই দিকে।

এই অদ্ভুত ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আমাদের দুজনেরই যেন হঠাৎ আর পা সরল না। অথচ জানোয়ার-গুলো এসে পড়েছে তিন চারশো গজের মধ্যে।

হঠাৎ ডামবার্টন শুকনো গলায় চীৎকার করে বলে উঠল, 'ওটা কী?'

আমিও দেখলাম—ম্যামথের ঠিক পিছনেই এক কিম্ভূত জানোয়ার—তার গলা লম্বা, নাকের উপর শিং আর পিঠের উপর কাঁটার ঝাড়। গুহার দেয়ালের ছবির জানোয়ার!—ল্যাজের উপর ভর দিয়ে ক্যাঙ্গারুর মত লাফিয়ে ল্যাফিয়ে এগিয়ে আসছে প্রাণের ভয়ে!

আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। হাতে আমার অ্যানেস্থিয়ান বন্দুক কিন্তু এই উন্মত্ত পশুমেলার সামনে এ-বন্দুক আর কী?

ডামবার্টনের পা কাঁপছিল। 'দিস্ ইজ দি এণ্ড'—বলে সে ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল।

আমি এক হ্যাঁচকা টানে ডামবার্টনকে মাটি থেকে উঠিয়ে বললাম, 'পাগলের মত কোরনা—এখনো সময় আছে পালানোর।'

মুখে বললেও, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ম্যামথের সার একশো গজের মধ্যে এসে পড়েছে।

ভূমিকম্পের তেজ কিছুটা কমেছিল, এখন আবার প্রচণ্ড কাঁপানি শুরু হল, আর তার সঙ্গে বাড়ল জন্তুদের চীৎকার। পিছনে বাইসনের দল দেখা দিয়েছে। সব মিলিয়ে সে যে কী ভয়ঙ্কর শব্দ তা আমি লিখে বোঝাতে পারব না।

কিছুদূর দৌড়ে আর এগোতে পারলাম না। এ অবস্থায় বাঁচবার আশা পাগলামো ছাড়া আর কিছু না। তার চেয়ে বরং হাতির পায়ের তলায় পিষে যাবার আগে সেগুলোকে কাছ থেকে ভালো—

করে দেখে নিই। এমন সুযোগও এর আগে কোন সভ্য মানুষের কখনো হয় নি!

ডামবার্টন আর আমি দুজনেই থেমে এগিয়ে আসা জানোয়ারের দলের দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম। আর কতক্ষণ? খুব বেশি ত বিশ সেকেণ্ড!

আবার নতুন করে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি শুরু হল—আর তার সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারদের মধ্যে একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য—যেন তারা হঠাৎ বুঝতে পারছে না কোনদিকে যাবে—দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক করছে—পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে।

এরপর যে দৃশ্য দেখলাম, তেমন দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি—ভবিষ্যতেও দেখব কিনা জানিনা। সামনের সারির ম্যামথগুলোর পায়ের তলার জমিটা জঙ্গলের সঙ্গে সমান্তরাল একটা লাইনে প্রায় মাইলখানেক জায়গা জুড়ে চিরে দুভাগ হয়ে গেল। তার ফলে যে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হল তাতে কমপক্ষে একশো হাতি, বাইসন আর সেই নাম না-জানা জন্তু হাত পা ছুঁড়ে বিরাট চীৎকার করতে করতে ভূগর্ভে তলিয়ে গেল। আর অন্য জানোয়ারগুলো এবার ছুটতে শুরু করল উল্টো দিকে—অর্থাৎ আবার সেই জঙ্গলের দিকে।

আর আমরা? এই প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পই শেষকালে আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করল।

* * *

গুহার মুখটাতে এসে দেখলাম তার ভিতরে যাবার আর কোন উপায় নেই। ছাত ধ্বসে মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। ভিতরে যা কিছু ছিল তা বোধহয় চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। শুধু রয়ে গেল আমার তোলা ছবিগুলো।

ফাটলের বাইরে এসে দেখি মিগুয়েল পালায়নি, তবে ভয়ে প্রায় আধমরা হয়ে গিয়েছে। আমাদের দেখে আনন্দে জড়িয়ে ধরে কাঁদে আর কি!

কোচাবাম্বা ফেরার পথে ডামবার্টনকে বললাম, 'বুঝতে পারছ—আমরাও ঠিক বলিনি, কর্ডোবাও ঠিক বলেনি। গুহাটা আদিমই বটে—সেখানে আমাদের অনুমান ঠিক। কিন্তু তার কিছু ছবি যে সম্প্রতি আঁকা—সেটাও ঠিক।—কাজেই সেখানে কর্ডোবা ভুল করেনি!'

ডামবার্টন মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, 'পঞ্চাশ হাজার বছরের বুড়ো কেভ-ম্যানের কথা লোকে বিশ্বাস করবে বলে মনে হয়?'

আমি হেসে বললাম, 'যারা আমাদের পুরাণের সহস্রায়ু মুনি ঋষিদের কথা বিশ্বাস করে, তারা অন্তত নিশ্চয়ই করবে!'

সমাপ্ত

* প্রোফেসর শঙ্কু ও কোচাবাম্বার গুহা শুরু হয়েছিল গত ফাল্গুন মাসে (মার্চ)।

* পুরাতন সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় *

ভারত প্রতিনিধি

সুধীর সেন

(থানাতে কুর্মাসি পশুশালা দেখার পর)

রৌদ্রোজ্জ্বল রবির প্রভাতে
চুপি চুপি আসিনু বেড়াতে
ক্ষণিকের অবসরে
বহুকাল পরে
পশুর জগতে।
শুরু হতে
হেরিলাম ঘুরে ঘুরে
কত জীবজন্তু জানোয়ার
সুন্দর অপূর্ব বিষাক্ত অদ্ভুত
বীভৎস আকার
সর্বশেষে
থামিলাম তব কাছে এসে।
সোৎসুক নয়নে পড়িলাম
তব শুভ জন্মতিথি,
তব নাম ধাম,
গজ শিশু সইরাম।
বক্র শুঁড় উচ্চে তুলে,
হেলে দুলে তুমি ছুটে এলে,
দাঁড়ালে আমার পাশে
অব্যক্ত উল্লাসে।
ভারতের শিশু প্রতিনিধি
হেরি তব গতিবিধি
মনে হল সহসা চকিতে
তুমি যেন পারিলে চিনিতে
রাষ্ট্র সংঘ-প্রতিনিধি মোরে,
তাই মোর তরে
তব স্থূল দেহ তুলে
লীলাচ্ছলে
কোমল বৃংহণ রবে
করিলে রচনা
এমন অপূর্ব অভ্যর্থনা।
ত্যজি জন্ম ভূমি
সুদূর ভারতে
আসিয়াছ তুমি
শৈশব হতে
যূথভ্রষ্ট জীবন কাটাতে
দূর আফ্রিকাতে।
দেখি তব পরিপুষ্ট তনু
মনে মনে বড় তুষ্ট হনু
সইরাম
বুঝিলাম
হেথা কুর্মাসির বুকে
আছ তুমি সুখে
সম্ভ্রমে সাদরে,
চর্বি অপর্যাপ্ত দুর্বাদল
সুস্নিগ্ধ শ্যামল
সুনীল আকাশ তলে।
প্রতি দিন দলে দলে
বিনা কাজে
এই পশু শালা মাঝে
কত লোক আসে যায়
হেথা এসে থমকি দাঁড়ায়
কত বৃদ্ধ শিশু যুবা।
সহসা কেউ বা

তোমা পানে ঝুঁকে
সকৌতুকে
তৃণখণ্ড দেয় ছুঁড়ে।
তুমি তাই লম্বা শুঁড়ে
যত্নে তুলি মুখে দাও পুরে।
কত শিশু অস্থির চঞ্চল
কত কি যে বলে অনর্গল
সোল্লাসে চীৎকারি;
অর্থ তার বুঝিতে না পারি।
এই ভাবে প্রতিদিন
ক্লান্তিহীন
করিছ আনন্দ বিতরণ।
স্থাপি জন্মভূমি সনে
নীরবে গোপনে
নিগূঢ় বন্ধন।
মোর মত
তুমিও নিয়ত
আছ রত
রাষ্ট্রদৌত্য কাজে
অশান্তি বিক্ষুব্ধ বিশ্ব মাঝে।
মোর লাগি
আছে জাগি
চিন্তা সর্বগ্রাসী
জটিল সমস্যা রাশি রাশি
দিবা নিশি
অফুরন্ত ডিপ্লোমিসি।
একই পেশা করি মোরা দোঁহে
কিন্তু কূট নহে
কভু তব কূট নীতি
তব আকৃতি প্রকৃতি
জন্মলব্ধ ক্রীড়া প্রীতি
সেই তব আসল সম্বল
সুন্দর সরল
তব উপস্থিতি
সেই তব রাজনীতি।
হেরি তোমা, সইরাম
লভিলাম
আনন্দ অগাধ।
করিলাম মনে মনে
এই আশীর্বাদ;
প্রবাস বেদনা তব যাক্ চুকে,
থাক সুখে
একাকী আপন মনে
বর্দ্ধি নিত্য আয়তনে।
রোগ শোক করি জয়
হও দীর্ঘজীবী থাক নিরাময়
হেথা কুর্মাসিতে
অভিনব তব এম্বেসিতে।

আটলাণ্টিস রহস্য

প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীনকাল থেকে য়ুরোপের লোকের মধ্যে একটা প্রবাদ চলে আসছে, আটলাণ্টিস নামে একটা সুসভ্য দেশ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে এবং ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে গেছে। গ্রীক পণ্ডিত প্লেটো (প্লাতন) লিখে গেছেন; এথেন্সের ব্যবহার শাস্ত্র প্রবর্তক সোলন মিশর দেশের পুরোহিতদের কাছে শুনেছিলেন, 'পুরাকালে তোমাদের দেশে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর, সুসভ্য এবং সমৃদ্ধিশালী একজাতীয় লোকের বাস ছিল, যাদের কাছে তোমরা, আজকের গ্রীকরা,--এবং তোমাদের শহর সামান্য কণামাত্র ধ্বংসাবশেষ।' সোলন নাকি শুনেছিলেন, সে দেশের আয়তন ছিল আটশো হাজার বর্গ মাইল, এবং সে দেশ ধ্বংস হয়েছিল তাঁর ন'হাজার বছর আগে চব্বিশ ঘণ্টার ভূমিকম্পে। হিরাক্লিসের স্তম্ভের ওপারে নাকি ছিল নাকি সেই দেশ। ভূমধ্য সাগরের মধ্যে গ্রীসের কাছাকাছি আটশো হাজার বর্গ মাইল কোনও ভূমিখণ্ড সমুদ্রে তলিয়ে যাবার জায়গা নেই। দ্বিতীয়তঃ জিব্রাল্টারের কাছে হিরাক্লিসের বিখ্যাত স্তম্ভ ছিল পশ্চিম মহাসমুদ্রে বেরোবার মুখে; সেইজন্য প্লেটো ভেবেছিলেন, পশ্চিমের ঐ মহাসমুদ্রের মধ্যেই সেই মহাদেশটা ডুবে আছে, এবং তাঁর ধারণানুযায়ী সেই অবলুপ্ত আটলাণ্টিস এর নাম থেকে ঐ সমুদ্রটারই পরে নামকরণ হয়েছে - 'আটলাণ্টিক মহাসাগর।' গত আড়াই হাজার বছর ধ'রে ঐ 'আটলাণ্টিস' সম্বন্ধে অনেকে অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু সেই লুপ্ত মহাদেশের কোনও সন্ধানই এতদিন পাওয়া যায় নি।

সম্প্রতি য়ুরোপের পূর্বদক্ষিণে গ্রীসের পাশে ইজিয়ান সমুদ্রে হঠাৎ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে 'আটলাণ্টিস'-রহস্যের একটা সমাধান পাওয়া গেছে মনে হচ্ছে। গ্রীসের দক্ষিণে ক্রীট দ্বীপে সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার একটা সুন্দর শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে যে সব ভিত্তি চিত্র শোভিত বাড়ি ঘর, আসবাব জিনিসপত্র প্রভৃতি ইতঃপূর্বে পাওয়া গেছিল, তাতে পৃথিবীর লোক জেনেছিল, মিশর, বাবিলোনিয়া এবং ভারতবর্ষের মহেঞ্জদাড়োর সমসাময়িক এক সুপ্রাচীন সুসভ্য জাত বাস করত ঐ অঞ্চলে। গ্রীক পুরাণের বিখ্যাত ক্রীটের রাজা মাইনসের নামানুসারে তাদের সভ্যতাকে মিনোয়ান সভ্যতা বলা হয়। ঐতিহাসিকদের মতে গ্রীসের সভ্যতা এবং পরবর্তীযুগের রোম এবং য়ুরোপের সভ্যতা সেই মিনোয়ান সভ্যতার কাছে ঋণী! সেই মিনোয়ান সভ্যতার সমাপ্তি কি-ভাবে ঘটেছিল,—সে বিষয়ে অবশ্য নানা পণ্ডিতের ছিল নানা মত।

গ্রীসের দক্ষিণ পূর্বে ক্রীট দ্বীপের উত্তরে কতকগুলি দ্বীপকে সান্তোরিনি দ্বীপপুঞ্জ বলা হয় তার মধ্যে 'থিরা' নামক একটি দ্বীপে আগ্নেয় ভস্ম তোলবার জন্য খনি খোঁড়া হয়েছে। সেই ভস্ম সিমেন্ট তৈরী করবার কাজে লাগে। ১৯৫৬ সালে সেই রকম একটা খনির তলায়—মাটি থেকে একশো ফুট নিচে একটা পাথরের বাড়ি কিছু আগুনে-পোড়া কাঠ কাটরা এবং একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোকের

দাঁতের পাটি পাওয়া গেছে। এথেন্সের ভূমিকম্প-বিজ্ঞানাগারের অধ্যাপক আঞ্জেলস্ গালানোপুলস্ এই আবিষ্কারের মূলে ছিলেন। 'রেডিয়ো কার্বন' পরীক্ষার ফলে জানা গেছে—যাদের দাঁত পাওয়া গেছে তারা আনুমানিক তিন হাজার চারশ' বছর আগে মারা গেছিল, এবং যে ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাতের ফলে তাদের শহরটা একশ' ফুট আগ্নেয় ভস্মের তলায় গেছিল, মানুষের লিখিত ইতিহাসে তার চেয়ে বড় প্রাকৃতিক বিস্ফোরণ আর কখনও হয়নি।

পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের 'ক্রাকাতোয়া'তে গত ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে যে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে—বৈজ্ঞানিকেরা তার সঙ্গে তুলনা করে প্রাচীন যুগের ঐ বিস্ফোরণের ভীষণত্ব সম্বন্ধে ধারণায় পৌঁছেছেন। ক্রাকাতোয়ায় চোদ্দশো যাট ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথাটা ফেটে তেত্রিশ মাইল উঁচু একটা আগুনের থাম দাঁড়িয়ে উঠেছিল, পাথরের টুকরো চারদিকে পঞ্চাশ মাইল দূরে ছিটকে পড়েছিল, ধূলিকণা কয়েক মাস ধরে সমস্ত পৃথিবীর বাতাসে ছড়িয়ে সূর্যাস্তের আকাশকে রাঙিয়ে তুলেছিল। যে রঙ ছিল এমনই আগুনের মতো লাল, যে কয়েক মাস পরেও আমেরিকার পূর্ব উপকূলে একদিন আগুন লেগেছে ভেবে লোকে ভয় পেয়ে 'ফায়ার ব্রিগেড' ডেকেছিল। অগ্ন্যুৎপাতের পর ক্রাকাতোয়ার আগ্নেয় গিরিটা ছ'শো ফুট গভীর একটা গর্তে পরিণত হয়েছিল, কাছাকাছি দু'শো পঁচানব্বইটা শহর সমুদ্রের জলোচ্ছাসে ধ্বংস হয়েছিল, তাতে ছত্রিশ হাজার লোক ডুবে মরেছিল। একটা জাহাজ জলের ঠেলায় দু'মাইল ডাঙায় উঠে পড়েছিল। সেই বিস্ফোরণের গর্জনে চারশো আশি মাইল দূরে বাড়িঘর কেঁপেছিল, দু'হাজার মাইল দূর থেকে শোনা গেছিল। সেই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সমস্ত দ্বীপটাতে এক ফুট পুরু 'লাভা' অর্থাৎ যে অগ্ন্যুৎপাত হয় তার ভস্মরাশি আশি হাজার বর্গমাইল ছড়িয়েছিল, আগ্নেয়গিরির গহ্বরটা সমুদ্র থেকে বারোশ' ফুট নিচে চলে গেছিল, সমুদ্রজলের এক মাইল উঁচু উত্তাল তরঙ্গ ঘণ্টায় দু'শ মাইল বেগে ক্রীটের উপকূলভূমির উপর আঘাতের পর আঘাত দিয়েছিল। একশো ফুট উঁচু হয়ে সেই জলের পাঁচিল ক্রীট দ্বীপ প্লাবিত করেছিল। তিন ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্র তরঙ্গে দক্ষিণে মিশরের বদ্বীপ ভেসে গেছল। পূর্বে ছশোচল্লিশ মাইল দূরে সিরিয়ার 'উপারিট' নামক বন্দর ডুবিয়ে শেষ করে দিয়েছিল। এ হ'ল সাময়িক বিপর্যয়। এই বিস্ফোরণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আরও বেশি।

সে সময় ক্রীটদ্বীপের বারোটি শহরে কম পক্ষে দশ লক্ষ সুসভ্য নাগরিক বাস করত। কয়েক বছরের সভ্যতার ইতিহাস ছিল তাদের সমৃদ্ধির পিছনে কাছাকাছি অনেকগুলি দ্বীপে এই সভ্য মানুষদের ঘাঁটি ছিল। তাদের বিদগ্ধ লিখন প্রণালী ছিল, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, দৌড় প্রতিযোগিতা, স্ত্রী পুরুষ বাজিকরদের অসমসাহসিক ক্রীড়া প্রদর্শনী ছিল। আক্রমনোদ্যত ষাঁড়ের শিং ধরে লাফ খাওয়ার প্রতিযোগিতাতেও নামত সে দেশের পুরুষ, এবং পায়খানার জলনিকাশের ব্যবস্থা ছিল মাটির তলা দিয়ে, ঘর ঠাণ্ডা রাখবার জন্য শীতল বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল। অপূর্ব কারুকার্যময় নানা রকম ধাতুপাত্র এবং গহনা প্রভৃতি তৈরি করতে পারত। সুন্দর মূর্তি গড়ত, বাড়ির দেয়ালে তারা যে রঙিন ভিত্তিচিত্র আঁকত তা আধুনিকতম রুচিসঙ্গত বলা চলে।

তাদের বাণিজ্যজাহাজ এবং রাজ্যদূতেরা প্রাচীন যুগের পৃথিবীর সমস্ত সুসভ্য দেশে ছড়িয়ে ছিল। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে হঠাৎ সেই সভ্যতার সমাপ্তি ঘটে। শহরগুলো ধ্বংস হয়ে যায়, দোতলা-তেতলা বিরাট প্রাসাদের বড় বড় পাথরগুলো দেশলাইকাঠির মতো ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। ক্রীটদ্বীপের সমস্ত উর্বর ক্ষেত্রপূর্ণ উপত্যকাভূমি আগ্নেয় ভস্মের স্তূপে চাপা পড়ে, মিনোয়ান জাতটাই অকস্মাৎ ইতিহাসের পাতা থেকে সাড়ে তিন হাজার বছরের জন্য মুছে যায়। সেই দুর্যোগের সময় যারা জাহাজে করে সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে অনেক দূরে চ'লে গেছিল বা জলোচ্ছ্বাসের উর্ধ্বে উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় আশ্রয় নিতে পেরেছিল কেবল সেই রকম কিছু নরনারী বোধ হয় রক্ষা পেয়েছিল।

বিপদ কেটে গেলে তারা উত্তর ক্রীটে এবং দক্ষিণ গ্রীসে আবার নতুন ক'রে সংসার পাতে। গ্রীসে তখন যে বর্বর হেলাডিক জাতের লোকেরা বাস করত এই নবাগতদের সংস্পর্শে এসে তারা ক্রমে সভ্য হ'য়ে ওঠে। চোদ্দশো খৃষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ গ্রীসে মাইসিনিয়ান সভ্যতার বিকাশ এই সময়ে আরম্ভ হয়, গ্রীসের সভ্যতার ইতিহাসের গোড়া পত্তন হয়। উদ্বাস্তু মিনোয়ানরা গ্রীকদের লেখাপড়া, ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, ধনুর্বিদ্যা এবং খেলাধুলা শেখায়, সোনা এবং ব্রোঞ্জের কাজ শেখায়, প্রাসাদে এবং সমাধি মন্দির রচনায় দীক্ষা দেয়। পরবর্তী যুগের গ্রীস সেই লুপ্ত সভ্যতার স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছিল নানা কিংবদন্তীতে আটলান্টিসের কাহিনী তার মধ্যে অন্যতম।

সোলনের হিসাবে একটা গুরুতর ভুল ছিল। অধ্যাপক গালানোপুলসের মতে তিনি মিশরীর লিপির অক্ষর পড়তে ভুল করেছিলেন, একশোকে 'হাজার' পড়েছিলেন। তা হ'লেই আটলান্টিসের পরিমাণ আর তার ধ্বংস হওয়ার তারিখ বিজ্ঞানসম্মত হয়। আটশো হাজারের জায়গায় আশি হাজার বর্গমাইল হলে আটলান্টিস ভূমধ্যসাগরের এক প্রান্তে ইজিয়ান সমুদ্রের মধ্যে ডুবে থাকতে পারে। আর সোলনের ন'শো বছর আগে অর্থাৎ আজ থেকে তিন হাজার চারশ' বছর আগে অগ্ন্যুৎপাতটা ঘটে থাকলে মিনোয়ান সভ্যতার ধ্বংসের তারিখের সঙ্গে আটলান্টিস ধ্বংসের তারিখ মিলে যায়। হিরাক্লিসের স্তম্ভ খুঁজতে জিব্রাল্টারের কাছে না গিয়ে অধ্যাপক গালানোপুলস গ্রীসের দক্ষিণে ক্রীটের কাছাকাছি দুটি অন্তরীপ পেয়েছেন, সেগুলিকে এখনও লোকে হিরাক্লিসের স্তম্ভ বলে। প্লেটোর বর্ণনা-মতো আটলান্টি-সের রাজধানী যে সমতলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ক্রীটের বিধ্বস্ত নগর 'ফাইস্টস'এর কাছাকাছি সমতল ভূমি প্রায় সেই রকম। সমুদ্রের দেবতা পসিডনের প্রিয় যে অঞ্চলে গরম জলের ঝরণা, বিদীর্ণ ভূমিতল এবং সমকেন্দ্রিক-বৃত্তাকারে কাটা খাল ছিল ব'লে তিনি লিখেছেন, সাঁন্তোরিনি দ্বীপে তার দেখা পাওয়া যাচ্ছে। সমুদ্রের তলায় নিমজ্জিত আগ্নেয়গিরির মুখের উপর বৃত্তাকারে খাল এবং বন্দরগুলির চিহ্ন দেখে একজন বড়ো ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন, 'মনে হচ্ছে আটলান্টিস রহস্যের সমাধান হ'ল এতদিনে।'

সান্তোরিনির দুর্যোগের ফলস্বরূপ আর একটা ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে চারিদিকের জল পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করতে পারে, মাছ মরে বিষিয়ে যেতে পারে,

ঘূর্ণিবাত্যা রক্তবর্ণ বৃষ্টিপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে। চারশো পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে মিশরে এইরকম দুর্যোগ ঘটেছিল। য়িহুদীদের বিবরণে পাওয়া যায়। যে সময়ে তারা মিশরে দাসত্বে বদ্ধ ছিল, সে সময়ে একবার ঐরকম দশটি বিপৎপাত হয়। দেশের সমস্ত জল লাল রঙের হয়ে যায়, মাছ মরে যায়, ব্যাংএরা ডাঙ্গায় উঠে আসে। আকাশ থেকে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো জ্বলন্ত শিলাবৃষ্টি হতে থাকে, তিনদিন দেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। পচা জলাতে যে সব পোকা-মাকড়ের সৃষ্টি হয় তাদের দ্বারা মানুষ এবং গবাদি গৃহপালিত পশুর নানা রকম রোগ সৃষ্টি হওয়ায় ঘরে ঘরে (প্রথমজাত সন্তান ?) মানুষ মরতে থাকে। ইহুদীদের 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' ছাড়া মিশরের ল্যাপাজরাসে লেখা সমসাময়িক বর্ণনাতেও যাওয়া যায় 'দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে। সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে, তার জ্যোতি নেই। পৃথিবীগর্ভের শব্দ এবং বিশ্বজোড়া এই কোলাহল কখন থামবে ? শহরগুলো ধ্বংস হয়ে গেল, ফল আনাজ কিছু মিলছে না, দেশব্যাপী মারীভয় আরম্ভ হয়েছে।'

এই সুযোগেই বোধ হয় মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদীরা মিশর ত্যাগ করে। বাইবেলের মতে তাদের দেশত্যাগের সময় সান্তোরিনির অগ্ন্যুৎপাতের সময়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। মিশরের সম্রাট ফারাও য়িহুদীদের অনুসরণ করে লোহিত সমুদ্রে ধারে আসেন। য়িহুদীরা সমুদ্র গর্ভে নামলে দু'পাশের জল সরে গিয়ে তাদের পথ করে দেয় আর সম্রাট সৈন্য নামলে স্তম্ভিত জলরাশি দু'দিক থেকে ফিরে এসে তাঁদের ভাসিয়ে দেয় বলে যে বর্ণনা আছে বাইবেলে, ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যুৎপাতের ফলে তাও সম্ভব মনে হয়। অধ্যাপক গালানোপুলসের মতে য়িহুদীদের প্রাচীন বিবরণ 'লোহিত সমুদ্র'কে না বুঝিয়ে (ইয়ান সুফ) ভূমধ্যসাগর থেকে একটি সংকীর্ণ ভূমিখণ্ড দ্বারা বিচ্ছিন্ন 'নলখাগড়ার সমুদ্র বা, বর্তমান 'সার্বেনিস হ্রদ'কে বোঝাতে পারে। য়িহুদীরা সেই সঙ্কীর্ণ স্থলপথ দিয়ে চলে যেতে পেরেছিল, সে সময় সমুদ্রের জল সরে গেছিল উত্তর ইজিয়ানের দিকে, তারপর যখন মিশরের সৈন্য এল তখন সেই বিপুল জলরাশি জোয়ারের টানে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এই জল সরে যাওয়ার এবং ফিরে আসার মধ্যে কুড়ি মিনিট ব্যবধান ছিল মনে হয়।

য়িহুদী পুরাণের কাহিনী ততটা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না হ'লেও মিনোয়ান সভ্যতা ধ্বংসের পাথুরে প্রমাণকে অবিশ্বাস করা যায় না। তিন হাজার চারশ' বছর আগে আগুন এবং ভস্মের মধ্য দিয়ে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্ম হয়, তার সম্পূর্ণ তথ্য খুঁজে বার করবার জন্য আজ ঐতিহাসিক এবং বিজ্ঞানিকেরা একযোগে কঠিন পরিশ্রম করছেন। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে 'থিরা' দ্বীপের ভূগর্ভ থেকে 'পম্পিয়াই' এর অনুরূপ আগ্নেয়ভস্ম ঢাকা একটি সম্পূর্ণ শহর পাওয়া গেছে।

জানুয়ারি ১৯৬৮ সংখ্যায়

* রীডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকার 'রোনাল্ড শিলার' এর প্রবন্ধ অবলম্বনে।

(সমুদ্রের তলদেশ সম্বন্ধে জানবার জন্য স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল, তারপরে আর ফিরে আসেনি। এই অভিযানের নেতা ছিলেন মহাপণ্ডিত ডঃ ম্যারাকট ও জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপটেন হাওসি। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত প্রাণিবিদ মিঃ সাইরাস হেডলি, ইঞ্জিনিয়ার বিল স্ক্যানল্যান ও আরো ২৩ জন। একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তলদেশে অনুসন্ধান চালানই হল ম্যারাকটের উদ্দেশ্য।

স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ রওনা হবার কয়েকদিন পর, ৩রা অক্টোবর, 'আরোইয়া' জাহাজের গ্রাহক যন্ত্রে এক অদ্ভুত বেতারবার্তা ধরা পড়ে—'ঝড়ে জাহাজ কাত। হয় ত আর আশা নেই। ম্যারাকট, হেডলি. স্ক্যানল্যান আগেই গেছেন। ব্যাপার অবোধ্য। ওলনতারের আগায় হেডলির রুমাল। ঈশ্বর ভরসা। এস্ এস্ স্ট্র্যাটফোর্ড।'

৫ই জানুয়ারি আরাবেলা নোউলস্ নামক জাহাজ হাল্কা গ্যাসে ভরা এবং বিশেষ উপাদানে তৈরি একটি ঝকঝকে গোলকের ভিতর হেডলির দ্বিতীয় চিঠিতে এক অত্যাশ্চর্য বিবরণ.জানতে পারে;

জানা যায় যে এক ঝুলন্ত খাঁচার মতন যন্ত্রের সাহায্যে ম্যারাকট, হেডলি ও স্ক্যানল্যান আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তলায় এক গভীর খাদের ধারে অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন। জাহাজের সঙ্গে তাঁদের নলের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে তাঁরা গভীর খাদের মধ্যে পড়ে যান এবং এক আশ্চর্য নগরীর সন্ধান পান।

হালকা কাঁচের মতন জিনিসে তৈরি ডুবুরির পোশাক পরা কয়েকটি লোক এসে তাঁদেরও অনুরূপ পোশাক পরিয়ে 'খাঁচা' থেকে বার করে, বিচিত্র আসবাব পত্রে সজ্জিত এবং কৃত্রিম বাতাসে পূর্ণ এক অট্টালিকায় নিয়ে যায়। সেখানে তাঁদের আহার এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা হলে সকলে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।)

(ছয়)

'যখন জ্ঞান হল প্রথমে বুঝতেই পারলাম না কোথায় আছি। ক্রমশঃ আগের দিনের ঘটনাগুলো একটা অস্পষ্ট দুঃস্বপ্নের মত মনে পড়তে লাগল, সেগুলো যে সত্যি তা ভাবতেই পারছিলাম না। হতভম্বের মত খালি ঘরখানার চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। ঘরটার জানালা নেই। দেওয়ালগুলো একঘেয়ে ঘোলাটে রঙের। কার্নিসগুলোর উপর বরাবর হালকা বেগনী রঙের আলো কাঁপছিল, প্রতিপ্রভ আলো। ঘরে অল্প কয়েকটি আসবাব। শেষে চোখ পড়ল দুটো বিছানার দিকে, তার একটা থেকে নাসিকাগর্জন শুনতে পেলাম। 'স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড এর উপরে থাকতে এ গর্জনটা ম্যারাকটের বলে' জেনেছিলাম। মনে হল এ কি আজগুবী ব্যাপার, এ কখনও সত্যি হতে পারে? কিন্তু যখন আমার বিছানার চাদরে হাত দিয়ে দেখলাম কে জানে কোন সামুদ্রিক গাছের শুকনো আঁশ দিয়ে বোনা সেই অদ্ভুত কাপড়খানা তখন হৃদয়ঙ্গম করলাম কি অসম্ভব অভাবনীয় অ্যাডভেঞ্চারই না আমাদের কপালে এসে জুটেছে। অবাক্ হয়ে এই সব ভাবছি এমন সময় বোমা ফাটার মত হাসির শব্দে চমকে উঠে চেয়ে দেখি বিল্ স্ক্যান্‌ল্যান তার বিছানায় উঠে বসেছে। আমি জেগেছি দেখে তার হাসির মধ্যেই বলে' উঠল, 'মর্নিং, দোস্ত!'

আমি একটু ঝাঁঝালো গলায় বললাম, 'বেশ খোস্ মেজাজে আছ মনে হচ্ছে। তবে আমি হাসবার মত কিছু দেখছি না।'

'বিল্ বললে, 'আরে আমারও মেজাজটা তোমার মতই তিরিক্ষি হয়ে ছিল যখন ঘুম ভাঙল, কিন্তু তারপর মগজে এল এইসা এক তোফা মতলব যে বেদম হাসি পেয়ে গেল।'

'হাসতে আমিও জানি, কিন্তু মতলবটা কি শুনি?'

'আরে দোস্ত, আমার মনে হল আমরা যদি ঐ ওলন তারের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে ফেলতুম তাহলে ক্যায়সা মজাদার ব্যাপারটাই না হত। ঐ কাঁচের মুখোসগুলোর মধ্যে আমরা নিঃশ্বাস নিতুম ঠিকই। তারপর যখন হাওয়াসি বুড়ো তার জাহাজ থেকে ঝুঁকে দেখতে যেত আমরা ঝাড়কে ঝাড় তার বরাবর তাক করে' উঠতুম। সে ঠিক ভাবত আমাদের বড়শিতে গেঁথে তুলেছে। আরে কেয়াবাত কেয়াবাত!'

'আমাদের সম্মিলিত হাসিতে ডক্‌টরের ঘুম ভাঙল। তিনি উঠে বসলেন। খানিক আগে আমি যেমন ভ্যাবাচ্যাকা খাচ্ছিলাম তিনিও যে এখন তেমনি ভ্যাবাচ্যাকা খাচ্ছেন তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। তাঁর টুকতো টুকরো মন্তব্য শুনতে শুনতে আমাদের বিপদের কথা ভুলে গেলাম। তাঁর কথায় কখনও প্রকাশ পাচ্ছিল গবেষণার আনন্দ আর কখনও বা সে গবেষণার ফল তাঁর সহকর্মীদের জানাতে না পারার খেদ। শেষে তিনি ফিরে এলেন এই আলোচনায় যে আমাদের এখন কি কর্তব্য।

''নিজের ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, 'এখন নয়টা।' সকলের ঘড়িতেই তাই, কিন্তু সেটা সকাল নটা না রাত নটা জানবার কোনও উপায় ছিল না।'

'ম্যারাকট্ বললেন, 'নিজেদের তারিখের হিসাব আমাদের নিজেদেরই রাখতে হবে। আমরা নামি ৩রা অক্‌টোবর। এখানে এসে পৌঁছাই সেইদিনই সন্ধ্যা বেলা। আমরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছি?'

'তা, সে তো একমাসও হতে পারে। আমাদের মেরিব্যাঙ্ক ওয়ার্কসের মিকি স্কট্ ছ রাউণ্ডের বাজিতে আমাকে পয়েণ্টে নেওয়া ইস্তক এমন ঘুম আর ঘুমুইনি।'

'সভ্য মানবের যা কিছু দরকার সব বন্দোবস্তই হাতের কাছে ছিল। আমরা পোশাক পরে' হাত মুখ ধুলাম। দরজাটা কিন্তু বাইরে থেকে বন্ধ ছিল, কাজেই বুঝলাম তখনকার মত আমরা বন্দী। বাতাস চলাচলের কোনো ব্যবস্থা এমনিতে চোখে না পড়লেও ঘরের বাতাস একেবারে টাটকা ছিল। দেখলাম দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট ফুকর রয়েছে, তাই দিয়েই ফুর ফুর করে' বাতাস আসছে। সেণ্ট্রাল হীটিং-এর ব্যবস্থাও আছে মনে হল, কারণ যদিও কোনো চুল্লী দেখলাম না তবু ঘরটা বেশ আরামদায়ক গরম গরম লাগছিল। দেওয়ালের গায়ে একটা বড় বোতাম দেখতে পেয়ে সেটা টিপলাম। যা ভেবেছিলাম তাই, ওটা একটা কলিং বেল দরজাটা তখনই খুলে গেল আর হলদে পোষাক পরা একটি ছোট খাট চেহারার মানুষ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তার বড় বড় কটা চোখের চাউনি দিয়ে সে জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে আমাদের দিকে তাকাল।

'ম্যারাকট্ বললেন, 'আমাদের খিদে পেয়েছে, কিছু খাওয়াতে পার?' লোকটি মাথা নেড়ে হাসল। বোঝাই গেল যে কথাগুলো তার অবোধ্য।

'স্ক্যান্‌ল্যান্ একবার কপাল ঠুকে অ্যামেরিকান অপভাষার খই ফোটালে, উত্তরে সেই শূন্যগর্ভ হাসি। শেষটা আমি যখন হাঁ করে' মুখে আঙুল ঢুকিয়ে খাওয়ার ইঙ্গিত করলাম তখন সে সজোরে ঘাড় নেড়ে বুঝতে পেরেছে জানিয়ে দ্রুত প্রস্থান করল।

'দশ মিনিট পরে দরজা আবার খুলে গেল আর সেই রকম হলদে পোষাক পরা দুজন পরিচারক একটা ছোট টেবিল গড়াতে গড়াতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। আর, খাবার? খুব ভাল হোটেলেও এর চেয়ে ভাল খাবার পেতাম না। কফি, গরম দুধ, রোল্, চ্যাপ্টা সুস্বাদু মাছ আর মধু দিয়ে ব্রেক্‌ফাস্ট্ সমাধা করতে আধঘণ্টাটাক আমরা খুবই ব্যস্ত রইলাম। তারপরে পরিচারক দুজন আবার এসে টেবিলটা গড়িয়ে বের করে নিয়ে গেল, আর যাবার সময় দরজাটা সাবধানে বন্ধ করে দিল।

'স্ক্যান্‌ল্যান্ বললে, 'নিজের গায়ে চিমটি কাটতে কাটতে কালশিরা পড়ে গেল, তবু বুঝতে পারছি না এসব স্বপ্ন না সত্যি। আচ্ছা ডক্, আপনি সমস্ত ব্যাপারটা কিরকম ঠাওরাচ্ছেন?'

'ডকটর মাথা নাড়লেন। বললেন, 'আমার কাছেও সমস্ত স্বপ্নের মতই লাগছে তবে বড় গৌরবময় স্বপ্ন! জগতের পক্ষে একি অপূর্ব কাহিনী, কেবল যদি সকলকে শোনাতে পারা যেত!'

'আমি বললাম, 'একটা জিনিস কিন্তু বোঝা গেল যে আটলান্টিসের কিংবদন্তীর মধ্যে সত্য অবশ্যই আছে আর সেখানকার কতক লোক অতি আশ্চর্য উপায়ে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে।'

'বিল্ স্ক্যান্‌ল্যান্ তার সুগোল মাথাটি চুলকাতে চুলকাতে ব'লে উঠল, 'যদিও বা তারা বেঁচে থাকতে পারলে, তারা বাতাস আর খাবার জল আর সব কি করে' পেল আমার মাথায় ঢুকছে না।

কালকের রাতের সেই দাড়িওয়ালা দোস্ত্‌টি যদি আমাদের আর এক নজর দেখে নিতে আসেন তাহলে তাঁর থেকে কিছু এলেম মিলতে পারে।

'তা কি করে' হবে, যখন আমরা কেউ কারও কথা বুঝিনা?'

ম্যারাকট্ বললেন, 'আমরা নিজেদের নিরীক্ষা শক্তিই ব্যবহার করব। একটা জিনিস আমি এখনই বুঝতে পেরেছি—আমরা যে মধু খেলাম তার থেকে। ওটা সত্যিকার মধু নয়, সাংশ্লেষিক মধু—অর্থাৎ কি না কৃত্রিম মধু, যা পৃথিবীতে আমরাও তৈরি করতে শিখেছি। আর কৃত্রিম মধু যদি হতে পারে তাহলে কৃত্রিম কফি বা ময়দাই বা নয় কেন? মৌলিক পদার্থগুলির এক একটি অণু যেন এক একখানি ইঁট, আমাদের চারি পাশে এই ইঁটগুলি ছড়ানো। আমাদের কেবল বলতে হবে কেমন করে কোন জাতের কতগুলি ইঁট বেছে নেওয়া যায় যাতে এক একটা নতুন নতুন পদার্থের ইমারত গড়া যেতে পারে। এই অণুগুলিরই সাজাবার একটু অদল-বদলে স্টার্চ হয়ে যায় চিনি কিংবা অ্যালকোহল। কিন্তু এই অদল বদলটা করে কিসে? উত্তাপে। বিদ্যুতে! তাছাড়া অন্যান্য এমন কোনো কোনো শক্তিতে যার সম্বন্ধে আমরা হয়ত কিছুই জানি না। এমন কতগুলি পদার্থ আছে যার অণুগুলির অদল বদল আপনা আপনিই অনবরত হতে থাকে। ইউরেনিয়ম হয়ে যায় রেডিয়ম, আবার রেডিয়ম হয়ে যায় সীসা—আমাদের হাতও দিতে হয় না।'

'আমি বললাম, আপনি তাহলে মনে করেন যে ওদের রসায়ন খুব উন্নত ধরনের?'

'সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। মৌলিক অণুগুলির মধ্যে তো এমন একটিও নেই যা ওদের লাগালের বাইরে। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন এল সমুদ্রের জল থেকে নাইট্রোজেন আর কার্বন আছে এই অপর্যাপ্ত গাছ গাছড়ার মধ্যে, আর সামুদ্রিক জীবদেহ ধ্বংস হয়ে হয়েছে এই যে সিন্ধুমল এতে আছে ফস্‌ফরাস্ আর ক্যাল্‌শিয়ম। যথেষ্ট জ্ঞান আর কৌশল যদি থাকে তবে কি না তৈরি করা যেতে পারে?'

'ডক্টর রসায়ন শাস্ত্রের উপর একটা বক্তৃতাই সুরু করেছিলেন এমন সময় দরজা খুলে গেল, মাণ্ডা ঘরে ঢুকে আমাদের সহৃদয় সম্ভাষণ করলেন। তাঁর সঙ্গে আগের রাত্রের সেই পক্ককেশ বৃদ্ধও এসেছিলেন। বিদ্বান্ বলে হয়ত তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি কয়েকবার আমাদের উদ্দেশ করে' কথা বললেন—হয়ত প্রত্যেকবারই আলাদা আলাদা ভাষায়, কিন্তু সবই সমান অবোধ্য। তখন তিনি কাঁধ-ঝাঁকানি দিয়ে মাণ্ডাকে কি যেন বললেন। সেই পরিচারক দুজন তখনও দরজার কাছে অপেক্ষা করছিল, মাণ্ডা তাদের এক হুকুম করলেন। তারা অমনি গিয়ে কোথা থেকে একটা অদ্ভুত পর্দা এনে হাজির করলে। দুই দিকে দুটি খুঁটিতে সেটা আটকানো, বায়োস্কোপের পর্দার মত। কিন্তু তার গায়ে একটা চকচকে জিনিসের আস্তর, আলো পড়ে সেটা চকমক, চিকমিক করতে লাগল। এক দিকের দেয়াল ঘেঁসে সেটা রাখা হল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তার পর সাবধানে সেই পর্দা থেকে কয়েক পা মেপে মেঝের উপর একটা জায়গায় চিহ্ন দিলেন। সেইখানটায় দাঁড়িয়ে তিনি ম্যারাকটের দিকে ফিরে হাত দিয়ে নিজের কপাল ছুঁলেন আর সঙ্গে সঙ্গে পর্দাটার দিকে আঙুল দেখালেন।

'স্ক্যান্‌ল্যান বলে' উঠল, বিলকুল ফক্কা—স্রেফ্ হেঁয়ালি।

'ম্যারাকট্ মাথা নেড়ে জানালেন যে আমরা একেবারেই কিছু বুঝতে পারছি না। বৃদ্ধ তখন যেন তিলেকের জন্য হকচকিয়ে গিয়ে তারপরেই মাথায় এক বুদ্ধি এনে ফেললেন। একবার নিজের শরীরের দিকে আঙ্গুল দেখালেন, তারপর পর্দার দিকে ফিরে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, মনে হল সেই পর্দার উপরে তিনি মনঃসংযোগ করছেন। নিমেষের মধ্যে তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠল সেই পর্দায়। তারপর তিনি আমাদের দিকে আঙ্গুল দেখালেন এবং পর মুহূর্তেই ভেসে উঠল আমাদের তিনজনের ছবি পর্দার গায়ে। ঠিক আমাদের নয়—তাঁর চোখে আমরা যেমন দেখতে। স্ক্যান্‌ল্যানকে দেখাচ্ছিল অনেকটা যেন চীনাদের মত আর ম্যারাকট্‌কে শুকনো মড়ার মত, কিন্তু চেনা যাচ্ছিল ঠিকই।

'আমি বলে' উঠলাম, 'এ চিন্তার প্রতিচ্ছবি।'

'ম্যারাকট বললেন, 'ঠিক। অতীব আশ্চর্য আবিষ্কার, ব্যাপারটা টেলিপ্যাথি আর টেলিভিশন এই দুটি জিনিস মিলিয়ে তৈরি। পৃথিবীতে ও দুটি জিনিস আমরা সামান্যই বুঝি।

'স্ক্যান্‌ল্যান্ বললে, 'আমি কখনও ভাবিনি এ জন্মে নিজেকে কখনও বায়োস্কোপের পর্দায় দেখতে পাব—অবশ্য যদি ঐ গালফোলা চীনাম্যান্ আমিই হয়ে থাকি!'

'এই সময় দেখা গেল বৃদ্ধ যেন কিসের ইসারা করছেন। স্ক্যান্‌ল্যান্ বললে, 'বুড়ো চায় যে আপনি একবার ওটা পরখ করে দেখেন,।'

'ম্যারাকট্ তখন চিহ্ন দেওয়া জায়গাটাতে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর সবল সুস্থ মস্তিষ্ক সেই বৃদ্ধের নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তুলল পর্দার গায়ে। মাণ্ডার ছবিও দেখলাম আমরা, তারপর দেখলাম 'স্ট্র্যাট্‌ফোর্ডকে। মাণ্ডা আর সেই প্রাচীন বিজ্ঞানী দুজনেই জাহাজখানার প্রতিচ্ছায়া দেখে খুব ঘাড় নাড়লেন। ভাবখানা যেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক এই রকমই তো!' মাণ্ডা হাত নেড়ে একবার আমাদের দিকে আর একবার পর্দার আঙ্গুল দেখালেন।

'আমি বলে' উঠলাম, সব কিছু ওঁদের খুলে বলতে হবে, এই হল কথা। ওঁরা ছবিতে জানতে চান আমরা কে আর কেমন করেই বা এখানে এসেছি।'

'ম্যারাকট্ ঘাড় নেড়ে মাণ্ডাকে জানালেন যে তিনি বুঝতে পেরেছেন। তারপর তিনি যেই আমাদের সাগর অভিযানের কথা বলতে সুরু করেছেন অমনি মাণ্ডা হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন। তাঁর হুকুমে পরিচারকরা পর্দাটাকে সেখান থেকে নিয়ে গেল, আর তাঁরা দুজন আমাদের ইঙ্গিত করলেন তাঁদের পিছন পিছন যেতে।

'বাড়িটি বিশাল। আমরা বারান্দার পর বারান্দা পার হয়ে চললাম। শেষে একটা প্রকাণ্ড 'হল'-এ এসে পৌঁছালাম। হলের চেয়ারের সারিগুলি রঙ্গালয়ের মত পর পর ক্রমাগত উঁচু করে' করে' সাজানো। একদিকে একটা বড় পর্দা টাঙ্গানো—যেরকম পর্দা আমরা এইমাত্র দেখলাম। তার দিকে মুখ করে' বসে রয়েছে অন্ততঃ হাজার খানেক দর্শক! আমরা ঢুকতেই তাদের মধ্যে থেকে উঠল স্বাগতের গুঞ্জনরোল! তাদের মধ্যে মেয়ে পুরুষ দুই ছিল—সবরকম বয়সেরই।

পুরুষেরা কালো না হলেও কিছু ঘোরবর্ণ, সকলেরই দাড়ি আছে। মেয়েরা সুন্দরী, একটু বেশী বয়সের মেয়েরা বেশ রাসভারীও। তবে সকলকে ভাল করে' দেখবার সময় পেলাম না, কারণ আমাদের নিয়ে গিয়ে একেবারে সামনের সারিতে বসিয়ে দিল। ম্যারাকট্‌কে নিয়ে গেল পর্দার সামনে মঞ্চের উপর। আলোগুলো নিবিয়ে দেওয়া হল, তারপর ম্যারাকট্‌কে ইশারা করা হল সুরু করতে।

তিনিও তাঁর কাজ করলেন খুব ভাল ভাবে। প্রথমে দেখা গেল আমাদের জাহাজ টেম্‌স্‌ নদী থেকে ছাড়ল। অমনি দর্শকদের মধ্যে একটা উত্তেজনার কলরোল উঠল—সত্যিকার আধুনিক শহরের এমন টাটকা নমুনা দেখে। তারপর দেখা গেল একটা ম্যাপ। জাহাজটা কোন পথে পাড়ি দিল দেখানো হলো। তার পরে সেই ইস্পাতের গোলকখানি আর তার সাজ সরঞ্জাম। তাই দেখে দর্শকদের মধ্যে যে গুঞ্জন উঠল তাতে বুঝলাম তারা সেটাকে চিনতে পেরেছে। তার পরে দেখলাম আমরা সমুদ্রগর্ভে নামছি, নেমে সেই শৈলশিরার উপরে সেই অতল গহ্বরের মুখের কাছে এসে পৌছালাম। তারপর সেই রাক্ষুসে জন্তুটার আবির্ভাব। 'ম্যারাস্‌! ম্যারাস্‌'! বলে দর্শকেরা চেঁচিয়ে উঠল। বুঝলাম তারাও সে জানোয়ারটিকে বিলক্ষণ চেনে আর ভয় করে। সকলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখতে লাগল সে আমাদের গোলকের কাছিটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। শেষে যখন সেটা কেটে গেল আর আমরা সেই গভীর দহের মধ্যে পড়ে গেলাম তখন সভা থেকে একটা অস্ফুট আর্তনাদ উঠল।

'সভা ভাঙ্গতেই সকলেই আমাদের পিঠ চাপড়ে আর নানা রকম করে বুঝিয়ে দিল যে আমরা তাদের দেশে সুস্বাগত। প্রধানদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। সকলেরই পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা জাফরান রঙের চোগা, কোমরে কোমরবন্ধ আর পায়ে উঁচু বুট। প্রধানদের কেবল বয়স বেশী। কোমরবন্ধ আর বুট একরকম মাছের আঁশের মত আঁশওয়ালা কোনো চামড়ায় তৈরি। মেয়েদের গায়েও প্রাচীন ছাঁদের সুন্দর পোষাক। গোলাপী নীল আর সবুজের নানা বিভিন্ন আভার মেলা যেন। তাতে আবার থোকা থোকা মুক্তা আর সাত-রঙা ঝিনুকের চুমকি বসানো। প্রধানদের মধ্যে একজনের নাম স্কার্পা। তাঁর একমাত্র মেয়ে সোনাকে দেখলাম সেদিন। তার চাউনির মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য গভীরতা যা আমার জীবনে সেই দিন থেকে এনে দিল যেন একটা নতুন স্বাদ।

'ডাঃ ম্যারাকট দেখলাম এক ভদ্রমহিলার সামনে মহা উৎসাহে ইশারা ইঙ্গিতের সাহায্যে ভাষার অমিল ঘোচাবার চেষ্টা করছেন আর স্ক্যান্‌ল্যান্‌ এক ঝাঁক মেয়ের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে হাত পা ছুঁড়ে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে তাদের মত সুন্দরী পৃথিবীতে দেখা যায় না। মেয়েরা কিছু বুঝুক বা না বুঝুক, হেসেই কুটিপাটি।

'সেদিন মাণ্ডা আর আমাদের নতুন বন্ধুরা আমাদের নিয়ে সেই বিশাল বাড়ির খানিক খানিক ঘুরিয়ে দেখালেন। বহুযুগ ধরে উপর থেকে সামুদ্রিক জীবের হাড় খোলস ইত্যাদি নানা জিনিস পড়ে' পড়ে' বাড়িটার এতখানি পুঁতে গিয়েছে যে এখন ছাদ দিয়ে ছাড়া ঢোকবার উপায় নেই। ছাদের উপরে বাড়িতে ঢোকবার ঘর, সেখান থেকে পথ ক্রমাগত নিচের দিকে নেমে গেছে। কয়েক শ ফুট এই রকম

নামলে নিচেকার মেঝেয় পৌঁছানো যায়। আবার মেঝে খুঁড়ে সুড়ঙ্গ করেও রাস্তা তৈরি হয়েছে। যে দিকেই তাকাই ঢালু রাস্তা নেমে গেছে পৃথিবীর পেটের ভিতর। বাতাস তৈরির যন্ত্র আর চারিদিকে সেই বাতাস সরবরাহের পাম্প সমস্ত দেখলাম। ম্যারাকট সবকিছুর খুব তারিফ করতে করতে আমাদের দেখিয়ে দিলেন যে বাতাস তৈরির জন্য কেবল যে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মেশানো হচ্ছে তা নয়, অন্য যে সব গ্যাস খুব অল্প পরিমাণে পৃথিবীর হাওয়াতে থাকে—যেমন আরগন নিঅন এইসব—তাও তৈরি করে' তেমনি অল্প পরিমাণে মেশানো হচ্ছে। জল পরিস্রবণ করবার বড় বড় হৌজ আর প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক কলগুলিও দেখবার জিনিস, যদিও সে সবের কলকব্জা এত জটিল যে সব কিছু আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত। এইটুকু কেবল বলতে পারি যে আমি নিজের চোখে দেখে আর নিজের জিবে চেখে বুঝলাম নানা রাসায়নিক পদার্থ আর গ্যাস নানা যন্ত্রের মধ্যে ঢালা হচ্ছে আর তার থেকে তৈরী হয়ে যাচ্ছে ময়দা, চা, কফি, মদ।

'বাড়িটার যতখানি আমাদের দেখানো হল তা পরেও কয়েকবার দেখার আমরা সুযোগ পেয়েছিলাম। দেখে দেখে আমাদের মনে হল যে এখানকার লোকেরা আগে থেকেই জানতে পেরেছিল যে তাদের দেশ একদিন সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে যাবে আর সেজন্য ডুবে গিয়ে যাতে বেঁচে রাকতে পারে তার সমস্ত আয়োজন তারা অনেক আগে থাকতেই করে রেখেছিল। সেই বিশাল বাড়িটা তৈরি হয়েছিল এমনভাবে যাতে তার মধ্যে তারা স্থায়ী আশ্রয় পায়। তাই এবার থেকে তাকে তাদের আশ্রয়সদন বলব। আগে যেসব যন্ত্র বা কলকারখানার কথা বলেছি সেগুলি, তাছাড়া কাঁচের পোশাকের জন্য কাঁচের কারখানা, বাইরে থেকে ভিতরে ঢোকবার ঘরগুলি, জল ছেঁচে ফেলার বিরাট পাম্পগুলি সবই সেই আশ্রয়সদনের দেওয়ালের ভিতর সেঁধিয়ে তৈরি, বেশ বোঝা যায় বাড়িটা তৈরি হওয়ার সময়েই সেগুলোও তৈরি হয়েছিল। আগে থাকতেই সবকিছু ভেবে দেখবার এদের এই আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে আমরা যে কি অবাক হলাম তা বলে বোঝাতে পারি না। এ কোন আশ্চর্য জাতি? আমরা যতদূর জানতে পারলাম তাতে মনে হল এই জাতির দুটি প্রকাণ্ড শাখা ছিল, একটি গিয়েছিল মধ্য আমেরিকায় আর একটি ইজিপ্টে। সেই দুটি দেশেই তারা নিজেদের সভ্যতার ছাপ রেখে গেছে যদিও তাদের আপন দেশ তলিয়ে গেছে আটলান্টিক মহাসমুদ্রে কিন্তু তার সঙ্গে এও মনে হল এদের পূর্বপুরুষদের মত উদ্যম এখন আর এদের নেই, কাজেই এদের জ্ঞান বিজ্ঞান এতদিনেও আর তত এগোয়নি। এদের বিজ্ঞান ম্যারাকটের হাতে পড়লে হয়ত তিনি আরও বড় কিছু, আরও আশ্চর্য কিছু করতে পারতেন। এমনিতে স্ক্যান্‌ল্যান্‌ই তার চটপটে মাথা আর কলকব্জার হাত নিয়ে এর মধ্যে যে সব কারবাই দেখাচ্ছিল তাতে এরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। জাহাজ ছেড়ে ইস্পাতের খাঁচায় করে' আসবার সময় স্ক্যান্‌ল্যানের কোটের পকেটে ছিল একটা মাউথ-অর্গ্যান। তাই বাজিয়ে সে এদের কাছ থেকে যে তারিফ পেতে লাগল তেমন তারিফ আমরা হয়ত করি মোৎসার্টের (Mozart) মত সুরশিল্পীর সঙ্গীত শুনে।

'বলেছি সেই বাড়ির সমস্তটা আমাদের দেখানো হয়নি। এ সম্বন্ধে আর একটু খুলে বলি। একটি

বারান্দা দিয়ে সর্বদাই লোক যাতায়াত করতে দেখতাম, কিন্তু আমাদের গাইড্‌রা একবারও সে দিক মাড়াল না। কাজেই আমাদেরও সেদিকে কি আছে দেখবার ইচ্ছাটা বেড়েই গেল। একদিন যে সময়ে লোক চলাচল থাকে না এমনি সময়ে আমরা আমাদের ঘর থেকে সরে পড়লাম। চললাম সেই অজানা জায়গাটার দিকে।

'পথটা ক্রমে একটা উঁচু খিলানওয়ালা দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছাল। মনে হল দরজাটা আগা-গোড়া খাঁটি সোনার তৈরি। সেই দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখি আমরা এসে পড়েছি একটা মাঠের মত প্রকাণ্ড ঘরে, লম্বায় চওড়ায় কোনো দিকেই ত্রিশ ফুটের কম হবে না। চার দিকের দেওয়ালে নানা উজ্জ্বল রঙ আর কিম্ভুতকিমাকার সব জীবের অদ্ভুত ছবি আর মূর্তি। তাদের মাথায় আবার আমেরিকার আদিবাসীদের পুরোদস্তুর রাজসজ্জার মত প্রকাণ্ড মুকুট। এই বিশাল ঘরের এক মুড়োয় বুদ্ধমূর্তির ধরনের এক বিরাট মূর্তি। কিন্তু বুদ্ধমূর্তির মুখে দেখা যায় যে করুণা এতে তার বদলে রয়েছে যেন উৎকট রাগ। তার উপর চোখ দুটোর রঙ আবার লাল, আর তার ভিতর দুটো বিজলী বাতি বসানো থাকায় দেখতে আরো ভীষণ লাগছিল। তার কোলের উপর মস্ত একটা চুলো। কাছে গিয়ে দেখলাম সেটা ছাইয়ে ভরতি।

'ম্যারাকট্‌ বললেন, ইনি হলেন মোলক্‌, বা বেঅ্যাল্‌—প্রাচীন ফিনীশিআর আদিম দেবতা।'

'আমার মনে পড়ে' গেল শুনেছিলাম এই দেবতার কাছে নাকি সেই প্রাচীনকালে মানুষ বলি দেওয়া হত। বলে' উঠলাম, 'কি সর্বনাশ! আপনি বলেন কি? এখানকার এই শান্তশিষ্ট মানুষরা নরবলি দেয়?'

'স্ক্যান্‌ল্যান্‌ প্রায় ঘুসি বাগিয়ে বললে', আশাকরি ওদের ঘরের রীত ওরা ঘরেই রাখে। আমাদের ওপর যেন এসব কেরদানি ফলাতে না আসে।'

'আমি বললাম, 'না. এতদিনে হয়ত ওদের শিক্ষা হয়েছে। দুর্দশায় পড়লেই মানুষ অন্যের প্রাণের দাম বুঝতে শেখে।'

'ম্যারাকট্‌ ছাই ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললেন, 'ঠিক কথাই। এ সেই পুরাতন কুলদেবতা বটে, তবে কুলধর্মটি আর তত উগ্র নেই মনে হচ্ছে। এগুলো কেবল রুটি আর ঐরকম সব জিনিসের ভস্মাবশেষ মাত্র। কিন্তু এক সময়ে হয়ত—'

এমন সময় একটা রুক্ষ গলার আওয়াজে আমাদের গবেষণা বাধা পেল। চেয়ে দেখি হলদে কাপড় আর লম্বা টুপি পরা কয়েকজন লোক। নিশ্চয়ই এই মন্দিরের পুরোহিত। তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হল এবার আমরাই বেঅ্যালের শেষ বলি হলাম বুঝি বা! একজন তো তার কোমরবন্ধ থেকে একখানা ছোরাই টেনে বার করলে। মারমুখো হয়ে চীৎকার করে' তারা তাদের পবিত্র দেবস্থান থেকে আমাদের একরকম ধাক্কা মেরেই বার করে' দিলে।

'স্ক্যান্‌ল্যান্‌ চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার দিব্যি, গায়ে হাত দিলে বাছাকে চাঁটিয়ে দেব! এই চিমসে কোথাকার, আমার কোট ছাড়্‌ বলছি!'

আমার তো মনে হল স্ক্যান্‌ল্যান যাকে বলে 'অশান্তি' তাই বুঝি হয়ে যায় মন্দিরের পবিত্র চতুঃসীমার মধ্যেই। যাহোক, সে হাত বাড়াতে সুরু করবার আগেই আমরা কোনোমতে তাকে সরিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর সোজা আমাদের ডেরায়। মাণ্ডা আর অন্যান্যদের ভাবে কিন্তু বুঝলাম যে আমাদের গুপ্ত অভিযানের কথা তাঁরা টের পেয়েছেন আর সেজন্য বিরক্তও হয়েছেন।

'তবে সেটা ছাড়া আর একটি দেবস্থানও ছিল, সেটা বিনা আপত্তিতে আমাদের দেখানো হল। আর তার ফলে এঁদের আর আমাদের মধ্যে মোটামুটি কথাবার্তার একটা উপায় বেরুল। কেমন করে বলি শোন। এই জায়গাটা আশ্রয়সদনের নিচের তলায়। তার কোনো সাজ সজ্জা বা অন্য বৈশিষ্ট্য নেই। কেবল ঘরের এক মুড়োয় হাতির দাঁতের তৈরি একটি নারী মূর্তি। তাঁর হাতে বর্শা, আর কাঁধের উপর বসে' একটি পেঁচা। এক খুব বয়স্ক বৃদ্ধ সেখানকার রক্ষক। তাঁর এত বয়স সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছিল তিনি আশ্রয়সদনের মানুষদের চাইতে এক উন্নততর জাতির মানুষ—দেহ ও মন দুদিক দিয়েই। ম্যারাকট আর আমি দুজনেই সেই মূর্তির দিকে চেয়ে ভাবছি এমনটি যেন আর কোথায় দেখেছি এমন সময় সেই বৃদ্ধ আমাদের উদ্দেশ করে কথা কইলেন।

'মূর্তিটির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, 'থিআ'।

'আমি অবাক্ হয়ে বলে উঠলাম, 'আরে, ইনি যে গ্রীক বলছেন!'

'তিনি আবার বললেন, 'থিআ—অ্যাথিনা।'

'আর কোনো সন্দেহ নেই। তিনি বলছেন গ্রীক ভাষায়; দেবী—অ্যাথিনা।'

ম্যারাকট্ কি অসাধারণ পণ্ডিত, তিনি তখনি প্রাচীন গ্রীক ভাষায় বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে সুরু করলেন। বৃদ্ধ কিন্তু সে ভাষা পুরোপুরি বুঝতে পারলেন না, আর তার উত্তর দিলেন এমনই প্রাচীন এক বুলিতে যে তা প্রায় অবোধ্য। তবু ম্যারাকট ক্রমে সে ভাষার কিছু কিছু শিখে নিলেন। ওদের মধ্যে একজন লোকও পেলেন যার মারফতে খুব অস্পষ্টভাবে আপন মনোভাব ওদের কিছু কিছু জানাতে পারলেন।

এই দেবস্থান দেখে এসে প্রফেসর ম্যারাকট্ সেদিন আমাদের কাছে একটি বক্তৃতা করলেন। ক্লাস নেওয়ার ভঙ্গীতে তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠে বললেন: 'আটলাণ্টিস্ তলিয়ে যাওয়ার কিংবদন্তী যে সত্যি এই বৃদ্ধ তার একটি প্রমাণ। তোমরা জান—কিংবা হয়ত জাননা—(স্ক্যান্‌ল্যান্—'মারুন বাজি!') যে আটলাণ্টিস্ যখন ধ্বংস হয়ে যায় সেই সময়ে সেখানকার লোকেদের সঙ্গে আদিম গ্রীকদের যুদ্ধ চলছিল। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আটলাণ্টিয়দের হাতে তখন অনেক গ্রীক বন্দী ছিল, তাদের কতক হয়ত আশ্রয়সদনে কোনো কোনো কাজ করত। তারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস নিয়েই আটলাণ্টিয়দের সঙ্গে এখানে এসে পড়ে। আমি যতদূর বুঝেছি, ঐ বৃদ্ধটি সেই প্রাচীন গ্রীকদের কোনো পুরোহিতের বংশধর। হয়ত পরে আমরা এই গ্রীকদের আরও কাউকে কাউকে দেখতে পাব।

'স্ক্যান্‌ল্যান বললে, এদের একটা কথা আমার বলবার আছে। একটা দেবতার মূর্তি যদি রাখতেই হয় তবে পোড়া কয়লার ধুলোওয়ালা ঐ লাল চোখো হোঁতকাটার চাইতে চমৎকার একটি মেয়ের মূর্তিই

বোধহয় ভাল। অবশ্য ওরা যেমন ভাল বোঝে।'

'আমি বললাম, 'ভাগ্যে ওরা তোমার অভিমত জানতে পারছে না, না'হলে খ্রীষ্টান শহিদ হিসাবেই তোমার ইহলীলা সাঙ্গ করতে হত!'

'তাহলে ওদের আমেরিকান নাচের বাজনা শোনাবে কে? আমার সঙ্গে রঙ্গ তামাশা করাটা ওদের প্রায় একটা অভ্যাসের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে যে।'

'বাস্তবিক এরা সবাই বেশ হাসি-খুশি মানুষ, এদের মধ্যে আমাদের দিন বেশ ভালই কাটছিল। কিন্তু এক এক সময় সমস্ত মনপ্রাণ যেন ছুটে যেতে চাইত আকাশের আলোর রাজ্যে ফেলে আসা আমাদের আপন দেশে। এখনও চায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অক্সফোর্ডের সেই কলেজ-প্রাঙ্গন কিংবা হার্ভার্ডের সেই এল্‌ম্‌ গাছের সারি আর খেলার মাঠ। আটলান্টিক মহাসাগরের তলায় সেই অদ্ভুত অজানা দেশে বসে' আমাদের নিজেদের দেশ প্রথম প্রথম যেন চাঁদের দেশের মতই সুদূর মনে হত। কেবল এখন আবার দেশের মুখ দেখতে পাওয়ার ক্ষীণ আশা মনে জাগছে। ক্রমশঃ

---

* ১৯৬৯ এর জানুয়ারী (১৩৭৫-পৌষ) মাস থেকে ম্যারাকট ডীপ সুরু হয়েছে। পুরাতন সব কয়টি সংখ্যাই কিনতে পাওয়া যায়। কার্যালয়ে অনুসন্ধান করুন।

নিজের পাড়ায়

নির্মলেন্দু গৌতম

নিজের পাড়ায় বীরত্ব তার,
কেবল ডাকাডাকি!
অন্য কুকুর ঢুকবে পাড়ায়
সাধ্যি আছে নাকি!
এমনি করে ধম্‌কে বেড়ায়
ঠিক যেন সে রাজা,
ইচ্ছে হলেই পারবে দিতে
যেমনি খুশি সাজা!

অন্য পাড়ায় যাবেই না সে,
গেলেই মজা বড়ো:
অন্য কুকুর দেখলে সেথায়
ভয়েই জড়োসড়ো।
আর তো রাজা নয় সে তখন,
সেই কুকুরের প্রজা!
ল্যাজ নামিয়ে ছুট দেবে সে
নিজের পাড়ায় সোজা!!
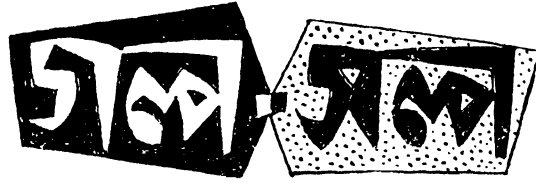
আংকোরের হারানো সম্পদ

১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসে অঁরি মুও (Henri mouhut) নামে একজন ফরাসী প্রাণীতত্ত্ববিদ্ নতুন ধরনের পোকামাকড় খুঁজতে খুঁজতে অভাবনীয় এক আবিষ্কার করে বসলেন।

তখন পূর্ব দক্ষিণ এশিয়াতে ফরাসীদের খুব বোলবোলা। ইন্দো-চীনে তাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্য; লোকে বলত ফরাসী ইন্দোচীন। এখন যেখানে ভিয়েৎনাম, লাওস, সেইখানে তখন ফরাসীদের প্রবল প্রতিপত্তি। থাইল্যাণ্ডের নাম ছিল শ্যামদেশ। তার পূব-দক্ষিণে কাম্বোডিয়া। মুও ঐ কাম্বোডিয়ার ঘোর জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

এত ঘন গাছপালা যে অতি কষ্টে এগুতে হচ্ছিল। হঠাৎ দেখেন গাছপালার মাঝখানে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা আর সেইখানে যতদূর চোখ যায় বিশাল এক শহরের ধ্বংসাবশেষ। পাথরে তৈরি প্রাসাদ কেল্লা, তাদের চারদিকে চওড়া পরিখা, বিশাল বিশাল মন্দির চাতাল। উঁচু উঁচু ছাদ, তার উপর দাঁড়ালে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। পরিখার ধারে উঁচু পাথরের বাঁধ, তার দুপাশে দুই সারি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্তি। মূর্তিগুলোর বেশির ভাগই পরিখার নিচে পড়ে আছে। প্রাসাদ কেল্লা সব কিছুর ভগ্ন দশা।

মুও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এ কাদের ফেলে যাওয়া রাজধানী, এর কথা তো আগে কখনো শোনেন নি। পোকা মাকড় খোঁজার কথা তিনি ভুলে গেলেন। দিনের পর দিন কাটালেন নতুন নতুন ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কার করে। তাঁর মনে হল লোকে যে প্রাচীন গ্রীস রোমের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে এত মাতামাতি করে, এর কাছে সে-সব কিছুই নয়।

ঐ খোলা জায়গাটাই সব নয়, তার চারদিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে ভাঙ্গা মন্দির কেল্লা প্রাসাদ। জঙ্গল তাদের গ্রাস করেছে। দেয়ালের মধ্যে, মূর্তির গায়ের ভিতর দিয়ে শিকড় চালিয়ে মস্ত মস্ত বট অশ্বত্থগাছ গজিয়েছে। পাথরের জোড়া আলগা হয়ে গেছে।

অদ্ভুত সব দৃশ্য চোখে পড়তে লাগল। প্রথম দৃষ্টিতে যেখানে ঘন বন ছাড়া কিছু চোখে পড়ে নি, কাছে যেতেই মুও দেখলেন সেখানেও সারি সারি দেব মূর্তি, চারদিকে তাদের বুনো লতাপাতার ঝালর। বন এসে যেন শহরটার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ডাল পালা শিকড়-বাকলে অদ্ভুত সব কারুকার্য ঢাকা পড়ে আছে। কোথাও মস্ত মূর্তির চারপাশে গাছ জড়িয়ে আছে। শিকড়ের ফাঁক দিয়ে নিখুঁতভাবে খোদাই করা অতিকায় একজোড়া প্রসন্ন ঠোঁট, বা আধ বোজা চোখ দেখা যাচ্ছে। চল্লিশ বর্গমাইল জুড়ে

এই ধ্বংসাবশেষ।

বোঝাই যাচ্ছে কি রকম বিস্ময় আর উৎসাহ নিয়ে মুও তখনকার ফরাসী সরকারের কানে কথাটা তুললেন। বিশ্বেতে পণ্ডিতরা এই রহস্যময় শহর নিয়ে একাগ্রভাবে পড়াশুনা ও গবেষণা করতে লাগলেন। পুরনো পুঁথিপত্র, লোককথা থেকেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করা গেল। চীনে ভ্রমণকারীদের লেখা বই থেকে অনেক কিছু জানা গেল।

বোঝা গেল যে এই হল সেকালের আংকোরথম; লুপ্ত খমের রাজ্যের কেন্দ্র ছিল এইখানে। অনেকের মতে একাদশ শতকে রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ এই শহরকে নিজের স্মৃতি মন্দির স্বরূপে তৈরি করেন। স্মৃতি-মন্দির ই বটে; পাঁচটি চূড়োয় যেন পাঁচটি পদ্মফুলে কুঁড়ি বসানো; একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। সব চাইতে বড় মন্দিরের নাম আংকোর-বাট।

এখানকার পাথরের দেয়ালের গায়ে অপূর্ব কারুকার্য। হিন্দু দেব দেবতার সঙ্গে বৌদ্ধ শিল্প মিশে আছে। সূর্যবর্মণ নামটিও ভারতীয়। কোথা থেকে এরা এসে এত দূরে রাজ্য-পত্তন করেছিল? শোনা যায় 'আংকোর থম' হল 'ওঙ্কার ধাম' নামেরই অপভ্রংশ।

তখনকার ফরাসী সরকারকে এবার দুই রকম কাজ হাতে নিতে হল। ঐতিহাসিক গবেষণা আর ধ্বংসের হাত থেকে প্রাচীন শহর উদ্ধার। অবিশ্যি প্রাচীন বলতে সে রকম খুব প্রাচীন নয়। যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় কম্বোডিয়াতে খমেরদের আধিপত্য ছিল নবম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত। সূর্যসেন দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন। তখন খমেরদের ক্ষমতার অবধি ছিল না।

বাস্তবিক ভারি নাম-ডাক ছিল এদের। চীনে পর্যটক আর ভারতীয় বণিকদের এদের রাজ্যে যাওয়া আসা ছিল। খমেররা নাকি উত্তরের কোনো পাহাড়ে দেশ থেকে এখানে এসেছিল। দেখতে দেখতে তাদের ক্ষমতা আর ধনসম্পদ এমনি বেড়ে গেল যে সেকালের বিখ্যাত সাম্রাজ্যের মধ্যে খমের সাম্রাজ্যও একটি হয়ে দাঁড়াল।

উঁচু বাঁধানো পথ, পাঁচ তলা প্রাসাদ, বিশাল বিশাল চূড়ো তৈরি করত এরা। পাথরের উপর পাথর এমন নিপুণভাবে বসাত যে জোড়া দেবার জন্যে চূণ-সুরকির দরকার হত না। হাজার বছরের বেশি অমনি দাঁড়িয়ে থাকত, যদি না গাছপালা গজিয়ে পাথরের কারিকুরি-করা চাঁইগুলোকে স্থানচ্যুত করত। এমন নিপুণ স্থাপত্যের কাজ এখন কেউ করতে পারে না।

আংকোর থমের চারদিকে খমের সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে ছিল। মিকং নদীর উপত্যকায় ঘন বন কেটে ওদের দিগন্তব্যাপী ধান খেত ছিল। জল সেচে তাদের নিপুণতা দেখলে অবাক হতে হয়। খাল কেটে বাঁধ তৈরি করে, দূর থেকে বন্যার জল এনে তারা কাজে লাগাত. দেশ জুড়ে মাকড়সার জালের মতো তাদের খালাবিলের ব্যবস্থা ছিল। কয়েকটা খাল চল্লিশ মাইল অবধি লম্বা ছিল।

এসব কাজের জন্যে খাটবার লোকের দরকার হত। থেকে থেকে রাজারা তাই জয় যাত্রায় বেরুতেন। ফিরবার সময় ধন রত্নের সঙ্গে হাজার হাজার বন্দী এনে, পাথর-কাটা মাটি খোঁড়ার কাজে লাগাতেন। বিদেশী ভ্রমণকারীরা তাই দেখে দেশে ফিরে বলতেন খমের রাজ্যে সবাই সুখী, সবাই

আরামে থাকে, ওদের দাসদাসীরা ছাড়া। তাদের দুঃখের শেষ নেই।

হয়তো এই কারণেই খমেরদের পতনও হয়েছিল। ঐ জয়যাত্রার সময়টুকু ছাড়া তারা নাকি বড় বেশি বিলাসী, বড় বেশি আরামপ্রিয় হয়ে পড়েছিল। বন্দীদের উপর তারা বড় বেশি অত্যাচার করত। তারা নিজে ছিল বিদেশী, যদিও কম্বোডিয়ায় তারা ছয় শো বছর রাজত্ব করেছিল। তখন কম্বোডিয়ার নাম ছিল কাম্বুজা। সেখানকার অধিবাসীরা খমেরদের কাছে এত দুর্ব্যবহার পেয়েছিল যে তাদের তারা দেখতে পারত না।

কিন্তু বিশেষ কিছু করতেও পারত না কারণ রাজপুরুষদের ছিল দুই লক্ষ শিক্ষিত যুদ্ধ-হস্তী আর দূরে তীর ছোঁড়ার নানা রকম যন্ত্র; তাদের নৌকোগুলি এমনভাবে তৈরি ছিল যে তীর বিঁধত না। তবু তাদের একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হল।

যতদূর জানা যায় ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামদেশের লোকরা আংকোর আক্রমণ করে, রাজধানী অধিকার করল। খমেররা দলবল জড়ো করে তখনকার মতো তাদের পরাজিত করল বটে, কিন্তু পরের বছর খমেররা আংকোর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হল। কোথায় গেল কেউ বলতে পারে না। কেউ বলে মহামারিতে সবাই মরেছিল; সেই বলে অত্যাচারিত প্রজারা ক্ষেপে উঠে তাদের মেরে ফেলেছিল। তারপরে প্রায় সাড়ে চারশো বছর কেউ তাদের কথা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। ১৮৬১ সালে দৈবাৎ যদি মূও তাদের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার না করতেন, তাহলে খ্‌মেরদের কথা আরো কতকাল অজানা থাকত কে জানে।

যুদ্ধবিদ্যা ছাড়া, শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান শিল্পসাধনা, কোনোটাতেই খ্‌মেররা কম ছিল না। দেশের মাটিতে তারা সোনা ফলাত। শোনা যায় যে একজন চীনে ভ্রমণকারী আংকোর দেখতে এসে, এক বছর কাটিয়ে, ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষটা দেশে ফিরে, এখানকার সুখ-ঐশ্চর্যের কথা লিখে রেখেছিলেন। সেই রচনা থেকে খ্‌মেরদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়েছে। তাছাড়া ওদের শিল্পকর্ম থেকে ওদের সাজ-পোশাক, আচার-আচরণ সম্বন্ধেও জানা যায়। হিন্দু আর বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ইচ্ছামতো বেছে নিয়ে তারা নিজেদের একটা বিশেষ সংস্কৃতি গড়ে নিয়েছিল।

এখন ফরাসী সরকারের সমস্যা হল জঙ্গলে গ্রাস করা এই অপূর্ব শিল্প কি করে রক্ষা করা যায়। বিশেষজ্ঞরা জঙ্গল কেটে, গাছের শিকড় সযত্নে বের করে, মূর্তি ও স্তম্ভ ইত্যাদি নতুন করে দাঁড় করালেন। কিন্তু গাছের ছায়া না পেয়ে আর কি একটা জীবাণুর আক্রমণে, সূক্ষ্ম বেলে পাথরের কারুকার্য গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

এগুলিকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় দাঁড়াল, যত্ন করে পাথরগুলি খুলে নিয়ে, কংক্রিটের ভিতের উপর নতুন করে আবার বসানো। চারদিকে জল-নিকাষের জন্যে নল-ও লাগাতে হল। তারপর নানা রকম আধুনিক ওষুধপত্র ব্যবহার করে, শেষ পর্যন্ত কাজ সমাধা হল। জগদ্বিখ্যাত ওঙ্কার-ধাম দেখতে এখন দেশ দেশান্তরের লোকে উদ্‌গ্রীব।

রেলগাড়ি

সুকমল দাশগুপ্ত

ঝুক্ ঝুক্ রেলগাড়ি
দূর দেশে ছায় পাড়ি,
মাঠ ঘাট এড়িয়ে—সে
ছোটে সব পেরিয়ে সে,
গাছ-পালা থামগুলো
ছোট-বড় গ্রামগুলো
নদী, নালা, জঙ্গল
ছেলে মেয়ে দঙ্গল
স'রে যায় পেছিয়ে
ওই সব চেঁচিয়ে!
গাড়ি চলে ঝুক্ ঝুক্
বুকখানা ধুক্ ধুক্
ভুস্ ভুস্ ভস্ ভস্
রাত প্রায় হবে দশ্
আকাশের তারা ওই
খুঁজে ফেরে কারা কই!
ট্রেনখানা থামিয়েই
লোকজন নামিয়েই,
ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ ভক্ ভক্
ঠন্ ঠন্ ঝক্ ঝক্
চলি মামাবাড়ি তাই
ছেড়ে দিল গাড়ি টাই।
কত দেশ কত গ্রাম
জানা নেই নাম ধাম
মাঝে মাঝে চিৎকার
কুউউ ঝিক্ ঝিক্ তার।
ওই আসে বৃষ্টি ও
ঝাপ্সা যে দৃষ্টি ও
শার্শীটা বন্ধ
তবু তার ছন্দ
ঘুরে মরে আকাশে
কত সুর মাখা সে।
পথ মাটি কাঁপিয়েই
পড়ে যেই হাঁপিয়েই
থামে গাড়ি মাথা হেঁট্
'পান বিড়ি সিগারেট্—
লুচি-পুরি, মিহিদানা
জানালায় ছায় হানা।
পেট যেই ভ'রে যায়
সুর্ সুর্ স'রে যায়
আঁধারের বুক চিরে
চলে গাড়ি ধীরে ধীরে।
স্বপ্নের দেশটায়
ছুটে চলে শেষটায়—
ঘুম ভাঙে, হোলো ভোর
থামে গাড়ি খোলো দোর

একটি নির্মম হত্যা

সৌরেন্দ্রকুমার পাল

অবুঝের মত প্রাণিহত্যাকে যেমন শিকার বলে মেনে নেওয়া যায় না, তেমনি যারা শিকারের নামে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও বিবেকহীন ভাবে হত্যা করে, তাদের শিকারী বলা যায় না। শিকারটাকে যারা sports মনে করে, তারা প্রত্যেকেই একটা নীতি মেনে চলে। নইলে এলোপাতাড়ি শিকার, যাকে বলা হয়—wanton shooting, করলে অচিরে জঙ্গলের প্রাণিজ সম্পদের বিলুপ্তি ঘটবে।

শিকারী মাত্রেই নীতি মেনে চলে শিকারের ক্ষেত্রে। তাই জ্ঞানহীন শিকার এবং নীতিগত শিকারের পার্থক্য বোঝান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এবং তার জন্য প্রয়োজন হয়েছে উপরের গৌরচন্দ্রিকাটুকু।

কয়েক বছর আগের ঘটনা।

এক শিকার থেকে ফিরে আসার কদিন পরেই আমার পূর্ব দরখাস্তর উত্তরে কোডার্মা জঙ্গলের পারমিট পাবার খবর এল। টাকা পাঠিয়ে দিয়ে যাত্রার জন্য আবার প্রস্তুত হতে লাগলাম।

এ যাত্রায় আমি একক যাত্রী।

মার্চের শেষে ঠাণ্ডার প্রকোপ তখন অনেক কম। জঙ্গলের চেহারায় অনেক পরিবর্তন এসেছে বসন্তের আগমনে। গাছগুলি নতুন কিশলয়ে কচি সবুজে ছেয়ে গেছে। শাল মহুয়া পলাশ এমন আরও কত ফুল ফুটেছে শাখায় শাখায়। আম গাছগুলিও মুকুলে ভরে গেছে। কোথাও পাখিদের কূজন, কোথাও বা ভ্রমরের গুঞ্জন রবে চারিদিক মুখর হয়ে রয়েছে। মাটিতে তৃণ বা ঝোপ-ঝাড় এই সময় প্রায় শুকিয়ে যায়। তাই বন্ধুর বনভূমি সেই সময় অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার দেখায় এবং অনেকটা দূর পর্যন্ত সব কিছু দৃষ্টিতে আসে।

জঙ্গলের মধ্যে দেহাতী গ্রামের ধারে একটি ভাণ্ডার বাড়িতে উঠলাম। একটি দেহাতী লোককে রাখলাম আমার আহার ইত্যাদির ব্যবস্থায়।

প্রথম দিনটা কাটল অন্ততঃ দশদিন থাকার তোড়জোড়ে। দ্বিতীয় দিন থেকে শিকার শুরু করার কথা; কিন্তু কোথায় কি শিকার পাব তার খবর নেই। অগত্যা গ্রামের মোড়লদের ডাকলাম। আলোচনার শেষে সাব্যস্ত করলাম যে বাঘের আশায় মহিষ কিনে বাঁধার কোনো প্রয়োজন নেই। বাঘ তার প্রয়োজন মত গরু মহিষ দিনে রাতে মারবার সুযোগ পায় এবং নিয়মিতভাবে মেরেও খাচ্ছে। সব চেয়ে বড় কথা হল ও জঙ্গলের বাঘ কদাচ দুবার ফিরে আসে তার মারা অর্ধভুক্ত শিকারের উপর। কারণ, হয় তার ভুক্তাবশিষ্ট লোকেরা তুলে নিয়ে খায়, আর নইলে রাতের অন্ধকারে সেই অবশিষ্টটুকু খেতে আসা মানে চরম বিপদের ফাঁদে পা দেওয়া। রাত্রে গুড়ুম্ শব্দর তাৎপর্য সম্বন্ধে এ অঞ্চলের বাঘদের নাকি অভিজ্ঞতা আছে। তাছাড়া যেখানে ছাড়া গরু মহিষ জঙ্গলে এবং আশপাশে দিনে রাতে অবাধে ঘুরছে, সেখানে জঙ্গলের মধ্যে বাঁধা মহিষের বাচ্চা দেখে তার সন্দেহ হবেই এবং এটা প্রতীয়মান হয়েছে বহু শিকারীর পূর্ব প্রচেষ্টায় বিফলতা দেখে। বুঝলাম এখানকার বাঘ অতি ধুরন্ধর।

সুতরাং বাঘের আশায় থাকবার একমাত্র পথ রইল natural kill অর্থাৎ, বাঘের নিজের চেষ্টায় লব্ধ স্বাভাবিক শিকারের সন্ধানে থাকা এবং প্রয়োজন বলে বাঘের track ধরে বা তার পথে অনুসন্ধান করে মুখোমুখি তাকে শিকার করা। আপাততঃ সেটা অনিশ্চিত মনে করে সেই রাত্রে চিতা শিকারে যাব ঠিক করলাম ; কারণ, আগের দিন রাত্রি প্রায় নটা নাগাদ কাছাকাছি একটা চিতাকে ডাকতে শুনেছিলাম।

বিকালে একটা ছাগল জোগাড় করে গ্রামের অদূরে একটা নালার ধারে ছাগলটাকে বেঁধে একটু তফাতে একটা ঝোপে গিয়ে বসলাম। বলা বাহুল্য যে ঝোপটাকে এমনভাবে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দিলাম, যাতে তার মধ্যে আমার অবস্থিতি এতটুকু চিতা বা কোনো জানোয়ারের দৃষ্টিতে না পড়ে অথচ, সামান্য ফাঁক দিয়ে আমি দিব্যি দেখতে পাব।

কাছ থেকে চিতা শিকার করতে মাঝারি রাইফেলের চেয়ে বন্দুক বেশি কার্যকরী আমার বিশ্বাস। তাই গোটাকতক ভারী বুলেট আর বন্দুক নিয়ে চিতার আশায় রইলাম। ওদিকে যে লোকদুটো ছাগলটাকে বেঁধেছিল, তারা চলে যাবার কিছু পরে ছাগলটা ম্যাঁ ম্যাঁ স্বরে তাদের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে ডাকতে লাগল। ওর এই ডাকাটা আমার পক্ষে সৌভাগ্যকর হলেও ওর অবস্থা দেখে আমার মনে কিছুটা দয়ার উদ্রেক হয়েছিল। নিরীহ একটা জলজ্যান্ত ছাগলকে টোপ হিসেবে চিতার কবলে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া ছাড়া আর কি !

ধীরে ধীরে দিনের আলো ক্ষীণ হ'য়ে এল। ছাগলটা এবার বেশ জোরে ডাকতে লাগল আর বাঁধন ছাড়াবার জন্য মাঝে মাঝে চেষ্টা করতে লাগল। চিতার আগমনের সম্ভাবনায় উদ্‌গ্রীবতা এবং ছাগলের একটানা ম্যাঁ ম্যাঁ শব্দ, এই দুইএর সমাবেশ আমায় অত্যন্ত অস্বস্তিময় করে তুলল।

হঠাৎ ছাগলটা চুপ করে গেল এবং পর মুহূর্তে দেখি একটা বিরাট দাঁতাল শূয়োর নালা পার হয়ে এল এবং ছাগলটার দিকে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। প্রায় চার পাঁচ গজ পিছনে আরও চারটে শূয়োর এল এবং জঙ্গলে পায়ের আওয়াজে মনে হল আরও আসছে। একেবারে শূয়োরের দল। চিতার আশা ছেড়ে দিয়ে ছাগলটাকে বাঁচাবার জন্য প্রথম শূয়োরটাকে কানের পাশে গুলি করলাম। তারপর আচম্‌কা বন্দুকের শব্দে সবকটা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারল। কিন্তু, একটা মাঝারি আকারের শূয়োর সামনে নালা দিয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে ধরাশায়ী হল।

এমনটি ঘটবে আমি কল্পনা করতে পারিনি। তবুও ভাল যে ছাগলটা এ যাত্রায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল।

বন্দুকের দুটো গুলির আওয়াজ শুনে গ্রামের লোকরা এসে গেল এবং তারা যখন দেখল বাঘের পরিবর্তে দু দুটো শূয়োর পাওয়া গেছে তাদের আনন্দ আর ধরে না।

এরপর চারিদিনের মধ্যে আমার এলাকায় বাঘের কোনো খবর গেলাম না। পরের দিন খবর এল আমার শিকারের সীমার বাইরে দূরে এক গ্রামের কাছে বাঘ একটা মহিষ মেরেছে রাত্রে এবং সকালের দিকে মেরেছে আর একটাকে। সেটা ভোর না হ'তেই নাকি জঙ্গলে চরতে বেরিয়েছিল।

যাই হক, এতে আমার কিছু লাভ নেই। আমার পারমিটের মেয়াদ শেষ হ'য়ে আসছে দেখে অগত্যা হাঁকোয়া শিকারের ব্যবস্থা করলাম। দুদিন হাঁকোয়া করে বাঘের খবর আমার এলাকার মধ্যে পেলাম না। কয়েকটা চিত্রল হরিণ মাত্র দেখতে পেয়েছিলাম হাঁকোয়ায়। ওদের প্রতি গুলি চালাতে মন চায়নি।

নদিনের দিন খবর পেলাম-কাছেই বাঘ একটা সম্বর হরিণ মেরেছে ভোরের দিকে। তৎক্ষণাৎ রওনা হলাম জায়গাটা দেখবার জন্য। বেলা তখন এগারটা কি বারোটা হবে।

প্রায় মাইলখানেক পথ। যে স্থানে সম্বরটা আক্রান্ত হয়েছিল সেটা সম্প্রতি ঝোপ-ঝাড় কেটে বন বিভাগ থেকে পরিষ্কার করেছিল। সম্বরটাকে অতর্কিতে আক্রমণ করেছে এক বাঘিনী এবং নিশ্চয়ই পিছন থেকে আক্রান্ত হওয়ায় বাঘিনীকে পিঠের উপর নিয়ে সম্বরটা বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে ছুটোছুটি করেছে, যার জন্য চারিদিকে সম্বরের খুরের দাগ এবং রক্তের দাগ রয়েছে। একটা ঝোপের ধারে পেলাম অনেকটা রক্ত। বুঝলাম এখানে হরিণটাকে ধরাশায়ী করে বাঘিনী তার ভবলীলা সাঙ্গ করেছে।

এর পর বাঘিনীর পায়ের দাগ এবং হিঁচড়ে শিকারকে নিয়ে যাবার দাগ খুবই স্পষ্ট ছিল। সে দাগ ধরে আমি ক্রমশঃ একটা খাদে এলাম। খুব সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে যেতে এলাম এক নালায়। নালা ধরে দাগ অনুসরণ করে এলাম একটা পরিষ্কার জায়গায়। সেখানে পেলাম মানুষের পায়ের ছাপ আর রক্তের দাগের সঙ্গে ছড়ান হাড়ের অনেক টুকরো। বুঝলাম, মানুষ এই লোভনীয় শিকারের খবর পেয়ে বাঘকে তাড়িয়ে তার মুখের খাবার ইতিমধ্যে কেড়ে নিয়ে গেছে।

আমি ফিরে এসে শেষ চেষ্টার জন্য ঐ বিশেষ স্থানটি এবং কাছাকাছি অঞ্চল সমেত হাঁকোয়া করার ব্যবস্থা করলাম। কারণ, এরকম ক্ষেত্রে বাঘ সাধারণতঃ তার মড়ী আগলাবার জন্য অথবা, সুযোগ সুযোগ বুঝে কোনো এক সময় তার খাবারের বাকি অংশটুকু অন্যত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেবার আশায় মড়ীর কাছাকাছি কোনো জায়গায় লুকিয়ে থাকে। যদিও আমার সন্দেহ হয়েছিল যে মানুষ হৈ হট্টগোল করে তার শিকার আত্মসাৎ করেছে এবং এতে সে নিশ্চয়ই টের পেয়ে হয়তো ও স্থান ত্যাগ করে দূরে কোথাও সরে গেছে, তবুও একবার চেষ্টা করে দেখব ঠিক করলাম।

এবারে আমার সহযোগিতা করতে এল স্থানীয় এক যুবক। সঙ্গে তার দুনলা গাদা বন্দুক। সুযোগ গেলে বাঘকে সে মারতে পারে কিনা অনুমতি চাইল আমার কাছে। কি মনে করে আমি তাকে সেই অনুমতি দিলাম এই সর্তে—এ হাঁকোয়ায় বাঘের পরিবর্তে অন্য কোনো জানোয়ার পেলে সে গুলি চালাবে না এমন কি শিংওয়ালা হরিণ পেলেও না, বিশেষ করে মাদী হরিণ সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

যুবক সর্ত মেনে নিল এবং তার হাবভাবে আমার প্রত্যয় হওয়ায় তাকে শিকারে বসতে সম্মতি দিলাম।

বেলা তখন সাড়ে তিনটে হবে। পড়ন্ত রোদের উষ্মতা আদৌ নেই। শুধু সোনালি রং জঙ্গলের

মাথায় মাথায় বিদায়ের পূর্বে সেদিনের মত স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে। দু-একটা করে পাখি উড়ে যাচ্ছে। বোধ হয় তারা গোধূলির পূর্বে কুলায়ে ফিরছে। বাতাস এত ধীরে বইছে যে তার শিহরণে গাছের পাতায় কম্পন অনুভূত হ'চ্ছে না। দিনটির বিদায়ের ঠিক পূর্বমুহূর্তের পরিস্থিতি।

আমার সামনে একটা নাতিউচ্চ টিলা। টিলাটার যে জায়গায় একটা ঘন ঝোপঝাপে ঢাকা খাদ এসে ক্রমশঃ একটা শীর্ণ নদীতে মিশেছে, তারই বিপরীতে একটা গাছের পিছনে বসেছি পাতার আড়াল করে। আমার থেকে প্রায় সত্তর গজ দূরে যেখানে টিলাটা শেষ হয়েছে, তার উল্টো দিকে বসেছে যুবক।

হাঁকোয়ার লোকরা এগোতে সুরু করেছে। আমার কথামতো তারা চিৎকার না করে কেবল গাছে বা শুকনো কাঠে ঠক্ ঠক্ শব্দ করছে এবং মাঝে মাঝে স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলছে। এভাবে হাঁকোয়া করায় উদ্দেশ্য যাতে জন্তু জানোয়ার প্রাণ ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে না দৌড়য় এবং বাঘের ক্ষেত্রে, তাকে না চটিয়ে ধীর গতিতে শিকারীর দিকে আনা।

প্রায় মিনিট দশেক অতিবাহিত হল, অথচ বাঘ তো দূরের কথা একটা শূয়োর বা হরিণ পর্যন্ত বেরল না। stopper বা রোকয়াদের তরফ থেকেও কোন আওয়াজ আসছে না। ভাবছি, জঙ্গল কি একেবারে ফাঁকা।

হঠাৎ চোখে পড়ল টিলার শেষের দিকে কি একটা জানোয়ার ঢালু পথে আসছে। আমার থেকে প্রায় চল্লিশ গজ ব্যবধান। আরও একটু নামতে চোখে পড়ল মস্তবড় এক সম্বর মা হরিণ তার বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে অতি সাবধানে নদীর দিকে নামছে। বাচ্চাটা প্রায় মাস ছয় কি সাতেকের হবে মনে হল। মা সন্তানকে আগলে আগলে নামছে পিছনে মানুষের তাড়া খেয়ে। ওদের গায়ে পড়ন্ত রোদের কিরণ পড়ে ওদের সৌন্দর্য সৌষ্ঠব যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল জঙ্গলের সেই পটভূমিতে।

প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে এই অপরূপ দৃশ্য দেখে এতই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে নিজের অবস্থিতির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। অপলক দৃষ্টিতে ওদের দেখছিলাম।

আমার সমস্ত তন্ময়তা ভেঙ্গে গেল অকস্মাৎ গাদা বন্দুকের গুড়ুম শব্দে। নদী পার হবার আগেই হরিণটা চট্ করে গতি পরিবর্তন করে বাচ্চাকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সর্তভঙ্গকারী যুবকের এই নির্মম নিষ্ঠুর ব্যবহারে আমার মাথার রক্ত যেন সঙ্গে সঙ্গে টগ বগ করে রাগের আগুনে ফুটতে লাগল।

হাঁকোয়ার লোকেরা কাছাকাছি আসতেই আমি দৌড়ে গিয়ে যুবককে প্রশ্ন করলাম, কেন সে সর্ত ভুলে বাচ্চা সমেত মা হরিণের ওপর গুলি চালিয়েছে? সে ভেবেছিল আমি আনন্দিত হব, কিন্তু তার কোন কৈফিয়ৎ না মেনে সেই মুহূর্তে তাকে তাড়িয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে লোকেরা মা হরিণের মৃত দেহটা অদূরে জঙ্গলের মধ্যে পেয়ে আনন্দে হৈ হৈ করে টেনে আনতে লাগল।

বিষাদে মন ভরে গেল। এই দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং বিবেকহীন হত্যার জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করলাম। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে চুপ করে বসে দেখছিলাম হরিণের মৃতদেহটা গাছের ডালে বেঁধে দশ

বারটা লোক বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মহোৎসবের আনন্দে।

আমারই অনতিদূরে পড়ে আছে হতভাগ্য হরিণের অজস্র রক্ত। জায়গাটা লাল হয়ে গেছে। উদাস মনে আকাশে তাকিয়ে দেখি সেখানেও লাল। পাহাড়ের ওপাশে সূর্য বোধহয় তখন দিগন্তে লাল আবির ছড়িয়ে দিয়েছে।

উঠে ফেরার পথে মাত্র কয়েক পা এগিয়েছি হঠাৎ পিছনে 'ম্যাঁ' ডাক শুনে থমকে তাকিয়ে দেখি হরিণ শিশু কিছুদূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মা হারা সেই হরিণ শিশুর ভয়ার্ত চাহনীর সঙ্গে মাকে খোঁজার কাতরধ্বনি আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। মনে হোল, ও যেন আমায় জিজ্ঞাসা করছে—'আমার মা কোথায়? আমার মা?'

সহ্য করতে পারলুম না হতভাগ্য হরিণ শিশুর করুণ সজল চাহনি। রাইফেল তুলে ওর মা হারানর কষ্ট লাঘব করতে উদ্যত হতে মনুষ্যকণ্ঠে কে চিৎকার করে উঠল—'মারবেন না ওকে, ছেড়ে দিন, ওর যা হয় হবে।' তাকিয়ে দেখি, দলের একটি লোক আমাকে ডাকতে এসেছে।

চকিতে হরিণ শিশু মানুষকে অবিশ্বাস করে জঙ্গলে অন্তর্ধান করল, আর তার ছোট্ট খুরে ওঠা ধুলোর কণাগুলি দেখে মনে হোল রাশি রাশি ধিক্কারের ছাই আমার মুখে মাখিয়ে দিয়ে গেল।

হতভাগ্য হরিণ শিশুর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা একমাত্র জঙ্গলের দেবতার হাতে সঁপে দিয়ে ফিরে এলাম সেদিন।

পুতুলের দেশ

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বাবুইহাটির বাড়িগুলো
ছোট্ট দেখায় ভারি—
একটার পর একটা যেন
সাজানো মালগাড়ি!
কে জানে আর ঝুপসি নদী
হবে এমন সরু!
তারই পাড়ে চরছে মাঠে
ছোট্ট খেলার গরু।

গাছগাছালি দাঁড়িয়ে আছে
জড়াজড়ি করে!
মানুষগুলো যত পুতুল
বেড়ায় নড়েচড়ে!
সবাইকে তাই সত্যি তুতুল
দিল অবাক করে—
সত্যি জগৎ খেলার হল
দেখল পাহাড় চড়ে।

সমুদ্র কেন ক্ষেপে ওঠে

অজেয় রায়

মাঝে মাঝে সমুদ্র এমন ক্ষেপে ওঠে কেন ?

যে তরঙ্গগুলিকে দেখি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে গড়াতে গড়াতে এসে তীরে ভেঙ্গে পড়ছে যেগুলি মাঝে মাঝে দৈত্যাকৃতি নিয়ে প্রবল আক্রোশে ডাঙ্গার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে চায় কি কারণে ?—মানুষ যুগ-যুগান্তর ধরে সমুদ্রের এই রূপ পরিবর্তনের কারণ চিন্তা করেছে। ক্ষিপ্ত সাগর, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশি দেখে আতংকে অভিভূত হয়েছে। দুরন্ত প্রকৃতির সামনে নিজেকে মনে হয়েছে কত অসহায়।

সমুদ্রের উদ্দামতা ও বিশাল বিশাল ঢেউ সৃষ্টির কারণ দুটি—সামুদ্রিক ঝড় এবং সমুদ্রগর্ভে কোনও ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ।

বজ্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, ঝড় আমরা ডাঙ্গাতেও দেখি। কিন্তু সামুদ্রিক ঝড়ের বিশেষত্ব হচ্ছে সেখানে প্রচণ্ড বাতাস শুধু একা নয়,—তার দোসর জোটে অকুল জলরাশি। এই দুইয়ে মিলে সামুদ্রিক ঝড়কে ভয়াবহ বিধ্বংসী রূপ দেয়।

বিউফোর্ট মান (Beaufort Scale) অনুযায়ী বাতাসের বেগ ঘণ্টায় ২৫—৩১ মাইল হলে বলা যায় বেশ জোর বাতাস। তখন ঢেউয়ের গড় উচ্চতা হয় প্রায় ১২ ফুট। আর বাতাসের বেগ ঘণ্টায় ৬৪-৭৫ মাইল দাঁড়ালে আমরা তাকে বলি প্রবল ঝড়। তখন ঢেউয়ের গড় উচ্চতা হয় ৩০—৪০ ফুট বা আরও বেশি।

বিভিন্ন দেশে সামুদ্রিক ঝড়ের নানা স্থানীয় নাম আছে।

যেমন বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন, ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের তীরে হারিকেন, চীন সমুদ্রে টাইফুন, অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম-উপকুলে উইলি উইলি ইত্যাদি। তবে এরা সবাই ঘুর্ণিঝড় এবং এদের প্রকৃতি সর্বত্রই মোটামুটি এক ধরনের।

সাধারণতঃ উত্তর গোলার্ধের সমুদ্রে শীতকালে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের সমুদ্রে গ্রীষ্মকালে সব চেয়ে বেশি ঝড় ওঠে। বিষুব রেখার কাছাকাছি উষ্ণ-অঞ্চলে ঝড়ের প্রবলতা বেশি। বাতাসের বেগ হয় অতি প্রচণ্ড। আর ঝড়ের আবির্ভাব হয় ঘন ঘন। কিন্তু উত্তর-অঞ্চলে শীতকালীন ঝড়ে ঢেউ ওঠে খুব উঁচু। ঝোড়ো বাতাস অনেক বেশি দিন ধরে বইতে থাকে। আর ঝড়ের তাড়নায় সমুদ্রস্রোত ভীষণ বেগে বহু দূর দূর দেশের তীরে গিয়ে আঘাত করে।

ঝড়ের সময় ঢেউয়ের উচ্চতা কি হবে তা নির্ভর করে—কত বেগে বাতাস বইছে, কতক্ষণ ধরে বইছে, সমুদ্র সেখানে বদ্ধ না খোলা তার উপর। দিগন্তপ্রসারী মুক্ত সাগরবক্ষে বাতাস ও স্রোতের বেগ হয় বেশি। ঢেউ খুব উঁচু হয়ে ওঠে।

নাবিকদের একটা নিজস্ব হিসেব আছে। তাদের মতে বায়ু যত মাইল বেগে বইবে, সাধারণতঃ

ঢেউয়ের গড় উচ্চতা তার অর্ধেকের (ফুট) বেশি হবে না। তবে এ হিসেব সব সময় খাটে না।

বাতাসের ঠেলায় স্রোত যখন ছোটে তখন সব সময় মাঝ দরিয়ায় ঢেউ বড় একটা অস্বাভাবিক রকম উঁচু হয়ে ওঠে না। কিন্তু ক্রমে তীর যত কাছে আসে, সাগরগর্ভের গভীরতা কমে, ঢেউগুলি ততই ফুলে ফেঁপে ওঠে। তারপর বিপুল ক্রোধে ফেনার মুকুট পরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গমালা গর্জন করে বারবার তীরভূমির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। এই ধাবমান স্রোতের সঙ্গে অন্য কোন বিপরীতমুখী স্রোতের সংঘর্ষ ঘটলেও বিপদ। তখন প্রলয় যুদ্ধ বেধে যায়।

এক একটা সামুদ্রিক ঝড়ের ফলে উপকূলে ক্ষয়-ক্ষতি প্রাণনাশের পরিমাণ যে কি সাংঘাতিক হতে পারে তা ভাবা যায় না। বর্তমানকালে চরম বিধ্বংসী সমুদ্র ঝড় হয় ভারতবর্ষে। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর।

বঙ্গোপসাগর থেকে সাইক্লোন বাংলা দেশের দক্ষিণ উপকূলের উপর দিয়ে বয়ে যায়। ফলে ২০,০০০ নৌকো ধ্বংস হয়, ৩০০,০০০ লোক প্রাণ হারায়। সে আমলের অনেক লেখায় এই মহাপ্রলয়ের বিবরণ আছে। তখন নবাবী রাজত্ব। ইংরেজ বণিকদের হাতে কলকাতা শহর সবে গড়ে উঠছে। ঘূর্ণিবাতাস আর অবিশ্রাম বৃষ্টিধারা কলকাতাকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছিল। অনেক বাড়ি ঘর ধ্বসে পড়ে বহু মানুষ জন পশু-পাখি প্রাণ হারায়। গঙ্গায় সমুদ্রের জল ঢুকে এক সাংঘাতিক কাণ্ড বাধিয়েছিল। কলকাতার জাহাজঘাটে বাঁধা একখানা বাণিজ্য জাহাজও সেবার আস্ত ছিল না। এ ঘটনা প্রসঙ্গে লেখা একটি কাহিনী বলি—

ঝড়-জল তো থেমেছে। এক ক্যাপ্টেনের জাহাজ কলকাতা বন্দরে বাঁধা ছিল। বেশ কদিন পরে ক্যাপ্টেন এলেন দেখতে জাহাজের কি অবস্থা। একজন কুলিকে জাহাজের খোলের মধ্যে দেখতে নামানো হল। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও কুলিটি আর ফিরে উঠে এল না। তারপর আর একজন কুলিকে নামানো হল। কিন্তু সেও আর ফেরে না। তখন ক্যাপ্টেন স্বয়ং মশাল জ্বালিয়ে, গুলিভরা বন্দুক হাতে, লোকলস্কর নিয়ে খোলের ভিতরে দেখতে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল চিৎকার, দমাদ্দম্ বন্দুকের আওয়াজ। কি ব্যাপার ?— না, এক মস্ত কুমীর ! হাঁ করে ওৎ পেতে বসে। ঝড়ের সময় ঢেউয়ে ভেসে এসে কুমীরটা খোলের ভিতর আটকে পড়েছিল। ক'দিন তার খাওয়া জোটে নি, পেটে আগুন জ্বলছে !

ঝড়-ঝঞ্ঝা বা ভূমিকম্পে আলোড়ন জাগে। ঢেউয়ের আকারও বিরাট হয়। উত্তর আটলান্টিকে তো একটু ঝড় উঠলেই ষাট ফুট উচু ঢেউ হামেশাই দেখা যায়। নাবিক বা লাইট-হাউসের রক্ষাকারীরা তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারেন ঝড়ের সময় কত বড় বড় ঢেউ তাঁরা দেখেছেন। এক একটা ঢেউয়ের মাথা আবার সব ঢেউকে ছাপিয়ে ওঠে। নাবিকরা বলেন প্রতি কুড়িটা ঢেউয়ে একটা ঢেউ আসে, যার উচ্চতা হয় গড় ঢেউগুলির উচ্চতার অন্ততঃ দু'গুণ।

সবচেয়ে উঁচু ঢেউ কোনটি ? কোথায় দেখা গেছে ?—এ নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক হয়েছে। অনেকের কথা বিশ্বাসযোগ্য ঠেকে নি। আবার হয়তো পৃথিবীর উচ্চতম ঢেউটি যিনি দেখেছেন সেই নাবিক

দুর্ভাগ্যক্রমে আর কোনদিনই ডাঙ্গায় ফিরে আসতে পারেন নি। সত্যি বলতে অমন তাণ্ডবের মাঝে লোকে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবে, না ঢেউ মাপবে? কাজেই সব চেয়ে উঁচু ঢেউ কে দেখেছে? কত বড়?—বলা শক্ত।

প্রত্যক্ষদর্শীরা অনেক বিরাট উঁচু ঢেউয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। তবে ইউ. এস. এস. রামাপো (U. S. S. Ramapo) জাহাজের এক অফিসারের দেখা ঢেউটির রেকর্ড বোধকরি এ যাবৎ কেউ ভাঙ্গতে পারে নি।

১৯৩৩ সাল, ফেব্রুয়ারি মাস। প্রশান্ত মহাসাগরে ম্যানিলা থেকে সান-ডিয়াগো যাবার পথে রামাপো ঝড়ে পড়ে। সাতদিন সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করে জাহাজ কোনোক্রমে রক্ষা পায়।

ঝড় তখন ভীষণ বেগে চলছে। বাতাস ও জলের টানে জাহাজ দিশেহারা হয়ে উঠেছে। সাগর উদ্দাম। এক অফিসার জাহাজের ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে চাঁদের আলোয় হঠাৎ দেখলেন পর্বতপ্রমাণ এক ঢেউ মাথা তুলে উঠছে। আর উঠছে। জাহাজ তখন দুই ঢেউয়ের মধ্যবর্তী নিচু জায়গাটায়। কাজেই ঢেউটির উচ্চতা বুঝতে অফিসারের অসুবিধা হয় নি।

এই দানব ঢেউয়ের মাথা প্রধান মাস্তুলের ডগা অবধি উঁচু হয়েছিল। অর্থাৎ উচ্চতা পাক্কা ১১২ ফুট। ক'তলা হবে?

কথায় বলে মানুষ পাগল হলে তার গায়ের জোর বেড়ে যায়। সমুদ্রের বেলাও তাই। লক্ষ লক্ষ টন জলরাশি ভীষণ বেগে এসে যে আঘাত হানে তার ক্ষমতা অবিশ্বাস্য।

বিখ্যাত গল্প লেখক রবার্ট-লুইস্ স্টীভেনসনের বাবা টমাস স্টিভেনসন প্রথম সমুদ্র স্রোতের শক্তি মাপবার জন্য একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তার নাম দেওয়া হয় 'ওয়েভ-ডাইনামোমিটার' (Wave Dynamometer)। তিনি পরীক্ষা করে দেখেন, ঝড়ের সময় সমুদ্রস্রোতের গতিশক্তি প্রতি বর্গফুটে ৬০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। সমুদ্রের আসুরিক ক্ষমতা সম্বন্ধে গল্প শুনলে মনে হয় রূপকথা, স্রেফ গাঁজাখুরি।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ, ডিসেম্বর মাস। স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে একটা বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ার যে দৃশ্য দেখেছিলেন তা অকল্পনীয়।

ঢেউ এসে বার বার আঘাত করে সমুদ্র উপকূলে পাথরের ওপর বসানো কংক্রীটের এক নিরেট স্তম্ভকে মোটা মোটা লোহার রডের বাঁধন ছিঁড়ে উপড়ে ফেলল। কংক্রীটের চাঁইটা ছাড়াও বাঁধের অন্যান্য অংশ, লোহার ডাণ্ডাগুলি ইত্যাদি নিয়ে প্রায় ১৩৫০ টন বা ২৭০০,০০০ পাউণ্ড ওজন উপড়ে ফেলা হয়েছিল।

তবে এ ঘটনা তার বাহুবলের সামান্য একটু নমুনা মাত্র! বছর পাঁচেক পরে সমুদ্র আর এক দফা বিক্রম দেখালো। ক্ষ্যাপা সমুদ্র নতুন স্তম্ভটিকেও উপড়ে তুলে ফেলল। নতুন স্তম্ভটির ওজন ছিল ২৬০০ টন।

বিশাল বিশাল শিলাখণ্ড জলের তোড়ে অনেক উঁচুতে ছিটকে পড়ছে এমন শোনা গেছে।

একবার ১৩৫ পাউণ্ড ওজনের একখণ্ড পাথর ১০০ ফুট লাফিয়ে উঠে একজন লাইট-হাউস রক্ষকের ঘরের ছাদ ফুটো করে ভিতরে পড়ে। সে যাত্রা গৃহকর্তার মাথাটা বেঁচে গিয়েছিল এই রক্ষে।

ঝড়ের ফলে যেমন সাগর বক্ষে স্রোতের তীব্রতা বাড়ে তেমনি হয় সমুদ্রগর্ভে কোনো ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটলে। এর নাম 'সুনামি' (Tsunami)—জাপানী শব্দ।

এক হিসেবে এর প্রকৃতি আরও সর্বনাশা। ঘূর্ণিঝড়ের মত এর ফলে খোলা সমুদ্রবক্ষে বড় বড় ঢেউয়ের জন্ম হয় না। স্রোতের প্রচণ্ডতা বোঝা যায় যখন এই স্রোতের সঙ্গে কোনও বিপরীতমুখী স্রোত বা তীরভূমির সংঘর্ষ হয়।

ঝড় নেই, জল নেই, পরিষ্কার আকাশ হঠাৎ দেখা গেল। সমুদ্র ভূমিকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ। পাহাড়ের মত উঁচু। আর কি আস্ফালন!

বেচারা উপকূলবাসীরা সতর্ক হবার সুযোগটুকুও পায় না।

কোথাও ভূমিকম্প হলে 'সুনামি' তীরবেগে সাগরের বুকে ছুটে চলে। যখন গভীর সমুদ্র দিয়ে যায় তখন অনেক সময় এর অস্তিত্ব টের পাওয়াই মুস্কিল।

ঢেউয়ের স্ফীতি বাড়ে সামান্য আর স্রোতধারা জেট প্লেনের গতিতে ঘণ্টায় ৪০০—৫০০ মাইল বেগে ধাবিত হয়। হয়তো জাহাজটা একটু দুলে নেচে উঠল মাত্র। কেউ জানতেও পারল না পায়ের তলা দিয়ে 'সুনামি' কী ভীষণ মারণাস্ত্র নিয়ে কোনো উপকূল লক্ষ্য করে ধেয়ে চলেছে। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে লিসবন ভূমিকম্পের ফলে ৫৩ ফুটের বেশি উঁচু তরঙ্গমালা মাত্র ৯½ ঘণ্টার মধ্যে পুরো আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের কূলে এসে ঘা দিয়েছিল।

'সুনামি' আসছে তার প্রধান সংকেত হচ্ছে হঠাৎ দেখা যাবে সমুদ্রতীরের জল যেন যাদুমন্ত্রবলে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে তীরের কাছে নোঙর করা জাহাজ বা নৌকোগুলি কাদায় বসে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই উন্মত্ত ঢেউ এসে তীরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সব ভাসিয়ে নেয়। অনেক সময় লোক সাগরের এই অদ্ভুত পশ্চাদপসারণ দেখতে বেলাভূমিতে ভিড় করে আসে। জানে না এক্ষুনি তেড়ে আসবে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত।

প্রশান্ত মহাসাগরে 'সুনামির' উপদ্রব সব চেয়ে বেশি। একমাত্র জাপানকে ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত অন্ততঃ পনেরো বার 'সুনামি'র দাপট সহ্য করতে হয়েছে। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের এক 'সুনামিতে' জাপানে ২৭,১২২ লোক মারা যায়।

তবে ১৮৮৩ সালে আগস্ট মাসে ক্রাকাতোয়া বিস্ফোরণের ফলে যে ভয়ংকর 'সুনামি' সৃষ্টি হয়েছিল তার তুলনা নেই।

দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার ছোট্ট আগ্নেয় দ্বীপ ক্রাকাতোয়া। হঠাৎ আগ্নেয়গিরির ঘুম ভাঙ্গে। পাহাড়ের গায়ে একটা বিরাট ফাটল দেখা দেয়। হুড় হুড় করে সাগরের জল ঢুকতে থাকে সেখান দিয়ে। তারপরই বিস্ফোরণ। দ্বীপের গোটা মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে উড়ে যায়।

শত শত মাইল দূর থেকে এর প্রচণ্ড শব্দ শোনা গিয়েছিল। ধূসর কালো ছাই আর ধোঁয়ায়

আকাশ ঢেকে যায়। সেই ছাই পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের মত বছরভোর সারা পৃথিবীর আকাশে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অনেক দেশের আবহাওয়া বেশ কিছু দিনের জন্য ওলট-পালট হয়ে যায়। কোথাও অসময়ে গুরু গুরু মেঘ ডেকে, বিদ্যুৎ চমকিয়ে বৃষ্টি নামে। কোথাও আচমকা তুষারপাত সুরু হয়।

আর সমুদ্রজলে দারুণ আলোড়ন জাগে। একশো ফুট উঁচু ঢেউয়ের পর ঢেউ, অপর পারে জাভার তীর প্লাবিত করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ৩৬০০০ হাজার লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাছাড়া কত নৌকো-জাহাজ যে ডুবে গিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে দূর দূরান্তে বিভিন্ন সাগরের কূলে সুনামি ঘা দিয়ে দিয়ে ফেরে।

এই প্রচণ্ড প্রাকৃতিক শক্তি, এই প্রবল জলোচ্ছ্বাসকে রোধ করার কৌশল এখনও মানুষ আয়ত্ত করতে পারে নি। কিন্তু আধুনিক যুগে এর ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমিয়ে ফেলা হয়েছে। যে সব সমুদ্রে ঝড় ঝঞ্ঝার প্রাদুর্ভাব বেশি তার উপকূলে 'রাডার' কেন্দ্র বসানো হয়েছে। ঝড়ের সম্ভাবনা হবা মাত্র তা এই সব আবহাওয়া অফিসে ধরা পড়ে। বেতারে দিকে দিকে খবর পাঠানো হয়। আবহাওয়াবিদ্‌রা লক্ষ্য রাখেন, ঝড়ের গতি কোন পথে। বাতাসের জোর কত, ইত্যাদি। আবার 'সিস্‌মোগ্রাফ' যন্ত্রে সমুদ্রগর্ভে যে কোন ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাৎ ধরা যায়। এর ফলে সুনামি সৃষ্টি হয়। তখন অভিজ্ঞ সমুদ্রবিদ্‌রা নজর রাখেন কোন পথে সুনামি ধেয়ে চলেছে। সমুদ্রের যে সব অংশ, উপকূলভাগে যে সব দেশ, এই ধরনের জলোচ্ছ্বাসের মুখে পড়তে পারে তাদের আগে-ভাগে সংকেত পাঠানো হয়—তাণ্ডব আসছে, হুঁশিয়ার !

কোন অঞ্চলে, কখন ঝঞ্ঝা বা সুনামি আঘাত করবে তাও আধুনিক বিজ্ঞানীরা হিসেব করে প্রায় ঠিকঠাক বলে দিতে পারেন।

সমুদ্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে 'ক্রাইমিয়ার ঝড়' (Crimean Storm) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আকস্মিক সমুদ্র ঝড়ে মিত্রপক্ষের বহু জাহাজ ধ্বংস হয় ঘটনাটিতে বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী লাভেরিওর সামুদ্রিক ঝড় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন। তিনি এর গতি-প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা সুরু করেন এবং ইউরোপে সামুদ্রিক ঝড়ের পশ্চিম হতে পূর্ব গতি আবিষ্কার করেন। তারই উৎসাহে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রঝড়ের আগমনবার্তা বেতারে জানিয়ে সাবধান করে দেবার জন্য প্রথম এক 'আন্তর্জাতিক তারবার্তা প্রেরণ ব্যবস্থা' (International Telegraphic System) স্থাপিত হয়। পরে এই বিজ্ঞান অবশ্য দিনে দিনে উন্নত হয়েছে।

মস্ত রাজা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

এক যে ছিল মস্ত রাজা
প্রকাণ্ড তার পাগড়ি।
পাগড়ি তো নয় মাথায় যেন
ঢাউস গুড়ের নাগরি।
রাজার ছিল কি ?
একটি ছিল কালা পাইক,
এক ভাঙা পালকি।
বেয়ারা নেই, পালকি কে বয় ?
হেঁটেই চলেন রাজা।
হাঁটতে গিয়ে দেখেন মাথায়
পাগড়িটা এক সাজা।
'কোই হ্যায় ! আয়, পাগড়ি নামা !'
রাজা পাড়েন হাঁক।
কেউ শোনে না। কালা পাইক
ঘুমিয়ে ডাকায় নাক।
উদার রাজা, মস্ত রাজা,
জপতে তো চান সাম্য।
হুকুম শোনার কেউ নেই তাই
মিলছে না সে কাম্য !

আজগুবি নয়

(লীলা মজুমদার)

জলপাইগুড়ি থেকে মাইল বারো দূর। শিকারপুর বলে একটা জায়গা; সেখানে একটা চা বাগান। হিমালয়ের পায়ের কাছে জানই তো বুনো জন্তুদের আস্তানা। ঘন বন জঙ্গল, তার মধ্যে দিয়ে চা-বাগানে যাওয়া-আসার পথ। প্রায়ই চা-বাগানগুলো এমন জায়গায় হয় যে একটা থেকে আরেকটা অনেক দূরে। তবু তাদের মধ্যে গাড়ি চেপে জীপ চেপে বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া-আসা চলে।

এর বাড়ি ওর বাড়ি যাওয়া, দল বেঁধে মাঝে মাঝে মাছ ধরা, শিকার করা লেগেই থাকে। বাইরে থেকেও বহু লোক আসে চা-বাগান দেখতে, মাছ ধরতে, শিকার করতে। তাও সব সময় ছোটখাটো শিকার নয়। পাখি মারা হরিণ মারা ত আছেই—বড় শিকারও পাওয়া যায় ঐ বড় শিকারের লোভেই কেউ কেউ আসে। তাদের মধ্যে অনেক সময় বিদেশী লোক-ও থাকে।

বড় শিকার বলতে বাঘ বোঝাচ্ছে সে-কথা আশা করি বুঝে নিয়েছ। পাহাড়তলির বনে বাঘ থাকে। তারা সবাই কিছু আর মানুষ খেত না, কিন্তু তা হলেও যথেষ্ট উপদ্রব করে। মুরগিটুরগি তো শেয়ালেও ধরে নিয়ে যায়, তাতে তেমন একটা এসে যায় না। ছাগল বাছুর গোরু গেলে বড় ক্ষতি হয়। তাই বাঘ বেরুলে সকলের শিকার করার উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

ঐ শিকারপুরের চা বাগানেও একটা বাঘ উপদ্রব শুরু করে দিল। প্রায়ই একটা কিছু না কিছু উধাও হত। চারদিকে বাঘের থাবার দাগ। মানুষটানুষ মরে নি অবিশ্যি, তবু লোকদের বড় ভয়। দিনকে দিন বাঘটার সাহস যেমন বেড়ে যাচ্ছে, কোনদিন কাকে ধরে তারই বা ঠিক কি।

বেজায় চালাক বাঘ। রাতে ইচ্ছেমতো চা বাগানে ঘুরে বেড়াত, অথচ কেউ মারতে পারে না। অনেকে চেষ্টা করেছিল, বাঘের দেখাই পায় নি। কেউ কেউ দূর থেকে দেখেও তার নাগাল পায় নি। এমন সময় বাঘে একটা বড় গোরু মারল। চা বাগানের এলাকার মধ্যেই। এবার একটা কিছু না করলেই নয়। একজন আমেরিকান সাহেব এসেছিল চা-বাগানে। তার শিকারের বড় শখ। বাঘের নামে তার জিবে জল এল। এ বাঘ মারতেই হবে। তারপর ছালটাকে তার নিউ ইয়র্কের পঁয়ত্রিশ তলার বসবার ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে, বন্ধুদের ডেকে বাঘ শিকার সম্বন্ধে কত গল্পই না করা যাবে।

চা-বাগানের মালিক তাকে অনেক বোঝালেন। কি দরকার, শেষটা যদি কি হতে কি হয়ে যায়। সাহেব নাছোড়বান্দা। হবেটা আবার কি? কিল্-এর কাছে গাছের ডালে মাচায় বসব। সঙ্গে দক্ষ শিকারী থাকবে। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ভালো বাঘ-মারা বন্দুক থাককে। বিপদ আবার কোথায়, ও বাঘ আমি মারব-ই। এমন সুযোগ এজন্মে আর পাব না।

শেষ পর্যন্ত তাই হল। মাচা হল, শিকারী এল, বন্দুক নিয়ে সাহেব তার সঙ্গে মাচায় চেপে

বসল। একটু দূরেই গোরুটা পড়ে আছে। আরেকটু রাত হলেই বাঘ খেতে আসবে। বাস্, আর দেখতে হবে না। শিকারী বারবার সাবধান করে দিল ?

'সাহেব, টুঁ শব্দটি করবে না, সিগারেট খাবে না, এতটুকু শব্দ শুনেছে কি তামাকের গন্ধ পেয়েছে অমনি বাঘ পালাবে।'

যথা সময়ে বাঘ এল। ইদিক উদিক ঘুরে দেখে নিশ্চিন্তমনে খেতেও বসল। শিকারী নিঃশব্দে সাহেবকে টিপে দিল : এইবার। সাহেব এদিকে বন্দুক তৈরি রেখেছিল, ওদিকে কিন্তু সিগারেট ধরানো তো বারণ এক হাতে না হয় বন্দুক, কিন্তু অন্যটা নিয়ে করবে কি ভেবে পাচ্ছিল না। তাই সে হাতটাকে পকেটে পুরে রেখেছিল। শিকারীর টিপুনি খেয়ে, তাড়াতাড়ি হাতটাকে পকেট থেকে বের করে বন্দুক তুলে ধরল। ব্যস্ ! ওতেই হয়ে গেল। প্যান্টের গায়ে হাত ঘষার সামান্য শব্দটি যেই না বাঘের কানে গেল, এক ঝলক বিদ্যুতের মতো সে অদৃশ্য হয়ে গেল। সাহেবের বাঘ মারা হল না। পরদিন সে মনের দুঃখে চলে গেল।

সব কথা শুনে চা বাগানের মালিকের বুড়ো বামুনঠাকুর চটে কাঁই। 'এত করেও বাঘটাকে মারতে পারল না, এমন ক্যবলা সায়েব তো জন্মে দেখি নি। আমি হলে—' এই অবধি বলে খক্-খক্ করে কাশতে কাশতে বামুনঠাকুর বিরক্ত হয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। সেই থেকে ওর মাঝে মাঝেই বাঘ মারার কথা মনে হত। রান্নাবাড়িতে একটা বন্দুকও ছিল, তাতে গুলি পোরা থাকত। যা ঘোর জঙ্গল চারধারে কখন কি হয় বলা যায় না, তাই এটা সব সময়ই তৈরি থাকত।

এদিকে কেউ তার কিছু করতে পারে না দেখে বাঘটার ক্রমে সাহস বেজায় বেড়ে গেল। চা-বাগানে প্রায় রোজ রাতেই সে হানা দিতে লাগল। চলাফেরা করতে লোকের ভয় ধরে গেল। একদিন বামুনঠাকুরের রান্নাঘরের পিছনে পেয়ারা বাগানে সে একটা বাছুর মারল। বামুনঠাকুর অনেক সয়েছিল, এবার আর পারল না। এমন সব আনাড়ি এরা, এদের দিয়ে তো বাঘ মারা হবে না। ঠিক করল নিজেই একবার চেষ্টা দেবে। বাঘ তো আবার বাছুরটাকে খেতে আসবে, তখন দেখা যাবে। পাকা শিকারীরা তাই করে।

রাঁধাবাড়া শেষ করে, সকলকে খাইয়ে দাইয়ে নিজেও খাওয়া দাওয়া সেরে, কাকেও কিছু না বলে বামুন ঠাকুর বন্দুকটা বগলে নিয়ে একটা বড় দেখে পেয়ারা গাছে চড়ে বসল। মাচা কোথায় পাবে ? বাছুরটা সেখান থেকে দশ গজ দূরে। বসে বসে ঝিমুনি এসে গেছে, এমনি সময় সত্যি সত্যি বাঘটা এসে চারদিকে একবার দেখে নিয়ে, দিব্যি নিশ্চিন্তে খেতে আরম্ভ করল।

বামুনঠাকুর এরই অপেক্ষা করছিল। সে শুনেছিল খেতে আরম্ভ করলে ওদের অন্য দিকে খেয়াল থাকে না। বন্দুকটা তুলতে যাবে এমনি সময় বেজায় কাশি এল। বহু দিনের কেশো রুগী, কি করে বেচারা। খক্—খক্—খক্ করে কেশে টেশে একাকার। ভাবল, হয়ে গেল এতদিনের সাধ !! বাঘটা কিন্তু একবার একটু কান খাড়া করেই আবার খেয়ে যেতে লাগল। এখানে যেমন চারদিকে মানুষের চেনা গন্ধ, তেমনি এ কাশিও তার খুব চেনা, প্রায় রোজই রান্না ঘর থেকে শোনে, এতে ভয়ের কিছু নেই।

কাশি কমলেই বামুনঠাকুর—বন্দুক তুলে গুড়ুম ! ব্যস্, বাঘের-ও দফা শেষ। বামুনঠাকুর গাছ থেকে নেমে টেনে দৌড় ! ছালটাকে রান্নাঘরে টাঙিয়ে বন্ধুদের ডেকে গল্প শোনাতে হবে !

ক্রীড়াজগৎ

অজয় হোম

আমাদের নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীরাম চ্যাটার্জি মহাশয় কলকাতায় স্টেডিয়াম তৈরির জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। আসন সংখ্যা প্রথমে হবে ৭৫ হাজার, পরে বাড়িয়ে ১ লক্ষ ২৫ হাজার নাকি করা হবে খুবই আশার কথা। স্থান এখনও ঠিক হয় নি। ইতিমধ্যে বাংলা সরকার ইডেন ও রঞ্জি স্টেডিয়াম দখল নিয়ে স্টেডিয়াম তৈরির প্রথম পদক্ষেপ সূচনা করেছেন। আমাদের মতে ইডেনে ফুটবল স্টেডিয়াম না হওয়াই উচিত! কারণ, ওখানকার মাটি ফুটবলের ঠিক উপযুক্ত নয়। ভয় শুধু আশা মরীচিকায় না পর্যবসিত হয়।

হকি

কলকাতায় হকি এতদিনে জমেছে। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল তাদের ক্রীড়াধারা অব্যাহত রেখে সমান তালে এগিয়ে চলেছে।

অমৃতসরে ভারত ও কেনিয়ার হকি টেস্টে প্রথম খেলা শেষ হয় গোলশূন্য; দ্বিতীয় টেস্ট বোম্বাইতেও ফলাফল এক। এই টেস্টে ভারত প্রথমার্ধে ২টি পেনাল্টি কর্নার নষ্ট করে। আমেদাবাদে তৃতীয় টেস্টে ভারত জেতে ১-০ গোলে। লেফট-ইন হারসেম সিং জয়সূচক গোলটি করেন। জলন্ধরে চতুর্থ বা শেষ টেস্টেও ভারত ১-০ গোলে কেনিয়াকে হারায়। দ্বিতীয়ার্ধে বিজয়সূচক গোলটি করে বিনোদকুমার।

ক্রিকেট

কলকাতায় ক্রিকেট এখনও চলছে তবে শেষ পর্যায়ে। দ্বিতীয় ডিভিসন ক্রিকেট লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে খিদিরপুর প্রথম ইনিংসের ফলাফলে। আগামী মরসুমে খিদিরপুর প্রথম ডিভিসনে খেলবে।

জুনিয়র সিএবি নকআউট ফাইনালে বড়িশা স্পোর্টিং খিদিরপুরকে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছে। এই খেলায় বড়িশার এ চ্যাটার্জি সেঞ্চুরি করেন।

অ্যাথলেটিস্

বোম্বাইয়ের জাল পারদিওয়ালা ১৯৬৮ সালের হেমস ট্রফি পেয়েছেন। পারদিওয়ালা খেলোয়াড় হিসেবে পান নি, পেয়েছেন 'ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ড' এবং অলিম্পিক গেমস বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সব প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশারদ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে বলে। কিন্তু আমাদের এমন দুর্ভাগ্য এতবড়ো নির্ভরযোগ্য অ্যাথলেটিক বিশারদ ভারতে থাকতেও আমাদের অ্যাথলেটিক নিয়ন্তারা পরামর্শের জন্যে কখনও তাঁকে ডাকেন নি। এর আগে হেমস ট্রফি ভারত থেকে পেয়েছেন মাত্র ২ জন। হকিতে বাবু (কে ডি সিং) এবং টেনিসে রমানাথন কৃষ্ণান। আমেরিকাকে উত্তর দক্ষিণে ভাগ করে ছয় মহাদেশ থেকে অপেশাদারী ছ'জন শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদকে বেছে 'প্লাক' দান করেন প্রতি বছর লস এঞ্জেলেসের হেমস অ্যাথলেটিক ফাউণ্ডেশান।

টেনিস

ডেভিস কাপে কুয়ালালামপুরে ভারত মালয়েশিয়াকে ৫-০ খেলায় হারিয়ে এবং কলম্বোতে সিংহলের বিরুদ্ধে ৪-১ খেলায় জিতে পূর্বাঞ্চলীয় ফাইনালে ওঠে। এবার খেলবে ফিলিপাইন ও জাপানের খেলায় বিজয়ী দেশের সঙ্গে। খেলাটি হবে পুনাতে। ভারতের ৫ জন বাছাই হয়েছেন, খেলবেন ৪ জন। তাঁরা হলেন—কৃষ্ণান, প্রেমজিৎলাল, জয়দীপ মুখার্জি, শ্যাম মিনোত্রা ও শিব মিশ্র।

টেবিল টেনিস

ভারত থেকে ৪ জন—মীর কাশিম আলি (অন্ধ্র), কে জয়ন্ত (মহীশূর), ফারুক খোদাইজি মহারাষ্ট্র) এবং জি জগন্নাথ (রেলওয়ে) গেছেন মুনিকে বিশ্ব টেবিলটেনিস প্রতিযোগিতায় খেলতে। মতিরিক্ত তালিকায় আছেন মহীশূরের বি শৈকুমার। দলগত প্রতিযোগিতায় ভারত 'এ' গ্রুপে। সখানে আরও তিনটি দেশ—পর্তুগাল, মরোক্কো ও হাঙ্গেরি।

াঁতার

২৩ মাইল ব্যাপী সিংহলের তালাইমানার থেকে ধনুস্কোটি পর্যন্ত পকপ্রণালী সাঁতার প্রতিযোগিতায় 'ত বছরের ন্যায় এবছরও রেলওয়ের ২৪ বছর বয়সী বৈদ্যনাথ নাথ প্রথম হয়েছেন। সময় লেগেছে ১৫ ণ্টা ২ মিনিট। গতবছর লেগেছিল তাঁর ১৪ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল নিয়ে গুগোল হয়। নিয়মমাফিক পথে সাঁতার শেষ না করার জন্যে দ্বিতায় স্থান অধিকারী রেলওয়ের াপর সাঁতারু গতবারেরও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী লক্ষ্মীকান্ত ভৌমিক এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী াম্বাইয়ের আর পি মার্চেন্টের দাবী নাকচ করা হয়। ফলে দ্বিতীয় হয়েছেন ত্রিপুরার এক পল্লীর

ছেলে প্রতিযোগিতায় বয়েসে সর্বকনিষ্ঠ রতিরঞ্জন ধর এবং তৃতীয় বিবেচিত হয়েছেন সিংহলের মানায়াকারা।

ফুটবল

ব্যাংককে এশিয়ান ইউথ ফুটবলে এবছর ভারতের যোগ দেওয়া হবে না। কারণ, ভারত সরকার বিদেশী মুদ্রা দিতে নারাজ। এদিকে টেনিস ও টেবিলটেনিসের বেলায় বিদেশীমুদ্রার ঘাটতি দেখতে পাওয়া যায় না। ভারতের জনসাধারণের সবচেয়ে প্রিয় খেলার প্রতি সরকারের এত বীতরাগ কেন তা বুঝতে পারলাম না।

ব্যাঙ্গালোরে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা ফাইনালে ১-০ গোলে মহীশূরের কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। বাংলার অনেক মহারথীরা না গেলেও খেলা হয়েছে খুব ভালো।

এবছর মহীশূরের মাদ্রাজের বিরুদ্ধে ফাইনালে ওঠাও ন্যায়সঙ্গত মনে হয় না। প্রথমদিন মাদ্রাজ ৩-২ গোলে মহীশূরকে হারায়, দ্বিতীয় দিন মাদ্রাজ হারে ১-০ গোলে। গোল অ্যাভারেজ দুজনেরই সমান। সুতরাং টস করা হয়। এই টস করে মহীশূর ক্যাপটেন। মাটিতে মুদ্রা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে ওঠেন তাঁরা জিতেছেন বলে এবং চটপট মুদ্রাটি কুড়িয়ে নেন। ওই সময়টুকুর মধ্যে দু'চারজন যারা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের মতে জয়ী মাদ্রাজই। মহীশূর অধিনায়কের চীৎকার বাইরে জনতার কানে যায়। তারা তখন উল্লাসে ক্ষিপ্ত। টসে বিরোধ শুনে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে স্লোগান দিতে দিতে কর্মকর্তাদের তাড়া করে। জনতার চাপে পড়ে মাদ্রাজের দাবী বাতিল হয়। আবার সেমি ফাইনাল খেলার কথা ওঠে কিন্তু মাদ্রাজ নাম প্রত্যাহার করে নেয়।

গত কবছর ধরেই মহীশূর ও বাংলা সন্তোষ ট্রফিতে ফাইনাল খেলছে। ৭ বারের ফাইনালে মহীশূরের জয় ৪ বার, বাংলার ৩ বার। কিন্তু বাংলার রেকর্ডের সঙ্গে কেউ এখনও সমকক্ষ হতে পারে নি। ১৯৪১ সালে জাতীয় ফুটবলের শুরু। তিনবার শুধু খেলা হয় নি। ২৫ বার অনুষ্ঠানের মধ্যে বাংলা বিজয়ী ১১ বার, রানার্স ৮ বার। এবারও বাংলা ট্রফি নিয়ে ঘরে ফিরতে পারত কিন্তু বাংলার ফরোয়ার্ডরা আক্রমণ রচনা করতে গেলেই লাইনসম্যান অফসাইড ঘোষণায় তৎপর হয়েছেন মনে হয়। এবং মহীশূরের ফরোয়ার্ডরা অফসাইডে থেকেও রেফারির প্রশ্রয় পেয়েছেন অতিরিক্ত।

স্ট্যামিনার অভাব

কিছুদিন আগে 'ফিফা' রেফারিজ কমিটির সদস্য ফুটবল আইন বিশারদ মালয়েশিয়ার কো ই টেক ভারতে ঘুরে গেলেন। তিনি বলে গেছেন, ভারতে যে পরিমাণ সম্ভাবনাপূর্ণ খেলোয়াড় আছে এবং এই বিরাট দেশে ফুটবলের যতখানি জনপ্রিয়তা তাতে একটু আন্তরিকতা নিয়ে চেষ্টা করলে অবশ্যই মান বাড়তে পারে। অনেক খেলোয়াড়ই উন্নত কলাচাতুর্যের অধিকারী। কেউ কেউ নৈপুণ্যে পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়দের কাছাকাছি যেতে পারে। কিন্তু প্রায় সব খেলোয়াড়দের মধ্যে স্ট্যামিনার অভাব! শারীরিক পটুতার দিক দিয়ে অনেক ঘাটতি। সম্ভবতঃ বহু খেলোয়াড় নিরামিষভোজী এবং স্ট্যামিনার পক্ষে সেটা বড়ো অন্তরায়। আমিষভোজী না হলে এবং খুব পুষ্টিকর খাদ্য না খেলে স্ট্যামিনা বাড়ানো শক্ত।

এক

ওরা একটু আগে থেকেই স্টেশনে এসে বসেছিল। অরু, মিতু, মা আর মামা। চিত্তকাকাও স্টেশনে এসেছিলেন। জিনিসপত্র ছিল মোটামুটি মন্দ না। মামার একার পক্ষে সবদিক সামলানো সম্ভব ছিল না। আর মা তো কদিন থেকে কেঁদেই যাচ্ছেন।

গত রাত্রি থেকেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিল। সকালে ছেড়ে গিয়েছে। পথঘাট কাদাময়। গরুর গাড়ির চাকা কাদায় বসে যাচ্ছিল। লম্বা একটা খাল কেটে গরুর গাড়িটা যাচ্ছিল একটানা ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করতে করতে। মিতু একমনে দেখছিল কেমন করে চাকার গর্ত আবার জলে ভরে যাচ্ছিল।

ছোটদা অরুর তো অন্যদিকে হুঁসই ছিল না। কাল রাত্তিরে ও বোধহয় ঘুমোয়ইনি। শুধু কলকাতার কথা। সারারাত ছটফট করেছে।

ও কলকাতায় দু'একবার গিয়েছে। মিতু একবারও যায়নি। বাবা মারা যাওয়ার পরে মা আর কোথাও যেতেন না। মামার বাড়িতেও না। মামা মাঝে মাঝে আসতেন।

ছোটদার কলকাতার গল্প শুনতে শুনতে মিতু এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘরের পাশের শিউলি গাছটা থেকে সারারাত টপ্‌টপ্‌ করে জল ঝরছিল।

সকালে হরিনাথ বোষ্টমের গান শুনে যখন তার ঘুম ভাঙল দেখে তার অনেক আগেই অরু উঠে পড়েছে। অন্যদিন হরিনাথ বোষ্টমের গানের সংগে সংগে সেও ভেঙিয়ে গান ধরত, 'কচি কচি খাসি খেতে ভালোবাসি, পয়সা নেই তো করব কি'। এর জন্যে মার কাছে কি কম বকুনি খেয়েছে!

আজ তার ওসব খেয়ালই নেই।

'সব রেডি তো? সিগনাল দিয়েছে।' মামার গলায় মিতুর চমক ভাঙলো। মা চোখে কাপড় ঘসছেন।

মিতু বুঝতে পারে মা কেন কাঁদছেন। সোনাপোতার বাড়ি আজ তাদের ছেড়ে দিতে হচ্ছে। মা তো প্রথমে কিছুতে রাজী হচ্ছিলেন না বাবা পাকিস্তান থেকে আসার পরেই এখানে বাসা

করেছিলেন। ঈশ্বরদির আরো অনেকে—যেমন চিন্তকাকা, পরেশবাবু ওরা সব এখানে উঠেছিলেন। তখন মা নাকি এখানে থাকতে রাজী হন নি। কলকাতার কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিলেন। সে আজ কতবছর আগের কথা।

বাবার কথা মিতুর বেশ ভালোই মনে পড়ে।

কলকাতা থেকে বাবা যখন আসতেন, সংগে সব সময়ই তার আর ছোটদার জন্যে কিছু না কিছু আনতেন। কিন্তু প্রথমে কিছুই বলতেন না। গম্ভীর হয়ে বসে থাকতেন। অরু ছটফট করত, কিন্তু মিতু চুপ করে বসে থাকত। সে জানত জিনিসটা তো সে পাবেই।

অবশেষে বাবা নিজেই হঠাৎ বলে উঠতেন, 'নাঃ এবার আর কিছু আনলাম না। ছাখ্ তো থলেটার মধ্যে যদি কিছু থেকে থাকে।'

অরু ছুটে যেত। বেরিয়ে পড়ত হয়ত তুটো রংচঙে গল্পের বই।

টুলুদের সংগে নদীর ধারে খেলতে গিয়ে সন্ধ্যে হয়ে যেত। আকাশের মেঘগুলো লাল হয়ে যেত—যেন এক একটা জাহাজ। মিতুর মনে হতো নদীর ওপার দিয়ে বাবা যেন তাড়াতাড়ি হেঁটে বাজার নিয়ে বাড়ি আসছেন। তার হঠাৎ মন কেমন করত। ছোটদা কোথা থেকে এসে বলত, 'চল্ মিতু, বাড়ি যাই।' বাড়ি গিয়েই ছোটদা কিছুক্ষণ মার কাছে ঘুরঘুর করত, যতক্ষণ না পড়তে বসার জন্যে বকুনি খেত।

বাবা কলকাতায় দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন।

বড়দার কথা মিতুর কমই মনে পড়ে। বড়দা যখন মারা যায় তখন মিতুর জ্ঞানই হয়নি বললে চলে। তবুও একটা ছবি মনে পড়ে। উঠোনের লেবুগাছের তলায় একটা বছর দশেকের ছেলে খালি গায়ে হাফপ্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে। সারা গা দিয়ে ঘাম ঝরছে।

বড়দার বইখাতা একটা বাক্সের মধ্যে এখনো আছে। মা তাদের খুলতে দেয় না। একদিন মাত্র দেখেছিল একটা হাতের লেখার খাতা। ওপরে আকাবাঁকা অক্ষরে লেখা—শ্রীঅমিত কুমার বসু কেলাস থিরি।

বিজয়ার দিন সে আর অরু বাবার সংগে নদীতে নৌকা চড়তে যেত। ঢাকে বাজত, ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন। অরু বলত, বাজছে—চল্ দুগ্গা জলে চল্। মা বলেন ওর ঠাকুর দেবতায় একেবারেই ভক্তি নেই।

তারা বাইচ্ খেলা দেখত। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যেত। মিতু অরুর ঘুম আসত। ঘোলা-জলে চাঁদের আলো পড়ে নদীটাকে রাস্তা রাস্তা মনে হ'ত। নৌকা থেকে মিতুর মনে হ'ত নদীর ধারে ঐ গাছটার তলায় বড়দা দাঁড়িয়ে আছে। ওকে ফেলে যেন ওরা চলে যাচ্ছে।

নদীর জল মাথায় ছিটিয়ে যখন তারা বাড়ি আসত বাবা তাদের তুজনের হাত ধরে গান গাইতেন। চারদিকে জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে। খুব ভালো লাগত মিতুর। একটু একটু মনে পড়ে গানটা—ফিরে চল আপন ঘরে।

—'মামা জানো—উ—ই যে দুরে কলের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে—ওটা পাকিস্থান। বাদল বলল।

—'তাই নাকি ? আমি ভেবেছিলাম পাকিস্থান একটা জায়গার নাম।'

—'ধ্যেৎ, আমি বলছি, ওটা পাকিস্থানে।'

অরু আর মামার কথোপকথনে মিতু ফিরে তাকাল। ওপাশে মা চিত্তকাকার সংগে কি কথা বলছেন! আরো কয়েকজন এসেছে স্টেসন পর্যন্ত। হরিবোষ্টমকেও দেখতে পেল। বিকাশ, ইফতিকার এদের সংগে অরু হাতপা নেড়ে কথা বলছে। কলকাতার কথা।

মিতু যেন বারবারই টুকনির গলা শুনছে। চিত্তকাকার মেয়ে টুকনি। আজ সারা সকাল মিতুর সংগে সংগে ঘুরেছে। মিতুকে ডাকে 'মিমুদি'।

ওরা গাড়িতে উঠল। গাড়িতে অরুর কথার বিরাম ছিল না। 'দ্যাখ্ দ্যাখ্ মিতু, মনে হচ্ছে মাঠটা ঘুরছে। ওই দ্যাখ্ তারাটা কেমন নেমে যাচ্ছে, আবার মাঠের ধাক্কা খেয়ে উঠে যাচ্ছে।'

মামা একমনে কি একটা বই পড়ছিলেন।

হঠাৎ অরু কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা বাবা কলকাতায় কোথায় থাকতো ?'

মিতুর কান্না কান্না পাচ্ছিল। গাড়ির চাকায় বাজছিল তারা যেখানে নামবে সেই স্টেশনের নাম—দমদম জংসন। আবার যেন মাঝে মাঝে বলছে— সোনাপোতা কলকাতা—সোনাপোতা কলকাতা। মিতুর মনে হচ্ছিল।

দুই

সিঁথির বাড়িতে এসে অরুমিতু দুজনেরই মন খারাপ হয়ে গেল। সোনাপোতার মতো খোলা বাড়ি নয়, দেড়খানা ঘর। উঠোন নেই, বাগান নেই। বাড়ির পাশেই একটা সবুজ কচুরীপানাভর্তি মজা ঝিল। মিতুর স্বাস্থ্য বইএ একটা ছবি আছে—অপরিচ্ছন্ন পুষ্করিণী। এই ঝিলটা দেখলে সেই ছবিটার কথা মনে পড়ে।

অরু বলল, 'ধুৎ, এটা আসল কলকাতা না। সেটা তোকে একদিন দেখিয়ে আনব।

মামার বাড়ি কাছেই। মামীমা এসেছেন। মামাতো বোন সুমিতাদিও এসেছে। সে যে কেন এসেছে মিতু জানে না। তখন থেকে বই হাতে করে পড়ছে তো পড়ছেই। কিছুক্ষণ পরে দীপকদা এল। কলেজে পড়ে। কয়েকবার সোনাপোতায় গিয়েছিল। নিজেকে যেন কি ভাবে। কথা বলার সময় মাঝে মাঝে মুখের এক কোন কানের কাছে টেনে নিয়ে যায়। ওটা নাকি কোন ইংরাজী সিনেমায় দেখেছিল। মোটের ওপর দীপুদাকে খারাপ লাগে না। অরু তো ওর শিষ্য। দীপুদার কাছে থেকে টিকিট জমানো শিখেছে। দীপুদার সব 'ডাঁট' তাদের কাছে। মামা এলেই শান্ত ছেলেটি।

অমিতাদি বেহালায় শ্বশুরবাড়িতে আছে। ও আসে নি।

আর একজন বাড়িঘর গোছগাছ করে দিলেন। পাশের বাড়ির সীতামাসী। মাকে তিনি প্রথম দিনেই 'তুমি তুমি' বলে আপন করে নিলেন। স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। মা তাঁকে পেয়ে খুব খুসি। অরুমিতুর স্কুলে ভর্তি করার বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন। মার মনটা অনেক হাল্কা হয়েছে বলে মনে হলো।

সীতামাসীও বিধবা। মাকে বললেন, 'আমিও একসময় ভেঙে পড়েছিলাম। কিন্তু অন্তর জন্যে শক্ত হতে হল। তোমাকেও শক্ত হতে হবে ভাই। এরা মানুষ হলে সেটাই হবে তোমার সবচেয়ে বড় জয়, সার্থকতা।'

অরু দীপুদাকে বলল, 'দীপুদা, এই জায়গা আমায় একটুও ভালো লাগছে না। ট্রাম নেই, দোতালা বাস নেই। শুধু নোংরা নর্দমা, পুকুর। তোমাদের পাইকপাড়া তো আসল কলকাতার মধ্যে—না?'

দীপুদা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা বেশ ভালো জায়গায় বাড়ি করেছেন। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখবি এখানে ওখানে সোনার খনি খুঁড়ে রাখা হয়েছে। আর বর্ষাকালে তো ভেনিস। খড় ভর্তি গগুোলাগুলো যেতে যেতে মাঝে মাঝে সোনার খনির মধ্যে চাকা ঢুকিয়ে উল্টে থাকে। খবরের কাগজে ছবি দেখিস নে?'

দীপুদার কথাই ওরকম।

রাত্তিরে মামার সংগেই গাড়ি করে মামীরা বাড়ি ফিরলেন। মামীমা বাড়ি থেকে সকলের জন্যে রাত্রের খাবার এনেছিলেন, তাই মাকে আর রাঁধতে হল না।

মামা বললেন, 'তুদিন ধরে কত রোগীর অভিশাপই যে কুড়োলাম। এবার গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

তারপর মাকে ডেকে চুপি চুপি বললেন, 'তুই তো আমার কাছ থেকে হাত পেতে কিছুতেই কিছু নিবি নে। যাহোক এই কটা নোট রেখে দে। নইলে তোর বাড়িতে ঢুকব না। কোনো প্রয়োজন হলেই আমাকে জানাবি। আর স্কুলের কাজটা আগামী মাসেই পেয়ে যাবি। সীতাদিও বললেন।'

সীতামাসী মামীমার সম্পর্কে দিদি হন। সেইজন্য মামাও তাঁকে সীতাদি বলে ডাকেন।

মা তাঁর দাদা বৌদিকে প্রণাম করলেন—সুমিতাদি বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। দীপুদাও ভালো মানুষের মতো তার পিসীমাকে প্রণাম করল। তারপরে ঘাড়টা বেঁকিয়ে বলল, 'গুড নাইট, আরু মিট্টু।'

সকলে হেসে উঠল। সীতামাসী ছাড়া সকলে বাড়ি ফিরল।

—তিন—

অরুমিতু তুজনেই স্কুলে ভর্তি হল। মিতু সীতামাসীর স্কুলেই। মাও ঐ স্কুলেই সেলাই শেখান। প্রথম দিনে মার ক্লাস করতে গিয়ে মিতুর হাসি আসছিল। কষ্টও হচ্ছিল। মার চিরকাল তুপুরে ঘুমোনো অভ্যেস। এখন থেকে সেটা আর হবে না।

মিতু ফ্রি হতে পেরেছিল।

অরু ভর্তি হয়েছিল দূরের একটা স্কুলে। বাসে করে যেতে হত।

আস্তে আস্তে নতুন জায়গাতে তারা খাপ খাইয়ে নিল। তুজনেরই বন্ধুবান্ধব হল। বুলু, ঝাঁপি এদের কাছ থেকে প্রথম প্রথম মিতুর চিঠি আসত। সেও লিখত। মার, অরুরও চিঠি আসত। পরে তাও কমতে কমতে একসময়ে প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

একদিন অরু রাত্তিরবেলা মিতুর কাছে এসে বলল, 'মিতু, জানিস আজ কোথায় গিয়েছিলাম ?' ও যেন কেমন করছিল।

মিতু জানত, কোথায় ছোটদা যেতে পারে। হয় পরেশনাথের মন্দির, না হয় কাছাকাছি অন্য কোথাও। দূরে গেলে মাকে বলে যেতে হয়। মিতুও মামার সংগে গিয়ে সব দেখেছে। চিড়িয়াখানা, যাদুঘর—স-ব।

মিতু বলল, 'কোথায় গিয়েছিলি ? খুব ঘুরতে শিখেছিস আজকাল। দীপুদার সঙ্গে এয়ারপোর্টে গিয়েছিলি তো ?'

অরু বলল, 'নারে। মাকে বলবি না তো ?' তারপরে নিচুস্বরে বলল, 'কাশীমিত্র ঘাট শ্মশান দেখলাম। বাবাকে তো ওখানেই নিয়ে গিয়েছিল জানিস, দেয়ালে কয়লা দিয়ে অনেক নাম লেখা আছে দেখলাম। বাবার নাম তো নেই ? বোধহয় মিলিয়ে গিয়েছে। অনেক বছর আগে কিনা।'

ছোটদার কথায় ঘরটা যেন থমথম করতে লাগল।

মা খেতে ডাকলে উঠে গেল। কিন্তু খেতে বসে গলার কাছটা ব্যথা করতে লাগল মিতুর।

শোওয়ার সময় মিতুর মনে হল কতদিন প্রার্থনা করা হয় নি। বিছানার ওপর বসে হাত জোড় করে মনে মনে প্রার্থনা করে সে শুয়ে পড়ল। অরুর দিকে তাকাতে দেখল সে শুয়ে শুয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছে। আলো পড়ে তার বড় বড় চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। ক্রমশঃ

মহাভারতের ঘুমপাড়ানি গান

স্বপন বুড়ো

[সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নানাজাতীয় ঘুমপাড়ানি গান মায়েদের মুখে-মুখে ছড়িয়ে আছে। তারই কয়েকটি সংগ্রহ করে বাঙ্‌লা ছড়ায় রূপদান করা হয়েছে। সেই থেকে গোটা কয়েক ছড়া পরিবেশন করা হল]

[বাঙলা]

খোকা ঘুমুলো পাড়া জুড়োলো
বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজ্‌না দেবো কিসে ?
এসো মাসি এসো পিসি
ঘুম দিয়ে যাও
বাটা ভরা দেবো পান
গাল পুরে খাও ॥

[বিহার]

ডিম পেড়ে যাওরে পাখি
খেল্‌বে খোকনমণি,
ডিমগুলিতে গন্ধ হলে
মন্দ বলে গনি !
প্রত্যহ তাই পাখি এসো—
ডিম পেড়ে ভাই ভালই বেসো—
টুকরি করে রুটি দেবো—
আদর দেবো ধনি—
পাখি তুমি ডিম পেড়ে যাও
খেল্‌বে খোকনমণি ॥

[দক্ষিণ ভারত]

(তামিল)

তুমি মোর পুতুলি গো—নয়নাভিরাম !
রাণী কৌশল্যার—পুত্র শ্রীরাম।
লঙ্কার দশ-মাথা—রাজা রাবণে—
নিধন করিলে রাম তুমি ত' রণে !

*

যে চাঁদে লুকিয়ে আছে সোনার হরিণ
শ্রীরঙ্গম আলো করে তাই রাত দিন !
প্রাচীরেতে ঘেরা এই সেরা শহরে
নয়নের মণি তুমি, জানে কি পরে ?

*

এ জীবনে তুমি মোর অমৃত ধারা
স্বপনের নিধি তুমি—হয়ো না হারা !
তোমার অলকে শোভে মল্লিকা ফুল
কৌশল্যার দান,—নাই তার তুল !
তুমি যে আমার কোলে এসেছ ফিরে—
প্রজা সৃষ্টির তরে—নতুন তীরে।

*

মরি মরি সৃজিলে গো তুমি কমলে—
ব্রহ্মারে বসাইলে তাহারই দলে !
জনকের মনোহর তুমি জামাতা—
দশরথ-নিধি তুমি ত্রিলোক ত্রাতা !
মৈথিলী স্বামী তুমি—ভগবান রাম
ঘুম যাও বাছা মোর, হয়ো নাকো বাম।

[আসাম]

নীল বরণের অসীম সাগর থেকে
সাগর সেঁচে মুক্তো দেবো আনি—
সোনা আমার খেল্‌বে ভোরের রোদে
মিষ্টি হেসে মায়ের আঁচল টানি।
সন্ধ্যে বেলায় সূর্যি যখন ডোবে
শ্বেত শয্যায় খোকন আমার ঘুমোয়
স্বপনপরী চাঁদের স্বপন এনে
সোনার দু' চোখ ভরিয়ে দেবো চুমোয়।
দিদিমা যে গীত শোনাবে কত
সেই আবেশে আসবে সোনার ঘুম
বুড়ী দিদি নয়ন জলে ভিজে
সোনার ঠোঁটে খাবে মধুর চুম ॥

[উড়িষ্যা]

ওরে দুখী জন দরিদ্র রতন
শুয়ে থাকো সোনামণি,
কাননের মাঝে ভূত জেগে আছে
তারে যে আপদ গণি!
শিখে লেখাপড়া টাকা পাবে ঘড়া
পালঙ্কে রবে শুয়ে
কত দাস দাসী সেবিবে যে আসি
দেবো জুতো পা'টা ধুয়ে ॥

॥ কপাল খারাপ ॥

অতীন মজুমদার

করিস্ কি বিশ্বাস, পরীক্ষাটায় পাশ করাটারে ভাগ্যের খেল্?
নইলেরে কেন শুধু একটুর জন্যেই বারে বারে হচ্ছিস্ 'ফেল্'!
গেলবারে অঙ্কেতে পেলি তুই শুধু তিন, এবারেতে শূন্য পেলি,
পর পর দু'বছরই 'ফেল্' ক'রে ওরে ভজা একই ক্লাসে রয়ে যে গেলি!
মাত্র তিরিশ পেলে অঙ্কেতে পাশ তোরে,—এ এমন বেশী কিছু নয়রে,
তিনের পিঠেতে শুধু শূন্যটা থাক্‌লেই তিরিশ তো তাতে বাপু হয়রে!
গেলবারে অঙ্কেতে পেয়েছিলি শুধু তিন,—শূন্যটা যদি পাশে থাকতো,
সাধ্য কি ওরে ভজা 'ফেল্' বলে একই ক্লাসে সে বছরই তোকে
ধরে রাখতো!
না পাওয়া সে শূন্যটা এ-বছর পেয়ে গেলি, তফাৎটা হল বাপু এই যে—
এ-বছরে সেবারের পাওয়া সেই তিনটাই শূন্যের আগে শুধু নেই যে!
তিরিশের তিন আর শূন্য—দুটোই পেলি, একসাথে পেসিনা যা' দুঃখু,
এম্নিতে পাশ তুই —'ফেল্' তোকে বল্‌বে রে নেহাৎ বাপু যে গো-মুখ্যু!
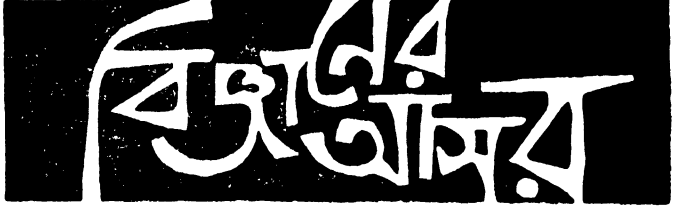
পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

হাজার বছর ধরে দেশ বিদেশের পুরাণে প্রবাদে কাব্যে লোকগাথায় চাঁদের কত ছবি ফুটে উঠেছে ! বাংলা দেশের কত ছড়ায় কবিতায়ও তো চাঁদের ছড়াছড়ি। এদেশের অসংখ্য ছড়ায় ও কবিতায় চাঁদের যে শুভ নমনীয় ছবি আঁকা রয়েছে, তা কি কেউ কখনও ভুলতে পারে !

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ,
এমন সময় মাগো আমার কাজলা-দিদি কৈ ?

খোকার কাছে চাঁদ কখনও চাঁদমামা, কখনও খরগোশ কোলে শশাঙ্ক। আবার কখনও সে কল্পনা করে যে, চরকা-বুড়ি একটা গাছের তলায় বসে চরকায় সুতো কাটছে ঘ্যানর ঘ্যানর ক'রে।

আবার পূর্ণিমার রাতে যখন চাঁদের হাসির বাঁধ ভাঙে, পৃথিবীর মাঠ-ঘাট বন-উপবন সব চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় ছেয়ে যায়, চারিদিক এক মোহময় মাদকতায় ভরে ওঠে, মন তখন উধাও হয়ে যায় কোথায় কোন এক স্বপ্নরাজ্যে !

এবারের বড়দিনের সবচেয়ে বড় খবর, মানুষ চন্দ্র জয় করেছে, মহাকাশে গিয়ে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেছে, তারপর নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছে মাটির পৃথিবীতে।

১৯৬৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর। সূর্যকে সাক্ষী রেখে চাঁদকে সাত পাকে বাঁধবে ব'লে, তিনটি মানব-সন্তান যাত্রা করল পৃথিবী ছাড়িয়ে সেই চিরন্তন স্বপ্নের রাজ্যে। দুঃসাহসী এই তিন মহাকাশচারীর নাম ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান (কম্যাণ্ডার), জেম্‌স এ লোভেল এবং উইলিয়ম এ. অ্যাণ্ডার্স।

শনিবার ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিনিটে আমেরিকার কেপ কেনেডি থেকে অ্যাপোলো-৮ মহাকাশ যানের বিশাল রকেট পৃথিবীর মাটি ছেড়ে উঠল। রকেটের পাঁচটি এফ-১ ইঞ্জিন একসঙ্গে গর্জে উঠল এবং ৩৬০ ফুট দীর্ঘ রকেট ও মহাকাশ-যানকে (মোট ওজন ২৮ লক্ষ কিলোগ্রাম) এক ঠেলায় উঁচুতে তুলে দিল। তখন রকেট এবং মহাকাশ যানের গতিবেগে দাঁড়াল ঘণ্টায় ৬,০০০ মাইল। ইঞ্জিনগুলি চালু রইল মাত্র ২ মিনিট ৩৩ সেকেণ্ড আর প্রতিটি ইঞ্জিনে প্রতি সেকেণ্ডে জ্বালানী খরচ হল ১৩,০০০ লিটার কেরোসিন এবং তরল অক্সিজেনের মিশ্রণ। প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এই পাঁচটি ইঞ্জিন খসে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের ইঞ্জিন চালু হয়ে তাদের তুলে দিল আরো ৮০ মাইল উঁচুতে এবং তাতে গতিবেগ সঞ্চার করল ঘণ্টায় ১৩,৭৫০ মাইল। এজন্য পাঁচটি জে-২ ইঞ্জিনে ৬ মিনিটের মধ্যে ৫০০ টন তরল হাইড্রোজেন এবং তরল অক্সিজেনের মিশ্রণ জ্বালানীরূপে খরচ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করে দিল একটি মাত্র জে-২ ইঞ্জিন এবং সেই অ্যাপোলো-৮ কে পৃথিবীর ওপরে মহাকাশের কক্ষপথে পৌঁছে দিল। শুরু হ'ল পৃথিবী প্রদক্ষিণ। গতিবেগ তখন ঘণ্টায় ১৭,৪০০ মাইল। এইবার তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি নিভিয়ে দেওয়া হ'ল।

তাঁরা দু'বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন। এ সময়ের মধ্যেই তাঁরা যন্ত্রপাতিগুলি সব ভাল ক'রে নিলেন। সব কিছু ঠিকমত কাজ করায়, পৃথিবী থেকে যাত্রার প্রায় তিন ঘণ্টা পরে এবং ভারতীয় সময় রাত্রি ৯টা ১২ মিনিটে, পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে নির্দেশ গেল,—'এবার ছুটে চলো চাঁদের দিকে।'

পৃথিবীর অভিকর্ষ-বন্ধন ছিন্ন করতে হ'লে মহাকাশ-যানের গতিবেগ হওয়া দরকার ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল। তাই রকেটের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হ'ল চাঁদের দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় পর্যায়ের ইঞ্জিনটি চালু করে দেওয়া হ'ল। এর ফলে মহাকাশ-যানের গতিবেগ দাঁড়াল ঘণ্টায় ২৪,৮৫০ মাইল। কিছুক্ষণ পরেই রকেটের ইঞ্জিন নিভিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর থেকে মহাকাশ-যান তার নিজস্ব গতিতে ছুটে চলল চাঁদের দিকে।

দুঃসাহসী তিন মহাকাশচারী মহাকাশে তাঁদের পথ খুঁজে নিয়ে যাত্রা করলেন, জ্যোতিষ্কমণ্ডলের এক অজানা পথে, যে পথে এর আগে মানুষ কোনদিন পা বাড়ায় নি। তাঁদের লক্ষ্য, প্রায় ২ লক্ষ ৩৪ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত মোহময় চাঁদ, যে তাকে আবহমান কাল ধরে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

এইভাবে পৃথিবীর অভিকর্ষের বিরুদ্ধে তাঁরা যত এগিয়ে চললেন, মহাকাশ-যানের গতিবেগও তত কমতে লাগল চলতে চলতে সোমবার রাত্রে, ভারতীয় সময় ১টা ৫৯ মিনিটে, তাঁরা গিয়ে উপস্থিত হলেন এমন এক জায়গায় যেখানে পৃথিবীর অভিকর্ষের টান শেষ হয়েছে এবং চাঁদের অভিকর্ষের টান শুরু হয়েছে। তখন অ্যাপোলোর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২,২৩৩ মাইল, আর চাঁদ থেকে তার দূরত্ব ছিল ৩৫ হাজার মাইল।

এই স্থানটি অতিক্রম ক'রে যাওয়া মাত্রই চাঁদ যেন মহাকাশ-যানটিকে লুফে নিল। তখন থেকে চাঁদের আকর্ষণে প্রতিমুহূর্তেই অ্যাপোলোর গতিবেগ আবার বাড়তে লাগল।

এরপর, ভারতীয় সময় মঙ্গলবার বেলা ২টা ৪৫ মিনিটে পৃথিবী থেকে নির্দেশ গেল,—'চন্দ্র প্রদক্ষিণের জন্য প্রস্তুত হও।'

সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশ থেকে জবাব এল,—'প্রস্তুত আছি।'

চাঁদের অভিকর্ষের টানে মহাকাশ যানটি ধনুকের মতো বাঁকা একটি পথে এগিয়ে গেল চাঁদের সেইদিকে যেদিক মানুষ এর আগে আর কোনদিন দেখতে পায়নি। ৩টা ১৮ মিনিটে তাঁরা চাঁদের সেই অজ্ঞাত এবং অদৃষ্ট আকাশে গিয়ে হাজির হলেন। তখন তাঁদের সামনে অচেনা চাঁদ, আর পেছনে

ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত বিস্তার। পৃথিবীর চিরচেনা মুখখানাও আর দেখা যাচ্ছে না, পৃথিবীর সঙ্গে বেতার সংযোগও সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন। কারণ, তাঁদের সম্মুখে তখন চাঁদ দাঁড়িয়ে আছে এক অনতিক্রম্য বাধার মতো।

এই অবস্থায় মহাকাশচারীরা একটি বিপরতীমুখী রকেট (retro-rocket) চালিয়ে মহাকাশ যানের গতিবেগ কমিয়ে ঘণ্টায় ৩,৭০০ মাইলের মধ্যে নিয়ে এলেন। এই গতিবেগই মহাকাশ-যানকে চন্দ্রের কক্ষপথে স্থাপন করল। শুরু হ'ল চন্দ্র প্রদক্ষিণ।

এদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে দু'হাজারেরও বেশি বিজ্ঞানী দুরু দুরু কক্ষে শ্বাস রোধ ক'রে প্রতিমুহূর্ত গুণছেন। হয় মহাকাশচারীরা পাবেন অনন্ত গৌরব নয় তাঁরা চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবেন মহাকাশের অসীম অন্ধকারে।

ধীরে ধীরে কেটে গেল দুঃসহ ৩৭ মিনিট। তারপর ঠিক ৩টা ৫১ মিনিটে বেতার গ্রাহকে আবার ওদের গলা শোনা গেল। চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে করতে তাঁরা আবার চাঁদের এপিঠে চলে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কেপ কেনেডিতে উল্লাসের ঝড় বয়ে গেল। পৃথিবীর অগণিত মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল।

বেতার তরঙ্গে খবর এল, 'বেশ আছি, চমৎকার আছি।' ৪ মিনিটের একটু বেশি সময় রকেট ইঞ্জিনটি চালু রাখতে হয়েছিল। চাঁদের সব চাইতে কাছে যখন যাচ্ছি তখন দূরত্ব থাকছে ৬০·৫ মাইল, আর সবচাইতে দূরে যখন যাচ্ছি তখন ১৬৯ মাইল।'

এরপর আরো ১১ সেকেণ্ড ধরে রকেট ইঞ্জিন চালিয়ে ওঁরা মহাকাশ-যানের কক্ষপথ প্রায় বৃত্তাকার ক'রে নিলেন। তখন দূরত্ব দাঁড়াল যথাক্রমে ৬০·২ এবং ৬০·৮।

চন্দ্র প্রদক্ষিণকালে টেলিভিশনে ওঁরা পৃথিবীতে চাঁদের ছবি পাঠালেন। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে চাঁদকে দেখলেন এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত পাঁচটি স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করলেন।

এতকাল মানুষ চাঁদকে দেখেছে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার মাইল দূর থেকে, আর এখন লোভেল তাকে দেখলেন মাত্র ৬০ মাইল দূর থেকে। প্রথম দর্শনেই চাঁদকে তাঁর মনে হ'ল, প্লাস্টার অব প্যারিস অথবা ধূসর বালিরাশির মতো।

পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র থেকে প্রশ্ন করা হ'ল,—'আবহমানকালের চাঁদকে কেমন দেখছ?'

লোভেল জবাব দিলেন,—'চাঁদটা আসলে ধূসর, আর কোনো রঙ নেই। উর্বর সাগরকে পৃথিবী থেকে একরকম দেখায়, এখন দেখছি অন্য রকম। চন্দ্রপৃষ্ঠে আলো-আঁধারের যে সীমারেখা, তার দিকে যতই এগোচ্ছি বৈষম্যটা ততই ফুটে উঠছে।'

লোভেল আরো জানালেন,—'সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—খুঁটিনাটি পর্যন্ত।'

চাঁদের কলম্বস এবং গুটেনবার্গ এই গহ্বর দু'টি দেখে অ্যাণ্ডার্স বললেন,—'হুবহু দেখতে পাচ্ছি একেবারে স্পষ্ট।'

আর কম্যাণ্ডার বোরম্যান বললেন,—'কঠিন পাথরে তৈরি এখানকার দিগন্তরেখা। আকাশ পিচের মতো ঘন অন্ধকারে মোড়া। আর সূর্য? সে যেন ধবধবে সাদা একটি আলোর পিণ্ড। পায়ের নীচে ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছে কাসৃপার ও গিলবার্ট জ্বালামুখ দুটি। আর দূরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটি পর্বত-মালা, মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেই পাহাড়ের চূড়া ক্রমশঃ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের গায়ে থাবা মেরে মেরে পাথরের চাঁই সরিয়ে কারা যেন বড় বড় গর্ত তৈরি করে রেখেছে। ওরাই হল সেই সব জ্বালামুখ যাদের আমরা এতকাল দূরবীণ দিয়ে দেখেছি। আজ এই মূহূর্তে তারা সকলেই আমাদের চোখের সামনে।'

মহাকাশচারীরা চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেন মোট দশবার, প্রত্যেকবার সময় লাগে ২ ঘণ্টা করে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকবারই প্রায় ৪৫ মিনিট সময় তাঁরা থাকেন চাঁদের আড়ালে, আর সেই সময় তাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ থাকে নি।

চাঁদের আকাশে গিয়ে ওঁরা পৃথিবীকেও দেখলেন, কিন্তু এবারে দেখলেন প্রায় ২ লক্ষ ৩৪ হাজার মাইল দূর থেকে। সে এক নূতন চোখে দেখা! চাঁদকে আকাশে যেমন দেখা যায়, চাঁদের দেশে গিয়ে পৃথিবীকে দেখালো তার চেয়ে আরো অনেক বড় এবং সুন্দর। কারণ, পৃথিবীর ব্যাস চাঁদের ব্যাসের প্রায় ৪ গুণ। পৃথিবীর অর্ধেকটা সূর্যালোকে উদ্ভাসিত, বাকি অর্ধেক রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা। আলোকিত অংশে উজ্জ্বল সাদা মেঘ, বাদামী রঙের জমি, আর নীল সমুদ্র সহ স্পষ্ট দেখা গেল।

অ্যাপোলো ৮-এর জানালা দিয়ে ওঁরা ছবি তুললেন। নীচে চাঁদের জমি, আর দূরে আকাশে পৃথিবী। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

অভিযান শেষ, এখন ঘরে ফেরার পালা। চন্দ্রকে দশবার প্রদক্ষিণ করার পর মহাকাশচারীরা চন্দ্রের অভিকর্ষ বন্ধন ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় পর্যায়ের রকেট ইঞ্জিনটি আবার চালু করে দিলেন। তখন মহাকাশ যানটি ঘণ্টায় ৫,৫০০ মাইল বেগে ছুটল পৃথিবীর দিকে। তখন কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে মহাকাশচারীদের কোনো যোগাযোগ ছিল না, কারণ তখন মহাকাশ যানটি ছিল চাঁদের ওপাশে। বলা বাহুল্য, চাঁদের অভিকর্ষ-বন্ধন ছিন্ন করার পর্যায়টিও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইঞ্জিনটি ঠিকমত চালু না হলে, কিংবা তাতে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে, মহাকাশচারীদের জীবনে ঘনিয়ে আসত এক দারুণ দুর্বিপাক।

যাই হোক, ওঁরা নির্ভুল পথে এগিয়ে এসে এক সময় পৃথিবীর অভিকর্ষের এলাকায় প্রবেশ করলেন। তখন থেকে মহাকাশ যানের গতিবেগ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। অ্যাপোলো-৮ যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমায় এসে পৌঁছাল, তখন তার গতিবেগ দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় ২৪,৬৩০ মাইল। এই প্রচণ্ড গতিবেগ থাকায়, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সময়, অ্যাপোলো-৮ কে এমনভাবে পরিচালিত করা হল যাতে তাপ-প্রতিরোধক আবরণসহ মহাকাশ যানের চেপ্টা দিকটা থাকে পৃথিবীর দিকে। কী অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক কুশলতা! বাইরের উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ৩,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে, কিন্তু তখন কেবিনের ভিতরে উষ্ণতা রইল মাত্র ২১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে। মহাকাশচারীরা সবচেয়ে দ্রুতবেগে বায়ু-

মণ্ডলে প্রবেশ করার এবং সবচেয়ে বেশি উষ্ণতা সহ্য করে বেঁচে থাকার এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করলেন

এরপর তাঁদের ক্যাপসুলটি প্যারাসুটে ভর করে সুনির্দিষ্ট সময়ে (শুক্রবার ভারতীয় সময় রাত্রি ৯টা ২০ মিনিট), এবং হাওয়াই দ্বীপের কাছাকাছি প্রশান্ত মহাসাগরের এক সুনির্দিষ্ট জায়গায়, নির্বিঘ্নে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে একটি হেলিকপটার গিয়ে মহাকাশচারীদের তুলে নিয়ে এল কাছাকাছি অপেক্ষমান ইয়র্কটাউন জাহাজে।
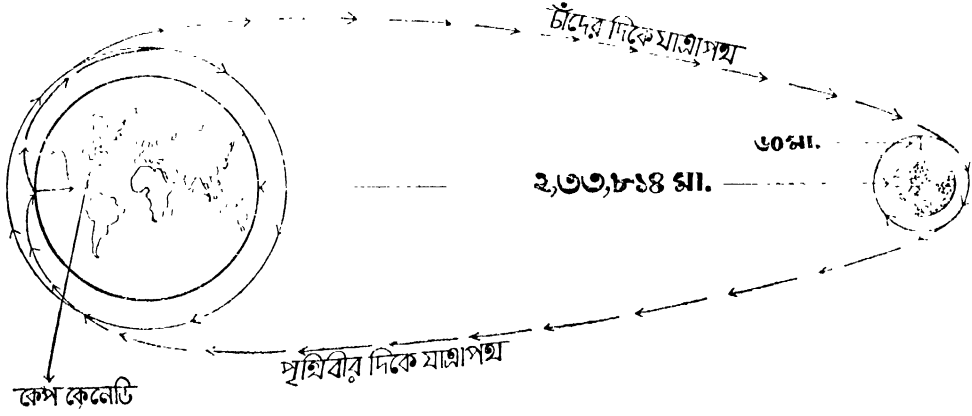
মহাকাশচারীরা সবসমেত ছ'দিন তিন ঘণ্টা সময় পৃথিবীর বাইরে ছিলেন। তাঁরা চাঁদের দিকে ভ্রমণ করেন ৬৯ ঘণ্টা, চন্দ্র প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ২০ ঘণ্টা আর পৃথিবীর দিকে ফিরে আসতে সময় লাগে ৫৮ ঘণ্টা। এই ১৪৭ ঘণ্টা সময়ে তাঁরা অতিক্রম করেছেন মোট ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার মাইল পথ। এতকাল এ ছিল মানুষের কল্পনারও বাইরে।

বোরম্যান, লোভেল এবং অ্যাণ্ডার্স, এঁরা হলেন এ যুগের তিন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিযাত্রী। এঁরাই প্রথম মানব-দল যাঁরা পৃথিবীর অভিকর্ষ-বন্ধন ছিন্ন ক'রে চলে গেছেন অন্য এক জ্যোতিষ্কের আকাশে সেই জ্যোতিষ্কের অভিকর্ষকে জড়িয়ে ধরে তাকে বার বার প্রদক্ষিণ করেছেন। চন্দ্রপৃষ্ঠের দূর-বিস্তৃত প্রান্তর, সুউচ্চ পর্বতমালা, আগ্নেয়গিরির গহ্বর, শব্দহীন চিরস্থির মহামরুর বীভৎসতা সবই তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন নিকট থেকে, বিজ্ঞানীর সন্ধানী দৃষ্টিতে। চন্দ্রের যে দিকটি মানুষ এর আগে আর কোন দিন দেখতে পায়নি, সেদিকও তাঁরা দেখেছেন। আর দেখেছেন, তাঁদের চিরচেনা পৃথিবীকে নতুন দৃষ্টি দিয়ে। তারপর একসময়, দুরন্ত দামাল ছেলেদের মতো, শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছেন জননী পৃথিবীর কোলে। তাইতো দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা মহাকাশের বীর কলম্বসদের জানিয়েছেন আন্তরিক অভিনন্দন। এদের অসাধারণ কৃতিত্বের কথা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে চিরকাল চিহ্নিত হয়ে থাকবে স্বর্ণাক্ষরে।

ইতিহাসের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর এবং দুঃসাহসী অভিযানের প্রথম অধ্যায় আজ সমাপ্ত। চাঁদ স্পর্শ করতে আর মাত্র ৭০ মাইল বাকি। মানুষের ইতিহাসে এ এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। অ্যাপোলো ৮ সত্যিই অঘটন ঘটিয়েছে। আর সেই সঙ্গে মানুষের সামনে উন্মোচিত ক'রে দিয়েছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাত্রার নব-দিগন্ত।

আমি কেন প্রকৃতি-পড়ুয়া

জীবন সর্দার

চাঁদ তারা সূর্যকে রোজ দেখে, রোজ জল হাওয়া পেয়ে ওতে আমরা এমন অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছি যে ভাবতেই পারিনা ওগুলো না থাকলে আমাদের কি হবে। এত সুন্দর নিয়মে চাঁদের আকার বাড়ে কমে, সূর্য ওঠে আর অস্ত যায়, হাওয়া বয়, জোয়ার ভাঁটা খেলে নদীতে সাগরে, ওসব কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা সামান্য চেষ্টা করেই বলে দিতে পারি—কখন চাঁদ সূর্য উঠবে নাববে, জোয়ার ভাঁটা আসবে যাবে, কখন আসবে শীত উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়ার সাথে কিংবা জলভরা মেঘ নিয়ে আসবে মৌসুমী বাতাস।

ধর, একদিন হাওয়া বওয়া বন্ধ হল। সাগরের উপর থেকে রোদের তাপে জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে স্থির মেঘ হয়ে রইল। মেঘের বিন্দু বিন্দু জলকণা একটির সাথে অন্যটি মিশে মিশে বড় হয়ে ভারি হয়ে আকাশে ভাসতে না পেরে ফের নেবে আসবে সাগরে। এমনি করে বারবার একই ঘটনা ঘটবে সবখানে—যেখান যেখান থেকে রোদের তাপে বাষ্প দেখা দেবে। হাওয়ার চলাচল নেই, মেঘ নড়বে না। বৃষ্টি নেই তাই শুকিয়ে যাবে খেতের ফসল, বনের গাছ মাঠের ঘাস। আমি ভাবতে পারছি না আর কি হবে। শেষে হয়ত চাঁদের পিঠের মত হবে পৃথিবী। সেখানেও ত' হাওয়া নেই শুনেছি।

এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কোনদিন ঘটবে কিনা আজকে হিসেব করেও সত্যিসত্যি কেউ বলতে পারবে না। এ শুধু কল্পনা। কিন্তু চারপাশে ঘুরে ফিরে দেখে একটি কথা বারবার মনে হচ্ছে—আমরা মানুষেরা নিজের সুখের জন্য পৃথিবীর মাটি খুঁড়ে বন কেটে নদী বেঁধে শেষে এখন এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, যখন ভাবতে হচ্ছে আর এগুলে 'সভ্যতা' বাঁচবে তো। মজার কথা! আমরা সভ্য কেননা আমরা বন সাফ করে শহর বসাতে পারি, বাঁধ দিতে পারি নদীতে। ডানা নেই তবুও পাড়ি দিতে পারি দিগ্‌দিগন্তে। আমরা পরমাণু বিদ্যুৎ বাষ্পকে বশ করেছি, জয় করেছি রোগভয় কিছুটা। আমাদের পেটের জন্য ফসল যতটা দরকার ততখানি ফলাতে পারলে আর পরোয়া কিসের। তবুও সব কিছুর জন্য শেষ পর্যন্ত কিন্তু প্রকৃতির উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে।

কেননা যেবার বৃষ্টি হল না, আর যেবার বানে ভেসে গেল—দুবারই আমরা কি অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। আরো দেখ, মরুভূমি গুটি গুটি এগিয়ে আসছে রুখতে পারছি না তাকে। রোগের সাথে লড়াই করে তার প্রতিষেধক বের করছে মানুষ, কিন্তু মনের আতংক উৎকণ্ঠা রয়েই গেছে মনে। আতংক আরও বেশি এই কারণে যে মানুষ মানুষের জন্য যা করছে তা দেখে আর ভরসা হয়না।

আমি এতদিন সবদিক ঘুরে বেরিয়ে দেখে এসে 'প্রকৃতি-পড়ুয়া' হবো বলে ঠিক করেছি। কেননা এটি শুধু সময় কাটাবার সখ নয়—যদিও অনেকে সখ করেই বাগান করে, পশুপাখি পোষে, ঝিনুক

কুড়োয়, প্রজাপতি ধরে বা পাখি দেখে। অনেকের সখ পেশা হয়ে গেছে পরে আর বৈজ্ঞানিকেরা অনেক সময় অনেক কাজের খবর পেয়েছেন তাদের কাছ থেকে। সব থেকে বড় কথা, প্রকৃতি আর মানুষ যে একে অন্যের উপর নির্ভর করে আছে এ কথাটি জানার সুযোগ হবে প্রকৃতি-পড়ুয়া হলে।

আমরা যেমন আমাদের দেহের খবরাখবর রাখব, তেমনি, গাছপালা মাছ পোকা পাখি আর পশুদের হাবভাবের খবরাখবর রাখারও চেষ্টা করব। যে প্রকৃতি পড়ুয়া নয়, সে, ধান খেয়েছে বলে বুলবুলিকে দোষ দেয়। বোঝেনা যে গাছে গাছে পোকা খেয়ে সেই পাখিই ক্ষতি টুকু পুষিয়ে দেয়। যে প্রকৃতি পড়ুয়া নয় সে হয়ত দোয়েলের শিষ শুনে আনন্দ পাবে, ফুলের বুকে প্রজাপতি দেখে খুশি হবে, অবাক হয়ে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়া ঝর্ণার দিকে তাকিয়ে থাকবে, কিন্তু বুঝবে কী ওরা সব প্রকৃতিকে ভরে তুলে প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সফল করছে।

আমরা আধুনিক মানুষেরা দিনের পর দিন কাজে সাজে বলাচলা থাকায় প্রকৃতির কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। অথচ আমরা প্রকৃতিতে মোটেই আলাদা একটা কিছু নই। অংশ মাত্র।

প্রকৃতিতে নিজেদের আলাদা ভাবছি বলেই, সেই আতংক আমাদের মনে এসে উঁকি দিচ্ছে— সভ্যতা রাখার জন্য যেহারে আমরা প্রকৃতিকে নষ্ট করছি, এ ভাবে চললে, সভ্যতা কেন মানুষই শেষে লোপ পাবে না তো! আশার কথা—প্রকৃতিকে মুগ্ধ হয়ে একবার দেখেই তার রূপগুণের কারণ বুঝতে না পারি, তাকে নষ্ট না করে কাজে লাগাবার সংকেত খুঁজতে তো পারব প্রকৃতি পড়ুয়া হলে।

ঠিক করেছি আমি প্রকৃতি পড়ুয়া হবো।

সন্দেশ।
প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর।
জীবন সর্দার
আমি তোমার সাথে একমত।
ঠিক করেছি আমি প্রকৃতি পড়ুয়া হবো। ইতি—

এইভাবে চিঠি লেখ আমাকে, আমি তোমাকে প্রকৃতি-পড়ুয়া করে নেব।

নতুন পড়ুয়া: প্রপ ১৪১—পবিত্রকুমার বসু, অঞ্জনগড়, নদীয়া।
প্রপ ১৪২—মৃদুল দাশগুপ্ত; শ্রীরামপুর, হুগলী।
প্রপ ১৪৩—অমিতাভ পাল; বৈষ্ণবচক, মেদিনীপুর।
প্রপ ১৪৪—গৌতম মুখার্জী; বালিগঞ্জ, কলকাতা।
প্রপ ১৪৫—মনামী রায়, প্রপ ১৪৬—অনামী রায়; সওয়াই মাধোপুর, রাজস্থান
প্রপ ১৪৭—প্রশান্তকুমার রায়চৌধুরী; বেলঘরিয়া, কলকাতা।
প্রপ ১৪৮—রণদীশ চৌধুরী; বালিগঞ্জ, কলকাতা।

প্রকৃতি পড়ুয়ার প্রশ্ন ঃ

সওয়াই মাধোপুর, রাজস্থান থেকে মনামী ও অনামী রায় লিখেছে ঃ এখানে একরকম পাখি দেখতে পাই, গরম কালে বেশি আসে। অনেকটা গাংচিলের মত দেখতে। গায়ের মাঝখানটা শাদা, তুই পাশ খয়েরী। উচু গলা। লম্বা ঠোঁট গাঢ় রং এর। পা হুটো হালকা হলদে রংএর। গলার রং কালো, মাথাটাও কালো। ডানাত্নটো খুললে বেশ লম্বা, ভিতর দিকটা কিছুটা কালো কিছুটা সাদা। মোটের উপর পাখিটি সুন্দর। মাটি থেকে পোকামাকড় খুঁটে খায়। মাটিতেই থাকে, উঁচু জায়গায় বসে কম। ভীষণ জোরে 'টি-টি হোক' করে ডাকে। বর্ষাকালেই বেশি জোরে ডাকে। কি নাম পাখিটির ?

উত্তর : পাখিটির ডাকের সাথেই ওর নামের মিল। আরো ভাল করে লক্ষ্য করে দেখ ওদের ঠোঁট আর চোখের মাঝে হলুদ কিংবা লাল চামড়া একটু বেরিয়ে আছে কিনা। যে পাখিকে আমরা টিট্টীভ বলি রাজস্থানের ভাষায় তাকে কি বলে ?

পাখির পরিচয় ঃ রামগাংরা

(ছবি—শর্মিলা রায়)

একনজরে চড়াই পাখির মাপের সাদাকালো একটি পাখি। মাথা, ঠোঁট, গলা বুক লেজ চকচকে কালো। গলা থেকে কালো মোটা একটি রেখা তলপেট অবধি নেমেছে। গাল হুটো সাদা। পিঠ নীলচে ছাই ছাই। ডানায় সাদা রেখা। উত্তরবঙ্গে আর পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমের পাহাড় জঙ্গল গুলোতে বেশি দেখা মেলে। পোকা-মাকড় আর ছোট ফল খায়। কাঠ বাদামের মত কিছু পেলে এক পায়ে ফলটি চেপে ধরে ঠোঁট দিয়ে এমন ঠোকে শব্দ শুনে মনে হয় বুঝি কাঠ ঠোকরা ঠোকরাচ্ছে। খাবার খোঁজার ভঙ্গি চমৎকার। পাতার তলা, ডালের জোড় বাকলের নীচে, ডাল ধরে ঝুঁকে উবু হয়ে অসম্ভব কায়দায় খাবার খুঁজতে দেখেছি। বাগানের ক্ষতিকারক এমন পোকা খেয়ে খেয়ে আমাদের উপকার করে। গাছের ছোট্ট ফোঁকরে বা মাটির গর্তে শীতের সময় বাদে যে কোন সময় বাসা বানায়। ভেতরে ঘাস শেওলা ঝরা পালক এসব দিয়ে গদি বানায়। গোটা ছয়েক গোলাপী সাদার উপর খয়েরী ছিট্ ছিট্ ডিম দেখতে পাব তখন। পাখিগুলো খুব ছটফটে ! ছেলে পাখিগুলো ই-চি-চি ইচিচি করে চড়া সুরে শিষ দিয়ে ডাকে সঙ্গীকে।

[আলেখ্য]

প্রথম দৃশ্য

ঘোষণা : ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ। স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক বেশে শ্রীনগর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পদব্রজে ভারতভূমি পরিক্রমা করছেন। ঘুরতে ঘুরতে স্বামীজী এসেছেন বৃন্দাবনে।

মঞ্চের পর্দা উঠলো।

পথের দৃশ্য। মাঠ, গ্রাম পার হয়ে পথ চলে গেল বনভূমিতে, হারিয়ে গেছে পাহাড়ের কোলে। পথের পাশে এক গাছতলায় একটি লোক বসে তামাক খাচ্ছে।

পরিব্রাজক বেশে স্বামীজী প্রবেশ করলেন। লোকটির তামাক খাওয়া দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

স্বামীজী। অনেক দিন তামাক খাইনি, এক কল্‌কে তামাক খেয়ে যাই।

[লোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে] ভাই, তোমার হুঁকোটা একবার দাও তো আমি একটু তামাক খাব।

লোকটি। ঠাকুর, আমি ছোট জাত।

স্বামীজী। ছোট জাত!

লোকটি। হ্যাঁ, ঠাকুর, আমি অচ্ছ্যুৎ।

স্বামীজী। অচ্ছ্যুৎ! তুমি কোন্ জাত?

লোকটি। আমি মেথর।

স্বামীজী। তুমি মেথর !

লোকটি। হ্যাঁ ঠাকুর, আপনাকে এই হুঁকো দিলে আমার পাপ হবে।

স্বামীজী। মেথর ! মেথরের হুঁকো ! তাহলে তো তামাক খাওয়া হল না। থাক্ গে—

[লোকটিকে পাশ কাটিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন।]

অন্তরীক্ষে। তুমি তো সন্ন্যাসী। সমাজ ও সংসার ত্যাগ করেছ। তোমার কাছে ছোটজাত বড়জাত কি ? সন্ন্যাসীর কাছে জাতিকুলের বিচার কেন ? তোমার সবাই তো মানুষ—অমৃতস্য পুত্রা: —ঈশ্বরের সন্তান—ব্রহ্মস্বরূপ—

স্বামীজী। [ফিরে এলেন] দাও ভাই, তোমার হুঁকোটা।

লোকটি। আমি মেথর ঠাকুর।

স্বামীজী। [বসে পড়লেন তার পাশে] দাও—

[লোকটি সসব্যস্তে সরে বসলো।]

স্বামীজী। আমি সন্ন্যাসী, আমার কাছে মেথর বলে কিছু নেই, সব মানুষই সমান। দাও—

[হুঁকা টেনে নিলেন তার হাত থেকে।]

লোকটি। [ব্যস্ত হয়ে] ঠাকুর ঠাকুর, করেন কি !

[হাত জোড় করে] আমার অপরাধ হবে, আমার পাপ হবে !

স্বামীজী। [হাসলেন] তুমি ছোট নও, তুমি অছ্যুৎ নও, তুমি মেথর নও। তুমি মানুষ, আমিও মানুষ। তোমার ভগবান আর আমার ভগবান একই, আমরা সবাই তাঁর ছেলে,—সবাই ভাই —

[তামাক খেতে সুরু করলেন।]

[লোকটি হাত জোড় করে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।]

মঞ্চের আলো নিভলো। এক মিনিট পরে আলো জ্বললো। শুধু সময়ান্তর দেখানোর জন্য। দৃশ্যপটের কোন পরিবর্তন হলো না।

ঘোষণা : বৃন্দাবনের পথে। রাধাকুঞ্জের পাড়ে।

[পদক্ষেপে স্বামীজী প্রবেশ করলেন।]

স্বামীজী। পথ চলা বোধ হয়, কিছু বেশী হয়েছে। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর চলতে ইচ্ছা করছে না। এই পুকুর পাড়ে গাছতলায় একটু বসি। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি, মনোরম।

[গাছের তলে বসলেন।]

জয় গিরিধারী লাল !

[সুর করে করে] মীরাকে প্রভু গিরিধারীলালা—

নেপথ্যে গান : তুহুঁ হাত কি দরপন, মাথকি ফুল,

নয়নকি অঞ্জন বয়ানে তাম্বুল,
অঙ্গকি মৃগমদ, গীমকি হার,
দেহকি সরবস্ব গেহকি সার,
পাখীকো পাখ, মীনকে পানি,
তেমতি প্রভু, তুয়া হাম মানি।

স্বামীজী! রাধাকুণ্ড কাকচক্ষুর মত জল। বেশ ভাল লাগছে। স্নান করে নিই, ক্লান্তি দূর হবে, দেহ স্নিগ্ধ হবে।

গাছের আড়ালে সরে গেলেন। আড়াল থেকে গেরুয়া বসন রাখলেন গাছতলায়, রাখলেন লাঠিটা।

জয় শ্রীগিরিধারীলাল —

[জলে নামার শব্দ শোনা গেল।]

[এদিকে একটা বানর নেমে এলো গাছ থেকে। লাঠিটা নেড়েচেড়ে দেখল। তারপর গেরুয়া বসনটি নিয়ে গায়ে জড়ালো। কাপড়খানি বানরের বেশ পচ্ছন্দ হলো। গোল করে কাপড়খানি পাকিয়ে নিয়ে টপ্‌ টপ্‌ করে সে গাছে উঠে গেল।

স্বামীজী! [অন্তরাল থেকে] বানরটা কাপড়খানা নিয়ে গেল! দে বাবা, আমার কাপড়খান দিয়ে যা। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার দ্বিতীয় বস্ত্র নেই, আমি কি করে তাহলে লোকালয়ে যাবো। দে বাবা, কাপড়খানা দিয়ে যা—

[গাছের পাতার আড়ালে বাঁদরটিকে ও গেরুয়া বসনের অংশ দেখা গেল।]

বানর। উক্‌!

স্বামীজী [অন্তরালে] দে বাবা! বানর। উক্! স্বামীজী। [অন্তরালে] দে বাবা দিয়ে যা—

[বানর লাফ দিয়ে অদৃশ্য হলো।]

স্বামীজী। [অন্তরালে] কাপড়খানা নিয়ে তুই চলে গেলি? বেশ করেছিস্ যা—আমার ওই একখানি মাত্র বসন। আমিও আর লোকালয়ে যাবো না। এইখানে এই রাধাকুঞ্জের পাড়ে গাছতলায় বসে রইলাম। গিরিধারীলালের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। বৃন্দাবনে এই মাঠের মাঝে আমাকে যদি না খেয়ে মরতে হয় তো মরবো। এইভাবে লোকালয়ে তো আর যাওয়া যাবে মা। জয়শ্রীগিরিধারীলাল তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। জয় শ্রীগিরিধারীলাল—(ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। গাছের আড়ালে তাঁকে বসে থাকতে দেখা গেল।

বিপরীত দিকে একটি লোকের প্রবেশ। তার হাতে একখানি কাপড় ও এক ঠোঙ্গা খাবার।)

লোকটি। সাধুজী! মহারাজ! (গাছের কাছে গিয়ে) মহারাজ!

স্বামীজী। [অন্তরালে] কে?

লোকটি। এই নিন্ কাপড়।

স্বামীজী। [অন্তরালে] কাপড়।

লোকটি। আপনার গেরুয়া বসন তো বানরে নিয়ে গেল। আপনার আর তো কাপড় নেই, তাই একখানা কাপড় নিয়ে এলাম। এই কাপড়খানা পরুন। লোকালয়ে যাবেন তো, কাপড় চাই।

স্বামীজী। [অন্তরালে] তুমি কে?

লোকটি। আমি গরীব ব্রজবাসী। কাছেই থাকি।

স্বামীজী। তুমি গরীব ব্রজবাসী!

[লোকটি কাপড়খানি গাছের আড়ালে ছুঁড়ে দিলে।

স্বামীজী সেই কাপড়খানি পরে সামনে এগিয়ে এলেন।]

লোকটি। এই নিন্ খাবার নিন্। স্নান করলেন, এবার কিছু সেবা করুন। অনেক বেলা হয়েছে।

স্বামীজী। খাবার?

লোকটি। আমি গরীব মানুষ বিশেষ কিছুই আপনাকে খাওয়াতে পারলাম না। শুধু চাপাটি আর চাট্নি।

স্বামীজী। [খাবারের ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে] তুমি গরীব মানুষ। উঁহু, তোমাকে পাঠিয়েছেন গিরিধারীলাল।

লোকটি। সেবা করুন মহারাজ।

[বসে খেতে সুরু করলেন।]

[ইতিমধ্যে লোকটি পায় পায় গাছের আড়ালে সরে পড়লো।]

স্বামীজী। [খাওয়া শেষ করে মুখ তুললেন] কই, কোথা গেল!

[এদিকে ওদিকে তাকালেন] না, নেই ! [হাসলেন] বুঝেছি গিরিধারীলাল, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ ! জয় শ্রীগিরিধারীলাল !

আলো নিভলো। এক মিনিট পরে আলো জ্বললো।

দৃশ্যপট বদলায়নি, শুধু সময়ান্তর বোঝালো।

ঘোষণা : হিমালয়ে আলোয়ারের পথে এক কবরখানার পাশে।

[ধীর পদক্ষেপে স্বামীজী প্রবেশ করলেন।]

স্বামীজী। কবরখানা। অনেকটা পথ এসেছি, এইখানে খানিক বসে যাই।

[এক পাশে বসলেন।]

[অপর দিক দিয়ে এক ফকিরের প্রবেশ।]

ফকির। কৌন্ হো ?

স্বামীজী। আমি সন্ন্যাসী।

ফকির। হিন্দু সন্ন্যাসী ? কবরখানায় এসে বসলে কেন ?

স্বামীজী। এই পথ দিয়ে যাচ্ছি, বড় ক্লান্ত, খানিক বসে যাই।

ফকির। বেশ বেশ, বসো। কিছু খাবে ?

স্বামীজী। কি খাওয়াবে ?

ফকির। চানা ?

স্বামীজী। না।

ফকির। মকাই ?

স্বামীজী। না।

ফকির। তবে তো তোমাকে খাওয়াবার মতো আর কিছু ঘরে নেই।

স্বামীজী। তোমার ঘর ? তুমি তো দেখছি ফকির।

ফকির। হ্যাঁ, আমি ফকির। তবু আমার একটা ঝোপড়ি আছে। এই কবরখানা দেখাশুনা করি, আর ওই ঝোপড়িতে থাকি।

স্বামীজী। তোমার একটা আস্তানা আছে। তাহলে আমাকে দুখানা চাপাটি খাওয়াও না কেন ?

ফকির। চাপাটি ? আমি যে মুসলমান, তুমি আমার চাপাটি তো খাবে না।

স্বামীজী। তুমি ফকির আর আমি সন্ন্যাসী। আমাদের আবার জাত কি ? আমরা দুজনেই তো ভগবানকে ডাকি। দুজনেই তো এক জাত।

ফকির। কিন্তু হিন্দু সাধুরা তো আমাদের ছোঁয়া খায় না।

স্বামীজী। তারা মানুষকে নররূপী নারায়ণ বলে মানে না। সবাই ভগবানের অংশ তা তারা স্বীকার করে না। সব মানুষকে ভাই বলে বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমি জানি তুমি আমার ভাই। তুমি চাপাটি দাও, জল দাও, আমি খাবো।

ফকির। তুমি তো নতুন কথা বলছ সন্ন্যাসী।

স্বামীজী। নতুন কথা নয় ফকির সাহেব। এই সত্যি কথা। তুমি চাপাটি নিয়ে এসো।

[ফকির চলে গেল। একটু পরেই পাতায় করে চাপাটি ও বদ্‌নায় করে জল নিয়ে এল। স্বামীজী হাসিমুখে খেতে সুরু করে দিলেন।]

ফকির। [সামনে বসলো।] আপনি সত্যি সাধু। মহারাজ, আপনি যথার্থ খোদার লোক !

আলো নিভলো। দু মিনিট পরে আলো জ্বললো। ইতিমধ্যে দৃশ্য বদলেছে, দেখা দিয়েছে সভাকক্ষ।

[মখমল বিছানো চেয়ারে বসে আছেন আলোয়ারের রাজা মঙ্গল সিং, সামনের আরেকখানি চেয়ারে বসে আছেন স্বামীজী। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন দেওয়ান রামচন্দ্রজী। পিছনে দু'তিন জন সভাসদ।]

ঘোষণা : আলোয়ারের রাজসভা।

রাজা। আপনি একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। আপনি তো ইচ্ছে করলে অনেক পয়সা রোজগার করতে পারেন। অথচ আপনি ভিক্ষা করে, এভাবে পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে দিন কাটান কেন ?

স্বামীজী। [হাসলেন] তাহলে আমি আপনাকে একটা পাল্টা প্রশ্ন করি মহারাজ ?

রাজা। বলুন ?

স্বামীজী। আচ্ছা মহারাজ, আপনি তো রাজা, আপনি রাজকন্যাকে অবহেলা করে সাহেব-সুবাদের সঙ্গে আমোদ করে শিকার করে দিন কাটাচ্ছেন কেন ?

প্রথম সভাসদ্। মহারাজকে এ রকম প্রশ্ন করা চলে না।

দ্বিতীয় সভাসদ্। ঠিক কথা। এ ধরনের প্রশ্ন অপমানজনক।

রাজা। আপনারা চুপ করুন তো !

[সভাসদেরা ত্রস্ত হলো।]

রাজা। আমি এভাবে কেন চলি জানেন স্বামীজী, এটা আমার ভাল লাগে।

স্বামীজী। আমারও ঠিক তাই। এইভাবে ভিক্ষা করে চলতে আমারও ভাল লাগে।

রাজা। আচ্ছা স্বামীজী, আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে আপনার কাছে।

স্বামীজী। বলুন।

রাজা। হিন্দু দেবদেবীতে আমার বিশ্বাস নেই, এজন্য পরকালে আমার কি হবে ?

স্বামীজী। আপনি কি পরিহাস করছেন ?

রাজা। না স্বামীজী, আমি সত্য বলছি। অন্যান্য লোকের মতো কাঠ মাটি পাথর বা ধাতু দিয়ে গড়া দেবদেবীর মূর্তির উপাসনা করতে আমি পারি না। আমার বিশ্বাস হয় না। এতে কি আমার কোনো ক্ষতি হবে ?

স্বামীজী। কোন ক্ষতি হবে না। প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব আদর্শ অনুসারে ধর্মসাধনার অধিকা
আছে।

রাজা। স্বামীজী, হিন্দুরা যে মূর্তি পূজো করে সেটা কি পুতুল পূজো নয়?

স্বামীজী। পুতুল পূজো! পুতুল পূজো!
[আনমনা ভাবে চারিপাশে তাকালেন। তারপর হেসে।]
মহারাজ, দেওয়ালে ওই ছবিটা কার?

রাজা। আমার ছবি।

স্বামীজী। দেওয়ানজি, ওই ছবিটা একবার নামান না।

রামচন্দ্র। ছবিটা নামাবো?

স্বামীজী। নামান।

রাজা। নামান্।
[দেওয়ানজী হাতে তালি দিলেন, দুজন ভৃত্য প্রবেশ করলো।]

রামচন্দ্র। মহারাজের ওই ছবিখানা দেয়াল থেকে নামিয়ে আনো।
[ভৃত্য দুজনের প্রস্থান। একটু পরেই একখানি বড় বাঁধানো ছবি নিয়ে প্রবেশ।
স্বামীজী তাদের হাত থেকে ছবিখানি নিয়ে দেখতে লাগলেন।]

স্বামীজী। দেওয়ানজী, আপনি এই ছবিটায় থুতু ফেলুন তো!

রামচন্দ্র। [সবিস্ময়ে] এ আপনি কি বলছেন? এটা মহারাজের ছবি।

স্বামীজী। এ তো সামান্য একটুকরো ক্যানভাস ছাড়া আর কিছু নয়।

রামচন্দ্র। এটা মহারাজের প্রতিকৃতি।

স্বামীজী। এর সঙ্গে মহারাজের সম্পর্ক কি? এক টুকরো ক্যানভাস, শরীর নেই, নড়ে না চড়ে না,
কথাও বলে না।

রামচন্দ্র। এ তো মহারাজের অপমান।

স্বামীজী। ঠিক কথা। এই ক্যানভাসটার উপর থুতু ফেললে মহারাজের অপমান। কারণ এর মধ্যে
যাঁর ছবি তাঁকে আপনারা সম্মান করেন। ঠিক এমনি হিন্দুদের মূর্তিগুলিও এক একটা দেবদেবীর
প্রতীক। হিন্দুরা ওই মূর্তিগুলির মধ্যে তাদের ইষ্ট দেবতাকে প্রত্যক্ষ করে। পুতুল বলে
ভাবে না।

রাজা। স্বামীজী, আশ্চর্য আপনার যুক্তি, বিস্ময়কর আপনার জ্ঞান। আপনি আজ আমার চোখ খুলে
দিলেন। আমি এতদিন এ তত্ত্ব বুঝিনি। আপনি অসাধারণ ব্যক্তি! [প্রণাম করলেন।]

স্বামীজী। জয়স্তু! কল্যাণমস্তু!

আলো নিভলো। আলো আবার জ্বললো। ইতিমধ্যে দৃশ্য বদলেছে। একটি বাড়ির সামনের

বারান্দা দেখা যাচ্ছে।

[বারান্দায় একখানি নেয়ারের খাটিয়ায় স্বামীজী একা শুয়ে আছেন। খালি গা।]

ঘোষণা : আবু পর্বতে এক মুসলমান উকিলের গৃহে স্বামীজী।

[মুসলমান গৃহস্বামীর প্রবেশ]

গৃহস্বামী। স্বামীজী!

স্বামীজী। বলুন সাহেব।

গৃহস্বামী। ক্ষেত্রীর মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী এসেছেন।

স্বামীজী। আসুন।

[গৃহস্বামী এগিয়ে গিয়ে মুনসী জগমোহন লালকে নিয়ে এলেন।]

গৃহস্বামী। ইনি ক্ষেত্রীর মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী মুনসী জগমোহন লাল।

স্বামীজী। [খাটিয়ার উপর উঠে বসলেন] আসুন।

জগমোহন। নমস্তে।

স্বামীজী। কল্যাণমস্তু। বসুন।

[গৃহস্বামী একটি সুদৃশ্য বেতের মোড়া এগিয়ে দিলেন। জগমোহন বসলেন।]

জগমোহন। আপনি হিন্দু সন্ন্যাসী?

স্বামীজী। হ্যাঁ।

জগমোহন। আপনি একজন মুসলমানদের বাড়িতে আছেন?

স্বামীজী। আছি। ক্ষতি কি?

জগমোহন। আপনার খাদ্য ও পানীয়ে এই মুসলমানের তো ছোঁয়া লাগে?

স্বামীজী। লাগুক। আমি সন্ন্যাসী। আমি সমস্ত সামাজিক রীতি-নীতির ঊর্ধ্বে। মুসলমান বলছেন কেন, আমি একজন মেথরের সঙ্গে বসেও খেতে পারি। এতে ধর্মের ভয় নেই কারণ ভগবানের এই নির্দেশ। এতে শাস্ত্রের ভয় নেই, কারণ শাস্ত্রেও এই নির্দেশ আছে। আমি সর্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান করি। আমার কাছে উঁচু নিচু ছোট বড় বলে কিছু নেই। সবই শিবময়। ওঁম্ শিব-শিব-শিব—
[ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। চোখ খুললেন দু মিনিট পরে।]

জগমোহন। স্বামীজী, আপনাকে একটা প্রশ্ন করবো?

স্বামীজী। বলুন।

জগমোহন। জীবনটা কি?

স্বামীজী। জীবন এক সত্তা যে সত্তা ক্রমাগত আপনাকে বিকাশ ও প্রকাশ করতে চাইছে। আর বহিঃশক্তি ক্রমাগত তাকে দাবিয়ে রাখতে চাইছে। এই দুই শক্তির মাঝে যে সংগ্রাম চলছে, তা-ই জীবন।

জগমোহন। বড় চমৎকার ব্যাখ্যা তো! স্বামীজী, মহারাজকে একবার আনবো আপনার কাছে।

স্বামীজী। আমিও তাঁর কাছে যেতে পারি।

জগমোহন। আপনি যাবেন? সে তো আমাদের পরম সৌভাগ্য!

স্বামীজী। যাবো।

জগমোহন। কবে যাবেন?

স্বামীজী। কবে নিয়ে যাবেন।

জগমোহন। আজই।

স্বামীজী। বেশ, যাবো।

আলো নিভলো। আবার একটু পরে আলো জ্বললো।

ইতিমধ্যে পট পরিবর্তন হয়েছে।

কন্যাকুমারীর শেষ প্রান্তে ভারত মহাসাগর। সুনীল জলরাশির মাঝে কচ্ছপের পিঠের মতো প্রকাণ্ড শিলা ভেসে আছে। সেই পাথরখানির উপর শুয়ে আছেন স্বামীজী।

[সহসা স্বামীজী উঠে বসলেন।]

স্বামীজী। [স্বগতঃ] ধর্ম আর ধর্ম। শুধু ঘুরছি, মানুষকে ধর্মতত্ত্ব শেখাচ্ছি। কিন্তু কেন? খালি পেটে তো ধর্ম হয় না। আজ ভারতের অসংখ্য মানুষ পশুর মতো জীবন কাটাচ্ছে। আমরা যুগ যুগ ধরে তাদের শোষণ করছি। তাদের পদদলিত করছি। এর প্রতিবিধান কি? কি এর প্রতিকার? এদের জন্য প্রয়োজন ত্যাগ ও সেবা। শুধু ত্যাগ ও সেবা!

[মঞ্চের আলো স্তিমিত হয়ে গেল। সেই অস্ফুট আলোয় দেখা গেল একটি মানুষের ছায়া। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো স্বামীজীর সামনে।]

অন্তরীক্ষে: পোরবন্দরের দেওয়ান পণ্ডিত শংকর পাণ্ডুরঙ্গ।

পণ্ডিত শংকর। স্বামীজী, আমার ধারণা আপনি এদেশে কিছুই করতে পারবেন না। এখানকার লোক আপনার মূল্য বুঝবে না। আপনার উচিত পাশ্চাত্য দেশে যাওয়া। সেখানে লোক আপনার মূল্য বুঝবে। আপনি সেদেশে ভারতের সনাতন ধর্ম প্রচার করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

[ছায়া মিলিয়ে গেল।]

[আরেকটি মানুষের ছায়া দেখা গেল। সে ধীর পদে এগিয়ে এলো স্বামীজীর কাছে।]

অন্তরীক্ষে: লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক।

লোকমান্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিকাগো শহরে এ বছর ধর্ম মহাসভা হবে। স্বামীজী, আপনার মতো মানুষের সেখানে যাওয়া দরকার। আপনি সেখানে গেলে ভারতের সনাতন ধর্মের গৌরব রক্ষা করতে পারবেন।

[ছায়া মিলিয়ে গেল।

আরেকটি মানুষের ছায়া দেখা গেল। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো স্বামীজীর কাছে।]

অন্তরীক্ষে : বেলগাঁও-এর ফরেস্ট অফিসার হরিপদ মিত্র।

হরিপদ। স্বামীজী, আপনি আমেরিকায় ধর্ম মহাসভায় যান। টাকার জন্য ভাববেন না। আমি এই শহর থেকে চাঁদা তুলে টাকার জোগাড় করে দেবো।

[ছায়া মিলিয়ে গেল। আরেকটি ছায়া দেখা দিল, ছায়া এগিয়ে এলো স্বামীজীর কাছে।]

অন্তরীক্ষে : মহীশূরের মহারাজা রামরাজেন্দ্র ওয়াদিয়ার।

মহারাজা। স্বামীজী, আপনি যদি আমেরিকা যান আমি আপনাকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে পারি।

[ছায়া মিলিয়ে গেল। আরেকটি ছায়া দেখা দিল, ছায়া এগিয়ে এলো স্বামীজীর কাছে।]

অন্তরীক্ষে : রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি।

রাজা। গুরুদেব, আপনি শিকাগো ধর্মসম্মেলনে যদি যান, আমি আপনাকে সব খরচ দিতে পারি।

[ছায়া মিলিয়ে গেল। আরেকটি ছায়া দেখা দিল।]

অন্তরীক্ষে : হায়দরাবাদের নিজামের শ্যালক নবাব স্যার খুরসিদ জাহ।

নবাব। স্বামীজী, আপনার আমেরিকা যাবার জন্য টাকার দরকার, আমি আপনাকে এখনই হাজার টাকা দিচ্ছি।

[ছায়া মিলিয়ে গেল।

এবার একসঙ্গে দেখা গেল অনেকগুলি ছায়া। তারা পর পর এগিয়ে এলো স্বামীজীর কাছে।]

অন্তরীক্ষে : মহামতি আনন্দ চার্লু।

মহামতি। আপনাকে বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে যেতে হবে স্বামীজী।

অন্তরীক্ষে : বিচারপতি সুব্রাহ্মণ্য আয়ার।

বিচারপতি। আমরা আপনাকে আমেরিকা পাঠাতে চাই।

অন্তরীক্ষে : আলাসিংগা পেরুমল।

আলাসিংগা। স্বামীজী, টাকার জন্য আটকাবে না, টাকা আমরা তুলে দেবো।

[ছায়াগুলি মিলিয়ে গেল। এবার দেখা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। আয়—আয়—

[ধীরে ধীরে জলরাশির শেষ সীমায় পৌঁছে ছায়া মিলিয়ে গেল।]

অন্তরীক্ষে : আয়—আয়—আয়—

স্বামীজী। [উঠে দাঁড়ালেন] গুরুদেব, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আমি যাবো—আমি যাবো—

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল।]

ক্রমশঃ

আমার সাধ

লিপি ঘোষ

বয়স ১১ বছর গ্রাঃ সং ২৩০০

ওগো পাখি তোমার মতো,
থাকত যদি ডানা
দেশবিদেশে উড়ে যেতাম
রইত নাকো মানা

তোমার ডানা তোমায় নিয়ে
কোথায় উড়ে যায়
কাজল পরা ছোট্ট মেয়ে
সেইদিকেতে চায়

ভূত

পরন্তপ গুহঠাকুরতা

বয়স ১১ বছর গ্রাহক নং—১৯৮৯

বাঘ, সিংহকে সকলেই ভয় করে, কিন্তু তার চেয়ে কয়েক জাতের লোকেরা আরও বেশি ভয় করে ভূতকে। তারা বলে, রাত্রি বেলা ১২টার সময় পুলের কাছে গেলে নাকি ভূতে টানে। আমার মামা ভূতকে বিশ্বাস করে না। মামার একটা গল্প বলি।

মামা একদিন তার তিন বন্ধুকে নিয়ে একটা জায়গায় হকি খেলতে গেছে। তারা একটা বড় বাড়িতে দুই দিনের জন্য থাকবে। মামার তিন বন্ধুর নাম হল, অশোক, রতন আর খোকন। তাদের মধ্যে সব থেকে সাহসী অশোক।

বন্ধুরা ও মামা যে বাড়িতে ছিল, সে বাড়ির চাকর ভূতের ভয়ে ছয়টার সময় সন্ধ্যেবেলা নিজের বাড়িতে চলে যায়। সে মামাকে বলেছিল যে রাত্রি বেলা নাকি একটা ভূত এসে এই বাড়ির ঝিকে গলা টিপে মেরেছিল তাই সে ভয়ে ভয়ে রোজ তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যায়।

যাই হোক, মামা আর তার বন্ধুরা কিছু বিশ্বাস করল না বটে, কিন্তু পাশে হকি খেলার লাঠি নিয়ে শুয়ে থাকল। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল, অনেক রাত্রি, খালি জেগে রইল অশোক। রাত যখন প্রায় বারোটা তখন দরজাটা যেন খুলে গেল। সে তখন রতন, খোকন আর মামাকে ওঠাল। তারা সবাই দেখল একটা সাদা ভূত বেরিয়ে আসছে। অশোক কিন্তু ভূতের পায়ের দিকে লক্ষ্য করে ছিল—তার পায়ে ছিল চামড়ার জুতো। সে তখন বুঝতে পারল এটা অন্য কোনো জিনিস, ভূত নয়। তাই সে অন্য বন্ধুদের বলল যে যখন ভূতটা কাছে আসবে তখন হকির লাঠি দিয়ে ঠ্যাঙ্গাবে। ভূতটা আস্তে আস্তে যেই কাছে এল, অমনি চারজনে মিলে ভূতকে এমন পিটুনি দিল যে সে একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

সকালে উঠে দেখা গেল যে ভূতটা সত্যি ভূত নয়, একটা লোক কঙ্কালের সাজ পরে এসেছে। লোকটা হকির লাঠি দিয়ে এমন মার খেয়েছে যে তার হাত পা, ভেঙে গেছে। তারপরে লোকটাকে থানায় দিয়ে আসা হল।

॥ রূপসায়র ॥

তপনকুমার দাঁ

বয়স ১২ বছর গ্রাহক নং—২২৭৭

টলটল রূপাজল,
করে খেলা অবিরল,
উচ্ছল চঞ্চল—
রূপসায়রে।

দিঠি যায় যদ্দুর,
কচি কচি রোদ্দুর,
সোনার সমুদ্দুর—
যেন ছায়ারে॥

চিক্‌চিকে ঢেউগুলি,
সোনালী স্বপন তুলি,
নাচিছে আপনা ভুলি'—
আপন মনে।

সাদা সাদা হাঁস যত,
সচল ফেনার মত,
ভেসে চলে খেলারত—
ঢেউয়ের সনে॥

ঘুট ঘুটে আঁধারেতে,
জোনাকিরা ওঠে মেতে,
মিটমিটে চোখ পেতে—
তারারা জাগে।

থমথমে চারিধার,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে হাহাকার
ওঠে যবে বার বার—
শিহর লাগে॥

সুন্দর বন ভ্রমণ

অরুন্ধতী সেন—বয়স ১২½, গ্রাহক সংখ্যা ২২৭০

অ্যানুয়াল পরীক্ষা হচ্ছে। ইতিহাস পরীক্ষা। কলম চালিয়ে হাত ব্যথা করছে, ঠিক সেই সময় আমাদের স্কুলের বেয়ারা এল নোটিস হাতে। প্রথমে অত গা করিনি। কিন্তু নোটিস শুনে চক্ষু চড়ক গাছ। শুনলাম সুন্দর বনে স্কুল থেকে বেড়াতে নিয়ে যাবে। পরীক্ষা হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে বাবাকে বললাম। বাবা নিমরাজি হলেন। ৭ তারিখ শনিবার যাব। বসে বসে দিন গুণছি।

হায় ভগবান! দিন যে এত বড় হতে পারে আগে জানতাম না। যাই হোক শেষ পর্যন্ত শুক্রবার রাত্রিটা এল। গোছগাছ করে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে আর ঘুম আসে না। একরকম বিনিদ্র রজনীই কেটে গেল। সকাল ৬-৩০ বাজতে না বাজতেই স্কুলে এলাম। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছি এমন সময় দিদি বললেন VIII B লাইন কর। তাড়াতাড়ি লাইনে দাঁড়ালাম। লাইন করে বাসে গিয়ে উঠলাম। বাসে আমাদের ক্লাস আর দুজন মাস্টার একজন দিদিমণি। বাস চলেছে তো চলেছে। শেষে ক্যানিংয়ে থামল। সেখানে স্টীমারে চড়লাম। আমরা সবাই খুব মজা করলাম।

কিছুক্ষণ পরে অনেকে স্টীমারের মাথায় চড়লো। আমাদের এক বন্ধু কিছুতেই উঠবেনা। তার পরে তিনবার পড়ে গিয়ে উঠল। দুজনে একধারে বসেছি। ও খালি বলে এই এই ঠেলিসনা পড়ে যাব। তারপর আমাদের ক্লাস টীচার লিপিকাদি খুব সুন্দর একটা গান গাইলেন।

তখন আমরা সুন্দর বনে ঢুকে গেছি। মাঝে মাঝে দেখছি কুমীরগুলো মাথা তুলছে। কি বীভৎস দেখতে। দুপারে গাছপালার মধ্যে মাঝে মাঝে হরিণ ছুটে বেড়াচ্ছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সূর্য ডুবছে, তার লাল কিরণ গাছের মাথায় আর জলে পড়ে চিকচিক করছে। দুপাশে ঘন সবুজ বন। মাঝে আমাদের স্টীমার ঘড় ঘড় করে চলেছে। ও ভুলে গেছি আমাদের দুপুরে ও বিকালে বেশ ভালো খাবার দিয়েছিল। এবার ফেরার পালা। আবার সেই লাইন করে উঠলাম। বাসে চড়লাম। রাত ৯টা। পৌঁছলাম স্কুলে। আমার ত ঘুম পেয়ে গেছে। বাবা নিতে এলেন। বাড়ি ফিরলাম। বিদায় সুন্দর বন। হয়ত আর সেখানে যাওয়া হবে না, কিন্তু এক দিনের এই ভ্রমণ কাহিনী চিরদিন আমার মনে থাকবে।

একটু খানি হাসো

রীণা ভট্টাচার্য—বয়স ১৩, গ্রাহক নং ১৮৮৫

গুলবাজদের এক আড্ডায় তিন সেরা গুলবাজ তাদের কাহিনী শোনাচ্ছিল।

প্রথম জন বলল, 'আমার দাদু ছোটবেলায় যখন নখ কাটছিলেন, তখন একটা বাঘ তাঁকে খেতে এসেছিল। তাঁর কাছে ব্লেড ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তিনি শুধু ব্লেড দিয়েই বাঘটাকে মেরে ফেলেছিলেন।

দ্বিতীয় জন বলল, আমার দাদু একদিন খাওয়া দাওয়ার পর দাঁত খুঁটছিলেন সেই সময় একটা বাঘ এসেছিল তিনি ঐ খড়কে দিয়েই বাঘটাকে মেরে ফেলেছিলেন।

তৃতীয় জন বলল, আমার দাদুর হাতে যখন কোন অস্ত্রই ছিল না সেই সময় একটা বাঘ এসেছিল। দাদু তখন বাঘটাকে দেখে বললেন, ছিঃ বাঘ তুমি ন্যাংটো হয়ে এসেছ। এই কথা শুনে বাঘটা লজ্জায় মরে গেল।

ধাঁধার উত্তর

অনীতা চট্টোপাধ্যায়—বয়স ১২ বছর—গ্রাঃ নং ২২৩৯

আগের ভদ্রমহিলা শাশুড়ী, পরেরটি তাঁর পুত্রবধূ।

ধাঁধা

হেনা ভট্টাচার্য—বয়স ১২, গ্রাহক নং ১৮৮৫

আচ্ছা বলতো কোন জিনিস যে তৈরি করে সে ব্যবহার করে না, যে কেনে সেও ব্যবহার করে না, আবার যে ব্যবহার করে সে জানে না।

ধাঁধা

শুভময় ও কল্যাণময় চট্টোপাধ্যায়

গ্রাহক সংখ্যা ২২২৪—বয়স ১০ ও ৮½ বছর

রমাকান্ত কামার ছাড়া আর একটা নাম করত, যেটা সামনে থেকে আর পিছন থেকে পড়লে একই হবে ?

মাঘ মাসের সন্দেশের ছবি।

মাঘ মাসের হাতপাকাবার আসরে ৭৪৭ পৃষ্ঠায়—'সুরের মোহ' এবং 'তিনটি মুখভঙ্গী' ছবিগুলি এঁকেছিল ২১৭৬ গ্রাহক অনুপম বড়ুয়া। বয়স ১৫ বছর।

নববর্ষ

মিলিন্দ চক্রবর্তী

বয়স—৬ বঃ ৭ মাস গ্রাহক নং—২০৬৬

পুরনো বছর শেষ হ'ল,
নতুন বছর এসে গেল,
এসে গেল ছিয়াত্তর সন ;
জামা পেলাম অনেক গুলি,
আর পেলাম রঙ ও তুলি,
কার্ড আঁকব মনের মতন !
সবার সেরা পাওয়া আমার
বাবা দিলেন গ্রাহক করে,
সন্দেশটা পাব আবার
প্রতি মাসেই বছর ভ'রে।

চিঠিপত্র

(১) **অরূপকুমার তরাত**, ২০৮৬, বয়স ৭

নিজে হাতে চিঠি লিখতে হয়, ভাই। ধাঁধা পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটাও দিতে হয়। আবার উত্তরসহ ধাঁধাগুলি পাঠিও।

(২) **অঞ্জন ভট্টাচার্য**, ২৩৬১, বয়স ১২,

তোমরা উত্তরবঙ্গে বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যে টাকা তুলে ভারত সেবা সঙ্ঘে জমা দিয়েছ. শুনে খুব খুসি হলাম। এবার প্রফেসার শঙ্কুর গল্প পেয়ে খুসি তো? 'তুষার মানবের সন্ধানের' লেখককে বলব তুমি আরো গল্প চাও।

(৩) **কেকা চৌধুরী**, ১১৫৪, বয়স ৯½

নতুন সন্দেশ পেয়েছ তো? পত্রবন্ধু চাই, শখ:—বই পড়া, নাচ, গান, সেলাই।

(৫) **সঙ্ঘমিত্রা চক্রবর্তী**, ২২৮৭, বয়স ১২,

গ্রাহক কার্ডেই তো সম্পাদকদের নাম সই আছে। সেটাকে যত্ন করে রেখো। পড়াশুনো ভালো করে করছ জেনে খুসি হলাম।

(৬) **সুনন্দা চক্রবর্তী**, ২২৯৪, বয়স ১০

চিঠি লিখলে উপরে ঠিকানা ও তারিখ দিতে হয়। সময় কাটে না তো সেলাই কর না কেন? ছবি আঁকতে পার না? পুজোর সময় বন্ধুদের পাঠাবে বলে ছোট ছোট কার্ড তৈরি কর না কেন? বুক্-মার্কও করতে পার। সামান্য খরচে সুন্দর জিনিসও হবে, প্রচুর আনন্দও পাবে।

পত্রবন্ধু চাই শখ ডাকটিকিট ও কার্ড সংগ্রহ, গল্পের বই পড়া।

(৭) **রাজেশচন্দ্র সিংহ**, ২১০১, বয়স ১২

ভাই, ভ্রমণ কাহিনী লিখলে জায়গাটার বর্ণনা বৈশিষ্ট ও, সেখানকার লোকজন ইত্যাদি সব দিতে হয়, তুমি যে কিছুই দিলে না, ছাপি কি করে? আরেকবার ভালো করে লিখে দাও না কেন, ভাষা তো তোমার ভালোই।

(৮) **অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়**, ২২৬১, বয়স ১১

গ্রাহক মাত্রই হাত পাকাবার—আসরের সভ্য, আলাদা করে কিছু করতে হয় না। তবে কবিতাটি চলল না, ভাই। মন-ভ্রমরাও কি প্রজাপতির মতো একরকম পোকা?

(৯) **প্রবাল সানাতনি**, ২৭৪৬, বয়স ১৬

সে কি ভাই, ইংলিশ মিডিয়মের ছাত্র বলে শুদ্ধ বাংলা লিখতে পার না আবার কি? বাংলা পড় না, বল না? তোমার লেখাটি কিন্তু সত্যি চলল না, তথ্যের অশুদ্ধি আছে। যথা সপ্তরথ একেবারে

লাইট হাউসের খুব কাছে, সাত মাইল দূরে নয়। ভ্রমণকাহিনীর বিষয় বস্তু আরো নিখুঁৎ হওয়া চাই, বিশেষ করে পাঠকদের যদি বয়স কম হয়।

(১০) **সুপর্ণ চৌধুরী**, ১২০৯, বয়স, ১১

তোমার চিঠি ও লেখা পেয়ে খুশি হয়েছি।

সম্পাদকীয়—

কে আবির পাঠিয়েছিলে? বেজায় খুশি হয়েছি। কিন্তু নাম ধাম না দিলে কি করে উত্তর দেব নতুন বছরে শুভকামনা জেনো সবাই।

পুস্তক-পরিচয়

কল্যাণী কার্লেকার

ডুডুম-ডুম—অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক—নিউরিট, দাম ১·৫০ টাঃ

ঝরঝরে ছড়াগুলি, পরিষ্কার ছন্দ।

লেখক—"মা-ঠাকুমার মুখে গড়া মিষ্টি মিষ্টি ছড়া'র কথা বলে' ভূমিকা করেছেন। তাঁর ছড়াও মোটামুটি মিষ্টি, কতকগুলো দুষ্টু আর কতকগুলো এঁচোড়ে পাকা। আজকাল "আধো-আধো মুখ" এর ছেলেরাও হয়তো এঁচোড়ে পাকা ছবিগুলি কিছু কিছু ভালো আর কিছু কিছু সাধারণ।

রামায়ণ গানের ছল্প

সুবীর চট্টোপাধ্যায়

কৈফিয়ৎ—তোমরা যারা গল্প লেখ,
কিংবা লেখ ছড়া,
হরেক রকম খেয়াল খুশি
কল্পনা রঙ করা।

'ছল্প' লেখার চেষ্টা কর
শক্ত কিছুই নয়,
ছড়ার সাথে গল্প জুড়ে
'ছল্প' গড়া হয়॥

(ছড়া + গল্প = ছল্প)

পাগলাগড় গাঁয়ের বিশ্ববকাটে ফচ্‌কে ছেলে চাঁদবদন সাউ, বারোবারের চেষ্টাতেও স্কুল ফাইনাল টেস্টে এ্যালাউ হ'তে পারল না। শেষে মনের দুঃখে লেখাপড়া ছেড়ে পাড়ার পাঁচটা গুণ্ডামার্কা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে, রামায়ণ গানের দল খুলে ফেলল।

দেখতে দেখতে জুটে গেল—খোল করতাল, ঢোল, মৃদঙ্গ, একতারা, গুবগুবি। সুরু হ'ল মহড়া। যেমনি গান, তার তেমনি সুর। আর গলা? কারো গলা ষাঁড়ের মত পিলে চমকানো। কারো আবার ভাঙ্গা কাঁশির চেয়েও খনখনে। চাঁদ-বদনের কণ্ঠস্বর তো গাধাকেও হার মানায়।

ব্যাপারটা বুঝতে গাঁয়ের লোকেদের বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। কেউ কেউ ভাবলে, বুঝি ভূমিকম্প সুরু হ'য়েছে! গাঁয়ের পুরুত ঠাকুর চোখ বুজে ইষ্টনাম জপ করতে করতে বললেন, 'নির্ঘাৎ চন্দ্রে সূর্যে সংঘর্ষ হ'চ্ছে।'

হারান নাপিত কাঁপতে কাঁপতে জানাল 'ভারত পাকিস্তানে যুদ্ধ বেধেছে। পাকিস্তান বোমা ফেলছে। ঐ শুনুন তার শব্দ'

ব্যাপারটা যাই হোক, সবাই একবাক্যে বললে—সাংঘাতিক প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড একটা কিছু হচ্ছে নিশ্চয়ই!

পাগলাগড় গাঁয়ের ছেলে চাঁদবদন সাউ,
বারোবারের টেস্টে যখন হ'ল না অ্যালউ,
মনের দুঃখে লেখাপড়া দিয়ে রসাতল
বন্ধু নিয়ে খুলল শেষে রামায়ণের দল॥
বিকট গলার করল সুরু জঘন্য চিৎকার,
গাঁয়ের লোকের ঘুরল মাথা দেখল অন্ধকার॥

বাপস্ কি পিলে চম্‌কানো আওয়াজ! অমন শব্দ গাঁয়ের লোকে বাপের জন্মেও শোনে নি। দেখতে না দেখতেই চতুর্দিকে একটা বিপর্যয় সুরু হ'য়ে গেল। গাঁয়ের শেষপ্রান্তে ধোপাপাড়া।

ধোপাপাড়ার সতেরখানা গাধা 'গাঁ গাঁ' করতে করতে দড়ি ছিঁড়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারল ঘণ্টায় পঞ্চান্ন মাইল স্পীড।

গাঁয়ের মোড়লের বুড়ো বাপ আজ ছ'বছর বাতে শয্যেশায়ী। ন'ড়ে শুতেও পারে না। একেবারে অথর্ব। সে বুড়োও হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে খাটিয়া ঘাড়ে সাড়ে সাত পা হেঁটে মূর্চ্ছা গেল।

কলাবাগানের তিনশো তিরিশটা হনুমান আঁৎকে উঠে, এ ওর নাকে, সে তার কানে, কামড়ে দিলে, 'হুপ হুপ' ক'রে। কয়েকজন আবার ল্যাজে ল্যাজে হ্যাঁচ্কা টানে সুরু করল টাগ্-অব্-ওয়ার।

সুরু হ'ল চতুর্দিকে বিপর্যয়!
বিদ্‌ঘুটে সব কাণ্ড—সে আর বলার নয়!!
বললে সবাই 'বাপরে মারে'
বেতো বুড়ো খাটি ঘাড়ে
গাধারা সব দড়ি ছিঁড়ে
'গাঁ গাঁ' ক'রে ছুট্ লাগায়॥
কলাবনের তিনশো হনু
আঁৎকে উঠে ভাইরে ভাই
ল্যাজে ল্যাজে হ্যাঁচ্কা টানে
করলে সুরু জোর লড়াই॥

বেশ কিছুক্ষণ পর মাথা ফাতা ঠাণ্ডা হ'লে গাঁয়ের লোক খোঁজাখুজি ক'রে বার করল রামায়ণ গানের আস্তানা। তখন সবাই একজোট হ'য়ে 'রে রে' ক'রে লাঠি নিয়ে তাড়া করলে চাঁদবদন আর তার দলবলকে। হঠাৎ আক্রমণ। মোটেই প্রস্তুত ছিল না ওরা। পরীক্ষায় ফি বছর ফেল মারলে কি হবে। চাঁদবদনের বুদ্ধি কিন্তু চমৎকার। ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে, বাজনা বাদ্যি ঘাড়ে নিয়ে দলবল সমেত চোঁ চাঁ দৌড় মারল।

ছুট্...ছুট্ · ছুট্। পাক্কা পঞ্চা-শ ক্রোশ দূরে এক পাণ্ডববর্জিত গাঁয়ে মস্ত বেল গাছের তলায় গিয়ে থামল ওরা। প্রথমে তো একঘণ্টা ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে হাঁপাল, চাঁদবদন ও সাঙ্গোপাঙ্গ। তারপর বাজনা গুলোয় সুর বেঁধে সেই বেলগাছের তলাতেই আবার সুরু করল বিপজ্জনক রামায়ণ গান।

গাঁয়ের লোকে করলে তাড়া।
গাইয়ের দল ছাড়ল পাড়া॥
ছুটতে ছুটতে নয় ক্রোশ
হাঁফ ছাড়ল ফোঁস ফোঁস॥
বেলগাছের তলায় বসে,
গান ধরল আবার কষে॥

এদিকে হয়েচে কি, ঐ বুড়ো বেলগাছটার মগ্‌ডালে থাকত এক বেম্মদত্যি। সাতপুরুষের বাসা। চাঁদবদন আর তার সাঙ্গোপাঙ্গের অমন ভীমসেনী গলার গান শুনে বেম্মদত্যি. মশায়ের আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার উপক্রম হ'ল। নেহাৎ ভূত তাই প্রাণে মরল না। সামলে নিল কোন গতিকে। বেম্মদত্যি ভাবলে—সেরেচে, এই অলক্ষুণে বাউণ্ডুলে গাইয়েগুলোর জ্বালায় বেঘোরে মারা পড়ব নির্ঘাৎ। বাঁচতে হ'লে একমুহূর্তও এখেনে নয়। বাসা বদলাতে হবে। কিন্তু মারা যাওয়া কিংবা বেলগাছ ছাড়া কোনটাই তার মনঃপুত হ'ল না। বেম্মদত্যি মনে মনে ঠিক করল—এই অকালপক্ক জাম্বুবান গুলোকে যেমন করেই হোক তাড়াতে হবে এখেন থেকে।

বেলগাছটার মগ্‌ডালেতে থাকত রে ভাই সত্যি,
সাতপুরুষের সাধের বাসায় সে এক বেম্মদত্যি॥

গান তো তাকেও করলে তাড়া থাকলে হেথায় যাবেই মারা
প্রাণটা বুঝি শরীর ছাড়া, ছাড়বে নাকি বাসা ?
হায়রে একি জঘন্য গান দারুণ সর্বনাশা !!

বেম্মদত্যি মিনিট তিনেক ঘাড় চুলকে একটা বুদ্ধি বার ক'রে ফেলল। পাশের গাঁয়েই থাকে এক বিশাল চেহারার কুস্তিগির। নাম হাড়গিলে হোড়। বেম্মদত্যি, বামুন পুরুতের রূপ ধয়ে সোজা হাড়গিলের কুস্তির আখড়ায় গিয়ে হাজির।

হাড়গিলে কুস্তি কসরৎ শেষে গোটা একান্ন মোটা রুটি, কিলো চারেক মাংস অর এক জালা কাসুন্দির আচার দিয়ে বিকেলের জলখাবার সারছিল।

বামুনকে দেখে ঠাট্টা করে বললে, 'কি বাবাজি, চলবে নাকি এই নিরামিষ হেঁ, হেঁ !'

বামুন, থুড়ি বেম্মদত্যি একটাও না কথা বলে গুম্ মেরে বসে রইল।

মিনিট তিনেক ভেবে ভেবে
চুলকে মাথা ঘাড়
বেম্মদত্যি শেষকালে এক
বুদ্ধি করে বার।
পাশের গাঁয়ের পালোয়ান,
হাড়গিলে নাম তার।
পালোয়ান সারছে তখন
বৈকালী আহার ॥
শরীরখানা বিশাল, যেন,
মৈনাক পাহাড় ॥
খাবার দাবার খুব বেশী নয়
মাংস কিলো চার।
পুরুত সেজে গেল সেথায়,
রূপের কি বাহার !
একান্নোটা মোটা রুটি,
এক জালা আচার ॥

পর্বত প্রমাণ আহার পর্ব শেষ ক'রে গুটি তিন টেঁকুর তুলে মেজাজে তুড়ি-টুড়ি মেরে হাড়গিলে বলল, কি ঠাকুর মতলব কি বলেই ফ্যালো।

পুরুত বললে, 'দেখো বাপু, আমি হলুম বেম্মদত্যি।'

সেই শুনে হাড়গিলে ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগল। বামুন মানে বেম্মদত্যি অভয় দিয়ে বলল, 'আহাহা ভয় পেও না। তোমার কোন ক্ষতি আমি করব না। যদি আমার একটা উপকার কর তো তোমায় বড়লোক ক'রে দেব।'

হাড়গিলে একটু সামলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, 'অ্যাঁ বড়লোক ক'রে দেবেন ? বলেন কি ?'

'শুধু বড়লোক নয়, তোমাদের জমিদারের পরমাসুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়েও হয়ে যাবে।'

হাড়গিলে এবার একটু সন্দেহ করল। বিরক্ত হয়ে বলল, 'দেখো ঠাকুর তুমি বোধ হর পাগল, কিংবা পেট খারাপ, কিংবা আমার সঙ্গে ঠাট্টা…'

'থামো। বলছি না আমি বেম্মদত্যি, যদি রেগে যাই…'

'না না। রেগো না বাপু'—আবার কাঁপতে লাগল হাড়গিলে।

বেম্মদত্যি বলল, 'ঘাবড়োনা ছোকরা, বড় বিপদে পড়েছি আমি। বেশ ছিলাম বেলগাছের মগ্ ডালে নিরিবিলিতে। কোত্থেকে এক আঁমায়ণ গানের দল এসে বিকট গলায় চেঁচিয়ে বুঝি আমায় গাছ ছাড়া করলে!'

'তা' আমি কি করব?'

'তুমি বাপু ঐ আঁমায়ণের দলকে মুগুর নিয়ে তাড়া কর। ওদের যদি তাড়াতে পারো তো বড়লোক আর জমিদারের জামাই, বুঝলে?'

বেম্মদতি হাড়গিলেকে দিলে পরিচয়,
তাই না শুনে হাড়গিলে হোড় পেল ভীষণ ভয়॥
বেম্মদত্যি অভয় দিয়ে বললে, 'শোন ভাই
বন্ধু হব তোমার আমি, ভয়ের কিছুই নাই॥
তুমি আমার একটা যদি কর উপকার,
খুশি হয়ে দেব তোমায় দারুণ পুরস্কার॥
জমিদারের মেয়ের সাথে হবে তোমার বিয়ে।
থাকবে সুখে সারাজীবন প্রচুর টাকা নিয়ে॥'
আনন্দেতে হাড়গিলে হোড় মুর্চ্ছা বুঝি যায়!
বললে, 'ঠাকুর কাজখানা কি বলত আমায়'
বেম্মদত্যি বললে তাকে, 'গেল বুঝি প্রাণ?
বাসাছাড়া করলে মোরে আঁমায়নের গান॥
কতগুলো হাড়হাভাতে বাউণ্ডুলে ছেলে
আঁম নামের চিৎকারেতে জ্বালিয়ে আমায় খেলে।
তাড়িয়ে ওদের দেখাও দেখি কসরৎ তোমার
তারপরেতে সর্তমত পাবে পুরস্কার।'

ক্রমশঃ

হাসির-ছবি—প্রতিযোগিতা!

হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ !! কই? তোমরা যে বড় হাসছ না? কি দেখে হাসবে? কেন—এবারকার সন্দেশের প্রথম ছবিটা দেখে!

ডানদিকের ছেলেটিকে দেখ, ছবি দেখে সে হেসেই কুটিপাটি! তোমাদের হাসি পাচ্ছে না? কেন?

ও-হরি! ছবিটা যে আঁকা শেষ করাই হয়নি। এক কাজ কর—তোমরা চেষ্টা করে দেখ কে কত কম লাইনে ওটাকে সবচেয়ে হাসির ছবিতে দাঁড় করাতে পার !!

(১) একটা অন্তত: ৩"×৪" সাইজের, সাদা কাগজে ছবির 'ফ্রেমে-বাঁধানো' অংশটুকু ঠিকমতন কপি করে নাও।

(২) তারপরে তার সঙ্গে যথাসম্ভব কম-সংখ্যক লাইন যোগ করে একটা হাসির ছবি আঁক। ইচ্ছামতন লাইন যোগ করতে পার, কিন্তু মূল লাইনগুলিকে বদলাতে পারবে না।

(৩) চাইনিজ ইঙ্ক্ অথবা অন্য কোন কালো কালিতে ছবি আঁকতে হবে।

(৪) ছবির একটা যথাযোগ্য নামও দিতে হবে।

(৫) ছবির পিছনে, (অথবা আলাদা কাগজে) নিজের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক সংখ্যা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখবে।

(৬) যারা এখনও গ্রাহক সংখ্যা পাওনি, তারা লিখবে 'নতুন গ্রাহক।'

(৭) যারা এখনও চাঁদা পাঠাওনি তারা ৩১শে মে'র মধ্যে চাঁদা অবশ্যই পাঠাও।

(৮) যারা গ্রাহক নও তারাও, ৩১শে মের মধ্যে গ্রাহক হলে, প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।

(৯) ৩১শে মে র মধ্যে ছবিটা আমাদের কাছে পাঠাবে। খামের বাঁ-দিকের কোণে লিখবে হাসির-ছবি-প্রতিযোগিতা!

(১০) কে কত কম লাইন ব্যবহার করেছ, কত ভাল হাসির ছবি এঁকেছ আর কেমন উপযুক্ত নাম দিয়েছ—এ সবই বিবেচনা করে দেখা হবে। বলা বাহুল্য যে এ বিষয়ে সম্পাদকের বিচারই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে।

তিনটি দশটাকা মূল্যের পুরস্কার থাকবে। অবশ্য প্রয়োজন হলে পুরস্কার গুলি ভাগাভাগি করে দেওয়া হতে পারে।

(ক) যাদের বয়স ঠিক আট বছর বা তার চেয়ে কম।

(খ) যাদের বয়স আট বছরের বেশি কিন্তু বারো বছরের বেশি নয়।

(গ) যাদের বয়স বারো বছরের বেশি কিন্তু সতের বছরের কম।
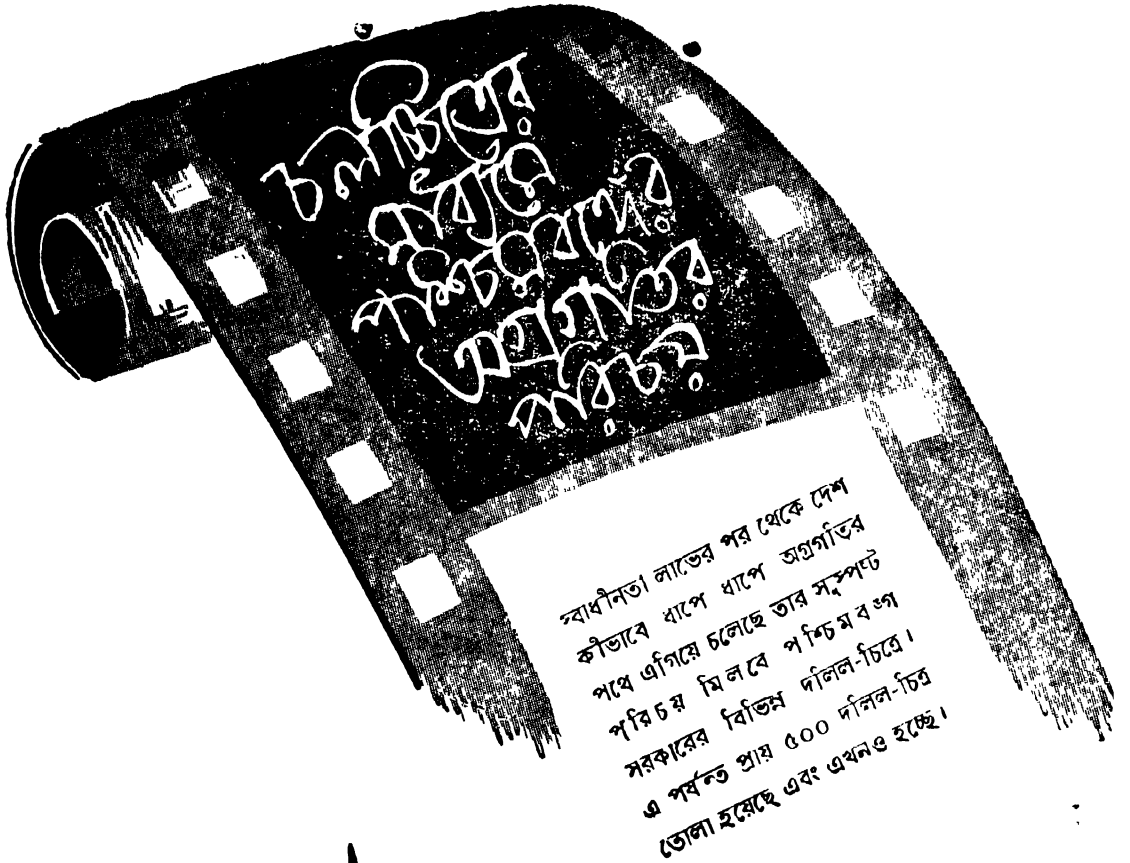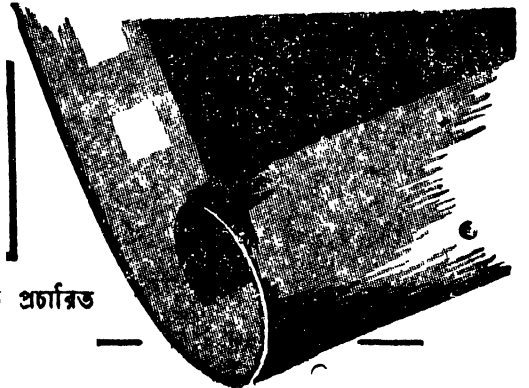
ম্যারাকট ডীপ

নবম বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬/জুন ১৯৬৯

॥ টেলিগ্রাম ॥

গোপাল সাঁতরা

টক্‌কা টক্‌কা টক্‌কা টরে
বাতাসে ঈথারে আসছে তারে
সংকেত ভাষা টক্‌কা টরে
টেলিগ্রাম যন্ত্রটা শব্দ করে
হাজার মাইল দূরে
এক ঘেয়ে এক সুরে
আসছে যাচ্ছে নেই চুপ করে
টরে টরে টক্‌কা টক্‌কা টরে।
জন্ম মৃত্যুর আরও কত সংবাদ
ঘটনার ঘনঘটা বিচিত্র তার স্বাদ
আবেগ আর উচ্ছ্বাস কত সব দরকারী
আদেশ খবরদারী সংবাদ সরকারী।
টরে টরে টক্‌কা টক্‌কা টরে
টেলিগ্রাম যন্ত্রটা শব্দ করে।
নদ নদী পাহাড়ের পারাপার দুস্তর
কাগজের বুকে লেখা অক্ষর স্বাক্ষর।
মানুষের কথা তারে ছুটোছুটি করছে
টেলিগ্রাম যন্ত্রটা শব্দে নড়ছে।
টক্ টক্ খট খট শব্দ করে
টরে টরে টক্‌কা টক্‌কা টরে।

শবরীর প্রতীক্ষা

অনামিকা

রাম তো সোনার হরিণ ধরতে চলে গেলেন। চলে যাবার একটু পরেই সীতা বললেন, 'লক্ষ্মণ তুমিও যাও, রাম একা, তাঁর যদি কোনো বিপদ হয়।' লক্ষ্মণ সীতাকে একা ফেলে রেখে যেতে চাইছিলেন না, কিন্তু সীতা খুব কান্নাকাটি করতে লাগলেন। তখন লক্ষ্মণ কি আর করেন, একটা গণ্ডী কেটে, তার ভেতরে সীতাকে থাকতে বলে, তিনি, চলে গেলেন। লক্ষ্মণ যেই চোখের আড়াল হয়েছেন, অমনি রাবণ এসে সীতাকে রথে তুলে নিয়ে পালাল। একটু পরেই রাম ও লক্ষ্মণ ফিরে এলেন, এসে দেখলেন সীতা নেই। 'সীতা সীতা' বলে কত ডাকলেন, কিন্তু কোনো সাড়া পেলেন না। তখন দুই ভাই মুনিদের বাড়ি, নদীর তীরে, বনে বনে কত খুঁজলেন, কিন্তু কোথাও সীতাকে পাওয়া গেল না। সীতাকে না পেয়ে রাম লক্ষ্মণ আবার এগোতে লাগলেন। খানিকটা গিয়েই দেখতে পেলেন একটা মস্ত বড় পাখি রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে আছে। ওঁর কাছে যেতেই পাখিটা আস্তে আস্তে বললে, 'আমি জটায়ু পাখি, দশরথের বন্ধু। সীতাকে লঙ্কার দুষ্টু রাজা রাবণ ধরে নিয়ে গেছে। পম্পা সরোবরের তীরে আমার দাদা সম্পাতি আছেন, তোমরা তাঁর কাছে যাও, তিনি সীতা উদ্ধারের উপায় বলে দেবেন।' এই বলে জটায়ু মরে গেল। জটায়ুকে দাহ করে বিষণ্ন মনে ওঁরা আবার এগোতে লাগলেন। যেতে

যেতে তাঁরা একটি ছোট্ট সুন্দর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আশ্রম দেখতে পেলেন। রাম বললেন, 'চল এমন সুন্দর আশ্রমটি কার, কেইবা এখন এখানে থাকেন দেখি! ওখানে গিয়ে আমরা একটু বিশ্রাম করি।'

আশ্রমটি আগে ছিল মতঙ্গ মুনির। এখন শবরীর (শবরী মানে ব্যাধ রমণী)। প্রথমে ইনি মতঙ্গ মুনির দয়ায় আশ্রমটি ঝাড়ু দেবার অধিকার পেয়েছিলেন। অতি যত্নে রোজ শুধু আশ্রমটি ঝাড়ু দিয়ে চলে যেতেন। মতঙ্গ মুনি ক্রমে যখন বুড়ো হয়ে পড়লেন, তখন থেকে শবরী তাঁর কাছে কাছে থেকে নিজের দ্বারা যতটুকু সম্ভব সেবা করতেন। তাঁর সেবায় মুনি খুব খুশি হয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি শবরীকে ডেকে বললেন, 'আমি মারা যাবার পর তুই এই আশ্রমে এসে থাকবি; আর তোকে আমি পবিত্র রাম নাম দিচ্ছি, সারাক্ষণ জপ করবি। পৃথিবীর ভার কমাবার জন্যে, ভগবান নিজে শীগগির অযোধ্যার রাজা দশরথের ছেলে হয়ে জন্মাবেন, পরে লঙ্কার অত্যাচারী রাজা রাবণকে দমন করতে এই পথ দিয়ে যাবেন, তখন তিনি তোকে দর্শন দেবেন। তুই তাঁর প্রতীক্ষা করবি।' এই বলে মুনি মারা গেলেন।

মুনি মারা যাবার পর থেকে শবরী একা এই আশ্রমে এসে আছেন। আর সেই থেকেই—সে অনে-ক দিন হয়ে গেল, রামকে দেখার আশায়, রামকে পাবার আশায়, তপস্যা করে চলেছেন। তিনি সারাক্ষণ রামকে ডাকেন, আর মনে মনে বলেন, হে রাম! কবে তুমি আসবে? কবে তোমায় দেখে আমি ধন্য হব? রাম! তোমায় না দেখে যে, আর থাকতে পারছি না—হে রাম! অনেক দিন যে হয়ে গেল, কবে তোমার দয়া হবে? শবরী খুব ব্যাকুল হয়ে পড়েন। রোজই আশা করেন, আজ রাম নিশ্চয় আসবেন, কিন্তু রাম আসেন না। রাম আসেন না বলে তাঁর ভীষণ কষ্ট হয়। একদিন শবরীর মনে হল রান্না করতে তাঁর অনেক সময় যায়, 'কাল থেকে আর রান্না করব না। গাছে ফল আছে, নদীতে জল আছে, খাওয়ার অভাব কি! ওই সব খেয়ে থাকব। তাহলে রামকে ডাকার আরো বেশি সময় পাব। অত কম ডাকি বলেই তিনি আসেন না।' তারপর থেকে শবরী আর রান্না করেন না। গাছের ফল আর নদীর জল খেয়ে থাকেন। খেতে খেতে কোনো ফল যদি ভালো লাগে, সেটি আর খাওয়া হয় না, রামের জন্যে তুলে রেখে দেন। এই রকম প্রায়ই যে ফলটি ভালো লাগে, সেটি না খেয়ে তুলে রাখেন। কেন না, রাম যখন আসবেন, তখন ওই রকম সুস্বাদু ফল যদি না পান।

আশ্রমটিকেও খুব পরিচ্ছন্ন করে রাখেন। একটিও কুটো কাটা ঝরা পাতা বা কাঁকর পড়ে থাকতে দেন না। ভাবেন রাম এলে যদি তাঁর পায় ফুটে যায়! কি মনে করবেন? মনে করবেন 'শবরীটা কি! আশ্রমটাও একটু পরিস্কার করে রাখতে পারে নি!' একদিন আবার শবরীর ভাবনা হলো, 'আচ্ছা রাত্তিরে যখন ঘুমোই, তখন রাম এসে ফিরে যাননি তো?' পরের দিন সকালে উঠেই সবাইকে জিজ্ঞেস করেন, 'ভাই, তোমরা কি কেউ জানো, রাত্তিরে রাম এসেছিলেন কি?' তারা বলে 'কই, রাম বলে কোনো লোক তো আসেনি।' শবরী একটু নিশ্চিন্দি হন, তা'হলে তিনি এসে ফিরে যাননি! কিন্তু সেই থেকে শবরী আর সারারাত ঘুমোতেন না।

আজকাল তিনি খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকেন। সামান্য একটু কিছু শব্দ পেলেই চমকে ওঠেন।

তা একটু হাওয়ার শব্দই হোক, কি পাতা ঝরার শব্দই হোক্, শব্দ হলেই মনে করেন ওই বুঝি রাম এলেন! তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখেন রাম এলেন কি! কিন্তু কোথায় রাম! নির্জন বন চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। হতাশায় শবরী ভেঙে পড়েন। তবুও রাত্তিরে বার বার দরজা খুলে দেখেন, রাম এলেন কি! এমনি করে কত দিন, কত বছর ঘুরে যায়, রামের দেখা না পেয়ে শবরীর খুব যন্ত্রণা হয়, কি রকম যন্ত্রণা, তা কাউকে বোঝানো যায় না। শবরী কাঁদেন, কখন বা কাঁদতেও পারেন না, রামের অদর্শন তাঁর বড়ই অসহ্য মনে হয়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যায়, শবরী কেঁদে বলেন, 'হে রাম এখনো কি তোমার সময় হয়নি! আমি যে বুড়ো হয়ে পড়ছি, চোখেও যে ভালো দেখতে পাচ্ছি না! আরো পরে এলে, আমি তোমায় কি করে দেখব? রামচন্দ্র! আমি কি এ জন্মে তোমায় পাবনা! তোমার জন্য যে কত ফল রেখেছি সে সব কি তুমি কিছুই খাবে না? আমি মরবার আগে তুমি দয়া করে একবার দেখা দাও।' এমনি করে, খুব কাতর হয়ে রামকে ডাকেন আর দেখবার আশায় ছটফট করেন।

যে ছোট্ট সুন্দর আশ্রমে রাম বিশ্রাম করতে আসছেন, সেটাই ওই শবরীর আশ্রম। শবরীর প্রতীক্ষা এতদিনে সার্থক হতে চলেছে।

শ্রান্ত ক্লান্ত রাম শবরীর আশ্রমে এলেন। রামকে দেখে শবরীর আনন্দ ধরে না। রামকে তিনি কি বলবেন কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না। কোথায় বসাবেন, কি খাওয়াবেন, কি ভাবে সেবা যত্ন করবেন, ভেবেছিলেন, এখন সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। অসীম আনন্দে শুধু রামকেই দেখছেন। কি সুন্দর দেখতে, চোখ যে ফেরানো যায় না! যতই দেখছেন,—ততই আরো দেখতে ইচ্ছে করছে, দেখে যেন আর আশা মিটছে না! দুই গালে আনন্দাশ্রু ঝরে ঝরে পড়ছে! রামও শবরীকে দেখছেন! খানিক পরে রাম খুব মিষ্টি করে বললেন, 'শবরী! আমার জন্য কি রেখেছ, দাও।' আনন্দে আত্মহারা শবরী যেন ঘুম ভেঙে উঠলেন।

তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে, সেই এক কামড় নেওয়া আর আধখাওয়া ফল এনে রামকে খুব আদর করে খাওয়াতে লাগলেন।

রামের মনে হল, এমন সুন্দর ফল এর আগে তিনি আর কখনো খাননি! শবরী বললেন, 'রাম তোমাকে দেখবার জন্যই এতদিন বেঁচে ছিলুম ; তুমি দাঁড়াও, আমি তোমায় দেখতে দেখতে মরি!'

এই বলে শবরী, আগুন জ্বালিয়ে তাতে ঝাঁপ দিলেন। সবাই অবাক হয়ে দেখল আকাশ থেকে একটি সুন্দর রথ এসে শবরীকে তুলে নিয়ে, স্বর্গে চলে গেল।

[আলেখ্য]

দ্বিতীয় দৃশ্য

১৮৯৩ খৃস্টাব্দ।

আমেরিকা। শিকাগো সহর। রাজপথ।

স্বামীজী চলেছেন পথ দিয়ে। আগের বেশ আর নেই।

পরনে রেশমী গেরুয়া আলখাল্লা। মাথায় পাগড়ী।

স্বামীজী। [স্বগতঃ] শিকাগো ছাড়তে হলো। এই শহরে বেজায় খরচ। এতো খরচ চালানোর মতো টাকা নেই। কিন্তু এই দূর দেশে এসে অর্থাভাবে পরাজয় মানলে চলবে না। আমি তো ঈশ্বরের কাছে আদেশ পেয়েছি। তাহলে আমার ভয় কি। তিনি তো সবই দেখছেন। তিনি যা করেন তাই হবে। মরি কি বাঁচি আমার উদ্দেশ্য টলবে না।

[মার্কিন মহিলা কেট স্যানবর্ণ-এর প্রবেশ।]

কেট। আপনি কি ভারতীয়?

স্বামীজী। হ্যাঁ।

কেট। এখানে কোথায় থাকেন?

স্বামীজী। ছিলাম শিকাগোতে।

কেট। এখন ?

স্বামীজী। বোসটন যাচ্ছি।

কেট। বোসটন যাচ্ছেন কেন ?

স্বামীজী। এখানে বড় খরচ। ওখানে শস্তায় থাকতে পারবো।

কেট। আপনি আমেরিকায় এসেছেন কেন ?

স্বামীজী। ভেবেছিলাম শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় যোগ দেব, কিন্তু সেই সভা বসতে এখনও তিনসপ্তাহ বাকি। এই তিনসপ্তাহ শিকাগোয় থাকার মত টাকা আমার নেই। তাই চলে যাচ্ছি শস্তার জায়গায়।

কেট। আপনি আমার বাড়িতে থাকবেন ?

স্বামীজী। আপনার বাড়িতে ?

কেট। হ্যাঁ, আমার অতিথি হবেন।

স্বামীজী। কোথায় আপনার বাড়ি ?

কেট। বোসটনের কাছেই এক গ্রামে। ম্যাসচুসেট্‌স্ ; আমি সেখানে থাকি। আমার বাড়ির নাম ব্রিজি মেডোজ্। বাগান আছে, ঝর্না আছে, পুকুর আছে। যাবেন আমার বাড়িতে ?

স্বামীজী। চলুন।

আলো নিভলো। আবার আলো জ্বললো। সেই একই দৃশ্য।

[স্বামীজীর সঙ্গে প্রবেশ করলেন অধ্যাপক রাইট।]

রাইট। স্বামীজী, আপনি অবশ্যই শিকাগো ধর্মসভায় যাবেন।

স্বামীজী। সেই কথা ভেবেই তো এদেশে এসেছিলাম। কিন্তু সে কি আর হবে ?

রাইট। কেন হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

স্বামীজী। আপনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন ? কিন্তু তারা আমাকে পাত্তা দেবে কেন ? আমার তো ঢাল নেই তলোয়ার নেই, চাল নেই চুলো নেই।

রাইট। আপনাকে পাত্তা দেবে না ? এ কি বলছেন ? আপনার মতো মানুষের জন্যই তো ধর্ম মহাসভা ! আপনিই হবেন সেই সভার প্রথম ও প্রধান ব্যক্তি।

স্বামীজী। আমার কাছ থেকে যখন তারা পরিচয়পত্র চাইবে, তখন আমি কি দেখাব ? আমার সার্টিফিকেট কই ?

রাইট। আপনার পরিচয়পত্র ? সূর্যের কিরণই সূর্যের পরিচয়। আপনি সূর্যের মতই স্বপ্রকাশ। আপনার জ্ঞান এদেশের সমস্ত পণ্ডিতদের চেয়ে বেশি।

স্বামীজী। কিন্তু সম্মেলনে যোগ দেবার অনুমতি পাব কি করে ? প্রতিনিধি হবার অধিকার কোথায় ? ডেলিগেট টিকিট কে দেবে ?

রাইট। সে দায়িত্ব আমার। সম্মেলনের যাঁরা সংগঠক তাঁরা অনেকেই আমার পরিচিত। তাছাড়া

নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান আমার বন্ধু। আমি তার কাছে চিঠি দোব। জানিয়ে দেব যে আপনি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

স্বামীজী। ভালো কথা। কিন্তু শিকাগোতে যে যাবো আমার তো ট্রেনের টিকিট কাটারও পয়সা নেই।

রাইট। টিকিট কেনার পয়সা নেই? আমি দেব।

স্বামীজী। আপনি দেবেন?

রাইট। হ্যাঁ, আমি দেব। এ ধার নয়, দান নয়, আপনি মনে করবেন ঈশ্বর আপনাকে দিচ্ছেন।

স্বামীজী। কিন্তু সেখানে পৌঁছলেই তো হবে না। থাকবো কোথায়? খাব কি?

রাইট। আমি সে ব্যবস্থাও করে দেব।

স্বামীজী। তাহলে তাই করুন, ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

আলো নিভলো। আবার আলো জ্বললো। সেই রাজপথের দৃশ্য।

[ধূলি মলিন বেশে স্বামীজীর প্রবেশ।]

স্বামীজী। শিকাগোয় তো এলাম। কিন্তু এখানে ভরসা করার তো কিছুই নেই। ব্যারোজ সাহেবের ঠিকানাটা কোথায় হারিয়ে ফেললাম। কত লোককে জিজ্ঞাসা করলাম। কেউ একটা কথার জবাবও দিলে না। এরা তো আমাকে মানুষ বলেই গণ্য করতে চায় না। রাতটা কাটাবার মতো একটা আশ্রয় মিললো না কোথাও। শেষে স্টেশনের মালগাড়ীর ইয়ার্ডে খালি প্যাকিং বাক্সের মধ্যে শুয়ে তো রাত কাটালাম। এখন খাব কি? পয়সা নেই। দু টুকরো রুটি তাও তো কেউ দেয় না। ভিক্ষা চাই মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয়। আমি কি এই সুদূর বিদেশে না খেয়ে পথের উপর মরবো। ভগবানের কি এই ইচ্ছা? জগদীশ্বর, তুমি কি আমায় পরীক্ষা করছ? বেশ, প্রভু, তুমি যদি তাই চাও, তাই হোক। আমি আর ঘুরতে পারছি না। এইখানেই বসি, তারপর এইখানেই শুয়ে পড়বো। প্রভু, তোমার যা ইচ্ছা হয় করো, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্ জগদীশ্বর!

[পথের উপর বসে পড়লেন।]

[সামনের বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে এক মহিলা এতক্ষণ স্বামীজীকে দেখছিলেন। এবার তিনি দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। মহিলা মিসেস্ জর্জ ডবলু হেল।]

হেল। আপনি কি সন্ন্যাসী?

স্বামীজী। হ্যাঁ।

হেল। বিশ্ব-ধর্মসভায় যাবেন বুঝি?

স্বামীজী। হ্যাঁ, সেখানে যাবো বলেই বেরিয়েছিলাম।

হেল। তাহলে এখানে এই অবস্থায় কেন?

স্বামীজী। টাকা পয়সা ফুরিয়ে গেছে। ব্যারোজ সাহেবের কাছে যাবার কথা ছিল। তাঁর ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলেছি। এখন এই পথ ছাড়া আর কোন গতি নেই।

হেল। আসুন, আমার বাড়িতে আসুন।

স্বামীজী। আপনি কে জানতে পারি কি ?

হেল। আমার নাম মিসেস জর্জ হেল। এই আমার বাড়ি, আপনি আসুন আমার বাড়িতে। আপনি আমার অতিথি হবেন।

স্বামীজী। চলুন। [উঠে দাঁড়ালেন]

হেল। আমি আপনার ধর্মমহাসভায় যাবার সব ব্যবস্থা করে দেব, আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। আপনি এই ক'দিন আমার বাড়িতেই থাকবেন।

স্বামীজী। [স্বগতঃ] জগদীশ্বর, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ ! মাঝে মাঝে শুধু পরীক্ষা করে দেখছ।

হেল। আসুন।

[মিসেস হেল বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। স্বামীজী তাঁর অনুগমন করলেন।]

তৃতীয় দৃশ্য

১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর : সোমবার। শিকাগো শহরের মিচিগান এভেনিউ। রাস্তার উপর মস্ত বাড়ি আর্ট ইনস্টিটিউট। সেখানে কলম্বাস হলে ধর্ম মহাসভার অধিবেশন সুরু হয়েছে। মস্ত হল, সামনে ছ'সাত হাজার শ্রোতা বসে আছে, তবে তাদের দেখা যাচ্ছে না।

মঞ্চের উপর উঁচু আসনে বসে আছেন সভাপতি, আমেরিকান ক্যাথলিক চার্চের প্রধান বিশপ কার্ডিন্যাল গিব্‌সন। তাঁর দুপাশে সারি সারি চেয়ারে বসে আছেন দেশবিদেশের প্রতিনিধিরা। সেই প্রতিনিধিদের মধ্যে একধারে বসে আছেন স্বামীজী। গেরুয়া পোষাক, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। বয়স সবার চেয়ে কম।

সভা চলছে।

অন্তরীক্ষে : অনেকেই তো বক্তৃতা লিখে এনেছে। প্রত্যেকেই বক্তব্য বিষয় তৈরি করে এনেছে, আমিই শুধু অপ্রস্তুত। কি সম্পর্কে কি বলবো, কিছুই ঠিক করে আসিনি। ভুল করেছি। এখন এই পণ্ডিত মণ্ডলীর মাঝে বোকার মত কি বলবো ; সবাই ভাববে অর্বাচীন। জগদীশ্বর, তুমিই ভরসা !

সভাপতি। চারজন বললেন, এবার বিবেকানন্দ আপনি বলুন।

স্বামীজী। আমি ? আমার নম্বর তো পঞ্চম নয়, আমার ক্রমিক সংখ্যা একত্রিশ।

সভাপতি। তা হোক, আপনি বলুন।

স্বামীজী। না, এখন, নয়, পরে বলবো।

আলো নিভলো। আবার আলো জ্বললো। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে গেছে। সভা চলছে।

সভাপতি। বিবেকানন্দ, এবার আপনি বলুন।

স্বামীজী। এখন নয়।

সভাপতি। কখন্ বলবেন ?

স্বামীজী। আরো পরে। আমার নম্বর আসুক।

আলো নিভলো আলো জ্বললো। বিকাল গড়িয়ে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সভা চলছে।

সভাপতি। বিবেকানন্দ এবার আপনি বলুন।

[স্বামীজী উঠে দাঁড়ালেন।]

অন্তরীক্ষে : মা বাগ্‌দেবি ! তোমার শরণ নিলাম। তুমি যা বলাবে, তাই বলবো। তুমি ছাড়া আমার গতি নেই। তুমি আমার সহায় হও মা। আমি যেন সনাতন ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করতে পারি মা।

স্বামীজী। [সামনে এসে হাত জোড় করে সকলকে নমস্কার জানালেন।] Sisters and brothers of America ! I come to speak here of a religion of which Buddhism is a rebel child, and Christanity is but a distant echo.

[শ্রোতাদের বিপুল করতালি।]

স্বামীজী। পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্মই সব ধর্মের জননী। হিন্দুধর্ম শিখিয়েছে সহনশীলতা। হিন্দুধর্মের কথা হোল—তুমিও চলো, আমিও চলি। কাছে এসো, হাতে হাত মিলিয়ে চল। হিন্দুধর্ম বলে—সব ধর্মই মহান্ সব ধর্মই পৌঁছেছে ঈশ্বরে, যেমন সব নদী গিয়ে পড়েছে সমুদ্রে। যত মত, তত পথ। কিন্তু সব মতে আর সব পথেই সেই পরম সম্বোধি। পথ বিচিত্র হতে পারে কিন্তু সব মানুষের ঈশ্বর এক। সব ধর্মতেই সত্য নিহিত আছে।

[স্বামীজী থামলেন। শ্রোতারা স্তব্ধ। বিস্মিত।]

সভাপতি। আজকের সভা এইখানেই শেষ হোল।

[প্রথমে সভাপতি, তারপর একে একে সবাই মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন। স্বামিজী সবাইকার পিছনে কিন্তু স্বামীজী বেরিয়ে যাবার আগেই শ্রোতারা এসে স্বামীজীকে ঘিরে ধরলো।]

১ম শ্রোতা। কোন্ দেশের মানুষ তুমি ?

স্বামীজী। ভারতবর্ষ।

১ম শ্রোতা। সেখানে কোথায় থাকো ?

স্বামীজী। কখনো পাহাড়ে পর্বতে, কখনো গাঁয়ের গাছতলায়, কখনো রাজার বাড়িতে, কখনো-বা গরীবের কুটিরে। আমি সন্ন্যাসী, আমি স্বাধীনভাবে বিচরণ করি !

২য় শ্রোতা। খাও কি ?

স্বামীজী। যখন যা জোটে।

২য় শ্রোতা। বনজঙ্গলে পাহাড়পর্বতে কি জুটবে ?

স্বামীজী। না জুটলে খাই না।

৩য় শ্রোতা। কাজকর্ম কিছু কর না ?

স্বামীজী। ভিক্ষা করি।

৩য় শ্রোতা। তোমার টাকা পয়সা নেই ?

স্বামীজী। এক কপর্দকও না। আমি তো সন্ন্যাসী।

৪র্থ শ্রোতা। এই বুঝি তোমার দেশের সাধুসন্তদের পোশাক ?

স্বামীজী। না। তোমাদের দেশে এই সভায় আসার জন্য এই বিশেষ পোশাক করেছি।

৪র্থ শ্রোতা। তোমার দেশের সাধুসন্তদের পোষাক কি ?

স্বামীজী। এক টুকরো ছেঁড়া কাপড়, নয়তো একটু চট কি একখানা চামড়া।

৫ম শ্রোতা। তুমি জাতিভেদ মানো ?

স্বামীজী। জাত তো একটা সামাজিক প্রথা, সে তো ধর্ম নয় !

এক তরুণী। তুমি বিয়ে করেছ ?

স্বামীজী। না।

তরুণী। বিয়ে করনি কেন ?

স্বামীজী। কাকে বিয়ে করবো ? কোন মেয়ের মুখের পানে তাকালেই আমার মা জগন্মাতাকে মনে পড়ে।

আলো নিভলো। আবার আলো জ্বললো। সেই একই দৃশ্য।

ধর্মসভা চলছে। শুধু ক্যালেণ্ডারের তারিখটা বদলেছে।

১৫ই সেপ্টেম্বর।

[নেপথ্যে মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।]

[তিনজন কর্মকর্তা প্রবেশ করলেন]

১ম কর্মকর্তা। [সভাপতির কাছে গিয়ে] বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনার জন্য সবাই উৎসুক।

সভাপতি। তাঁর বলা শেষ হলেই তো সবাই চলে যাবে।

২য় কর্তা। তাই তো দেখছি। এবারকার সভায় উনিই সব।

৩য় কর্তা। কিন্তু বলেন ভাল, যা বলেন তা শোনার মত। মুখস্থ করা বক্তৃতা নয়, স্বতঃস্ফূর্ত।

সভাপতি। কিন্তু সবাই উঠে গেলে পরের বক্তারা কি খালি ঘরে বক্তৃতা করবেন ?

১ম কর্তা। একটা উপায় আছে।

২য় কর্তা। কি ?

১ম কর্তা। বিবেকানন্দ সবার শেষে বলবেন।

১ম কর্তা। }
২য় কর্তা। } সে ভাল।

[নেপথ্যে গুঞ্জন যেন জোরালো হয়ে উঠলো।]

সভাপতি। আপনারা চঞ্চল হবেন না। স্থির হয়ে বসুন। আপনারা বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনতে চান, পরে বিবেকানন্দের বক্তৃতা আছে।

নেপথ্যে। কখন্ তিনি বলবেন ?

সভাপতি। তিনি বলবেন সবার শেষে।

নেপথ্যে। কতক্ষণ বলবেন ?

সভাপতি। পনেরো মিনিট।

নেপথ্যে। কি সম্পর্কে বলবেন ?

সভাপতি। ভ্রাতৃভাব।

নেপথ্যে। আর কত দেরী হবে ?

সভাপতি। আর তিনজন বক্তার পরেই তিনি বলবেন।

নেপথ্যে। বসুন, বসুন, আর তিনজন বক্তার পরেই বিবেকানন্দ বলবেন।

আলো নিভলো। আবার আলো জ্বললো। সেই দৃশ্য।

ধর্মসভা চলছে।

স্বামীজী বক্তৃতা করছেন।

স্বামীজী। কুয়ার ব্যাং ও সমুদ্রের ব্যাঙের একটি গল্প আছে। কুয়ার ব্যাং কিছুতেই বিশ্বাস করে না যে কুয়ার চেয়ে বড় জলাশয় কোথাও আছে। সমুদ্রের ব্যাংকে তাই সে কুয়া থেকে তাড়িয়ে দেয়। আমি একজন হিন্দু, আমি নিজের কুয়ার মধ্যে বসে আছি, আর ভাবছি এই কুয়াটাই সমগ্র জগৎ। একজন খৃস্টানেরও সেই অবস্থা। একজন মুসলমানেরও তাই। আপনারা সেই ছোট ছোট জগতের বেড়াগুলি ভাঙতে চাইছেন, এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ। ঈশ্বর আপনাদের সহায় হোন্।

আলো নিভলো। আলো জ্বললো। সেই একই দৃশ্য। সভা চলছে। ক্যালেণ্ডারের তারিখটা শুধু বদলেছে। ১৯শে সেপ্টেম্বর।

স্বামীজী বক্তৃতা করছেন।

স্বামীজী। নির্মল বিশুদ্ধ মানুষ ইহজীবনেই ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেন। হিন্দুদের মধ্যে অনেক দোষ আছে, অনেক বৈশিষ্ট্যও আছে। হিন্দু কখনও প্রতিবেশীর অনিষ্ট করে না। হিন্দু কখনও বলে না যে আমিই একমাত্র মুক্তির অধিকারী আর কেউ নয়।

[সহসা থেমে গেলেন]

আমি দেখেছি, আপনাদের মধ্যে অনেকে হিন্দুধর্মের প্রতি অবজ্ঞার ভাব দেখান। তাই আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনারা হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কি জানেন ? বলুন তো হিন্দুদের কোন ধর্মগ্রন্থ আপনারা পড়েছেন কি না ? আপনারা যাঁরা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পড়েছেন, তাঁরা হাত তুলুন।

[বারেক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।]

কই ? আপনারা সাড়া দিচ্ছেন না তো ! কেন ? সত্যকে স্বীকার করুন, সাহস দেখান, অকপট হোন, হাত তুলুন !···

[ক্ষণেক থামলেন]

এক—দুই—তিন। মাত্র তিনখানা হাত—মাত্র তিনজন। ছ-সাত হাজার বিদগ্ধ সুধীজনের মধ্যে হিন্দুশাস্ত্র পড়েছেন মাত্র তিনজন। আর তাইতেই আপনাদের জনমত! এই জনমত দিয়ে আপনারা হিন্দুধর্ম বিচার করার স্পর্ধা রাখেন? শুনুন আপনারা, আমার কাছে শিখুন। হিন্দু ধর্মই সমস্ত বিশ্ববাসীকে অমৃতের পুত্র বলে সম্বোধন করেছে। হিন্দুই প্রথম বলেছে, তোমার আমার মধ্যে সেই একই শক্তি বিদ্যমান। সেখানে কোন ঘৃণা নেই, কোন বিরোধ নেই, কোন ভেদবুদ্ধি নেই। সেই মহাশক্তি পরমপুরুষের মধ্যে সবাই একীভূত। হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান কোন ধর্মই ছোট নয়, বড় নয়। ধর্মভাব বা পবিত্রতা কোন মঠ মন্দির বা গির্জার একচেটে নয়। প্রত্যেক ধর্মেই এক মন্ত্র—শান্তি আর কল্যাণ, প্রেম আর মৈত্রী।

আলো নিভলো। পরক্ষণেই আলো জ্বললো। সেই একই দৃশ্য। ধর্মসভা চলছে। শুধু তারিখটা বদলেছে। ২৭শে সেপ্টেম্বর।

স্বামীজী বক্তৃতা করছেন।

স্বামীজী। প্রত্যেক ধর্মমতেই সত্য আছে। সাধু চরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটা বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এবং প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতির মধ্যেই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করেছেন।

চতুর্থ দৃশ্য

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ খৃস্টাব্দ।

ঘর। স্বামীজী একা একখানি চেয়ারে বসে আছেন। সামনে একখানি বড় টেবিল। টেবিলের উপর অনেকগুলি খবরের কাগজ পড়ে আছে। স্বামীজী একখানি কাগজ তুলে নিয়ে দেখতে লাগলেন।

অন্তরীক্ষে: নিউ ইয়র্ক হেরাল্‌ড্।

ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দই প্রধান ব্যক্তি।

[হাতের কাগজখানি রেখে স্বামীজী আরেকখানি কাগজ তুলে নিলেন, দেখতে লাগলেন।]

অন্তরীক্ষে: দি নিউ ইয়র্ক ক্রিটিক।

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাশক্তি ঈশ্বরদত্ত। তাঁর গৈরিক বসন, তাঁর মুখশ্রী যেমন সুন্দর, কণ্ঠও তেমনি বীণার ঝঙ্কারের মতো মধুর।

[হাতের কাগজখানি রেখে স্বামীজী আরেকখানি কাগজ নিলেন।]

অন্তরীক্ষে: দি বোস্টন ইভ্‌নিং।

স্বামী বিবেকানন্দের চেহারা আর প্রচারিত ভাবসমূহের মহত্ত্বে সকলের কাছেই তিনি প্রিয় হয়ে উঠেছেন। এমন আত্মাভিমান শূন্য মানুষ আর দেখিনি।

[স্বামীজী হাতের কাগজখানি রেখে, আরেকখানি কাগজ নিলেন।]

অন্তরীক্ষে : দি প্রেস অফ আমেরিকা।

আচার্য বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনে সমস্ত খৃস্টীয় পণ্ডিতগণ বিমুগ্ধ হয়েছেন—বিস্মিত হয়েছেন।

[হাতের কাগজখানি স্বামীজী রাখলেন। জানলা দিয়ে বাইরের পানে তাকালেন। উদাসভাবে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। কেমন যেন আনমনাভাব। তারপর সহসা।]

স্বামীজী। মা—মা—মাগো, কি হবে মা, আমার এই নামে? আমার দেশজননী যে দুঃখে দৈন্যে কাঁদছে। কোটি কোটি ভারতবাসী একমুষ্টি অন্নের জন্য মরছে। আর এই দেশে এরা কোটি কোটি টাকা খরচ করছে ব্যক্তিগত সুখের জন্য। মাগো, আমি কি করবো, আমায় পথ দেখিয়ে দে। বলে দে মা, আমি কি করবো।

[চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ভাবাবেগে তন্ময় হয়ে গেলেন।]

অন্তরীক্ষে : উত্তিষ্ঠত: জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধতঃ। বিশ্বনিয়ন্তার উপর বিশ্বাস রাখো, তিনি তোমাকে পথ দেখাবেন। সেই মহাশক্তি তো সবভূতে বিরাজমান। তিনি তো তোমার মধ্যেও রয়েছেন, তত্ত্বমসি—তুমিই তিনি। সন্দেহ কেন? দ্বিধা কিসের? জেগে ওঠো, তোমার শক্তিকে জাগ্রত কর। তোমার আদর্শ নিয়ে এগিয়ে চল, তোমার লক্ষ্য স্থির রাখো—

স্বামীজী। [আত্মস্থভাবে] সোঽহং—সোঽহং—সোঽহং—

[বলতে বলতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।]

—যবনিকা—

ছড়া

জ্যোতি ভূষণ চাকী

নটু সেদিন
বলল, 'শোনো দাদু,
তোমার দাড়ির যেমন ঘটা
আর চুলে বাঁধছে জটা
তাতে লোকে নির্ঘাৎ
বলবে তোমায় সাধু!'

দাদু বলল,
'সকাল সন্ধ্যেবেলা
তুমি আমার কাছে থাকো
ওভাই, একটু নড়ো নাকো;
তাতে লোকে তোমায়
বলবে আমার চেলা!'

রেবন্ত কুমার গোস্বামী

(পাকিস্তান থেকে এসে অরুমিতুরা সোনাপোতায় ছিল। বাবা কলকাতায় মেসে থাকতেন, হঠাৎ দুর্ঘটনায় মারা যান। সোনাপোতা ছেড়ে সিঁথির ছোট্ট বাড়িতে এসে প্রথমে ওদের খুব মন খারাপ হয়েছিল। সুমিতাদি ও দীপুদাকে নিয়ে মামা-মামী ওদের দেখতে এসেছিলেন। কাছেই মামার বাড়ি।

পাশের বাড়ির সীতামাসী একটা স্কুলের হেড মিস্ট্রেস। মিতু তাঁর স্কুলেই ভর্তি হল। মাও সেখানে সেলাই শেখাবেন। অরুর স্কুল একটু দূরে)।

চার

স্কুলে প্রথম প্রথম সহপাঠীরা অরুর পেছনে লেগে থাকত—সে গ্রাম থেকে এসেছে বলে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই অরুকে তাদের ভালো লেগে গেল তার মধুর ব্যবহারের জন্যে।

মাস্টার মশাইরাও তাকে ভালবাসেন। কারণ সেই ক্লাসের সব চাইতে মেধাবী ছেলে।

বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই নিশীথবাবু অরুর বিদ্যানুরাগ দেখে বলেন, 'অরু সত্যিকারের বিজ্ঞানী হও। বিজ্ঞানকে জানার চেষ্টা কর। বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান। মনটাকেও বিজ্ঞানী করে তুলবে। যাচাই না করে কিছুই গ্রহণ করবে না। আবার যাচাই না করে কিছু হেসে উড়িয়েও দেবে না। জানবে মানুষের ক্ষমতা অতি সীমাবদ্ধ। আমাদের চোখ নাক কান যা গ্রহণ করতে পারে তার চাইতেও বেশি পারে কুকুর বেড়াল জাতীয় ইতর প্রাণীরা। তবুও মানুষ বেশি জানে—তার বিজ্ঞানী প্রবৃত্তি দিয়ে।'

তিনি আরো বলেন, 'জানবে বিজ্ঞানই সত্য। বৈজ্ঞানিক নিয়ম মানুষের সৃষ্টির আগেও ছিল। আবার মনুষ্যজাতি যখন পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে তখনও থাকবে।'

অরু বলে, 'সে কেমন করে স্যার?'

নিশীথবাবু হেসে বলেন, 'কেন ? তখনও আলোর গতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার দুশো মাইলই থাকবে। কমবে না বাড়বে না। যদি কমে বাড়ে সেটাও বিজ্ঞানের নিয়মে। তবে দুঃখের বিষয় সেটাকে সেকেণ্ডে মাইলে মাপার জন্যে কেউই থাকবে না।'

নিশীথবাবু পড়ানও গল্প বলার মতো করে। অরুর শুনতে খুব ভাল লাগে। সে এসে মিতুর কাছে গল্প করে।

নিশীথবাবুকে দেখে অরুর মনে হয়েছিল গণিদাদুর কথা। ইফাতকারের বাবা। দুজনেরই কাঁচাপাকা চুল দাড়ি। গণিদাদুর তো প্রায় একেবারে সাদা। ঠিক রবিঠাকুরের মতো।

ইফাতকারের বাবা অরুদের বাড়ি মাঝে মাঝে আসতেন। গ্রামের সব বাড়িতেই যেতেন। বিশেষ করে যারা খুব গরীব তাদের কাছে। কত কথা বলতেন, অরু সব বুঝতে পারত না।

মা তাঁকে ডাকতেন কাকা বলে। তাই অরুমিতুরা বলত গণিদাদু।

ইফাতকার একদিন অরুকে বলেছিল, 'এই, তুই আমাকে মামা বলে ডাকবি।'

অরু বলেছিল, 'ইঃ মামার বাড়ির আব্দার !'

একদিন অরু ইফাতকারকে ডাকতে গিয়ে দেখে গণিদাদু বারান্দার অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। তাকে দেখে বললেন, 'বসো, ইফাতকার একটু পরেই আসবে।'

হঠাৎ তিনি বললেন, 'আচ্ছা অরু, কোনো দেশে সব টেকোরা মিলে যদি একটা ক্লাব করে তবে কেমন হয় ?'

অরু হেসে উঠে বলে, 'দাদুর যেমন কথা !'

গণিদাদু কিন্তু হাসলেন না। বললেন কিছুদিন আগে কাগজে দেখেছিলাম কোন দেশে যেন এরকম একটা ক্লাব হয়েছে। হোক। কিন্তু টেকোরা যদি বলে তারা চুলওয়ালাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে আলাদা বেঞ্চে বসবে, চুলওয়ালাদের ছেলেমেয়েদের সংগে বসবে না—তাহলে কেমন হয় ?'

অরু গণিদাদুর অদ্ভুত কথা শুনে হেসেই বাঁচে না।

গণিদাদু বললেন, 'তুমি হাসছ। কিন্তু এরকমই হচ্ছে আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়। কিন্তু কেউ হাসছে না তো। গায়ের রং সাদা বা কালো হওয়া আর মাথায় টাক হওয়া না হওয়া এর ওপর কারো হাত আছে ?'

গণিদাদু আরো বলেন, 'ঠিক সেরকম যদি মাছখাওয়া লোকরা বলে আমাদের আলাদা দেশ চাই, মাংস খাওয়া লোকদের সংগে থাকব না—তবে লোকে তাদের কথা শুনবে না। পাগল বলবে। তারা বলবে তোমরা কি খাবে না খাবে সেটা তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওর মধ্যে রাজনীতি আসে কি করে ?'

'কিন্তু ধর্মটাও কি মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় ? রাম কি করে তার মনুষ্যত্ব, তার বিবেক, নৈতিক চরিত্রকে আরো উন্নত করবে, সেটা রামের ব্যক্তিগত ব্যাপার। শ্যাম যাই করুক না কেন।

শ্যামের ধর্ম নিশ্চয় শ্যামের মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের জন্যে রামের মাথা কাটতে বলবে না। তবে কেন এরকম হচ্ছে? আমার দেশের মানুষ আর কবে বুঝবে?' গণিদাহু অসহায়ের মতো তাকান।

তারপর হঠাৎ লজ্জিত হয়ে বলেন, 'ছাখ্ তো, তোর সামনে কি সব আবোল তাবোল বকতে আরম্ভ করেছি। ঐ যে তোর বন্ধু এসে গিয়েছে। যাও, কিন্তু বেশি দেরি কর না।' গণিদাহু কখনো 'তুই' কখনো 'তুমি' বলতেন অরুকে।'

সীতামাসীর ছেলে অন্তুদাকে অরু একদিন গণিদাত্নর কথা বলেছিল।

অরু জিজ্ঞেস করেছিল, 'অন্তুদা, তুমি নাকি নাস্তিক। ভগবান মানো না।'

অন্তুদা বলেছিল, 'কি জানি। তোর গুরু আইনস্টাইন বলেন ভগবান নেই; পরমহংসদেব বলেছেন তাঁকে দেখেছেন; রবীন্দ্রনাথ বলেছেন জীবনদেবতার কথা, কিন্তু তাঁকে দেখেছেন কিনা শুনিনি; আর লোকে যাঁকে স্বয়ং ভগবান বলে মনে করে সেই বুদ্ধদেব নিজে ভগবান সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। বোঝ ব্যাপার! সুতরাং আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের চুপ করে থাকাই ভালো, কি বলিস?'

তারপরে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আচ্ছা অরু, ধর্ম করে গত কুড়ি বছরে আমাদের দেশে কয়জন স্বর্গে আর বেহেস্তে গেছে জানিস?'

অরুর মনে হয় অন্তুদা ঠিক গণিদাত্নর মতো অদ্ভুত কথা বলছে। সে বলে, 'তা আবার জানা যায় নাকি?'

অন্তুদা বলে, 'না, তার কোনো স্ট্যাটিসটিক্স্ নেই।'

অরু অন্তুদাকে বলে গণিদাত্নর কথা।

অন্তুদা বলে, 'তুই তো বিজ্ঞানের ছাত্র অরু। জানিস ওঁরাই হচ্ছেন এযুগের গ্যালিলিও। আজ তাঁদের বিরোধীরা তাঁদের ব্যঙ্গ করবে, অপদস্থ করবে। তারা হয় স্বার্থপর সুবিধাবাদী, নয়ত অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কিন্তু একদিন দেখবি ওঁদের জয়ের পতাকা উড়ছে ঘরে ঘরে। যেদিন অন্ধকারের বাসিন্দা মানুষের সূর্যের আলোর সংগে পরিচয় হবে। তাঁদের হাতেই রয়েছে ভাবীকালের দূরবীক্ষণ।'

অরু চুপ করে কি ভাবছিল। দূর থেকে রেডিওর গান ভেসে আসছিল—

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে—'

পাঁচ

নিশীথবাবুর ছেলে কল্যাণও অরুর সংগে পড়ে। তার সংগেই অরুর সব চাইতে আগে ভাব হয়। তাকে অনেকটা দীপুদার মতো লাগে অরুর।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পরেই অরু দেখে তার বেঞ্চে পাশের ছেলেটির হাতে একটা গল্পের বই। সে লুব্ধ দৃষ্টিতে বইটির দিকে বোধহয় কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল। সেটা লক্ষ্য করেছিল ছেলেটি— অর্থাৎ কল্যাণ।

সে বলল, 'কিরে, পড়তে নিবি নাকি ?' অরু লজ্জা পেয়ে কিছু বলল না।

কল্যাণ নিজে থেকেই বইটি তাকে দিয়ে বলল, 'বইটা দিচ্ছি। তবে—হ্যাঁ—তিনটি সর্তে। এক নম্বর—বইটি অবিকৃত অবস্থায় মলাটসহ প্রত্যর্পণ করিবে। দু'নম্বর—পুস্তক পড়িতে দেওয়ার অর্থ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিবার জন্য দেওয়া নয় সেটা মনে রাখিবে। তিন নম্বর—পরের নিকট হইতে বই লইয়া আরেকজন তৃতীয় ব্যক্তিকে পড়িতে দেওয়া উদারতার পরিচয় নহে—সেটাও মনে রাখিবে।'

অরু হেসে ফেলল। বইটার নাম দেখল—'আবার যখের ধন।' বাড়ি গিয়ে বইটা পড়ে তার খুব ভালো লাগল। সবচেয়ে ভালো লাগল যেখানে সংকেত দিয়ে চিঠি লেখা হয়েছে।

পরদিন অরু মিতুকে ডেকে তাকে একটা কাগজ দিয়ে বলল, 'বল্‌তো মিতু, এতে কি লেখা আছে ?'

মিতু দেখল লেখা আছে—

$(1+18+21+16)-(11+21+13+1+18)-(2+1+19+21)$

মিতু বলল, 'তোর চেয়ে অংকে কাঁচা হতে পারি ছোটদা। কিন্তু এ সরলটা অনায়াসেই করতে পারব।'

অরু বলল, 'দূর বোকা, সরল হলে তোকে দিতাম কেন ? এটা একটা সংকেত। আচ্ছা, তোকে বলে দিচ্ছি। যত অংক তত নম্বর ইংরাজী অক্ষর পাশাপাশি বসিয়ে দে। যেমন, 1 হলে A। যোগচিহ্ন থাকলে পাশাপাশি বসাবি। বিয়োগচিহ্ন থাকলে ফাঁক রাখবি। এবার করতো।'

মিতু পেনসিল নিয়ে লিখতে লাগল আঙুল গুনে গুনে। কিছুক্ষণ পরে বলল, 'আরে, বেশ মজা তো! তোর নাম হয়ে গেল—ARUP KUMAR BASU.'

অরু বলল, 'আচ্ছা এবার পেনসিল দিয়ে টেবিলে টোকা দিচ্ছি। তুই শব্দ গুনে গুনে অক্ষর বসা। দ্যাখ্‌ তো, কি বলছি।'

টোকার শব্দের সংগে সংগে মিতু মনে মনে পড়ে চলল—এ বি সি ডি ই! প্রথম তের টোকায় M.

কিছুক্ষণ পরে বলল, 'লিখেছি। MITU'

মিতু বলল, 'বারে! বেশ মজার জিনিস তো। হ্যাঁরে ছোটদা, এইভাবেই বোধহয় টরে টক্কা করে টেলিগ্রাম পাঠায়—না ?'

অরু বলে, 'তুই একটা বোকা। এইভাবে পাঠালে Z অক্ষরটা পাঠাতেই বেলা কেটে যাবে। ZULU শব্দটা পাঠাতে কতক্ষণ লাগবে ভাবতো। টেলিগ্রাফের আলাদা সংকেত আছে।'

অরু ভাবে তার বোনটার সত্যিই বুদ্ধিটা একটু কম। অথচ ধাঁধার উত্তরের বেলায় তার মাথা খেলে অরুর চাইতে ভালো। অরু তো কোনোটাই পারে না।

সেদিন অন্তুদা জিজ্ঞেস করল, 'বল্‌তো অরু, ক খ-এর ভাই। কিন্তু খ ক-এর ভাই নয়। এটা কি করে হয় ?'

অরু বলে, 'যাঃ। তাই আবার হয় নাকি ?'

মিতু চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'কেন হবে না ? খ ক-এর বোন।'

অরু বোকা বনে যায়। ভাবে, এত সোজা উত্তরও সে বলতে পারল না।

অন্তুদা বলল, 'নিজে বোন কিনা, তাই মিতু বলতে পারল।'

কিন্তু অরু জানে, মিতুর উপস্থিত বুদ্ধি তার চাইতে অনেক বেশি।

ছয়

কল্যাণের সংগে বন্ধুত্ব ক্রমে ঘনিষ্ঠ হলো। অরু তাকে বলে তাদের সোনাপাতার গল্প—বিকাশ, ইফতিকার, বাদল—ওদের কথা। সেখানে দোলের সময় কেমন করে বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে পিচকারী তৈরি করত—লিলি ফুলগাছের অয়েলপেপারের মতো পাতলা শেকড় ছাড়িয়ে কুমকুমের পটকা তৈরী করত, সে সব গল্প। বনভোজনের গল্প, সাঁতার কাটার গল্প।

সে সব শুনে কল্যাণ বলত, 'তবে তুই এখানে এলি কেন রে ব্যাটা ? গাড়ি চাপা পড়ার জন্যে ?'

কল্যাণ মাঝে মাঝে এরকম রেগে তাকে গালি দিত। অরু জানত কল্যাণের স্বভাবই ওরকম। সে হাসত।

অরু কল্যাণকে বলত, তার ইচ্ছা বড় হয়ে বৈজ্ঞানিক হবে। কল্যাণকে জিজ্ঞেস করত সে কি হবে।

কল্যাণ বলত, 'আমার তো ইচ্ছা ঘুড়ি হওয়ার।'

অরু অবাক হয়ে বলত, 'সে আবার কি ?'

কল্যাণ বলে, 'কেন ! বেশ আকাশে আকাশে উড়ব। নিচে মারামারি ফাটাফাটি যা হোক না কেন টেরই পাব না। পরে একদিন ভোকাট্টা হয়ে যাব।'

অরু তার কথায় হেসে ফেলে।

কল্যাণ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, 'কিন্তু আমি জানি, আমাকে ফুটবলই হতে হবে।'

'সেটাই বা কি ?' অরু জিজ্ঞেস করে।

কল্যাণ বলে, 'অর্থাৎ যে যেদিকে লাথি মারবে সেদিকেই যেতে হবে। বাবা চাইবেন ডাক্তার হই। মা হয়ত চাইবেন দাদুর মতো উকীল হই। শেষকালে, ফুরুৎ করে হয়ত সরস্বতী পাঠশালায় মাষ্টারির গোলেই ঢুকে পড়ব। যে যা চায় তাই কি হতে পারে ? আমি কি ঘুড়ি হতে পারব ? আমাকে ঐ ঠেলাগাড়িই হতে হবে। তারপরে হঠাৎ একদিন বাসের ধাক্কায় দেড় ঠ্যাংএ উল্টে থাকব।'

অরু ভাবে কল্যাণ তার চেয়ে কত বেশি চিন্তা করে।

বাসের ধাক্কায় কথা শুনে অরুর কি মনে হয়। কল্যাণকে জিজ্ঞেস করে, 'এই—নন্দলাল বোস লেন কোথায় জানিস ?'

হঠাৎ এই প্রশ্নে কল্যাণ অবাক হয়ে বলে, 'কেন ?'

অরু বলে, 'না, এমনি। আমার বাবা কলকাতায় থাকতে ওখানে একটা মেসে থাকত।'

কল্যাণ বলে, 'বাগবাজারের দিকে কোথায় যেন। আমি ঠিক জানি না।'

ক্রমশঃ

পালোয়ান মামা

ঝুমুর চৌধুরী

গভীর বনে বাবার কোয়ার্টার।
বাবা আমার ফরেস্ট্ অফিসার।
কলকাতাতে কলেজে পড়ে মামা;
এক ছুটিতে হঠাৎ এসে মামা।
বলে, 'তোদের বন দেখতে আসা!
দেখতে হবে কত জীবের বাসা।
বাঘ, হায়েনা—এসব আছে তো রে?
নাকি শুধুই কাঠবেড়ালী, ওরে?'
যখন বলি, আছে একটা বাঘ।'
বলে, 'আচ্ছা, দেখিস হাতের তাগ;
লাঠির ঘায়েই খতম হবে প্রাণ।'
ফুলিয়ে বুক ধরল মামা গান॥
মামার দেহ শক্ত গড়া, দেখি;
পাথর কুঁদে গড়েছে কেউ এ কি!
সসম্ভ্রমে মামার গুণ গাই
এমন দেহ আর দেখিনি ভাই।
পারবে বটে মারতে মামা বাঘ;
একটু শুধু লাঠির চাই তাগ॥

ক'দিন গেল। বলল মামা, 'কিরে
বাঘের দেখি উধাও টিকিটিরে।
দেখা পাওয়া—সে তো দূরস্থান;
এক দিনও তো না শুনি তার গান।'
আমরা বলি, 'তাই তো, বন্ধ ডাক!'
বলল মামা, 'আমায় দেখে বাঘ
পালিয়ে গেছে বনের সীমা ছেড়ে।
নয়তো দিতাম গোঁফ জোড়া ওর নেড়ে।'

সেদিন সাঁঝে মেঘের ঘনঘটা;
বাইরে ব'সে বই পড়ছি মোটা।
নিচের মাঠে মামা ব্যায়াম করে
বাতাস টেনে বুক ফুলিয়ে ধরে।
সেলাম করি বিরাট পালোয়ান;
ঘামছে মামা, গাইছে চাঁছা গান॥
এমন সময়,—হঠাৎ এ কি হল?
মামা দেখি ছটফটিয়ে মল!
'হালুম' করে ডাকল বুঝি বাঘ:
ভিরমি খেয়ে মামা তখন কাত।—
'গেলুম ওরে, আমায় ধরে রাখ:—
ঐ বুঝিরে নিলে আমায় বাঘ!'
এই না বলে মামা চক্ষু তুলে
জ্ঞান হারিয়ে নিথর হয়ে শুলে॥
বাইরে থেকে ভিতর ঘরে এনে
জল ছিটিয়ে বহু মানত মেনে,
বহু কষ্টে মামার জ্ঞানটি আসে—
মামার চোখে ভয় যে তবু ভাসে।
বলল মামা, 'আমি বেঁচেই আছি?'
এই না বলে দিল দেদার হাঁচি॥
বলি, 'মামা, ভয় পেয়েছ ভুলে—
বাঘ ডাকে নি, মেঘের ডাকেই শুলে!
হঠাৎ মেঘে বাজ ডেকেছে যেই,
উলটে পড়ে জ্ঞান হারালে সেই।'
উঠল মামা, বলল হেসে, 'তাই!
নয় তো আমি জ্ঞান হারিয়ে যাই!
বাঘ এলে তো যেত লড়াই করা:
মেঘ আকাশে—যায় না যে তা ধরা!'

রামায়ণ গানের ছপ্পা

সুবীর চট্টোপাধ্যায়

পাগলাগড় গাঁয়ের ছেলে চাঁদবদন সাউ।
বারোবারের টেস্টে যখন হল না অ্যালাউ।
মনের দুঃখে লেখাপড়া দিয়ে রসাতল
বন্ধু নিয়ে খুলল শেষে রামায়ণের দল।
গাঁয়ের লোকে করল তাড়া, গাইয়ের দল ছাড়ল পাড়া,
বেলগাছের তলায় বসে, গান ধরল আবার কষে
বেলগাছটার মগডালেতে থাকত রে ভাই সত্যি
সাতপুরুষের সাধের বাসায় সে এক বেম্মদত্যি
গানের ঠেলায় বেম্মদত্যি ছুটল তাড়াতাড়ি
পাশের গাঁয়ের হাড়গিলে হোড় পালোয়ানের বাড়ি।

বলল তাকে বেম্মদত্যি—গেল বুঝি প্রাণ !
বাসা ছাড়া করল মোরে রামায়ণের গান।
তাড়িয়ে ওদের দেখাও যদি কসরৎ তোমার
তারপরেতে সর্তমতন পাবে পুরস্কার !'

'হেঁ হেঁ সে আর বলতে, এক্ষুনি তাড়াচ্ছি 'বেটাদের।' কথাটা বলেই গোটা কুড়ি ডন বৈঠক দিয়ে একটা পেল্লায় গদা তুলে নিয়ে হাড়গিলে ছুটল বেলতলায়।

'বেরো ব্যাটারা সিঙে ফোঁকা গাইয়ের দল। আমার ভিটেয় বসে মড়াকান্না। পিটিয়ে তোদের পাঁপড়ভাজা করে দেব।' গদা ঘুরিয়ে চাঁদবদন আর তার দলবলকে তাড়া করল হাড়গিলে। হাড়গিলের মৈনাক পাহাড়ের মত মেদবহুল বিপুল বপু আর সালগাছের মতো হাতে একটা প্রমাণ সাইজের গদা দেখে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই চাঁদবদনের দল হাওয়া। তাড়াতাড়িতে ওরা বাদ্যযন্ত্রগুলো নিতেও ভুলে গেল।

মুগুর হাতে হাড়গিলে হোড়
দেখায় খেলা তার।
আসছে তেড়ে হস্তী যেন
বাপ্‌রে কি চিৎকার ॥

'আমার ভিটেয় মড়াকান্না !
মার্ বেটাদের মার'
বাজনা ফেলে গাইয়ের দল
হ'ল পগার পার ॥

রামায়ণ গানের দল চোখের আড়াল হ'তেই একগাল হেসে বেম্মদত্যি হাড়গিলের সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড ক'রে বলল, 'বন্ধু বড় উপকার করলে তুমি। এর বদলে তোমাকে যা দেব বলেছি সব পাবে। তবে, একটা চাল চালতে হবে। আমি জমিদারের মেয়ের ঘাড়ে গিয়ে চাপব। পৃথিবীর কোন গুনিন্ বা ওঝা আমাকে নামাতে পারবে না। শুধু তুমি গেলেই আমি জমিদারের মেয়ের ঘাড় থেকে নেমে যাব। ব্যাস্ তাহলেই কেল্লা ফতে।

কিছুদিনের মধ্যেই গাঁয়ে হৈ চৈ পড়ে গেল। জমিদারের মেয়েকে ভুতে পেয়েছে। সাতটা নয়, পাঁচটা নয় ঐ একটি মাত্তর মেয়ে, পরমাসুন্দরী। জমিদার মনের দুঃখে নাওয়া খাওয়া ছেড়েছেন। এদেশ ওদেশ বিদেশ বিভুঁই থেকে হাজার ওঝা বদ্যি হাকিম কোবরেজ আসছেন। কিন্তু কোনো উন্নতি নেই।

হাড়গিলে ওঁৎ পেতে বসেছিল। তাল বুঝে সে সোজা গিয়ে হাজির হ'ল জমিদার বাড়ি। গোঁফে মোচড় দিয়ে বলল, 'দেখুন জমিদার মশাই আপনার মেয়ের ঘাড়ে যিনি চেপেছেন তিনি, ভুত অদ্ভুত কিম্ভুত নিমভুত যাই হোন না কেন তাঁকে আমি ঠিক নামিয়ে দেব। তবে একটা সর্তে। ঐ মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে আর আধ্বেক গাঁ যৌতুক দিতে হবে।' কি আর করেন জমিদার। ব্যাজার হয়ে রাজি হলেন শেষ পর্যন্ত।

হাড়গিলে জমিদারের অন্দর মহলে পা দিতে না দিতেই জমিদারের মেয়ের মুখ দিয়ে বেম্মদত্যি বললে, 'বন্ধু এসেছ ? এবার তবে আমি যাই। কিন্তু মনে রেখ, আর কোথাও যেন আমাকে ছাড়াতে যেওনা। তা হ'লেই ঘাড় মট্‌কে দেব।' বেম্মদত্যি জমিদারের মেয়ের ঘাড় থেকে নেবে তার পুরোনো

আস্তানা বেলগাছের মগডালে পাড়ি দিল। মহা ধুমধাম ক'রে জমিদারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'ল হাড়গিলের। আধখানা গাঁয়ের মালিকও হ'ল সে।

রাতারাতি চতুর্দিকে ছড়াল খবর—
জমিদারের মেয়ের ঘাড়ে ভূত চেপেছে জোর॥
রোজা ওঝা বদ্যি হাকিম দেশ ও বিদেশের,
কায়দা কানুন কসরৎ খেল দেখিয়ে গেছে ঢের॥
তবুও তো কোনরকম উন্নতি নেই হায়,
সময় মত হাড়গিলে হোড় সেইখানেতে যায়॥
তাকে দেখে বেম্মদত্যি বলে 'এবার চলি,
বন্ধু শোন একটা কথা স্পষ্ট ক'রে বলি॥
অন্য কোথাও ভূত নামাতে যেওনা যেন আর
মুণ্ডুখানা ধড়ে তবে থাকবে না তোমার'
এই না বলে দত্যি গেল আগের আস্তানা।
হাড়গিলে হোল পেল সবই, সর্তে ছিল যা॥

সুখেই চলছিল হাড়গিলের সংসার, হঠাৎ জমিদারকেই ভূতে ধরল। ট্যাঁড়া পিটিয়ে চারদিকে খবর দেওয়া হ'ল। সবাই বললে, 'জমিদারের জামাই তো মস্ত গুনিন। তাকেই ডাকো এবার। খবর গেল হাড়গিলের বাড়ি। হাড়গিলের বৌ তো কেঁদে কেটে গঙ্গা নদী বইয়ে দিল। হাড়গিলে উভয় সঙ্কটে পড়ল। বেম্মদত্যি তাকে পই পই বারণ ক'রেছে অন্য কোথাও ভুত ছাড়াতে না যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে না গেলেই নয়।

হাড়গিলে হোড় খোশমেজাজে
আছে রাজার হালে।
হায় বুঝি তার সুখটুকু আর
থাকল না কপালে॥

জমিদারকেই ভূতে পেল,
বাজল ট্যাঁড়া ঢাক।
ভূত নামাতে হাড়গিলেরই
পড়ল আবার ডাক॥

ভাবতে ভাবতে একটা সূক্ষ্ম বুদ্ধি বেরিয়ে এল হাড়গিলের মোটা মাথা থেকে। সে চলল জমিদার বাড়িতে। তাকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠল জমিদার, মানে বেম্মদত্যি, 'ওরে হতভাগা মুখপোড়া উল্মুলম্ব এবার তোর ঘাড় মটকে…'

বেম্মদত্যি অর্থাৎ জমিদারকে থামিয়ে দিয়ে হাড়গিলে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, 'আহাহা রাগছ কেন বন্ধু? তোমার দয়ায় আজ আমি মস্ত বড়লোক। তোমার আর একটা উপকার আমি করতে এসেছি।'

'কি ব্যাপার তাড়াতাড়ি বল্' রাগে কাঁপছে বেম্মদত্যি।

হাড়গিলে গোঁফে তা দিয়ে বলল, 'সেই রামায়ণ গানের দল জমিদারের ভূত ছাড়াতে আসছে খবর পেলুম।'

'অ্যাঁ বলিস্ কিরে! এবার প্রাণে মারা যাব নির্ঘাৎ। ওরে বাবা, কোন্ দিক দিয়ে আসছে ঐ বোম্বেটে গাইয়ের দল?'

'পশ্চিম দিক দিয়ে' চোখ নাচিয়ে বলল হাড়গিলে।

'ধন্যবাদ তোমায় বন্ধু। আমি পুব দিক দিয়ে পালালাম। বাপ্‌রে···'

এই না বলে, পড়ি কি মরি ক'রে ঝড়ের বেগে ছুটল বেম্মদত্যি পুবদিকের বন্ধ দরজা ভেঙ্গে তছ্‌নছ্‌ ক'রে। গায়ে যেন তার একশো হাতির তেজ!

নিরুপায় হাড়গিলে
ভেবে দিন রাত,
বুদ্ধি খাটাল এক
ছ্যাখ্‌ রে কায়দা ছ্যাখ্‌
সেই চালে ঝটপট
হ'ল বাজিমাত॥
হাড়গিলে গেল সেথায়
দেখা পেয়ে তার
ভূত রেগে অস্থির,
ভাঙ্গে বুঝি ঘাড়॥
হাড়গিলে হেসে বলে
গোঁফে দিয়ে তা।
'শোন শোন বন্ধু গো
রাগ ক'র না,
খবর এসেছে এক
মিথ্যে তো নয়,
কি জানি কি হবে ভাই
শুনে লাগে ভয়॥

আসছে এখানে নাকি
রামায়ণ দল।'
তাই শুনে ভূত কাঁপে,
বলে, 'ওরে বল্‌
কোন দিক দিয়ে ওরা
আসছে রে ভাই?
নির্ঘাৎ মারা যাব,
এবারে পালাই॥'
হাড়গিলে হেসে বলে
'পশ্চিম দিয়ে'
পুবের বন্ধ দ্বার
মাটিয়ে মিশিয়ে
দম্‌কা ঝড়ের বেগে
দত্যি পালায়।
একশো হাতির তেজ
যেন তার গায়॥

=প তন্ম=

* প্রচলিত উপকথার গল্প অবলম্বনে

(সমুদ্রের তলদেশ সম্বন্ধে জানবার জন্য স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল, তারপরে আর ফিরে আসেনি। এই অভিযানের নেতা ছিলেন মহাপণ্ডিত ডঃ ম্যারাকট ও জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপটেন হাওসি। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত প্রাণিবিদ মিঃ সাইরাস হেডলি, ইঞ্জিনিয়ার বিল স্ক্যানল্যান ও আরো ২৩ জন। একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তলদেশে অনুসন্ধান চালানই হল ম্যারাকটের উদ্দেশ্য।

৫ই জানুয়ারি আরাবেলা নোউল্‌স্‌ নামক জাহাজ হাল্কা গ্যাসে ভরা এবং বিশেষ উপাদানে তৈরি একটি ঝকঝকে গোলকের ভিতর হেডলির চিঠিতে এক অত্যাশ্চর্য বিবরণ জানতে পারে।

জানা যায় যে এক ঝুলন্ত খাঁচার মতন যন্ত্রের সাহায্যে ম্যারাকট, হেডলি ও স্ক্যানল্যান আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তলায় এক গভীর খাদের ধারে অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন। জাহাজের সঙ্গে তাঁদের নলে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে তাঁরা গভীর খাদের মধ্যে পড়ে যান এবং এক আশ্চর্য নগরীর সন্ধান পান।

সমুদ্রগর্ভে বিশাল এক 'আশ্রয় সদনে' কৃত্রিম বাতাসের সাহায্যে জীবনধারণ করে উন্নত বিজ্ঞা সম্পন্ন এক জাতি—তাদের কাছে আশ্রয় পাওয়া গেল।

বাড়ির এক প্রান্তে প্রকাণ্ড হল ঘরে প্রাচীন ফিনীশিয়ার আদিম দেবতা বেয়্যানের পুজা হয়।

অপর দিকে একটি ঘরে গ্রীক দেবী অ্যাথিনার মূর্তি। বৃদ্ধ রক্ষক প্রাচীন গ্রীক ভাষা ডঃ ম্যারাকটের সঙ্গে আলাপ করলেন। মাণ্ডা, স্কার্পা, তাঁর মেয়ে সোনা বহু মেয়ে পুরুষের সং পরিচয় হল।

এরা বেশ হাসিখুশি মানুষ। এরা চলচ্চিত্রের মতন পর্দায় চিন্তার প্রতিচ্ছবির সাহা আগন্তুকদের কাহিনী শুনে নিল।)

কিন্তু বাকিগুলো যুগ যুগ ধরে' জমতে জমতে ক্রমশঃ ঐ বিশাল আশ্রয় সদনটিকে সমাধিস্থ করে' ফেলেছে।

'উপরে পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের শেষ চিহ্ন সেই লোহ-গোলকটিকে পিছনে ফেলে আমরা আরো এগিয়ে চললাম। হঠাৎ মনে হল এক পোঁচ কালির দাগের মত কি যেন একটা এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি হতে সেটাকে ভেঙ্গে চুরে হয়ে গেল এক দল মানুষ, সকলেরই কাচের পোষাক। তারা চওড়া ধরনের স্লেজগাড়ি টানতে টানতে আসছিল, স্লেজগুলো কয়লাতে বোঝাই। দারুণ পরিশ্রমের কাজ। স্লেজগুলোতে হাঙ্গরের চামড়ার দড়ি লাগানো, তাই ধরে বেচারিরা পিঠ বেঁকিয়ে মাথা নুইয়ে প্রাণপণে টানছিল। প্রত্যেক দলে একজন করে' সর্দার আছে। আমরা লক্ষ্য করলাম যে সর্দার আর কুলিরা দুই বিভিন্ন জাতির লোক। কুলিরা ফর্সা আর লম্বা, নীল চোখ, জোরালো শরীর। আর সর্দাররা অত ফর্সা নয়, তাছাড়া তাদের বেঁটে চওড়া গড়ন। কাঁচের পোষাকের ভিতর থেকে তো আর কথা বলবার উপায় ছিল না। ফিরে এসে ম্যারাকট্ আমাদের বলেছিলেন যে ঐ কুলিরা হয়ত সেই গ্রীক বন্দীদের বংশধর যাদের উপাস্য দেবীর মূর্তি আমরা সেদিন দেখে এসেছি।

'যেতে যেতে এই রকম কয়েক দল লোক আমরা দেখলাম, সকলেই কয়লা বোঝাই স্লেজ টানছে। শেষে আমরা একেবারে কয়লার খনিতে গিয়ে পৌঁছালাম। সেটা প্রকাণ্ড একটা গহ্বর, তাতে একটা মাটির স্তর তার পরে একটা কয়লার স্তর, আবার মাটির স্তর তার পর কয়লার স্তর, এই ভাবে রয়েছে। একদল কয়লা কাটছে আর একদল সেই কয়লা ঝুড়িতে ভরছে। উপরের লোক সেই ঝুড়ি টেনে তুলছে। কত পুরুষ ধরে' সাগরগর্ভে খোঁড়া হয়েছে এই বিরাট গহ্বর কে জানে। আমরা এক দিক থেকে তার আর এক দিক দেখতেই পেলাম না। বুঝলাম আটলান্টিয়দের যাবতীয় যন্ত্র ও কলকারখানা যে বিদ্যুতের জোরে চলছে তার যোগান আসছে এই কয়লা থেকে।

'এইখানে একটা কথা বলে নিই। মাণ্ডা ও আর সকলের কাছে আমরা আটলান্টিস্ নামটি উল্লেখ করাতে ওঁদের মুখের ভাবে খুবই বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছিল। তারপর ঘন ঘন মাথা নেড়ে তাঁরা জানিয়েছিলেন যে কথাটা বুঝতে পেরেছেন। তাহলে আমাদের কিংবদন্তীতে দেশটির নাম ঠিকই রয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে!

কয়লার খনির ডান পাশ দিয়ে সেটাকে পেরিয়ে গিয়ে আমরা আগ্নেয়শিলার খাড়া পাহাড়ের সারির কাছে এসে পৌঁছালাম। পৃথিবীর বুক ফুঁড়ে প্রথম যেদিন তারা বে'রিয়েছিল আজও তাদের গা সেদিনকার মতই পরিষ্কার উজ্জ্বল কালো রয়েছে। উপরকার মিশকালো অন্ধকারের ভিতর শ কয়েক ফুট উঁচুতে উঠে গেছে। পাহাড়ের তলায় রাশীকৃত সমুদ্রের ফুলের মত প্রবালের স্তূপ। তার ভিতর থেকে লম্বা লম্বা আগাছা গজিয়ে ঘন জঙ্গল হয়ে গেছে। সেই জঙ্গলের ধারে আমরা খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। আমাদের সঙ্গীরা আমাদের দেখাবার জন্য হাতের ডাণ্ডা দিয়ে সেই আগাছা পিটিয়ে তার ভিতর থেকে নানা অদ্ভুত আকারের মাছ আর খোলাওয়ালা জন্তু তাড়িয়ে বের করতে লাগলেন। নিজেদের খাবার জন্য এক একটা সঙ্গেও নিলেন। এক মাইল কি তারও বেশী আমরা এই রকম

ফূর্তিতে ঘুরে বেড়াবার পর দেখলাম মাণ্ডা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ভয় ও বিস্ময়ের ভঙ্গীতে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন্। আমাদেরও তখন হঠাৎ খেয়াল হল যে ডাঃ ম্যারাকট্ অদৃশ্য হয়েছেন।

'কয়লার খনিতে তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন এতে ভুল নেই, সেখান থেকে আমাদের সঙ্গে আগ্নেয়শিলার পাহাড় পর্যন্ত এসেছিলেন তাও ঠিক। তিনি আমাদের ফেলে এগিয়ে গেছেন এটাও অসম্ভব বলেই মনে হল। অতএব তিনি নিশ্চয় আমাদের পিছনে জঙ্গলের আশে পাশেই কোথাও আছেন। আমাদের বন্ধুরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু স্ক্যান্‌ল্যান্ আর আমার তো বেশ জানা ছিল সেই অন্যমনস্ক বিজ্ঞানীর আজগুবি খেয়ালের কথা, কাজেই আমরা জানতাম যে ভয়ের কোনো কারণ নেই, হয়ত একটু পরেই দেখব তিনি তন্ময় হয়ে কোনও সামুদ্রিক জীব পর্যবেক্ষণ করছেন। আমরা সবাই যেদিক থেকে এসেছিলাম সেই দিকে ফিরে চললাম। একশ গজ গিয়েছি কি না গিয়েছি। ডাঃ ম্যারাকট্‌কে দেখা গেল।

'তিনি ছুটছেন,—এমনভাবে ছুটছেন যে তাঁর মত লোকের পক্ষে তা অসম্ভব বলেই আমার ধারণা ছিল। কিন্তু আত্মরক্ষার চেষ্টায় মানুষ অনেক সময় অসাধ্য সাধন করে। তিনটি বিকট দর্শন জীব ছুটছে প্রায় তাঁর পায় পায়। সেগুলো বাঘা কাঁকড়া, গায়ে সাদা আর কালো ডোরা, প্রত্যেকটি কাঁকড়া আকারে একটি বড় জাতের কুকুরের মত। ভাগ্যক্রমে তারা খুব ক্ষিপ্রগামী জীব নয়। তড় বড় করে' পাশের দিকে অদ্ভুত ভঙ্গীতে তারা চলছিল। তবে কিনা ম্যারাকটের দম ফুরিয়ে এলেই তারা তাদের সেই বিকট দাঁড়া দিয়ে তাঁকে চিমটে ধরে' ফেলত। আমাদের বন্ধুরা তাঁদের ছুঁচালো ডাণ্ডা উঁচিয়ে তেড়ে গেলেন আর মাণ্ডা তাঁর কোমরবন্ধ থেকে জোরালো বিজলী বাতি তুলে সেই বীভৎস জানোয়ারগুলোর মুখে আলো ফেললেন। তখন তারা জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল। ম্যারাকট্ একটা প্রবালের ঢিবির উপর বসে' পড়লেন। পরে তাঁর কাছে শুনেছিলাম যে গভীর জলের কিমিরার (Chimœra) একটা দুর্লভ নমুনা সংগ্রহের আশায় তিনি জঙ্গলের ভিতর ঢুকেছিলেন, অমনি এই কাণ্ড।

'পাহাড়গুলি পার হওয়ার পর আমরা গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি উপস্থিত হলাম। সামনের ধুসর সমভূমি বিভিন্ন আকৃতির গম্বুজ ও চূড়ায় প্রায় আচ্ছন্ন। বুঝলাম সেই প্রাচীন নগর রয়েছে এর তলায়। হারকিউল্যানিয়ম যেমন লাভার নিচে আর পম্পিয়াই ছাইয়ের নিচে চাপা পড়েছে তেমনি এটিও সিন্ধুমলের নিচে একেবারেই চাপা পড়ত যদি আশ্রয়সদনের লোকেরা মাটি কেটে এখানে যাওয়া আসার পথ তৈরি না করত। এই পথটি বেশ লম্বা, ঢালু হয়ে একটা চওড়া রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। রাস্তার দুই ধারে বাড়ি। বাড়ির দেওয়ালগুলি কোথাও কোথাও চিড় খেয়েছে, কোথাও বা ধসে পড়েছে, কারণ সেগুলো আশ্রয়সদনের মত নিরেট গাঁথনি নয়। কিন্তু বাড়ির ভিতরগুলি বেশীর ভাগই সেই আট হাজার বছর আগে সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার দিন যেমন ছিল আজও তেমনি রয়েছে, কেবল সমুদ্র তাদের জায়গায় জায়গায় আলাদা রূপ দিয়েছে মাত্র—কোথাও অপরূপ সুন্দর, কোথাও ভয়ানক বীভৎস। আমাদের বন্ধুরা প্রথম দিককার বাড়িগুলো তাড়াতাড়ি পেরিয়ে এসে একটা প্রাসাদের মত সুন্দর আর বড় বাড়িতে

(সাত)

'আমরা এঁদের অতিথি না বন্দী? এক এক সময়ে সন্দেহ জাগত মনে। যাহোক দিন কয়েক পরে একদিন তাঁরা আমাদের সমুদ্রের মেঝের উপর বেড়াতে নিয়ে গেলেন। মাণ্ডা ছাড়া আরো পাঁচজন ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আমাদের ইস্পাতের খাঁচা থেকে উদ্ধার করে আনার পর আমরা প্রথম যে ঘরটাতে এসে দাঁড়িয়েছিলাম আবার সেইখানেই সবাই গিয়ে দাঁড়ালাম। এবার আমরা সেটা আর একটু ভাল করে' দেখবার সময় পেলাম। ঘরটা খুব বড়, লম্বায় চওড়ায় অন্ততঃ একশ ফুট করে। ছাদটা নিচু, ছাদ আর দেওয়াল সবই সামুদ্রিক উদ্ভিদে সবুজ হয়েছিল, টপ্ টপ্ করে' জলও ঝরছিল। চারদিকের দেওয়ালে সারি দিয়ে পেরেক লাগানো, প্রত্যেকটিতে একটি করে চিহ্ন আঁকা—বোধ হয় নম্বর। প্রত্যেক পেরেকে একটা করে স্বচ্ছ কাঁচগোলক আর এক জোড়া বাতাস তৈরির বাক্স। ঘরের মেঝে বড় বড় পাথরের টাইল বসিয়ে তৈরি। সেগুলি বহু যুগ ধরে মানুষের পায়ে পায়ে ক্ষয়ে গর্ত হয়ে গেছে, তাতে জল জমে আছে। কার্নিসের উপর বরাবর প্রতিপ্রভ নলের আলো বসানো, তাতে সমস্ত ঘর আলো হয়েছিল। কাঁচের পোষাকগুলি আমাদের গায়ে আঁটা হলে প্রত্যেকের হাতে কোনো রকম হালকা ধাতুর তৈরি একটা করে ছুঁচালো ডাণ্ডা দেওয়া হল। তারপর মাণ্ডা ইশারায় হুকুম দিলেন দেওয়ালের পাশ দিয়ে যে রেলিং রয়েছে সেইটা শক্ত করে ধরতে। সকলে তাই ধরলাম। বাইরের দরজাটা খুলে যেতেই সমুদ্রের জল হু-হু করে এত জোরে ভিতরে ঢুকতে লাগল যে রেলিংটা ধরা না থাকলে আমরা পায়ের উপর দাঁড়িতে থাকতে পারতাম না। জলের লেভেল্ অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের মাথা ছাড়িয়ে উঠল, আমাদের উপর তার তোড়ও কমে গেল। মাণ্ডা আমাদের নিয়ে দরজার দিকে এগোলেন। দরজা পার হতেই আমরা আবার সমুদ্রের পঙ্কশয্যায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। খোলা দরজা আমাদের ফেরবার পথ চেয়ে রইল।

'সমুদ্রজলে সেই আশ্চর্য অনুপ্রভার আলো কাঁপছে। তাতে আমরা চারিদিকে অন্ততঃ সিকি মাইল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। দূরে একটা খুব উজ্জ্বল আলো দেখে আমরা আশ্চর্য হলাম। মাণ্ডা সেই দিক লক্ষ্য করেই চলতে সুরু করলেন, পিছন পিছন সার বেঁধে আর সকলে চলতে লাগলাম। তাড়াতাড়ি চলা যাচ্ছিল না, জল ঠেলে এগুতে তো হচ্ছিলই তা ছাড়া নরম কাদায় পা অনেকখানি করে বসে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরেই আমরা বুঝতে পারলাম সেই উজ্জ্বল আলোটা কিসের। সেটা আমাদেরই ছেড়ে আসা লৌহগোলকখানি—আমাদের বিগত জীবনের শেষ নিদর্শন। সমুদ্রের তলায় পুঁতে যাওয়া সেই বিরাট ইমারতের অনেক গম্বুজের একটির উপরে খাঁচাটি কাত হয়ে পড়ে রয়েছে, তখনও তার আলোগুলি জ্বলছে। ভিতরটাতে চারভাগের তিনভাগই জলে ভরা, কিন্তু যেদিকে আমাদের বিদ্যুতের সমস্ত সাজসরঞ্জাম ছিল, বন্ধ বাতাসের চাপে সেদিকে জল যেতে পারেনি। ভিতরটা আমাদের এত চেনা। সেই 'সেটি'গুলি, সেই সব যন্ত্রপাতি, সমস্তই ঠিক ঠিক রয়েছে। আর, কতকগুলি বড় বড় মাছ তার ভিতরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বোতলের ভিতরে রাখা শখের মাছের মত। সবটা মিলিয়ে কি অদ্ভুতই না লাগছিল দেখতে। এক এক করে' আমরা তিন জন খোলা দরজাটা আঁকড়ে ধরে উঠে ভিতরে ঢুকলাম।

ম্যারাকট্ তাঁর একটা নোটবুক উদ্ধার করলেন—জলের উপর ভাসছিল। স্ক্যান্‌ল্যান্ আর আমি আমাদের নিজেদের গুটিকয়েক জিনিসপত্র বার করে নিলাম। মাণ্ডাও তাঁর দু একজন সঙ্গীকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। দেওয়ালে লাগানো গভীরতামাপক, উষ্মমাপক আর অন্যান্য যন্ত্রগুলি খুব আগ্রহের সঙ্গে তাঁরা দেখলেন। উষ্মমাপক অর্থাৎ থার্মোমিটারটি আমরা দেওয়াল থেকে খুলে সঙ্গে করে' নিলাম। বিজ্ঞানীরা এ খবরে ঔৎসুক্য বোধ করবেন যে সমুদ্রজলের তাপমান চল্লিশ ডিগ্রী ফারেনহাইট্, অর্থাৎ যে তাপমানে জল জমে বরফ হয় তার চাইতে আট ডিগ্রী বেশী। যে রাসায়নিক কারণে সিন্ধুজলে অনুপ্রভা দেখা যায় সেই কারণেই সমুদ্রতলের তাপমান তার উপরের স্তরের চাইতে বেশী।

'আমাদের বেড়িয়ে নিয়ে আসা ছাড়া এই ছোট্ট অভিযানটির বোধ হয় অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। সেটি হল আহার্যের সন্ধান করা। আমাদের আটলান্টিয় সঙ্গীরা থেকে থেকে তাঁদের হাতের ছুঁচালো ডাণ্ডা সজোরে নিচের দিকে চালিয়ে দিচ্ছিলেন আর প্রত্যেকবারই একটা করে' চ্যাপ্টা কটা রঙের মাছ গেঁথে তুলছিলেন। মাছগুলো সমুদ্রের মেঝের সঙ্গে এমন মিশে যাচ্ছিল যে অনভ্যস্ত চোখে তাদের ঠাহর করা মুশকিল। দেখতে দেখতে ওঁদের প্রত্যেকের কোমর থেকে দু'তিনটে করে' মাছ ঝুলতে লাগল। স্ক্যান্‌ল্যান্ আর আমারও তার কায়দাটা শিখে নিতে দেরি লাগল না, দুটো করে' মাছ দুজনে গেঁথেও ফেললাম। কিন্তু ম্যারাকট্ যেন চলেছেন স্বপ্নের ঘোরে, সাগর-গর্ভের অপরূপ সৌন্দর্যে বিভোর। মাঝে মাঝে উৎসাহের চোটে বক্তৃতাও করছেন যা আমরা কানে শুনতে পাচ্ছি না, কেবল চোখে দেখতে পাচ্ছি।

'চারিদিকের সেই ধূসর সমভূমি দেখে সেখানে আর কোনো বৈচিত্র্য নেই মনে করেছিলাম। কিন্তু এখন জানলাম পৃথিবীর উপরে যেমন তেমনি এখানেও নদী আছে, তাতে স্রোতও বয়। নরম পাঁক কেটে চলেছে সেই অন্তঃসাগরীয় স্রোত, তলাকার লাল মাটির বনিয়াদ বেরিয়ে পড়েছে। সেই লাল মাটি অসংখ্য সাদা সাদা জিনিসে প্রায় ঢাকা পড়ে' আছে। আমরা ভেবেছিলাম সেগুলো হয়ত ঝিনুক বা শাঁখ, কিন্তু পরীক্ষা করে' দেখে বোঝা গেল সেগুলো তিমি মাছের কানের হাড় আর হাঙর ও অন্যান্য জন্তুর দাঁত। আমি একটা পনের ইঞ্চি লম্বা দাঁত কুড়িয়ে পেলাম। তখন এই ভেবে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম যে ভাগ্যে এমন রাক্ষুসে জানোয়ার সমুদ্রের উপরকার স্তরেই থাকে। ম্যারাকটের মতে সেই দাঁত এক জাতের অতিকায় হিংস্র তিমিমাছের।

'সমুদ্রের এই গভীর তলদেশে একটা অদ্ভুত ব্যাপার বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। আগেই বলেছি জৈব পদার্থের অবিরাম মন্থর পচনের ফলে সমুদ্রের মেঝে থেকে একটা উত্তাপহীন আলো বেরুতে থাকে। কিন্তু মাথার উপরে অমাবস্যার রাত্রির মত মিশকালো অন্ধকার। উপর দিকে না তাকালে এমনিতে মনে হয় যেন শীতকালের মেঘলা দিন। আর উপরের ঘন অন্ধকারের ভিতর থেকে ছোট ছোট সাদা সাদা চাঁই অনবরত পড়তে থাকে, ঠিক যেন তুষারপাতের মত। আমাদের মাথার উপরে রয়েছে যে পাঁচ মাইল জল তার মধ্যে যে সব শামুক আর গুগলি জন্মাচ্ছে বড় হচ্ছে আর মারা যাচ্ছে তাদেরই খোলস এগুলি। অবশ্য অনেক খোলস নিচে এসে পড়বার আগেই জলে মিলিয়ে যায়,

'এমন সুন্দর খাইয়েছে যা তুমি জীবনে খাওনি আর খেতে পাবেও না—বুঝলে?' সৈনিকটির কথা শুনে সম্রাট হেসে ফেললেন। বললেন, 'তাই নাকি? কি এমন খাইয়েছে তোমার বন্ধু?'

সৈনিকটির চোখ চক চক করে উঠল। বলল, 'কি খাওয়াতে পারে আন্দাজ কর দেখি।' চোখ ছুটো বুজে সে বোধহয় সেই খাওয়ার কথাই ভাবতে লাগল।

সম্রাট আমোদ পেলেন। বললেন, 'বাঁধাকপির ঝোল বোধ হয়?'

'—কি বল্লে, ঝোল? হাঁ ঝোল বটে, তবে আরও ভালো কিছুর ঝোল। ভাবো, বেশ ভালো করে ভেবে বলো'! '—তবে কি পাঁঠার মাথার (বোধ হয় পাকা রুই মাছের মাথার মতই উপাদেয়) ঝোল?'

'—আরও ভালো বন্ধু আরও ভালো কিছুর নাম করতে হবে।'

'তাহলে, বোধহয় শুয়োরের মাংসের ঝোল?'

'—উঁহু হল না আরও অনেক ভালো। যাক তোমাকে আর মিছে খাটাব না।' সৈনিকটির চোখে মুখে যেন যুদ্ধ জয়ের আনন্দ ফুটে উঠল। চীৎকার করে সে আবার বলল, 'ফেজ্যাণ্ট (pheasant) পাখির ঝোল খেয়েছি, বুঝলে, ফেজ্যাণ্ট পাখির ঝোল। আর পাখিটি পেয়েছি কোথায় শুনবে? শুনলে মাথা ঘুরে যাবে। খাস সম্রাটের শিকার করবার বনে গিয়ে আমি নিজে পাখিটি মেরেছি। ঐ বনে সম্রাট ছাড় আর কেউ শিকার করতে পারে না আমার বন্ধু সম্রাটের সেই বন দেখাশুনা করে কিনা। পাখিটা কি সুন্দর খেতে সে আর কি বলবো! একেবারে তোফা।' সৈনিকটি টেনে টেনে হাসতে লাগল।

সম্রাট গম্ভীর হয়ে গেলেন। সৈনিকটি কিন্তু থামল না। একটানা বকে যেতে লাগল। তার মা বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন। ওঁরা নাকি তাঁকে খুব ভালবাসেন। সে শিগগির বিয়ে করবে। তার ভাবী বৌএর নাম গ্রেটা। এমনি সব নানান কথা।

সম্রাট হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়ি কোথায় তোমার? বৃষ্টি থেমে এসেছে। কিন্তু আমি তোমায় বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেব।'

নতুন বন্ধুটির এহেন দয়ার পরিচয় পেয়ে সৈনিকটি খুব কৃতজ্ঞ হল। আর এতক্ষণ পরে তার খেয়াল হল যে সে বক বক করে কেবল নিজের পরিচয়ই সব দিয়ে গেছে কিন্তু নতুন বন্ধুর পরিচয় ত' কিছুই নেয়নি। খুব অভদ্রতা হয়ে গেছে। যাহোক সে এলোমেলো ভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই তোমার নাম কি তাতো জানা হয়নি এখনও? তুমি কি করো?'

সম্রাট মুচকি হাসলেন। বললেন, 'এবার কিন্তু তোমার পালা, বল দেখি আমি কে?'

সৈনিকটি সম্রাটের দিকে একবার চেয়েই বলল, 'এ আর এমন কঠিন কি? তুমিও একজন··· তুমিও একজন সৈনিক। এই আমারই মত, নইলে এত ভাল হবে কি করে?'

সম্রাট হেসে বললেন, 'মিলেছে, কিন্তু আমি আরও ভালো একটা পদে কাজ করি'।

'—তবে কি তুমি, মানে না মানে, আপনি একজন লেফটেন্যাণ্ট'।

'আরও ভালো৷'

'আপনি কি কর্নেল ?' সৈনিকটি তোৎলিয়ে উঠল।

'হল না, আরও ভালো কিছুর নাম কর'

'—তবে বোধ হয় আপনি জেনারেল ?'

কিন্তু সম্রাট এতেও ঘাড় নাড়লেন দেখে সে বলে উঠল, 'আপনি প্রধান সেনাপতি ?'

সম্রাট তবু বলেন, 'আরো একটু ভালো৷'

সৈনিকটি একেবারে ফ্যাকশে হয়ে গেল। কাঁপতে লাগলো ভয়ে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল একবার। লো, 'বুঝেছি, বুঝেছি, চিনেছি আপনাকে। আপনি সম্রাট। আপনি সম্রাট।'

সে রীতিমত কাঁপছিল। হঠাৎ সে নিচে লাফিয়ে নামবার চেষ্টা করল। সম্রাট বাধা দিলেন। লেন, 'উঁহু তোমায় বাড়িতে পৌঁছে দেব বলেছি না ? চুপ করে বস'।

সৈনিকটি থপ করে বসে পড়ল। সে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সম্রাট তাঁর একটা চোখ একটু ট করে তাকে সহজ হতে বললেন। আর বললেন, 'দুটো কথা এখন থেকে মনে রাখবে। প্রথম হল বার যখন কোথাও ফেজ্যাণ্ট পাখি মারতে যাবে আগে মালিকের অনুমতি নেবে আর দ্বিতীয় হল থম আলাপেই কখনও খুলে সব কথা বন্ধুকে বলবে না, বুঝলে ?'

সৈনিকটি সম্রাটের উদার হাসি আর সুন্দর চোখ দেখে মুখটা আবার নিচু করল। তার মনে তখন হল কে জানে ?

টুটু মাস্টার

সনৎ কুমার দাস

লক্‌লকে বেত হাতে,
বলে—'টুটু মাস্টার'
চট্‌পট্ পড়ো যদি
সুনাম তো ক্লাসটার।'
কলের পুতুলগুলি
সবাই তার ছাত্র
বেশি তার ভেঙে গেছে
আছে দুটি মাত্র।
ঝির্ ঝির্ বাতাসেতে
দোলে তারা যখনই

ছট্‌ফট্ কর কেন ?
বলে টুটু তখনই।
নিজে লেখে হিজিবিজি
ছেঁড়া তার পাতাতে
মন দেয় নিজ পাঠে
রাখি হাত মাথাতে।
ঢুলুঢুলু চোখে তার
ঘুম যেই নামল,
ছাত্রদের পাঠ নেয়া
তক্ষুনি থামল॥

ঢুকলেন। তার বিরাট বিরাট থাম আর অপূর্ব কারুকার্য পৃথিবীর উপরে একটি মাত্র জায়গার কথা মনে করিয়ে দেয়, সে হল ঈজিপ্টে নীলনদের ধারে লুপ্রোর বলে একটা জায়গা। সেখানকার বহু প্রাচীন কার্নাকের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ঠিক এই ধাঁচের। কিন্তু সেও এত সুন্দর নয়। আধ আলোতে প্রকাণ্ড ঘরের মোজেইক করা মেঝের উপর দাঁড়িয়ে বড় বড় মূর্তি। রূপালী ঈল মাছ উপরে খেলে বেড়াচ্ছে। আমরা এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। একটা ছোট ঘরের মেঝে রামধনু রঙের ঝিনুক দিয়ে মিনা করা, আলো পড়তে ঝলমলিয়ে উঠল বর্ণালীর সাতটি রঙ। ঘরের এক কোণে হলদে রঙের কোনও ধাতুর তৈরি অনেক কাজ করা একটি মঞ্চ আর একটি পালঙ্ক। মনে হয় কোনো রাজারই শয়ন-মন্দির ছিল এটা। কিন্তু মোটের উপর মনে হল বাড়িটা অলক্ষুণে—যখন দেখলাম সেই পালঙ্কেরই পাশে পড়ে আছে একটা বিশ্রী কালো স্কুইড, তার দেহটা আস্তে আস্তে উঠছে পড়ছে কেমন যেন কুৎসিতভাবে। সেখান থেকে বেরিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বেরোবার পথে চোখে পড়ল একদিকে একটি ভাঙ্গা রঙ্গভূমি আর এক দিকে একটা জেটি যার শেষ মুড়োয় একটা বাতিঘর। হয়ত সেখানে ছিল একটা বন্দর।

ক্রমশঃ

সত্যি বটে

অশোক চক্রবর্তী

হাবু, তুই বললি যা মানি সবই সত্যি,
আমারও অবিশ্বাস নেই এক রত্তি।
সত্যিই সারাদিনে দশ বারো ঘণ্টা
পড়ায় ব্যস্ত থাকে তোর পুরো মনটা।
পড়তে উঠিসও ভোরে —দিদিমার সঙ্গে,
সেই থেকে যাস্ মেতে পড়বার রংগে।
অ্যাতো পড়ে নিশ্চয়ই জ্ঞান কম হয় না;
তাই কি, আমারও কাছে পড়া ধাতে সয় না?
আশংকা হয় বড় তোর কথা ভাবতে,
অ্যাতো পড়ে পারবি কি বেশি দিন বাঁচতে?
হা বেচারা, রোজ ভোরে হয়ে মহা ব্যস্ত
বসিস্ রান্নাঘরে—পিঁড়ি পেতে মস্ত।
তারপরে সারাদিন—হয়ে যেন যন্ত্র—
শুধুই পড়িস্ (তবে···পেটপুজো মন্ত্র।)
দিদিমা—সরস্বতী—ঢেলে থালাবাটিতে
সুস্বাদু জ্ঞান তোকে দেন পরিপাটিতে।
এ-সব তো জানি আমি একেবারে স্পষ্ট.
ভীষণ পড়িস্ তুই! আহা, কত কষ্ট!!

॥ আরও ভালো ॥

(অস্ট্রিয়ার লোক কথা)

বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়

জোসেফ হলেন অস্ট্রিয়ার সম্রাট। খুব তাঁর নাম ডাক। আর সব রাজারা তাঁকে খাতির করেন। তাঁর ক্ষমতাকে হিংসে করেন। তাঁকে ভয় করেন মনে মনে।

রাজপ্রাসাদে কত আদর সম্মান, কত আদব কায়দা কত জাঁকজমক। কিন্তু জোসেফের মনে হয় এ সবই যেন কেমন নিষ্প্রাণ।

মাঝে মাঝে তিনি তাই বেরিয়ে পড়েন। কাউকে সঙ্গে নেন না। রাজার ঝলমলে পোশাক পরেন না। গরীবের বেশে গরীবের মতো রাস্তায় ঘোরেন। মেশেন গরীবদের সঙ্গে। পাঁচটা সুখ-দুঃখের কথা বলেন। কখনও বা চলে যান দূরে কোনো গাঁয়ের মাঝে কিংবা বনের গভীরে কিংবা নদীর ধারে। গাঁয়ের সব লোকেদের নানান কাজ দেখেন গভীর বনে গাছের পাতা ঝরার শব্দ শোনেন। নদীর ঝির ঝিরে স্রোত দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যান আর ভাবেন রাজপ্রাসাদে অত আরাম। কিন্তু এমন আনন্দ ত' সেখানে পাওয়া যায় না।

শরৎ কালের এক রবিবার। গাছেরা লাল আর হলুদ পাতার সুন্দর পোশাক পরেছে। ভারি সুন্দর লাগছে চারিধার। জোসেফের মনে হল এমন দিনে অনেক দূরে যাওয়া দরকার, অনেক দূরে।

একটা সাধারণ গাড়ি নিলেন জোসেফ আর একটা তেজী ঘোড়া। সকলের অগোচরে বেরিয়ে পড়লেন। আকাশে সেদিন মেঘ ছিল না। রাস্তায় অনেক লোকজন সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এমন দিনেও যে ঝমঝম বৃষ্টি নামতে পারে কে তা ভেবেছিল? কিন্তু এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস যেন কোথা থেকে বয়ে এল আর তারপরেই শুরু হল প্রচণ্ড বৃষ্টি। গাড়ির ঢাকনা তুলে দিলেন সম্রাট। লোকেরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবার জন্য ছুটোছুটি করছিল। দূরে যাদের বাড়ি তারা খুঁজছিলো কাছাকাছি কোথাও মাথা গোঁজবার একট ঠাঁই।

জোসেফ ভাবলেন এই বৃষ্টিতে বেশিদূর যাওয়া যাবে না প্রাসাদে ফিরে যাওয়াই এখন উচিত। এমন সময় সৈনিকের পোশাক পরা একজন যুবক এসে দাঁড়াল তাঁর গাড়ির সামনে। ও তাঁকে চিনতে পারেনি। কাকুতি মিনতি করে সে বলল, 'আমাকে দয়া করে একটু নিয়ে যাবেন? দেখুন না কেমন সুন্দর নতুন পোশাক আমার। এখুনি একবারে ভিজে যাবে। যাবেন নিয়ে?'

ওর চেহারাটি বেশ সুন্দর। মুখটি দেখলে মনে হয় বেশ সরল আর চটপটে। ওকে দেখে সম্রাটের বেশ পছন্দ হয়ে গেল। ইঙ্গিতে তিনি ওকে গাড়িতে উঠতে বললেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নানান গল্পগুজবে তাঁরা মেতে উঠলেন। যেন কতদিনের আলাপ। সৈনিকটি জানাল সেদিনটি তার বেশ সুন্দর কেটেছে। এক বন্ধুর বাড়িতে তার নিমন্ত্রণ ছিল। শেষে সে বলল,

ভয়ঙ্কর ঘোড়া

জীবন সরকার

বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত। চারিদিকে সোনালি সবুজ ধানক্ষেত। বাতাসে হেলিয়ে দুলিয়ে নাচছে, দুলছে। মাঝে মধ্যে পতিত জমি। ডোবা পুকুর থাকলেও বোঝা যায় না। মনে হয় সবুজ নদীর ঢেউয়ের মেলা কোথায় কোন সুদূরে ভেসে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

গ্রামের কোলাহল, রান্নাবান্নার শব্দ, পোলাপানের চীৎকার, কোনো কিছুই শোনা যায় না—যাবেই বা কি করে—দূর তো আর কম নয়। ঘোড়ায় গেলে দশ থেকে পনেরো মিনিট আর হেঁটে গেলে আরো বেশি। অবিশ্যি দেখা যায়—চেনা যায় কোনটা কাদের বাড়ি। বাবুনদের গোয়ালঘরও খুব অস্পষ্ট নয়। বাচ্চুদের দেব দারু গাছ, তালগাছ দেখা যায়।

গ্রামের নাম জলশিং। কোনকালে জলের বুঝি গরুর মতো শিং ছিল এবং সেই থেকে এই বিচ্ছিরি নামের পত্তন হয়েছে। বাড়ির পিছনে পুকুর –বিরাট বিরাট পুকুর। তারপরেই ধানজমি আরম্ভ হয়েছে। তা শেষ হয়েছে অনেক দূরে। ওপারের গ্রাম দেখা যায় না, কি যেন গ্রামের নাম—ভুলে গেছি।

বৈশাখের শেষ অপরাহ্ন বেলা। আমের বউল ছাড়িয়ে গুটি ধরেছে। কোন কোন গাছে বেশ বড় হয়েছে। ধানগাছগুলি লকলকিয়ে মাথা চাড়া দিয়েছে। আকাশে কার্পাস মেঘের ভেলা দেখতে দেখতে কালো হয়ে গেলে ডমরু বাদ্য বাজে। আলো সরে গিয়ে কালো হিম অন্ধকার নামে। বুকের ভিতরে দ্রিম দ্রিম দামামা বাজে। উত্তর কোণে ঝড়ের সূচনা। ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া ছাড়ে—থমথম করে চারিদিক। এক্ষুনি ঝড় উঠবে…কালবৈশাখীর ঝড়।

কেউ কেউ মাঠে দে ছুট কেননা গরু-ঘোড়া রয়েছে, ঘরে আনতে হবে। আম বাগানে দে ছুট কেননা কচি কচি কাঁচামিঠা আম—আহা! কি স্বাদ। কেউ-কেউ কোচ হাতে পুকুর কিংবা বিলের কিনারে যায়—কেননা মাছেরা বৃষ্টির জলে পাড়ে উঠবে। ভাগ্যি মন্দ থাকলে সাদা ধবধবে রাঘব বোয়াল

দেখা দেবে—আর দিলেই ন্যাজ দিয়ে বাড়ি মারবে। যে একবার বাড়ি খেয়েছে সে আর বাঁচেনি। আর ভয়ঙ্কর ঘোড়া যদি আসে—তাহলে একদম খতম।

বাইরে ঝড় তুফান। গাছ গাছালি মাথা নুইয়ে দিচ্ছে। বৃষ্টি ছিটে ফোঁটা আরম্ভ হয়েছে। বাতাসে সোঁ সোঁ ভয়ঙ্কর গর্জন। কালো আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক। টিনের চালে কড়-কড়র-কড় আওয়াজ হচ্ছে। লণ্ডভণ্ড তাণ্ডবলীলা! ভয়ঙ্কর প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড! মনে হয় পৃথিবী এক্ষু'ন ধ্বংস হয়ে যাবে। এ যাত্রা গ্রাম বাড়িঘর সব শেষ।

এই দুর্যোগের সময়ে জ্যেঠু কোচ নিয়ে বেরিয়ে গেল। মাথায় টোকা। দশাসই শক্ত সমর্থ চেহারা। মিশমিশে গায়ের রঙ। এককালে জোয়ান ছিল দেহের প্রতিটি খাঁজে তার চিহ্ন স্পষ্ট বর্তমান।

বাড়ির সকলেই মানা করল কিন্তু কারো কথা শুনল না। হন হন করে বেরিয়ে গেল। একরোখা লোক হলে যা হয়।

টাপুর টুপুর বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। আকাশটা ভেঙ্গে পড়ল। বাঘার মাছ ধরার ঝোঁক ছিল। সেইজন্য জ্যেঠুর পিছনে পিছনে চুপিচুপি বেরিয়ে গেল। নতুন নয়—যাওয়ার অভ্যাস আছে।

গ্রাম ছাড়িয়ে রাস্তায় নামতেই রাস্তাঘাট পিচ্ছিল হয়ে গেল,—হাঁটা যাচ্ছে না। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, সবকিছু ঝাপসা কিছুদূর গিয়েই বাঘা জ্যেঠুকে হারিয়ে ফেলল,…অদৃশ্য হয়ে গেল। ডাকতে পারছে না কেনন৷ বৃষ্টির জলে ঝমঝম শব্দ। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ। কাঁপন আরম্ভ হয়েছে। শব্দের তরঙ্গে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

জমির ধার ধরে বাঘা হাঁটতে লাগল আর চারিদিকে চোখ—কোনো মাছের ঝাঁক দেখা যায় কিনা কই—জিওল—মাগুর দেখা যায় কিনা। হাঁটতে হাঁটতে বিলের কাছে এসে গেল। ধানজমিতে জলের রেখা, জল বাড়ছে। জল আরম্ভ হয়েছে। জলের ঝপ ঝপ ছপ ছপ শব্দ। বাতাসে ধানগাছগুলি জলে বাড়ি খাচ্ছে। টুপ-টাপ বৃষ্টির ফোঁটা জলে পড়ছে। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব।

ক্রমে ক্রমে আরো অন্ধকার হয়ে গেল। মনে হল সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রীতিমত শীত করছে আর দাঁড়াতে পারছে না থরথর করে কাঁপছে। বৃষ্টি পড়ছে কিন্তু তুফানের তেমন জোর নেই—একটু কমেছে। মুখ তুলে বাঘা জ্যেঠুকে দেখবার জন্য চারিদিকে তাকাল কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখতে পেল না।

এখন কি করবে?—বাড়ি ফিরবে, না ডাকবে? কোনদিক দিয়ে এসেছে কোনদিক দিয়ে যাবে কিছুই ঠাহর করতে পারল না। কাদের জমি—বাড়ি থেকে কতটা দূরে তাও বুঝতে পারল না। দিশা-হারা—দিগ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দিক-নির্ণয় করতে চাইল কিন্তু সফল হল না। চারিদিকে শুধু ধান-ক্ষেত আর ধান-ক্ষেত।

এখন কি করবে, চিন্তাটা মাথায় আসতেই সেই ঘটনাটা মনে এল। এই বিলে যতরাজ্যের ভূত বাস করে। হালুম-মালুম রাক্ষসেরা বাস করে আর…আর থাকে ভয়ঙ্কর ঘোড়া। ই-আ য়া বড় বাঁশের মত ঠ্যাঙ। গাব-গাছের মত মুখ। লাউয়ের মত চোখ। গায়ে সাদা-সাদা দাগ। ল্যাজটা মাটিতে

পড়ে থাকে আর সেই ল্যাজে বাঁধা থাকে নরমুণ্ডর মালা। একবার যে এই ভয়ঙ্কর ঘোড়াটা দেখেছে তার আর রক্ষা নেই। সে নির্ঘাৎ মরবে—প্রাণ হারাবে। জ্যেঠু একবার দেখেছিল এবং তারপরেই জ্বর এসেছিল। অনেক মন্ত্র জানতো বলে সে যাত্রা বেঁচে গিয়েছিল।

এইসব কথা মনে আসতেই বৃষ্টি ভেজা শরীরে লোম খাড়া হয়ে গেল। হাত পা অবশ হয়ে গেল… হিম হয়ে গেল। চারিদিকে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ব্যাঙ—ব্যাঙের ডাক…! ঝপ ঝপ শব্দ। আবার কে যেন বলল :

বাঁচতে যদি চাস
সোজা পথে যা।

কথাগুলি শুনে বাঘার মনে হল সত্যি তো যে পথে এসেছে সে পথেই গেলেই তো হয়। কথাটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য মনে মনে সে খুসি হল। ঘুরে যেই পা দিয়েছে আর তক্ষুনি দেখল একটা শেয়াল জলের ওপর দিয়ে ছপ-ছপাৎ-ছপ করে দৌড়ে পালাল। এইখানে এই সময় কোথা থেকে শেয়াল এল? শরীর থরথর করে কাঁপছে। চারিদিকে ভয়ের দৃশ্য! কাঁদতে ইচ্ছা করল, চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করল কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বের হল না। কে যেন গলা টিপে ধরেছে—দম বন্ধ হয়ে আসছে। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। শীতে দাঁতে দাঁত লাগছে।

এখন সন্ধ্যার সময়…ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। বাদলার জন্য আরো ভয়ঙ্কর গাঢ় মনে হল। ধানগাছগুলি বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, এখন আর দুলছে না—তেমন বাতাস নেই, বৃষ্টির ভারে নুইয়ে পড়েছে।

বাঘা থপ-থপ করে টেনে টেনে পা ফেলে চলতে লাগল আর মনে মনে রাম রাম জপতে লাগল কিন্তু স্পষ্ট করে মুখ দিয়ে স্বর বের হল না, চেষ্টা করেও উচ্চারণ করতে পারল না।

ভালো করে দেখতে না পেলেও, হঠাৎ চক্ষের সম্মুখে মনে হল একটা বৌ লালপেড়ে শাড়ী পরে, বিরাট একটা রাঘব বোয়াল নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটার থেকে মাছটাই যেন বড়। ল্যাজটা ধানগাছে দুলছে।

এই না দেখে বাঘার শরীর ছির ছির শির শির করে উঠল। ঠকাঠক দাঁতে দাঁত লাগল। ভিজা সব চুলগুলি দাঁড়িয়ে গেল। আর সাহস পাচ্ছে না পা ফেলতে। দূরে দূরে গ্রামের বাড়িতে কুপির আলো দেখা যাচ্ছে। বাঘার কাছে মনে হল সেগুলিও আলো নয়—অন্য কিছু। আলেয়া টালেয়া হবে হয়তো! চীৎকার করে জ্যেঠুকে ডাকতে ইচ্ছা হল কিন্তু গলা দিয়ে কোন কথাই বের হল না। চোখ দুটি বড় বড় হয়ে গেল। আর রক্ষা নেই। সেই ভয়ঙ্কর ঘোড়ার দেশে এসে গেছে, রাঘব বোয়ালের দেশে এসে গেছে।

এখন কি হবে। বুঝতে পারছে বিপদ, অথচ কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। রাস্তার যেন শেষ নেই। মা-বাবা নিশ্চয়ই চিন্তা করছে—গেলে পরে বকবে—মারবে—আর কোনোদিন না বলে কোথাও যাবে না। এবার সত্যি সত্যি বাঘার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বৃষ্টি নেই, বাতাস নেই আছে শুধু গভীর কালো অন্ধকার। হঠাৎ পাশ দিয়ে একটা বিরাট

ঘোড়া দেখতে পেল। খটা খট খট করে পা ফেলছে। বাঁশের মত ঠ্যাঙ। প্রকাণ্ড ল্যাজ। মস্ত বড় চোখ। গায়ে সাদা-সাদা দাগ। এত বড় আবার ঘোড়া হয় নাকি!—বাপরে! গুঁড়ি গুঁড়ি জল, ধোঁয়া ধোঁয়া মতো, ভুল দেখছে নাকি?

থপ থপ করে দিব্যি হেঁটে চলেছে। এইবার ল্যাজের বাড়ি দিলে—আর রক্ষা নেই—নির্ঘাৎ মৃত্যু। ব্যাঙেরা কোথায় গেল? আমি যে মরলাম।

চিঁ—হিঁ—হি—চিঁই করে ঘোড়াটা ডেকে উঠল। জলে থপ থপ—ঝপ-ঝপ শব্দ! আকাশে গুম গুম শব্দ! চারপাশে বিরাট অথৈ থৈ-থৈ জলের সমুদ্র! অজস্র ঢেউ। ব্যাঙগুলি ছাতা মাথায় দিয়ে ভেসে যাচ্ছে তলিয়ে যাচ্ছে। গর গর-গরর করে একটা বাজ তালগাছে পড়ল। আলোর ঝিলিক এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে গেল। কোথায় ঘোড়া কোথায় কি!

বাঘার মাথাটা ঘুরে গেল ধানজমি, গ্রাম - তালগাছ—ভয়ঙ্কর ঘোড়া—রাঘব বোয়াল, কোলা ব্যাঙ চারিদিকে বন বন করে ঘুরতে লাগল। আর সে ত তক্ষুনি ঝপাৎ করে পড়ে গেল।—মারে বাপরে—একটা শব্দ হয়েই নিঝুম—স্তব্ধ।

এদিকে জ্যেঠু বাড়িতে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে পেরে হ্যাজাক্ এবং সংগে চাকরকে নিয়ে—বিলের দিকে পা বাড়াল। বাঘাকে খুঁজতে খুঁজতে—দেখল, যে সে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে; মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে।—

জ্যেঠু আর অপেক্ষা করল না। বাঘাকে কোলে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল। মন্ত্র আওড়াতে লাগল। লম্বা-লম্বা পা ফেলে ছুটল।

অবশেষে বাড়ি এল। কি হয়েছে—কেমন করে হল উত্তর না দিয়েই বাইরের বারান্দায় শোবার বন্দোবস্ত করে ভিজা কাপড় খুলতে খুলতে বললো ডাক্তারকে খবর দিতে। বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে গেল। বিপদের পর বিপদ—বিপদ যেন লেগেই রয়েছে।

ডাক্তার এল, ইন্‌জেকশন দিল। গরম সেঁক দিতে বলে চলে গেল।

ভোরের দিকে বাঘা চোখ খুলল। চারিদিকে তাকিয়ে মা-বাবাকে খুঁজল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল।

সকলের চিন্তা দূর হল। অনেকে বলল—জ্বর হবে! সাবধানে রেখ। বাড়িতে রামায়ণ পাঠের ব্যবস্থা হল।

দিন সাতেকের পর সকলের আশা পূর্ণ হল। বাঘা ভাল হয়ে উঠল। একটু জ্বরের মতো হয়েছিল বলে এই কয়দিন বিছানায় থাকতে হয়েছিল।

ডাক্তার দেখলে কি হবে। ওষুধ খেলে কি হবে। সকলের ধারণা জ্যেঠুর মন্ত্রবলেই বাঘা এ যাত্রা বেঁচে গেল।…… ..

২৪শে ডিসেম্বর ১৯৬৮ ছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা বিশেষ দিন। সে দিন চাঁদ থেকে মাত্র সত্তর মাইল দূরে থেকে, তিনজন আমেরিকান মহাকাশচারী, বরম্যান, লভেল ও অ্যাণ্ডার্স, বেতার ও টেলিভিসন ক্যামেরার সাহায্যে পৃথিবীর কোটি কোটি দর্শককে এত কাছের চাঁদকে কেমন দেখতে লাগে, তাই চাক্ষুষ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সেখান থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখায় ক্যামেরা ঘুরিয়ে তাও দেখিয়েছিলেন।

পৃথিবী থেকে দুই লক্ষ মাইল দূরে বসে বরমান বললেন, 'এখানকার দিগ্‌বলয় একেবারে স্পষ্ট। আকাশ কুচকুচে কালো, সূর্য ঝকঝকে সাদা। এর আগে এত দূর থেকে পৃথিবীর লোকে কারো কথা শোনে নি। অথচ কথাগুলি এত স্পষ্ট আসছিল যে মনে হচ্ছিল, শহরের মধ্যেই কেউ টেলিফোনে কথা বলছে।

ঐখানে পৌঁছতে মহাকাশগামী অ্যাপলো এইটের ১৪৭ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। এর আগেও যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৭ বার আর রাশিয়া থেকে ১০ বার. দুঃসাহসী মহাকাশচারীরা অনেক দূর অবধি এগিয়েছিলেন, অনেক তথ্যও সংগ্রহ করেছিলেন। তবু তাঁরা সবাই পৃথিবীর কক্ষ-পথের ভিতরেই ছিলেন। এই প্রথম সে-পথ ছেড়ে, অন্য একটা গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে মানুষ পৌঁছল।

এই প্রথম চাঁদের যে পিঠ পৃথিবী থেকে দেখা যায় না, মানুষ তার ফিল্ম তুলে আনল। এর আগেও অবিশ্যি যান্ত্রিক উপায়ে ছবি তুলে, টেলিভিসনের সাহায্যে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল।

অ্যাপলো-এইটের নাবিকরা পৃথিবী থেকে ২৩৩,০০০ মাইল দূরে গেছিলেন। এর আগে কেউ এতদূর যায় নি। ফিরবার বেলায় এক সময়ে তাঁদের গতিবেগ হয়েছিল ঘণ্টায় ২০,৬২৯ মাইল। এর আগে কখনো এতটা হয় নি।

'মহাকাশ যুগের' শুরু হয়েছিল ১১ বছর আগে, যখন রাশিয়ার প্রথম স্পুটনিক মহাকাশে পৃথিবীর চারিদিকে উড়েছিল। তাতে কোনো মানুষ কি আরোহী ছিল না। সাত বছর আগে ঐ রাশিয়া থেকেই প্রথম মানুষও পৃথিবীর কক্ষপথ ধরেছিল।

এবার বৈজ্ঞানিকরা এতদূর এগিয়েছেন, যে মানুষের চাঁদে নামার বহু যুগের স্বপ্ন হয়তো এই বছরেই সফল হবে। চাঁদের মাটিতে নামার আগে অবিশ্যি আরো অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে, যাতে হঠাৎ পৌঁছে কোনো অজানা বিপদের সম্ভাবনা আরো কমে যায়।

এই তিনজন আকাশচারী চাঁদের চার দিকে দশবার ঘুরেছিলেন। একেকবারে ঘুরতে মাত্র দুই ঘণ্টা সময় লেগেছিল। দশবার ঘুরে, যান্ত্রিক উপায়ে অ্যাপলো এইটের গতির মুখ পৃথিবীর দিকে ঘুরিয়ে, ২৭শে ডিসেম্বর তাঁরা হাওয়াই থেকে এক হাজার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরে নিরাপদে নেমে পড়লেন।

কি আছে চাঁদে যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে, প্রাণ হাতে নিয়ে দুঃসাহসী আকাশচারীরা বারে বারে মহাকাশের অজানা বিভীষিকার সম্মুখীন হচ্ছেন? চাঁদ তো একটা মরা গ্রহ। সেখানে বাতাস পর্যন্ত নেই, প্রাণের কোনো চিহ্ন-ও আজ অবধি দেখা যায় নি! জীব-জন্তু গাছ-পালা কিছু নেই যেখানে, সেখানে যাবার এত কিসের আগ্রহ? শোনা যায় জল পর্যন্ত নেই চাঁদে।

অ্যাপলো-এইট থেকে চাঁদের ভূ পৃষ্ঠের দিকে তাকিয়ে বরমান বলেছিলেন, 'এই বিশাল, প্রাণহীন, শূন্যতার ক্ষেত্র যেন আগন্তুকদের নামতে বারণ করছে। বাস করার, কিম্বা কাজ করার পক্ষে এ জায়গাটা যে মোটেই খুব মনোহর নয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।' তবু কেন এত আগ্রহ?

এই আগ্রহের কারণ হল চাঁদে পৌঁছানো শুধু একটা বড় অভিযানের শেষ নয়। আসলে এই হল তার চেয়ে অনেক বড় বড় অভিযানের আরম্ভ। এবার গ্রহে-গ্রহান্তরে যাবার চেষ্টা হবে। এই ছোট পৃথিবীতে মানুষদের আর ধরছে না, এবার আকাশ জুড়ে তাদের যাতায়াত চলবে। কবে মানুষ নিরাপদে চাঁদে নেমে আবার ফিরে আসবে তার অপেক্ষায় রইলাম।

মনে রেখো

* প্রত্যেক ইংরাজি মাসের ২৯/৩০ তারিখে পরবর্তী ইংরাজি মাসের সন্দেশ প্রত্যেক গ্রাহক গ্রাহিকার নামে Under Certificate of posting পাঠানো হয় *
* তবু কিছু কিছু সন্দেশ ডাকের গোলমালে হারায় *
* যদি দশ তারিখের মধ্যে সন্দেশ না পাও, তাহলে তখনই আমাদের জানাবে, একটা ডুপ্লিকেট কপি পাঠিয়ে দেব। জানাতে দেরী করোনা কিন্তু। *
* যদি ঠিকানা বদল কর তাহলে সেটাও যথাসময়ে কার্যালয়ে জানিয়ে দিও। ভুলোনা কিন্তু *

বালুকণা, নীলাঞ্জন আর আমি

জীবন সর্দার

যার সাথে বকখালিতে গাংগচিল দেখতে গিয়েছিলাম তার নাম নীলাঞ্জন। প্রকৃতির সব খবরই প্রায় তার জানা। কথা ছিল, ভোরে উঠে সমুদ্রের ধারে ধারে দুজনে হেঁটে চলে যাব বকখালি। বেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখি সে নেই। চলে গেছে একা।

গরমের দিন। বেলা বাড়ছে। পথ ঘাট তাতছে। শুকনো হাওয়ার সাথে বালু উড়ছে, চোখ মেলা যাচ্ছে না। বালু ঢুকছে নাকে মুখে। ঘর বাড়ি আসবাবের উপর স্তর জমেছে ধুলোর। আমিও একা বেরুলাম।

বসন্তকাল থেকেই খেত, মাঠ, যেগুলি ঘাসে ঢাকা নয়, সেগুলি শুকিয়ে ঝুরো ঝুরো হয়ে গেছে। মেঠো-পথ কাঁচা রাস্তা নদীর তীর ডোবা নালা সবই শুকোচ্ছে। শুকিয়ে যেমনটি ঝুরো হয়েছে মাটি, একটু হাওয়ায় ধুলো হয়ে সেগুলো মাটি ছেড়ে উঠে পড়ল উপরে। হাওয়ায় খানিকক্ষণ ভেসে, এদিক-সেদিক উড়ে মাটিতেই নামল শেষে। কখনো হাওয়া ধুলোবালি সব উড়িয়ে নিয়ে গেল বহুদূর। বকখালির পথে যাচ্ছি বাতাস আর বালির এই খেলা দেখছি। দূর থেকে এক সময়ে দেখি নীলাঞ্জন বালিয়াড়ির উপর একা বসে আছে।

সেদিন দু'জনে বালিয়াড়ির উপর বসে বালি ওড়া দেখলাম। গরম জলের ওপর থেকে যেমন বাষ্প ওঠে, কিংবা শীতের সকালে পুকুরের ওপর থেকে যেমন, তেমন করে 'বালির ধোঁয়া' যেন উঠছে সাগর-বেলা আর বালিয়াড়ির ওপর থেকে। হাওয়া যেদিকে গেল 'বালির ধোঁয়া' সেদিকেই উড়ে গেল অবিরাম।

অনেকক্ষণ একমনে কি ভেবে নীলাঞ্জন বললে, 'একটা মজা দেখবে। দূরের ঐ ঝাউ আর ফণি-মনসা গাছগুলোর তলায় কেমন বালুর ঢিপি জমেছে দেখেছ; বলো ত' দেখি কেমন করে জমেছে ওগুলো! জানোনাতো—আচ্ছা, ধর সাগর থেকে হাওয়া বইছে ডাঙ্গার দিকে। জলের পর থেকে অনেকটা গড়ানে বালুবেলা পার হয়ে এসে কাঁটা গাছে ঝাউ গাছে হাওয়া প্রথম ধাক্কা খেল। হাওয়ায় বয়ে আনা বালি গাছের পাতায় বাধা পেয়ে ঝরে পড়ল তার গোড়ায়। কিছুবা চলে গেল উড়ে। বিন্দু

বিন্দু বালু, বালুর উপর বালু জমে জমে গাছের গুঁড়ি ঢেকে ফেলল একদিন। আমি ছোট্ট একটি গাছে এ পরীক্ষা করেছি, দেখবে এসো।'

একটি শিয়ালকাঁটা গাছের কাছে আধখানা দেশলাই কাঠি গোঁজা রয়েছে বালিতে। ওটিকে দেখিয়ে সে বললে, 'একরাতে কতটা বালু এই গাছের পিছে জমে তা পরীক্ষা করার জন্য কাঠিটি পুঁতেছি। গাছের কাছে হাওয়ায় বওয়া বালু জমার রীতি দেখে অবাক হলাম। গাছ যদি একই থাকত তবে দেখতুম একটিই ঢিপি। সামনে পিছে গাছ রয়েছে আরও, তাই ঢিপিও জন্মেছে অনেক। ঢিপিগুলো যখন বড় হয়ে উঁচু হয়ে ওঠে তখন বাতাস তাতে বাধা পায় বলে তার সামনেই বালির নতুন ঢিপি গড়ে ওঠে। এমনি করে সমুদ্রের মুখোমুখি স্তূপের পর স্তূপ জমে ওঠে। ঢেউ খেলানো এই বালিয়াড়িগুলিই সেই স্তূপ।

বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে চলতে চলতে দেখলাম অনেক জায়গায় তার তলায় বড় গাছ চাপা পড়ে আছে বালুর স্তূপ উঁচু হয়ে উঠলেই তার আর একটি নতুন স্তূপ হবে, এক স্তূপের পিছে আর একটি, এমনি করে খেত খামারে ঢুকে পড়েছে বালিয়াড়ি। এগিয়ে আসা বালুকণার হাত থেকে খেত-খামার গ্রাম বাঁচাবার জন্য গাছ বুনে দিতে দেখেছি। বালিয়াড়ির উপর ঘাস জন্মালে ত' কথাই নেই,—বালুর ওড়া বন্ধ। কিন্তু বালু যে সবখানে, তার বেলা? নদী সমুদ্র বা মরুভূমির ধারে যাদের ঘর তাদের কথা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু শহরে যারা থাকে তাদের ঘরবাড়ি আসবাবে ধূলার স্তর জমে কি করে একদিনেই? আমি একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছি নীলাঞ্জনকে।

'এ মিহি বালুকণা আর হাওয়ার খেলা।' শান্ত গলায় সে বললে। 'মিহি বালুকণা অনেকক্ষণ বাতাসে ভাসতে পারে ওজনে কম বলে। হাওয়ায় ভেসে ভেসে দূর দুরান্তে চলে যায় ওগুলো। সারাক্ষণ, দিনের পর দিন যদি মিহি কণাগুলো বাতাসে ভেসে থাকতো তখন আমাদের চোখের সামনে বালুকণার একটি পর্দা ঝুলছে বলে মনে হত। ঝড়ে দমকা বাতাসে সেগুলো উড়ে চলে যায়, নয়তো বৃষ্টির সাথে নেমে আসে মাটিতে। বৃষ্টির পর রোদ উঠলে কেমন 'পূজার দিনের' সকাল বলে মনে হয়। কারণ বাতাসে মিহি বালুকণার 'পর্দা' নেই তাই সব স্পষ্ট—আলো ঝক্‌মকে।'

একটি ঢিপির উপর আমাকে দাঁড় করিয়ে নীলাঞ্জন বললে, 'দেখছ ঢিপিটার গা কেমন ঢেউ খেলানো। যেন ধাপে ধাপে কুঁকড়ে গেছে বালিয়াড়ির গা। এও সেই মিহিকণা আর হাওয়ার খেলা। মৃদু হাওয়ায় মিহি কণাগুলো অল্প একটু উড়েই পড়ে যায় বালিয়াড়ির পিঠে। মোটা কণাগুলো রয়ে গেল নীচে, তার পাশে ধাপে ধাপে বসেছে মিহি কণাগুলো।' আতস কাঁচ দিয়ে দেখি তার কথাই সত্যি—মিহি বালুকণা উঁচু ধারে, তার চেয়ে মোটাকণা খাঁজে খাঁজে।

বালুর কথা বললে, মরুভূমি,—সমুদ্রতীর বা নদীতীর থেকে আমাকে বেশি টানে। বললে হাসবে, বালু দেখতে একা একাই আমি গিয়েছিলাম থর মরু। জয়শলমীরের পথে 'লখি' গ্রামের কাছে যখন পৌঁছেছি তখন বালুর ঝড় উঠেছিল। বায়ুকোণ ঢেকে গিয়েছিল হলদে বালুর মেঘে। হাওয়ার সাথে বালু এসে বারবার ঝাপটা মেরে গেছে মুখে। সূর্য বালুর ঘন পর্দার ওপাশে অস্ত গেল কখন বুঝিনি। রাতে

মরুভূমির দেখি একেবারে অন্যরূপ। সমুদ্র যেন কি কারণে জমে গেছে। বালু বালু হয়ে গেছে জল। আমার মনে হ'লো মরুভূমি বালু তৈরির মস্ত এক কারখানা। সেখানে বৃষ্টি হয় সামান্য। গাছপালা খুব কম। দিনে আর রাতে গরম ঠাণ্ডা বেশ ওঠানামা করে। বাতাস বইছে সারাক্ষণ। বাতাসের গতি সব সময়ই মরু-সীমান্তের দিকে। মিহি বালু মোটা বালু সব উড়ছে তার সাথে আর সীমান্তের খেত-খামার গ্রামশহর বালুতে ঢাকা পড়ছে একটু একটু করে। যখন বৃষ্টি হয় বালুর স্তর মাটিতে বসে যায় একটু। মরুভূমির ভেতরকার গ্রামগুলো পরিষ্কার, বালু চাপা পড়েনি। কিন্তু সীমান্তে বালু এগিয়ে চলেছে। মরুভূমির এগিয়ে আসা ঠেকিয়ে রাখতে গাছ বোনা হয়েছে। গাছ ঘিরে নিয়মমত বালু ঢিপি দেখা দিয়েছে। বালুর উপর চাষের জোগাড় হয়েছে অনেক জায়গায়। বালুকণার ফাঁক দিয়ে জল যেতে পারে সহজেই, হাওয়াও। ঠিক মত জল ঢাললে, সার ছড়ালে সবুজ শস্যে ঢেকে যাবে।

পাখির পরিচয় ঃ চাতক

(ছবি—শর্মিলা রায়)
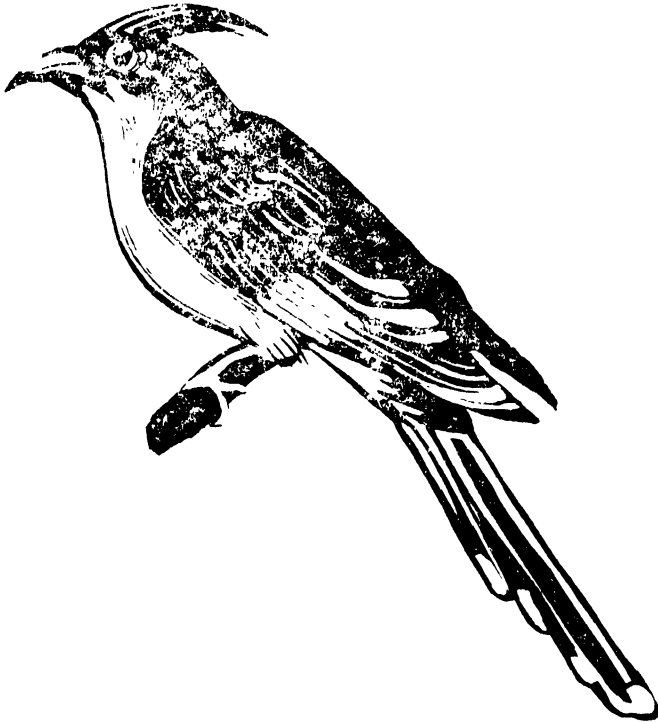
শাদা কালো রংএর পাখিটা পায়রার মত বড় হবে। শরীরের ওপর দিকটা, ঝুঁটি ও চকচকে কালো। একটু সবুজ আভা আছে কালো রংএ। গলা বুক পেট সব শাদা। লেজ লম্বা, খাঁজ কাটা ডগায় শাদা ফোঁটা। ঠোঁট কালো। পা নীলচে কালো। উড়লে ডানায় শাদা রেখা দেখা যায়। গাছ থেকে গাছে ডেকে ডেকে (বেশ চড়া সুরে) উড়ে যায়। বর্ষাকালেই বেশি দেখবে পাখিটাকে। শুঁয়োপোকা পিঁপড়ে, মাকড়সা এসব খায়। সারাক্ষণ গাছের ডালে ডালেই খাবার খুঁজে বেড়ায়—বড় ছোট ঝোপ ঝাড় সব রকম গাছে। কদাচিৎ মাটিতে নেবে খাবার ধরে। বর্ষাকালে ডিম পাড়ার সময় ওদের। নিজেরা বাসা বানায় না, পরের বাসায় ডিম পাড়ে। ছাতারে পাখির বাসা খুঁজলে চাতকের ডিম পেতে পার। প্রায় গোল নীলচে চকচকে ডিমগুলি। বর্ষাকালে যে জাতের চাতক আমরা দেখি, তাদের আসা যাওয়া অনেকদিন ধরে অনেকে লক্ষ্য করেছেন। ওরা যাযাবর। কেউ কেউ বলেন ওরা শীতকালে আফ্রিকা আর বর্ষায় আমাদের এখানে থাকে। কোথাও ওকে বলে ঝুঁটি কোকিল।

(১) সন্দীপন দেব, ২০৪০, বয়স ৬২

ভাই, বয়সের তুলনায় খুব ভালো ভ্রমণ কাহিনী লিখেছ, এটা তোমাকে না জানিয়ে পারলাম না। লিখেছ তোমার শখ বই পড়া, ছবি আঁকা, গল্প লেখা। পত্রবন্ধু চাই নাকি? গ্রাহকরা, শোন।

(২) হেনা মোহান্ত, ২২৭৮, বয়স ১৪

তুমি লিখেছ, 'আসলে আমার বয়স চোদ্দ। আমার বয়সটা কি আপনা থেকেই বেড়ে সতেরো হয়েছে, না ছাপাতে ভুল হয়েছে, না আপনারাই বাড়িয়ে দিয়েছেন?···আমায় ভালোবাসেন না, তাই বয়স বাড়িয়ে তাড়াবার ব্যবস্থা করেছেন। মারাত্মক ভুল করেছেন কিন্তু। যাই হোক, আর যেন এমন ভুল না হয়···ইত্যাদি'

তোমার বয়স বাড়িয়ে আমাদের কি কোনো লাভ হবে? আর তাড়ানোই যদি উদ্দেশ্য হর, তা হলে বয়স বাড়িয়ে সতেরো করে ও. তাড়ালাম না কেন বল তো? যাদের সতেরো হয়ে গেছে তাদের চিঠির উত্তর দেবার তো কথা নয়। ওটা যে নিতান্তই ছাপার ভুল, সেটুকু বুঝবার মতো তোমার নিশ্চয়ই বুদ্ধি আছে। যাই হোক, ছাপার ভুলের জন্যে আমরা দুঃখিত। তুমিও সম্পাদককে কিভাবে চিঠি লিখতে হয়, গুরুজনদের কাছে তার পাঠ নিও।

(৩) সুনন্দন চক্রবর্তী, ২২৯৪, বয়স ১১

জানুয়ারির সন্দেশ যদি বন্ধুরা কেউ নিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে আরেকটা কিনে নিও। আমাদের কার্যালয়ে কাউকে পাঠাতেও পার, কিম্বা ডাকমাশুল সহ এক কপির দাম পাঠিও। সন্দেশেই তো এসব দেওয়া থাকে। পত্রবন্ধু চাও অথচ কেউ পত্রবন্ধু হচ্ছে না, এতো মহামুস্কিল! কই, সন্দেশের গ্রাহকরা কেউ কেউ সুনন্দনের বন্ধু হতে এগিয়ে আসবে না? তা হলে কিন্তু শুধু সুনন্দন না, আমাদেরও দুঃখ হবে।

(৪) উজ্জ্বল চক্রবর্তী, ২০২৩, বয়স ১২

যিনি প্রফেসর শঙ্কুর গল্প লেখেন, তুমি নিশ্চয় জান যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কর্মব্যস্ত মানুষদের মধ্যে তিনি একজন। প্রতি মাসে কি হয়ে ওঠে, ভাই? তবে এবার পর পর তিন মাস ধরে তাঁর গল্প পড়লে তো? নিশ্চয় খুসি হয়েছ?

(৫) সুজিৎ ও প্রতিমা নন্দী, ২৩০৬, বয়স ১২ ও ৯

গ্রাহক কার্ড নিশ্চয় পেয়ে যাবে ভাই, সবাইকেই পাঠানো হয়। মাস খানেকের মধ্যে না পেলে অবিশ্যি ধরে নিও ডাকে হারিয়েছে। তখন আবার জানিও।

(৬) মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়, ১৭০১, বয়স ৭½

ধাঁধাটি খুব পুরনো হলেও ভালো। নানান ভাবে এই ধাঁধা লেখা হয়। তোমারটা দিচ্ছি :—

বসিতে ঝম্‌-ঝম্‌, উঠিতে পাহাড়।
লক্ষ লক্ষ জীব মারে, না করে আহার।

কই, গ্রাহক বন্ধুরা, উত্তর দাও দিকি নি।

(৭) মিত্রা রায় চৌধুরী, ১৪২৫, বয়স ১৩

ওটা আমাদেরই ভুল, ভাই। রচনা আরো সহজ ভাষায় লিখো। সোজাসুজি ঘটনাগুলির বর্ণনা দিও। ডিউক বা পিনাকীর মনের মধ্যে কি হচ্ছিল সে তো কারো জানার কথা নয়। মাকু এ ১৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে পাবে। সন্দেশ কার্যালয়তেও পাওয়া যায়। কমিশন পাবে। সন্দেশের গ্রাহকেরা এই দুই জায়গা থেকে যে কোন বই কিনলেই কমিশন পাবে।

(৮) জয়ন্তকুমার রায়, ২০৫৩, বয়স ১৬½

রচনা ও ছবি ভালো হলেই ছাপা হয়। আর কিছু আমরা বলতে চাই না, কারণ সম্পাদকের হাতেই ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হয়। মহাশ্বেতা দেবী খুব ই প্রতিভাশালিনী লেখিকা। তাঁর লেখা মাঝে মাঝে ছাপব বলে আশা রাখি বৈ-কি। তিনি-ও সন্দেশকে খুব ভালোবাসেন এবং সেইটে হল সব চেয়ে বড় কথা।

(৯) তোমরা অনেকে বিজ্ঞানের আসরে একটা প্রশ্নোত্তর বিভাগ চেয়েছিলে। কিন্তু প্রশ্ন পাঠাচ্ছ না কেন? প্রশ্ন পাঠালে তার পরে ত উত্তর পাবে।

(১০) উদয়ন চৌধুরী ১৮৩৩

বয়স না দিলে কিছুই করা যায় না। হাতের লেখাও কিন্তু পড়া মুস্কিল। ভালো লেখা অভ্যাস কর।

(১১) অস্মিতা সেনগুপ্ত ২৮২৮, বয়স ১০

পত্রবন্ধু চাই। শখ:—বই পড়া, নাটক লেখা, গানবাজনা।

(১২) শুভ্রা বিশ্বাস ২০২৯, বয়স ১৪

যখনি চিঠি লিখবে, কোন বিভাগের জন্যে লিখেছ কোনা দিয়ে লিখে দেবে। যেমন, চিঠিপত্র বা হাত পাকাবার আসর, প্রকৃতি-পড়ুয়ার দপ্তর।

(১৩) আরেকজন লিখেছে তার গ্রাহক সংখ্যা ২৩২৯, বয়স ১০

কিন্তু নাম দেয় নি। ঐ সংখ্যাতেই তার ভাইয়েরও চলবে, কিন্তু ভাইয়ের-ও নাম দেয় নি। নিজের হাতে চিঠিপত্র লিখতে হয়। বড়দের দিয়ে লিখিও না। আর সর্বদা নাম দিও।

অজয় হোম

নাঃ শেষ পর্যন্ত স্টেডিয়াম সত্যিই তৈরি হবে বলে মনে হচ্ছে। ইডেনেই তৈরি হবে ৭৫ হাজার দর্শক আসনের কম্পোজিট স্টেডিয়াম। স্টেডিয়াম পরিকল্পনার কার্যসূচী এখন মন্ত্রীসভার অনুমোদন সাপেক্ষ। সেখান থেকে কোনো বাধা না এলে মাসখানেকের মধ্যেই কাজ শুরু হবে এমন আশা আমরা এখন করতে পারি। খেলা হবে ফুটবল ক্রিকেট ও হকি। এই তিন জাতীয় খেলা বিভিন্ন মরসুমে হলে ইডেন মাঠের ক্ষতি হবে কিনা এই নিয়ে অনেক বাদানুবাদের পর অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা শেষ পর্যন্ত যুক্ত মাঠ নির্মাণের স্বপক্ষে মত দেন। স্টেডিয়াম হবার আগেই ইডেনে শুরু হবে মেয়েদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা।

ক্রিকেট

এতদিনে কলকাতায় ক্রিকেট শেষ হল। দারুণ গ্রীষ্মে ক্রিকেট খেলা যে কত কষ্টের তা এক ভুক্তভোগী ছাড়া কেউই বুঝতে পারে না। সবচেয়ে বোঝে কম ক্রিকেট কর্তারা—সি এ বি। ক্রিকেট মরসুমের একটা শেষ সীমা বেঁধে দেওয়া উচিৎ। মার্চের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহের ভিতরেই সব খেলা শেষ করা যে কেন হয় না তা বোঝা খুবই শক্ত। কর্তৃপক্ষ ভুলে যান দেহ মনকে কষ্ট দেবার জন্যে খেলা নয়।

এ বছর নকআউট বা লীগ ফাইনাল কোনোটাই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হয় নি। দুটি খেলাতেই মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কিন্তু এই দুটি খেলাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে গোলমাল। নকআউট গোলমালের কারণ একজন আম্পায়ার, তিনি শেষদিনে ছিলেন অনুপস্থিত। লীগে দর্শকবৃন্দ।

আম্পায়ারের উপর প্রথম হামলা, পরে খেলোয়াড়দের উপর ইষ্টকবৃষ্টি। প্রায় প্রতিবছরই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এর কি শেষ হবে না?

মোহনবাগান সিনিয়র নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ফাইনালে পোর্ট কমিশনার্সকে ১৫৫ রানে পরাজিত করে ৩ বছর পরে মেহেরা ট্রফি বিজয়ী হয়। আর লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে ৬৬ রানে হারিয়ে ক্রিকেটে 'ডাবল' জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করে।

অস্ট্রেলিয়া সফর

বিদেশী মুদ্রার টানাটানির জন্যে ভারতে অস্ট্রেলিয়ার ৩টি টেস্ট্ কি ৫টি টেস্ট্ হবে এই নিয়ে মীমাংসা এখনও হয় নি। তবে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক পূর্ণসফর তালিকা গ্রহণ করে অর্থমন্ত্রকের কাছে ৪৬ হাজারি পাউণ্ড বিদেশী মুদ্রা অনুমোদনের সুপারিশ করেছেন। অর্থাৎ ৩টি টেস্ট্ ৫টি সাধারণ খেলার বদলে ৫টি টেস্ট্ ও ৫টি সাধারণ খেলার প্রস্তাবই অনুমোদন করলেন।

হকি

কলকাতায় এখন চলছে বেটন কাপ প্রতিযোগিতা। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দু'দলই এগিয়ে চলেছে রাউণ্ডের পর রাউণ্ড পার হয়ে কাপ বিজয়ী হবার প্রচেষ্টায়।

লীগ চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান। এর আগে মোহনবাগান অপরাজিত থেকে ৫ বার লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এ বছর নিয়ে হল ৬ বার। কিন্তু এ বছরে মোহনবাগানের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব একটাও ড্র বা হারা নয় বিপক্ষে একটাও গোল না খাওয়া। লীগ টেবিলে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হল ১৯টি খেলার মধ্যে মোহনবাগান ৪৪টি গোল করেছে, বিরুদ্ধে একটাও গোল হয়নি শূন্য ০, ড্র এবং পরাজয়ের ঘরেও ০, পয়েণ্ট ৩৮। অবশ্য একটি খেলা আর্মেনিয়ান্সদের বিরুদ্ধে না খেলে ওয়াকওভার পেয়ে ২ পয়েণ্ট লাভ করেছিল।

১৯৬২ সালে মোহনবাগান শেষবার লীগ জয় করে। তারপর পর পর ৬ বছর তারা রানার্স, তার মধ্যে ৪ বার অপরাজিত রানার্সের সম্মান। গত ৬ বছর ধরে একটি খেলার জন্যে লীগ হাতছাড়া হয়ে আসছে। সেই একটি খেলা এবার হেরেছে ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে। ইস্টবেঙ্গল কোনো খেলা ড্র করেনি! হেরেছে শুধু একটি খেলায় মোহনবাগানের কাছে। রানার্স ইস্টবেঙ্গল ১৯টি খেলায় ১৮ জয়, ড্র ০, পরাজয় ১, স্বপক্ষে গোল ৩৬, বিপক্ষে ১, পয়েণ্ট ৩৬।

সমস্ত লীগ খেলায় মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল দুজনে কেউই উন্নত মানের খেলা দেখিয়ে দর্শক মন জয় করতে পারে নি। বেশির ভাগ খেলাই হয়েছে উদ্দেশ্য বিহীন খাপছাড়া। বরঞ্চ তৃতীয় স্থান অধিকারী ইষ্টার্ণ রেল ও এ এ দল এই দু'দল অপেক্ষা বেশ কিছুটা ভালো খেলেছে। তারপরেই ঝগড়াঝাঁটি করে ৫টি খেলায় অংশ গ্রহণ না করেও বি এন আর চতুর্থ স্থান লাভ করে। এই ফলাফলেই বোঝা যায় বাকি অন্যান্য দলের মান কতো নিম্নস্তরের। লীগ তালিকায় সর্বশেষ দল হল খালসা স্পোর্টিং। তার ফল—খেলা ১৯, জয় ০, ড্র ৪, পরাজয় ১৫, স্বপক্ষে ৩, বিপক্ষে ২৮, পয়েণ্ট ৪।

লেফট আউট

সম্প্রতি হৃদরোগে পৃথিবী পরিত্যাগ করলেন ৬২ বছর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী। এনামে তাঁকে কজন চিনতো ? এক ডাকে চিনতো লোকে যদি বলা হতো মোহনবাগানের সতু চৌধুরী। চোখের উপর ভেসে ওঠে ১৯২৮ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত মাঠে দৌড়চ্ছে বল নিয়ে ৬ ফিটের উপর লম্বা স্বাস্থ্যবান স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এবং সহজাত কলাচাতুর্যে উচ্ছল এক পায়ের খেলোয়াড় সতু চৌধুরী। ডান পায়ে মারের জোর ছিল না কিন্তু সেটা পুষিয়ে নিয়ে ওই পায়ের জোর বাঁপায়ে এনে সটে আরোপ করত বিদ্যুতের গতি এবং বজ্রের শক্তি। আহা ! কি সেণ্টার করা ! একেবারে মাপা।···কি চোখ জুড়ানো বাঁ পায়ের গোল। পায়ের কায়দায় বাঁক খাওয়ানো কর্নার কিক সরাসরি গিয়ে ঢুকছে গোলে, গোলকিপার বোকার মতো হাঁ করে থেকেছে গতির নিশানা ঠাহর করতে পারে নি। বাঘা বাঘা গোরা পল্টন খেলোয়াড়দেরও একই অবস্থা। হাফ-ব্যাক পজিশন থেকে ফ্রি কিকে গোল !

১৯২৭ সালে পাবনা থেকে কলকাতায় এসে প্রথমে টাউন ক্লাবে খেলেন। সে বছরেই 'স্টেটসম্যান' কাগজ সতু চৌধুরীর ছবি ছেপে হেডিং দেন—'ওয়ান ম্যান প্লেড এগেনস্ট হোল টিম'। ১৯২৮ থেকে মোহনবাগানে। ১৯৩৪ সালে আই এফ এ-র হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ১৯৩৮-এ অস্ট্রেলিয়ায় সফর করেন। দু জায়গাতেই অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন।

ফুটবল

আজ ৫ই মে, কদিন পরেই অর্থাৎ ৯ তারিখ থেকে শুরু হবে প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ। গত দু'বছর আই এফ এ শীল্ডের খেলা শেষ হয় নি। গত বছর লীগের খেলাও শেষ হয় নি। এ বছর কী হবে কে জানে। আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি মানুষ যেন তার শুভবুদ্ধি না হারায়।

দার্জ্জিলিং ভ্রমণ

সিদ্ধার্থ সেন, বয়স—১১ গ্রাহক নং ১৮৫৫

বহুদিন ধরেই আশা করেছিলাম দার্জ্জিলিঙ যাব, কিন্তু এতদিন এটা মনের মধ্যেই ছিল, গত ২১শে জুন সেই আশা বাস্তবে রূপলাভ করল।

নির্দিষ্ট দিন ভোর ছ'টার সময় শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে দার্জিলিং যাবার জন্য মা, মামা, দিদি ও আমি শিলিগুড়ি ষ্টেশনে পৌঁছালাম, কিন্তু টিকিট কাটার কিছুক্ষণ পরই শুনতে পেলাম যে ট্রেন সেদিন হয়ত যাবে না, ট্রেনের পথের মধ্যে অনেক ধ্বস নেমেছে। তাই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা উঠলাম ল্যাণ্ড-রোভার (জীপের মত এক রকম গাড়ি) হাঁ ভারাক্রান্ত হৃদয়েই বটে, কারণ শুনেছিলাম ট্রেনের পথের সৌন্দর্য বাস রাস্তায় পাওয়া যায় না, যদিও ট্রেন লাইন ও বাস রাস্তা সব সময় পাশাপাশি।

যাই হোক, আমরা উঠলাম ল্যাণ্ড-রোভারে, পথে যে অপূর্ব সৌন্দর্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কোথাও রোদ, কোথাও কুয়াশা, কোথাও বা বৃষ্টি। এক জায়গায় দেখলাম চমৎকার সোনালী রোদ এসে গাছপালার উপর পড়াতে সে গুলি চিকমিক করছে, এক মুহূর্তের জন্য অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে আবার সেই দিকে তাকাতেই দেখলাম যে ইতিমধ্যেই একপশলা বৃষ্টি সোনালী রোদকে গ্রাস করে ফেলেছে। রাস্তাগুলি এঁকেবেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে-ঘুরে উপরে উঠেছে। এর ফলে নিচ থেকে দেখা যায় কোথায় আমরা উঠব, আর উপর থেকে দেখা যায় কোন পথে আমরা উঠেছি।

দুই পাশে ফেলে যাই চা বাগান, কোথাও বা একদিকে পাহাড়, আর একদিকে খাদ। ঐ খাদ দিয়ে দেখা যায় সমভূমি, আর পাহাড়ের উপর দেখা যায় পাহাড়িদের ছোট ছোট বাড়ি ও গাছপালা। কোথাও বা প্রচণ্ড শব্দ করে নামছে ছোটবড় ঝরনা।

এইসব দেখতে দেখতে আমরা এসে পৌঁছলাম চুণভাটি নামে এক জায়গায়। সেখানে দেখি অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ফলে প্রকাণ্ড একটা ধ্বস নেমেছে। প্রায় 'শ খানেক গাড়ি ধ্বসের দুদিকে আটকে আছে, আমাদের গাড়ি তাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল, তাই বাধ্য হয়ে দেখতে লাগলাম যে সব বস্তু প্রকৃতির খেয়ালে তৈরি হয়েছে, আর এর জন্য মা ধরিত্রীকে জানাতে লাগলাম অসংখ্য ধন্যবাদ।

ইতিমধ্যে সরকারী লোকজন এসে রাস্তা পরিস্কার করতে লাগল। প্রায় ঘণ্টা তিনেক পর তারা একটা পথ রচনা করতে সমর্থ হল। সেই পথ দিয়ে গাড়ি আবার এগিয়ে চলল। তিন ধারিয়া, কার্সিয়াং, টুঙ্, সোনাদা ও ঘুম পেরিয়ে যখন আমরা দার্জ্জিলিঙে পৌঁছালাম তখন একটা বেজে গেছে। তারপর আমরা গিয়ে উঠলাম মামার এক বাড়িতে। সেখানে কিছু খেয়ে ও বিশ্রাম করে আমরা বের হলাম বেড়াতে।

দার্জ্জিলিঙে জুন-জুলাই মাসেও খুব শীত থাকে, তাই সেখানে সারা বছরই সোয়েটার চাদর গায়ে দিয়ে বের হতে হয়, আর শুতে হয় লেপ কম্বল গায়ে দিয়ে। আমরাও সোয়েটার চাদর গায়ে দিয়ে ২১, ২২ ও ২৩ তারিখে দার্জ্জিলিঙের ম্যালে, চিত্তরঞ্জনের বাসভবন, রাজভবন, চিড়িয়াখানা, হিমালয়ান মাউন্টিয়ারিং ইনষ্টিটিউট, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া ফলস্ বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রভৃতি দেখলাম। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আবহাওয়া খারাপ থাকার দরুণ আমরা কাঞ্চন জঙ্ঘা দেখতে পাই নি। তাছাড়া দার্জ্জিলিঙের দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে প্রায় সমস্তই দেখেছি। আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ করেছি যে পাহাড়ি রাস্তায় উদাস, অলস ভাবে ঘুরে বেড়াতে কি মজা। তারপর ২৩শে জুন দুপুরে ল্যাণ্ডরোভারে রওনা হয়ে শিলিগুড়িতে পৌঁছালাম বিকাল চারটের সময়।

দার্জ্জিলিঙে নানা জায়গা দেখতে যে এক ফোঁটা ক্লেশ হয়নি একথা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অদম্য উৎসাহ তাদের দমন করে রেখেছে। দার্জ্জিলিঙ্ থেকে ফেরার সময় মনে যে কষ্ট হয়েছে তা বুঝান যায় না।

বৌঠানের কথা

সুপর্ণ চৌধুরী গ্রাহক নং ১২০৯ বয়স ১১ বছর

সকলে তাঁকে জানে, প্রতিমা ঠাকুর নামে। কিন্তু আমরা শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা ডাকতাম বৌঠান বলে, কিছুদিন আগে তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে খুব কষ্ট হল এবং তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা মনে পড়ল। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছেলে রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী, তাঁকে আমরা যখন দেখেছি তখন তিনি অসুস্থ, শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণের পাশে কোনারক নামে যে বাড়ি সেই বাড়িতে বৌঠান থাকতেন। দেখতে পেতাম তিনি কোনারকের বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ খুব অল্প বয়সে মারা যান। শান্তিনিকেতনে তাঁর নামে ছোটদের জন্য একটি পাঠাগার খোলা হয়। এই পাঠাগারের উদ্বোধন করেন বৌঠান। এছাড়া অন্যান্য অনেক সভাতেও তাঁকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হত। তখন কথা বলতে গেলে তাঁর গলা কাঁপত।

তিনি কানেও একটু কম শুনতেন। কিন্তু তবুও তাঁকে অনেক সভাতেই ডাকা হত তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজে রবীন্দ্রনাথকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকবার বিদেশেও গিয়েছিলেন। বৌঠানের আর একটি গুণ ছিল তিনি খুব ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। শান্তিনিকেতনের সবাই তাঁকে খুব ভালোবাসতেন।

একবার তাঁকে সামনাসামনি দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। একদিন আমার বন্ধু সিদ্ধার্থের সঙ্গে খেলা করতে করতে উত্তরায়ণের কাছে চলে গিয়েছিলাম। সিদ্ধার্থরা রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়, সে হঠাৎ বললে 'চল্, একবার ঠাকুমার (বৌঠান) সঙ্গে দেখা করে আসি।' আমি আর সিদ্ধার্থ কোনারকের ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম বৌঠান একটা গোল চেয়ারে বসে আছেন। পাশে টেবিলের উপর একটা বাটিতে কিছু মুড়ি। প্রথমে সিদ্ধার্থ তাঁকে প্রণাম করল, তারপর আমি। তিনি আমাদের দেখে খুব খুসি হলেন। আমরা দুটো চেয়ারে বসলাম। তিনি আমাকে দেখিয়ে সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ, কে?' সিদ্ধার্থ বলল, 'ও আমার বন্ধু।' তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি?' আমি বললাম 'সুপর্ণ চৌধুরী।' তিনি আবার বললেন, 'কোন ক্লাসে পড়?' আমি বললাম 'ক্লাস থ্রি'। এই সব কথাবার্তার পর তিনি একটা লোককে ডেকে বললেন, 'এদের দুটো বিস্কুট আর লজেন্স দিয়ে দিস।' আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ঘরের আসবাবপত্র দেখতে লাগলাম। তারপর প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

বৌঠান ছোট ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসতেন। বিশেষ করে ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু দিনে আমাদের অর্থাৎ ছোটদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেন। আমরা দল বেঁধে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতাম। বৌঠান আজ নেই। এখন শান্তিনিকেতন গেলে কোনারকের যে বারান্দায় বৌঠান বসে থাকতেন সেই বারান্দা দেখব কিন্তু তাঁকে আর দেখতে পাবো না।

চন্দনার বেড়াল

কেয়া বসু

গ্রাহক নং ১৪৬০—বয়স ১৩ বছর

চন্দনার খুব বেড়াল পোষার সখ। পশমের বলের মত নরম বেড়ালছানাগুলো কি সুন্দর ডাকে 'মিউ মিউ,' চকচকে চোখে তাকায়, চুকচুক করে দুধ খায় আর লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করে। কিন্তু তার মা বেড়াল একেবারেই পছন্দ করে না। চন্দনার বয়স আট বছর, তার এক বোন আছে—ময়না, সে আরও ছোট্ট। চন্দনা একদিন করল কি—ভাঁড়ার ঘরের একটা আলমারির মধ্যে চুপিচুপি পাশের বাড়ি থেকে পাওয়া দুটো বেড়ালছানা পুষতে আরম্ভ করল। সে ছাড়া আর একথা কেউ জানতে পারল না।

তারপর থেকে চন্দনা মায়ের কাছে বেশি বেশি খাবার চাইতে লাগল। চন্দনা বলে, 'মা, আমার পেট ভরে না, আমাকে আরও ভাত, মাছ, দুধ দাও।' আর মা তো ভারি খুসি। তিনি ভাবেন, যে মেয়ে কোনোদিন এত খেত না, সে যখন খেতে চাইছে, নিশ্চয়ই সেটা ভাল লক্ষণ, রোগা মেয়েটা এবার মোটা হবেই।

চন্দনার খাবার সময় মা কাজে বেরিয়ে যেতেন বলে থাকতে পারতেন না। একদিন ছুটির দিন তিনি হঠাৎ দেখলেন যে চন্দনা মাছভাত আর দুধভাত মেখে প্লেটে করে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরের দিকে যাচ্ছে। ব্যাপার কি ? তিনিও পিছু পিছু গেলেন। দেখলেন, চন্দনা আলমারি খুলে প্লেটটা ভিতরে ঢু'কয়ে দিল।

মা তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। ছানাগুলো খাবার দেখে লাফিয়ে লাফিয়ে ডাকছে—মিউ মিউ। তিনি চন্দনার কোন কথা না শুনে বেড়ালদের টান মেরে ফেলে দিলেন। সেদিন রাত্রে তিনি শুয়েছেন, এমন সময় কোথা থেকে যেন মিউ মিউ শব্দ। বেড়ালরা ভীষণ চেঁচাচ্ছে।

শোবার ঘরের পাশেই গ্যারাজ। শব্দটা যেন ওদিক থেকেই আসছে। তিনি গ্যারাজে গিয়ে দেখেন চন্দনা বেড়ালদের জন্য ইট দিয়ে ঘর তৈরি করে বেড়ালদের সেখানে লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু সেই ঘরে একটুও ফাঁক নেই। বেড়ালদের দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, তাই চেঁচাচ্ছে। তখন মা চন্দনাকে বললেন, 'বেড়াল যখন পুষবেই তখন ঘরে ফাঁক করে দাও।' চন্দনা তখন খুসি মনে ভাল করে ঘর তৈরী করল। বেড়ালছানারা এখনও সেখানেই আছে আর দিনে দিনে বাড়ছে। তাদের জন্য রোজ গ্যারাজে খাবার নিয়ে যায় চন্দনা আর তার ছোট্ট বোন ময়না।

সেতো এলনা

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য

গ্রাহিকা নং ২৫৮১—বয়স ১৩ বছর

নাঃ সে এলো না। আমি ব্যগ্র হোয়ে প্রতীক্ষা করছি তার জন্য, কবে সে আসবে ? তার জন্য তৈরী আছে সবই, নেই শুধু সে। তার জন্য তৈরী আছে ঘড়ি, গেঞ্জি, তালা, চোখ খারাপ হবার ভয়ে আছে চশমা, জল আনার জন্য আছে কলসী, হাওয়া খাওয়ার জন্য একটা হাত পাখাও আছে, আছে সবই নেই শুধু সে।

তোমরা হয়তে বলবে 'কে, সে ?' আমি বলবো, সে একজন মস্ত বড় মানুষ। তোমরা হয়তো হেসে আমার কথা উড়িয়ে দেবে, কিন্তু তোমরা চেষ্টা করলে তার জন্য তৈরী জিনিসগুলো দেখতে পাবে। দেখতে পাবে, রাসবিহারীর মোড়ে একটা বড় গেঞ্জি ঝুলছে তার জন্য, আবার একটু এগোলেই দেখতে পাবে একটা বড় তালা ঝুলছে তার জন্য, কিন্তু কই সে ? আবার যদি জগুবাবুর বাজারের সামনে দিয়ে যাও তবে দেখবে বাসনের দোকানে তার জন্য রয়েছে বিরাট কলসী আর হাতপাখা। নেই শুধু সে। হাজরার মোড়টা ঘুরলেই একটা চশমার দোকানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লে দেখা যাবে তার চশমা ; বাটার দোকানে নমুনা হিসাবে তার জুতো। এসপ্লানেডে গেলে দেখবে, তার জন্য টাঙানো ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে তার প্রতীক্ষা করছে, কিন্তু সে কি আসবে ? হয়ত কোন দিন সে কোন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন এর মতো বৈজ্ঞানিকের হাতে তৈরী হবে, আর তখন হয়তো আমি থাকব না ; যদি তোমরা তাকে দেখ তো আমার কথা বলতে, ভুলো না কিন্তু।

* (বড় বড় দোকানের বড় সাইজের নমুনা দেখে লেখা।)

দিল্লী

সন্দীপন দেব

গ্রাহক নং ২০৪০—বয়স ৭½ বছর

আমরা যখন দিল্লী গিয়েছিলাম, তখন আমরা হাউস খাসে ছিলাম। হাউস খাস মানে রাজার দীঘি। সেখানে একটা দীঘি ছিল। আলাউদ্দীন বলে একজন রাজা এখানে এসে বিশ্রাম করত। দীঘিটা এখন শুকিয়ে গেছে। একটু জল আছে। তখন যে ঘরগুলো ছিল, এখন সেগুলো ভেঙে গেছে। ছুটির দিনে লোকেরা সেখানে পিকনিক করতে যায়।

কুতুব মিনার আমাদের বাসার কাছেই ছিল। আমরা প্রায়ই সেখানে বেড়াতে যেতাম। কুতুবউদ্দীন বলে একজন রাজা কুতুব মিনার তৈরি করেছিলেন। আলাউদ্দীন ঠিক করেছিলেন যে কুতুবের ডবল একটা মিনার তৈরি করবেন। কিন্তু আলাউদ্দীন মিনার তৈরি হবার আগেই আলাউদ্দীন মরে গেলেন। তাই আলাউদ্দীন মিনার আর পুরো হল না। সেখানে একটা স্তম্ভ আছে। লোকে বলে রাজা বিক্রমাদিত্য সেটা তৈরি করেছিলেন। যে এটাকে দুই হাতে পিঠের দিকে জড়িয়ে নিতে পারবে সে নাকি রাজা হবে। একজন ধরতে পেরেছিল। কিন্তু তাকে আমরা রাজা টাজা কিছু হতে দেখলাম না।

কুতুবমিনার খুব উঁচু। আমরা কুতুবমিনারে উঠিনি। আমি অত উপরে উঠতে পারব না। আমার পা ধরে যায়।

দিল্লীতে রাষ্ট্রপতিভবন আছে। সেখানে রাষ্ট্রপতি থাকেন। রাষ্ট্রপতি মানে প্রেসিডেণ্ট। আমরা সেখানেও গিয়েছিলাম। কাছেই পারলামেণ্ট। সেখানে বক্তৃতা টক্তৃতা হয়। পারলামেণ্ট একেবারে গোল।

দিল্লীর রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার।

পুরোনো দিল্লীতে লালকেল্লা আছে। সেটা পুরো লাল পাথর দিয়ে তৈরি। শাহজাহান লাল কেল্লা তৈরি করেছিলেন। রাজা যেখানে ময়ূর সিংহাসনে বসতেন, সেইসব দেখেছি।

দিল্লীতে যেখানে পুরোনো কিল্লা আছে, লোকেরা বলে সেখানে যুধিষ্ঠিররা থাকতেন। পুরোনো কেল্লাতে একটা লাইব্রেরি ছিল। তার সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে পড়ে রাজা হুমায়ুন মারা যান। কাছেই Zoo—সেখানে একটা ঘোড়ার গাড়ী আছে। সেটার নাম বগগি। আমরা বগ্‌গিতে চড়ে Zoo দেখলাম। Zoo আমার খুব ভাল লাগল।

Zoo-তে একটা গণ্ডার আছে। তার নাম মোহন। মোহন অন্ধ গণ্ডার। তাকে দেখলে ভীষণ কষ্ট হয়।

দিল্লীতে বিড়লা মন্দির আছে। সেখানে একটা park আছে। দোলনা, ঢেঁকি, স্লিপ সব আছে।

সেখানে তিন-চারটে গুহাও আছে। একদিন গুহার মধ্যে বাবার সঙ্গে 'চোর চোর' খেলা আরম্ভ করলাম। আমি যেই বাবাকে ধরতে যাই অমনি বাবা সাঁৎ করে সরে যায়। এমনি করে হঠাৎ আমি

খুব নিঃশব্দে বাবার পিছনে এসে গেলাম, তারপর আরো নিঃশব্দে বাবাকে ছুঁয়ে দিলাম।

বাবা, আমি, মা কত মজা করেছি বিড়লা মন্দিরে গিয়ে। বিড়লা মন্দির আমার খুব ভালো লাগত।

আমরা একদিন তুগলকাবাদ পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। তুগলকাবাদ অর্ধেক হয়ে আছে। তুগলকাবাদ বানিয়েছিলেন গিয়াসুদ্দিন তুগলক। একদিন তার ছেলে মহম্মদ তুগলক তাকে মেরে ফেলে। সেজন্যে তুগলকাবাদ অর্ধেক হয়ে পড়ে আছে।

দিল্লী আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমরা দিল্লীতে দেড় বছর ছিলাম। যখন দিল্লী থেকে চলে আসি তখন আমার দিল্লীর জন্যে খুব কষ্ট হয়েছিল।

(১৫ই জুনের মধ্যে উত্তর দিতে হবে)

(১)

দুই আর চারে নেব, এক চারে বলিব,
এক তিনে হাত পাব, তিন-চারে রহিব,
এক দুই কত পাই যন্ত্র ও কৌশল,
সবে মিলে চেঁচামেচি, সমবেত কোলাহল।

(২)

গরমের ছুটিতে ছকু লতু যাবে দানাপুরে, পেনু আর মিনু যাবে লখনউ, কিন্তু আমরা ঠিক করেছি গ্রামে যাব। মজা মন্দ হবে না। গরমও কম লাগবে। সারাদিন তাস পেটাবো, কিনে আনা রসগোল্লা সন্দেশ ফেলে খালি চুরি করে আচার খাব, ধরতে গেলে এক লাফে পালাব।

* * *

আর অনে···ক ফল খাব। ফলের কথা বলিনি বুঝি? বলেছি বৈকি। গ্রাহক গ্রাহিকারা খুঁজে বার কর উপরের গল্পের মধ্যে কটা ফলের নাম লুকিয়ে আছে।

(৩)

ভজাকে কতগুলো আম বিক্রি করতে বসিয়ে তার বাবা বললেন—'ডানদিকের আমগুলো খুব মিষ্টি, ওগুলো টাকায় চারটে করে দেবে। আর বাঁদিকের আমগুলো একটু টক, টাকায় ছটা করে দিও। ভাল আর মন্দ আম সমান সংখ্যক আছে।' বাবা চলে গেলে পরে ভজা ভাবল 'ভাল-মন্দ আম যখন সমান সংখ্যকই আছে, তখন আর কষ্ট করে অত হিসাব করি কেন? সব আমই যদি টাকায় পাঁচটা হিসাবে বেচি, তাহলেও নিশ্চয় দরেদরে একই ফল পাব।' এইভাবে সে সব আম বেচল। বাবা ফিরে আসতেই ভজা তাঁকে আম বিক্রির টাকা বুঝিয়ে দিল, কিন্তু তিনি বললেন, 'আর একটা টাকা কোথায় গেল? তুই ঠিক ঠিক হিসাব করে বিক্রি করেছিলি ত?'

তারপর ভজা যখন তার হিসাবের কথা বলল তখন বাবা একটু হেসে বললেন—'বোকচন্দর!' তোমরা বল দেখি—(ক) ভজার হিসাবে কেন ভুল হয়েছিল? বুঝিয়ে বল।

(খ) মোট কত আম ভজা বিক্রি করেছিল?

চৈত্র মাসের ধাঁধার উত্তর

(১)

বাঁ থেকে ডানদিকের প্রথম লাইনে, উপর থেকে নিচে তৃতীয় ঘরের 'ক' থেকে সুরু করে, সব কয়টি সর্ত রক্ষা করে দশটি রঙের নাম পাবে:—কমলা-বেগুনি-সবুজ-হলদে সাদা গোলাপী ছেয়ে (অর্থাৎ ছাইএর রঙ)—কাল-নীল-লাল।

কয়েকটি গ্রাহক একটু অন্য রকমভাবে সবকটি রঙের নাম, সর্ত রক্ষা করে বার করেছে। তাদের উত্তর সম্পূর্ণ ঠিক ধরা হয়েছে।

কিন্তু, বেশ কিছু সংখ্যক গ্রাহক এলোমেলোভাবে কেবল রঙের তালিকা দিয়েছে, তারা সর্ত রক্ষা করে বার করছে না আন্দাজে বার করেছে বুঝবার কোন উপায় নাই। সুতরাং তাদেরটা প্রায় ঠিক বলা হয়েছে। যারা দশটি রঙের নাম বার করতে পারেনি তাদের উত্তর ভুল বলে ধরা হয়েছে।

(২)

কমল।

(৩)

২২ দিন।

১৩৭৬ সালের ধাঁধা প্রতিযোগিতা

বাঃ, বাঃ, সাবাশ! সাবাশ!! এবার দেখি বেশ কিছু সংখ্যক গ্রাহক সব ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছ। কিন্তু এবার থেকে আরো উঠে পড়ে লাগো, কারণ ১৩৭৬ সালের প্রথম থেকে ধাঁধার সঠিক উত্তর দেবার পুরস্কার প্রতিযোগিতা সুরু হল।

যদি সারা বছরের সঠিক উত্তর দাতাদের সংখ্যা খুব বেশি হয় তাহলে তাদের মধ্যে কারা বেশি ভাল করে উত্তর দিয়েছ সেটা দেখা হবে। আবার যদি কারোই সারা বছরের সব উত্তর ঠিক না হয়, তাহলে যারটা সব চেয়ে ভাল হবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

অবশ্য প্রত্যেক মাসে যেমন উত্তর দাতাদের নাম বেরোয় সেটা বেরোবেই। আর একটা জিনিস সম্বন্ধে তোমরা সাবধান হও। এখনও কিন্তু প্রত্যেক মাসে নাম নম্বরহীন কয়েকখানা উত্তর পাচ্ছি। সব কিছু ঠিক করে যদি নিজের নাম লিখতে ভুলে যাবার দরুণ পুরস্কার না পাও তাহলে কি রকম দুঃখের কথা হবে বলত!

উত্তর দাতাদের নাম—

যাদের সব কয়টি উত্তর ঠিক—

৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ১৭৫ অনিতা রায়, ২৮৮ গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪০ পূরবী চক্রবর্তী ও অরুণাভ মুখার্জী, ৩৮০ গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ৩৯৭ ভারতী বসু, ৪০৩ বুদ্ধদেব ও পারমিতা নিয়োগী, ৫১১ প্রতুল, প্রদীপ, প্রণব ও প্রবীর কুণ্ডু, ৬১৬ ভারতী মিত্র, ৮৩৮ সুপ্রতীক বাগচী, ৮৪৯ স্মরণ দাশগুপ্ত, ১০৯৮ তারা চন্দ, ১২৩২ নন্দিনী দত্ত মজুমদার, ১২৩৩ স্বাতী সিংহ, ১২৯৮ রুদ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৫৯৭ বিচিত্র কুমার গুহ, ১৬১৩ ভারতী ও অভিজিৎ দে, ১৬১৫ পথিকৃৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬৫১ হাম্বির মজুমদার, ১৬৯৩ আশীষ ও শ্যামল পাইন, ১৭৬০ সুখেন্দু কুমার বাউর, ১৭৮৮ পলাশবরণ পাল, ১৮৮৫ রীনা ও হেনা ভট্টাচার্য, ১৮৯৪ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২০৬৬ মিলিন্দ চক্রবর্তী, ২১৪২ স্বর্ণাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১৫২ সুরজিৎ, অনুপা ও শিপ্রা কর, ২১৭৪ শিবরঞ্জনী মাইতি, ২১৮৮ মহুয়া সেনগুপ্ত, ২২১৫ শুভা মজুমদার, ২৩১০ ভাস্করজ্যোতি ও প্রজ্ঞাপারমিতা বসু, ২৪৯৬ স্মরজিৎ দে, ২৫৪৪ সান্ত্বনা রায় চৌধুরী, ২৫৪৭ প্রসেনজিৎ ও মৈত্রেয়ী বোস, ২৭২০খুশমুদ গুলাম হাসনায়ন, ২৭৪০ সোনালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭৬৩ শর্মিলা ও সব্যসাচী বসু,, বি-২৭ সিদ্ধেশ্বরী পাঠাগার, ভিটা, বর্ধমান।

দুটি ঠিক ও একটি প্রায় ঠিক—

৬৫ সঞ্জয় ও সুজয়, ১১৫ অর্পিতা কিশলয় ও কিশোর চক্রবর্তী, ২২৭ জয়ন্ত ও সুবল কুমার নন্দী রায়, ২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ২৯৫ শম্পা ও শর্মিলা দত্ত, ৭৬৭ সঙ্ঘমিত্র দে-চৌধুরী, ৮৪৩ মালা দাশগুপ্ত, ৮৯০ কারুবাকী ও বিপাশা দত্ত, ৮৯৮ হিমাদ্রি ও দোলনচাঁপা চৌধুরী, ৯৫০ অপর্ণা রক্ষিত, ১০৭১ সুপ্রতীক বিশ্বাস, ১১৫৪ কেকা চৌধুরী, ১২৫১ শর্মিলা সেন, ১৪৪৮ রিতা, রুমা, বাসব ও শান্তনু রায়, ১৩৬১ অনন্যা সরকার, ১৫৮৩ অঞ্জন চ্যাটার্জী, ১৬১৯ অঞ্জন ও অলোক ব্যানার্জী, ১৬৫৫ শৃণ্বন্তী পাল, ১৮২৭ অণুতোষ ও অশোক চট্টোপাধ্যায়, ১৮৬৩ সোনালী লাহিড়ী, ১৯৯৭ অনসূয়া বসু, ২৫৫৪ জয়ন্ত রায়, ২১৪৯ অনামী ও মনামী রায়, ২১৯৫ মুকুর দাশগুপ্ত, ২১৯৬ মিঠু, কুকাই ও বিলু ঘোষ, ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায়, ২২৭০ অরুন্ধতী ও ব্রততী সেন, ২২৮৭ সঙ্ঘমিত্রা চক্রবতী, ২২৯৪ সুনন্দন চক্রবর্তী, ২৪০১ সুব্রত বক্সু, ২৫৫৮ কুণাল চট্টোপাধ্যায়, ২৭৮৩ অঞ্জন চৌধুরী, ২৬৮৬ ভাস্বতী দত্ত, ২৭৩৫ উৎপল ভট্টাচার্য, ২৮২৮ অস্মিতা সেনগুপ্ত, ২৮৫০ শ্যামলী চক্রবর্তী, ৩৮৯১ অঞ্জন কুমার ঘোষ।

দুইটি উত্তর ঠিক—

১২৪ দীপঙ্কর ও রুমা মজুমদার, ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ৩১৬ কুমকুম ভট্টাচার্য, ৪৪৮ অঞ্জনা, নূপুর ও মিলনকুমার বিদ্যান্ত ৮৭০ শম্পা, সুপ্তা ও শান্তনু চক্রবর্তী, ৯৮৩ জ্যোতির্ময় ইন্দ্রাণী ও ঈশানী মজুমদার, ১১২৬ অনিরুদ্ধ চক্রবতী, ১৩২০ বিজলী ঘোষ, ১৩৬৫ জয়ন্তী রায় চৌধুরী, ১৪০১ মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায় ১৪০১ উত্তমকুমার বটব্যাল, ১৫১৪ রমিতা পাল, ১৫৩৬ বাপ্পাদিত্য দেব, ১৫৮২ জবা রায়, ১৭৯২ মলয়া পাল, ২০২৭ মণিময় নাগ, ২০৪৭ অনিমা ও অনুশ্রী বসাক, ২১৫৮ সুবীর কুমার ধর,

২১৭০ অম্লান ভট্টাচার্য, ২১৮৫ অমিতেন্দু দেব রায়, ২২০২ শুভাশিস ধর, ২২২৪ শুভময় ও কল্যাণময় চট্টোপাধ্যায়, ২১২৫ শ্যামাপ্রসাদ দাস, ২৩২৯ দুলাল ও শ্যামল সমাদ্দার, ২৩৪৮ মণিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৬০ শুভেন্দু প্রকাশ গাঙ্গুলী, ২৩৮৬ চিন্ময় ভট্টাচার্য, ২৪১০ ঋত্বিক সান্যাল, ২৫৮১ অভীক কুমার ভট্টাচার্য, ২৮৩৭ অর্পিতা রায় চৌধুরী, জেবি ৮৭ ভদ্রশীলা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, ইটাহার, পশ্চিম দিনাজপুর।

একটি উত্তর ঠিক—

১২২৪ সমীর সাহা, ১৬০৩ নিশীথরঞ্জন, নীতীশরঞ্জন, সমীর ও মিতালী গুহ, ১৯৯৪ মালা রায়, ২০২৩ উজ্জ্বলকুমার ও উৎপলকুমার চক্রবর্তী, ২০৩০ মিতা মুখোপাধ্যায়, ২০৪১ কুমার রায়, ২০৮৬ জয়শ্রী স্বাগতা, ও অরূপকুমার তরাত, ২৪১৫ সুশান্ত বসু, ১৭০৩ অমিতাশীষ গোস্বামী।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বহুসংখ্যক গ্রাহক দেরীতে নব-বর্ষ সংখ্যা পেয়েছে বলে হাসির ছবি প্রতিযোগিতার উত্তর পাঠাবার তারিখ ৩০শে জুন পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হল।

সার্কাসের খেলা আমিও দেখাতে পারি।

সুফি
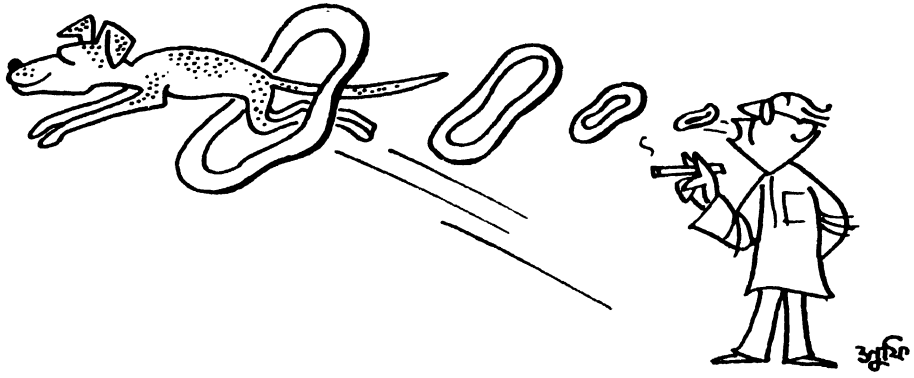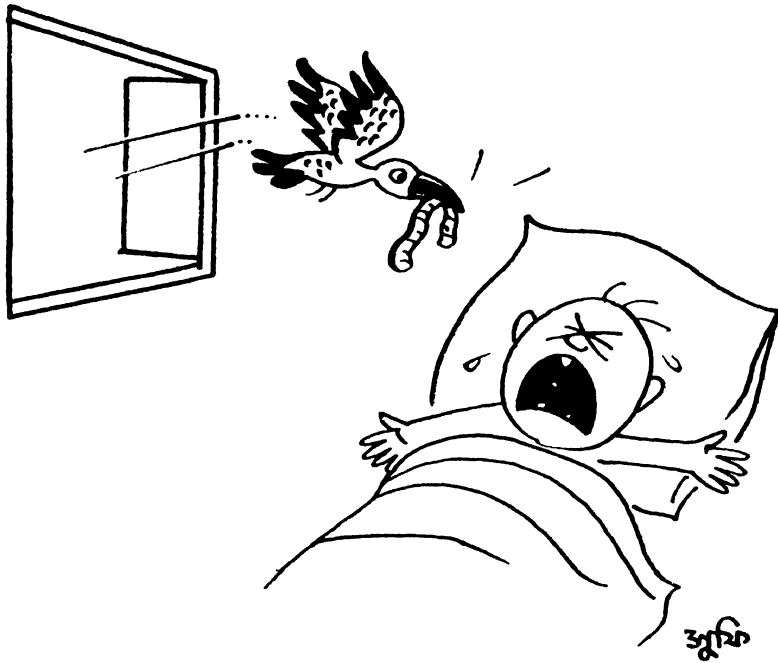
নবম বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৭৬/অগাস্ট ১৯৬৯

কেউ জানেনা

নির্মলেন্দু গৌতম

যেমনি খুসি মুখোস এঁটে
যা ইচ্ছে তাই সেজে,
কেউ জানে না যখন খুসি
দিচ্ছে দেখা কে যে!

খোঁজ পাওয়া তার যাচ্ছে না তো
সবাই ভেবে সারা!
হঠাৎ তাকে ধরতে বুঝি
সতর্ক সব পাড়া।

কেউ জানে না এমনি সময়
বললে হঠাৎ কে যে,
'পাড়ায় পাড়ায় এমনি খোঁজা
মজার ব্যাপার সে যে!

'বরং সবাই মুখোস এঁটে
ইচ্ছে মতন সাজি,
হার মেনে সে অমনি সবার
বন্ধু হবে আজি।'

নারদ মুনির আরো গল্প

কুন্তলা দত্ত

নারদমুনির তো আর কোনো কাজ নেই, কেবল বীণা বাজিয়ে হরিনাম করা আর বেড়ানো। এমনি বেড়াতে বেড়াতে একবার তিনি স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গেলেন। ইন্দ্র সাদরে মুনিঠাকুরকে বসিয়ে পাদ্যঅর্ঘ্য দিলেন; কুশল প্রশ্ন করলেন। তারপর তাঁর পারিজাত গাছ থেকে একটি ফুল নারদকে দিলেন। ফুল পেয়ে নারদ খুব খুসি। যে সে ফুল তো নয়, স্বর্গের পারিজাত—স্বর্গে ইন্দ্রের বাগান ছাড়া কোথাও এ ফুল পাওয়া যায় না।

তিনি ফুল নিয়ে দ্বারকায় এলেন কৃষ্ণের কাছে এবং তাঁর প্রিয়তম কৃষ্ণকেই ফুলটি দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সে ফুলটি নিয়ে পরিয়ে দিলেন রুক্মিণীর মাথায়। সে ফুল পরে রুক্মিণীর অপরূপ শোভা হল। নারদ বললেন, 'আহা, মা, তোমার কি রূপ খুলেছে।'

রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণ দুজনেই খুব আনন্দিত। নারদ তখন মনে মনে ভাবছেন—'ঠাকুর, তুমি ত্রিভুবনকে নাচিয়ে বেড়াও, এবারে আমি তোমায় একটু নাচাই।'

তিনি করলেন কি শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা গেলেন সত্যভামার কাছে। গিয়েই ইনিয়ে বিনিয়ে গল্প করলেন যে তিনি স্বর্গ থেকে একটা পারিজাত ফুল এনে শ্রীকৃষ্ণকে দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই ফুলটি রুক্মিণীর মাথায় পরিয়ে দিতেই কি শোভা—ইত্যাদি।'

এখন সত্যভামার স্বভাব ছিল অনেকটা ছোট ছেলেমেয়েদের মতো। ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন অনেক সময়—'ওকে বড় পুতুলটা দিয়েছে, আমারটা ছোট কেন'—কিম্বা—'ওকে কেন দিল, আমাকে কেন দিল না'—বলে হাত পা ছুঁড়ে মাটিতে গড়িয়ে কাঁদতে শুরু করে সত্যভামাও ছিলেন ঠিক তেমনি। তিনি চাইতেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবেন সব ভাল জিনিস তাঁকেই দেবেন। কাজেই নারদের কাছে পারিজাত ফুলের কথা শুনে অভিমানে তাঁর মুখ কালো ও চোখ ছল্ ছল্ হয়ে এল। তিনি আস্তে আস্তে গোঁসাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ওষুধ ধরেছে বুঝতে পেরে নারদ অমনি চট্ করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে বললেন—

'তাইতো ঠাকুর, বড় মুস্কিল হল যে। তোমার এখান থেকে আমি সত্যভামার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তারপর কথায় কথায় যেই পারিজাত ফুলের কথাটি বলেছি অমনি সত্যভামা মুখ কালো ও চোখ ছল্‌ছল্ করে গোঁসাঘরে গিয়ে ঢুকল।

শুনে শ্রীকৃষ্ণ মহাবিপদে পড়লেন। সত্যভামাকে কি করে এখন শান্ত করা যায়। তিনি রুক্মিণীকে বললেন—'তুমি ফুলটা সত্যভামাকে দিয়ে দাও!'

রুক্মিণী শান্ত, বাধ্য প্রকৃতির। তিনি সব সময়ই সত্যভামাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের দাবী

ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু আজ তাঁরও অভিমান হল। সব সময়ই সত্যভামার দাবী মানতে হবে কেন? রুক্মিণীও কি শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী নন? তিনি একটি ফুল পরেছেন—তাই নিয়ে অত কাণ্ড?

রুক্মিণী বেঁকে বসলেন। নারদ তো শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা দেখে মনে মনে খুব হাসছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন গেলেন সত্যভামার কাছে। সত্যভামা—এলোচুলে নিরাভরণা হয়ে মাটিতে শুয়ে আছেন। শ্রীকৃষ্ণ অনেক বুঝিয়ে তাঁর মান ভাঙালেন। বললেন.—'একটা ফুলের জন্য এত? তোমাকে আমি পারিজাত গাছ সুদ্ধ এনে দেব।'

তখন সত্যভামার মুখে হাসি ফুটল। শ্রীকৃষ্ণ তখনই নারদকে পাঠালেন ইন্দ্রের কাছে। বলে—পাঠালেন যে তাঁর একটি পারিজাত গাছ চাই।

নারদের মুখে এ কথা শুনে ইন্দ্র চটে গেলেন। পারিজাত স্বর্গের গাছ। নন্দন কানন ছাড়া কোথাও হয় না। আর পৃথিবীর এক গোয়ালার ছেলে সেই গাছ চায়? না হয় দু-একটা হাতি, বক, সাপ মেরেছে, আর রাজা হয়েছে—তাই বলে এত স্পর্ধা? এ সব কথা বলে তিনি নারদকে জানালেন—গাছ তিনি দেবেন না।

নারদ তক্ষুণি শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে মুখ কালো করে বললেন,—'তোমার কথায় ইন্দ্রের কাছে গিয়ে—না হক কতগুলো গালাগাল শুনতে হল তোমার নামে।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—'কেন? ইন্দ্র গাছ দিল না? কি বললে?'

নারদ তখন হুবহু ইন্দ্রের কথাগুলো শুনিয়ে দিলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'বটে? ইন্দ্র এ কথা বলল? অসুরদের আক্রমণে হেরে গিয়ে বারবার

যে আমার কাছে কেঁদে পড়ত, আর আমাকে স্বর্গ উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হত সে সব বুঝি ভুলে গেছে ? বলি যখন তপস্যার বলে ইন্দ্র হবার জোগাড় করছিল তখন তাকে পাতালে পাঠিয়ে কে ইন্দ্রের রাজপাট রক্ষা করেছিল তাও ইন্দ্রের এখন আর মনে রাখার দরকার নেই, না ? বল গিয়ে যে ভালয় ভালয় পারিজাত গাছ যদি না দেয় তো কেড়ে আনব !

শ্রীকৃষ্ণ হলে বিষ্ণুর অবতার। ইন্দ্র বিপদে পড়লে বিষ্ণু বহুবার তাঁকে উদ্ধার করেছেন—তাই শ্রীকৃষ্ণ ঐ কথাগুলো বললেন। নারদ আবার গেলেন ইন্দ্রের কাছে। হুবহু শ্রীকৃষ্ণের কথাগুলো তাঁকে শুনিয়ে দিলেন। ইন্দ্র তো চটে লাল! বললেন 'আসুক যুদ্ধ করতে। দেখি কেমন কেড়ে নেয়।'

তারপর বুঝতেই পারছ। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে নিয়ে গরুড়ের পিঠে চড়ে গেলেন—পারিজাত গাছ আনতে। তুমুল যুদ্ধ লাগল ইন্দ্র আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। দেবতারা ভয় পেয়ে মহাদেবের শরণ নিলেন। যদি মহাদেব এই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন। মহাদেবকে ইন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ দুজনেই মানেন। কাজেই মহাদেব মধ্যস্থতা করতে এলে দুজনে যুদ্ধ বন্ধ করলেন। মহাদেব ইন্দ্রকে বললেন,—'কৃষ্ণ তোমার ছোট ভাই। সে একটা গাছ চেয়েছে সেটা দিলে না কেন ?'

ইন্দ্র বললেন,—'কৃষ্ণ হুমকি দিয়ে শাসিয়ে কেন চাইল ? 'দাদা' বলে ডেকে চাইল না কেন ?'

তখন মহাদেবের কথামত শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে প্রণাম করে 'দাদা' বলে ডেকে পারিজাত গাছ চাইলেন। ইন্দ্র রাজী হলেন গাছ দিতে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে প্রণাম করছেন দেখে সত্যভামার আবার মুখ ভার হল। তখন গরুড়—সে ইন্দ্রের বন্ধু কিনা—ইন্দ্রকে দিয়ে সত্যভামাকে প্রণাম করিয়ে সত্যভামাকে সন্তুষ্ট করল। ইন্দ্র গাছ দিলেন এই শর্তে যে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ হলে গাছ আর পৃথিবীতে থাকবে না স্বর্গে চলে যাবে।

পারিজাত গাছ পেয়ে সত্যভামার তো আনন্দ আর অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না। সযত্নে তাঁর ঘরের সামনে গাছ পোঁতা হল। পারিজাত ফুলের গন্ধে চারদিক ম' ম'। নারদ একদিন এলেন গাছ দেখতে। সত্যভামা খুব গর্ব আর আনন্দের সঙ্গে গাছ দেখালেন। নারদ তখন সত্যভামাকে বললেন,

'তাই তো, সত্যভামা, তোমার মত এমন ভাগ্যবতী দেখা যায় না। ঠাকুর তোমাকে কি ভালই বাসেন। তোমার জন্য ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পর্যন্ত পিছু-পা হন নি। তোমার মতো মেয়েরাই তুলাব্রত করতে পারে ; যে-সে লোক তো আর পারে না।'

সত্যভামা জিজ্ঞেস করলেন—'তুলাব্রত কি ঠাকুর ?'

নারদ বললেন,—'এ ব্রত করলে মহাপুণ্যলাভ হয়। স্বামীকে তুলায় বসিয়ে ওজন করে দান করে দিতে হয়। একটা গাছের সঙ্গে বাঁধতেও হয়—তা তোমার তো পারিজাত গাছই আছে। এ ব্রত এ পর্যন্ত করেছেন শুধু ইন্দ্রাণী, পার্বতী আর অগ্নির স্ত্রী স্বাহা। বড় কঠিন ব্রত।'

সত্যভামা শুনে বললেন,—'আমিও করব। আপনি সব ব্যবস্থা করুন।'

মহা ধুমধাম করে ব্রতের জোগাড় শুরু হল। শ্রীকৃষ্ণের মত নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে সত্যভামা ব্রতয় বসলেন। যাগযজ্ঞ পুজো-আর্চা শেষ হলে শ্রীকৃষ্ণকে দান করলেন সত্যভামা পুরুত অর্থাৎ নারদের হাতে। নারদ তখন তাঁর দক্ষিণা যা সোনাদানা পেয়েছেন সব গরীব দুঃখীকে বিলিয়ে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কোমরে এক দড়ি বেঁধে বললেন,—'এখন চল বাছা, বাড়ি যাই।'

শ্রীকৃষ্ণও সুবোধ বালকের মত নারদের পিছু পিছু চললেন।

ব্যাপার দেখে সত্যভামা ব্যস্ত হয়ে বললেন,—'ও মুনিঠাকুর ওঁকে নিয়ে যাচ্ছেন কোথায়?'

নারদ ফিরে দাঁড়িয়ে বিস্মিতভাবে বললেন, 'কেন, তুমি এঁকে আমায় দান করে দাও নি?'

সত্যভামা ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বললেন, 'হ্যাঁ, তা, দান তো করেছি—কিন্তু—কিন্তু—আচ্ছা—ইন্দ্রাণী স্বাহা পার্বতী এঁরাও তো এ ব্রত করেছিলেন কই এঁদের স্বামীদের তো আপনি নিয়ে যান নি?'

নারদমুনি বললেন, 'ওঃ এই কথা? না, ওদের আমি নিই নি। নিয়ে কি করব? ঐ ইন্দ্র, সে তো কুঁড়ের বাদশা, কোনো কাজ তো জানেই না, যুদ্ধটা পর্যন্ত ভাল করে করতে পারে না, বারবার অসুরদের তাড়া খেয়ে পালায়। আর হাতি ঘোড়া রথ নইলে বাবু চলতে পারেন না। আমার কোনো কাজে তো আসবেই না, ওঁর জন্য হাতি ঘোড়া জোগাড় কর। তাই আমি ইন্দ্রাণীকেই ইন্দ্র ফিরিয়ে দিলাম। আর শিব—সেও তো ভাং খেয়ে শ্মশানে মশানে ঘোরে—কোনো কাজই পারে না—সঙ্গে আবার একপাল ভূতপ্রেত। তাই ওকেও নিই নি। আর অগ্নি তো সর্বভুক। ওকে ঘরে রেখে কোনদিন পুড়ে মরব। তাই সে ব্যাটাকেও নিই নি। কিন্তু এবার যেটি পেলাম সেটি সব কাজেই পটু। দুধ দুইতে পারে—গরু চরাতে পারে, আর কি মিষ্টি বাঁশী বাজায়। আবার রথ চালাতে পারে, সুদর্শন চক্র দিয়ে আমাকে সব বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। আর যদি কিছু নাও পারত, তবু ওর চাঁদমুখের দিকে চেয়ে চেয়েই আমি জীবন কাটিয়ে দিতাম। আহা, এমন জিনিস আমি ছাড়ছি না। নাও, চলো।'

বলে নারদ এগিয়ে চললেন। তাঁর কথা শুনে সত্যভামার তো চক্ষুস্থির। সর্বনাশ! এখন উপায়? শোকে দুঃখে সত্যভামা মূর্ছিতা হয়ে পড়ে গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ চুপ করে নারদের কাণ্ডখানা দেখ্‌ছিলেন। এখন সত্যভামাকে মূর্ছিতা হয়ে পড়তে দেখে তাঁর কষ্ট হল তিনি নারদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—

"নারদ, আর কেন? এবার ক্ষান্ত দাও।'

নারদ বললেন, উহুঁ, এখন ছাড়ছি না। এখনই হয়েছে কি? আরো বাকি আছে। বড় পুণ্যের লোভ হয়েছে। তোমাকে দান করে পুণ্য করবেন! পুণ্য করাচ্ছি। তুমি বাগড়া দিও না চুপ করে দেখ মজাটা।'

এদিকে রুক্মিণী প্রভৃতি সব রাণীরা জল দিয়ে হাওয়া করে সত্যভামার জ্ঞান সঞ্চার করলেন।

তখন সত্যভামা এবং অন্য রাণীরা সকলে নারদকে ধরে বসলেন।

'মুনি ঠাকুর কৃষ্ণকে নিয়ে গেলে আমরা তো বাঁচব না। আপনি এর একটা উপায় করুন, দোহাই আপনার।'

নারদমুনি মাথা চুলকে দাড়ি আঁচড়ে ভেবেচিন্তে বললেন—'তোমরা যখন এত করে বলছ--তখন একটা উপায় হতে পারে। যদি শ্রীকৃষ্ণের সমান ওজনের সোনা আমাকে দাও—তা হলে ব্রতফলও নষ্ট হবে না অথচ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদেরই থাকবেন।'

এই কথা! সত্যভামা আনন্দিত হয়ে তক্ষুণি আদেশ দিলেন—'সোনা ও তুলাদণ্ড নিয়ে এস।'

তুলাদণ্ড অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লা এল। শ্রীকৃষ্ণকে একদিকে বসানো হল, অপরদিকে সোনার তাল চাপানো হল। কিন্তু যতই সোনা চাপানো হয়—কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের সমান হয় না। যেদিকে শ্রীকৃষ্ণ সেদিকটা মাটি থেকে আর ওঠে না। রাণীরা গয়নাগাঁটি সব খুলে খুলে পাল্লায় চাপালেন। কিছুতেই হচ্ছে না। নারদ তো এদিকে টিপ্পনী কাটছেন—'হায়, হায়! দ্বারকার ঐশ্বর্যের নাকি তুলনা হয় না—কিন্তু একটা মানুষের সমান সোনাও যে নেই দেখছি। এই মুরোদ নিয়ে আবার তুলাব্রত করার শখ! সাধে বলে স্ত্রীবুদ্ধি—প্রলয়ঙ্করী। অত করে ধরেছে, তাই ভাবলাম একটু সোনার বদলে ওদের স্বামী ওদের ফিরিয়ে দিই—কিন্তু এখন কি হবে? পুরো সোনা না পেলে তো আমি শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়তে পারব না। ব্রত নষ্ট হলে আমারও পাপ হবে যে।'

সত্যভামার তো লজ্জায় দুঃখে, অপমানে চোখে জল এসে গেছে। রাণীর সবাই কাঁদছেন। দ্বারকার সব সোনা তুলায় চাপিয়েও যে শ্রীকৃষ্ণের সমান হচ্ছে না। তখন উদ্ধব বলে এক সখা বললেন, —শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভুবনপতি ভগবান--তাঁকে কি ঐ ছাই সোনা দিয়ে মাপা যায়! তিনি ঐশ্বর্যের চেয়ে অনেক বড়। তিনি ভক্তির বশ, ঐশ্বর্যের বশ নন। এ কি পাগলামি করছেন আপনারা? সোনা নামান, আর একটী তুলসীপাতায় ভক্তিভরে কৃষ্ণনাম লিখে তুলায় চাপান। শ্রীকৃষ্ণ নিজের মুখে বলেছেন—'আমার চেয়ে আমার নাম বড়।'—বড় মানেই ভারি। তাঁর অতি প্রিয় তুলসী পাতায় নাম লিখে চাপালেই পাল্লা নেমে আসবে।'

তাই করা হল। কৃষ্ণনাম লেখা তুলসীপাতা তুলায় দিতেই—শ্রীকৃষ্ণ যেন হালকা হয়ে ওপরে উঠে গেলেন, আর তুলসীপাতার দিকটা মাটিতে নেমে এল। সত্যভামা ও অন্যান্য রাণীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আর শ্রীকৃষ্ণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে উদ্ধবের দিকে তাকালেন।

নারদমুনি শ্রীকৃষ্ণকে ফিরিয়ে দিয়ে ঐ কৃষ্ণনাম লেখা তুলসীপাতা মাথায় করে নাচতে নাচতে চলে গেলেন।—সোনার দিকে ফিরেও তাকালেন না।

(পাকিস্তান থেকে এসে অরুমিতুরা সোনাপোতায় ছিল। বাবা কলকাতায় মেসে থাকতেন, হঠাৎ দুর্ঘটনায় মারা যান। ওরা সোনাপোতা ছেড়ে সিঁথির ছোট্ট বাড়িতে এল। কাছেই মামার বাড়ি। মিতু স্কুলে ভর্তি হল। মাও সেখানে সেলাই শেখাবেন। অরুর স্কুল একটু দূরে।

ক্রমে গ্রামের ছেলে অরু ক্লাসের সব চেয়ে মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত হল। বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই নিশীথবাবু তাকে কত ভাল ভাল কথা বলতেন। এই নিশীথবাবুর ছেলে কল্যাণের সঙ্গে অরুর সবচেয়ে বেশি বন্ধুতা হল।

মিতুর ভাব হল তার ক্লাসের মেয়ে দুর্বা আর মাল্যশ্রীর সঙ্গে।

হঠাৎ দুচার দিনের জ্বলে কল্যাণ মারা গেল। অরু খুব কাতর হয়ে পড়ল।)

এগারো

অরু ক'দিন বাড়িতে চুপচাপ বসেছিল। রাত্রে—আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবত ঐ লাল তারাটা কল্যাণ। আর ঐ যে বড় তারাটা ওটা বাবা। তার পাশেই যে ছোট্ট তারাটা ঝিক্‌মিক্ করছে ওটা দাদা।

মা বলেন, 'আহা রে! একমাত্র ছেলে। বাপমায়ের কি কষ্ট। এ ব্যথা যে কি, যার গিয়েছে সেই জানে।'

মিতু তার ছোটদার মনটা হাল্কা করার চেষ্টা করে অন্য নানা কথা জিজ্ঞেস করে।

বলে, 'আচ্ছা, নিশীথবাবু এখন তোদের পড়ান না?'

অরু বলে, 'কেন পড়াবেন না। পড়ানোর সময় বোঝাই যায় না যে তাঁর একমাত্র ছেলে মারা গিয়েছে।'

মিতু জিজ্ঞাসা করে, 'প্রথম দিনে কি পড়ালেন ? অবশ্য আমি বিজ্ঞানের কিই বা বুঝব।'

অরু বলে, 'নিশ্চয় বুঝবি। তিনি সুপারসোনিক শব্দ সম্বন্ধে পড়ালেন। বইএ লেখা নেই এমন সব কথা বলেন তিনি।

'সুপাসোনিক শব্দ মানুষে শুনতে পায় না, এত তীব্র। অনেক ছোট ছোট জীবাণু তো সহ্য করতে না পেরে মরেই যায়। তাতে আমাদের সুবিধেই হয়েছে। টালাট্যাংকের মতো বড় জলের ট্যাংকে ওষুধ ছড়াতে অনেক খরচ। তার চাইতে জলের মধ্যে ঐ শব্দতরঙ্গ চালিয়ে দাও—বীজাণু মরে যাবে।

'আরো কত কথা বললেন নিশীথবাবু। অনেক প্রাণী—যেমন মাছ পিঁপড়ে নিজেদের মধ্যে যে কথা বলে তা ঐরকম শব্দ বলে মানুষ শুনতে পায় না। জিরাফ ও ঐ রকম শব্দে ডাকে।'

মিতু চোখ কপালে তুলে বলে, 'সে কিরে! তবে যে আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বইএ লেখা আছে, জিরাফ ডাকে না।'

অরু গম্ভীর হয়ে বলে, 'ওসব বই তোদের জন্যে। আমাদের জন্যে না।'

তারপরে বলে, 'জানিস, কাকদের নিজেদের ভাষা আছে।'

মিতু বলে, 'তা আর জানি না। একটা কাক ডাকলে আশেপাশের সব কাক এসে হাজির হয়।'

অরু বলে, 'শুধু তাই নয়, আমাদের যেমন বাংলা ইংরাজী আছে, কাকদের সেরকম আছে। বাংলাদেশের কাক আফ্রিকায় ছেড়ে দিলে তার ডাকে অন্য কোনো কাক আসিবে না। কারণ তারা বাঙালী কাকের ভাষা বোঝে না।'

মিতু বলে, 'বলিস কি !'

অরু বলে, 'নিশীথবাবু বলেছেন, বাদুড়ের থেকে একরকম সুপারসোনিক শব্দ বেরোয় যা ফড়িং পোকামাকড়রা শুনতে পায়। শুনেই বাদুড় কাছাকাছি আছে বুঝে পালিয়ে যায়। বাদুড়ে ফড়িং খায় তো ? অনেক দেশে মানুষ বাদুড়ের এই শব্দ রেকর্ড করে শস্যক্ষেত্রের কাছে বাজায়। তাতে কীটপতঙ্গ ক্ষেতের ধারে কাছে আসে না।'

মিতু বলে, 'বাবাঃ। কত কি জানার আছে, না রে ছোটদা ? যাক, এখন খেতে চল। নইলে তোর কানের কাছে এবার মার গলার রেকর্ড বাজবে।'

বোনের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে অরু হেসে ওঠে।

বারো

পাড়ার মধ্যে অরু যে নিজেকে আলাদা করে রাখত, সেটা কিছু ছেলের কাছে সহ্য হচ্ছিল না। তারা এটাকে অহংকার বলে মনে করত। তাছাড়া অরু পড়াশোনায় ভালো ছিল, সেটাও ছিল তাদের ঈর্ষার একটা কারণ। একদিন সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ল।

সেদিন ছিল অরুদের স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার একটা দিন। হঠাৎ কতকগুলো ছেলে অরুদের

স্কুলের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাণ্ডবনৃত্য সুরু করে দিল। যারা পরীক্ষা দিচ্ছিল তাদের উঠে যেতে বলল। কিন্তু হেডমাস্টারমশাইএর হস্তক্ষেপে তারা কিছু করতে পারল না।

ওদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল অরুদের পাড়ার। বয়সে দীপুদার সমান। স্কুলে বা কলেজে পড়ে না। কারণ অরু তাকে সব সময়ই রাস্তায় বা রোয়াকে বসে থাকতে দেখে, আরো কিছু ছেলের সঙ্গে।

একদিন হঠাৎ তারা একটা মিছিল বের করল। ছেলেটি এসে অরুকে যোগ দিতে বলল মিছিলে। অরু গেল না। বলল. 'না ভাই, এখন পরীক্ষা চলছে। এখন যেতে পারব না।'

গাঢ় সবুজ আর হলুদ রংএর জামা প্যান্ট পরা ছেলেটি অংগভংগী করে উঠল। বলল, 'অরে আমার বিদ্যেসাগর রে! না এলে দেখে নেব।'

কথা হচ্ছিল অন্তুদাদের বাড়ির সামনে। অন্তুদা অফিস থেকে ফিরেছিল। গোলমাল শুনে বাইরে এসে বলল, 'কি হয়েছে রে -'

অরু আর ঐ ছেলেটি ছাড়া আরো চারপাঁচজন ছিল। সবাই চুপ করে গেল। অন্তুদাকে সবাই ভয় করে। তার চেহারার জন্যে। অন্তুদা নিয়মিত ব্যায়াম করে। তা ছাড়া অন্তুদা এত বই পড়ত আর বক্তৃতা দিত যে বাড়িতে মাঝে মাঝে পুলিশ আসত।

একটি ছেলে আমতা আমতা করে বলল, 'না—ও বলছে—যে মিছিলে শুধু লেখাপড়া না জানা ছেলেরাই যোগ দেয়।'

অরু কিছু বলার আগেই অন্তুদা বলল, 'ঠিক বলেছে কিনা পরখ করেই দেখা যাক। আচ্ছা রজত, তুমি বলোতো মে মাসের প্রথম দিনটাতে কি হয়েছিল? কোথায় হয়েছিল?'

রংচঙে ছেলেটি বলল, 'ঠিক জানি না—তবে অরূপ যা বলছে তা প্রগতিশীল মতবাদের বিরোধী।' বলে সে একজন সাহেবের নাম করল।

সে অরুকে দেখিয়ে বলল, 'ওর মামা বড় ডাক্তার বলে, অরুও বুর্জোয়া হয়েছে।'

অন্তুদা তার কথা শুনে হেসে বলল, 'অদ্ভুত তোমাদের যুক্তি। জানো এইমাত্র তুমি যাঁর নাম করলে তিনি ছিলেন একজন শিল্পী এবং তা হয়েও আমাদের চাইতে বেশী চিন্তা করেছেন দুনিয়ার সর্বহারাদের জন্যে। বলতে পার তিনি কোথাকার লোক ছিলেন?'

চুলে টেরিকাটা একটি ছেলে জবাব দিল, 'জানি, রাশিয়ার।'

অন্তুদা বলল, 'না বিশু, তাঁর জন্ম জার্মানীতে। মৃত্যু ইংল্যণ্ডে। সব চেয়ে বড় কথা তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। এমন কি তাঁর ভারতের তখনকার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যা জ্ঞান ছিল তা তোমার আমার নেই।'

ছেলেরা উসখুস করতে করতে একসময় চলে গেল। কিন্তু অরুর মনে হল, ওরা সহজে তাকে ছাড়বে না। অন্তুদার ভয়ে হয়ত সামনাসামনি কিছু করতে সাহস করবে না। কিন্তু পেছনে লেগে থাকবে তাকে অপদস্থ করার জন্যে।

— তেরো —

একদিন সন্ধ্যে হয়ে গেলেও অরু স্কুল থেকে ফিরল না। মা ভয়ে ছটফট করতে লাগলেন। সে স্কুল থেকে বা অন্য কোথাও থেকে একটু দেরী করে এলেই মা ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েন। কলকাতার রাস্তায় পদে পদে বিপদ। অরু মিতুর বাবাকে একদিন অফিস থেকে ফেরার সময় মৃত্যু এসে অতর্কিতে ছিনিয়ে নিয়েছিল।

আজও মিতু মনে মনে এক দৃশ্য দেখে। একজন লোক হাতে একটা থলে নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বাসে ওঠার জন্যে। থলের মধ্যে থেকে উঁকি মারছে একটা মোটা গল্পের বই। হয়ত তাতে লেখা আছে—'অরু মিতুকে—বাবা।'

পেছন থেকে অতর্কিতে একটা মোটর এসে ধাক্কা দিল লোকটিকে। ছিটকে পড়ল সে। বইটাও হয়ত পড়েছিল রাস্তার একপাশে। কে জানে!

মার কথায় মিতু বর্তমান জগতে ফিরে এল।

মা বললেন, 'সত্যিই তো, বড় দুর্ভাবনা হলো। একটা ফোন করে ছাখ্ তো মিতু তোর মামার ওখানে অরু গিয়েছে নাকি। তবে ওতো ওখানে যাওয়ার দিন আগে থেকে আমাকে বলে যায়।'

মিতু পাশের দোকান থেকে মামাকে ফোন করে জানল অরু ওখানে আছে। মামার গাড়ীতে করে এখনই আসছে।

না বলে মামার ওখানেও অরু যায় না। শুনে মা রাগ করলেও যেন নিশ্চিন্ত হলেন বলে মিতুর মনে হল।

অরু যখন মামার সংগে বাড়ি ফিরল তখন তার চেহারা দেখে মিতু অবাক। কপাল কাটা, চুল উসকো খুসকো, সার্ট ছেঁড়া। মা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন।

মামা বললেন, 'দেখো, তোমার ছেলের কীর্তি। কোথায় মারামারি করে এসেছেন। নিজে যা মার খেয়েছে, তার চেয়ে বেশি মেরেছে একজনকে। তাকে আমার ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হয়েছিল। পুলিসে ধরেছিল। নিজে জামিন হয়ে ছাড়িয়ে এনেছি। ও. সি. তো আমার বাঁধা রোগী।'

মা সব শুনে হতবাক। বললেন, 'আমাকে কি একটুও শান্তিতে থাকতে দিবিনে তোরা? কি হয়েছিল অরু? কেন এসবের মধ্যে গেলি? ও কি করেছিল?'

অরু বলল, 'সব সময় পেছনে লাগে ছেলেটা। আজ টিট করে দিয়েছি। পুলিশেও ওকে আটকে রেখেছে।'

'হয়েছে, হয়েছে। বাহাদুরী দেখাতে হবে না।' মা বললেন। এরপর স্কুল থেকে সোজা বাড়ি না এসে কোথাও গিয়েছ তো তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। আমারই হয়েছে যতো জ্বালা!'

সন্ধ্যেবেলা পড়ার সময় মিতু চুপি চুপি অরুকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল ছোটদা?'

অরু প্রথমে কিছু বলল না। বোনের পেড়াপেড়িতে শেষে বলল, 'কাঁহাতক সহ্য করা যায় বল্ তো? রাস্তায় দেখলেই বলবে—এই, জামাটা সেলাই করে দিবি?'

'তাতে কি হয়েছে?' মিতু হেসে বলে উঠল।

অরু রাগে চেঁচিয়ে উঠল, 'কি হয়েছে? আমি জানি না, ওরা কেন একথা বলে? মাকে অপমান করে। মা স্কুলে সেলাই শেখায়—তাই।'

ছোটদার কথায় মিতু সব বুঝতে পারে। ছোটদার চেহারা আগের চেয়ে কত খারাপ হয়ে গিয়েছে। কারো সংগে মেশে না। চুপচাপ থাকে। মনে পড়ে সেদিনকার কথা কলকাতায় আসার জন্যে তার কি উৎসাহ।

'বেশ ভালো ছিলাম আমরা সোনাপোতায়, না রে ছোটদা?' মিতু বলে।

অরু শুধু একটা 'হুঁ' বলে পড়ার বই খুলে বসে।

ক্রমশ

বাদুড়-ঝোলা

চুনী দাশ

ঝুলছে দেখ বাদুড়-ঝোলা
ব্যস্ত-বাগীশ মানুষগুলা।
হুমড়ি খেয়ে পড়ছে যতো
পিল্ পিলিয়ে উঠছে ততো!

উঠতে যেতেই ছিটকে পড়ে
হাতল যতোই জোরসে ধরে;
পাদানিতে পা রাখে কার সাধ্যি—
কেউ বলে না—বাদুড়-ঝোলা—বাদ দি!!

যাদুর খেলা

যাদুকর এস, ডি, দে

(১) যাদুই পেনসিল (Magic Pencil)

॥ প্রদর্শন ভঙ্গী ॥ যাদুকর হাতে একটা সাধারণ পেনসিল এবং অঙ্কিত কাগজ নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করলেন। কাগজের ওপর ঐ পেনসিল দিয়ে 'ম্যাজিক' কথাটা এবং তার নাম লিখলেন। এবার যাদুর দর্শকদের বললেন এই পেনসিলটা অলোকিক শক্তি সম্পন্ন। তার প্রমাণ আপনাদের দিচ্ছি—এই বলে যাদুকর ঐ 'ম্যাজিক' লেখা কাগজটা দিয়ে পেনসিলটাকে জড়িয়ে (Roll) ফেললেন। এবং প্রান্ত দুটো মুড়ে দিলেন (১নং চিত্র)। তারপর যাদুকর ম্যাজিকের মন্ত্র পড়লেন—1, 2, 3 এবং মোড়া প্রান্ত দুটো হাত দিয়ে কেটে ছাইদানিতে (Ashtray) ফেলে দিলেন। আর যে কোন একটা প্রান্তে টান দিতেই বেরিয়ে এল একটা আস্ত নীল রংএর রুমাল ! বাকী কাগজটা কুঁচি কুঁচি করে ছাইদানিতে ফেলে দিলেন।

(১নং চিত্র)

(2নং চিত্র)

কি ভাবে রুমাল বেরকরা হচ্ছে

(৩নং চিত্র)
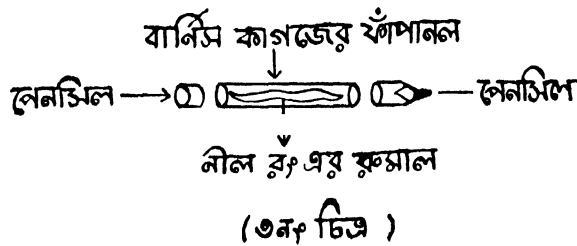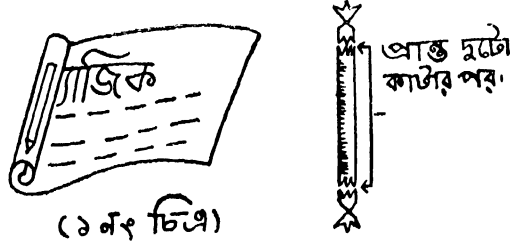
॥ কৌশল ॥ ৩নং চিত্র দেখলে খেলাটার মূল কৌশল সহজেই বুঝতে পারবে। প্রথমে একটি রঙ্গিন বার্নিস কাগজ দিয়ে পেনসিলের মত ফাঁপা নল তৈরি করে নাও। বার্নিস কাগজটা যে রংএর ঠিক সেই রংএর খানিকটা পেনসিল নাও। এবার ঐ পেনসিলের সামান্য টুকরো করে ঐ ফাঁপা নলের দুই প্রান্তে আটকে নাও তাহলেই পেনসিলের মত মনে হবে।

কিন্তু দুটো প্রান্তে পেনসিল আটকানোর আগে ঐ ফাঁপা নলটার মধ্যে একটা ছোট, পাতলা নীল রংএর রুমাল ভর্তি করে নাও। ব্যাস তা' হলেই হ'ল। কাগজের দুই মাথা ছিঁড়ে ফেলার সময়, পেনসিলেরো আবার ডগা ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল।

(২) ভূতুড়ে চোঙের খেলা (Ghost Tube)

॥ প্রদর্শন ভঙ্গী ॥ যাদুকর কোন ভূমিকা না করে একটা চোঙের (Tube) এপার-ওপার সম্পূর্ণ শূন্য দেখিয়ে এবং হাত প্রবেশ করিয়ে প্রমাণ করলেন যে চোঙটা সম্পূর্ণ শূন্য তারপর সেই শূন্য চোঙটা থেকে কতগুলো বাহারী সিল্কের রুমাল এবং পালকের ফুল বের করে দেখালেন। রুমাল এবং পালকের ফুল দেখানোর পর চোঙটা আবার এপার ওপার শূন্য দেখিয়ে যাদুকর খেলাটি শেষ করলেন।

॥ কৌশল ॥ প্রথমে ৮" লম্বা এবং ৫" ব্যাসযুক্ত একটা চোঙ তৈরি করতে হবে। এই চোঙের দুই দিকেরই ব্যাস হবে ৫" এবং আর একটা মোচাকৃতি (Conic Shape) চোঙ করতে হবে যার নিচের দিকের ব্যাস হবে ৪.৯" এবং উপরের ব্যাস ৪" আর লম্বা হবে ৬.৫"। এই মোচাকৃতি চোঙটা আগের ৮" লম্বা চোঙের মধ্যে ফিট করতে হবে। চোঙের ভেতরের অংশ কালো রং দিয়ে রঞ্জিত করতে হবে। চোঙের বাইরে বাহারী রং এর বর্ডার দেওয়া যেতে পারে। দুই চোঙের মাঝখানে যে শূন্য স্থান থাকবে সেটা বাহারী সিল্কের রুমাল এবং পালকের ফুল দিয়ে ভর্তি করতে হবে।

উপযুক্ত প্রদর্শকের হাতে খেলাটি প্রদর্শিত হ'লে মজাটা মাঠে মারা যাবে না।

॥ কাঠের ঘোড়া ॥

পরিমল ভট্টাচার্য

আচ্ছা।
একটা যদি থাকত আমার
টাট্টু ঘোড়ার বাচ্চা।
টগবগিয়ে ছুটিয়ে ঘোড়া
যেতাম অনেক দূর
ঘাট ছাড়িয়ে হারিয়ে গিয়ে
পেরিয়ে সমুদ্দুর।

ইচ্ছে।
কে আর বল টুটুন সোনার
মনের খবর নিচ্ছে।
কেউ বোঝেনা আমার কথা
ছোট্ট যে একরত্তি
ধমকে দিয়ে সবাই বলে
কাঠের ঘোড়াই সত্যি।

(সমুদ্রের তলদেশ সম্বন্ধে জানবার জন্য স্ট্র্যাটফোড জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল, তারপরে আর ফিরে আসেনি। এই অভিযানের নেতা ছিলেন মহাপণ্ডিত ডঃ ম্যারাকট ও জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপটেন হাওসি। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত প্রাণিবিদ মিঃ সাইরাস হেডলি, ইঞ্জিনিয়ার বিল স্ক্যানল্যান ও আরো ২৩ জন। একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তলদেশে অনুসন্ধান চালানই হল ম্যারাকটের উদ্দেশ্য।

৫ই জানুয়ারি আরাবেলা নোউল্স্ নামক জাহাজ হাল্কা গ্যাসে ভরা এবং বিশেষ উপাদানে তৈরি একটি ঝকঝকে গোলকের ভিতর হেডলির চিঠিতে এক অত্যাশ্চর্য বিবরণ জানতে পারে।

জানা যায় যে এক ঝুলন্ত খাঁচার মতন যন্ত্রের সাহায্যে ম্যারাকট, হেডলি ও স্ক্যানল্যান আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তলায় এক গভীর খাদের ধারে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে গভীর খাদের মধ্যে পড়ে যান এবং এক আশ্চর্য নগরীর সন্ধান পান।

সমুদ্রগর্ভে বিশাল এক 'আশ্রয় সদনে' কৃত্রিম বাতাসের সাহায্যে জীবনধারণ করে উন্নত বিজ্ঞান সম্পন্ন এক জাতি—তাদের কাছে আশ্রয় পাওয়া গেল। এরা প্রাচীন আটলান্টিসবাসীদের বংশধর।

মাণ্ডা, স্কার্পা, তাঁর মেয়ে সোনা ও বহু মেয়ে পুরুষের সঙ্গে পরিচয় হল। এরা বেশ হাসিখুশি মানুষ। এরা চলচ্চিত্রের মতন পর্দায় চিন্তার প্রতিচ্ছবির সাহায্যে আগন্তুকদের কাহিনী শুনে নিল।

ডুবুরির পোষাক পরে, সমুদ্রতল দিয়ে হেঁটে মাণ্ডা এবং আরো পাঁচজন আগন্তুকদের নিয়ে গিয়ে তাঁদের প্রধান শক্তির উৎস এক বিশাল কয়লার খনি, প্রাচীনযুগের ডুবে যাওয়া নগরী এবং আরো অনেক বিচিত্র দৃশ্য দেখালেন। আবার চলচিত্রের পর্দায় নিজেদের ইতিহাস কিভাবে প্রাচীন আটলান্টিস সমুদ্রের জলে ডুবে গিয়েছিল কি ভাবে এক মহাজ্ঞানী আগে থেকে তার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং যারা

তাঁর সাহায্য নিয়েছিল তারা বেঁচেছিল—এক বিশাল প্রেক্ষাগৃহে সমগ্র আটলান্টিস সমাজের উপস্থিতিতে সেই চিত্র দেখান হল।)

নয়

'একটার পর একটা নানা আশ্চর্য আর অদ্ভুত জিনিস দেখে দেখে শেষটা আমাদের মনে হল নতুন কোনো কিছুতেই আমাদের আর অবাক করতে পারবে না। তবু কিছুদিন পরে—আমাদের হিসাবে প্রায় মাস খানেক পরে—আবার এক ঘটনায় আমাদের মনে হল এই বুঝি সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার।

'ততদিনে সেই আশ্চর্য দেশে আমরা নিজেদের এক রকম খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম, সাধারণ বিশ্রামাগার প্রমোদভবনগুলি কোথায় কোথায় তাও জেনে গিয়েছিলাম। সেখানকার গান বাজনার আসরে যেতাম। তাদের নাট্যাভিনয়ও দেখতাম, কথাগুলি বুঝতে না পারলেও তাদের অঙ্গ ভঙ্গীতে প্রায় সবই বুঝতে পারতাম। মোটামুটি বলতে গেলে আমরা সেখানকার সমাজে বেশ মিশে গিয়েছিলান। অনেক পরিবারের সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয় হয়েছিল, আমরা তাদের বাড়ি যেতাম। সেই জাতির একজন প্রধানের মেয়ে সোনার কথা আগেই বলেছি। তাঁরা আমায় এমন আপন করে নিয়েছিলেন যাতে সত্যিই আমার মনে হল জাতি বা ভাষার তফাতটা কিছু নয়, মানুষে মানুষে আসলে কোনো তফাত নেই, সকলেই এক। আর সোনার কথা যদি বলতে হয় তাহলে সুপ্রাচীন আটলান্টিস্ আর আধুনিক আমেরিকায় সামান্যই তফাত। আমেরিকার কোনো কলেজের মেয়ে যাতে খুশি হয় ঠিক তাতেই দেখলাম খুশি হয় আমার এই পাতালপুরীর রাজকন্যাও!

'কিন্তু যা বলছিলাম। একদিন স্ক্যান্‌ল্যান্ হঠাৎ খবর আনলে যে গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে। বললে, 'এই ধর গিয়ে এদের একজন এখুনি বাইরে থেকে এল। কি দেখেছে কে জানে, এমনই খেপে গিয়েছে যে কাঁচের মুখোসটা খুলতেই স্রেফ ভুলে গিয়েছিল। মিনিট কয়েক তার ভিতর থেকে হাঁউ মাউ করার পর তার খেয়াল হল যে কেউ তার কথা শুনতে পাচ্ছে না। তখন সেটা খুলে কি যে মাথা মুণ্ডু বকে' গেল যতক্ষণ তার দম রইল। সবাই তার সঙ্গে যাচ্ছে বেরুবার ঘরে। আমি বলি আমরাও যাই। আলবৎ কিছু একটা এসেছে, আমাদের সেটা দেখা চাই-ই।'

'সকলের সঙ্গে আমরাও বারান্দা বেয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে বেরুবার ঘরে উপস্থিত হলাম, তারপর সেখান থেকে সমুদ্রের মেঝেতে। তবুও ছোটার বিরাম নেই। ওদের সঙ্গে ঠিক পাল্লা দিয়ে উঠতে অবশ্য আমরা পারছিলাম না, তবে ওদের হাতে বিজলী বাতি ছিল, তাই পিছনে পড়ে গেলেও তাই দেখে দেখে আমারা ওদের পিছু ধরে রইলাম। আগের বারের মত এবারেও আমরা সেই আগ্নেয়-শিলার পাহাড়ের ধার ঘেঁষে যাচ্ছিলাম। একটা জায়গায় এসে দেখলাম পাহাড়ের গা বেয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে একেবারে পাহাড়ের উপরে গিয়ে পৌছালাম। দেখলাম উপরটা বড়ই উচু নিচু, এবড়ো খেবড়ো। কোথাও ছুঁচাল চুড়ো, কোথাও গভীর দরি। সেই প্রাচীনকালের আগ্নেয় উৎপাতের লাভা

জমে এই পাহাড় হয়েছে। যাক, তারি মধ্যে একটা জায়গা বেশ সমতল। তার মাঝখানটিতে একটা কিছু পড়ে ছিল যা দেখে আমাদের দম বন্ধ হয়ে এল। আমাদের সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম তাঁদেরও ঠিক সেই অবস্থা।

'সমুদ্রের পাঁকের মধ্যে অর্ধেক গা ডবিয়ে পড়ে আছে একটি ছোট জাহাজ। পড়ে' আছে কাত হয়ে, ধোঁয়ার নলটা ভেঙ্গে ঝুলে পড়েছে, কি অদ্ভুতই না দেখাচ্ছে সেটাকে সেই অবস্থায়। সামনের মাস্তুলটার খানিকটা উড়ে গিয়ে সেটা অনেকখানি ছোট হয়ে গেছে। এমনিতে কিন্তু জাহাজটি সদ্য ডক্ থেকে বেরুনোর মত ঝকঝকে তকতকে। তাড়াতাড়ি কাছে গেলাম। সেটা জাহাজের পিছন দিক, গায়ে নাম লেখা রয়েছে: 'স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড, লণ্ডন'। মন যে আমাদের কি রকম করে উঠল বুঝতেই পার। আমাদের জাহাজ আমাদের পিছন পিছন 'ম্যারাকট্ ডীপে' এসে হাজির হয়েছে!

'বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা যাওয়ার পর অবশ্য ব্যাপারটা আর তত দুর্বোধ্য মনে হল না। সেই পড়তি ব্যারোমিটার, নরওয়ের জাহাজের গোটানো পালগুলি, দিগন্তে ঘনিয়ে ওঠা কালো মেঘ, সবই আস্তে আস্তে মনে পড়ল। নিশ্চয় একটা বড় রকমের তুফান উঠেছিল, আর তাতে বেচারী স্ট্র্যাট্‌ফোর্ডকে দিয়েছিল পটকে তার উপরকার লোকদের একজনও যে বেঁচে নেই সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যখন দেখলাম জাহাজের নৌকাগুলির প্রায় সবই পিছন পিছন এসে পোঁছেছে অর্থাৎ সেগুলো জাহাজ থেকে নামাবারও সময় পাওয়া যায়নি। যে ওলন-তারের সঙ্গে আমি আমার রুমালটি বেঁধে দিয়েছিলাম হয়ত সেটিও গুটানো শেষ হয়েছে আর জাহাজও বানচাল হয়েছে। আর নৌকা নামানো হলেই বা কি? সেই প্রচণ্ড ঝড়ে কোন নৌকাটাই বা বাঁচত? আমরা বেঁচে রইলাম, আর আমরা মরে গেছি ভেবে যারা অস্থির হয়েছিল তারাই গেল মরে! অদৃষ্টের কি অদ্ভুত খামখেয়াল।

'ক্যাপটেন হাওসি তখনো রেলিং-ঘেরা মঞ্চের উপর তাঁর হুকুম দেবার জায়গাটিতে—যাকে বলে জাহাজের ব্রিজ্—সেইখানে দাঁড়িয়ে, তাঁর আড়ষ্ট হাতে রেলিংটা শক্ত করে' ধরা। তিনি, আর এন্‌জিন্-ঘরে তিনজন স্টোকার বা ফায়ারম্যান মোট এই চারজনের দেহ জাহাজের মধ্যে পাওয়া গেল। আমাদের ইচ্ছানুযায়ী দেহগুলি সিন্ধুমলের নিচে কবর দেওয়া হল। কবরের উপর সাজিয়ে দেওয়া হল সমুদ্রের ফুলের মালা। এটুকু খুঁটিয়ে লিখলাম এই আশায় যে যদি পৃথিবীর মানুষের চোখে কখনও এটা পড়ে তাহলে মিসেস হাওসি তাঁর শোকে সান্ত্বনা পাবেন। স্টোকার তিনজনের নাম আমরা জানতাম না।

আমরা যতক্ষণ এই সব কাজে ব্যস্ত ছিলাম ততক্ষণে আটলান্টিয়রা দলে দলে জাহাজের উপর গিয়ে উঠেছিল। তাদের ভাব দেখে মনে হল এই প্রথম কোনও আধুনিক জাহাজ নিচে তাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। পরে আমরা জেনেছিলাম যে কাচগোলকের ভিতরকার অক্সিজেন তৈরির যন্ত্র একবারে কয়েক ঘণ্টার বেশি কাজ দেয় না। তার পরে আবার সেটাকে কাজ করিয়ে নিতে হয়—ব্যাটারির মত। দেখলাম ওরা একটুও সময় নষ্ট না করে' তখনি জাহাজখানাকে ভাঙ্গতে সুরু করল—ওদের কাজে লাগবার মত জিনিস যা পাবে নিয়ে যাবে। কাজটি ছোট খাট নয়, আজ পর্যন্ত সে

কাজ শেষ হয় নি। আমরাও আমাদের ক্যাবিনে ঢুকে যে সব কাপড়-চোপড় বা বই-পত্র তখনও একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি সেগুলি নিয়ে এলাম।

'যা যা নিয়ে এলাম তার মধ্যে জাহাজের লগ-বুকটিও ছিল। তার শেষ লেখাটি নেই ঃ—

'৩রা অক্‌টোবর। নির্ভীক কিন্তু দুঃসাহসী অ্যাড্‌ভেঞ্চারী তিনজন আজ আমার ইচ্ছা ও পরামর্শের বিরুদ্ধে তাঁদের যন্ত্র অবলম্বন ক'রে সমুদ্রতলে নেমেছিলেন এবং আমি যা ভেবেছিলাম তাই ঘটেছে। ঈশ্বর তাঁদের আত্মার শান্তিবিধান করুন। তাঁরা সকাল এগারটার সময় নেমেছিলেন। তাঁদের নামবার অনুমতি দেব কিনা বুঝতে পারছিলাম না, কারণ তুফান উঠবে মনে হচ্ছিল। আমার যেমন মনে হচ্ছিল তাই যদি করতাম! কিন্তু তাহলেও তখনকার মত তাঁদের থামানো ছাড়া বেশি কিছু ফল হত না। তাঁদের সঙ্গে সেই শেষ দেখা এই হিসাবেই আমি তাঁদের বিদায় সম্ভাষণ করলাম। খানিকক্ষণ সব ভালই গেল। এগারটা পঁয়তাল্লিশে তাঁরা তিনশ ফ্যাদম নিচে গিয়ে পৌছালেন, সেইখানেই তাঁরা তল পেয়েছিলেন। ডাঃ ম্যারাকট আমায় কয়েকবার বার্তা পাঠালেন, সব ঠিক আছে মনে হল। কিন্তু তার পর হঠাৎ এক সময়ে তাঁর উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম আর সঙ্গে সঙ্গে তারের কাছিটাও বড্ড নড়ছে দেখা গেল। তারপরেই কাছিটা কেটে গেল। মনে হয় সেই সময়ে তাঁরা একটা গভীর গহ্বরের উপর ছিলেন, কারণ ডক্টরের অনুরোধে জাহাজ খুব আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। বাতাসের নলগুলি তখনও কাজ করে যাচ্ছিল, আমার আন্দাজে প্রায় আধ মাইলটাক পেরিয়ে যাবার পর সেগুলি কেটে গেল। ডাঃ ম্যারাকট্‌, মিঃ হেড্‌লে বা মিঃ স্ক্যানল্যানের সম্বন্ধে আর কিছু জানতে পারার কোনও আশা নেই।

'তবু একটি অত্যন্ত অসাধারণ ব্যাপারের কথাও লিখে রাখতে হয় যার অর্থ কি তা ভেবে দেখবার সময় আমি পাই নি, কারণ আকাশের চেহারা বড় খারাপ হয়ে ওঠাতে আমাকে নানা কথা ভাবতে হচ্ছিল। তাঁরা নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে একবার ওলনও নামানো হয়েছিল, গভীরতা দেখা গেল ছাব্বিশ হাজার ছয় শ ফুট। ওলনের সীসাটা অবশ্য নিচেই থেকে গেল, কিন্তু তারটা এইমাত্র গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে আর—পড়ে' কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না—তারের আগায় নমুনা তোলবার জন্য যে চীনা-মাটির কাপ থাকে তার ঠিক উপরেই মিঃ হেডলের নাম লেখা রুমালটি বাঁধা রয়েছে দেখা গেল। জাহাজের সকলেই একেবারে স্তম্ভিত, কেউই ভেবে পাচ্ছে না কি করে এমনটা হতে পার। এর পরের লেখায় হয়ত এ সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পারব। জলের উপর কিছু ভেসে উঠতে পারে এই আশায় আমরা এখানে কয়েক ঘণ্টা থেকে গেছি। কাছিটাও টেনে তুলেছি, তার আগাটা অসমান, খোঁচা খোঁচা মত। এখন আমায় একবার জাহাজের দিকে নজর দিতে হচ্ছে, আকাশের এর চেয়ে খারাপ চেহারা কখনও দেখিনি, ব্যারোমিটার ২৮·৫এ তাড়াতাড়ি নামছে।'

'ভাবতে অদ্ভুত লাগে যে আমরাই এই লেখা পড়ব আর ক্যাপ্‌টেন হাওসি থাকবেন না।

'সেইখানে থাকতে থাকতে এক সময়ে আমাদের কাঁচগোলকের ভিতরে আমাদের নিঃশ্বাস যেন ক্রমে আটকে আসছে মনে হল, আর বুকের উপর ক্রমশঃ ভার বোধ হতে লাগল। বুঝতে পারলাম

এই বেলা ফেরা দরকার। ফেরার পথে আর একটি ঘটনা ঘটল যাতে আমরা জানতে পারলাম যে এমন কোনো কোনো বিপদ আছে যার কাছে এখানকার লোকেরা একেবারেই অসহায়। আর তাই থেকেই বুঝলাম এই কয় হাজার বছরেও কেন এদের সংখ্যা আরও বাড়ে নি। সেই গ্রীক দাসদের নিয়ে এদের মোট জনসংখ্যা আমাদের হিসাবে বড় জোর চার পাঁচ হাজার মাত্র হবে।

'আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আগ্নেয়শিলার পাহাড়ের ধারে সেই জঙ্গলের পাশ দিয়ে আসছিলাম এখন সময় মাণ্ডা উত্তেজিতভাবে উপর দিকে আঙ্গুল দেখালেন আর আমাদের দলের একজন দলছাড়া হয়ে একটু দূরে গিয়ে পড়েছিল প্রাণপণে হাত নেড়ে তাকে ইসারায় ডাকতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও টেনে নিয়ে তিনি ও আর সকলে কতকগুলি বড় বড় পাথরের কাছে ছুটে গেলেন। সেইখানে আশ্রয় নেবার পর আমরা দেখতে পেলাম ভয়ের কারণটা কি। আমাদের উপর দিকে কিছু দূরে একটা প্রকাণ্ড অতি অদ্ভুত আকৃতির জন্তু বেশ জোরে নিচের দিকে আসছে। সেটাকে মনে হচ্ছিল যেন একটা মস্ত পালকের গদি, দেখতে তেমনি নরম আর ফোলাফোলা। তার তলার দিকটা সাদা আর একধারে একটা লম্বা লাল ঝালরের মত রয়েছে, সেইটে নেড়ে নেড়েই সে জলের ভিতর চলাফেরা করে। মনে হচ্ছিল তার না আছে মুখ না আছে চোখ, কিন্তু একটু পরেই দেখতে পেলাম সেটা কি সাংঘাতিক রকমের সচেতন। যে লোকটি দলছাড়া হয়ে পড়েছিল সে আমাদের দিকে ছুটে আসছিল, কিন্তু বুঝতে পারল বোধ হয় যে আর আশা নেই। বিষম ভয়ে তার মুখ বিকৃত হয়ে গেল। সেই উদ্ভট জন্তুটা তার উপর নেমে পড়ে' চারি পাশ দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে' তার উপর চেপে পড়ে' রইল। আমাদের কাছ থেকে কয়েক গজ দুরেই এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা হচ্ছিল কিন্তু আমাদের সঙ্গীরা এমনই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে মনে হচ্ছিল তাদের নড়বার চড়বার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। স্ক্যানল্যানই ছুটে গিয়ে জানোয়ারটার লাল আর কটা ছোপওয়ালা পিঠটার উপর লাফিয়ে পড়ে' হাতের ডাণ্ডার ছুঁচাল ডগাটা তার নরম শরীরের ভিতর গেঁথে দিলেন। আমিও স্ক্যানল্যানের পিছন পিছন ছুটে গিয়েছিলাম, শেষে ম্যারাকট্ ও আর সকলেও এসে জন্তুটাকে আক্রমণ করায় সেটা একরকম তেলালো রস ছড়াতে ছড়াতে আস্তে আস্তে ভেসে উঠে সরে' পড়ল। কিন্তু ততক্ষণে তার প্রকাণ্ড দেহের চাপে লোকটির কাচ-গোলক ভেঙ্গে গিয়ে সে বেচারা নিঃশ্বাস আটতে মারা গিয়েছিল। তার মৃতদেহ নিয়ে আমরা শরণালয়ে ফিরে এলাম। সকলেই দুঃখ করল লোকটির জন্য। আর আমাদের সাহস দেখে ওরা আমাদের আরো কদর করতে লাগল। সেই অদ্ভুত জন্তু সম্বন্ধে ডাঃ ম্যারাকট্ বললেন যে সেটা কম্বল-মাছের একটা নমুনা—মৎস্যবিদ্‌দের খুবই জানা—তবে আকারটা তাঁর স্বপ্নেরও অতীত।

'এই জীবটির কথাই কেবল ফলাও করে' বললাম কারণ তার জন্যেই আমাদের এক বন্ধুর প্রাণ গেল, কিন্তু এ ছাড়া আরো এত আশ্চর্য জীব আছে সমুদ্রের তলায় যে তাই নিয়ে আমি একটা বই লিখতে পারি, হয়ত লিখবও। গভীর সমুদ্রের প্রাণীদের মধ্যে লাল আর কালো এই দুটি রঙই বেশী দেখা যায়। গাছপালার রঙ ফিকে সবুজ আর সেগুলি এত শক্ত যে ট্রলে প্রায় ওঠেইনা। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে যে সমুদ্রের তলায় গাছপালা নেই। অনেক সামুদ্রিক প্রাণী দেখতে আশ্চর্য সুন্দর, আবার

অনেকের এমন বীভৎস রূপ যেন মনে হয় দুঃস্বপ্ন দেখছি। আর সেগুলি এমন সাংঘাতিক যে কোনো স্থলচর জীব তার কাছে লাগে না। একবার সত্যিকার সমুদ্রের সাপ দেখবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। অন্যান্য নানা অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর জানোয়ারের কথা ছেড়ে দিয়ে তার কথাই বলি। এই জীবটি মানুষের চোখে কদাচিৎ পড়েছে, কারণ সমুদ্রের অতি গভীর তলদেশে এর বাস, কেবল যখন সাগর জলের ভিতরকার কোনও তুমুল আলোড়নে সে ঘরছাড়া হয়ে উপরে ওঠে তখনই কখনো কখনো একে দেখতে পাওয়া যায়। এইরকম দুটি সাপ একদিন সোনা আর আমার পাশ দিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে চলে' গেল। আমরা দুজন ঘন সামুদ্রিক ঝাঁজির আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। কি বিরাট আকার। ফুট দশেক উঁচু আর দুশ ফুট খানেক লম্বা। উপর দিকটা কালো, নিচটা রুপোর মত ঝকঝকে সাদা, পিঠের উপর বরাবর উঁচু শির তোলা, আর চোখ দুটি ছোট ছোট—গরুর চোখের চাইতে বড় হবে না। এই জীবগুলির আর এমনি আরও অনেক রকম জীবের বিবরণ পাওয়া যাবে ডাঃ ম্যারাকটের লিপিখানির মধ্যে—যদি কোনোদিন সেটা তোমাদের হাতে গিয়ে পৌঁছায়।

ক্রমশঃ

॥ বললে ডেকে এক বুড়ি

অশোক চক্রবর্তী

বললে ডেকে এক বুড়ি
(পাগলি বটে) থুত্থুড়ি—
'চুনকামে
রোদ গুলে
লাগবে খেলে শুশ্‌শুড়ি !'
('শুশ্‌শুড়ি' বানানের জন্য আমি
দায়ী নই : দায়ী সেই বুড়ি।)
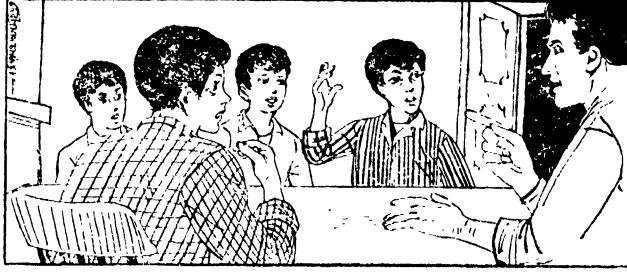
শিংওয়ালা অজগর

সুখেন্দু দত্ত

(গল্প)

মেঘের মত তার গায়ের রং। পাহাড়ের উপ'র, নয় তো ঘন জঙ্গলের মধ্যে নিঃশব্দে পড়ে থাকে নদীর ধারে কোন গাছের তলায়। কখনও গাছের ডালে লেজ ঝুলিয়ে। মাঝে মাঝে মেঘের মতো ডাকে। কখনো হয় তো পাহাড়তলীতে নেমে পড়ে শিকারের সন্ধানে। কোনো জানোয়ারকে বাগে পেলে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে। চোখের টানে শিকার তার দিকে এগিয়ে যায়। চোখে নাকি তার যাদু আছে। অজ অর্থাৎ ছাগল খায় বলে তার নাম অজগর।

সেই অজগরের মাথায় শিং থাকে, শুনেছ কখনো ?

আমার নয়, আমাদের তিনুদার গল্প। গল্পটাই আগে বলব, না গল্প যাঁর মুখে শোনা সেই তিনুদার কথা আগে বলব বুঝতে পারছি না। বয়সকালে তিনুদা নাকি মস্ত শিকারী ছিলেন। বন্দুক কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন কত জায়গায়। দক্ষিণে ভয়ঙ্কর সুন্দরবন, পূবে আসামের ঘন জঙ্গল আর উত্তরে কুমায়ূনের গভীর অরণ্য হেন জায়গা নেই যেখানে তিনুদা যান নি। সুযোগ পেলেই আমাদের ধরে এনে বসিয়ে সেইসব গল্প শোনান তিনুদা। শিংওয়ালা মস্ত অজগরটা তিনি নাকি দেখেছিলেন আমাদের এই সুন্দরবনেই, শিকারও করেছিলেন।

সাপের মাথার মনির গল্প শুনেছি, কিন্তু সাপের মাথায় শিং ? আমরা মিণ্টু পিণ্টু পানুর দল অবিশ্বাসের হাসি হাসলে তিনুদা বললেন, 'কি, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? তা তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর, সুন্দরবনে একবার যা ঘটেছিল বলছি শোন। কুমায়ূনের জঙ্গলে সেবার গোটা কয়েক বাঘ আর চিতাবাঘ শিকার করে অরুচি ধরে গিয়েছিল। সুন্দরবনের আসল রয়েল বেঙ্গল টাইগারই যদি শিকার করতে না পারলাম তাহলে আর শিকার করা হল কি…'

'খুক, খুক !'

তিনুদা চোখ লাল করে বললেন, 'কে, হাসে কে ?'

মুখ বিকৃত করে পানু বলল, 'হাসি না, গলায় এমন একটা খুসখুসে কাশি হয়েছে…'

'আদা পুড়িয়ে খাস!' বলে তিনুদা আবার আরম্ভ করলেন।

'হাঁটতে হাঁটতে তো একেবারে সুন্দরবনের ভেতরে চলে গেছি। চারিদিকে গহন বন, আকাশ আঁধার করা গাছ। আর অসংখ্য নদী-খাল, সাপের মত এঁকে বেঁকে চলে গেছে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। একটা গাছের উঁচু ডালে আমরা দুজন নিঃশব্দে চেপে বসলাম। একটু দূরেই একটা খাল। আমাদের জানা ছিল যে, বাঘ এই খালে জল খেতে আসবেই। জানিস তো, সুন্দরবনে মাচা বেঁধে শিকারের সুবিধা নেই। তাই গাছাল শিকার অর্থাৎ গাছে চড়ে শিকার করতে হয়।

ঘণ্টাখানেক বাদে খালের ধারে বেলাসুন্দরী ঝোপের আড়ালে একটু মৃদু সর-সর শব্দ উঠল। বাঘ নাকি? আমরা উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। একটু পরেই ঝোপের আড়াল থেকে সতর্ক পায়ে বেরিয়ে এল একটা শিঙেল হরিণ। বাঘ নয় তা হলে! আমরা হতাশ হলাম।

তা; হরিণ এসেছে যখন, এরপর বাঘও আসতে পারে। আমরা হরিণটার দিকে মুখ করে ঘুরে বসলাম। হরিণটা সন্তর্পণে দু'একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে নেমে গিয়ে খালের জলে মুখ দিল।

ঠিক খালের ধারেই হরিণটার মাথার ওপর একটা শুকনো মোটা গাছের ডাল, হাত পাঁচেক লম্বা হবে। ঝপ্ করে হরিণটার ওপর এসে পড়ল সেই ডালটা, তারপর বিদ্যুতের বেগে লম্বা হয়ে হরিণটাকে ধরল। স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম, এতক্ষণ আমরা যেটাকে গাছের শুকনো ডাল বলে মনে করেছিলাম, আসলে সেটা মস্ত একটা অজগর। গাছের ডাল জড়িয়ে নিষ্পন্দ হয়ে ঝুলছিল।

সর্বনাশ! ঐ গাছের ডালেই তো আমরা প্রথমে উঠতে গিয়েছিলাম। শেষে আবার কি ভেবে এটাতে এসে উঠেছি। ডালের প্যাঁচ খুলে তখন আমাদের একজনকেই তো জড়িয়ে ধরতে পারত। অতবড় হরিণটাকে যখন ধরতে পারল তখন মানুষও যে ধরতে পারবে না এমন তো কোন কথা নেই। হরিণটার বদলে এতক্ষণে তাহলে যে আমাদেরই কেউ অজগরটার শিকার হতাম। বোঝ একবার ব্যাপারখানা!

এদিকে অজগরটা ধরতেই তো হরিণটা আর্তস্বরে ডেকে উঠল, 'টিউ, টিউ।' কিন্তু তারপরই সব চুপ। ডাল থেকে নিজের দেহটা ছাড়িয়ে এনে অজগরটা এবার হরিণটাকে পাকের পর পাক দিতে লাগল। বিশাল দেহ অজগর, লম্বায় পনেরো হাতের ওপর। লেজের দিকটা তখনও তার গাছের গুঁড়িটা বেষ্টন করে আছে।

গাছের ডালে বসেই দেখলাম, হরিণটা আর নড়তে পারছে না, শুধু তার শরীরটা কাঁপছে থর থর করে। অজগরটা এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে তাকে যে সে বাঁধন থেকে মুক্তি পাবার ক্ষমতা তার আর নেই।

কিন্তু তারপর তার সে কাঁপুনিও থেমে যায়। হরিণের গোটা দেহটা এবার ভাল করে জড়িয়ে

ধরে অজগর, হরিণের শিং আর পা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। তারপর হরিণটাকে সে চাপতে শুরু করে!

আমাদের দু'জনের চোখের সামনে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা ঘটছে, ভয়ে বিস্ময়ে আমরা দু'জনে কেমন যেন হয়ে গেছি। চাপের চোটে হরিণের দেহের হাড়গোড় তো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যেই হরিণের দেহটা হয়ে গেল একটা প্রকাণ্ড নরম মাংসপিণ্ড। অজগরটা তখন পায়ের দিক থেকে হরিণটাকে গিলতে শুরু করল। দেখতে দেখতে হরিণের পিছনের পা দু'টো গেলা শেষ হয়ে গেল।

অজগরের মুখ থেকে অজস্র লালা বেরিয়ে হরিণটাকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। ধীরে ধীরে সেটাকে সে গিলছে। তিল তিল করে মৃত্যু, সে এক বীভৎস দৃশ্য। গাছের ডালে বসে থরথর করে কাঁপছি আমরা দু'জনেই। কথা বলবার শক্তিও নেই। মনে হচ্ছিল, সারা দেহ যেন আতঙ্কে জমাট বেঁধে গেছে। এখুনি বোধহয় পড়ে যাব ডাল থেকে।

অতবড় শিঙেল হরিণটার প্রায় সমস্তটাই অজগরটা গিলে ফেলল আস্তে আস্তে, শুধু মাথা আর শিং দুটো বাদে। হরিণের মুখের দুই কষ বেয়ে তখন রক্ত ঝরছে, চোখ দুটোও স্তিমিত।

তারপর একসময় আস্তে আস্তে মাথাটাও গিলে ফেলল অজগরটা। আরামের ভোজন পর্ব সমাধা তার। হরিণের সারা দেহ এখন অজগরের পেটের মধ্যে, সুধু শিং দুটো বাইরে। এত বড় শিংকে গিলতে পারছে না। মাথাটা হজম হলেও শিংজোড়া পেটে গিয়ে বেকায়দা ঘটাবে এই ভয়ও আছে।

এরকম একটা শিকার গিলতে পারলে অজগর দিন কয়েকের জন্য নিশ্চিন্ত। নিঃশব্দে পড়ে থাকে তাই অজগরটা, খালের ধারে গাছের তলায়। আর নড়তেও পারে না। তাকে দেখে তখন মনে হয়, বিরাট একটা শিংওয়ালা সাপ যেন জলের ধারে শুয়ে আছে, শিংওয়ালা অজগর সাপ।

আস্ত একটা হরিণ গিলে অজগরটা তো তখন আর নড়তে পারছে না। বুঝলাম, ওর কাছ থেকে আপাতত আর ভয় নেই। আর থাকতে পারলাম না। গাছের ডাল থেকে নেমে পড়ে সোজা অজগরের মাথাটা লক্ষ্য করে বন্দুক তুললাম। সঙ্গী যে ছিল সে বাধা দিল। বলল, দু'একটা গুলির কর্ম নয় এই অজগর শিকার। এমন কাজ করতে যেও না। হেসে বললাম, শিকার গিলেছে, এখন ওর নড়ন-চড়ন সব বন্ধ। এসো, এইবেলা ওকে শেষ করি। বলেই অজগরটার মাথা লক্ষ্য করে পর পর দু'বার গুলি ছুঁড়লাম।

সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় লেজ আছড়ে আশেপাশের ঝোপ-ঝাড় লতাপাতা সব যেন ওলট পালট করে ফেলল অজগরটা। কিন্তু পর পর কয়েকটা গুলি ছুঁড়বার পর বাছাধনের সে আস্ফালন আর কতক্ষণ! হরিণ খাওয়ার সাধ তার জন্মের মত মিটে গেল।'

'খুক! খুক, খুক!' পানুর কাশিটা আবার শুরু হতেই পিণ্টু তাকে ধমক দিয়ে উঠল। 'তা অত বড় অজগরটা শিকার করলে তার চামড়াটা কি করলে তিনুদা।'

তিনুদার মুখে কিন্তু কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। আড়চোখে আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে

নিয়ে বললেন, পর পর কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ শুনে দূরে নৌকা থেকে আমাদের লোকজন সব এসে পড়ল। মরা অজগরটাকে টানতে টানতে নিয়ে এল মাঝিভাই। তাদের আনন্দ ধরে না। এত বড় সাপের চামড়া বেচে তারা নাকি অনেক টাকা পাবে। ভাবলাম, গরীব মানুষ, নিকগে যাক।'

পানুর কাশিটা এবার আর ধমক দিয়েও থামানো গেল না। কাশতে কাশতেই সে বলল, 'আর শিংজোড়া? সে দুটোও তো অন্তত আনতে পারতে?'

বিষ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে তিনুদা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'আরে দূর দূর। কোথায় আসল রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর তার জায়গায় কিনা মরা হরিণের শিং। তোরাও যেমন, ওসব আবার বোঝা বয়ে কেউ আনে?'

'খুক, খুক!' পানুর খুশখুশে কাশিটা আবার বুঝি চাগিয়েছে। বলে, 'অজগরের হরিণ শিকারের এমনি গল্প কিন্তু আগেও যেন কোথাও শুনেছি তিনুদা।'

তিনুদা নিজেই যে আমাদের ডেকে বসিয়েছেন সেকথা ভুলে গিয়ে এবার রেগে উঠে বললেন, 'দিনরাত তোদের শুধু গল্প আর গল্প। পড়াশুনো কিছু নেই? শীগগির যা, পালা।' বলে নিজেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন।

রাত দুপুরে

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

খোকাখুকুরা মায়ের কাছে ঘুমিয়ে আছে আরাম করে,
কেউ জানেনা ঘট্‌ছে কি যে রাতদুপুরে পুতুল ঘরে—
চাঁদের আলো ঝল্‌মলিয়ে ঢুকল সেথা জান্‌লা দিয়ে,
ঘুমিয়ে ছিল পুতুলগুলো—দিল তাদের ঘুম ভাঙিয়ে।
জেগে সবাই বল্‌ল 'আহা! এমন খাসা চাঁদ্‌নী রাতে
নাচের গানের ছন্দে তালে আনন্দে মন আপনি মাতে।'
মোমের পুতুল 'মনিমালা', মুখখানি তার হাসি হাসি,
কাজলটানা ডাগর চোখ, কোঁকড়া কালো কেশের রাশি,
বলছে 'ওগো 'মলি দিদি দেখ্‌ছ কেমন করেছি সাজ?
বাজিয়ে নূপুর ঝুনু ঝুনু 'ময়ুর নাচ' নাচব আজ।'
'মলি' হ'ল ডলিপুতুল নীল দুটি চোখ, সোনালী চুল,
আকাশ-নীল পোষাক তার, মুখটি যেন গোলাপ ফুল!
নাচ্‌ছে 'নীল-পরীর নাচ' হাল্কা যেন হাওয়ায় হেলে,
ফুরফুরে নীল প্রজাপতি উড়ছে যেন পাখ্‌না মেলে।
'কাঠপুতুলী 'রূপকুমারী' রূপের ভারি গরব তার,
দেখিয়ে দিল এঁকেবেঁকে 'সাপের নাচ' কি চমৎকার!
নাদুস্‌ নুদুস ভালুক্‌ ছানা লোমের পুতুল 'টেডী' যে,
থপ্‌থাপয়ে 'ভালুক নাচন্‌' নাচ্‌তে সদাই 'রেডী' সে।
তুরকী ঘোড়া 'চর্‌কি নাচ' নাচছে কেমন ঘুরে ঘুরে,
গিটকিরি গান গাইছে কেমন 'চিঁ-হি-হি-হি' মিহিসুরে।
ভেবেই আকুল মাটির পুতুল গোলগাল সে আল্লাদী'
'গানটা নাহয় গাইতে পারি, ক্যাম্‌নে নাচের পাল্লা দি'?
বলল হাতি 'আমি তো দিদি অনেক মোটা তোমার চেয়ে,
তবুও দেখো, নাচ্‌বো খাসা শুঁড়্‌ দুলিয়ে গানটি গেয়ে।'
সবাই বলে 'নাচতে পারো যত তোমার প্রাণটা চায়,
দোহাই দাদা! গান গেয়োনা—ফাট্‌বে যেগো কানটা তায়!'
এম্‌নি ধারা মজার পালা চল্‌ল সারা রাতটি জুড়ে,
নাচ্‌ল তারা নানান্‌ ছাঁদে, গাইল তারা নানান্‌ সুরে
থাম্‌ল তারা চাঁদামামা ডুব্‌ল যখন শেষের রাতে
চোখ্‌টি বুজে পড়ল শুয়ে যে যার আপন বিছানাতে।

শীলা দেবীর বন্যার গল্প

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সত্য ঘটনা অবলম্বনে

'সেদিন অক্টোবর মাসের চার তারিখ। শুক্রবার। ১৯৬৮ সনের এই দিনটার কথা জীবনে আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। পরের দিন লক্ষ্মীপুজো। বিজয়া দশমীর পর থেকে আরম্ভ হয়েছে সৃষ্টিছাড়া বৃষ্টি! আকাশ কালো মেঘে ঢাকা, সূর্যের মুখ দেখার জো নেই। আশ্বিনের এই বৃষ্টি এবারের বর্ষাকে হার মানিয়েছে। কমল দিনবাজারে লক্ষ্মীপুজোর বাজার করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল—'লক্ষ্মী ঠাকুর এবারে আমাদের উপর খুব একটা খুশি নন। বাজারে করলা নদীর জল ঢুকেছে। জলের মধ্যেই হাট বসেছে। পাহাড় অঞ্চলেও এখানকার মতো বৃষ্টি হচ্ছে। শুনলাম, তিস্তার জল বেড়েছে—বাঁধের মাথা ছুঁই ছুঁই করছে। আমার ভয় হচ্ছে, বাঁধ টপকে তিস্তা শহরে না ঢুকে পড়ে।' ওর বাবা দাড়ি কামাচ্ছিলেন, শুনে বললেন—'দূর! এই আশ্বিন মাসে বন্যা হবে কি রে! চারিদিকে এত বৃষ্টি হচ্ছে, নদীর জল বাড়বে না? সে রকম কোন সম্ভাবনা থাকলে টাউনে এতক্ষণ ঢোল পড়ে যেত।'

আমি নিজেও কমলের কথা গায়ে মাখাইনি। জল বাড়ছে তা বাড়ছে—এমন যে প্রলয় হবে, তা কি জানতাম আগে। কমল নারকেল ঝুড়তে বসল। দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে আমি নারকেল কুরে গুড় জ্বাল দিয়ে নাড়ু তৈরি করতে বসলাম। কমল হেসে বলল—'মা লক্ষ্মীর পুজোর যোগাড় যেন ভালো মতো হয়, আমার দু'জন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছি।'

কাজকর্ম সেরে শুতে একটু রাত হল। শরীর ক্লান্ত। বৃষ্টি হচ্ছিল। দু'চোখ ভ'রে ঘুম নেমেছিল। রাত তিনটে কি সাড়ে তিনটে হবে—দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। বাইরে গোলমাল পাড়ার লোকের আর্ত চীৎকার। চোখ থেকে তখনও ঘুম যায়নি—ঠিক কিছু বুঝতে পারলাম না। ভাবলাম, কারও বাড়িতে হয়তো চোর ডাকাত পড়েছে, নয়তো আগুন লেগেছে। পাশের ঘর থেকে কমল চেঁচিয়ে উঠল - 'মা তোমরা শীগ্‌গির উঠে পড়, তিস্তার বাঁধ ভেঙে জল এসেছে।' সত্যি তো! ঘরের মেঝেতে জল। দূরে প্রবল জলরাশির গর্জন শোনা যাচ্ছে। রূপকথার হাজার হাজার দৈত্যদানব দলবেঁধে হুংকার ছেড়ে ঘরবাড়ি গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে ছুটে আসছে। সর্বনাশ! বান এসেছে! কি হবে আমাদের? কোথায় যাব আমরা? ঘরের ভেতর ঘুটঘুটে অন্ধকার, চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না। রিংকুর বাবা তাড়াতাড়ি ঘরের সুইচ টিপলেন। কিন্তু আলো জ্বলল না! উনি ঘাবড়ে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন—'আরে কমল, আলো জ্বলছে না যে!' কমল টর্চ জ্বেলে লণ্ঠন ধরাল। রিংকু ঘুম থেকে উঠে এতক্ষণ চুপচাপ বিছানায় বসেছিল। আলোতে আমাকে দেখতে পেয়ে ভয়ে একটা চীৎকার দিয়ে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রিংকুর বাবা বললেন—'চল, আমরা সকলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি—দত্তবাড়ির দোতলায় গিয়ে আশ্রয় নিই।' কিন্তু দরজা খুলে সামনের বারান্দায় এসে আর সাহস হল না। চারি দিকে জল থৈ থৈ করছে উঠোন-বারান্দা-রাস্তা জলে একাকার হয়ে গেছে। রাস্তায় এক কোমর জল হবে। জলে তীব্র স্রোত, দুরন্ত গতি—কচুরিপানাগুলো তীরের মতো সাঁই সাঁই করে ছুটছে। বৃষ্টি হচ্ছে। কমল টর্চ ফেলে বলল—'অসম্ভব, আমরা রাস্তায় নামলে ভেসে যাব। জলের যা স্রোত।'

উপায়? উপায় বাড়ির ছাদে ওঠা। বাড়িতে ছাদে ওঠার একটা মই ছিল, তাই রক্ষা। ওদিকে হাম্বা হাম্বা ডাক শুনে রিংকুর বাবা ছুটলেন গোয়ালে—গরু ছেড়ে দিতে। কমল মই নিয়ে এসে আমাকে ও রিংকুকে ছাদে টেনে তুলল। বাড়ির ভেতরের উঠোনে এক বুক জল। তারপর কমল এবং ওর বাবা ঘরের কিছু জিনিস-পত্তর সরিয়ে নড়িয়ে একটু উঁচুতে রেখে যখন উপরে উঠে এল তখন এক গলা জল। জল যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। মনে হচ্ছিল, ছাদে উঠেও আমরা বাঁচতে পারলাম না—লক্ষ লক্ষ সাপের মতো ফণা তুলে চাপা আক্রোশে জল আমাদের দিকে তেড়ে আসছে। আমরা, আমাদের এই বাড়িঘর সুদ্ধ গোটা শহরটা এখন জলের নিচে তলিয়ে যাবে। পৃথিবীর মানুষ আর আমাদের কথা কোনদিন জানতে পারবে না।

এত বিপদে কমল কিন্তু মাথা ঠিক রেখেছিল। ঘর থেকে বের হওয়ার আগে ওইটুকু সময়ের মধ্যে বুদ্ধি করে আলনা থেকে কিছু শুকনো জামাকাপড়, ঠাকুর ঘর খুলে লক্ষ্মীর ফল, নাড়ু, একটা চামড়ার ব্যাগে ভরে—ব্যাগটা এবং জলের জগটা হাতে নিয়ে ছাদে উঠেছিল।

আমরা ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে শুকনো পরলাম। তখনও বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলাম। কমল এক একবার টর্চ জ্বেলে জল লক্ষ্য করছিল। উঠোনে এখন আন্দাজ এক মানুষের মাথার উপর জল। ভাগ্যিস আমরা সময় মতো উপরে উঠে এসেছি। অন্ধকারে চোখে দেখা না গেলেও—লোকজনের হাঁকাহাঁকি, চীৎকার ও টুকরো টুকরো কথাবার্তা কানে আসছিল। পাড়ার অনেকেই আমাদের মতো বাড়ির ছাদে বা চালে আশ্রয় নিয়েছে। কিছু লোক খাটের উপর খাট বা টেবিল দিয়ে তার উপরে চেয়ার, টুল তুলে ঘরের ভেতরেই ছিল। তাদের যখন ঘুম ভেঙেছিল, বাইরে তখন ডুব জল। সুতরাং ঘরে থাকা ছাড়া তাদের সামনে কোন পথ ছিল না।

রাস্তার দিক থেকে 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' বলে ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল। কমল টর্চ ফেলল, কিন্তু ঠিক মতো কিছু দেখা গেল না। তবে মনে হল,—ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক—কেউ কচুরিপানার সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে। হায়রে বেচারি! কে তোকে বাঁচাবে!

একটু একটু করে সময় কাটতে থাকল—ভোর হয়ে এল। চারিদিকের ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলো চোখের সামনে আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। রোদ ওঠেনি, পাখি ডাকেনি, ফুল ফোটে নি—ফুলগাছ সব জলের নিচে। অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ ভরা অশান্ত আজকের ভোর বেলা আমাদের সামনে একটা অস্পষ্ট ছবি।

দুটো বড় বড় গাছ জলস্রোতে ভেসে এসে বাড়ির প্রাচীরের উপর আছড়িয়ে পড়ল—প্রাচীর ধ্বসে গেল। গাছ দুটো জলের টানে এগিয়ে চলল একটা পুরানো কাঠের বাড়ির দিকে। চালের উপরের লোকগুলি ভয়ে আর্তনাদ করে চোখ বুজল। কিন্তু, ওদের কপালের জোর বলতে হবে—গাছ দুটো বাড়ির একপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। নইলে ধাক্কা সামলাতে হলে ওই নড়বড়ে বাড়িটা খাড়া থাকত না।

বাড়ির আশপাশ দিয়ে একটা গরু মুখ উঁচু করে ভেসে বেড়াচ্ছে। বাঁচার জন্য তার সে কি চেষ্টা। রিংকু বলল—'মা, আমাদের কালীগাইকে তো দেখছি না?' তাই তো! ছাদের উপর থেকে বাড়ির চারিপাশে আমরা খুঁজতে লাগলাম। বেশিক্ষণ আমাদের খুঁজতে হল না। একটু পরেই চোখের উপর দিয়ে গরুটার মৃতদেহ ভেসে গেল। রিংকু কেঁদে উঠল। ওর বাবা দু'হাত দিয়ে চোখ ঢাকলেন।

আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারে পুলিন বাবুর বাড়ি। তার অনেকগুলো ছোট ছেলে-মেয়ে। ওরা সবাই বাড়ির চালে উঠেছে। আহা! বেচারীরা এক কাপড়ে উপরে উঠেছে। ভিজে কাপড়ে ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে এখন কাঁপছে। পাশের নরেশবাবুর বাড়ির সকলে ঘরের সিলিং-এ উঠেছিল। ওই ঘুটঘুটে অন্ধকারে অপরিসর জায়গায় তাদের দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। শেষে মরিয়া হয়ে ভেতর থেকে কোন রকমে একটা টিন সরিয়ে তারা উপরে উঠেছে। বড় ছেলের বউ রেখার কোলে চার মাসের বাচ্চা। অথচ ছিটে ফোঁটা খাদ্য, জল বলতে কিছুই তাদের সংগে নেই। আপন আপন প্রাণ হাতে করে সকলে উপরে উঠেছে। দুধের বাচ্চাটা খাবে কি? না খেতে পেলে যে কচি শিশুটা মরে যাবে। আমি কমলকে বললাম, কমল দুটো কমলা লেবু তাদের ছুঁড়ে দিল। তারপর কিছু নাড়ু ও ফল সামনের ও পাশের বাড়ির চালে ছুঁড়ে দিল। এই বিপদের দিনে সকলে কিছু একটু মুখে দিক। তাতেই আনন্দ, তাতেই সুখ।

একটু বেলা বাড়লে বৃষ্টি ছেড়ে গেল। জলের দিকে তাকানো যায় না—কি ঘোলা জল! গেরুয়া রঙ, একটু তেলতেলে ভাব। বাড়ির মধ্যে সাত আট ফুট জল—তবে জল বাড়া এখন একটু কমেছে। দূরে দত্তবাড়ির দোতলার বারান্দায় বহু লোকের ভিড়—অনেকে বাড়িঘর ছেড়ে ওখানে আশ্রয় নিয়েছে।

হৈ চৈ শুনে তাকিয়ে দেখি বাড়ির সামনে দিয়ে বারো তেরো বছরের একটা মেয়ের মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে। কেমন যেন হয়ে গেলাম। রিংকু ও কমলকে তাড়াতাড়ি বুকে টেনে জড়িয়ে ধরলাম। শুধু কি এই। সারাদিনে কত যে মরা গরু, মোষ সামনে দিয়ে ভেসে গেল—তা বলে শেষ করা যায় না। ঘরের কিছু কিছু জিনিসও ভেসে চলল—আমরা দেখে দেখে কেবল বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলাম। কিছুই করার নেই।

কলা, নাড়ু আর এক এক ঢোক জল খেয়ে সারাটা দিন আমাদের কাটল। পাড়ার অনেকের ভাগ্যে তাও জোটেনি। অনেকে 'জল' 'জল' করে পিপাসায় কাতর হয়ে বন্যার সেই ঘোলাজল অঞ্জলি ভ'রে পান করেছে।

সন্ধ্যের আগে আগে জল কিছুটা নেমে গেল। রাতটা আমাদের ছাদে বসে বসে কাটাতে হল। হিমে কাঁপতে লাগলাম! মেয়েটা শীতে এক এক সময়ে ছটফট করে কেঁদে উঠে আবার আমার কোলে মুখ গুঁজে চুপ করে ঘুমিয়ে পড়ে। মনে হচ্ছিল, দুনিয়ার লোক কি সব মরে গিয়েছে? এ শহরের বন্যার খবর কি কেউ রাখে না? কেউ কি আমাদের উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে না? রাত কাটল —কিন্তু কিভাবে যে কেটেছিল আজ তা ভাবলে পারি না।

রবিবার দিন একটু বেলা হলে আমরা ছাদ থেকে নামলাম। বাড়ি ঘরের অবস্থা দেখে চোখে জল এসে গেল। এখানে কি আর আমরা বসবাস করতে পারব। উঠোনে একহাঁটু কাদা, ঘরে-বারান্দায় কাদা—যেদিতে তাকাচ্ছি, শুধু পলি আর পলি। ঘরগুলোর ভেতরে যেন লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেছে। আলনা, চেয়ার, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল বেঞ্চি—কোনটা স্বস্থানে নেই—মেঝেতে পড়ে কাদায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। বাক্স-প্যাঁটরা ছোট ছোট ড্রাম টিন এখানে ওখানে পলির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। দু'একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে ভেসে গেছে। ট্রানজিস্টার সেটটা কাদার সংগে কথা বলছে। অন্যান্য জিনিসপত্তর কিছু আছে, কিছু ভেসে গেছে। যেগুলি আছে, সেগুলি পলির তলায় কোথায় যে তলিয়ে আছে বোঝা যাচ্ছে না।

রিংকুর ও কমলের একখানা পড়ার বই বাঁচেনি। দেওয়ালে জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরেছে। উঃ! কি জলটাই হয়েছিল ঘরে! খাটের উপর টেবিল তুলে—তার উপরে বিছানা রেখেও বাঁচানো যায়নি। শুধু দুটি কম্বল—কমল খাটের উঁচু ছত্রীতে রেখে গিয়েছিল বলে বেঁচেছে। বাড়ির সামনের দুই দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা হয়েছিল। দরজা খুলে বারান্দায় এসে চমকে উঠলাম। বাড়ির সামনে দুটো মরা গরু পাশাপাশি পড়ে আছে।

আমরা কিছুক্ষণ একে অন্যের মুখের দিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলাম। কি করব ভেবে পাচ্ছি না। পলি সরিয়ে ঘর সাফ করে আবার সব কিছু ঠিকঠাক করতে কতদিন যে যাবে, জানি না। এই পলির মধ্যে আমরা থাকব কি করে? কমল আর ওর বাবা দু'জনে কাদামাখা বিছানা নিয়ে গিয়ে ছাদে রোদে দিয়ে এল।

ঘরে চালডাল যা কিছু খাবার জিনিস ছিল সব নষ্ট হয়ে গেছে। পানীয় জল নেই—কুপের জল এত ঘোলা যে মুখে দেওয়া তো দূরের কথা, তাতে স্নান করা, এমনি ধোয়া মোছার কাজও চলবে না। খিদে পেয়েছে সবার। পেটে একটু দানাপানি না পড়লে সকলে সুস্থ থাকি কি করে? কমল চলল খাবারের খোঁজে। মনকে কেবল সান্ত্বনা দেওয়া। খাবার পাবে কোথায়? শহরের প্রতিটি লোকের আজ একই অবস্থা। মুখে একই বুলি।

বন্যার হাত থেকে দোকানদার বাঁচেনি, দোকানও রক্ষা পায়নি।

প্রাণে যখন বেঁচেছি, আবার নতুন করে সংসার সাজাতে হবে। আর তা করতে হলে যে সব জিনিস বেঁচেছে—ভেসে যায়নি বা নষ্ট হয়নি—সেগুলি দিয়ে শুরু করতে হবে। আমি এবং রিংকুর বাবা কাজে নেমে পড়লাম। পলি সরিয়ে সরিয়ে হাতড়ে হাতড়ে কাদা-ডোবা

জিনিসগুলো তুললাম। চেয়ার, বেঞ্চি—যেগুলো কাদায় গড়াগড়ি যাচ্ছিল, সেগুলি উঠিয়ে সোজা করে রাখলাম।

কমল বেলা একটা নাগাদ বাড়ি ফিরল। তবে সে একেবারে খালি হাতে ফেরেনি। তার হাতে কয়েকটা রুটি, একটু গুড়, দুটো মোমবাতি ও একটা দেশলাই। শিলিগুড়ির একদল যুবক বন্যাক্লিষ্ট জলপাইগুড়িবাসীদের জন্য গাড়ি করে রিলিফ নিয়ে এসেছে। পাড়ার মোড়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কমল হাতের জিনিসগুলো নামিয়ে রেখে জলের জগটা নিয়ে ছুটল। ওরা পানীয় জলও সঙ্গে এনেছে। রিলিফের রুটি-গুড় খেয়ে সেদিন দুপুরটা আমাদের কাটল।

কষ্টে কষ্টে আরো দুটো দিন কাটালাম। একটা ঘরের কাদা সরিয়ে কোনরকমে পরিস্কার করে চেয়ার, টেবিল, আলনা, ড্রেসিং টেবিল, বিছানা পত্তর, বাক্স প্যাঁটরা, ড্রাম টিন, হাঁড়ি-কড়াই বাসন—পলি সরিয়ে কাদা ঘেঁটে যা যা পাওয়া গেল—সব সেই ঘরে গাদা করে রাখলাম। শরীরের যা হাল হয়েছে, তাতে বাইরের লোক এসে দেখলে চিনতে পারবে না। মাথার চুল উস্কখুস্ক, চোখ মুখ বসা বসা, সারা শরীর পলি লেপা, জামাকাপড় নোংরা কাদা-মাখা। কূপের ঘোলা জলে স্নান করছি। শিলিগুড়ির তরুণদের দেওয়া চিঁড়ে গুড় খেয়ে রাত্তিরে কাদা-মাখা খাটে কম্বল পেতে ঘুমোচ্ছি। এভাবে প্রায় না-স্নান, না-খাওয়া, না-ঘুমানো অবস্থায় পলির পাঁকে পড়ে আর থাকা যায় না। কিসের মায়া করে এখানে পড়ে থাকা? জিনিস পত্তর যা উদ্ধার করেছি তার অর্ধেক প্রায় ফেলে দিতে হবে। ঘর দোরের পলি—সে তো পরেও সাফ করা যাবে। এখন যেমন সব আছে, তেমনই থাক। বাইরে গরু দুটো পচতে শুরু করেছে, গন্ধে ঘরে টেকা যাচ্ছে না। এখানে পড়ে থাকলে অসুখ নিশ্চিত।

আগে জীবন, তারপর বাড়ি ঘর সংসার। মঙ্গলবার রাত্রে রিংকুর বাবাকে বললাম—'ওগো, আর যে এখানে থাকা চলে না। চল না, আমরা সকলে নীলার ওখানে গিয়ে কিছুদিন ঘুরে আসি। ততদিনে শহরের অবস্থা স্বাভাবিক হোক, আমরাও একটু সুস্থ হয়ে নিই।' রিংকুর বাবা বললেন—'আমিও মনে মনে সেই কথাই ভাবছি।'

কমল এবং ওর বাবা শহরটা মোটামুটি একবার ঘুরে এসেছে। কমল শুয়ে গল্প করছিল—'জলপাইগুড়ি শহরকে আর শহর বলে চেনা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন একটা মস্ত বড় ধ্বংস স্তূপ। পথে ঘাটে, অলিতে গলিতে, বাড়ির আশে পাশে, সর্বত্র অজস্র জানোয়ারের মৃত দেহ পড়ে আছে। কোথাও কোথাও পাশাপাশি মানুষের মৃতদেহ পড়ে আছে। মৃতদেহ সরানোর কোন বন্দোবস্ত নেই। ওইভাবেই পচচে। উঃ! কি দুর্গন্ধ। নাকে কাপড় চাপা দিয়েও গন্ধ ঠেকানো যায় না। বন্যা থেকে বাঁচা মানুষের কাছে পলি বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শহরের প্রতিটি লোকের বাড়ি ঘরে উঠোনে পলি পড়েছে। রাস্তা-মাঠ, বাজারহাট, নালা নর্দমা পলির তলায় তলিয়ে। সারা শহরটা যেন পলি চাপা পড়েছে। শহরে আলো নেই, জল নেই, খাদ্য নেই, বাতাস দূষিত। স্কুলকলেজ, অফিস কাছারি, ব্যাঙ্ক পোষ্ট্‌অফিস, দোকানপাট সব বন্ধ। টেলিগ্রাফ-টেলিফোন-ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে, পোস্ট উপড়ে পড়েছে স্থানে স্থানে। শহরের মধ্যে

প্রবাহিত করলার ব্রীজগুলো জলের তোড়ে ভেঙে পড়েছে। শহর দুইভাগে বিভক্ত। শান্ত ও স্থির করলা দুরন্ত তিস্তার প্ররোচনায় ক্ষেপে উঠে বাঁধ ভেঙে এভাবে যে ধ্বংস অভিযান চালাবে, কেউ কোনদিন ধারণা করেনি। সমস্ত শহরটা পাঁচ ফুট থেকে চোদ্দ জলের নিচে ডুবে ছিল। সেনপাড়া, হাসপাতাল পাড়া, রায়কত পাড়া, হাকিম পাড়া, সমাজ পাড়া এলাকায় যেমন মানুষ মরেছে বেশি, তেমন বাড়িঘরের ক্ষতিও হয়েছে খুব।

রিংকুর বাবার অফিসের এক পিয়ন এসেছিল। পাহাড়পুরে তার বাড়ি। এই পাহাড়পুরের কাছে রাত প্রায় দুটো নাগাদ বাঁধ ভেঙে তিস্তা কয়েকটি গ্রাম ভাসিয়ে দিয়ে ঘুমন্ত শহরে হানা দিতে ঢুকেছিল। তার মুখে শুনলাম গ্রামের লোকের দুরবস্থার কথা। শহরের মতো সেখানে এত পাকা বাড়িঘর নেই। বেশির ভাগ জীর্ণ কুটীর। কিছু কাঁচা ঘর। খড় বা টিনের চাল, বাঁশের বেড়া, মাটির মেঝে। বন্যার জলে বহু বাড়িঘর ভেসে গেছে। পিয়ন বাউরি বাড়িতে ছিল না। ঘরের চাল সুদ্ধ তার পাঁচ ছেলে মেয়ে ভেসে যায়। ছেলেমেয়েরা সকলে নিখোঁজ—হয়ত তারা বেঁচে নেই। কেবল তার বউ ভাসতে ভাসতে এক বাঁশঝাড়ে আটকে গিয়ে প্রাণে বেঁচেছে। শুধু তার নয়, গ্রামের প্রায় প্রতি বাড়িতে লোক মরেছে। কোন বাড়িতে পাঁচজন, কোন বাড়িতে সাতজন, এমন কি কোন বাড়িতে গোটা পরিবারের লোক মরেছে। গবাদি পশু গ্রামে নেই বললেই চলে। শহরের মতো পাহাড়পুর, বালাপাড়া প্রভৃতি গ্রামে পলি পড়েনি, তার বদলে দুই তিন ফুট করে বালি পড়েছে। ছদিন আগে যেখানে সবুজ ধানের ক্ষেত ছিল, আজ সেখানে বালি ধূ ধূ করছে। আশ্চর্য এই তিস্তা! কোথাও পলি ঢেলেছে, কোথাও বালি ফেলেছে। গ্রামে কোন কোন জায়গায় এখনও জলস্রোত বইছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ ভেসে এসে পড়ে আছে। নিকটবর্তী ব্রডগেজ রেললাইনটা অনেক জায়গায় ধুয়ে ভেসে গেছে।

বুধবার দিন সকালে রিংকুর মেসোমশাই শিলিগুড়ি থেকে এক ট্যাক্সি ভাড়া করে এসে হাজির। আমাদের দেখে তাঁর চোখে জল এসে গেল। বললেন—'গতকাল অফিসের কাজে শিলিগুড়িতে এসে জলপাইগুড়ির ভয়াবহ বন্যার কথা শুনি। ভাগ্যক্রমে আপনাদের পাড়ার এক ভদ্দরলোকের সংগে দেখা হয়। তাঁর মুখে শুনলাম যে আপনারা সকলে জীবন নিয়ে বেঁচে আছেন। কিন্তু আপনাদের শরীরের এ কি হাল হয়েছে, দিদি। আমি যখন এসে পড়েছি আর এক মুহূর্ত আপনাদের এই নরকে পড়ে থাকতে দেব না। বাগানে নিয়ে যাব। এখানের প্রচুর লোক ট্রাকে বাসে চালের বস্তার মতো গাদাগাদি করে টাউন ছেড়ে চলেছে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের আশ্রয়ে। শোনা যাচ্ছে, শহরের তিন ভাগের দুই ভাগ লোকই বাইরে চলে গেছে।'

আমরাও যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। রিংকুর মেসোকে পেয়ে হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। কিছু মিষ্টি ও খাবার সংগে নিয়ে এসেছিল সে। আমরা সকলে ভাগ করে খেলাম। তারপর দরজায় তালা ঝুলিয়ে বাড়ি ছেড়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বেলা বারোটায় তাদের এখানে এসে উঠলাম।
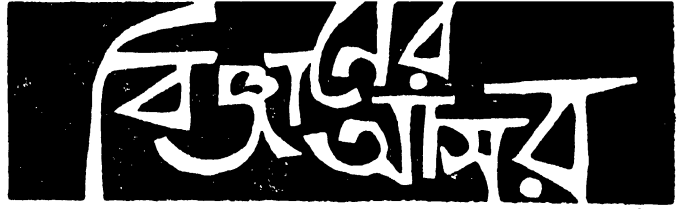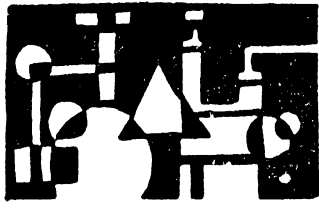
সেলুলয়েড আবিষ্কারের গল্প

অমরনাথ রায়

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কার কথা বলছি। একালের মত সেকালেও আমেরিকায় বিলিয়ার্ড খেলার খুব চলন ছিল। সেকালে বিলিয়ার্ড বল তৈরি হতো হাতির দাঁত থেকে। তার খরচ বড় বেশি। অনেক ভেবে চিন্তে আমেরিকার এক প্রখ্যাত বিলিয়ার্ড বল প্রস্তুতকারক একটি লোভনীয় পুরস্কার ঘোষণা করলেন। দশ হাজার ডলার পুরস্কার। যিনি বিলিয়ার্ড বল প্রস্তুতে হাতির দাঁতের বদলে অন্য কোন বস্তুর সন্ধান দিতে পারবেন, তাঁকেই ঐ পুরস্কার দেওয়া হবে।

বহু প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করলেন। তাঁদের মধ্যে 'জন ওয়েসলি হায়াট' ও একজন। হায়াট ছিলেন নিউ ইয়র্কের একজন মুদ্রণ ব্যবসায়ী। তাঁর ছিল আবিষ্কারের নেশা। সেই নেশার বশবর্তী হয়েই হায়াট বিলিয়ার্ড বল প্রস্তুতের নতুন উপায়ের খোঁজে পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। অনেক পরীক্ষার পর হায়াট কাঠের গুঁড়ো, ছেঁড়া কম্বল, আঠা এবং নাইট্রিক অ্যাসিড্ মিশিয়ে এক নতুন ধরনের বস্তু প্রস্তুত করলেন। তাঁর এই বস্তুটি ঐ প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হল না বটে, তবে হায়াট হাল ছাড়লেন না। নতুন উদ্যমে আবার পরীক্ষা চালাতে লাগলেন।

অবশেষে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হায়াট এক নতুন পদার্থ আবিষ্কার করলেন। ফেলে দেওয়া তুলোর সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড্ মিশিয়ে তিনি মণ্ড তৈরি করলেন। তাতে মেশালেন কিছুটা কর্পূর ও অ্যাল-কোহল। তারপর সেই মণ্ডকে রোলারে ফেলে চাপ দিয়ে যে বস্তুটি পেলেন, হায়াট তার নাম দিলেন —'সেলুলয়েড'।

তুলোর প্রধান উপাদান হল 'সেলুলোজ'। তার সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় তৈরি হল 'সেলুলোজ নাইট্রেট'। আর সেই সেলুলোজ নাইট্রেট, কর্পূর ও অ্যালকোহলের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হল সেলুলয়েড।

এই সেলুলয়েড কতকটা প্ল্যাস্টিকের মত একটা জিনিস। একে কাটা যায়, পাতলা পাতে পরিণত করা যায়। উত্তপ্ত অবস্থায় যখন নরম থাকে, তখন তাকে যে কোনো রূপ দেওয়া যায়। শীতল হলেও সে রূপ আর পালটায় না। এই সব গুণ আছে বলেই এ দিয়ে বিলিয়ার্ড বল ও নানারকম শিল্প দ্রব্য তৈরি হয়। তৈরি হয় ছুরির বাঁট, পিয়ানোর চাবি, চশমার ফ্রেম, চিরুণী, সিনেমার ফিল্ম, খেলার পুতুল ও আরও কত কি! কিন্তু সেলুলয়েড জিনিসটি অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। আগুনের সংস্পর্শে এলেই বিপদ। কাজেই সেলুলয়েডের জিনিসকে সর্বদা আগুন থেকে দূরে রাখতে হয়।

বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তর

অমিতানন্দ দাশ

১৯৯—শশাঙ্কশেখর সেন, বয়স—১০।

প্রশ্ন : চিল নিচে থাকলে ছায়া পড়ে, উঁচুতে উঠলে ছায়া দেখা যায় না কেন? সাধারণ বাল্বে ছায়া হয়, কিন্তু টিউব লাইটে ছায়া হয় না কেন?

উত্তর : যারা স্কুলে পদার্থবিদ্যায় ছায়ার বিষয়ে পড়েছো তাদের তো এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানাই উচিত। টিউবলাইটের ঠিক এই প্রশ্নটাই তো একবার ১৯৬৩ সাল নাগাদ হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় এসেছিলো।

চিলের ছায়া নিয়ে একটা ছোটো এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখতে পারো—সাধারণ বাল্ব থেকে জোরালো আলো পড়েছে এমন জায়গায় একটা পেন্সিল নিয়ে যাও। ধরা যাক বাল্বটা হলো সূর্য আর পেন্সিলটা হলো চিল। (দূরত্ব-টুরত্বগুলো কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যাও!) এই সন্দেশটাকে আলোর সামনে ধরে এর ওপর পেন্সিলের ছায়াটি লক্ষ্য করো! ধরো সন্দেশটা হলো খেলার মাঠ, আর পেন্সিল চিলটা তার থেকে খাবার সন্দেশ ছোঁ মেরে উঠছে বাল্ব সূর্যের দিকে। যখন পেন্সিলটা পৃষ্ঠার কাছাকাছি রয়েছে তখন ছায়াটা হবে গাঢ়। কিন্তু যখন পেন্সিলটা তার ছায়া থেকে বেশ কিছুটা দূরে চলে আসবে, তখন ছায়াটাকে দেখাবে অনেক বড় কিন্তু ফ্যাকাশে। এইভাবেই সূর্যের আলোয় চিলের ছায়া সবসময়েই মাটিতে পড়ে, তবে চিল মাটি থেকে বেশী উঁচুতে থাকলে ছায়াটা এতো বড় ও এতো ফ্যাকাশে হয় যে সেটা চোখেই পড়ে না।

গাঢ় ছায়া আর ফ্যাকাশে ছায়া কেন হয় বুঝবার জন্য পেন্সিলটার ছায়া সন্দেশের ওপর না ফেলে নিজের চোখে ফেলে দেখতে পারো। যদি একটা জ্বলন্ত বাল্বের কাছাকাছি গিয়ে, একচোখ বুজে, পেন্সিলটা দিয়ে আলোটা আড়াল করো তবে কোন ছায়া কেন হচ্ছে বুঝতে পারবে। পেন্সিলটা যদি পুরো বাল্বটাকে আড়াল করে তবে বুঝতে হবে তোমার পুরো চোখের মণির উপরে গাঢ় ছায়া পড়েছে। যদি তুমি পেন্সিলটার ধার দিয়ে বাল্বের কিছুটা অংশ দেখতে পাও তবে বুঝতে হবে তোমার চোখের কিছুটা অংশে অন্ততঃ ফ্যাকাশে ছায়া পড়ছে—বাল্বের কিছুটা অংশ থেকে আলো এসে এই ছায়ার মধ্যে পড়ছে বলেই একে ফ্যাকাশে দেখায়। আর পেন্সিলটা যখন চোখ থেকে বেশ কিছুটা দূরে তখন সেটা দিয়ে কোনোমতেই পুরো বাল্বটাকে আড়াল করা সম্ভব হবে না—তার মানে সেই দূরত্বে পেন্সিলটা কোনো গাঢ় ছায়াই ফেলে না। আলোর উৎসটা যদি ছায়া প্রস্তুতকারক বস্তুটার চেয়ে অন্ততঃ দৈর্ঘ্যে বড় হয় তবে তার গাঢ় ছায়া বস্তুটার পিছনে কিছুদূর গিয়েই শেষ হয়ে যায়, বাকি থাকে শুধু চওড়া ফ্যাকাসে ছায়া। টিউবলাইট লম্বায় অতো বড় হয় বলে তার আলোয় অধিকাংশ ছায়াই হয় ফ্যাকাশে

—মানে ঘরের প্রায় সব জায়গা থেকেই টিউবলাইটের কোনো না কোনো অংশ দেখা যায়। তবে খাটের তলায় অবশ্য গাঢ় ছায়াই পড়ে! হয়তো প্রশ্ন করবে চিলের নাহয় ছায়া পড়ে না, কিন্তু মেঘ তো সূর্যের চেয়ে ছোটো, তার ছায়া পড়ে কেন? তা, সূর্যের ব্যাস প্রায় ৯ লক্ষ মাইল এবং পৃথিবী থেকে দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি মাইল। কাজেই জ্যামিতি থেকে কষে দেখানো যায় একটা ১ ফুট আয়তনের চিলের গাঢ় ছায়া পড়বে যতক্ষণ তা মাটি থেকে $১ \times \frac{৯ \text{ কোটি}}{৯ \text{ লক্ষ}}$ — =১০০ ফুটের কম উচ্চতায় আছে। এখন একটা মেঘ যদি এক মাইল চওড়া হয় তবে তার ছায়া পড়বে যতক্ষণ তা মাটি থেকে ১০০ মাইলের কম উচ্চতায় আছে। চিল মাটি থেকে ১০০ ফুটের বেশী উঁচুতে হামেশাই উড়ছে, তবে মাটি থেকে ১০০ মাইল উঁচুতে হাওয়াই নেই, তো মেঘ আসবে কোত্থেকে?

রাজার সুখের স্বপ্ন নষ্ট

শিবচরণ চট্টোপাধ্যায়

ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখি
হলাম আমি রাজা,
সিংহাসনে মনের সুখে,
খাচ্ছি গরম খাজা।
মেধো এসে পেণাম করে
বলছে—'রাজা সায়েব
তুমিই বাবা, অন্নদাতা
তুমিই দেবাদিদেব।'
খুসি হলাম শুনে, ভাবি—
টেপাই এবার পা।
অবহেলা করলে লাগাই
শ দুই কোড়ার ঘা!
পাশেই বসে মন্ত্রী বুড়ো
বলব তাকে হেঁকে—
'শিক্ষা উচিৎ দাও ব্যাটাকে,—
দু মাস জেলে রেখে।'

এইনা ভেবে ঠ্যাংটা তুলে
দিলেম কাঁধে তার,
হেঁড়ে গলায় বলনু 'বাছা
টেপ্‌তো কয়েক বার।'
মেধো ছিল খেলার সাথী,
যেই না দিলুম দাবড়ে,
দু চোখ হল অশ্রুভরা,
গেল ও একটু ঘাবড়ে।
আমি কিন্তু ঠাণ্ডা মানুষ,
এবার গেলুম রেগে,
হঠাৎ আমার চোখ খুলে যায়,
চমকে উঠি জেগে।
লজ্জার কথা, বলতে নেইকো,
বলছি বড়ই দুখে,
চম্‌কে দেখি একখানা ঠ্যাং
তুলেছি বাবার বুকে!

যদিও 'নেপোর বই' পড়ে জানা গেছিল যে পানু, কিম্বা গুপি, কিম্বা তার ছোট মামা, শেষ পর্যন্ত কেউ ই চাঁদে যাবে না, তবু সুখের বিষয়, অ্যামেরিকানরা সত্যি সত্যি এবার চাঁদে লোক নামাচ্ছে। এমন কি প্রথমে নেপোকে বা অন্য কোনো দুঃসাহসী বেড়ালকে না পাঠালেও, শনিবার ২৯শে জুন, বনি নামক একটা সাত সের ওজনের বাঁদর মহাকাশ পরিভ্রমণে রওনা হয়ে গেছিল, তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

বনিকে নাইলনের সুট পরিয়ে, যথাস্থানে স্ট্র্যাপ দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়েছিল। হাতের কাছে খাবার-দাবার নিয়ে তা সে রাত দুপুরে, দেড়-হাজার পাউণ্ড ওজনের এক মহাকাশ-যান চেপে, তার রকেটের পিছন থেকে নিঃসৃত আগুনে চার দিকে আলো করে দিয়ে, রওনা হয়েছিল।

তারপর বেতারে সঙ্কেত পাওয়া গেছে এবং টেলিভিসনে দেখাও গেছে যে সে খাচ্ছে দাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে এবং ভালোই আছে। সে অবিশ্যি চাঁদে যাবে না। ত্রিশ দিন ধরে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবার কথা ছিল। এত দিন ওজন-হীন অবস্থায় থাকলে শরীরের উপর কি ফলাফল হতে পারে, এবার তারি পরীক্ষা হল। দুঃখের কথা যথা সময়ের আগে নামিয়ে আনলেও বনি বাঁচেনি। আর তারপর তো জুলাই মাসেই অ্যাপলো—১১ চেপে চাঁদে প্রথম মানুষ নামার কথা।

এই নামার ব্যাপারটি বেশ চিত্তাকর্ষক। তোমরা নিশ্চয় কাগজে দেখেছ যে মে মাসের শেষের দিকে তিনজন অ্যামেরিকান মহাকাশযাত্রী, অ্যাপলো—১০ চেপে চাঁদের খুব কাছ দিয়ে ঘুরে এসেছে। তারা অ্যাপলো—১১ করে যারা যাবে তাদের নামবার পক্ষে সব চেয়ে ভালো জায়গাটি পর্যন্ত ঠিক করে এসেছে।

অ্যাপলো—১১ কেমন জান? ওর দুটি প্রধান ভাগ আছে; প্রথম, বিশাল তিন-ধাপের স্যাটার্ণ—৫। এটি পৃথিবীর সব চেয়ে জোরালো রকেট। দ্বিতীয় অংশ হল আসল আকাশযানটি। তার-ও তিনটি অঙ্গ, কম্যাণ্ড মডিউল বা সি-এম সার্ভিস মডিউল বা এস্-এম আর লুনার মডিউল বা এল্—এম।

স্যাটার্ণ—৫ এর সঙ্গে অ্যাপলো-১১ কে জুড়লে হবে ৩৬৩ ফুট উঁচু। ফ্লরিডার কেপ কেনেডি থেকে একে মহাকাশে ছুঁড়ে দেওয়া হবে। সে এক ব্যাপার। স্যাটার্ণের প্রথম ধাপের ধাক্কায় মহাকাশ যানটি ৩৮ মাইল শূন্যে উঠবে। দ্বিতীয় ধাপে পৃথিবী থেকে ১১৮ মাইল উচুতে উঠবে। এতে মাত্র নয় মিনিট সময় লাগবে।

তারপর তৃতীয় ধাপের ধাক্কায় মহাকাশযানটির গতিবেগ ঘণ্টায় ১৫,০০০ মাইলে পৌঁছোবে। তারপর পৃথিবীর গতিপথ ছেড়ে অ্যাপলো—১১ চাঁদে যাবার রাস্তা ধরবে।

ক্রমে মহাকাশযান চাঁদের দিকে এগুবে। কিন্তু এমন ব্যবস্থা করা আছে যে দরকার হলেই পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে। চাঁদ থেকে যখন অ্যাপলো—১১ মাত্র ৫,৬০০ মাইল দূরে থাকবে, তখন মহাকাশযাত্রীরা সার্ভিস মডিউলের সাহায্য নেবে। তাতে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের টানে যাতে অ্যাপলো-১১ গতিবেগ বড় বেশি বেড়ে না যায়, তার ব্যবস্থা হবে। এতে অ্যাপলো-১১ চাঁদে গিয়ে ধাক্কা না খেয়ে চাঁদের চারদিকে ঘুরতে পারবে।

অ্যাপলো-১১ চাঁদের চারদিকে ঘুরতে থাকবে। এদিকে তিনজন আকাশচারীর মধ্যে দুইজন কমাণ্ড মডিউল ছেড়ে লুনার মডিউলে গিয়ে বসবে। একজন হবে পাইলট। সে সব যন্ত্রপাতি ঠিকভাবে কাজ করছে কি না সেটা পরীক্ষা করে নেবে। তারপর সে নামবার এঞ্জিন চালিয়ে দেবে। এল এম তখন অ্যাপলো-১১কে ছেড়ে একা নামতে থাকবে। অ্যাপলো ১১ চাঁদের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে এল্‌-এমের উপর নজর রাখবে।

নামা খুব সহজ নয়। অনেকগুলি জটিল ক্রিয়া আছে। সময়ও লাগবে প্রায় এক ঘণ্টা। প্রথমে ডিমের আকারে গতিপথ নিয়ে, এল্‌-এম নামবে। চাঁদের মাটির উপরে ৭০ মাইল থেকে ৫০ হাজার ফুট পর্যন্ত পৌঁছবে।

৫০ হাজার ফুটে পৌঁছলে একটা 'ব্রেক্‌' লাগানো হবে, তাতে গতিবেগ কমতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত আন্দাজ ঘণ্টায় তিন মাইল বেগে লুনার মডিউল সোজা নামবে চাঁদের মাটির উপরে। এল্‌-এমের ডাক নাম 'বাগ্‌' বা ছারপোকা। এর চারদিক থেকে নানাধরনের যন্ত্রপাতি বেরিয়ে রয়েছে বলে একে ঐ রকম দেখতে লাগে। সরু সরু মাকড়সার মতো ঠ্যাংগুলো চাঁদের জমিতে নামার সময় ভারসাম্য রাখবে। আবার ফেরার সময় ঐ ঠ্যাংগুলোই লঞ্চিং-প্যাডের কাজ করবে।

মহাকাশযাত্রীরা চাঁদের উপর এবার মাত্র ২৪ ঘণ্টা থাকবে। তারা পাথর নুড়ি ইত্যাদির নমুনা সংগ্রহ করে আনবে। অনেক ফটো তুলবে। তাছাড়া একটা বেতার স্টেশন বসিয়ে আসবে। সেখান থেকে এরা ফিরে এলেও অনেক সাঙ্কেতিক সংবাদ পাওয়া যাবে।

ফিরবার সময় হলে মহাকাশচারীরা এল্‌-এমে গিয়ে উড়বার ইঞ্জিনটা চালাবে। এবার তারা আবার অ্যাপলো-১১র কাছে ফিরে যাবে। এল-এম যেই বড় আকাশযানের সঙ্গে গিয়ে লাগবে, আকাশযাত্রীরা দুজন সেটাকে ছেড়ে অ্যাপলো-১১তে গিয়ে বসবে। এল্‌-এমের এবার কাজ ফুরোল। তাকে অ্যাপলো-১১ থেকে আল্‌গা করে, চাঁদের কাছেই ফেলে আসা হবে।

আবার সার্ভিস-মডিউলের চাঁদ ছেড়ে আসার জন্য গতিবেগকে ঘণ্টায় ৫,৪৬০ মাইলে তোলা হবে। পৃথিবীর আবহাওয়ার মধ্যে পৌঁছবার একটু আগে সার্ভিস মডিউলকেও ভাগ করা হবে।

পৃথিবীতে নামার ব্যাপারও খুব সহজ নয়। অ্যাপলো-১১র গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল। আড়ভাবে নামতে হবে যাতে হাওয়ার ঘষায় সহজে গতিবেগ কমে। না কমালে আগুন

ধরে যাবার ভয় থাকে। অন্যান্য বিপদ্‌ও আছে, যেমন ছিটকে আবার মহাকাশে ফিরে যাওয়া। যখন পৃথিবী থেকে ২৪,০০০ ফুট উপরে থাকবে, দুটি প্যারাসুট আস্তে আস্তে খুলে গিয়ে গতিবেগ আরো অনেক কমিয়ে দেবে।

তারপর যখন অ্যাপলো-১১ মাত্র ১০,০০০ ফুট উঁচুতে তখন মহাকাশযানের প্রধান তিনটি পারাসুটকে খোলা হবে। তারপর কম্যাণ্ড-মডিউল মহাকাশযাত্রী তিনজনকে নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঝুপ্‌ করে নেমে পড়বে।

সবসুদ্ধ ১৯৭ ঘণ্টা সময় নেবে মনে হয়। অর্থাৎ আট দিনের একটু বেশি। এ-সব দেখে শুনে শেষ পর্যন্ত পানু, গুপি আর ছোটমামার মত বদলাতে কতক্ষণ ?

* * *

আজ, ১৮ই জুলাই, সন্দেশের প্রুফ দেখছি আর মধ্যে মধ্যে বেতারে খবর পাচ্ছি মহাকাশযাত্রীরা নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলেছে। তারা চাঁদে পৌছাল বলে।

* * *

২১শে জুলাই—তারা চাঁদের পিঠে নেমেছে !!

* * *

তোমরা যতক্ষণে এই লেখা পড়বে, তার আগেই রেডিও আর খবরের কাগজে এই ঐতিহাসিক চন্দ্রযাত্রার খবর শেষ পর্যন্ত শুনে ফেলবে।

* * *

চাঁদমামা

স্বাগতা তরাত

গ্রাহক নং—২০৪৬ বয়স—১১

চাঁদ মামা লুকিয়ে থাকে
নীল আকাশের কোণে,
তাঁকে বুঝি কেউ রাখে না
ঘরের কোণে এনে।
মামা সবার তাইত রাতে
আলো পাই এত।
চাঁদনির আলো পাতার ফাঁকে
ভাল লাগে কত
হঠাৎ সে দিন আকাশ পাড়ি—
দেন তিন নভোচারী
চাঁদকে তাঁরা দেখে এলেন
হল মজা ভারী।

সুদূরের যাত্রী

জয়ন্তী রায় চৌধুরী

গ্রাহক নং—১৩৬৫ বয়স—৯ বছর

আমার বহুদিনের সাধ,
সাতসাগরে ফেনার মাঝে দুলবে জাহাজখানি,
তার সঙ্গে দুলব একা আমি।
কত সে দ্বীপ হব যে পার
গণনা তো নাই কোন তার
নাম না জানা অধিবাসী
কি শুধাবে আমায় আসি।
মোর অজানা তাদের ভাষা
বুঝব তাহা বৃথা আশা।
এমনভাবেই হব আমি দূর বিদেশের যাত্রী
এমন করেই কেটে যাবে আমার কত রাত্রি॥

ছড়া

অরূপ তরাত

গ্রাহক নং—২০৮৬ বয়স—৭ বৎসর

(ইংরেজী থেকে অনুবাদ)

ঘরর—ঘরর—ঘর !
ইঁদুর ভায়া উঠল ঘড়ির 'পর।
ঘরর ঘরর ঘর !

একটা বাজে ঠং করে
ইঁদুর পালায় ঢং করে
ঘরর—ঘরর—ঘর !

রিখিয়া ভ্রমণ

কুশল রায়

গ্রাহক নং—২৩৬৯ বয়স—৯ বছর

রিখিয়া দেওঘর থেকে পাঁচ মাইল, আমার সেখানে খুব ভাল লাগে। সেখানে কতগুলো বট-গাছের নিচে একদিন হাট বসে রবিবারে। সেখানে সূর্যাস্ত টিলা বলে একটা ছোট পাহাড় আছে, সেখান থেকে আমরা সূর্যাস্ত দেখতাম। হিরণার টিলার শেষে যে ছোট খাড়ি আছে, সেখানে সকালে গামছা দিয়ে ছোট ছোট জোব্রা মাছ ধরতাম। আর একদিন ছ মাইল দূরে চার্ণন বলে একটা নদীর ধারে গরুর গাড়িতে গিয়েছিলাম পিকনিক করতে। কিন্তু একবার আরও বেশীক্ষণ ধরে গিয়েছিলাম গাড়িতে ত্রিকূট বার মাইল! ছ মাইল গ্রামের কাঁচা রাস্তা তারপর দুমকা রোড সেখানে বাস গাড়ি লরী চলে।

গরুর গাড়িতে যাচ্ছি। সকাল সাতটায় আমাদের গাড়ি ছাড়ল। দেখতে দেখতে আটটা বাজতে চলল, গ্রামের রাস্তা কেবল পাথর আর উঁচু নিচু, তারপর গর্ত তারপর মাইল দুয়েক গিয়ে একটা জায়গায় কতগুলো আম গাছ ছিল সেখানে আমাদের গরুর গাড়ি থামল। তখন আমরা দুমকা রোডে এসেছি। সেখানে রুটি ডিম আর চা খেলাম। তারপর কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠলাম সেখান থেকে ত্রিকূট খুব ভাল দেখা যাচ্ছিল। যখন আমরা ত্রিকূটের কাছে এসেছি তখন আমাদের দলের তিনটে গরুর গাড়ির একজোড়া গরু ধান ক্ষেতে নামবার তাল করতে লাগল। এদিকে আমাদের একটা গরুর কি হল হঠাৎ সে বসে পড়ল। আমাদের গাড়িটা উলটে যায় আরকি। আমরা তখন অন্য দুটো গাড়িতে গিয়ে উঠলাম, শুনলাম ওকে খাইয়ে আনেনি বলেই ওরকম অবস্থা। ফেরার পথে কিন্তু গরুটা খেয়ে-দেয়ে ঠিক হয়ে গেল।

ত্রিকূটে একটার সময় পৌছালাম। তারপর খেতে খেতে চারটে বেজে গেল, পাহাড়ে উঠব ভেবেছিলাম আর ওঠাই হল না। দূর থেকে ত্রিকূট পাহাড়টা দেখায় ঘোড়ার খুরের মতন। আর তার গায় সবুজ গালিচা দিয়ে ঢাকা। ত্রিকূট পাহাড়ের একটা চুড়োর নাম হামাগুড়িয়া—সেখানে উঠতে গেলে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হয়। আর একটার নাম বুক ধড়ফড়িয়া, সেখানে উঠে নিচে তাকালে বুক ধড়ফড় করে। তার আগে আমরা খানিকটা উঠেছিলাম সেখানে একটা মন্দির আছে, চান করবার জায়গাটা হচ্ছে একটা নর্দমা, সবাই বলে ওটা ঝরণা, সেখানে আমরা চান করলাম। তারপর সন্ধে ছটায় রওনা দিয়ে আমরা রাত পৌনে একটায় বাড়ি পৌছালাম। তখন ফুটফুটে জ্যোৎস্না। দুমকা রোডটা চক্‌চক্ করছিল। কোন কোন গাড়ি থেকে গানও শোনা যাচ্ছিল। এমন করে যাবার দিন হয়ে এল। তারপর আমরা জিনিস পত্তর নিয়ে আবার সেই একঘেঁয়ে কোলকাতায় পৌছালাম।

"খরগোশের চোখ"

(পুরনো গল্প)

গোপা ব্যানার্জী

গ্রাহক নং ২৮৮ বয়স ১৫ বছর

এক সময় মাছেদের রাজার ভারি অসুখ করেছিল, কত ডাক্তার এল, কিন্তু কেউই রাজার রোগ সারাতে পারল না।

একদিন যখন মাছেরা রাজার এই অসুখ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলছিল তখন একটা কচ্ছপ হঠাৎ তাদের সামনে এল, সে এসে বলল, 'আমি রাজার রোগ এক নিমেষে সারিয়ে দিতে পারি, মহারাজ যদি একটি জীবন্ত খরগোশের চক্ষু গিলে ফেলতে পারেন তবেই তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হবেন।' বাস্তবিকপক্ষে কচ্ছপের এ বিষয়ে কোন জ্ঞানই ছিল না; সে কেবলমাত্র নিজের জ্ঞান জাহির করিবার জন্য এ কথা বলেছিল।

মাছেদের মধ্যে একজন ছিল রাজার মন্ত্রীর পুত্র, সে এই কথা শুনেই তার বাবাকে গিয়ে বলল, ক্রমে কথাটা রাজার কানে উঠল, রাজা তৎক্ষণাৎ সেই কচ্ছপকে নিয়ে আসতে আদেশ করলেন, মহারাজের দূত গিয়ে কচ্ছপকে একথা জানাল, কচ্ছপ তো রাজার কাছে যেতে হবে শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, অবশেষে সে যেতে বাধ্য হল।

মহারাজ রাজপ্রাসাদের খাটের উপর শুয়েছিলেন এবং ডাক্তারেরা তাঁর চারিদিকে জমা হয়েছিল, দূতগণ কচ্ছপকে সেখানে নিয়ে এল, মহারাজ কচ্ছপকে দেখে দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি সত্যি যে জীবন্ত খরগোশের চোখ গিললে আমি সুস্থ হব?' কচ্ছপ মাথা নাড়ল।

'তাহলে এক্ষুণি একটা জীবন্ত খরগোশকে নিয়ে এস' রাজা কচ্ছপকে আদেশ করলেন। কচ্ছপ তো শুনেই হতাশ হয়ে পড়ল। সে কোত্থেকে খরগোশ আনবে? হঠাৎ তার মনে পড়ল সে একদিন সমুদ্রতীরবর্তী পাহাড়ে একটা খরগোশকে দেখেছিল, সেই খরগোশটাকেই নিয়ে আসবে ভেবে সে যাত্রা করল।

পাহাড়ের উপর উঠে কচ্ছপটা দেখল সেই খরগোশটা পাহাড়ে বসে আছে, তাকে দেখে খরগোশ জিজ্ঞেস করল, 'ভাই কচ্ছপ, তুমি এই পাহাড়ে কি করছ?' কচ্ছপ বলল, 'আমি এখানে এসেছি সবুজ পৃথিবীর চারিদিক দেখ্‌তে।'

'তা তোমার কেমন লাগছে?'—

'খুব খারাপ নয়' কচ্ছপ উত্তর দিল, 'তবে এই সমুদ্রের নিচে গেলে তুমি আরও সুন্দর বাগান ও প্রাসাদ দেখতে পেতে,' এই বলে কচ্ছপ এমন সুন্দর সুন্দর জিনিসের কথা বলতে লাগল যে খরগোশের ভীষণ যাবার ইচ্ছা হল, কচ্ছপ তখন তাকে পিঠে করে সমুদ্রের নিচে নিয়ে যাবে বলল এবং খরগোশ তাতেই রাজি হল।

কচ্ছপের পিঠে চড়ে খরগোশ নিচে আসতে লাগল। জলের নিচে সুন্দর বাগান ও প্রাসাদ দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল, কচ্ছপ খরগোশকে মাছেদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে রাখল এবং একটু অপেক্ষা করলেই সে সুন্দর রাজাকে দেখতে পাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাইরে গেল। এই সময় খরগোশ শুনতে পেল যে দুটো মাছ ফিসফিস করে বলছে যে তার চক্ষু উপড়ে নিয়ে রাজার রোগ সারাবার জন্যই তাকে এখানে আনা হয়েছে। এ কথা শুনে খরগোশ ভীষণ ভয় পেয়ে গেল—কোথায় পালাবে বুঝতে পারল না।

ইতিমধ্যে কচ্ছপ মন্ত্রীকে নিয়ে ফিরে এল, তাদের দেখে খরগোশ বলতে লাগল, 'ভাল মশাই, আমি এখানে এসে খুব আনন্দ পেয়েছি, তবে যদি আমার আসল চক্ষু দুইটি নিয়ে আসতাম তবে আরও ভালভাবে দেখতে পেতাম। কারণ এখন আমার যে চোখ দুটো দেখছেন তা কাঁচের চোখ।' এই কথা শুনে কচ্ছপ ও মন্ত্রী ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ল। কচ্ছপ বলল, 'ঠিক আছে, আমি তোমাকে তীরে পৌঁছে দিচ্ছি তুমি তোমার আসল চোখ দুটো নিয়ে আবার ফিরে এস।' খরগোশ এতে রাজি হল, কচ্ছপ তখন তাকে তীরে নিয়ে এল। খরগোশ কচ্ছপের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে দ্রুত পাহাড়ের ওদিকে চলে গেল। কচ্ছপ কতদিন অপেক্ষা করল কিন্তু খরগোশ আর ফিরল না।

মাইহার ভ্রমণ

নিশীথ রঞ্জন গুহ

গ্রাহক নং—১৬০৩ বয়স—১৩

বাসন্তীপূজার ছুটি উপলক্ষ্যে রাম নবমীর দিন আমাদের মাইহারে 'সারদাদেবী'র মন্দির দেখতে যাওয়া ঠিক হলো। মাইহার সাতনা থেকে (মধ্য প্রদেশের একটি জেলা) ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত। বিখ্যাত সেতার বাদক আলি আকবর খাঁর পিতাজী বিখ্যাত স্বরোদ বাদক আলাউদ্দীন খান মাইহারে থাকেন। মন্দির দেখার আনন্দে ও ওস্তাদজীকে দেখার আনন্দে আমরা ভাই-বোনেরা অধীর হয়ে উঠলাম। নবমীর দিন সকাল ৯টার সময় মা, বাবা, আমরা ৫ ভাই বোন ও আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ ৫ জন অবাঙ্গালী বন্ধু মিলে জীপে করে রওনা হলাম। রাস্তাটা সুন্দর, বাঁধানো, দু'দিকে আম ও তেঁতুলের বড় বড় গাছ। কয়েকটা গ্রাম পেরিয়ে অসমতল উঁচু নিচু রাস্তা পার হয়ে বেলা প্রায় ১১টার সময় 'মাইহার' এসে পৌঁছালাম, 'সারদা দেবী' খুব জাগ্রত দেবী ব'লে এখানে মানে। রামনবমী উপলক্ষ্যে খুব বড় মেলা ব'সেছে। যেমন গরম তেমনি ভিড়। মন্দিরটা পাহাড়ের একেবারে উপরে অবস্থিত। ৩৬৫টি সিঁড়ি বেয়ে উঠলে তার মন্দিরে পৌঁছানো যায়। কি ভীষণ উঁচু না দেখলে ধারণা করা যায় না। মন্দিরের নিচে পৌঁছে দেখি ছোট বড় সব যাত্রীরা 'জয় সারদা দেবী কি জয়' ধ্বনি দিতে দিতে

কেউ উঠছে কেউ নামছে। কেউ কেউ অর্ধেক উঠে আর উঠতে পারছে না বলে কাঁদছে, আবার কেউ কেউ তাদের প্রবোধ বাক্য দিয়ে উঠতে প্ররোচনা দিচ্ছে। মন্দিরের চারদিকে আমাদের জীপটা ৩ বার ঘুরে মাত্র শেষ দাগ উপরে ওঠার সিঁড়ির নিচে এসে থামল। এর উপরে আর কোন গাড়ি যেতে পারে না। তখনও মন্দিরে যেতে ৬৫ সিঁড়ি বাকী। অনেক মুস্কিলে তো উপরে উঠে দেবীদর্শন হ'লো। আমাদের ঐ ক'টা সিঁড়ি উঠতেই কাহিল অবস্থা, আর যারা একদম সিঁড়ির নিচে থেকে উঠছে তাদের অবস্থা ভাব! পাহাড়ের উপর অমন সুন্দর মন্দির কি ক'রে সম্ভব হ'লো, না দেখলে ধারণা করা যায় না। আমরা ১০ পয়সা দিয়ে দিয়ে এক একজন জল খেলাম এক এক গ্লাস। বুন্দেলখণ্ডের দুজন বিখ্যাত বীরের নাম শুনে থাকবে, আলা আর উদল। তাঁদের আখড়া দেখলাম। যদি তোমরা কখনও এদিকে আস তবে দেখতে পাবে। চমৎকার দৃশ্য। মাইহারের মহারাজার দুর্গ, রাজবাড়ি ইত্যাদি দেখে ফেরার পথে ওস্তাদজীর ওখানে যাবার কথা ছিলো, কিন্তু তিনি অসুস্থ থাকায় দেখা হ'ল না। আমরা তখন ক্ষুণ্নমনে 'বিশ্রামগৃহে' এসে খাওয়া দাওয়া সেরে বিকেল প্রায় ৪টার সময় বাড়ি এসে পৌঁছালাম।
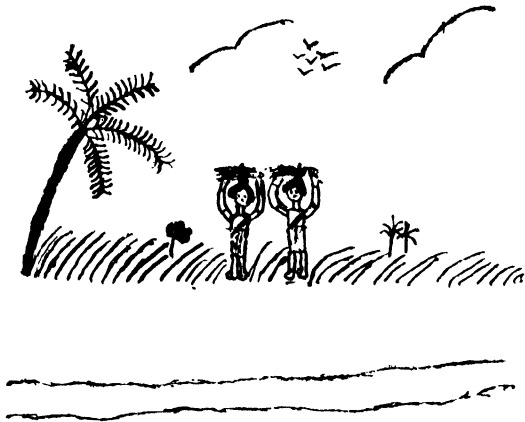
হাটের পথে

বিপাশা দত্ত

গ্রাহক সংখ্যা—৮৯০, বয়স ৬২ বছর
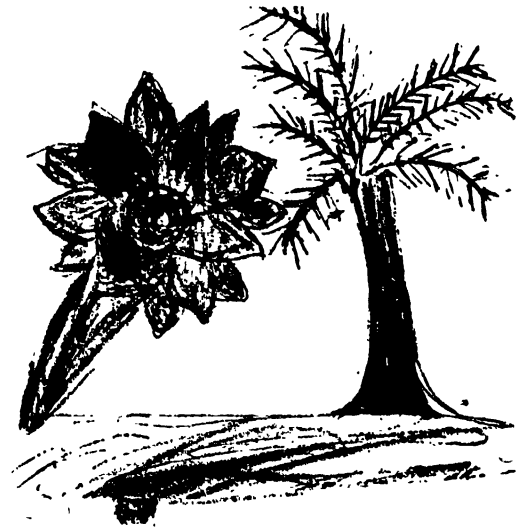
ফুল গাছ

মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রাহক নং ১৪০১—বয়স ৭ বছর

খুকুর দুধ খাওয়া

নীতীশ রঞ্জন গুহ

গ্রাহক সংখ্যা ১৬০৩—বয়স ১১ বছর

গ্রাম
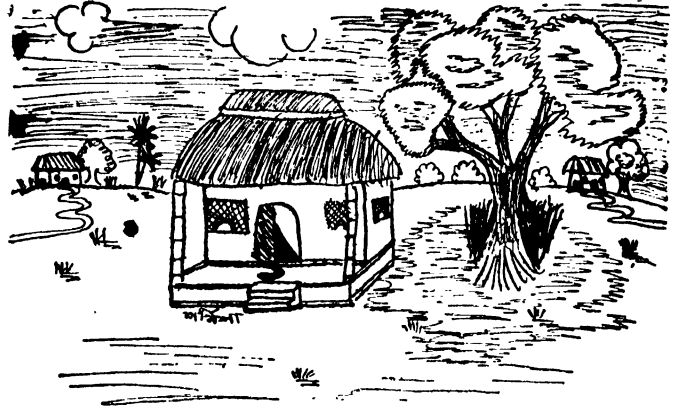
শর্মিলা বিশ্বাস

গ্রাহক সংখ্যা ১৮৭৮—বয়স ৯ বছর

(এই ছবিটি ভুল করে আষাঢ়মাসে তাপসী রায়ের নামে ছাপা হয়েছিল)

খুকু ও বোন

সোনালী চৌধুরী

গ্রাহক সংখ্যা ১৭০৪—বয়স ১৪ বছর

তাপসী রায়

গ্রাহক সংখ্যা ২০৫৩—বয়স ১৩ বছর

অজয় হোম

ফুটবল

তোমরা ইংরেজি বইতে কোনো পুরোনো কালের গল্পের আরম্ভে পড়ো 'ওয়ান্স আপ অন এ টাইম…।' কলকাতার ফুটবল আর কয়েক বছর বাদে হয়ে যাবে 'ওয়ান্স আপ অন এ টাইম'। কলকাতায় ফুটবল খেলা হতো এবং সে-খেলার মান ছিল খুবই উঁচু। ভারতবর্ষের নানাস্থান থেকে আইএফএ শীল্ডে যোগ দেবার জন্যে বহু দল আসত। এই কলকাতার মাঠে খেলার জন্যে বাইরের খেলোয়াড়দের আশা উদ্দীপনা সম্বৎসর ধরেই চলত। কলকাতার গ্যালারি ঘেরা মাঠে একবার নামতে পারলে নিজেদের জীবন ধন্য বলে মনে করত।

এ সবই বছর দশেক আগের কথা। কিন্তু গত দশ বছরে ফুটবলের যে হাল হয়েছে তাতে আগামী দশ বছরও লাগবে না, তার আগেই কলকাতার ফুটবল শেষ হয়ে যাবে। গল্পকথায় পরিণত হবে। কারণ, ফুটবলকে বাঁচিয়ে রাখার মতো খেলোয়াড় আজ আর তৈরি হচ্ছে না। দশ বছর আগেকার খেলোয়াড়দের ছায়াও খুঁজে পাওয়া যায় না আজকের কোনো খেলোয়াড়ের মধ্যে। খেলা হয় শুধু কর্তৃপক্ষদের।

ফুটবলের কোনো আকর্ষণ আজ আর মানুষের মনে নেই। কোনো চায়ের টেবিলে ফুটবল নিয়ে তুফান বা সরব আলোচনা তর্ক আর শোনা যায় না। রক আড্ডাখানা বা ক্লাবের কথা ছেড়েই দিলাম। এখন মাঠেই যেতে ইচ্ছে করে না। আগে একদিন না গেলে মনে হতো দিনটা বৃথা গেল।

ফুটবলের প্রতি অদম্য আকর্ষণ কেন কমতে আরম্ভ করেছে তা একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাই

রিটার্ন লীগ তুলে একক লীগ চালু করাতেই এই অবস্থায় পৌঁছাবার একটি প্রধান কারণ। বছর পার হয়ে যায় লীগ ও শীল্ডের খেলা শেষ হয় না। বাইরের দল আজকাল আর বিশেষ কেউ আসতে চায় না, কলকাতার আবহাওয়া দূষিত বলে।

ভারতের প্রাচীনতম প্রতিযোগিতা কলকাতার আইএফএ শীল্ডের কদর কমে যাচ্ছে। আজকাল ডুরাণ্ড রোভার্স খেলতে যায় বহু দল। ডিসি এম খেলতেও কিছু কম দল যাচ্ছে না। এমনকি আসামের বরদলৈ ট্রফি এবং পাটনার শ্রীকৃষ্ণ গোল্ড কাপেও বাইরের বিভিন্ন দল খেলতে যায়। কারণ, বাইরের দলের ভয় এবং বিশ্বাস কলকাতায় নিরাপত্তার অভাব, যে কোনো মুহূর্তে দর্শকদের হাতে নিগৃহীত হওয়ার আশংকা, কলকাতায় ন্যায় বিচার হয় না, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যেনতেন প্রকারে কলকাতাতেই শীল্ড রাখার চেষ্টা করেন। বছর পনের আগে একবার বাইরের দল ইণ্ডিয়া কালচার লীগ ট্রফি পেয়েছিল। তারপর থেকে শীল্ড এখানকার কয়েকটা দলের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে।

কার স্বার্থে একক লীগ চালু হল? কার স্বার্থে ওঠানামা রদ হল? এই একক লীগের জন্যে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের সভ্যসংখ্যা কমে যাচ্ছে। আগে সভ্য হবার জন্যে কত হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। এখন শোনা যাচ্ছে বহু সভ্য সভ্যকার্ড রিনিউ করেন নি।

বর্তমান আইএফএর নিয়মশৃঙ্খলা এবং প্রতিযোগিতা চালানোর ব্যবস্থাও খুব ঢিলেঢালা। বিশেষ গোষ্ঠীচক্রের জন্যে এই অব্যবস্থা ও অশান্তি।

এবছর গণ্ডগোল হচ্ছে মহমেডান স্পোর্টিংকে ঘিরেই। গত ইস্টবেঙ্গল-মহমেডানের খেলায় যা হল তা কলকাতার খেলার ইতিহাসে কখনও দেখা যায় নি। ১৭ মিনিট খেলা চলার পর মহমেডানের অধিনায়ককে রেফারি ন্যায়সঙ্গত কারণে গুরুতর অপরাধে নির্দেশ দেন মার্চিং অর্ডার অর্থাৎ মাঠের বাইরে যাবার। অধিনায়ক লতিফ সে আদেশ তো পালনই করেন না, উল্টে গালিগালাজ করেন, এমন কি রেফারির পেটে ঘুঁষি পর্যন্ত মারেন।

কোন খেলোয়াড় বা ক্লাবের রেফারির দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তিকর প্রতিবাদ করা চলে না। রেফারি ভুল করতে পারেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে একমাত্র আইএফএ। দর্শক বা খেলোয়াড়রা নয়। রেফারি ভুল সিদ্ধান্ত করলেও খেলা পুনরায় আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর পূর্বের সিদ্ধান্ত বদল করতে পারেন। হাওড়া ইউনিয়ন ও মহমেডানের খেলায় তাইই হয়েছিল। প্রথমে রেফারি গোল হওয়াটা গ্রাহ্য করেন নি, পরে লাইনসম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করে গোলের নির্দেশ দেন। আইনমতই কাজ তিনি করেন।

একক লীগ প্রায় সমাপ্তির মুখে। সুপার লীগে মহমেডানের খেলার কোনো আশাই নেই। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের পর বাকি ঠিক কোন তিন দল খেলবে বলা শক্ত। তবে পোর্টকমিশনার্স, ইস্টার্ণ রেল খেলবে বলেই মনে হয় বাকি একটি দল ঠিক হবে বিএনআর বাটা আর ওয়াড়ির মধ্যে।

ক্রিকেট

তোমরা যারা ক্রিকেটের খবর রাখো তারা নিশ্চয়ই জানো এককালের এক নম্বর দল ওয়েস্ট

ইণ্ডিজ দল ইংল্যণ্ড সফর করছে। দুটো টেস্ট হয়ে গেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আগের শক্তি আর নেই। ১৬ জন খেলোয়াড়দের মধ্যে ৮ জনই আনকোরা নতুন। ইংল্যণ্ডের মাঠ ও বৃষ্টি সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই।

অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারার পর এখন দু'নম্বরী দল। ইংল্যণ্ডের কাছে বর্তমানে প্রথম টেস্টে হেরে দ্বিতীয়তে হারতে হারতে বেঁচে ৩ নম্বরীতে পৌঁছছে। ইংল্যণ্ডেরও শক্তি বিশেষ নেই অধিনায়ক কলিন কাউড্রের পায়ে চোট হাসপাতালে, কলিন মিলবার্ন মোটর দুর্ঘটনায় হীন, প্রথম টেস্টের হিরো—টম গ্রেভনির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। তা সত্ত্বেও ইংল্যণ্ড নতুন অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থ যাঁকে দল থেকেই বাতিল বলে ধরা হয়েছিল তিনিই সম্মান রাখলেন প্রথম টেস্ট জিতে এবং দ্বিতীয় টেস্ট্ ড্র ও নিজে সেঞ্চুরি করে।

দ্বিতীয় টেস্ট ইংল্যণ্ড জিততে পারে নি ৩৭ রানের জন্য। ৫ ঘণ্টা সময়ে ৩৩২ রান এমন কিছু শক্ত নয়! সাড়ে ৪ ঘণ্টায় বয়কটের সেঞ্চুরি এবং ২ ঘণ্টায় পারফিটের ৩৯ মন্থরগতি রানের জন্যে জয়লাভ সম্ভবপর হয়নি। রাবারের মীমাংসা এই টেস্টেই হয়ে যেতে পারত।

দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খুবই ভালো খেলেছে। সোবার্স যেভাবে খেলেছেন তাতে মনে হয় আগামী টেস্টে তিনি তাঁর হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করবেন। নতুনদের মধ্যে শিলিংফোর্ড, হোল্ডার, ফিণ্ডলে ও ফ্রেডারিক আগামী দিনের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হয়ে দাঁড়াবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

টেনিস

উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারত থেকে যাঁরা খেলতে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এক প্রেমজিতলাল ছাড়া কেউ দাঁড়াতেই পারেন নি। গতবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন অ্যামেচার ও প্রোফেশনাল টেনিস শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় রড লেভার দ্বিতীয় রাউণ্ডে প্রেমজিতের কাছে পরপর দু'সেট হেরে শেষে দম এবং দৃঢ়তার সঙ্গে অভিজ্ঞতা মিশিয়ে খেলে বাকি ৩টি সেট জেতেন। প্রেমজিতলাল প্রথম দুই সেট অপূর্ব খেলেন। তাঁর লং ও ভলি মার খুবই সুন্দর হয়। ফলাফল—৩-৬, ৪-৬; ৬-৩, ৬-০ এবং রড লেভার এবছর নিউকোম্বকে পরাজিত করে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হলেন।

(উত্তর দেবার শেষ দিন ৩০শে অগস্ট্)

(১)

'অসমসাহসে' তার প্রথমটি পাবে,
'কাপুরুষতার' মাঝে দেখা নাহি যাবে।
'বন্দেমাতরম' মাঝে দ্বিতীয়কে পাই,
'জিন্দাবাদ মুর্দাবাদে' প্রয়োজন নাই।
'শস্য শ্যামলে' পাই তৃতীয় অক্ষর
কভু নাহি মিলে খুঁজে 'মরু প্রান্তর।'
সুস্বাদু ও হিতকারী, প্রিয় সবাকার,
তিনে মিলে আমাদের অতি আপনার।

(২)

বাড়ির সামনেই পাহাড়, অঞ্জন বহুবার তার চূড়োয় উঠেছে। উঠবার সময় তার গড় গতিবেগ থাকে ঘণ্টায় দুই মাইল, কিন্তু নামবার সময়ে সে গড় ছয় মাইল ঘণ্টায় বেগে নেমে আসতে পারে। যদি অঞ্জন ওপরে একটুও না দাঁড়িয়ে, সোজা চূড়োয় উঠেই তক্ষুণি নেমে আসে, তাহলে তার ওঠানামার গড় গতিবেগ কত হবে?

(৩)

দাদুর ডায়রিটা আমার ছয়মাসী এ-ওর কাছে নিয়ে পড়ছিলেন ; শেষ পর্যন্ত যে সেটা কার কাছে আছে তা খোঁজ করা দরকার।

মাসীরা আবার থাকেন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে—খড়্গপুর থেকে কানপুর, শিলচর থেকে পাঠানকোট আর নাসিক থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত!

অগত্যা ডাকবিভাগের উপর নির্ভর করতে হল। কিন্তু মাসীরা এমন সব অস্পষ্ট জবাব দিলেন যে-তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেলাম।

শিলচরের শান্তামাসী লিখেছেন—নান্ত ছাড়া সবাইত আমাকে কোন না কোন সময়ে ডায়রিটা পাঠিয়েছিল কিন্তু আমি আবার তাদের কাছেই ফেরত দিয়েছিলাম।

নাসিকের নাস্তুমাসীর চিঠি—শান্তা ছাড়া সবাই হয় আমাকে ডায়রি পাঠিয়ে ছিল, নয়ত আমি তাদের পাঠিয়েছিলাম। তুমি বরং মাস্তুকে চিঠি লেখ।'

মান্দ্রাজ থেকে মাস্তুমাসী জানালেন—'আমি ওটা একবার কান্তাকে আর একবার পান্তিকে পাঠিয়েছি, কিন্তু তারা কেউ আমার কাছে ডায়রিটা ফেরায়নি। ক্ষান্তির সঙ্গে আমার কোনরকম লেনদেন হয়নি।

তোমরা কি বলতে পার এখন ডায়রিটা কার কাছে আছে?

কি করে বুঝলে সেটা ভাল করে বুঝিয়ে বল।

আষাঢ় মাসের ধাঁধাঁর উত্তর

(১)

১ম্ প্রশ্ন—রাষ্ট্রকে কি দেবে নাগরিক দল?
২য় প্রশ্ন—গভীর সাগরে কি না পাই বল?
৩য় প্রশ্ন—জ্যৈষ্ঠমাস কোথা বল দেখি ভাই?
৪র্থ প্রশ্ন—কোন মোরব্বায় উপকার পাই?
৫ম্ প্রশ্ন—সাধুজনে কোন নীতি মেনে চলে?
ষষ্ঠ প্রশ্ন—'সম্পূর্ণ আয়ত্ত' বোঝাব কি বলে?

× × ×

একটি ছত্রে বলে দেওয়া যায়—

উত্তর—	১ম্	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম্
	কর	তল	গত	আমলকী	ন্যায়

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর।

(২)

খোকা মোট ১৫টী পেয়ারা পেড়েছিল।

খোকা নিজে মাত্র একটী পেয়ারা খেতে পেয়েছিল এবং তার ঠিক আগেই সে খুকুকে দিয়েছিল আধখানা পেয়ারা ফাউ এবং তখন যা মোট পেয়ারা ছিল তার অর্ধেক।

তার মানে খুকু পেয়েছিল ½ + ১½, তাহলে তখন মোট ছিল ৩। এইভাবে উল্টোদিক থেকে হিসাব করে গেলে সহজেই সংখ্যাটা বেরিয়ে আসবে।

(৩)

আষাঢ় মাসের তৃতীয় ধাঁধাটায় একটুখানি ছাপার ভুল থাকার জন্য তার উত্তর জানানো হল না। ধাঁধাটা তোমাদের মনে আছে ত? না হলে সন্দেশে আবার দেখে নাও।

আর সবই ঠিক আছে। (১) দিনু (২) বিনু এবং (৪) চিনুর কথাও ঠিক আছে, কেবল (৩) মিনুর কথাটী একটু ভুল ছাপা হয়েছে। তৃতীয় মিনু দুটো সাদা বল বার করে, নিজের থলির লেবেল দেখে

বলেছিল—বাকি বলটা যে কি তাত আমি মোটেই বুঝতে পারছি না! এবারে চেষ্টা করে দেখত তোমরা উত্তর দিতে পার কিনা।

জ্যৈষ্ঠমাসের ধাঁধার উত্তর দাতাদের নাম—যাদের সব কয়টি উত্তর ঠিক ঃ—

১ দীপংকর বসু, ৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ৬৫ সঞ্জয় ও সুজয় রায়, ১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ২৮৮ গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ৪০৩ বুদ্ধদেব ও পারমিতা নিয়োগী, ৬১৬ ভারতী মিত্র, ৬৯৩ ঋত্বিক গুপ্ত, ৮৩৮ সুপ্রতীক বাগচী, ৮৯৪ তপন ঘোষ, ৯৬২ অঞ্জন ও কুমকুম ভট্টাচার্য, ৯৮৩ জ্যোতির্ময়, ইন্দ্রাণী ও ঈশানী মজুমদার, ১১৫৯ গায়ত্রী রায়, ১২১৩ সুগত, স্বাতী ও সোমা ঘোষ, ১২৩২ নন্দিনী দত্ত মজুমদার, ১২৫১ শর্মিলা সেন, ১২৯২ সুজাতা ও সুবীর ঘোষ, ১২৯৮ রুদ্রনাথ ঘোষদস্তিদার, ১৩১৪ অরুণা ঘোষ, ১৩৩৬ শ্রীলতা চৌধুরী, ১৩৬১ অনন্যা সরকার, ১৩৭২ বসন্তকুমার মেমোরিয়াল রুর‍্যাল লাইব্রেরি, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৪৮১ উত্তমকুমার বটব্যাল, ১৫১৪ রমিতা পাল, ১৫১৮ নূপুর দাশগুপ্ত, ১৫৮২ জবা রায়, ১৬১৩ ভারতী ও অভিজিৎ দে, ১৬১৫ পথিকৃৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭৮৮ পলাশবরণ পাল, ১৭৯২ মলয়া পাল, ১৮২৭ অশোক ও অনুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ২০৬৬ মিলিন্দ চক্রবর্তী, ২০৭২ মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১৭০ অম্লান ভট্টাচার্য, ২২৩৯ অনীতা ও প্রণব চট্টোপাধ্যায়, ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায়, ২৩০৪ শুভব্রত মুখোপাধ্যায়, ২৩১০ ভাস্করজ্যোতি ও প্রজ্ঞাপারমিতা বসু, ২৩৩২ দেবাশিস মৈত্র, ২৩৫৬ রঞ্জিণী রায় চৌধুরী, ২৩৯৬ চিন্ময় ভট্টাচার্য, ২৪৪১ দেবোপম চক্রবর্তী, ২৪৫৬ অতীশ কুমার সেন, ২৪৬৭ মহাশ্বেতা ও অমিতবিক্রম ঘোষ, ২৫৪৪ সান্ত্বনা রায় চৌধুরী, ২৫৬২ সিদ্ধার্থ রায়, ২৫৬৩ হেদায়েতুল্লাহ, ২৫৬৭ প্রবীর কুমার সিংহ, ২৫৯০ সোমনাথ মুখার্জি, ২৬১২ চৈতালি সান্যাল, ২৬২৯ চিত্রাঙ্গদা ও চৈতালি বসু, ২৬৩৬ অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, ২৭৬৩ সব্যসাচী ও শর্মিলা বসু, ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত, ২৮২৮ অস্মিতা সেনগুপ্ত, ২৮৩৭ অর্পিতা রায় চৌধুরী।

যাদের একটি প্রায় ঠিক আর দুইটি ঠিক হয়েছে—

২১ শর্মিষ্ঠা রায়, ৭২ শর্মিলা ও পার্থসারথি বসু, ১১৫ অর্পিতা, কিশলয় ও কিশোর চক্রবর্তী, ১২৪ দীপঙ্কর ও রুমা মজুমদার, ১৭৫ অনিতা রায়, ২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ২৯৫ শম্পা ও শর্মিলা দত্ত, ৩৪০ পূরবী চক্রবর্তী, ৩৮০ সৌগত চট্টোপাধ্যায়, ৮৭০ শান্তনু, সুতপা ও শম্পা চক্রবর্তী, ৮৮৯ প্রেমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১২২০ বিপ্রবুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়, ১৪২৫ মিত্রা রায় চৌধুরী, ১৪৬২ স্বপ্না ও মৃণাল মজুমদার, ১৫২৪ শুভাশীষ ও প্রেমাশীষ বরাট, ১৫৩৬ বাপ্পাদিত্য দেব, ১৫৬৭ দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় ও জয়দীপ ভট্টাচার্য, ১৫৯৭ বিচিত্র কুমার গুহ, ১৬১৯ অঞ্জন ও অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬৫১ হাম্বির মজুমদার, ১৬৫৫ শৃণ্বন্তী পাল, ১৭৯০ জয়িতা ও সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮০৫ দেবাশীষ রক্ষিত, ১৮৬৩ সোনালী লাহিড়ী, ১৮৮৫ রীনা ও হেনা ভট্টাচার্য, ১৮৯৪ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২০২৯ শুভ্রা বিশ্বাস, ২০৪১ কুমার রায়, ২০৫০ পবিত্র কুমার বসু, ২৯৫৩ জয়ন্ত, তাপস, গীতা ও রাধেশ্যাম রায়, ২০৯৩ দেবাশীস দত্ত ২১৪২ স্বর্ণাভ ব্যানার্জী, ২১৫২ সুরজিৎ, অনুপা ও সিপ্রা কর-পুরকায়স্থ, ২১৭৪ শিবরঞ্জিনী মাইতি, ২১৭৫ বাণী সরকার, ২২১৫ শুভা মজুমদার, ২২২৫ শ্যামাপ্রসাদ দাস, ২২৪৮ দেবকুমার, মিহির

কুমার ও শৈবাল কুমার গুহ, ২২৬১ অরুন্ধতী ব্যানার্জী, ২২৭০ ব্রততী সেন, ২২৯৪ সুনন্দন চক্রবর্তী, ২৩০৫ অরূপ দত্ত গুপ্ত, ২৩৪৪ বংশীধারী কর, ২৩৮২ অনামিকা ও বিদ্যুৎ সাহা, ২৪১০ ঋত্বিক সান্যাল, ২৪২২ অতীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, ২৪৬৬ অর্ধেন্দু ও মমতাময়ী কর্মকার, ২৪৯৬ স্মরজিৎ কুমার দে, ২৫৪২ তন্ময় সেন গুপ্ত ও সুব্রত দত্ত, ২৫৪৫ বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত, ২৫৮১ অভীক কুমার ভট্টাচার্য, ২৭০৯ শঙ্কর ঘোষ, ২৭৩৫ উৎপল ও সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য, ২৭৪০ সোনালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাদের দুইটি উত্তর ঠিক হয়েছে ঃ—

২২৬ জয়ন্ত ও প্রবাল নন্দীরায়, ১০৩৮ কাবেরী মণ্ডল, ২০২৩ উজ্জ্বল কুমার চক্রবর্তী, ২০৪০ সন্দীপন দেব, ২১০০ আশীষ ভট্টাচার্য, ২১৫৯ স্বাহা ও শুভংকর বাগচী, ২১৯৬ মিঠু, কুকাই ও বিলু ঘোষ, ২২০২ শুভাশীষ ও দেবাশীষ ধর, ২২৮৭ সঙ্ঘমিত্রা চক্রবর্তী, ২৩৭১ নন্দিতা, সুমন্ত্র ও সুমিত সেনগুপ্ত, ২৩৮০ মুকুল দাশ, ২৩৯৩ মোহাম্মদ আমির উদ্দীন চৌধুরী, ২৩৯৭ বুলবুল, মানবেন্দ্র ও অরবিন্দ মজুমদার, ২৪৫৪ তপন সাহা, চঞ্চল হিন্দু হোস্টেল, ২৫৫৭ বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়, ২৬২৮ রঞ্জন ব্যানার্জী, ২৬৩১ সুতপা বিশ্বাস, ২৬৭৪ অমিত বাগচী, ২৬৭৬ শুদ্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ও শর্মিলা মুখার্জী, একটি নামধামহীন গ্রাহক (সে হাতপাকাবার আসরের জন্য 'এপ্রিল ফুল' নামে একটি নামধামহীন লেখাও পাঠিয়েছ। কে তুমি ?)

একটি উত্তর ঠিক ঃ—

১৯০২ অভিজিৎ চৌধুরী, ১৯৯৪ মালা রায়, ২৩০৬ সুজিত ও প্রতিমা নন্দী, ২৪০৫ সুরীতা মিত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—(১) যারা 'নতুন গ্রাহক' লিখেছিলে সকলের নম্বর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, লক্ষ্য করে দেখো। যাদের উত্তর পেয়েছি, সকলেরই নাম ছাপা হল। কারো নাম বাদ পড়ে থাকলে জেনো যে কোন কারণে উত্তরটা আমাদের হাতে আসেনি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—(২) আষাঢ় মাসের ধাঁধার উত্তর দাতাদের নাম শারদীয়া সংখ্যায় বেরোবে।

তোমরা কে ধাঁধার উত্তরের সঙ্গে 'বিচিত্র রাত' নামে একটা মজার চোরের গল্প পাঠিয়েছিলে সেটা পত্রপাঠ জানিও। লেখার মধ্যে নাম ধাম নেই!

হাত পাকাবার আসরের ধাঁধার উত্তর – উদয়ন মুখোপাধ্যায়—গ্রাঃ নং ২২৫৭, বয়স ১১

২	৬	৭
১	৫	৯
৮	৩	৪

উত্তমকুমার বটব্যাল—গ্রাঃ নং ১৪৮১, বয়স ১১২

(১) লবঙ্গ। (২) সুকুমার রায়।

সুখলতা স্মরণে

(১)

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ব্যাকুল বৃষ্টির দিন, তুমি নেই,
কে লিখবে ছড়া
ছোটদের মন নিয়ে সবুজ
স্বপ্ন দিয়ে গড়া।

তুমি নেই, তবু মন তোমার
স্মৃতিতে আছে ভরে
তোমার কবিতা ছবি ছড়া আর
'গল্পের নির্ঝরে!

(২)

রতন কুমার দে

তুমি নেই যেই শুনেছি খবর, ভেবেছি একটি কথা—
শিশুরা হারাল আর এক মা'য়েরে নাম তার 'সুখলতা'।…
কথা, গান, সুর, ছন্দ ছড়ায় অমৃত ছড়িয়ে তুমি—
গিয়েছ জীবনে।…মা' ছাড়া কি নামে ডাকবে বঙ্গভূমি ?…
মায়েরই মতন মহীয়সী তুমি গরিয়সী একজনা—
তুমি নেই মাগো, সন্তান মোরা দুঃখেতে আনমনা।…
যেখানেই যাও, যতদূর-লোকে তবু মোরা দিকে দিকে
চিরদিন ধরে পূজা করবই মায়ের মূর্তিটিকে।…

(৩)

উজ্জ্বল কুমার চক্রবর্ত্তী

গ্রাহক সংখ্যা ২০২৩ বয়স ১২½ বছর

যখন আমি ছোট ছিলাম
তখন আমি পড়েছিলাম
তোমার 'নিজে পড়ো',
সেই তুমি নেই আজ
ফুরিয়েছে সব কাজ
তুমি মম প্রণামখানি ধরো।

মেঘে আজি ঢাকা আকাশ
দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাতাস
বৃষ্টি কাঁদে কি সকরুণ রবে!
তবু তুমি নতুন সাজে
রবে মোদের মনের মাঝে
স্মৃতি তব, চিরঅক্ষয় হবে!

(১) **মণিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**, ১৩৪৮, বয়স ১৩

তোমার সন্দেশ ভালো লাগছে জেনে খুসি হলাম। গ্রাহক কার্ড পাবার জন্য সম্পাদককে চিঠি লিখতে হয়। তারপর কার্ড পাঠানো হয়। তবে মাঝে মাঝে ডাকে হারায়, তাই এখনো না পেয়ে থাকলে, আমাদের আপিসে আবার জানিও।

(২) তপনকুমার বসু, ১৫০১, বয়স ১৫

পত্রিকার নাম 'সন্দেশ' হয়ে ভালো হয় নি? প্রথম কথা, 'সন্দেশ' মানে 'খবর।' পত্রিকায় তা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় কথা, 'সন্দেশ' মানে একরকম মিষ্টি, পত্রিকাও সকলের সন্দেশের মতোই মিষ্টি লাগুক, এই ইচ্ছা। এ নাম সন্দেশের প্রথম সম্পাদক এবং প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৯১৩ সালে দিয়েছিলেন।

না, না, সবাই গ্রাহক কার্ড পায়। এখনো না পেয়ে থাকলে আমাদের আপিসে জানিও। নিশ্চয় হারিয়েছে।

গুপী গাইন বাঘা বাইন বইখানি সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদাদা উপেন্দ্রকিশোর প্রায় ৫৫ বছর আগে লিখেছিলেন। ছবি করার সময় প্রয়োজনমতো অদল-বদল ও সংযোজন করা হয়েছে। তাই অন্যরকম লাগছে।

(৩) **সতী দত্ত** ২৩৪৬, বয়স ১৪

তোমার শুভেচ্ছা পেয়ে আমরাও খুসি। কাজের মানুষ সময় পেলেই আবার গোয়েন্দা-কাহিনী লিখে দেবেন।

(৪) **শর্মিলা বিশ্বাস**, ১৮৭৮, বয়স ১০

গ্রাহক কার্ড এখনো না পেয়ে থাকলে জানিও।

পত্রবন্ধু চাই, শখ:—বই পড়া, নাটক লেখা, গান বাজনা। পত্রবন্ধুর নামে আমাদের আপিসের ঠিকানায় চিঠি দিও। আমরা পাঠিয়ে দেব। গুপী গাইন বাঘা বাইন প্রথম বছরের 'সন্দেশে' বেরিয়েছিল। আমাদের আপিসে কিনতে পাওয়া যায়, দাম মাত্র ১·০০। বাঁধানো কিনলে ২·২৫ প। অবশ্য সব সংখ্যাগুলি নেই। বই হয়েও বেরিয়েছে, দোকানে কিনতে পাবে।

(৫) **শুভাশিষ ধর**, ২২০২, বয়স দাওনি কেন ?

বিজ্ঞানের বিভাগের জন্য আমরা তোমাদের কাছে প্রশ্ন চেয়েছিলাম। কই তুমি পাঠালে না কেন ? এবার পাঠিও। বিভাগটি চালু হয়েছে দেখে খুসি হয়েছ ত ?

(৬) **মিত্রা রায়চৌধুরী**, ১৪২৫, বয়স ১৩

হ্যাঁ, গ্রাহকরা ১০% কম দামেই বই পাবে। 'মাকু' তিন বছর আগে বেরিয়েছিল। পুরনো সন্দেশের দাম তো পত্রিকাতেই দেওয়া থাকে। যদি পুরনো সন্দেশ কেনো, তার সব সংখ্যা আছে কি না, তাও দেখে নিও।

(৭) **মুক্তা মুখোপাধ্যায়**, ৭৮৬, বয়স ১৪

শহরে থাক বলে প্রকৃতি পড়ুয়া হতে পারছ না, সে আবার কেমন কথা ? প্রকৃতি তো শহরেও আছে। পাখি, পোকা, বেড়াল, কুকুর দেখ না ? একটা খুদে টবে একটা খুদে গাছ পুঁতে দেখই না কেমন বাড়ে। একজন একটা চ্যাপ্টা কাঁচের খোপে ছোলা পুঁতে, তার শেকড় কেমন করে বাড়ে তাও দেখে নিও। একজন একটা পুরনো পাথরের থালায় মাটি দিয়ে এত দুর্বাঘাস গজিয়ে ছিল যে তাদের বাড়িতে কোনো ব্যাপার হলে দুর্বাঘাসের জন্য ভাবতে হত না। একজন একটা ভাঙ্গা মাটির হাঁড়িতে পুঁই ডগা লাগিয়েছিল, বাড়ি সুদ্ধ সবাই পুঁই চচ্চড়ি খেয়ে সুখী হয়েছিল। তুমিও উঠে পড়ে লেগে যাও।

(৮) **তুহিন পাল চৌধুরী**, ২৪৩৮, বয়স ১২

না, ভাই, এর পর থেকে ঠিক সময়ই পত্রিকা পাবে, কোনো ভাবনার কারণ নেই। গ্রাহক কার্ড না পেয়ে থাকলে আবার আমাদের আপিসে দরখাস্ত কর। ধাঁধাটা কিন্তু বড়ই পুরনো। ঐ ধরণের ধাঁধা আমাদের পত্রিকাতেও বেরিয়েছে।

(৯) **পবিত্র কুমার বসু**, ২০৫০, বয়স ১৩½

সে কি ভাই, অতগুলো ভালো লেখা আছে বলছ, আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প নেই কেন বলে অনুযোগ করছ ? একসঙ্গে সব কি শেষ করতে আছে ? সবুরে মেওয়া ফলে।

(১০) **কুশলনাথ দত্ত**, ২০৬০, বয়স ১১

দ্বিতীয় পত্রিকাটি ফেরত দিয়েছ বলে খুসি হলাম। গণ্ডালুদের গল্প মাঝে মাঝে বেরোয় বৈ কি। তবে নলিনী দাশ একটা বড় কলেজের অধ্যক্ষা, তাঁর বেজায় কাজ, রোজ রোজ কি আর লিখবার সময় পান ?

(১১) **সুভাষ মিত্র, বিকাশ মিত্র, প্রকাশ মিত্র**, ২৪৭৩, বয়স ১৪, ১২, ৭

সত্যিই যিনি প্রফেসর শঙ্কুর গল্প লেখেন তাঁর অনেক কাজ। একটা ছবি তোলা চাট্টিখানিক কথা, ভাই। তার জন্য অনেক প্রস্তুতি চাই, অনেক লেখাপড়া, গান বাজনা তৈরি, অনেক পর্যবেক্ষণ, অনেক শেখানো পড়ানো। তারপর ছবি তোলার পরের কাজও খুব বেশি। অনেক কাটাই—ছাঁটাই, জোড়া-তালি, অনেক চিন্তা, অনেক পালিশ। তারপরেও কত হাঙ্গামা থাকে।

(১২) **শুভ্রা বিশ্বাস**, ২০২৯, বয়স ১৪

লেখা মনোনীত না হওয়াটা ঠিক দুর্ভাগ্য নয় ভাই। কোনো কারণে উপযুক্ত না হলে, তবেই লেখা মনোনীত হয় না। ভাগ্যের কথা ওঠেই না। যদি সত্যি ভালো লিখতে চাও, এখন থেকেই খুব খাটতে থাকো, দেখবে তার ফল কত ভালো হবে। তখন তোমাকে কিছু বলতে হবে না, সম্পাদকরা প্রকাশকরা তোমাকে সাধবে।

(১৩) **হেদায়েতুল্লাহ**, ২৫৬৩, বয়স ১৩

দেখ ভাই, তোমার কবিতাটি পড়লাম। তোমার ভাষা বেশ ভালো, কিন্তু ছেলেমানুষদের জন্যে কবিতা আরো ছেলেমানুষের মতো করে লিখলে ভালো হয় না? আরো লেখা পাঠাবে বলে আশা করে আছি।

(১৪) **অপরাজিতা বসু**, ১৮১৩, বয়স ১২

তোমার গল্প পেয়েছি। শহিদদের কথা তুমি নিজেই লিখে পাঠাও না কেন? ভালো বই, ভালো ছবি, যেখানে যা কিছু ভালো দেখবে, সর্বদা নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করার চেষ্টা করা, খুবই ভালো কথা।

(১৫) **শিখর রায়**, ২৭০৬, বয়স ১৪½

প্রথম বছরের বা আগের যে-কোনো বছরের সন্দেশের সবগুলি সংখ্যা না থাকলে, সর্বদা আমরা পত্রিকায় সে-কথা জানিয়ে দিই। তুমি নিশ্চয় পত্রিকাটি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখ নি, তা হলে জানতে পারতে সব সংখ্যা নেই। 'টং লিং' তো অনেক দিন আগেই বই হয়ে বেরিয়ে গেছে। দোকানে খোঁজ কর। 'পিকলুর ছোটকা'র বিষয়ও খোঁজ কর।

(১৬) **নন্দিতা, সুমন্ত্র, সুমিত সেন গুপ্ত**, ২৩৭১, বয়স ১২, ১১, ৭

পুরনো সন্দেশ কি কি পাওয়া যায়, এবং কোন বছরের কোন কোন সংখ্যা নেই, কোন বছরের সব আছে, তার সবিশেষ বিবরণী জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের সন্দেশে পাবে।

হাতপাকাবার আসরে লেখা বা আঁকা দিতে হলে, কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার করে লিখবে। একটা কপি রেখো, যাতে হারালে তোমাদের কাছে সেটা থাকে। ছবি একটু বড় করে এঁকো, যেমন ধর পোষ্ট কার্ডের মাপে। কুচি কুচি কাগজ পাঠালে বড় অসুবিধা হয়।

নন্দিতার পত্র বন্ধু চাই। শখ:—নাচ, গান, সেলাই, সাইকেল চড়া ও ডাকটিকিট সংগ্রহ করা।

(১৭) **নন্দিতা চৌধুরী**, ২২৮০, বয়স ১১

তোমার চাঁদা কবে ফুরোবে তোমার নিজেরই জানা উচিত। তোমার আশ্বিন মাস পর্যন্ত চাঁদা দেওয়া আছে। অক্টোবরে আবার পাঠিও।

আমাদের আপিসে লেখা থাকলেও, আমরা আশা করি তোমরা খেয়াল রাখবে কবে চাঁদা ফুরবে। পত্রবন্ধু চাই, শখ:—ছবি আঁকা, ডাকটিকিট ও মুদ্রা সংগ্রহ, বই পড়া। কি করে চিঠি দিতে হয় সেতো বলেইছি।

(১৮) **উজ্জ্বল কুমার চক্রবর্তী**, ২০২৩, বয়স ১২২

তোমার ছবিগুলি বেশ হয়েছে। দেখি কটি এবং কবে ছাপা যায়। সম্পাদকমশাই বিদেশে গেছেন, ফিরলে পর সিনেমা তৈরির যন্ত্রের বিষয়ে লেখার কথা মনে করিয়ে দেব।

(১৯) **হিমাদ্রি চৌধুরী**, ৮০৮, বয়স ১২২ বছর।

তোমার বুদ্ধি-দীপ্ত চিঠি পড়ে খুসি হলাম। শিল্পী হেমেন্দ্র মজুমদার মসূয়ার রায় বাড়ির নিকট আত্মীয়, সুতরাং রায়দের কথায় তাঁর কথা এসে পড়াই স্বাভাবিক। তিনি তোমার দাদু শুনে ভালো লাগল। আমাদের নিজেদের পত্রিকার ছোট খাটো বা বড় বড় ভুল ধরিয়ে দেওয়া তোমাদেরি কর্তব্য। বৈশাখে শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের নাটিকা 'বিবেকানন্দ'র নামটি সত্যিই আমাদের একজন কর্মীর অনবধানতাবশতঃ ভুল ছাপা হয়েছিল। সেজন্যে আমরা দুঃখিত।

কিন্তু বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তরের বিলম্বটা আমাদের অপরাধ নয়। সেজন্য তোমরাই দায়ী। ঠিক সময়ে প্রশ্ন পাঠাও নি কেন - প্রশ্নদাতারা উত্তর দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এবার খুসি ত? বেশ, রায় পরিবারের লেখকদের সম্বন্ধে শীঘ্রই একটা 'গল্প সল্প' দেওয়া যাবে।

(২০) **সুনন্দন চক্রবর্তী**, ২২৯৪, বয়স ১১

ভাই তোমার চিঠি পেয়ে আমরা অনেকক্ষণ হাসলাম। সত্যি তোমাকে মেয়ে ঠাওরানো উচিত হয় নি। তবে কি জান, তোমার লেখা 'সুনন্দনে'র ঐ শেষের 'ন' টাকে আকারের মতো দেখাচ্ছে। আমাদের খুব দোষ নয়। যাই হক, সেলাই না কর, ছবি না আঁক, তবু ক্রস্‌ওয়ার্ড করতে পার, লিখতে পার, একটা শিশু ভারতী জোগাড় করে এর পরের ছুটিতে আগাগোড়া পড়ে ফেলো। যেমনি জ্ঞান বাড়বে, তেমনি মজাও পাবে। ছবিতে গল্প বিষয়ে আমাদেরো মন খারাপ, কথা দিয়ে কথা না রাখা, ছিঃ! সম্পাদক মশাই বিদেশ থেকে ফিরলে তাঁকে ধরে পড়ব।

(২১) **সুবীর কুমার ধর**, ২১৫৮, বয়স ১৪

ভাই, তোমার চিঠি ও টিকিটসহ খাম পেলাম, কিন্তু লেখাটা তো সে-সঙ্গে নেই। আশা করি কপি আছে? পত্র পাঠ সেটি পাঠিয়ে দিও। গ্রাহক কার্ড না পেয়ে থাকলে, এখনি আমাদের আপিসে জানাও।

(২২) **তপন বিকাশ সাহা**, ২৪৬৪, বয়স দাও নি কেন?

পত্রবন্ধু চাই, শখ :—বই পড়া, লেখা, ছবি আঁকা। ব্যক্তিগত চিঠি লেখা হয় না, ভাই।

(২৩) **কেয়া তরফদার**, ২৪৩, বয়স ১৬

তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলাম। মন্দ জিনিস ভালো লাগা যতটা মন্দ, ভালো জিনিস ভালো না লাগাও ঠিক ততটা মন্দ। ঠিক কি না?

(২৪) **সুচিত্র কুমার বিশ্বাস**, ২০৮৭

তোমার দাদা সুচিত্র কুমার বিশ্বাস (সন্দেশের প্রাক্তন গ্রাহক) এবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে জেনে খুব খুসি হলাম।

(২৫) **সান্ত্বনা রায় চৌধুরী**, ২৫৬৪

তুমি ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তি পেয়েছ জেনে আমরা সত্যিই খুব আনন্দিত।

সন্দেশের গ্রাহক গ্রাহিকারা, তোমরা সকলেই উপরের দুটো খবর জেনে খুসি হয়েছ না? এর আগেও মাসে মাসে তোমাদের সাফল্যের খবর আমাদের কানে এসেছে। এরকম সুখবর ঠিক সময়ে জানালে আমরা সেটা সন্দেশে ছাপিয়ে দেব।

বৈশাখ মাসের প্রতিযোগিতার ফলাফল—

এবারকার প্রতিযোগিতায় উত্তরের সংখ্যা কম হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু খুব ভাল ছবি পাওয়া গেছে। কিছু সংখ্যক গ্রাহক প্রতিযোগিতার সর্তগুলি খুব ভাল করে রক্ষা করতে পারেনি বলে, তাদের পুরস্কার দেওয়া যায়নি (ছবি ভাল হলেও)।

যেমন—অনেকে মুল লাইনগুলি রক্ষা করেনি। কারো কারো ছবি ঠিক হাসির হয় নি আবার কেউ কেউ অতিরিক্ত সংখ্যক রেখা ব্যবহার করেছে।

ক-বিভাগ —দুঃখের বিষয়—এই বিভাগে একটিও পুরস্কার দেবার উপযুক্ত ছবি পাওয়া যায় নি। বোধহয় প্রতিযোগিতাটি ওদের পক্ষে কঠিন হয়েছিল। তবে ৬.৪—দেবাশীষ হালদারের ছবি মন্দ হয় নি। সে একটা বিশেষ পুরস্কার পাবে।

খ-বিভাগ—প্রথম পুরস্কার—২৯৫ শর্মিলা দত্ত

দ্বিতীয় পুরস্কার—২৭৬৩ শর্মিলা বসু

তাছাড়া এদের আঁকা ছবিও ভাল হয়েছে ঃ—

২২৫৭—উদয়ন মুখোপাধ্যায়। ১৬২৫—পার্থ বসু।

গ-বিভাগ—প্রথম পুরস্কার—১৮৩ নীপা গোস্বামী।

দ্বিতীয় পুরস্কার—২৭৬৩ সব্যসাচী বসু। ১৭০৬ বন্দন হালদারের ছবি খুব ভাল হয়েছে, কিন্তু সর্তরক্ষা হয়নি বলে প্রাইজ দেওয়া গেল না।

—বিশেষ শারদীয় উপহার—

১৩৬৭ এর পুজা উপলক্ষ্যে আগামী ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে (১৮ই অগস্ট থেকে ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত) পুরোন সন্দেশের মূল্য বিশেষভাবে হ্রাস করা হল যাতে নতুন গ্রাহকেরা সকলে পুরাতন সন্দেশগুলি সংগ্রহ করতে পারে। যদিও কোন কোন বৎসরের দু একটি সংখ্যা নাই, তবু চুম্বক থাকার দরুণ, ধারাবাহিক গল্প পড়তে কোন অসুবিধা হয় না। শেষ হয়ে যাবার আগে কিনে নাও!

মূল্য ঃ—প্রতি বছর	সাধারণ	বাঁধানো
১৩৬৮ (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র নাই)	১৲	২৲
১৩৬৯ (বৈশাখ নাই)	২৲	৩৲
১৩৭০ (সম্পূর্ণ বৎসর)	২.৭৫	৪৲
১৩৭১ (আষাঢ় নাই)	৩.৭৫	৫৲
১৩৭২ (কার্ত্তিক নাই)	৪.৭৫	৬৲
১৩৭৩ (শ্রাবণ নাই)	৪.৭৫	৬৲
১৩৭৪ (সম্পূর্ণ বৎসর)	৫.৭৫	৭৲
১৩৭৫ (সম্পূর্ণ বৎসর)	৫.৭৫	৭৲

দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত বা আট বৎসরের সন্দেশ এক সঙ্গে নিলে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় বা সাত টাকা রিবেট পাওয়া যাবে।

ক্রেতার অনুরোধে ভি. পি. যোগে অথবা ডাক-মাশুল সহ অগ্রিম মূল্য পাঠিয়ে দিলে রেজিস্টার্ড ডাকে বই পাঠান হবে।

নবম বর্ষ—৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৬/সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৬৯

ঐ-যা !

সুখলতা রাও

অবাক দেখি, একি বিষম টানাটানির পালা,
চিৎকারে যে পাড়ার লোকের লাগছে কানে তালা !
দুগাল বেয়ে ঝরণা ঝরে, হাঁ-টি চমৎকার,
কোথায় গড়ায় লাট্টু-পুতুল, নেই ঠিকানা তার।
বলছে খুকী—'আমিই নেব', খোকাও নিতে চাও ?
টানের চোটে বইখানি যায়, দেখছ না কি তাও ?
ঝগড়া করে ফেললে ছিঁড়ে, রইল কিবা আর ?
থাকলে পরে দুইজনেতে বুঝতে মজা তার।
জানতে কেমন মিষ্টি এ বই, সন্দেশেরি মত,
পড়তে মজা, শুনতে মজা, দেখতে মজা কত।
মিলে মিশে যে কাজ কর, তাতেই পাবে সুখ,
ঝগড়াঝাঁটি, কান্নাকাটি, বাড়ায় কেবল দুখ !

ফুলপরী

উপেন্দ্রকিশোর রায়

আমি কখনো পরী দেখিনি। তোমরা কি কেউ দেখেছ?

পরী আবার কোত্থেকে দেখব? পরী কি আছে?

আগের লোকেরা বলত, 'পরীরা তাদের ছোট্ট ছোট্ট ডানা মেলে চাঁদের আলো বেয়ে আসে, ফুলের ভিতর ঢুকে লুকোচুরি খেলে, আর ব্যাঙের ছাতার তলায় হাত ধরাধরি করে নাচে, আর জোনাকী পোকার গর্তে, ছোট্ট খোকাখুকীদের ঘরে এসে উঁকি মারে।'

নীল সাগরের মাঝখানে কাঁকড় মাটির দেশ আছে। সেইখানে কালো কালো মানুষ থাকে, তাদের কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। তারা বলে ফুলপরী তাদের দেশে থাকত। সে তার সোনার আঙুল দিয়ে ফুলদের গাল টিপে দিত। ভোরবেলার লাল আলো দিয়ে তাদের স্নান করাত, আর ফুরফুরে হাওয়ায় হিমের জল মিশিয়ে তাদের খেতে দিত। ফুলেরা তাকে দেখতে পেলেই মুখ তুলে হাসত, আর সে কাছে না থাকলে মাথা হেঁট করে থাকত।

সেটা কিন্তু ফুলপরীর দেশ ছিল না; তার দেশ ছিল স্বর্গে, সেইখান থেকে সে ফুল নিয়ে এসেছিল; তারপর একদিন সে তার দেশে চলে গেল। তখন তাকে দেখতে না পেয়ে ফুলেরা মাথা হেঁট করে চোখের জল ফেলতে লাগল। আর তারা মুখ তুলে চাইল না; তারা শুকিয়ে গেল, শেষে ঝরে পড়ে গেল।

তারপর আর সে দেশের গাছপালায় ফুল হয় না! সে দেশের লোকের তাতে বড় দুঃখ হল।

তারা বলল—'হায়, ফুল নাই, আমরা কেমন করে থাকব!'

তাদের মধ্যে ছয়জন বুড়ো মানুষ ছিল, তাদের চুল-দাড়ি ধবধবে শাদা। তারা বড় ভাল ছিল, আর তাদের খুব বুদ্ধি ছিল।

তারা বলল—'ফুল থাকবে না, তাও কি হয়? আমরা যাব সেই স্বর্গে, যেখানে ফুল পরীর দেশ। গিয়ে তাকে গড় করব, হাত জোড় করব, ফুল চেয়ে নিয়ে আসব।'

বলে তারা মাঠের পর বন, বনের পর মাঠ পার হয়ে ছজনায় মিলে যেতে লাগল। যেতে যেতে তারা সকল দেশের শেষে সেই শাদা পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠল, যেখানে পরীদের দেশ।

পরীরা তাদের দেখে বলল—'কালো কালো মুখ, শাদা শাদা চুল, বুড়ো মানুষ, তোমরা কোত্থেকে এসেছ? তোমরা কি চাও?'

তারা হাত জোড় করে বলল—'আমরা স্বর্গে যাব, ফুলপরীর কাছ থেকে ফুল আনতে।'

পরীরা তাতে ভারি খুসি হয়ে বলল—'ফুল আনতে যাবে? বেশ, বেশ! এই আমরা তোমাদের পথ করে দিচ্ছি।'

বলে তারা তাদের ছোট্ট ছোট্ট হাতে করে জল নিয়ে সূর্যের মুখে ছড়িয়ে দিতে লাগল, আর যারপর নাই সুন্দর একটি রামধনু হল। সেই রামধনু সেই পাহাড় থেকে গিয়ে একেবারে স্বর্গের সোনার দরজায় ঠেকল।

তখন পরীরা বলল—'এর উপর দিয়ে যাও, ফুলপরীর দেখা পাবে।'

তখন সেই ছয়জন বুড়ো মানুষ সেই রামধনু বেয়ে স্বর্গে চলে গেল।

সেখানে গিয়ে তারা ফুলপরীকে প্রণাম করে জোড় হাতে বলল—'মা! তুমি চলে এলে, তাই আর আমাদের দেশে ফুল ফোটে না। তাতে আমাদের দিন বড় দুঃখে যায়!'

শুনে ফুলপরীর চোখে জল এল।

সে বললে—'আহা! বাছা, তোদের আর দুঃখ করতে হবে না। এই দেখ, আমাদের দেশে কত ফুল, তোদের যত ইচ্ছা নিয়ে যা, এখন থেকে তোদের ফুলের দুঃখ দূর হয়ে যাবে।'

ছজন বুড়ো মানুষ তা শুনে বারবার ফুলপরীর পায়ের ধুলো নিল। তারপর তারা যত বয়ে আনতে পারে, তত ফুল নিয়ে তারা দেশে ফিরে এল।

তারপর থেকে সে দেশের গাছে গাছে ফুল ফুটতে লাগল, পাহাড়, বন, মাঠ সব ফুলে ছেয়ে গেল' আর লোকের ফুলের দুঃখ রইল না!

গৌরী ধর্মপাল
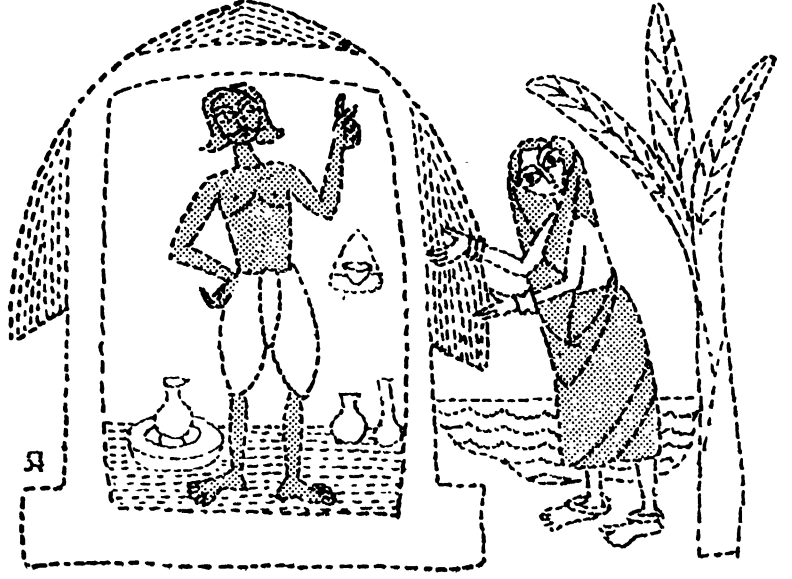
গ্রামের নাম দুধপুকুর। ঝকঝকে তকতকে নিকনিকে, ছুঁচটি পড়লে তুলে নেওয়া যায়। দশ-পুকুরের এক পুকুরের পাড়ে মূলীবাঁশের প্রকাণ্ড এক ঝাড়। সেই ঝাড়ের একধারে ছোট্ট একটি দোচালা ঘর। সেই ঘরে থাকে ময়নামতী আর ময়নামতীর মা।

ঘরের পাট সারা হলে দুপুরবেলা ময়নামতীর মা বসে বসে কাঁথা সেলাই করে। ময়নামতী মার পাশে পা ছড়িয়ে বসে পাড় থেকে সুতো তুলে তুলে দেয়, আর বেলা পড়ে এলে মা যখন আর চোখে ভাল দেখতে পায় না, তখন মার ছুঁচে সুতো পরিয়ে দেয়।

একদিন সেলাই করতে করতে ছুঁচ গেছে মট করে ভেঙে, আর ময়নামতীর মা কাঁদতে কাঁদতে বলছে, কি হবে রে ময়না?

ময়না বলছে, কেঁদো না মা, আমি তোমায় ছুঁচ এনে দেব।

এই বলে ডুরে শাড়ির আঁচলটি কোমরে জড়িয়ে ময়না গেল কামারবাড়ি।

—কামারখুড়ো কামারখুড়ো, আমার মায়ের কাঁথা-সেলাইয়ের ছুঁচ গেছে ভেঙে। তুমি এই ভাঙা ছুঁচের বদলে একটা নতুন ছুঁচ দেবে?

কামার বললে—ভাঙার বদলে নতুন? না বাছা তা হয় না। তবে আমার নাইবার গামছাখানা ছিঁড়ে গেছে। তুমি যদি আমায় একখানা নতুন গামছা এনে দিতে পার ত ভেবে দেখতে পারি।

ময়না বললে, আচ্ছা। গামছা নিয়ে ময়না গেল জোলাবাড়ি।

—জোলাখুড়ো জোলাখুড়ো, এই ছেঁড়া গামছাখানার বদলে আমায় একখানা নতুন গামছা দেবে? তাহলে কামারখুড়ো আমায় নতুন ছুঁচ দেবে, তাই দিয়ে আমার মা কাঁথা সেলাই করবে?

জোলা বললে, ছেঁড়ার বদলে নতুন? না বাছা তা হয় না। তবে আমার ভাত রাঁধার হাঁড়িটা বড্ড পুরোন হয়ে গেছে, তুমি যদি আমায় একখানা নতুন হাঁড়ি এনে দিতে পার ত ভেবে দেখতে পারি।

ময়না বললে আচ্ছা। বলে হাঁড়ি নিয়ে ময়না গেল কুমোরবাড়ি।

—কুমোরদাদা কুমোরদাদা, এই পুরোন হাঁড়ির বদলে আমায় একটা নতুন হাঁড়ি দেবে? তাহলে জোলাখুড়ো আমায় নতুন গামছা দেবে, কামারখুড়ো নতুন ছুঁচ দেবে, তাই দিয়ে আমার মা কাঁথা সেলাই করবে?

কুমোর বললে, পুরোন-র বদলে নতুন? না বাছা তা হয় না। তবে আমার মেয়ের শাঁখাজোড়া ফেটে গেছে, তুমি যদি আমায় একজোড়া নতুন শাঁখা এনে দিতে পার ত ভেবে দেখতে পারি।

ময়না বললে, আচ্ছা। বলে শাঁখাজোড়া নিয়ে গেল শাঁখারীবাড়ি।

শাঁখারীমামা শাঁখারীমামা, এই ফাটা শাঁখার বদলে আমায় একজোড়া নতুন শাঁখা দেবে? তাহলে কুমোরদাদা আমায় নতুন হাঁড়ি দেবে, জোলাখুড়ো নতুন গামছা দেবে, কামারখুড়ো নতুন ছুঁচ দেবে, তাই দিয়ে আমার মা কাঁথা সেলাই করবে?

শাঁখারী বললে, ফাটার বদলে নতুন? না বাছা, তা হয় না। তবে আমার মায়ের বড় সখ হয়েছে, ডিমভরা কৈমাছের চৈ-দেওয়া ঝোল খাবে নতুন কাঁসার থালায়, নতুন পিঁড়িতে বসে, নতুন কাপড় পরে নতুন নথ নাকে দিয়ে। তুমি যদি বাছা স্যাকরাবাড়ি থেকে সোনার নথ, ছুতোর বাড়ি থেকে কাঁঠালকাঠের পিড়ি, তাঁতিবাড়ি থেকে মেঘডম্বর শাড়ি, কাঁসারি বাড়ি থেকে খাগড়াই কাঁসার ফুলকাটা বগি থালা, জেলেবাড়ি থেকে এককুড়ি ডিমভরা কৈ আর মুদিবাড়ি থেকে তেলনুনসরষে—

এই পর্যন্ত শুনে ময়না ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেলল। আর সেই কান্না শুনে গ্রামের যে যেখানে ছিল সব্বাই ছুটে এল।

যতই সবাই বলে, ময়না তোর কি হয়েছে বল, ময়না ততই কাঁদে। কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারে না, এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, এমন সময় একগলা ঘোমটা টেনে শাঁখারীর বৌ বাড়ির থেকে বেরিয়ে এসে শাঁখারীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ওকে জিগ্যেস কর, ও জানে।

শাঁখারী থতমত খেয়ে বললে, এই এই এই।

সবাই বললে, তার আগে?

এক-কপাল ঘোমটা দিয়ে কুমোর-বৌ এসে কুমোরের দিকে আঙুল তুলে বললে, ওকে জিগ্যেস কর, ও জানে।

কাঁচুমাচু হয়ে কুমোর বললে, এই এই এই।

সবাই বললে, তার আগে?

ভিড়ের মধ্যে থেকে খ্যানখেনে গলায় চেঁচিয়ে উঠল জোলার মা, আমার ছেলেটিকে জিগ্যেস কর জানেন কিনা।

আমৃতা আমৃতা করে জোলা বললে—এই এই এই।

সবাই বললে—তার আগে?

তখন কামার কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে বললে, আমিই ভাই যত নষ্টের গোড়া, শোন বলছি—

কামারের বলাও শেষ হয়েছে আর 'ময়না কই, কোথায় গেলি রে?' বলতে বলতে ময়নামতীর মাও এসে হাজির হয়েছে, আর ময়নাও ছুটে গিয়ে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে। মেয়েও যত কাঁদে, মাও তত কাঁদে আর বলে ছুঁচ পেয়েছি রে ময়না, পেয়েছি। মায়ের প্যাঁটরায় তোলা ছিল। এতদিন খুলি নি তাই চোখে পড়েনি।

তখন বড়াইবুড়ি চোখ মুছতে মুছতে এগিয়ে এসে বললে, এই ময়নার মা'র তৈরি কাঁথা গায়ে দিয়ে তোমরা গাঁ-শুদ্ধ সবাই শীত কাটাও, বাদলা হাওয়ায় গা বাঁচাও, আর তার মেয়ে কিনা সারা গাঁ ঘুরে একটা ছুঁচ পায় না? তোমরা কি মানুষ, না, আর কিছু?

সবাই মাথা নিচু করে রইল।

কামার হাতজোড় করে বললে, মাপ কর মা, আর হবে না। এবার থেকে ময়নার, ময়নার মার সব ছুঁচ-কড়াই আমি গড়ে দেব।

সেইদিন থেকে রোজ ময়নাদের বাড়িতে

মাছ দিয়ে যায় জেলে
দুধ দিয়ে যায় গয়লা
খইমুড়ি দেয় গদাইবুড়ি

চাষীরা মিলে দেয় সম্বচ্ছরের ধান, তাঁতি দেয় শাড়ি-কাপড়, ঘরামি দেয় ঘর ছেয়ে।

আর ময়না, ময়নার মা লাল-নীল-হলদে-সবুজ-কালো কমলা সুতো দিয়ে কাঁথা সেলাই করে করে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়—জংলা-কাঁথা, পদ্মকাঁথা, পত্রকাঁথা, নক্সীকাঁথা, চিকণ-কাঁথা, চাকন-কাঁথা আর দোল-দুর্গোৎসবে আসরে-বাসরে খাটে-বিছানায় জমিয়ে প্যাতার জাজিম কাঁথা।

কেবল প্রত্যেক বছর পুজোর সময় মহালয়ার দিন সব থেকে সেরা একজোড়া শাঁখা বেছে নিয়ে শাঁখারীমামা যখন ময়নাদের বাড়ি গিয়ে হাঁক দেয়, 'ও ময়না, আছিস নাকি?' তখন ময়নার মা বেরিয়ে এসে বলে, এ বছরটা থাক দাদা, আসছে বছর দিও।

কাটা

প্রদীপকুমার রায়

ভাদ্রে বেজায় গরম
কি করে দিনটা কাটাই ?
সিনেমার টিকিটখানা
ভজাকে কাটতে পাঠাই।
ঐ যে শোবার খাটে
ঠাকুমা তকলী কাটে,
বাইরে সুতোর গুলি
রেখেছে বিছিয়ে চাটাই,
কাটবো অনেক ঘুড়ি
রেখে দি' জড়িয়ে লাটাই।
উনুনে ছানা কাটায়
কাকিমা রান্নাঘরে ;
খাই খাই বায়না করে
ছোটবোন কান্না ধরে।
সন্দেশ হচ্ছে ঘাঁটা,
আমি তো দু' কান কাটা,
কেটে সিঁদ ঢুকছি ঘরে ;
কাকিমা কান না ধরে !
সন্দেশ নিচ্ছি তুলে
পকেটে আর না ধরে।

ওরে বাপ, মাথায় এ কার
খটাখট পড়ছে চাঁটা !
ছিঃ ছিঃ ছিঃ, বলতে মাথা
লজ্জায় যাচ্ছে কাটা।
পড়েছি যেই না ধরা,
ঠাকুমা কাটল ছড়া !
বড়দা ফোড়ন কাটে
জ্যেঠিমা দেখায় ঝাঁটা ;
পাড়াতে পড়লো ঢি ঢি
রাস্তায় যায় না হাঁটা !
ভজাকে বলেছিলেম
চুপি চুপি ভাগ দেবো যে
কি করে জানব বল
চুকলী কাটবে ও যে ?
মা আমায় দেয় গালাগাল,
একবারো কাটছে না তাল ;
কাটা ঘায় লবণ দেবার
সকলেই সুযোগ খোঁজে,
কেটে খাল কুমীর এনে
গিয়েছি নিজেই মজে !
সিনেমা উঠল মাথায়
হল সার টিকিট করাই ;
ঠোঁট কাটা বন্ধুরা সব
কেটে ফুট ভাঙ্গল বড়াই।
পাড়াতে বাড়ি বাড়ি
ছড়াল কেলেংকারি ;
কেটে জিব, নিজের গালে
দু'হাতে নিজেই চড়াই ;
ভাবছি ভালো এবার
ছেড়ে ঘর কেটে পড়াই !!

যাদুর পাগড়ী

(তুরস্কের উপকথা)

কুলদারঞ্জন রায়

দুই ভাই ছিল, তাদের বাপ মা কেউ ছিল না। বাপ মরবার সময় তাঁর টাকা কড়ি দু-ভাইকে সমান ভাগ করে দিয়েছিলেন। বড় ভাই সেই টাকায় দোকান করে বেশ দুপয়সা রোজগার করতে লাগল। কিন্তু ছোট ভাই তার টাকা কড়ি দুদিনে উড়িয়ে দিল বাবুয়ানা করে আর অপব্যয় করে। একদিন ছোট ভাই দেখল, হাত একেবারে শূন্য—খাবে কি? বড় ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু চেয়ে আনল কিন্তু তাও গেল চক্ষের নিমেষে উড়ে! আবার আনল, তাও ওড়াতে দুদিন বই লাগল না। বড়

দেখল যে মহামুস্কিল! দোকান বিক্রি করে কোথাও চলে না গেলে তাকেও শীগগিরই পথের ভিখিরি হতে হবে। তখন বড় ভাই চুপি চুপি দোকান পাট বিক্রি করে, টাকা সংগ্রহ করল এবং স্থির করল যে গোপনে মিশরদেশে চলে যাবে। এ দিকে, কি করে জানি এই সংবাদ পেয়ে, ছোট ভাই সেই জাহাজে গিয়ে আগে থাকতে লুকিয়ে চড়ে বসে আছে। বড় ভাই জাহাজে উঠে একেবারে ক্যাবিনের ভিতর—ডেকের উপর আসে না, পাছে তাকে দেখতে পেয়ে ছোটও এসে হাজির হয়। ক্রমে জাহাজ ছেড়ে দিলে পর, দুভাই একসঙ্গে ডেকে এসে উপস্থিত। ছোটকে দেখে বড়র বড্ড রাগ হল, কিন্তু তখন আর উপায় কি!

মিশরে পৌঁছে বড় ভাই করল কি, ছোটকে সমুদ্রের তীরে জিনিসপত্রের কাছে বসিয়ে রেখে, গেল গাড়ি আনতে। সেই যে গেল, আর সে ফিরে এল না! ছোট বসে বসে নিরাশ হয়ে, শেষে বেরোল দাদার সন্ধানে। সেই শহর থেকে আরম্ভ করে কত দেশ, কত নগর যে সে ঘুরে বেড়াল কিন্তু কোথাও দাদার সন্ধান পেল না।

ঘুরতে ঘুরতে ছোট একদিন এক পাহাড়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত। দেখল, সেখানে তিনজন লোক ভারি কোলাহল আরম্ভ করেছে।

কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনজনের মধ্যে বড়টি বলল—'মশায়! আমরা তিন ভাই। বাবা মরবার সময়ে তিনটি জিনিস রেখে গিয়েছেন—একটা পাগড়ী, একটা চাবুক আর একখানা আসন। যে পাগড়ীটি মাথায় দেবে, তাকে কেউ দেখতে পাবে না। কেউ আসনটিতে বসে চাবুকটা দিয়ে সপাং করবামাত্র, বিদ্যুৎবেগে যেখানে ইচ্ছা উড়ে যেতে পারে। এখন আমাদের কে পাগড়ী পাবে, কে আসন পাবে আর কে চাবুক পাবে তাই নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে।'

এই বলে তিনভাই একসঙ্গে বলে উঠল—'মশায়! আমাদের মধ্যে যে কেউ একজনই এই তিনটা জিনিস পাবে। এখন আপনি দয়া করে মীমাংসা করে দিন।'

এই কথা শুনে ছোট করল কি, একটা গাছের ডাল দিয়ে তীর ধনুক বানিয়ে বলল—'দেখ! আমি এই তীরটা ছুঁড়ব, তোমাদের মধ্যে যে ছুটে গিয়ে আগে তীরটা নিয়ে আসতে পারবে,—এই তিনটা জিনিসই তার হবে।'

এই বলে সে তীর ছুঁড়বামাত্র তিন ভাই ছুটে চলল তার উদ্দেশ্যে।

তখন ছোট ভাবল—'বাঃ, খাসা সুযোগ!'

দাদার কথা ভাবতে ভাবতে চক্ষের নিমেষে সে পাগড়ীটি মাথায় দিয়ে আসনে বসেই চাবুক দিয়ে সপাং,—আর দেখতে না দেখতে আকাশে উড়ে, মস্ত বড় এক শহরের দরজায় গিয়ে উপস্থিত!

শহরে ঢুকে সেই দেশের বাদশার এক চাকরের কাছে শুনল—বাদশাজাদী রোজ রাত্রে কোথায় জানি চলে যান, কেউ তার সন্ধান করতে,পারে না। তাই বাদশা ঘোষণা করেছেন,—যে কেউ সন্ধান করতে পারবে, তাকে তিনি অর্ধেক রাজত্ব দেবেন আর তার সঙ্গে বাদশাজাদীর বিয়ে দেবেন।

একথা শুনেই ছোটভাই বলল—'আমাকে নিয়ে চল, বাদশার কাছে, আমি বলে দেব বাদশাজাদী কোথায় যান। যদি না পারি তবে আমার গর্দান দেব।'

চাকর তখনই তাকে বাদশার কাছে নিয়ে গেল।

বাদশাও হুকুম করলেন—'যাও তবে, বাদশাজাদীর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে রাত্রে শুয়ে থাক আর পাহারা দাও। খবরদার! ঘুমিয়ে পড়লেই কিন্তু কাল তোমার মাথা কাটা যাবে!'

রাত্রে সেই অপব্যয়ী ভাই গিয়ে বাদশাজাদীর ঘরের দরজায়, ঘুমের ভাণ করে শুয়ে রয়েছে। গভীর রাত্রে বাদশাজাদী ভাব্‌লেন—লোকটা হয়ত এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে- দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, সত্যিই তাই। তবু, ভাল করে পরীক্ষা করবার জন্য করলেন কি, বেরিয়ে এসে একটা ছুঁচ দিয়ে তার পায়ের তলায় খোঁচা মারলেন, কিন্তু তবু সে কোন সাড়া দিল না দেখে, একটা বাতি নিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ছোটভাই চোখ পিট পিট করে সব দেখছিল, তখনই সে পাগড়ীটা মাথায় দিয়ে চট করে উঠেই বাদশাজাদীর পিছনে পিছনে চলল। প্রাসাদের বাইরে এসেই দেখে, এই বড় এক দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে—তার মাথায় একটা সোনার ঝুড়ি, তার মধ্যে বাদশাজাদী বসে রয়েছেন।

ছোটভাই তখনই এক লাফে সেই ঝুড়িতে গিয়ে বসেছে—আর একটু হলেই ঝুড়ি উল্টে পড়েছিল আর কি।

দৈত্য আশ্চর্য হয়ে বলল—'করছেন কি বাদশাজাদী!'

বাদশাজাদী বলল—'কৈ আমি ত নড়ি চড়িনি, চুপ করেই ত বসে আছি।'

ছোট মাথায় পাগড়ী পরে আছে, কাজেই কেউই তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

দৈত্য কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই দেখল যে ঝুড়িটা বড্ড ভারি লাগছে। বলল—'বাদশাজাদী! রোজ ত আপনাকে বয়ে নিয়ে যাই, এত ভারি ত লাগে না? আজ মনে হচ্ছে যেন আপনার ভারে চুরমার হয়ে গেলাম!'

যা হোক, দৈত্য, ঝুড়ি মাথায় করে, মুহূর্তের মধ্যে এক আশ্চর্য বাগানে গিয়ে উপস্থিত! বাগানের গাছ আর ডালপাল সবই রূপো আর হীরের তৈরি! ছোট ভাই গাছের একটা ডাল ভেঙ্গে নিয়ে পকেটে রেখে দিল।

ডাল ভাঙ্গতেই গাছগুলি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে—'হায় রে হায়! আজ পৃথিবীর মানুষ আমাদের ডাল ভাঙ্গলে!'

দৈত্য আর বাদশাজাদী দুজনেই অবাক। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা কি!

আর কিছুদূর গিয়ে আর একটা বাগান, তার গাছগুলি সোনা আর দামী পাথরের তৈরি। সে গাছেরও একটা ডাল ভেঙ্গে ছোট পকেটে রাখল।

গাছগুলি বেদনায় অস্থির হয়ে বলতে লাগল—'হায় রে হায়! আজ মানুষের হাতে দুঃখ ভোগ করতে হল।'

তা শুনে দৈত্যের অবস্থা এমনি হল যে তার মুখ দিয়ে আর কথা সরে না!

বাগান পার হয়ে একটা পোল, সেটা পার হয়ে এক প্রাসাদ—তার দরজায় শত শত দাসদাসী বাদশাজাদীর জন্য অপেক্ষা করছিল। তিনি দৈত্যের মাথা থেকে নামতেই, তারা মণিমুক্তোর কাজকরা একজোড়া চটি এনে দিল। অপব্যয়ী ছোট ভাই তখনই একপাটি চটি নিয়ে পকেটে পুরেছে! অন্য পাটি পরে বাদশাজাদী আর একখানা খুঁজে কিছুতেই পেলেন না। একেবারে নিরুদ্দেশ! রাগে গজগজ করতে করতে তিনি প্রাসাদে ঢুকলেন, ছোটও তাঁর পিছন পিছন ঢুকল—মাথায় পাগড়ী পরে, হাতে আসন ও চাবুক নিয়ে।

বাদশাজাদী একটা ঘরে গিয়ে দেখলেন—দৈত্যের রাজা বসে আছেন।

সে কি যেমন তেমন দৈত্য? বাপরে, কি ভীষণ চেহারা! ঠোঁটদুটো যেন আকাশ পাতাল জুড়ে রয়েছে। বাদশাজাদী তার কাছে গিয়ে বসতেই, দাসী হীরের কাজ করা পেয়ালাতে করে সরবৎ নিয়ে এল। বাদশাজাদী হাত বাড়িয়ে সরবতের পেয়ালা নিতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে ছোট দাসীর হাতে এক থাবড়া। আর পেয়ালা মাটিতে পড়ে চুরমার। ছোট সেই ভাঙ্গা পেয়ালার একটুকরো নিয়ে পকেটে পুরল।

বাদশাজাদী এই পেয়ালা ভাঙ্গা দেখে ভারি ব্যস্ত হলেন আর রাজাকে বললেন—'আজকের দিনটাই অলক্ষুণে। আমি আর সরবৎ খাব না, আর কিছুই খাব না,—এখনই বাড়ি চলে যাব।'

দৈত্যরাজ বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে ঠাণ্ডা করে চাকরদের বললেন খানা ঠিক করতে। টেবিল পাতা হল, খাবার সাজান হল।

দৈত্যরাজ ও বাদশাজাদী খেতে বসলেন। তাঁরা খাচ্ছেন, আর ছোট ভাই কি শুধু চেয়ে দেখবে? তারও ত খিদে পেয়েছিল, কাজেই সেও ডিশের পর ডিশ সাবাড় করতে লাগল। কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে না অথচ কে জানি সব খাবার খেয়ে ফেলছে।

দৈত্যরাজ ও বাদশাজাদী তখন বুঝতে পারলেন যে টেবিলে একজন তৃতীয় ব্যক্তি আছে, অদৃশ্য এক অতিথি—তখন ভয়ে তাঁদের জ্ঞান লোপ পাবার মত হল।

দৈত্যরাজ তখনই সর্দার চাকরকে ডাকলেন, যে বাদশাজাদীকে রোজ মাথায় করে আনত, আর বললেন 'এখনই বাদশাজাদীকে বাড়িতে দিয়ে এস।'

এই সময়ে ছোট ভাই করল কি, তলোয়ার নিয়ে দৈত্যরাজের গলায় এক কোপ—আর তখনই তার মাথাটা গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

প্রাসাদে হুলুস্থুল ব্যাপার লেগে গেল—সর্বনাশ হয়েছে!

হায় হায়! আমাদের দৈত্যরাজাকে মানুষে কেটে ফেলেছে!

ছোটও তখন আসনে বসেই চাবুক নিয়ে সপাং।

বাদশাজাদী বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন, ছেলেটি ঠিক ঘরের দরজায় শুয়ে আছে, ঘুমে যেন অচেতন।

দেখে তাঁর বড় রাগ হল, বললেন—'লক্ষ্মীছাড়া! তোমার জন্যই না আজ এতসব কাণ্ড হয়েছে!' বলেই ছুঁচ দিয়ে তার পায়ের তলায় আবার এক খোঁচা!

খোঁচা খেয়েও যখন সে চুপ করে রইল, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে সে সত্যি সত্যি ঘুমোচ্ছে।

পরদিন অপব্যয়ী ভাইকে বাদশার কাছে নিয়ে গেলে পর, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কিহে, সন্ধান পেলে কিছু, রাত্রে বাদশাজাদী কোথায় চলে যান?

'হাঁ হুজুর! পেয়েছি বৈকি। তবে আমার একটা অনুরোধ আছে—রাজ্যের সব লোক একত্র করুন, সকলের সাক্ষাতে আমি বলব।'

ছোটভাই ভেবেছিল যে রাজ্যের সব লোক একত্র হলে, তার মধ্যে নিশ্চয় সে তার দাদাকে পাবে।

বাদশার হুকুমে, প্রাসাদের সমুখের প্রকাণ্ড মাঠে রাজ্যের লোক সব এসে জড় হল। উঁচু বেদীতে বাদশা মেয়েকে নিয়ে বসলেন। বেদীর কাছে দাঁড়িয়ে ছোটভাই প্রথম থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ঘটনা বলল।

বলা শেষ হলে বাদশাজাদী বললেন—'না বাবা, সব মিছে কথা বলছে, একটাও সত্যি না!'

একথা শুনে ছোটভাই পকেট থেকে মণি-মুক্তোর ডাল, একপাটি জরির চটি আর পেয়ালার

টুকরো বার করে দেখাল। তারপর যেই দৈত্যরাজার মৃত্যুর কথা বলছে এমন সময় হঠাৎ চেয়ে দেখল জনতার মাঝে তার দাদা রয়েছেন।

আর কথাটি নাই, ছুটে গিয়ে সে দাদাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

দাদাকে বাদশার কাছে নিয়ে এসে বলল—'দোহাই বাদশা, আপনার প্রতিজ্ঞা রাখুন, আমার দাদাকে অর্ধেক রাজত্ব দিন আর তাঁর সঙ্গে বাদশাজাদীর বিয়ে দিন। আমি কিছু চাই না। আমার পাগড়ী, আসন আর চাবুক আছে। তাই নিয়ে বেশ দিন কেটে যাবে। আমি শুধু চাই যে চিরজীবন যেন দাদার কাছে থাকতে পারি।'

দৈত্যরাজার মৃত্যুসংবাদ শুনে বাদশাজাদী ভারি খুসি হলেন। এই হতভাগা দৈত্য তাঁকে যাদু করেছিল। সেই যাদুর বশ হয়েই তিনি রোজ রাত্রে দৈত্যের চাকরের মাথায় চেপে দৈত্যপুরীতে যেতেন। দৈত্যের মৃত্যুতে যাদু ভেঙ্গে গিয়েছে, এখন তিনি বুঝতে পারছেন হতভাগা দানবকে আসলে তিনি কি ভীষণ ঘৃণা করতেন। যাদু থেকে মুক্ত হয়ে বাদশাজাদী এতই খুসি হলেন যে ছোটভাইয়ের অনুরোধে তার দাদাকে বিয়ে করতে তিনি তখনই রাজি হলেন।

শুভদিনে বড় ভাইয়ের সঙ্গে বাদশাজাদীর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের যৌতুক স্বরূপ বাদশা জামাতাকে অর্ধেক রাজত্ব দিলেন। ছোটভাইয়ের সুখের সীমা নাই—এখন সে মনের আনন্দে সব সময়ে দাদার সঙ্গে থাকতে পারবে আর মাঝে মাঝে পাগড়ী মাথায় দিয়ে আসনে বসে চাবুকটা সপাং না করেও ছাড়বে না।

(সমুদ্রের তলদেশ সম্বন্ধে জানবার জন্য স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ পাড়ি দিয়েছিল, তারপরে আর ফিরে আসেনি। এই অভিযানের নেতা ছিলেন মহাপণ্ডিত ডঃ ম্যারাকট ও জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপটেন হাওসি। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত প্রাণিবিদ মিঃ সাইরাস হেডলি, ইঞ্জিনিয়ার বিল স্ক্যানল্যান ও আরো ২৩ জন।

৫ই জানুয়ারি আরাবেলা নোউল্‌স্‌ নামক জাহাজ হাল্কা গ্যাসে ভরা এবং বিশেষ উপাদানে তৈরি একটি ঝকঝকে গোলকের ভিতর হেডলির চিঠিতে এক অত্যাশ্চর্য বিবরণ জানতে পারা যায়।

জানা যায় যে এক ঝুলন্ত খাঁচার মতন যন্ত্রের সাহায্যে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তলায় এক গভীর খাদের ধারে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে এঁরা গভীর খাদের মধ্যে পড়ে যান এবং এক আশ্চর্য নগরীর সন্ধান পান।

সমুদ্রগর্ভে বিশাল এক 'আশ্রয় সদনে' কৃত্রিম বাতাসের সাহায্যে জীবনধারণ করে উন্নত বিজ্ঞান সম্পন্ন এক জাতি—তাদের কাছে আশ্রয় পাওয়া গেল। এরা প্রাচীন আটলান্টিসবাসীদের বংশধর।

মাণ্ডা, স্কার্পা, তাঁর মেয়ে সোনা ও বহু মেয়ে পুরুষের সঙ্গে পরিচয় হল। এরা বেশ হাসিখুশি মানুষ। এরা চলচ্চিত্রের মতন পর্দায় চিন্তার প্রতিচ্ছবির সাহায্যে আগন্তুকদের কাহিনী শুনে নিল।

ডুবুরির পোষাক পরে, সমুদ্রতল দিয়ে হেঁটে মাণ্ডা এবং আরো পাঁচজন আগন্তুকদের নিয়ে গিয়ে তাঁদের প্রধান শক্তির উৎস এক বিশাল কয়লার খনি, প্রাচীনযুগের ডুবে যাওয়া নগরী এবং আরো অনেক বিচিত্র দৃশ্য দেখালেন। আবার চলচ্চিত্রের পর্দায় নিজেদের ইতিহাস দেখালেন।

হঠাৎ একদিন, যেন কোন সাংঘাতিক সংবাদ পেয়ে, সকলকে বাইরে বেরোতে দেখে আগন্তুকরাও

ডুবুরির পোষাকে তাঁদের সঙ্গ নিলেন। তাঁরা তাঁদেরই স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজকে জলমগ্ন অবস্থায় পেলেন। ক্যাপটেন হাওসি ও নাবিকদের মৃতদেহও জাহাজেই ছিল। জাহাজের লগবুকটি ম্যারাকট সঙ্গে নিয়ে এলেন।)

দশ

'আমাদের নতুন জীবনের সপ্তাহের পর সপ্তাহ গড়িয়ে যেতে লাগল। সে জীবন আমাদের ভালই লেগে গেল। আমরা মানুষের সেই বহুদিনের ভুলে যাওয়া ভাষা যতটা শিখে ফেললাম তাতে আমাদের এখানকার বন্ধুদের সঙ্গে কিছু কিছু কথা বলতে পারলাম। সেই শরণালয়ে শেখবার আর ভাল লাগবার অনেক জিনিসই ছিল। এদেশের লোকেরা অন্যান্য জিনিস বাদে পরমাণুখণ্ডন করতেও শিখেছে। যদিও তার দ্বারা যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া গেছে তা আমাদের পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের অনুমানের চাইতে কম, তবু তা সামান্য নয়। তা থেকে তারা বিরাট শক্তির ভাণ্ডার গড়ে' নিতে পেরেছে। কোনো কোনো বিষয়ে তো তাদের জ্ঞান আমাদের চাইতে ঢের বেশী, যেমন চিন্তার প্রতিচ্ছবি। চিন্তা জিনিসটা যে কি তাই তো আমরা জানিনা আজও।

'তবু, তাদের এত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের মধ্যে এমন দু একটা জিনিস আছে যা এদের পূর্বপুরুষদের নজর এড়িয়ে গেছে আর কাজেই তা এদের কাছেও নতুন।

'স্ক্যানল্যানের ভাগ্যই ছিল তা সপ্রমাণ করা। কয়েক দিন ধরে' দেখছিলাম সে যেন একটা চাপা উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে, যেন একটা প্রকাণ্ড গুপ্ত কথা চেপে রাখতে গিয়ে তার পেট ফাট ফাট হয়েছে। আপন চিন্তায় আপন মনেই সে হাসে। সেই সময় তার সঙ্গে আমাদের বেশী দেখা হত না, আপন তালে থাকত। তখন তার একমাত্র সঙ্গী ছিল বেরব্রিক্স নামে একজন মোটাসোটা আমুদে আটলান্টিয় যুবক। সে সেখানকার কোনো কলকারখানার তত্ত্বাবধায়ক ছিল। স্ক্যান্‌ল্যান্‌ আর বেরব্রিক্সের কথাবার্তার বেশীর ভাগই অবশ্য ছিল ইসারা ইঙ্গিত আর পিঠ থাবড়ানি। একদিন সন্ধ্যায় (?) সে আমাদের কাছে এল, খুব খুশি খুশি মুখ।

'ম্যারাকটকে বললে, 'এই ধরুন গিয়ে ডক্, আমার নিজের সামান্য কিছু বিদ্যে আছে, এখানকার এদের কাছে সেটা একবার জাহির করতে চাই। ওরা আমাদের দু একটা জিনিস দেখিয়েছে তো বটে, আমার মনে হয় আমাদের তার পালটা দেওয়া উচিত। কাল রাত্রে ওদের সবাইকে ডাকলে কেমন হয়?'

'আমি বললাম, 'কি নাচ নাচবে? জ্যাজ না চার্লস্টন?'

'সে বললে চার্লস্টন ফার্লস্টন নয়। দেখই তো আগে। একেবারে তাক লেগে যাবে এদের। বাস্, আর একটা কথাও বলব না। তবে ইয়ার, তোমাদের ডোবাব না আমি, তাক লাগাবার মত জিনিস আমি রাখি।'

'সেই অনুসারে পরের দিন সন্ধ্যায় সেখানকার জনসমাজ সেই প্রেক্ষাগৃহে একত্র হল। স্ক্যান্‌ল্যান্‌

আর বেরব্রিস্ক্‌ উঠল মঞ্চের উপর। গর্বে তাদের বুক দশ হাত। তার পর একটা বোতাম টিপতেই যা হল তাকে স্ক্যান্‌ল্যানের ভাষায় বলা চলে 'ওদের এক হাত দেখালাম, কারণ ওরা আমাদের কিছু অবাক করে' দিয়েছিল বটে।'

পরিষ্কার গলায় শুনতে 'পেলাম টু এল্‌ ও কলিং, লণ্ডন কলিং ব্রিটিশ আইল্‌স্‌। ওয়েদার ফোরকাস্ট।'

তারপর আবহ-সূচনার সেই চেনা বুলি! তারপর 'প্রথম সংবাদ স্তবক। মহামহিম ইংলণ্ডেশ্বর আজ পূর্বাহ্ণে হ্যামারস্মিথের শিশু-চিকিৎসালয়ের নবনির্মিত অংশটির দ্বারোদ্ঘাটন করলেন—' ইত্যাদি ইত্যাদি। এতদিন পরে হঠাৎ যেন আবার আমরা সেই রোজকার আটপৌরে ইংল্যণ্ডে ফিরে গেলাম। তারপর শুনলাম বৈদেশিক সংবাদ, খেলার খবর। আমাদের পুরানো পৃথিবী সেই একটানা সুরেই চলেছে। আমাদের আটলান্টিসের বন্ধুরা অবাক হয়ে শুনতে লাগল, কিন্তু বুঝতে তো পারল না কিছুই। কিন্তু খবরের পর সেদিনকার সঙ্গীতের প্রথম দফা হিসাবে যখন গার্ডদের ব্যাণ্ড বেজে উঠল তখন সবাই আনন্দে চীৎকার করে উঠল, তারপর দৌড়ে গিয়ে মঞ্চের উপর উঠে পর্দা সরিয়ে দেখতে লাগল কোথা বাজনাটা আসছে। সাগর অতলের এই সভ্যতার উপর আমরা চিরদিনের মত আমাদের ছাপ এঁকে দিয়েছি এতে আর কোনো ভুল নে ।

'এখান থেকে বেতার বার্তা পাঠাবার কোনো উপায় করতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করায় স্ক্যানল্যান বললে, 'তা পারব না সার্‌। তার জিনিসপত্র এদের নেই, আমারও অত মাথা নেই।'

'আটলান্টিসের রসায়নবিদদের নানা আবিষ্কারের মধ্যে একটি হল একরকম গ্যাস যা হাইড্রোজেনের চাইতেও নয় গুণ হালকা। ম্যারাকট তার নাম দিয়েছেন লাঘবজান। এই গ্যাস নিয়ে তিনি নানা-রকম পরীক্ষা করে দেখেছেন, আর তারই ফলে এইভাবে কাঁচগোলকের মধ্যে চিঠি পাঠাবার কল্পনাটি আমাদের মাথায় আসে।

'তিনি বললেন, 'আমি মাণ্ডাকে আমাদের উপায়টির কথা বুঝিয়ে বলেছি। তিনি কাঁচের কারিগরদের ফরমাশ করেছেন, দুই একদিনের মধ্যেই গোলক কয়টি তৈরি হয়ে যাবে।'

'আমি বললাম, 'কিন্তু আমাদের লেখা তার মধ্যে পুরব কেমন করে?'

'গ্যাস ভরবার জন্য একটি ছোট ছেঁদা থাকবে, সেইটা দিয়ে লেখাগুলোও ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। তারপর কারিগররা ছেঁদাটি বুজিয়ে দেবে। এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে সেগুলিকে ছেড়ে দিলে সোজা সমুদ্রের উপরে উঠে যাবে।'

'তারপর বছরখানেক ঢেউয়ের উপর নাচতে থাকবে।'

'হয়ত। কিন্তু গোলকটি সূর্যের আলো পড়ে' ঝকমক করবে, কারও না কারও নিশ্চয়ই নজরে পড়বে। আমরা ইউরোপ থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় জাহাজ চলাচলের পথের উপরেই ছিলাম। কয়েকটা গোলক পাঠালে তার অন্ততঃ একটিও কেউ পাবে না এমন মনে করবার কোনো কারণ দেখি না।'

'ভাই ট্যাল্বট—বা আর যাঁরা এই লেখাটি পড়বেন, জানবেন এমনি করেই এটি আপনাদের হাতে গিয়ে পড়েছে।'

কিন্তু আরও বড় দরের মতলব বেরুলো আমেরিকান যন্ত্রশিল্পীর উর্বর মস্তিষ্ক থেকে। স্ক্যান্ল্যান্ বললে, 'এই ধরুন গিয়ে এ জায়গাটা অবশ্য খাসা, তবু মাঝে মাঝে মনে হয় ঈশ্বরের আপন দেশটা আর একবার দেখতে পেলে মন্দ হত না।'

'আমি বললাম, সে তো আমাদেরও মনে হতে পারে, কিন্তু তার কি উপায় তুমি করতে পার?'

'আরে শোন ইয়ার, এই গ্যাসে ভরা কাঁচের বেলুনগুলো যদি আমাদের চিঠি নিয়ে যেতে পারে—তামাশা নয়, আমি দস্তুরমত হিসেব কষে দেখেছি। ধর আমরা ঐরকম তিন চারটেকে এক-সঙ্গে করলুম, তাহলে তো উপরে ওঠবার মত জোর হেসে খেলেই পাব, কি বল? তারপর ধর আমাদের কাঁচের মুখোসগুলো পরে নিয়ে এই বেলুনের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে ফেললুম আর ঘণ্টা পড়তেই অমনি দড়ি কেটে দিয়ে গিয়ে উপর পানে উঠলুম। তারপর আমাদের ঠেকায় কিসে?'

'এই ধর—হাঙ্গরে।'

'আরে ছুৎ, আমরা হাঙ্গরের পাশ দিয়ে শাঁ করে এমন উড়ে বেরিয়ে যাব যে সে ঠাহরই পাবে না তার পাশ দিয়ে কি গেল, ভাববে তিনটে আলোর ঝলক চলে গেল। সত্যিই আমরা এ মুড়ো থেকে এয়সা এক ঘাড় ধাক্কাই খাব যে ও মুড়োয় গিয়ে আমাদের জল থেকে ফুট পঞ্চাশেক লাফিয়ে উঠতে হবে!' 'বেশ, তা না হয় হল, কিন্তু তারপর?'

'দোহাই পিটারের, এর থেকে ও 'তারপর' বাদ দাও। একবার কপালখানা ঠুকে দেখাই যাক না।'

ম্যারাকট্ বললেন, 'আমার অবশ্য খুব ইচ্ছা আমাদের জগতে ফিরে যাব, আর কিছু না হোক আমাদের এইখানকার নানা পরীক্ষার ফলগুলি পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে পেশ করতে তো হবে। আমি স্ক্যান্ল্যানের পরিকল্পনা অনুমোদন করি।'

'এ ব্যাপারে আমার আগ্রহই সব চেয়ে কম হবার কারণ অবশ্য ছিল। সে কথা পরে বলব। আমি বললাম, 'তোমার এ ফন্দীটা স্রেফ পাগলামি। আমাদের জন্য কেউ যদি উপরে তৈরি হয়ে না থাকে তাহলে তো আমরা কেবল ভাসতেই থাকব আর শেষ পর্যন্ত খিদে আর তেষ্টায় মারা যাব।'

'আহাঃ, তৈরি হয়ে আবার থাকবে কে!'

'ম্যারাকট্ বললেন, 'হয়ত তারও বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। আমরা কোথায় আছি তার অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমা আমরা দিতে পারি, হয়ত দু এক মাইলের বেশী এদিক ওদিক হবে না।'

'আর তারা একটা মই নামিয়ে দেবে,' আমি বললাম একটু ঠাট্টার সুরেই।

'আরে মই টই নয়, কর্তা ঠিকই বলেছেন। শোন মিঃ হেড্লে, ঐ যে চিঠি পাঠাচ্ছ দুনিয়াকে—উঃ, সত্যি আমি খবর-কাগজের চমকে ওঠা হেডলাইনগুলো যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি!

যাক্, ঐ যে চিঠি পাঠাচ্ছ তাতে লিখে দাও যে আমরা আছি ২৭° উত্তর অক্ষাংশ ও ২৮°১৪' পশ্চিম দ্রাঘিমায়—কিংবা যা হয় ঠিক করে' দেখে লেখ। বুঝলে তো? তার পরে লেখ ইতিহাসের সব চাইতে বিখ্যাত লোকদের তিনজন—মহাবিজ্ঞানী ম্যারাকট্, ছারপোকা সংগ্রাহকদের উদীয়মান তারকা হেড্‌লে আর সেরা মেকানিক, মেরিব্যাঙ্কের গর্ব বব্ স্ক্যান্‌ল্যান্ সব্বাই মিলে সমুদ্রের তলা থেকে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে' সাহায্য চাইছে। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

'বেশ, তার পর -'

'তার পর লোকেরা যা করবার করবে আর কি। এটা এমন একটা চ্যালেঞ্জ যা তারা না নিয়ে থাকতে পারবে না। স্ট্যানলী যেমন খুঁজে বের করেছিলেন লিভিংস্টোনকে তেমনি ব্যাপার আর কি। আমাদের টেনে তোলা, বা আমরা যদি নিজেরাই লাফ মেরে উঠতে পারি তো আমাদের লুফে নেওয়া, এ সব মাথাব্যথা ওদের।'

'প্রফেসর বললেন, 'আমরাই তার উপায় বলে' দিতে পারি। ওরা এইখানে ওলন নামিয়ে দিক, আমরা নজর রাখব কোথায় সেটা এসে পড়ে। তার পর তাতে ক'রে' একটা বার্তা পাঠিয়ে তাদের বলব আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে।'

'স্ক্যান্‌ল্যান্ লাফিয়ে উঠে বললে, 'যা বলেছেন! আলবৎ এই হচ্ছে ঠিক ফন্দী।'

'ডাঃ ম্যারাকট্ বললেন আমার দিকে চেয়ে, 'এবং যদি কোনও মহিলা আমাদের অদৃষ্টের ভাগী হতে ইচ্ছা করেন তবে তিনজনের জায়গায় চার জনেও কিছু আটকাবে না।' তাঁর মুখে একটা দুষ্টু হাসি খেলে গেল!

'স্ক্যান্‌ল্যান্ বললে, 'তা যদি বলেন, তাহলে চারও যা পাঁচও তাই!—যাক্, মিঃ হেড্‌লে, মতলবটা বুঝলে তো এবার। ঐ কথা লিখে দাও। বাস্, ছ মাসের মধ্যে আমরা লণ্ডনের টেম্‌স্ নদীতে জাহাজ ভিড়োব।'

'অতএব এইবার আমরা আমাদের কাঁচের গোলা দুটি জলে ছেড়ে দিলাম। তোমাদের আকাশে যেমন হাওয়া, আমাদের আকাশে তেমনি জল। আমাদের ছোট বেলুন দুটি উপর দিকে উঠে যাবে। দুটিই কি মাঝপথে মারা যাবে? অসম্ভব কি? না আমরা আশা করতে পারি যে অন্ততঃ একটা এই জল পেরিয়ে চলে' যাবে? সেটা অদৃষ্টের হাতেই ছেড়ে দিলাম। আপাততঃ বিদায়।'

এইখানে এই কাঁচগোলকের ভিতরে পাওয়া লিপিখানি শেষ হয়েছে। ক্রমশঃ

লোটন এখন

আশা দেবী

জানলা দিয়ে এলেই দখিন হাওয়া
লোটন ভাবে সর্দি হবে তার—
বৃষ্টি এলেই কী তার চ্যাঁচামেচি ;
'নিমোনিয়া !—আন ডেকে ডাক্তার।'
একটুখানি রোদ লেগেছে গায়ে—
অমনি ভাবে নির্ঘাৎ স্নান স্ট্রোক্।
টপাৎ টপাৎ গিলছে ওযুধ খালি
হয়রান তার বাড়ির যত লোক !

দিল্লী থেকে স্যাণ্ডো মামা এল
তাগড়া জোয়ান, মেজাজ ভারী কড়া
কান ধরে তার হ্যাঁচকা দিয়ে বলে
'লক্ষ্মীছাড়া শরীরটাকে নড়া।'
ঘণ্টা দুয়েক চুবিয়ে দিলো জলে
দুপুর রোদে রাখলো ছাদে খাড়া—
লম্বা লাঠি বাগিয়ে নিয়ে হাতে
সারা বিকেল করলো মাঠে তাড়া।

স্যাণ্ডো মামার কড়া দাওয়াই খেয়ে।
অসুখ—ওষুধ কোথায় পগার পার—
রৌদ্রে জলে শক্ত শরীরখানা,
লোটন এখন মস্ত খেলোয়াড় ॥

কৃতজ্ঞ মৌমাছি

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

চীন দেশের গল্প

গভীর একটা বন্য বন পার হলেই চোখে পড়ে ছোটখাট একখানা ঘর সেখানে বাস করত এক তরুণ ছাত্র। সে থাকতো একা, একা, সঙ্গী সাথী কেউ ছিল না। দিনরাত পড়াশোনো নিয়েই সে ডুবে থাকতো! শুধু যে ছাপার বই পড়ত, তা নয়। বনের ভিতরের জীবন্ত প্রকৃতি থেকেও সে পাঠ নিত। আশে পাশে বনের গাছপালা আর প্রাণীদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করত খুব মনোযোগের সঙ্গে আর যা দেখত, তাই নিয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করত বসে বসে। তারপর সে যা দেখেছে, শিখেছে আর ভেবেছে সে সব নিয়ে বই লিখত। বইগুলো নিশ্চয়ই লোকের কাজে লাগবে, এই সে ভাবত।

একদিন কতগুলো গুব্‌রে পোকা মাটির নিচে গর্ত খুঁড়ে নতুন বাসা তৈরি করছিল। ছাত্রটি বসে বসে একমনে ওদের কাজ দেখছিল। এই করতে করতে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল। আগের দিন প্রায় সারারাত জেগে সে বই লিখেছে। শরীর ছিল খুব ক্লান্ত। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানে না। হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনে সে চমকে জেগে উঠল—'আমাকে বাঁচাও'। কে কোথায় আছ, ওগো, আমাকে বাঁচাও।'

সে উঠে বসে চারিদিকে তাকাতে লাগল। দেখল কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে একটি মেয়ে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে। চোখে তার ভয়ের চাউনি, দুই গাল বেয়ে বড় বড় দু ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। মেয়েটির সাজ পোশাক কৃষক কন্যার মত।

ছাত্রটি ছেলেবেলা থেকেই বনের ভিতরে বাস করে আসছে। জীবনে সে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করেছে খুবই কম। সংসারে মেয়ে পুরুষ সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল না বল্লেই চলে। মানুষের চেয়ে বনের পাখি আর পোকামাকড় সম্বন্ধেই বরং সে জানত বেশি। যে মেয়েটি সাহায্যের জন্য তাকে ডেকেছিল, সে ছিল অপরূপ সুন্দরী। তাকে দেখে ছাত্রটি থতমত খেয়ে গেল। কি যে বলবে, কিছুই ভেবে উঠতে পারল না।

এদিকে কিন্তু মেয়েটি আবার আর্তনাদ করে উঠল,—'ওগো, আমাকে বাঁচাও। লুকিয়ে থাকবার একটা জায়গা আমাকে দেখিয়ে দাও। নইলে আমার আর বাঁচবার উপায় নেই।' তখন সে দৌড়ে মেয়েটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—'কি হয়েছে তোমার? লুকোতে চাও কেন? এত ভয় পাচ্ছ কিসের জন্যে?'

মেয়েটি জবাব দিল—'দুষ্টু পরী চু-চোর ভয়ে আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। ও আমাকে দেখতে পেলে মেরে ফেলবে।'

'কেন? তোমাকে সে মেরে ফেলতে চায় কেন?'

'শোন। আমি একজন রাজার মেয়ে। একজন রাজপুত্র আমার বাবার কাছে এসে আমাকে বিয়ে করতে চাইলেন। এতেই হল রাজকন্যা চু-চোর হিংসে আর রাগ। ওর মত দুষ্টু পরী আর নেই। রাজপুত্র সা-ওয়াং-এর কিনা অগাধ টাকা পয়সা, তাই চু-চো তাঁকে বিয়ে করতে চায়।'

ছাত্রটি জিজ্ঞেস করল—'আর তুমিও সেই রাজপুত্রকে বিয়ে করতে চাও নাকি?'

রাজকন্যা বললেন—'মোটেই না। রাজপুত্র বয়সে বুড়ো বললেই হয় আর মোটা থপ্‌থপে। দেখতেও ভারি বিশ্রী। ওঁকে বিয়ে করা মানেই ওঁর টাকা পয়সাকে বিয়ে করা। তার চেয়ে সারাজীবন গরীব থাকতেও আমি রাজী আছি। কিন্তু আরও দেরি করা চলে না। আমাকে শিগগির কোথাও লুকিয়ে রাখ। রাজকন্যা চু-চো আমার পিছনে পিছনেই আসছে। সে এসে পড়ল বলে।'

'এই ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে বসে থাক। তাহলেই বোধহয় তোমাকে আর দেখতে পাবে না, চলে যাবে।'

'না, না। বাবা, তার যা চোখ। ওখান থেকে ঠিক সে আমাকে বের করে ফেলবে, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।'

ছাত্রটি তখন তার পুঁথি পড়া যাদুবিদ্যার কথা মনে মনে ভাবল। বলল—'দাঁড়াও, আমি তোমাকে একটা মৌমাছি বানিয়ে ফেলি, তাহলে তোমাকে দেখলেও সে আর কিছু বুঝতে পারবে না।'

রাজকন্যা বললেন—'তাহলে আর দেরি করো না, আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।' এই কথা বলতে না বলতেই মাটিতে ঝরা পাতার উপরে খস্‌খস্ শব্দ শুনতে পাওয়া গেল।

ছাত্রটি মনে মনে বলল—'জাদুবিদ্যাটা ফলবে কিনা তাই ভাবছি।' পুঁথিপত্র পড়ে সে নানা রকমের জাদুবিদ্যা শিখেছিল সত্য, কিন্তু মানুষের উপরে কোনদিন প্রয়োগ করার চেষ্টা করে দেখেনি। এদিকে কিন্তু আর একটুও সময় নেই। এক্ষুণি তাকে চেষ্টা করে দেখতে হবে। যদি ফল হয় ত হল নইলে কি আর করবে?

সে দৌড়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে একটা ছোট বোতল নিয়ে এল। তারপর তার থেকে রাজকন্যার গায়ে সাত ফোঁটা ওষুধ ছিটিয়ে বলল—'ছোট্ট মৌমাছি হয়ে উড়ে চলে যাও। বিপদ কেটে গেলে আমার কাছে ফিরে এসো, তখন তুমি আবার সুন্দরী রাজকন্যা হয়ে যাবে।'

এক মুহূর্তের মধ্যে রাজকন্যার আর দেখা নেই। তার বদলে এক মৌমাছি ছাত্রটির মাথার

উপরে ঘুরে ঘুরে গুন গুন করতে লাগল। তারপর সে দূরে উড়ে গিয়ে একটা ফুলের মধু খেতে আরম্ভ করে দিল। ঠিক তখনই রাজকন্যা চু-চো হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে ছাত্রটির কাছে জিজ্ঞেস করল—'এদিক দিয়ে কোন মেয়েকে কি তুমি যেতে দেখেছ, দেখতে রাজকন্যার মত?'

সে বলল—'না', মনে মনে ভাবল মিথ্যে কথা বলা হয় নি। যে মেয়েটি বিপদে পড়ে তার কাছে এসেছিল তাকেও আসলে একটি সুন্দরী কৃষককন্যার মত দেখাচ্ছিল, রাজকন্যার মত নয়।

রাজকন্যা চু-চো মনের ঝাঁঝ সামলে রাখতে না পেরে বলল—'তাহলে সে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনো দিক দিয়ে পালিয়েছে। আমি পাহাড়ের উপর থেকে তাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। তুমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলে, তা নইলে তাকে দেখতে পাবে না কেন?'

ছাত্রটি জবাব দিল—'তা হবে বোধ হয়। হ্যাঁ, এখন ত সত্যিই আমার মনে পড়ছে, ঐ গাছের তলায় শুয়ে থাকতে থাকতে আমি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।'

এদিকে রাজকন্যা চু-চো রাগে একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়েছে। ঠিক তখনই তার মাথার চারপাশে একটা মৌমাছি ভোঁ ভোঁ করে ঘুরতে লাগল। একবার তার গায়ে হুল ফুটিয়ে দিল।

রাজকন্যা চু-চো একেবারে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'জ্বালাতন করলে হতভাগা মৌমাছিটা। ধরতে পারলে একেবারে পিষে ফেলতাম।' মৌমাছিটা ততক্ষণে উড়ে পালিয়ে গেছে।

রাজকন্যা চু-চোর স্বভাব ছিল প্রতিহিংসায় ভরা। কারো বিরুদ্ধে একবার তার মন বিষিয়ে উঠলে আর কথা নেই। মনের ঝাল না মেটানো পর্যন্ত তার সোয়াস্তি হত না। ছোট্ট মৌমাছির কপালে তাই দুর্ভোগ লেখা ছিল। রাজকন্যা যখন তাকে পিষে ফেলবার কথা বলছিল, তখন সত্যি সত্যি তাকে মেরে ফেলতেই চেয়েছিল। শুধু যে রাগের মাথায় একটা কথার কথা বলেছিল, তা নয়। সে ছিল কিনা পরী, তাই তার ক্ষমতা ছিল অসীম। সে দশজন বামন দৈত্যকে ডেকে পাঠাল। তারা ছিল রাজকন্যা চু-চোর হুকুমের চাকর।

তাদের সে বলল—'বনের ভিতরে যত মাকড়সা আছে, তাদের সবাইকে জানিয়ে দাও আমার হুকুম—মৌমাছি দেখতে পেলে একটাকেও ছাড়বে না, সব কটাকে জালে আটকে মেরে ফেলবে।'

এদিকে মৌমাছি হয়ে গিয়ে সেই রাজকন্যা দেখল যে সে দিব্যি উড়ে বেড়াতে পারে। তখন তার কি আনন্দ! প্রথমেই সে করল কি, ছাত্রটির ঘরের জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ তার খাতাপত্র আর ছবিগুলো দেখে দেখে রাজকন্যা বোঁ বোঁ করে উড়ে বেড়াতে লাগল। টেবিলের উপরে ছিল একরাশি পরিষ্কার সাদা কাগজ, তার উপরে তখন পর্যন্ত কালির আঁচড়টি পড়েনি। কি একটু চিন্তা করে মৌমাছিটি দোয়াতের কাছে উড়ে গিয়ে কালির ভিতরে বেশ করে তার পাগুলো ডুবিয়ে নিল। তারপর সেই সাদা কাগজের কাছে ফিরে গিয়ে পায়ের কালি দিয়ে তার উপরে একটি শব্দ লিখে রাখল। লিখেই ঘর থেকে বেরিয়ে উড়ে চলল দূরে অনেক দূরে।

এইভাবে উড়ে বেড়াতে পারার আনন্দে সে তখন মশগুল। এক ফুল থেকে আর এক ফুলে, এক ঝোপের উপর থেকে আর এক ঝোপে সে নেচে বেড়াতে লাগল আর ভাবতে লাগল, মৌমাছির

জীবন ত বেশ মজার ! মৌমাছি হয়েই চিরজীবন কাটিয়ে দিতে পারলে মন্দ কি ! কিন্তু তার এই ইচ্ছা বেশীক্ষণ রইল না। কেন, তার কারণ বলছি।

উড়ে যেতে যেতে সে দেখতে পেল, সরু পথের ওপারে একটা ঝোপে একেবারে ফুলে ফুলময়, আর ফুলগুলোতে টস্‌ টস্‌ করছে মধু। মধু খাওয়ার লোভ সে আর সামলাতে পারল না। সে উড়ে চলল। কিন্তু সমস্ত পথ জুড়ে একটা মাকড়সার জাল দেয়ালের মত আগলে রেখেছে ঝোপটাকে। জালটা দেখতে কী বড় আর তার সুতোগুলোই বা কী শক্ত !

সে তাকিয়ে রইল সে দিকে। মাকড়সাটা চুপ করে বসেছিল জালের বাসার মাঝখানে। মৌমাছিকে দেখতে পেয়ে সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস তরল—'ওগো ছোট্ট মৌমাছি, আমার বাসাটা তোমার কেমন লাগে ?'

মৌমাছি জবাব দিল —'খুব চমৎকার বলেই ত মনে হয়। তুমি একলা এরকম একটা সুন্দর বাসা বানিয়ে ফেলতে পার, তোমার বাহাদুরী আছে বটে।'

মাকড়সা বলল—'ভিতরটা আরো চমৎকার। এসে একবার দেখে যাওনা।'

'আমার তো আর বেশি সময় নেই, আমাকে ফিরে যেতে হবে। আচ্ছা, এই খানিকক্ষণের জন্য আমি একবার আসছি।' এই বলে মৌমাছিটি জালের ভিতরে উড়ে গেল।

কিন্তু মাকড়সার জালের সুতোর ভিতরে একবার গিয়ে পড়তেই মৌমাছি বুঝল যে ওখান থেকে বেরিয়ে আসার আর উপায় নেই। সে বন্দী হয়ে গেছে। যতই ছট্‌ফট্‌ করে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, ততই সে জালের জটের ভিতরে আরো জড়িয়ে পড়ে। এদিকে মাকড়সা দেখল বন্দী ভাল ভাবেই আট্‌কা পড়েছে, আর পালিয়ে যেতে পারবে না। তখন সে জালের মাঝখানে তার আরামের কোণটিতে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ল। আর শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগল একটা সুন্দর বড় মৌমাছি সে ধরতে পেরেছে শুনে দুষ্টু পরী যেন তাকে পুরস্কার দিতে আসছে।

এ দিকে রাজকন্যার খোঁজে চু চো অন্য পথ ধরতেই ছাত্রটি মৌমাছির খোঁজে সে-তল্লাটে একেবারে তোলপাড় লাগিয়ে দিল। রাজকন্যাকে নিজের রূপে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে চট্‌পট্‌। সে ঝোপগুলোর ভিতরে খুঁজে দেখল, ফুলের পর ফুলের পাপড়ির ভিতরে তন্ন তন্ন করে খুঁজল, কিন্তু মৌমাছির দেখা পেল না। একটা ধ্যাবড়া মৌমাছিকে সে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু সেটা যে কিছুতেই রাজকন্যা হতে পারে না, সে তা ভাল ভাবেই জানত।

খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে সে ক্রমেই বনের ভিতরে ঢুকতে আরম্ভ করল। তারপর আরো ভিতরে। এইভাবে চলতে চলতে শেষটা সে সেই মাকড়সার জালের কাছে এসে হাজির হল। সারা পথ জুড়ে জালটা আড়াআড়ি ভাবে ঝুলছে। দেখল, সেখানে একটা মৌমাছি মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে।

মৌমাছি-রূপী রাজকন্যা তাকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল—'আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচিয়ে দাও আবার।'

ছাত্রটি মাকড়সার জাল ছিঁড়ে মৌমাছিকে মুক্ত করল। তারপর সে রাজকন্যার নিজের রূপকে ফিরিয়ে আনবার জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করল। দেখতে দেখতে রাজকন্যা আবার সেই সুন্দরী কৃষক কন্যার পোশাকে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে সে কথা বলতে যাবে এমন সময় অবাক হয়ে দেখল, রাজকন্যা একজোড়া বাদামী রঙের বড় ডানা মেলে গাছের উপর দিয়ে উড়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সে তার মন্ত্র বলতে একটু ভুল করে ফেলেছিল। তাই রাজকন্যার গায়ে ডানা লেগে রইল, খসে পড়ে নি।

সে রাজকন্যার দেখা আর কোনোদিন পায়নি। তাঁর কি হল, তাও জানতে পারেনি, কিন্তু বাড়িতে ফিরে গিয়ে সে দেখতে পেল, সাদা কাগজে বাঁকাচোরা ভাবে একটি শব্দ লেখা আছে—'কৃতজ্ঞ'। দেখে মনে হল, যেন কোন পোকা কালিতে পা ডুবিয়ে এই কাজটি করেছে।

লেখার দিকে তাকিয়ে তার কেবলই মনে হতে লাগল, হায়, মন্ত্র বলতে কেন তার এমন ভুল হল। রাজকন্যা কোথায় হারিয়ে গেলেন চিরদিনের মত!

রঙের কলম

নির্মলেন্দু গৌতম

সকাল বেলার সূয্যি সে যে
লাল কলমে আঁকা!
আকাশখানা নীল কলমের
নীল কালিতে মাখা!

সবুজ কালির কলম খানি
গাছপালা সব এঁকে,
তেপান্তরের দেশ দিয়েছে
সবুজ রঙে ঢেকে!

সাতটি রঙের কলম দিয়ে
রামধনুটি আঁকা;
সেই কলমেই হচ্ছে রঙিন
লক্ষ পাখির পাখা!

যার কাছে সেই রঙ-বেরঙের
কলমগুলি আছে,
সত্যি তাকে যায় না দেখা,
যায়না পাওয়া কাছে!

যেমন কর্ম তেমনি ফল !

স্রখলতা রাও

১

২
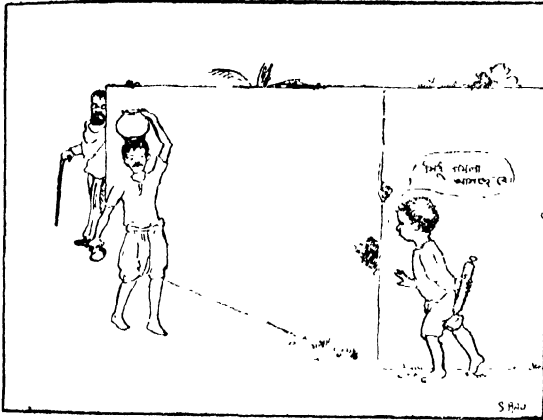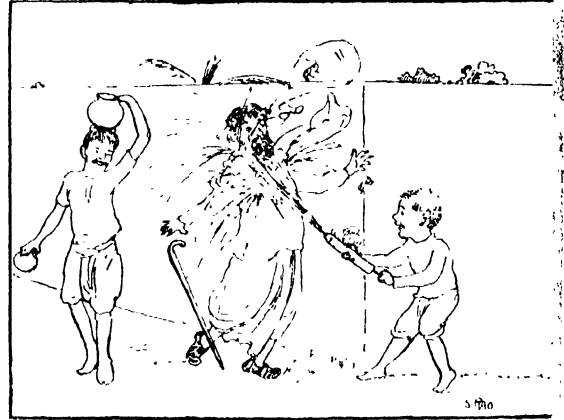
১। 'সিধু গয়লা আসছে রে !'

২। 'ইস্কুলের দেরী হল।'

'দুধে রোজ জল দেয়, এবার জল খাওয়াব !'

৩

৪

৪। 'এই রে ! মাস্টার মশাই !'

'তবে রে ! ইস্কুল পালান।'

স্মৃতিকণা

(শিমলা শৈল)

যোগেশ চন্দ্র মজুমদার

গত মাঘ মাসের সন্দেশে আমি যে অপূর্ব সর্প দর্শনের কথা লিখিয়াছিলাম তাহা ছিল কৃত্রিম সর্পের। এবারে হিমালয়ের সুবৃহৎ বিষাক্ত জীবন্ত সর্পের সহিত আমাকে কি ভাবে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিব। সেই দিনটির কথা মনে করিলে এখনও যেন মনে আতঙ্ক জাগিয়া উঠে, এই ঘটনাটির সঙ্গে হিমালয়ের পশু ও পাখির দুই একটি ঘটনারও উল্লেখ করিব। উহা অনায়াসে সন্দেশের 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তরে' অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে এবং হয়তো তোমাদের কৌতূহলও উদ্রেক করিতে পারে।

সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর কাল শিমলার কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসে আমার অতিবাহিত হয়। অবশ্য সারা বৎসর শিমলায় থাকিতে হইত না। গ্রীষ্মের সাতমাস শিমলায় থাকিতাম এবং বাকি পাঁচ মাস কলিকাতায় কাটিত। ১৯১২ সালে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইলে উহা শিমলা-দিল্লী হইয়া দাঁড়ায়। ১৯৪০ সালে দিল্লী থাকিতে আমি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করি। দিল্লীর প্রখর গ্রীষ্ম ও প্রচণ্ড 'লু' এড়াইবার জন্য ইহার পরে উপর্য্যুপরি চারি বৎসর শিমলায় কাটাই। যে ঘটনাটি উল্লেখ করিব এই সময়েই তাহা ঘটে।

১৯০৭ সালে যখন শিমলায় প্রথম যাই তখন ছোট শিমলা পল্লীতে আসিয়া উঠি। এই পল্লীটিতে তখন পঁচিশ ত্রিশ ঘর বাঙ্গালী পরিবার বাস করিতেন। পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। পল্লীটির পরিবেশ ও বেশ সুন্দর ছিল। পল্লীটির ভিতর কয়েকটি সুবৃহৎ পাইন (স্থানীয় ভাষায় কেলু) গাছ ছিল। নিকটেই পাঞ্জাব সেক্রেটেরিয়েটের Ellerslic নামক সুবৃহৎ প্রস্তর নির্মিত সুদৃশ্য প্রাসাদ স্বরূপ ভবন। ছোট শিমলার বাজার যেখানে শেষ হইয়াছে 'কুসুম্‌টি' নামক উপকণ্ঠটি সেখানেই আরম্ভ। ইহার ভিতর দিয়া একটি রাস্তা 'জুংগা' নামক তদানীন্তন ভারতীয় একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। পথে অশ্বিনী নামে একটি পার্বত্য নদী পড়িত। ইহা ছাড়া ছোট শিমলার কাছাকাছি অনেকগুলি সুন্দর বেড়াইবার স্থান ছিল। অবসর গ্রহণের পর যখন শিমলায় পুনরায় আসি তখন এই ছোট শিমলা পল্লীতেই আসিয়া উঠি।

প্রাতর্ভ্রমণ আমার চিরকালের অভ্যাস। শিমলায় থাকিতে সূর্যোদয়ের পূর্বে ভোরে বেড়াইতে বাহির হইতাম। প্রত্যহ প্রায় ৫।৬ মাইল বেড়াইয়া আসিতাম। এখন কি তুষার পাতের সময়েও দুই তিন মাইল বেড়াইয়া আসিয়াছি। সূর্যোদয় কালে চিরতুষার শ্রেণী হিমালয়ের সু উচ্চ পর্বত শিখরগুলি যে অপরূপ রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উঠিত তাহা দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া উঠিত। ছোট শিমলার অনতিদূরেই যে সর্বাপেক্ষা মনোরম স্থানটি ছিল, উহার নাম ছিল Chota Chelsea। ইহা একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র পর্বত।

ইহার শীর্ষদেশে Jesus-Marie Convent ও তৎসংশ্লিষ্ট হোস্টেল। ইহার নিকটেই গির্জার Archbishopএর বাড়ি। পর্বতের অপর পার্শ্বে পাঞ্জাবের মালের কোটলা নামক স্থানের জমিদারের বৃহৎ ভবন। আর কোনও বাড়ি ছিল না।

এই পাহাড়টি ঘিরিয়া যে নির্জন পথটি চলিয়া গিয়াছে উহা সহজেই মনকে আকর্ষণ করে। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক Sir Edward Buck তাঁহার Simla—Past and Present বহিতে (যাহা লর্ড কার্জনের আদেশে লিখিত হয়) এই পথটিকে One of the finest walks in and around Simla বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই পথটির এক স্থানে একটি বেঞ্চ পাতা ছিল। তাহার পাশ দিয়া দিদারগড় নামক ছোট পাহাড়ী গ্রামের পথটি নামিয়া গিয়াছে। আমি এই বেঞ্চে বসিয়া অনেক সময় পথশ্রম দূর করিতাম। সম্মুখে পর্বতের দৃশ্য অতি মনোরম।

যে ঘটনাটির কথা উল্লেখ করিব তাহা এই পথটিতেই ঘটে। সেইদিন প্রাতঃ ভ্রমণের পর, বেঞ্চটিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বাড়ি ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হই। তখন সবে মাত্র সূর্যোদয় হইয়াছে। রাস্তায় লোক চলাচল আরম্ভ হয় নাই। বেঞ্চটি ছাড়িয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি বাঁকের নিকট যেমন পৌঁছিয়াছি তখন মনে হইল পিছন হইতে আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া একটি ছোট গাছের শাখা অথবা ঐরূপ কোন দ্রব্য কেহ ছুঁড়িয়া মারিল।

মনে হইল নিকটস্থ গ্রামের কোনও দুষ্ট ছেলের কাজ, মজা দেখিবার জন্য এরূপ করিয়াছে কিন্তু পাহাড়ী ছেলে মেয়েদের সঙ্গে আমার যেরূপ পরিচয় ছিল তাহারা যে অমন কাজ করিবে তাহা মনে হইল না। ইহারা অত্যন্ত শান্ত ও সরল প্রকৃতির। তবুও একবার পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে সম্মুখে একবার চাহিয়া দেখিলাম কিন্তু এবারেও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অতঃপর যাহা চোখে পড়িল তাহা দেখিয়া মনে যে আতঙ্ক জাগিয়া উঠিল তাহা বলিবার নহে। চোখে না দেখিলে উহা বিশ্বাস করিয়া উঠা কঠিন।

দেখি যে আমার ডান পায়ের কাছেই, এক হাত দূরে হইবে, একটি সুবৃহৎ গোখুরা সাপ (Hamadryad) কয়েকটি কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বুঝিলাম পার্শ্বের পাহাড়ের শীর্ষদেশ হইতে পড়িয়াছে এবং নামিবার সময়ে আমার শরীরে প্রতিহত হইয়া নিচে রাস্তায় পড়িয়াছে। পাহাড়টি বৃক্ষলতাহীন, সমতল চট্টানের মত; কোনও অবলম্বন না পাইয়া সাপটি ২০০।৩০০ ফিট নিচে আসিয়া পড়িয়াছে। সাপটিকে দেখিয়া মনে হইল উহা হয়তো মরিয়া গিয়া থাকিবে, অথবা অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। সত্যই কি হইয়াছে দেখিবার জন্য ঐ স্থানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

প্রায় দশ মিনিট অপেক্ষা করিবার পর দেখি উহার দেহ সামান্য নড়িয়া উঠিল এবং কিছু পরে সাপটি কষ্ট করিয়া তাহার মাথাটি তুলিবার চেষ্টা করিল। আমি তাহা লক্ষ্য করিয়া কিছু দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণ পরে সাপটি পাহাড়ী রাস্তার ধারে যে বড় বড় ঘাসের ঝোপ ছিল তাহার মধ্যে নিজের শরীরটি প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেছে দেখিলাম। সমস্ত শরীরটি যে তাহার কত দীর্ঘ তাহা এইবার আমার দেখিবার অবকাশ হইল। মনে হইল উহার যেন শেষ নাই। দশ বারো

হাত দীর্ঘ হইবে মনে হইল কারণ তাহার দেহটি অদৃশ্য হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। পাহাড়ী গোখুরা সাপ যে এত দীর্ঘ হইয়া থাকে তাহা আপিসের এক সাহেবের নিকট শুনি। তিনি বন্দুকের গুলি করিয়া এইরূপ সাপ একবার মারিয়াছিলেন।

অতঃপর সাপটি কোথায় গেল তাহা দেখিবার জন্য উহার পিছন লইবার ইচ্ছা হইল, তবে এ কথাও একবার মনে হইল যে উহা করা যুক্তিসঙ্গত হইবে কি না। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম যে যখন আমি সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও উহার কোনও অনিষ্ট করি নাই। উহা হইতেও আমার অনিষ্ট হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

যাহা হউক, সম্মুখেই পাহাড়ের যে বাঁকটি ছিল তাহা অতিক্রম করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, দেখি যে সাপটি ঘন ঝোপের ভিতর হইতে প্রায় দুই তিন ফুট উচ্চে, মুখ বাহির করিয়া, দেহটি স্থির রাখিয়া অবস্থান করিতেছে। দুইটি জিহ্বা বিদ্যুৎগতিতে মুখের মধ্যে যাতায়াত করিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় আমি উহার খুব নিকট দিয়া গেলেও (এক হাত দূরে) আমাকে কিছুই করিল না, এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল মাত্র।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, দেখি যে একটি ইংরাজ মহিলা তাঁহার terrier কুকুরটিকে লইয়া প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ভাবিলাম তাঁহাকে একবার সতর্ক করিয়া দিই কিন্তু মনে হইল যদি ইতিমধ্যে সাপটি আত্মগোপন করিয়া থাকে ত মহিলাটি আমি যে তাঁহাকে খুব পরিহাস করিয়াছি মনে করিয়া আমাকে অভিশাপ দিতে কার্পণ্য করিবেন না! যাহা হউক আরও কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর দেখি আর একজন ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ ইংরাজ যুবক হন্‌ হন্‌ করিয়া আগাইয়া আসিতেছে। হাতে তাহার বেতের ক্ষুদ্র সংস্করণ। ভাবিলাম ভালই হইল, মহিলাটি যদি সত্যই কোনও বিপদে পড়িয়া থাকেন ত সে গিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে পারিবে।

বাড়িতে ফিরিয়া কাহাকেও এই বিপজ্জনক ঘটনাটির কথা প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু পরদিন প্রাতে বহুবিলম্বে যখন আমাদের পাহাড়ী গোয়ালা পরশুরাম দুধ লইয়া আসিল, বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে জানাইল যে যে-রাস্তা দিয়া প্রত্যহ সে দুধ আনে সেই পথে একটি সুবৃহৎ বিষাক্ত সাপ দেখা দিয়াছে। এরূপ বড় সাপ নাকি প্রায় দেখা যায় না। তাহাকে মারিবার অনেক চেষ্টা হইতেছে কিন্তু উহা বিফল হইয়াছে।

সকলে ঐ পথে চলা ত্যাগ করিয়াছে। অনেক পথ তাহাকে ঘুরিয়া আসিতে হইয়াছে। বাড়ির সকলেই জানিতেন আমি ঐ পথে প্রায়ই প্রাতঃ ভ্রমণে যাই সুতরাং আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন যেন ঐ পথে কিছুদিনের জন্য আর না যাই। তাঁহাদের কথা শুনিয়া আমি মনে মনে হাসিলাম মুখে কিছু প্রকাশ করিলাম না। কয়েক মাসের পর সমগ্র ঘটনাটি সকলের কাছে বিবৃত করি। তাঁহারা উহা শুনিয়া আমার যে অসীম সাহসের প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ বাহুল্য!

পরবর্তী ঘটনাটি পাহাড়ী 'লক্কড়' (নেকড়ে) বাঘ সম্বন্ধে। এই ঘটনাটিও উপরি-উক্ত পথটিতেই

ঘটে। অক্টোবরের শেষ, শীত তো পড়িয়া গিয়াছে, নিয়মিত প্রাতঃ ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। সমস্ত পাহাড়টি পরিভ্রমণ করিয়া বাড়ি ফিরিতেছি, হঠাৎ একটি বাঁক যেমন পার হইয়াছি দেখি যে সম্মুখেই, ২০।২৫ হাত দূরে,—এক জোড়া সুপুষ্ট বৃহৎকার 'লক্কড়' বাঘ। ইহাদের নাম পূর্বে শুনিয়াছিলাম কখনও দেখি নাই। নূতন জন্তু দেখিয়া যেমন আনন্দ হইল, আতঙ্কও যে হয় নাই এমন নহে। যদিও জানিতাম ইহারা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের আক্রমণ করে না। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, Convent-এর হোস্টেলের রান্নাঘরটি যেখানে অবস্থিত তাহার ঠিক নিম্নেই পথের উপরে দাঁড়াইয়া ইহারা হাড় চিবাইতে ছিল। রান্নাঘর হইতে বাবুর্চিরা এই স্থানটিতে উপর হইতে হাড়, মাংস প্রভৃতি ফেলিয়া দিত। কতক পথে পড়িত, কতক খডে পড়িত। সে জন্য এই স্থানটিতে চিল, কাক, শৃগাল প্রভৃতি প্রাণীরা ভিড় করিত। আজ শুধু বাঘ দুইটিই চোখে পড়িল।

ইহারা শীতের সময়, উপর পাহাড়ে যখন খাদ্যের অভাব ঘটে, নিচে নামিয়া আসে। শিমলা সহরেও সেই সময়েই ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। ঘরের পোষা বিড়াল, কুকুর, ছাগল প্রভৃতির বাঁধন ছিঁড়িয়া রাত্রে চুপি চুপি আসিয়া লইয়া যায়। পাহাড়ীদের শিশুদিগকেও ধরিয়া লইয়া যায় বলিয়া শুনিয়াছি কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের আক্রমণ করে না।

তবে একবার আমার অফিসের এক বুড়া চাপরাশিকে এক জঙ্গলের পথে তাড়া করিয়াছিল। সে একাকী পার্বত্য পথে দেশে ফিরিতেছিল। সে এতদূর ভয় পায় যে তাহাকে তিন চারিদিন শয্যাগত থাকিতে হয়।

বাঘ দুইটি সম্ভবতঃ আমাকে লক্ষ্য করে নাই। আমি আর অগ্রসর না হইয়া ধীরে ধীরে পিছু হটিয়া বহু পথ ঘুরিয়া শেষে বাড়ি ফিরিলাম।

শিমলায় লক্কড় বাঘ ছাড়া শীতের সময় snow leopard দেখা দেয়। একবার ডিসেম্বর মাসে প্রাতঃ ভ্রমণের সময় পথে দেখি দুইজন পাহাড়ি বাঁশে বাঁধিয়া একটি মৃত snow leopard লইয়া যাইতেছে। আকারে দেখিলাম ইহারা প্রায় লক্কড় বাঘের মতোই এবং দেখিতে অতি সুন্দর। তুষার শুভ্র গাত্রচর্মের উপর কয়েকটি কালো কালো ছোপ (spots)। বাঘটির প্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। এমন সুন্দর জন্তুটিকে যে মারিয়া ফেলা হইয়াছে তাহা জানিয়া মন দুঃখিত হইয়া উঠিল।

ভারতবর্ষের কোনও পশুশালায় এই বাঘ আছে কি না জানি না তবে কলিকাতা ও দিল্লীর পশু-শালায় দেখি নাই। এই জাতীয় বাঘ গ্রীষ্মের সময়ে সমতলে থাকিতে পারে না। একবার কলিকাতায় পশুশালায় শীতকালে একজোড়া মেরুপ্রদেশের সুবৃহৎ ভল্লুক দেখি। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তাহাদের বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। সেই শীতকালে সন্ধ্যার সময় জলে বরফ গলাইয়া Hose দিয়া তাহাদের স্নান করাইয়া দেওয়া হইতেছিল। তাহাদের নাম ছিল—Darby and Joan (ডার্বি ও জোন) অর্থাৎ বুড়া বুড়ী! দুঃখের বিষয়, শিমলায় যখন ফিরিয়া যাই, সংবাদ পত্রে জানিতে পারি যে গ্রীষ্মের কষ্ট সহ্য না করিতে পারিয়া তাহারা উভয়েই মারা পড়ে।

লক্কড় বাঘ ও snow-leopard ভিন্ন শিমলার পাশ্ববর্তী গ্রামগুলিতে হিমালয়ের বৃহদাকার কালো ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে ইহারা শস্য (ভুট্টা প্রভৃতি) পাকিলে ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া খাইয়া যায় ও নানাবিধ ক্ষতিসাধন করে। ইহারা হিংস্র প্রকৃতির, মানুষকে মারিয়া না ফেলিলেও আক্রমণ করিতে পিছুপাও হয় না। সেজন্য সন্ধ্যার পর স্থানান্তরে যাইতে হইলে গ্রামবাসীরা দল বাঁধিয়া যায়।

১৯১২ সালে গ্রীষ্মকালে আমরা কয়জন আত্মীয় ও বন্ধু মিলিয়া শিমলা হইতে ২৭ মাইল উত্তরে শতদ্রু নদী ও তাহার তীরস্থ উষ্ণ প্রস্রবণগুলি দেখিতে যাই।

শিমলা হইতে পাঁচহাজার ফুট নিম্নে অবতরণ করিয়া তদানীন্তন ক্ষুদ্র ভারতীয় রাজ্য ভোজ্জি নগরীর পাশ দিয়াই শতদ্রু বহিয়া গিয়াছে। বহু দুর হইতে ইহার ভীষণ গর্জন শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারই অপর তীরে অন্তঃসলিলা প্রস্রবণগুলি। আমরা প্রাতে যাত্রা করিয়া রাত্রি নয়টার সময় ভোজ্জি পৌঁছাই। বসন্তপুর পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়।

সেই স্থান হইতে সমতল উপত্যকাভূমি আরম্ভ হইয়াছে। পরিবেশ ঠিক বাংলা দেশের মত বোধ হইল। বহু চাষের ক্ষেত দেখিলাম। বাগানে আম, কলা, নেবু প্রভৃতি ফলিয়া রহিয়াছে চোখে পড়িল। মনে বড় আনন্দ হইল। কিন্তু এই স্থানটিতে যেমন পৌঁছিয়াছি, কয়েকটি পাহাড়ী গ্রাম্য লোকেদের সহিত দেখা হইল। আমাদের বিদেশী লোক দেখিয়া তাহারা সতর্ক করিয়া দিল যে এই পথ ধরিয়া সন্ধ্যাবেলায় ভল্লুকেরা উপদ্রব করিতে আসে। সুতরাং আমরা যেন এই স্থানটি অবিলম্বে পরিত্যাগ করি নতুবা হিংস্র ভল্লুক দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। আমরা ঐ স্থান শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া রাত্রি নয়টার সময়ে 'ভোজ্জি' নগরে পৌঁছি ও রাজার অতিথি হই। সুবৃহৎ ও মনোরম অতিথিশালা দেখিয়া মুগ্ধ হই। রাজার মন্ত্রী আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে আমরা শতদ্রু নদী ও উষ্ণ প্রস্রবণগুলি (স্থানীয় ভাষায় 'তাতা পানি') দেখিয়া প্রভূত আনন্দ পাই। যদি সুবিধা হয় ত এই উষ্ণ প্রস্রবণগুলি সম্বন্ধে পরে কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

ইহার পরে যে ঘটনাটির উল্লেখ করিব তাহা বহুকাল পূর্বে ঘটে। ১৯১১ সাল। আমি তখন কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসে নিযুক্ত। সে সময়ে আমাদের অফিস কলিকাতা যাতায়াত করিত তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রাজধানীর পরিবর্তন তাহার পর বৎসরে হয়। সাধারণতঃ আমরা অক্টোবরের শেষে নিচে নামিয়া যাইতাম কিন্তু সে বৎসরে George V দিল্লীতে আসিয়া দরবার করিবেন বলিয়া নভেম্বর পর্যন্ত আমাদের শিমলায় থাকিতে হয়। ১১ই নভেম্বর জীবনে প্রথম তুষারপাত দেখিবার সুযোগ হয়। সে যে কি অপরূপ সুন্দর তাহা বলিবার নহে। সে সময়ে আমার সতীর্থ সুলেখক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শিমলায় ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া কয়েকটি ফটোগ্রাফ তোলা হয়।

যে সময়ের কথা লিখিতেছি সে সময়ে আমার প্রায় সমবয়সী এক খুড়তুতো ভাইও কর্মোপলক্ষ্যে শিমলায় থাকিতেন। ছোট শিমলা হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে। প্রত্যেক রবিবারে আমাদের ছোট

শিমলার বাড়িতে আসিয়া তিনি সমস্ত দিন কাটাইয়া যাইতেন। দুজনে বৈকালে একত্রে বেড়াইতে বাহির হইতাম। যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন বেলা পড়িয়া যাইবার জন্য, বেশিদুর না গিয়া, উপরে যে মনোরম রাস্তাটির কথা লিখিয়াছি সেই পথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। তখন সন্ধ্যা হইবার বেশি বিলম্ব ছিল না। পথের যে স্থানটি হইতে দিদারগড় গ্রামে যাইবার জন্য অন্য একটি পাকদণ্ডির পথ নিচে নামিয়া গিয়াছে, তাহার উপরেই যেখানে পাহাড়ের ঢালটি নামিয়া আসিয়াছে, সেই ঢালটির উপরে গিয়া আমরা বসিয়া পড়িলাম।

বসিলাম বলা ঠিক হইল না, অর্ধশায়িত অবস্থায় থাকিতে হইল। স্থানটি খুব নির্জন। কিছুক্ষণ পরে মনে হইল, আমাদের পিছনে যে পাকদণ্ডিটি ছিল, তাহা দিয়া কেহ নামিয়া আসিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড গড়াইয়া আসিতেছে। আমরা ভাবিলাম কোনও পাহাড়ী হয়তো গ্রামের দিকে যাইতেছে। কিন্তু তাহাকে সম্মুখের রাস্তায় নামিতে দেখিলাম না। তখন পিছন ফিরিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে উভয়েরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইল এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা দাঁড়াইল।

এরূপ পরিবেশের মধ্যে যে পড়িতে হইবে তাহা পূর্বে কল্পনাও করি নাই। যখন পিছন দিকে তাকাইলাম, দেখি যে আমার গা ঘেঁসিয়া একটি সুবৃহৎ স্বর্ণশীর্ষ ঈগল আসিয়া বসিয়াছে ও পাহাড়ের মধ্যে তাহার আহার অন্বেষণ করিতেছে। নিশ্চিন্ত চিত্তে সে চারিদিকে চলা ফেরা শুরু করিল, আমাদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না।

এই পাখিটির একটু বর্ণনা আবশ্যক। এক উষ্ট্র পাখি (ostrich) ভিন্ন এত বড় পাখি এই প্রথম দেখিলাম। সমস্ত দেহ সোনার বরণ পালকে আবৃত। সুচিক্কণ, সুপুষ্ট দেহ। তাহার দৃপ্ত ভঙ্গীতে যে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা সত্যই রাজকীয়।

পুরাকালে ইহাকেই বোধকরি পক্ষীরাজ গরুড় বলিয়া অভিহিত করা হইত। চোখ দুইটির সুতীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বৃহৎ বক্র চঞ্চু এবং দুই পায়ে চারিটি করিয়া বৃহৎ নখর ও দুই পায়ের দৃঢ় মাংসপেশী চোখে পড়িল। ইহারা যে অনায়াসে মেষ ও ছাগশিশু প্রভৃতি ছোট জন্তু লইয়া আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে তাহা আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইল না। ছাত্রাবস্থায় স্কুলে Royal Reader নামক পাঠ্য পুস্তকে আছে যে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের এক কৃষক রমণীর ক্ষেত্রে শায়িত শিশু পুত্রকে একটি ঈগল পর্বতশীর্ষে নিজ বাসায় লইয়া যায় ও পরে কিরূপে ঐ রমণী অসম সাহসে দুরধিগম্য পর্বত শিখর হইতে নিজ সন্তানকে অক্ষত দেহে উদ্ধার করিয়া আনে। সেই অদ্ভুত ঘটনাটির কথা মনে জাগাইয়া তুলিল।

অতঃপর আমরা ভাবিলাম ঈগলটি যদি আমাদের আক্রমণ করে, আমরা কি করিয়া আত্মরক্ষা করিব। আমাদের কাছে লাঠি দেখিয়া যে সে ভয় পাইয়াছে তাহা মনে হইল না। আহার অন্বেষণ করিয়া চারিদিকে ঘোরা ফেরা শুরু করিল। আমাদের সমস্যা হইল কি করিয়া এ স্থান ত্যাগ করা যায়। শেষে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যেমন 'সড়-সড়ি' দিয়া নিচে নামিয়া পড়ে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া আমরা পাহাড় হইতে নিচে নামিয়া আসিলাম, গাত্র অনেক জায়গায় ছড়িয়া গেল। শেষকালে

পাহাড় হইতে লাফ দিয়া নিচের রাস্তায় পড়ি ও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি। তখনও দিনের সামান্য আলো ছিল।

পক্ষীটি পক্ষ বিস্তার করিয়া কি ভাবে উড়িয়া যায় তাহা দেখিবার খুবই ইচ্ছা ছিল কিন্তু পাখিটির উড়িবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। স্কুলে যখন পড়ি, তখন একবার Strand magazine যে একটি হিমালয়ের সুবৃহৎ স্বর্ণশীর্ষ ঈগলের ছবি (ফটো) প্রকাশিত হইয়াছে দেখি। পত্রিকাটিতে Curiousities বিভাগে উহা অন্তর্গত করা হইয়াছিল। শিমলার একজন ইংরাজ ঐ পাখিটি শিকার করিয়াছিলেন। পাখিটির বর্ণনায় বলা হইয়াছিল যে উহার পক্ষবিস্তৃতি ছিল ১৮ ফুট। আমাদের পাখিটির পক্ষ বিস্তার দেখিতে পাইবার কোনও সুবিধা হইল না।

ইহা ভিন্ন আর একবার কাছাকাছি ঈগল দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যা বেলায় জুংগার পথ হইতে ফিরিবার সময়ে শিমলার উপকণ্ঠ কুসুমটির নিকটবর্তী হইয়াছি, দেখি যে সম্মুখে অনতিদূরে পাহাড়ের একটি খাঁজে (ledge) একটি বাছুর চরিয়া বেড়াইতেছে। স্থানটি অনধিগম্য বলিলেই হয়, বাছুরটি কি করিয়া ঐ স্থানে পৌঁছিল তাহা বুঝা গেল না। ভাবিলাম হয়তো উপর পাহাড় হইতে নিচে হঠাৎ পড়িয়া থাকিবে, অনাহারে হয়তো মারা যাইবে। যাহা হউক, সেই পাহাড়টির খুব নিকটে যখন আসিয়া পড়িয়াছি, দেখিলাম যাহাকে বাছুর বলিয়া ভাবিয়াছিলাম উহা একটি সুবৃহৎ স্বর্ণশীর্ষ ঈগল। কিছু পরে পক্ষ বিস্তার করিয়া সে উপরের পাহাড়ের দিকে উড়িয়া গেল।

শিমলায় নভেম্বর মাসে Ladies Mile নামক রাস্তার উপরের আকাশে অনেক ঈগল উড়িতেছে দেখা যায়। উহারা এত উর্ধ্বে উড়ে যে তাহাদের চিল বলিয়া ভুল হয়। কাছে আসিলে উহাদের প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে। কলিকাতায় চিড়িয়াখানায় ঈগল পাখি বলিয়া যে নমুনাটি আছে তাহা শিমলার ঈগলের কাছে চিলের মতই দেখিতে। দেখিলে হতাশ হইতে হয়।

শিমলার পশু পাখিদের লইয়া উপরে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি। এখন দেখিতেছি যে আর একটি জন্তুর কথা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। সে হইল আমাদের অতি পরিচিত প্রাণী—চতুর্ভুর্জ বানর। শিমলায় হনুমান ও বাঁদর দুই-ই দেখা যায়। হনুমানেরা সংখ্যায় কম ও স্বভাবে অপেক্ষাকৃত শান্ত। ইহাদের সহরে আসিয়া উৎপাত করিতে দেখি নাই। কিন্তু বানরের কথা স্বতন্ত্র। ইহাদের উৎপাতে সহরবাসীদের সদাই সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। কাশী, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানের বানরের উৎপাতের কথা অনেকেই জানেন। তাহাদের তুলনায় উৎপাতে যে শিমলার বানরগুলি কম দক্ষ তাহা মনে হয় না।

এই বানর লইয়া আমাদের যে একবার কী দুর্গতি হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিব। ইহারা এক এক সময়ে যে কিরূপ ক্রুর হইয়া উঠে তাহা বুঝা যাইবে।

একদিন রবিবারে প্রবাসস্থ এক বন্ধুকে লইয়া প্রাতঃ ভ্রমণে বাহির হই। আমরা দুজনেই ছুটির দিনে বাড়িতে আবদ্ধ না থাকিয়া নিকটে বা দূরে বেড়াইতে যাইতাম। যেদিনের কথা লিখিতেছি সেদিন আমাদের 'জ্যাকো' (যক্ষ) পাহাড়ের শীর্ষে যে হনুমানজীর মন্দির আছে সেখানে যাইবার কথা হয়।

'জ্যাকো' কথাটি যক্ষের অপভ্রংশ। শুনা যায় এককালে নাকি যক্ষেরা এখানে বাস করিত। পাহাড়ীরা ইহাকে 'জাখু' বলিয়া অভিহিত করে।

বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছি, দেখি প্রবেশ দ্বারের মুখে বেড়াইতে যাইবার ফিটফাট্ পোষাক পরিয়া পাড়ার রজনীবাবুর ছোট ছেলেটি তাহার দিদির হাত ধরিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উভয়ের বয়ঃক্রম যথাক্রমে আট ও দশ। তাহাদের দেখিয়া একটু আশ্চর্য বোধ করিলাম। কথা-বার্তায় জানিলাম তাহাদের পিতা আমাদের সঙ্গে বেড়াইয়া আসিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। অত দূরে ও অত উচ্চ পাহাড়ে (৮০৪৮ ফুট) তাহারা যাইতে পারিবে কি না সন্দেহ প্রকাশ করাতে তাহারা বলিল যে দীর্ঘ ভ্রমণ তাহাদের অভ্যাস আছে। কোনও কষ্টবোধ হইবে না।

অগত্যা তাহাদের সঙ্গে লইতে হইল তবুও তাহাদের জন্য একটা ভাবনা রহিয়া গেল। কিছু পরে বাজারের রাস্তায় যখন পৌঁছিয়াছি দেখি যে আর একটি তের চৌদ্দ বৎসরের বালক (বন্ধু পুত্র) তাহাদের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আমরা হনুমানজীর মন্দির যাইতেছি শুনিয়া সে দৌড়িয়া বাড়ির ভিতর গিয়া মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিল ও নিকটস্থ দোকান হইতে বানরদের দিবার জন্য ছোলাভাজা প্রভৃতি কিনিয়া রুমালে বাঁধিয়া লইল ও নিজেদের জন্য একটি বড় কচি শসাও সঙ্গে লইল। শসাটি শেষে আমার বন্ধুটিকে পকেটে রাখিতে বলিলাম। তিনি উহা নিজের ওভার কোটের পকেটে রাখিয়া দিলেন।

পথে Ridgewood নামে একটি বাংলো বাড়ি পড়িল। উহার সম্মুখেই কতকটা মাঠের মত। উহার এক পার্শ্বে কতকগুলি বেঞ্চ রাখা ছিল এখানে সকলে মিলিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। মনে পড়িল কিছুদিন পূর্বে তক্ষশীলার নিকটে বুদ্ধদেবের যে অস্থি ও ভস্মরাশি আবিষ্কৃত হয় তাহা দেখিতে এই বাড়িতে আসি। Sir John marshall, Director-General of Archaeology তখন এই বাড়িতে বাস করিতেন। অস্থি ও ভস্মরাশি আমরা দেখিতে পাই নাই। উহার আধারটি দেখিয়াছিলাম। অস্থি ও ভস্মরাশি মার্শেল সাহেব নিরাপত্তার জন্য safeএ রাখিয়া দেন।

পথে কয়েকবার বিশ্রাম করিতে হইল। অবশেষে মন্দিরচূড়া দেখিতে পাওয়া গেল এবং আমাদের দেখিতে পাইয়া কেলু গাছ হইতে অনেকগুলি বানর আমাদের পিছু লইল।

মন্দিরে পৌঁছিয়া দেখিলাম ইহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে কয়েকটি তক্তপোশ পাতা রহিয়াছে। প্রাঙ্গণ হইতে কিছুদূরে গিয়া আমরা দাঁড়াইলাম। যে বালকটির হাতে ছোলাভাজা প্রভৃতি ছিল তাহা বানরদের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে বলিলাম। রুমালটি সে এতক্ষণ লুকাইয়া রাখিয়াছিল, যেমন বাহির করিয়াছে কোথা হইতে এক বৃহৎ বানরী (পাটরানী) আসিয়া উহার হাত হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া লাফ দিয়া গাছে উঠিল। এইবারে বিপদ দেখা গেল। ৫০।৬০টি বানর তখন তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া দাঁত খিচাঁইয়া কামড়াইবার চেষ্টা করিল। আমরা মন্দিরের পূজারীকে বালকটিকে রক্ষা করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলাম। তিনি বাহিরে আসিয়া ব্যাপার বুঝিয়া মন্দির ভিতর হইতে ছোলাভাজা প্রভৃতি আনিয়া চারিদিকে বানরদের মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন। বালকটী পরিত্রাণ পাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ও বলিল যে সে আর কখনও এখানে পদার্পণ করিবে না।

এই ব্যাপারটি যখন হয় তখন আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম সেখানেও এক ব্যাপার ঘটিয়া উঠে। একটা বুড়া কাণা গোদা বানর (দফাদার নামে পরিচিত) আমার বন্ধুর ওভারকোটের পকেটে শসা দেখিতে পাইয়া, উহা পাইবার জন্য পকেটে হাত ঢুকাইয়া উহা লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বন্ধুটি পকেটের ঢাকনা জোর করিয়া চাপিয়া থাকায় সে উহাতে অকৃতকার্য হইয়া তাঁহার পায়ের বুটজুতা সজোরে কামড়াইয়া দিল। তাহাতেও কোনও ফল হইল না দেখিয়া বন্ধুটির বাঁ হাতের তেলোতে দাঁত বসাইয়া সেই স্থানটি চিরিয়া দিল, ক্ষতস্থান হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। নিমেষের মধ্যে ইহা ঘটিয়া গেল। ক্ষতস্থান টিপিয়া ধরিয়া রক্ত বন্ধ করা হইল ও পরে রুমাল দিয়া উহা Pressure Bandage করা হইল। পূজারী উহা দেখিয়া বলিলেন যে উহা তেমন কিছু নহে। সাহেবদের ছেলে মেয়েদের প্রায়ই বাঁদরেরা কামড়াইয়া দেয় বিশেষ কিছু হয় না। এইসব দেখিয়া আমাদের সঙ্গে যে বালক ও বালিকাটি আসছিল তাহারা কাঁদিয়া ফেলিল ও বাড়ি যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

বাড়ি ফিরিবার মুখে বন্ধুটি বলিলেন যে শসাটির প্রতি যখন বাঁদরদের দৃষ্টি পড়িয়াছে তখন উহাদেরই উহা দেওয়া হউক। সেই উদ্দেশ্যে পূজারীর হাতে উহা দেওয়া হইল। তিনি মন্দিরের ভিতর গিয়া উহা টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া একটি ধাতুপাত্রে লইয়া বাহিরে আসিলেন ও বারান্দায় দাঁড়াইলেন। আমায় শসার টুকরাগুলি ছড়াইয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের একটি ব্যাপার দেখাইবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলেন। থালাটি হাতে লইয়া তিনি 'রাজা, রাজা, আ যা, আ যা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দূর হইতে গাছের ডাল ভাঙ্গিবার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল এবং ক্রমশঃ ঐ শব্দ নিকটবর্তী হইল। দেখি যে এক বৃহৎকায় পীতবর্ণ ভল্লুকের ন্যায় গোদা বাঁদর উচ্চ কেলু গাছ হইতে নিচে মন্দিরের ছাদে প্রকাণ্ড এক লাফ দিয়া পড়িল। সমস্ত ছাদটি কাঁপিয়া উঠিল। এমন বৃহৎ বানর জীবনে কখনও দেখি নাই মনে হইল। তাহার হাত ও পায়ের মাংসপেশী দেখিয়া পালোয়ানদের কথা মনে পড়িল। ছাদের ধারে আসিয়া সে হাত বাড়াইয়া পূজারীর প্রসারিত হাত হইতে থালাটি লইল। সে যে প্রকৃত রাজা তাহার পরিচয় সে এবারে দিল। দু' এক টুকরা শসা মুখে দিয়া সশব্দে শসাসুদ্ধ থালাটি অন্য বানরদিগের মধ্যে ফেলিয়া প্রস্থান করিল।

উপরি উক্ত ঘটনাগুলি ছাড়া কলিকাতায় থাকিতে তথাকার পশুশালায় আমার পশু ও পক্ষী লইয়া কয়েকটি কৌতুককর ঘটনা ঘটে, যদি সুবিধা হয়ত সে সম্বন্ধে কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

এই লেখাটি শেষ করিবার পূর্বে শিমলায় যে দুইটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহা উল্লেখ করিব। শিমলা সম্বন্ধে যত ভ্রমণ কাহিনী বাহির হইয়াছে কোনওটিতে ইহার উল্লেখ দেখি নাই।

প্রথম হইল, শিমলা হইতে পাঞ্জাবের সমতল ভূমি দর্শন। সাত আট হাজার ফুট পাহাড়ের উত্তর হইতে সমতল ভূমি দর্শন যে কি অপরূপ সুন্দর তাহা অবর্ণনীয়। শস্যশ্যামল শত সহস্র মাইল ব্যাপী সমতল ভূমির উপর দিয়া শতদ্রু নদী সর্পিল গতিতে বহিয়া চলিয়াছে, অস্তগামী সূর্যের কিরণে তাহার রজত শুভ্র জলরাশি অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, এই অতুলনীয় দৃশ্য ভুলিবার নহে। সমতলভূমি দিগন্ত স্পর্শ

করিয়াছে। দিক চক্রবাল রেখায় শতদ্রু মিলাইয়া গিয়াছে, অনন্তত্বের ভাব মনে জাগাইয়া তুলে। এই দৃশ্যটি শুধু বর্ষাকালেই দেখা যায়। তাহাও একদিন বা দুইদিন মাত্র। বর্ষণান্ত দিনে বৈকালের দিকে আকাশ হঠাৎ যখন সুনীল হইতে সুনীলতর হইয়া উঠে তখন এই মনোরম দৃশ্যটি চোখে পড়ে, তাহাও ক্ষণকালের জন্য। যে পাহাড়টির শীর্ষে কামনাদেবীর মন্দির এবং যে পাহাড়টির শীর্ষে তারা দেবীর মন্দির, এই দুইটি পাহাড়ের মধ্যে যে ফাঁক রহিয়া গিয়াছে উহার মধ্য দিয়াই এই দৃশ্যটি চোখে পড়ে। শিমলার গির্জা ময়দানে (Ridge) সে সময়ে শিমলাবাসী অনেকেই একত্রিত হ'ন। আমরা Binocular দিয়া এই দৃশ্যটি অনেকবার দেখিয়া প্রভূত আনন্দ পাইয়াছি।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব যাহা লক্ষ্য করিয়াছি তাহা পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি। একবার ছুটির দিনে প্রভাতে কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হই। কুসুম্‌টি পল্লীর নিচে খডে একটি ঝর্ণা ছিল এবং সেই ঝর্ণার তুষার শীতল জলে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকেরা প্রত্যূষে আসিয়া স্নান করিয়া যান শুনিয়াছিলাম। তাহাই দেখিবার উদ্দেশ্য ছিল। নিচে নামিয়া দেখিলাম, বিশেষ কিছুই নহে। ছোট একটি ঝর্ণা, চৌবাচ্চার ন্যায় এক স্থানে জল ধরিয়া রাখা হইয়াছে—বাঁধান পাড়ে বসিয়া স্নান সারিতে হয়। উহা দেখা শেষে আমরা পাহাড়ের আরও নিচে নামিয়া গেলাম। শ্মশানভূমি চোখে পড়িল। তাহার পাশ কাটাইয়া একটি পাহাড়ের গুহায় গিয়া উঠিলাম। গুহাটি গভীর নহে, অনেকটা দীর্ঘ, দালানের মত। সাধুরা ধুনী জ্বালাইয়া গিয়াছেন তাহার চিহ্ন বর্তমান। এই স্থানে পোঁছিয়া আমরা অন্যান্য গুহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলাম। কিন্তু নূতন কিছু চোখে পড়িল না। শেষে সকলে বাড়ি ফিরিবার জন্য এক স্থানে আসিয়া জড় হইয়াছি। সকলকেই দেখা গেল কিন্তু চারু নামে যে বন্ধুটি তাঁহাকে দেখা গেল না। তাঁহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নাম ধরিয়া হাঁক দিয়া ডাকা হইল—দূর হইতে উত্তর আসিল—চারু। দু'এক সেকেণ্ড পরে পুনরায় 'চারু' শোনা গেল। আমাদের এই বন্ধুটি ছিলেন খুব হাস্যরসিক, সর্বদাই মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত। ভাবিলাম পরিহাস করিবার জন্য নিজ নাম ধরিয়া অনুকরণ করিয়া ডাকিতেছেন। যাহা হউক বন্ধুটি কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলেন ও বলিলেন যে তিনি আমাদের কোনও ডাক শুনিতে পান নাই। তখন মনে হইল ইহা হয় তো প্রতিধ্বনি হইতে পারে কিন্তু উপর্যুপরি দুইবার ধ্বনি কখনও পূর্বে শুনি নাই, অন্যেরাও যে কেহ শুনিয়াছেন তাহাও কর্ণগোচর হয় নাই। অতঃপর পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে 'চারু' বলিয়া ডাক দেওয়া হইল। পূর্বের মতই উহা পরিষ্কার দুইবার ফিরিয়া আসিল! কালকা শিমলা রেলপথে তারাদেবী স্টেশনের নিকটে একটি স্থানে এঞ্জিনের হুইসূলের সুন্দর প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, মনে হয় যেন অপর কোনও ট্রেণ উল্টা দিক হইতে আসিতেছে।

'দে দোল-দোল !'

নীল পাখিদের নাগাল

সুবীর চট্টোপাধ্যায়

ভোরের বেলা নীল পাখিরা বুক ছুঁয়ে যায়
মনের কোণে মীড় গমক আর মূর্চ্ছনাতে
রিনিক ঝিনি তড়িৎ লয়ে সেতার বাজায়,
ঠাণ্ডা হাওয়া আধেক আলো আবছায়াতে
সে যেন এক স্বপ্নলোকের দরজা খোলে
নিজেকে আর পাইনা খুঁজে বন্ধ ঘরে
নীল পাখিরা প্রাণে আমার ছন্দ তোলে
সূর্য তখন তরল সোনা অঝোর ঝরে।

ইচ্ছে হলেই ওদের আমি ধরতে পারি
নীল পাখিরা উড়ুক উড়ুক ব্যস্ত ভারি।

তারপরেতে খেয়া ঘাটের ঘণ্টা বাজে
সময় হল, চলব এবার অনেক দূরে,
সারাটি দিন থাকব যখন ব্যস্ত কাজে
নীল পাখিরা ডাকবে কি আর মধুর সুরে?
কল্পনালোক নিরুদ্দেশে উধাও তখন
টগবগিয়ে ছুটছে আমার কাজের ঘোড়া।
নীলপাখিরা তেমন ক'রে কাড়ছে কি মন?
সত্যি তো নয়, ভোরের বেলার স্বপ্ন ওরা।

তবু হঠাৎ বুকের মাঝে কান্না ওঠে,
নীল পাখিদের নাগাল পেতে মনটা ছোটে।

সচ্ছলতা অর্থ এবং কীর্তি নিয়ে
মনের সুখে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখি,
নীল পাখিরা উধাও কেবল গান শুনিয়ে
নীল পাখিরা সত্যি তো নয় সবাই মেকি।
তবু তাদের ধরতে হবে, ধরতে হবে
নীল পাখিদের পুরব আমি সোনার খাঁচায়

সাফল্য আর আনন্দেরি সে উৎসবে
বাঁধব রাখি নীল পাখিদের নরম ডানায়।

সপ্ত সাগর চোদ্দ নদী পেরিয়ে তবে,
গল্প কথার সেই দেশেতে যেতেই হবে।

হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিলাম দূরের আকাশ
হাত বাড়ালেই চন্দ্র তারা, নয়কো দূরে
হারিয়ে গেছে অনেক বছর অনেক ত মাস।
উড়ছে ধুলো আমার ঘোড়ার ক্ষুরে ক্ষুরে।
সচ্ছলতা অর্থ এবং কীর্তি নিয়ে
বেঁচে থাকার স্বপ্ন এখন স্বপ্ন তো নয়
নীল পাখিরা যায়নাত আর গান শুনিয়ে
খামখেয়ালী সেই পাখিদের সময় কোথায়!

যন্ত্রণা আর ব্যথা যখন হৃদয় জুড়ে
নীল পাখিরা নিখোঁজ তখন অনেক দূরে।

সঃ সঃ

সে কি কবি, নীলপাখিরা হারায় নি তো,
আছে আছে।
খুঁজে দেখো সকাল সাঁঝে পাড়ার ভিতর
—আমের গাছে।
খুঁজে দেখো কাজের ভিড়ে সময় পেলে,
মনের মাঝে।
নীল পাখিদের নাগাল পাবে যখন তখন
তারি কাছে।

(রূপক)

চালচিত্তির

কার্তিক ঘোষ

দুপুরবেলা ঘুমোচ্ছিল
দুষ্টু মেয়ে তুতুল···
হঠাৎ ওকে ডাকলে এসে
ছোট্ট কাঠের পুতুল।
কাঠ ঠক ঠক কাঠের পুতুল
খেলার ঘরে থাকে,
এমন সময় হঠাৎ কেন
তুতুলটাকে ডাকে।
ঘুমটা ভেঙে অবাক তুতুল
বুঝতে পারে না সে,
কাঠের পুতুল কইছে কথা
মিটমিটিয়ে হাসে···
হঠাৎ ছাখে, কোন ফাঁকে সে
বাইরে গেছে নেমে
বলছে ডেকে : এসো তুতুল
বিষ্টি গেছে থেমে।

এই না শুনেই তুতুল সোনার
যেই নেচেছে মনটা···
অমনি দেখে, নাচছে পাখি
সবুজ সবুজ বনটা।
পাতায় নাচছে আলো—
নেই ঝুর ঝুর বিষ্টি··

নীল থৈ থৈ হাসছে আকাশ,
বাতাস নাচে মিষ্টি!
লাফিয়ে উঠে অমনি তুতুল
ছুটে এসে বললে :
লক্ষ্মীসোনা কাঠের পুতুল
কোথায় তুমি চললে?

পুতুল বললে : ঝরছে আলো ঝুর ঝুর
বাতাস নাচে ফুর ফুর···
এই ফাঁকেতে যাই চল না
ঘর পালিয়ে ঢের দূর···

তুতুল বললে : কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু···
ঘরের থেকে পা বাড়িয়ে
যাই যদি ভাই যাই হারিয়ে—
তখন আমায় মা বকবে
খুঁজবে এসে মিন্তু!
বড্ড আমার বাইরে যেতে
ইচ্ছে করছে কিন্তু॥

পুতুল বললে : ঐ দেখনা, পাতায় পাতায়
খুশির আলো ঝরছে···
সাত-সতেরো ভাবছ কেন
ইচ্ছে যদি করছে—
যাই চলনা বেড়িয়ে আসি

ফিরল আবার ঘরেই।
এটুখানি পরেই…

এই না শুনেই……
এদিক উদিক দেখলে
খানিক ভাই,
তার পরেতেই তুতুল সোনা
ছুটলো পাঁই—পাঁই।
বাড়ি কোথায় রইল পড়ে
মাঠ পেরিয়ে শেষে,
হঠাৎ ওরা থামল দুজন
নদীর ধারে এসে।

নদী বললে : বাঃ! কি মজা—হঠাৎ দেখি
তোমরা এলে যে—
আমাদের যে বসবে মেলা
খবর দিলে কে?

পুতুল বললে : খবর টবর কে দেবে আর
এমনি এলুম এমনি…
এসেই দেখি হাসছ তুমি
আগের মতই তেমনি!

এই না শুনে ছোট্ট নদী
মুচকি হেসে দিলে,
তুতুলটাকে ঢেউ দিয়ে সে
একটু ছুঁয়ে নিলে।
তার পরেতেই গান ধরলে :
খুল খুল খুল খুল…
বিষ্টি গেছে আর কেনরে
ওঠ্ ফুটে কাশ ফুল।

…হঠাৎ…
কাশ ফুলেরা উঠল ফুটে
নদীর ধারে ধারে
অমনি তুতুল লাফিয়ে উঠে
বললে : বাঃ কি মজা, বারে!

পুতুল বললে : এই মেয়েটা
বন্ধু আমার
খেলাঘরের মিতে…
তাই এসেছি
সবার সঙ্গে
ভাব করিয়ে দিতে!

তুতুল বললে : ওযে আমার খেলা ঘরের
মিষ্টি কাঠের পুতুল,
মিস্ত আমার ছোট্ট ভাই,…
আমার নাম তুতুল।

এই না শুনেই
হাসল নদী
কাশ ফুলেরা সবাই…
বললে : সত্যি
কি মজা আজ
দে দুলিয়ে দে ভাই!
এমনি সময় শোনা গেল
হঠাৎ অনেক দূরে…
গানের সুরে সুরে—
কে যেন কে দিচ্ছে খবর
কোথাও একটি ছুটি…
ছুটি—ছুটি—ছুটি!

চুপটি করে শুনছে নদী
তুতুল পুতুল চুপ,
কাশের বনে রোদ নাচছে
তখনও টুপ টুপ!

চুপটি ছিল নদীর ধারের
মাঠটা এতক্ষণ…
নীলচে নিশান উড়িয়ে দিলে
যেই না সবুজ বন—
…অমনি…

মাঠ বললে : নীল আকাশের চিঠি নিয়ে
নীলকণ্ঠ পাখি…
সবুজ বনে পৌঁছে গেছে
বুঝতে পারছ না কি!

নদী বললে : কেমন করে বুঝলে তুমি
বল না ভাই মাঠ…
হাসব আমি নাচব আমি
বসবে খুশির হাট।

মাঠ বললে : ঐ দেখ না সবুজ বনের
মাথায় নিশান নীল……
উড়ছে কেমন ফুর ফুর ফুর
করছে ঝিলি মিল!
ঐ দ্যাখ না আকাশ বাতাস
ভরিয়ে খুশির গানে,—
নীল পাখিটা পাখনা মেলে
আসছে এদিক পানে!

বলতে বলতে নীলপাখিটা এল…
অমনি সবাই খুশির খবর পেল।

পাখি বললে : বলব কত মজার খবর
খুশির খবর আর…
খেলতে যে আজ নামবে আকাশ
সবুজ বনের ধার!
দুধের বরণ মেঘ আসবে
তারাও খেলার জুটি……
আজকে কোনো কাজ রেখ না
—ছুটি-ছুটি-ছুটি!

বলতে বলতে উড়ল পাখি
সবুজ বনের কাছে…
মাঠ-নদী আর কাশ ফুলেরা
যাবার জন্যে নাচে!
পুতুল অমনি ব'লে উঠল :
আমরা দু'জন যাব—

তুতুল বললে : ঠিক বলেছ
আর কি সুযোগ পাব!
……তারপর……
আকাশটা যেই মাঠকে ছুঁয়ে
হাসল ঝিলি মিল....
অমনি সবাই অবাক হল
যা দেখে তাই নীল!

তুতুল বললে : আকাশ তুমি মিষ্টি আকাশ
বড্ড তুমি ভালো—
তুমি এলে খেলতে মাঠে
তাইতো এত আলো!

পুতুল বললে : বলতে হবে আজ…
হঠাৎ তুমি
পরলে কেন
নীল কাজলের সাজ!

মাঠ বললে : ছুটির দিনের সাজ পরেছে
তাইতো এতো বাহার…
আকাশ তো নয়, ও যেন ঠিক
নীল কাজলের পাহাড়!

নদী বললে : আমার জলে
তোমার যখন
মিষ্টি ছায়া পড়ে—
তখন আমার
ঢেউ গুলো যে

খুশিতে গান করে!

সবুজ বন বললেঃ সবুজ সবুজ বনটা আমি
কি যে জবড় জং—
তবু আকাশ দাও তুমি রোজ
আমায় কত রং!
সেই খুশিতেই বাঁচি আমি
সেই সুখেতেই থাকি···
তোমার গানে ভরিয়ে রাখে
কত যে সব পাখি।

তুতুল বললেঃ তোমায় সবচে
ভালো লাগে
বলব আমি কখন···
রামধনুটা
এঁকে আবার
দাও মুছে সব যখন।
তখন—তখন—তখন॥

এবার আকাশ মুচকি হেসে
দেখলে সবার দিকে···
অমনি আলোর ফুলগুলো সব
ফুটল যে চৌদিকে!

···তারপর···

আকাশ বললেঃ আমি আকাশ বন্ধু সবার
মানি কিন্তু মানি···
তোমরা সবাই আছো বলেই
ছুটির খবর জানি।
ছুটির খবর খুশির খবর
শিউলিতলায় পাই,
শুকতারাটি জ্বেলে আমি
ফুল কুড়োতে যাই!

এমনি সময়
কোথায় যেন
ঢাকে পড়ল কাঠি....
অমনি নড়ে
উঠল মাঠের
বুকের কাদা-মাটি।

মাটি বললেঃ তাইরে নাইরে তাইরে নারে নাই—
আমি যাচ্ছি আটচালাতে
কি মজা আজ ভাই!
এবার হব সিংহ অসুর
কেমন গনেশ ঠাকুর...
ঝাঁই কুড়াকুড়-তাক কুড়াকুড়—
ঝাঁউর গিজা ঝাঁকুড়।

ঢাকের বাদ্যি যেই শুনেছে
অমনি তুতুল তার...
পুতুল ফেলে ছুট দিল সে
শুনবে কথা কার!
ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে তুতুল
একা—একা—একা···
হঠাৎ একটা কোলাব্যাঙের
সঙ্গে হ'লো দেখা।
ছোট্ট ছাতা মাথায় দিয়ে
দিব্যি কোলা ব্যাঙ···
তুতুলটাকে দেখেই বললেঃ
গ্যাঙর গ্যাঙর গ্যাঙ।

তুতুল শুনে
হেসে ফেললে
মুচকে···
ব্যাঙটা অমনি

মুখটা একটু
কুঁচকে—
ব্যাঙ বললে : হাসছ কেন, ভাবছ তুমি
গান জানি না নাকি ?
জানি—জানি, ভালোই জানি
কিন্তু ক'টা ঢাকি···
হঠাৎ দেখি কোত্থেকে সব
আটচালাতে এসে,
এমন জোরে ঢাক পিটছে
ডোবার থেকে শেষে···
যাচ্ছি সরে অন্য কোথাও
অন্য কোনো গ্রামে—
নেই যেখানে ঢাক গুড় গুড়
শুধুই ঢাকের নামে।

এই না শুনেই
যেই না তুতুল
যাচ্ছে গুটি গুটি···
অমনি যেন
কে বললে :
···ছুটি-ছুটি-ছুটি।
পিছন ফিরে দেখলে তুতুল
একটা ছাগলছানা—
হাসতে হাসতে নাচছে কেমন
তাতিন তিনা তানা !
ছাগলছানা বললে : অমন ক'রে
যাচ্ছ কোথায়
দাঁড়িয়ে দেখ খানিক···
ঘাসের ডগায়
জ্বলছে কেমন
হাজার হাজার মানিক !

···অমনি···
তুতুল দেখলে ঘাসে ঘাসে
কি যেন সব জ্বলে—
মুঠোয় ক'রে তুলতে যেতেই
তারা সবাই বলে :
আমরা সবাই নিশির ফোঁটা···
টুপ টুপা টুপ শিশির ফোঁটা—
দিই ভিজিয়ে ফুলের বোঁটা
রোদ উঠলে হারাই···
ছুটির খবর আনে যারা
আমরা জেনো তারাই !

ঘাসের ডগায় শিশির দেখে—
চোখে খুশির কাজল এঁকে···
যেইনা তুতুল ছুটতে ছুটতে
শিউলি তলায় এল···
অমনি যেন মিষ্টি হাওয়ায়
ফুলের গন্ধ পেল !
শিউলি বললে : তুতুল তুতুল রাগ করনা
একটু পিছু ডাকি···
আমার ডালে কিসের খবর
বলতে পারো নাকি ?
তুতুল বললে : আটচালাতে মাটি পড়েছে···
ঢাকি এসেছে—ঢাকি !
শিউলি বললে : বড্ড তুমি বোকা···
আমার ডালে এইযে থোকা থোকা-
দেখছ কুঁড়ি দুধের বরণ,
হাসছে মিঠি মিঠি···
এসব কিন্তু ফুলের সাজে
শুধুই ছুটির চিঠি !

শিউলি গাছের
কথা শুনেই
তুতুল মজায় নাচে…
নাচতে নাচতে
যেই না যাবে
আটচালাটার কাছে!
বেড়ার ধারে
কোথায় ছিল
অপরাজিতা ফুল
সে ডাকলে
মুচকি হেসে,
দুল্‌লে দুল্‌দুল্‌।
অপরাজিতা বললে : কিসের ছুটি—কিসের খুশি
কেউ কি জানে তাহা…
আটচালাতে চালচিত্তির
কি সুন্দর আহা!
তুতুল বললে : তাইতো আমি—তাই…
আটচালাতে যাচ্ছি এখন
অপরাজিতা ভাই।

এমন সময় এল একটা
বাউল বুড়ো—তার…
কাঁধে ঝুলি, পাগড়ি মাথায়
নেই কোনো বাহার।
বাউল বুড়ো বললে : আকাশ কেন নীল হল আজ
বাতাস কেন খুশি…
নাড়ুর গন্ধে এ ঘর ও ঘর
ঘুরছে কেন পুষি?
মনে হ'চ্ছে দিঘীর পথ
জাগছে এবার যেন…
বলতে পারো কেন?

তুতুল এবার কি বলবে
ভাবছে মনে তাই…
হঠাৎ বুড়ো উঠল নেচে
তাইরে নারে নাই!
বাউল বুড়ো বললে : সোনার মেয়ে
আসছে আমার
ঘর আলো মা গৌরী…
মিষ্টি ছাঁচি
পান রেখেছি
পানের ভেতর মৌরী!
বলতে বলতে একতারাটি
বাজিয়ে গেল বুড়ো…
ঝরছে তখন পাতায় পাতায়
মিষ্টি রোদের গুঁড়ো।

তুতুল তুতুল ছোট্ট তুতুল
অমনি নেচে উঠল…
নাচতে নাচতে হাসতে হাসতে
আটচালাতে ছুটল।

আটচালাতে ঢাকি ছিল…
ঢাকটা তুলে কাঁধে নিল—
তারপরেতে কাঠি দিল,
ঝাঁউরগিজা ঘিনতা…
ঢাকি বললে : আর কি আছে চিন্তা…
নাচনা সবাই বাজনা বাজাই
তাধিন্ ধিনা ধিন্‌তা!
আটচালাতে
আঁকন বুড়ো
নাম সনাতন মিত্তির…
একপাশে সে

আপন মনে
আঁকছিল চালচিত্তির!
তুতুল বললে : আঁকন বুড়ো শোনো—
কেউ দিয়েছে তোমার কাছে
ছুটির খবর কোনো ?
সবুর কর—বলছি তোমায়···
মনে পড়েছে আরো,—
কিসের ছুটি, ক'দিন ছুটি
বলতে তুমি পারো ?
আঁকনবুড়ো বললে : এইতো দিলুম এঁকে···
কিসের ছুটি নাও বুঝে নাও
চালচিত্তির দেখে !

তবু তুতুল 'বোকার মতন
এদিক উদিক দেখে,
যাচ্ছে যখন বাড়ির দিকে
আটচালাটা থেকে···
বিপদ ঘটল তখন···
একটা সিংহ সামনে এসে
দাঁড়িয়ে পড়ল যখন !
সিংহ বললে : বোকার মতন যাকে তাকে
জিগেস্ কর যা-তা—
পারো নাকি দেখতে আগে
ক্যালেণ্ডারের পাতা !
দুগ্‌গা পূজোর ছুটি এটা...
তাওতো আছে লেখা,
এইটুকু কি এত দিনেও
হয়নি তোমার শেখা ?
তুতুল তখন
জড়ো সড়ো
ভয়ের চোটে ভাই...
বোকার মতন
হাঁ ক'রে সে
দাঁড়িয়ে রইল তাই।
সিংহ বললে : কি ভাবছো
হাঁ ক'রে—
মা দুগ্‌গার বাহন আমি
দেখবে কেমন
ধাঁ করে...
কামড়ে দেব,—
ছিঁচ কাঁদুনে
কাঁদবে তখন
মা-করে !
এই না বলেই সিংহটা সেই
যেই ক'রেছে হাঁ...
অমনি তুতুল কাঁদতে গিয়েই
সামনে দেখে—মা !...
বলচে ওকে : ওঠ্‌না তুতুল,
বিছনা তুলব না ?

বাইরে তখন ঢাক বাজছে···
দিচ্ছে কাঁসি তাল।
মিন্তু এসে বললে : দিদি
সপ্তমী যে কাল॥

বন্ধুর দান

সুখলতা রাও

বেনেগ্রাম ছোট একটি গ্রাম। কিন্তু ছোট হইলেও গ্রামে কয়েকঘর অবস্থাপন্ন লোকের বাস ছিল। তখন রেল হয় নাই সেইজন্য নৌকা করিয়া দূর দেশে যাওয়া-আসা চল ছিল। বেনে-গ্রামের কাছেই নদী থাকায় ব্যবসায়েরও সুবিধা ছিল। ধনেশ্বর বণিক গ্রামের মধ্যে একজন বড় লোক। তাঁহার প্রকাণ্ড দোতলা পাকা বাড়ি, বাগান-পুকুরে ঘেরা। সেই বাগানের বেড়া ঘেঁসিয়া ছোট একটি একতলা বাড়ি, সেখানা রামলোচন নামে এক গরীব কায়স্থের।

এই একতলা বাড়ির পিছনে খানিকটা পোড়ো জমি। তারই উপর দেখা যায়, ঝোপ জঙ্গল ও বাঁশঝাড়ের মাঝখানে একটা ঢিপির মাথায় একটা ভাঙ্গা মন্দির। এই পোড়ো জমিটুকু নাকি বহুকাল আগে রামলোচনের পূর্বপুরুষেরাই ভোগ করিতেন। প্রবাদ আছে, সে মন্দিরে এক সময়ে খুব ঘটা করিয়া পূজা হইত, এবং এখনও নাকি দেবমূর্ত্তির বেদীর নিচে, কিম্বা মন্দিরের দেয়ালের গায়ে, কিম্বা আঙ্গিনার তুলসীতলায় কোন এক জায়গায় অনেক ধনরত্ন লুকান আছে। সঙ্গে সঙ্গে এও প্রবাদ আছে, যে মন্দিরের কাছের বাঁশ-ঝাড়ে ভূতের বাসা, কেহ মন্দিরের কাছে গেলে ভূত তাহার ঘাড়ে চাপে। তাহা না হইলে অনেক আগেই লোকে সে ধনরত্নের খোঁজ করিত। যাহা হউক, গ্রামের লোকে সে সব কথা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। কেবল ঠাকুরমা দিদিমারা মাঝে মাঝে ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে সেই ধনের কথা ও ভূতের কথা গল্প করিতেন।

ধনেশ্বরের প্রকাণ্ড বাড়িতে থাকিতেন কেবল তিনি নিজে তাঁহার স্ত্রী ও দাস-দাসীরা। তাঁহাদের একটিও ছেলে কি মেয়ে ছিল না। পাশের ছোট একতলা বাড়িতে থাকিতেন রামলোচন, তাঁহার স্ত্রী ও বুড়ি ঝি চণ্ডী, তাঁহাদেরও ছেলেমেয়ে ছিল না।

একদিন ভোরবেলা গ্রামের লোকে ঘুম ভাঙ্গিয়া শুনিল, দোতলা বাড়িতে ও একতলা বাড়িতে যেন রেশারেশি করিয়া শাঁখ বাজিতেছে। ধনেশ্বরের অনেক কাল পরে একটি ছেলে হইয়াছে, তাই এত

শাঁখের ধুম। বণিকবাড়ির দাসী একতলা বাড়ির বেড়া ফাঁক করিয়া ডাকিল—'কিলা চণ্ডী, তোরাও দেখি শাঁখ বাজাস? আমাদের ঘরে রাজপুত্র এয়েছেন, তোদের ঘরে কে এয়েচে লা?'

চণ্ডী ঝি একগাল হাসিয়া বলিল, 'আমাদেরও রাজপুত্তুর এয়েছেন।'

ধনেশ্বর তাঁহার ছেলের নাম রাখিলেন 'কমলাচরণ' তাঁহার ইচ্ছা সে লক্ষ্মীরই সেবা করিবে। তিনি গণক ডাকিয়া ছেলের কোষ্ঠি করাইলেন। কোষ্ঠিতে লেখা ছিল—সে পরের ধন ভোগ করিবে।

রামলোচন তাঁহার ছেলের বড় বড় চোখ দুটি দেখিয়া তাহার নাম রাখিলেন 'পদ্মলোচন'। সকলে কমলাচরণকে ক্রমে চরণ ও পদ্মলোচনকে লোচন বলিয়া ডাকিতে লাগিল। চরণ দোতলার উপর সাত দাসীর কোলেপিঠে মানুষ হইতে লাগিল! লোচন গরিবের ঘরে মায়ের ও চণ্ডীদাসীর আদরে মানুষ হইতে লাগিল। কিন্তু কেমন করিয়া জানি একদিন চরণ আর লোচনে ভারি ভাব হইয়া গেল, যদিও তাহাদের জাতে মেলে না, যদিও একজন গরিবের ছেলে আর একজন ধনীর ছেলে।

ইহার মধ্যে হঠাৎ রামলোচন স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তখনও লোচন খুবই ছেলেমানুষ। তাহার মা অতিকষ্টে বাসনপত্র বাঁধা দিয়া, বিক্রি করিয়া তাঁহাকে মানুষ করিতে লাগিলেন। চরণ ও লোচন দুটিতে একসঙ্গে পাঠশালে যায়। চরণের পড়ায় তত মন নাই। কিন্তু লোচন জানে সে লেখাপড়া শিখিয়া বড় হইলে, তবে তাহার মায়ের দুঃখ ঘুচিবে, তাই সে মন দিয়ে পড়ে শুনে।

চণ্ডীর কাছে লোচন মন্দিরের লুকান ধনের কথা শুনিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় জানালার ধারে বসিয়া লোচন দেখিত, দূরে কাল ঢিপির উপর অন্ধকার মন্দির আর তার পাশে বাঁশের বন। চাহিয়া চাহিয়া সে ভাবিত, 'ঐ মন্দিরে না জানি কত হীরামাণিক লুকান আছে। আহা, সে সমস্ত যদি আমি পেতাম, তবে আর আমাদের এমন কষ্ট থাকত না। ও জমি ত আমাদেরই ছিল, ও ধনও তবে আমাদের।'

তাহার ইচ্ছা হইত একবার গিয়া খুঁজিয়া দেখে, যদি বা কপাল গুণে সে ধন পায়। কিন্তু বাঁশের বনের দিকে চাহিয়া তাহার আর সাহসে কুলাইত না।

তারপর মনে মনে বলিত—'যখন বড় হব, তখন খুব সাহস হবে, আর ভূতের ভয় থাকবে না, তখন আমি ঐ মন্দিরে গিয়ে খুঁজব।'

সে চণ্ডীকে বলিত—'জানিস, যখন আমি বড় হব, ঐ মন্দির থেকে অনেক মোহর এনে তোকে আর মাকে দেব।'

চণ্ডী ভয় পাইয়া বলিত, 'খবরদার খোকাবাবু, ওখানে যেতে নেই, ওখানে ভূত আছে!'

এমনি করিয়া বছর যায়! লোচনের পড়া শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের যে-দুঃখ সেই-দুঃখই আছে। তাহার বয়স এখন ষোল-সতের বছর হইবে। চরণের সঙ্গে এখনও তার ভাব, তবে এখন তাহাকে কাজের চেষ্টায় ঘুরিতে হয়, বাড়ি বাড়ি গিয়া দু একটি ছেলেকে পড়াইতে হয়, তাই বন্ধুর সঙ্গে তাহার বড় দেখা হয় না। চরণ বড় লোকের ছেলে, তাহার অনেক নূতন সঙ্গী জুটিয়াছে, সে লোচনের কথা প্রায় মনেই আনে না।

লোচন কিন্তু মন্দিরের কথা ভোলে নাই। একদিন দুপুরবেলা সে, ছোট একখানি শাবল হাতে করিয়া, বাড়ি হইতে বাহির হইল। এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া মন্দিরের দিকে চলিল। পোড়ো জমি, উঁচু-নিচু খানাখন্দ পার হইয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া দেখে কেহ আসিতেছে কিনা। মাঝে মাঝে এপাশে ওপাশে গাছের দিকে চায়। যদিও ভূতের ভয় করিবে না মনে করিয়াছে, তবুও গাটা যেন ছমছম করিতেছে। শেষে যখন মন্দিরের কাছে আসিয়া পড়িল, তখন উৎসাহেতে ভূত-টুত সব ভুলিয়া গেল।

অনেক পুরান মন্দির, ছাত পড়িয়া গিয়াছে, একদিকের দেয়াল পড়িয়া গিয়াছে, সেই দিকেই বাঁশবন। একটা বড় বাঁশের ঝাড় একেবারে উঠানের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সেই বাঁশঝাড়ের নিচে তুলসী মঞ্চ। মন্দিরের দেওয়ালের ও তুলসী মঞ্চের গাঁথুনী প্রাচীনকালের ছোট ছোট ইটের। উঠানে রাশীকৃত ইঁটপাটকেল, ভাঙ্গা দরজা, কড়ি-বরগা, বড় বড় পাথরও। লোচন আগে সেই তুলসী মঞ্চের নিচে খুঁড়িতে লাগিল। খুঁড়িতে খুঁড়িতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবু মাত্র আধ হাতের বেশি খুঁড়িতে পারিল না। কাজেই সেদিন বাড়ি ফিরিতে হইল। কিন্তু সে ছাড়িবার পাত্র নহে। এমনি প্রতিদিন সে মন্দিরে যাইতে আরম্ভ করিল। ভূতের কথা সে ভুলিয়া গেল। তুলসী মঞ্চের নিচে কিছু পাওয়া গেল না। তখন সে মন্দিরের আবর্জনা সরাইয়া ঠাকুরের ভাঙ্গা বেদী বাহির করিল। সেখানে কোন মূর্তি নাই। বেদীখানা পাথরের তৈরি। একখানি একখানি করিয়া পাথর ছেনি দিয়া কাটিয়া, শাবল দিয়া খুঁড়িয়া অনেক কষ্টে সে সেগুলিকে সরাইল। পাথরের তলার মাটিতে শাবলের ঘা মারিতেই ঠন করিয়া শব্দ হইল। তাড়াতাড়ি দুইহাতে মাটি সরাইয়া লোচন দেখিল, দেড় হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া একটা লোহার কপাট। কপাটের গায়ে একটা আংটা লাগান। লোচন প্রাণপণে সেই আংটা ধরিয়া টানিল, কিন্তু কপাট খুলিল না। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, কপাটের পাশে মাটিতে দুই পা জোরে বসাইয়া দুই হাতে গায়ের জোরে টানিল। তাহার হাতের শির ফুলিয়া উঠিল, মুখ লাল হইল, কিন্তু তবু লোহার কপাট নড়িল না। তখন সে হতাশ হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। এত কষ্ট করিয়াও কিছু ফল হইল না! তখন তাহার মনে হইল, একজন না পারিলেও দুইজনে পারা যাইবে। কিন্তু কাহাকে বিশ্বাস করিয়া সে সাহায্য করিতে ডাকিবে? চণ্ডী দাসী? চণ্ডী দাসী ত বুড়ি, তাহার গায়ে জোর কোথায়? তাছাড়া চণ্ডী এ-কথা শুনিলে নিজে ত আসিবেই না, তাহাকেও আসিতে দিবে না, ভূতের ভয়ে। তখন তাহার মনে হইল—'বন্ধুকে বলিলে কেমন হয়?' ঠিক কথা! চরণই উপযুক্ত লোক। সে তাহার বন্ধু, তাহাকে বিশ্বাস করা যায়। তাছাড়া, যদি ধন পায়ই, লোচন গরিব-মানুষ, কোথায় সে এত ধন রাখিবে? সে বন্ধুর সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া ধন লইবে, তাহার বদলে বন্ধু তাহাকে সাহায্য করিবে এবং ধন নিরাপদে রাখিবার ভার লইবে। এই ঠিক।

লোচন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিল। কিন্তু সেদিন তাহার এত পরিশ্রম হইয়াছিল, যে সেদিন আর সে চরণের সঙ্গে দেখা করিতে পারিল না।

পরদিন লোচন চরণকে একলা ডাকিয়া নিয়া বলিল—'ভাই, তোমার সঙ্গে আমার একটা দরকারি কথা আছে। একটা কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে? কিন্তু আর কেউ যেন জানতে না পায়!'

চরণ বলিল—'কি তোমার এমন গোপনীয় কাজ শুনি? যদি তাতে আমার কোন ক্ষতি না হয় তাহলে সাহায্য করতে পারি।'

লোচন বলিল—'তোমার ক্ষতি ত নেইই, বরং লাভ। তুমি যদি কিছু নাও কর, তবু এসব কথা আর কাউকে বল না, আমি তোমাকে বিশ্বাস করে বলছি। ঐ যে ভাঙ্গা মন্দির আছে না। যেখানে ধন লুকান আছে বলে লোকে বলে, সেখানে আমি গিয়েছিলাম।'

'সত্যি? তার পর? ভূত দেখলে?'

'না, না, ভূত কি? ভূতের কথা আমার মনেও হয় নি। আমি ঐ গুপ্তধন খুঁড়তেই গিয়েছিলাম।'

'পাগল আর কি!'

'শোনই না কেন আমার কথা। তুলসীতলায় আগে খুঁড়লাম সেখানে কিছু পেলাম না। তারপর, বেদীর নিচে খুঁড়তেই ঠন করে একটা আওয়াজ হল—'

'তারপর?'

'তারপর তাড়াতাড়ি মাটিগুলো সরিয়ে দেখি কি একটা লোহার কপাট—'

'লোহার কপাট! তারপর?'

'তারপর আর কি? অনেক চেষ্টা করেও কপাটটা খুলতে পারলাম না, তাই তোমার কাছে এসেছি। যদি কিছু পাই ত তোমার অর্ধেক, আমার অর্ধেক। তবে কি জানলে, আমি গরিব মানুষ। কোথায় সে সব রাখব তোমাকেই তার বন্দোবস্ত করতে হবে। কেমন, রাজি আছ ত?' 'রাজি।'

পরদিন দুপুরে লোচন আর চরণ দুজনে মন্দিরে গেল।

চরণ বলিল—'লোহার দরজা মরচে পড়ে আটকে রয়েছে। এক কাজ করা যাক, আগে দরজাটার চারদিকে শাবল দিয়ে আলগা করে নিয়ে, তারপর দুজনে মিলে আংটা ধরে টানা যাক।'

লোচন বলিল—'আংটাও ত মরচে ধরা, যদি ভেঙ্গে যায়?'

'যায় যদি ত আর কি করা যাবে? তখন দরজটাকেই শাবল দিয়ে খুঁড়ে তুলতে হবে।'

তখন তাহারা আস্তে আস্তে দরজার চারিদিকে শাবল দিয়া ঘা মারিতে লাগিল। দরজাটা যখন একটু আলগা মনে হইল, তখন দুজনে মিলিয়া আংটা ধরিয়া খুব জোরে টান দিল। অমনি খটাং করিয়া লোহার দরজা উঠিয়া আসিল। দরজার ভিতর দিয়া দেখা গেল নিচে ছোট্ট একটা কুঠুরি, দুইজন মানুষ কোনমতে ঢুকিতে পারে। লোচন দরজার ফোকরে দুই-পা ঝুলাইয়া দিয়া কুঠুরির ভিতর নামিয়া পড়িল, পিছন পিছন চরণও নামিল। প্রথমে তাহারা অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না, কেবল বিশ্রী একটা গুমোট গন্ধে তাহাদের যেন দম আটকাইয়া আসিতে লাগিল। তারপর ক্রমে ভিতরের অন্ধকার

তাহাদের চোখে সহ্য হইয়া আসিলে, তাহারা দেখিতে পাইল, কুঠুরির দেয়ালের গায়ে, ষোলটি পিতলের ঘড়া সাজান। ঘড়ার ভিতর হাত দিয়া দেখিল মোহর !!

চরণ লোচনের দিকে চাহিল, লোচন চরণের দিকে চাহিল, কেহ কিছু বলিল না। দুইজনে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিল, ভিতরে যেন তাহারা নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেছিল না।

বাহিরে আসিয়া লোচন বলিল -'এত মোহর বাড়ি নেব কেমন করে ?'

চরণ বলিল—'দিনের বেলা নেওয়া যাবে না, তাহলে অন্য লোকে দেখে ফেলবে। ও একটা ঘড়া আমরা দুজনে মিলে তুলতে পারব কিনা সন্দেহ! রাত্রে নিতে হবে। তবে বেশিদিন ফেলে রাখাও আবার নিরাপদ নয়।'

'তবে চল আজ রাত্রেই কাজ আরম্ভ করি।'

'রোস, আমি আগে রাখবার জায়গা ঠিক করি। তাছাড়া পরশুদিন অমাবস্যা গিয়েছে, আজ রাত্রে অন্ধকার হবে। চাঁদের আলো না হলে পারা যাবে না।'

'তাইত, তাহলে কিছুদিন সবুর করতে হয়। সাত আট দিন পরে হতে পারে। এস, তবে এখন যাওয়া যাক।'

দরজাটা আবার বন্ধ করিয়া দিয়া তাহারা বাড়ি ফিরিল।

এতদিন রোদে রোদে এত পরিশ্রম করার ফলে লোচনের জ্বর আসিল। বিকালে চরণ আসিয়া দেখিল বন্ধু শয্যাগত।

সে মুখে অনেক দুঃখ প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু মনে মনে তাহার বিশেষ দুঃখ হয় নাই।

মোহর দেখিয়া অবধি তাহার যেন মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। সে কেবল ভাবিতেছে—'আটটা ঘড়া আমার, আটটা লোচনের। যদি ষোলটাই আমার হত, তবে কেমন হত ?'

ক্রমেই এই দুষ্টুবুদ্ধি তাহাকে পাইয়া বসিল। তাই সে লোচনের জ্বর হইয়াছে দেখিয়া মনে মনে বলিল —'এইবার সুযোগ।'

কিন্তু তখনও অন্ধকার রাত, কিছুদিন দেরী করিতে হইবে। তার পরের দিন দুপুরে চণ্ডী দেখিল চরণ কতকগুলি বাঁশের চোঙা হাতে করিয়া পোড়ো জমির দিকে যাইতেছে।

চণ্ডী তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—'দাদাবাবু, লোচনের যে বড্ড অসুখ, তাকে একবার দেখে যাবে না ?'

'এই যাব' বলিয়া চরণ চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় চরণ লোচনকে চুপি চুপি বলিল, 'জান ভাই, সেইদিন থেকে নাকি মন্দিরের কাছে বাঁশঝাড়ের ভিতর কিরকম বিকট শব্দ শোনা যায়। আমরা টাকার সন্ধান পেয়েছি বলে বোধহয় ভূতগুলো রেগেছে। কাল রাত্রে যখন জোরে বাতাস বইছিল, আমাদের দোতলা থেকে 'হু হু' শব্দ শোনা যাচ্ছিল। শব্দটা ঠিক মন্দিরের দিক থেকে আসছিল !'

লোচন বলিল, 'আর ত মাত্র ৪'৫ দিন আছে, এর মধ্যে আমি ভাল হয়ে উঠলে হয় !'

জ্যোৎস্না রাত আসিয়া পড়িল, কিন্তু লোচনের জ্বর সারিল না।

চরণ্ সুযোগ বুঝিয়া এক রাত্রে সেই মোহরের সন্ধানে মন্দিরে চলিল। তাহার যে ভূতের ভয় ছিল না তাহা নহে। তবু টাকার লোভে সে অন্য সব কথা ভুলিতে চেষ্টা করিল। লোহার কপাট এখন আলগা, কাজেই সেটাকে সে একটু চেষ্টা করিয়াই খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে অন্ধকার! সেত বাতি আনে নাই। কিন্তু এত কষ্ট করিয়া আসিয়া আবার ফিরিয়া যাইবে? তাই সে চোখমুখ বুজিয়া অন্ধকারেই নামিয়া পড়িল।

হাতড়াইতে হাতড়াইতে যেমনি একটা ঘড়ার গায়ে হাত ঠেকিল, অমনি ধুড়ুস করিয়া কিসের একটা শব্দ হইল। ভয়ে চরণের সমস্ত শরীরের লোম যেন দাঁড়াইয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া দেখে, দরজার ফাঁক দিয়া যেখানে জ্যোৎস্নাভরা চারকোণা আকাশ চকচক করিতেছিল, সেখানটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার, দরজাটা বন্ধ হইয়া গিয়াছে!

নামিবার সময়ে তাড়াতাড়িতে সে ভাল করিয়া দেখে নাই। চারপাশের ছড়ান পাথরগুলা এমনভাবে ছিল যে, দরজাটা খুলিলে উল্‌টাইয়া মাটিতে না পড়িয়া, পাথরের গাদার গায়ে ঠেকিয়া খাড়া হইয়াছিল। ঝড়েও বোধহয় ইঁটপাটকেল একটু নাড়াচাড়া হইয়া থাকিবে, কেমন করিয়া জানি, একটা পাথর গড়াইয়া হয়ত দরজার উপরে পড়িয়া যায়, তাহাতেই হয়ত দরজাটা বন্ধ হইয়া যায়।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত চরণের যেন বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে দুই হাত উঁচু করিয়া পাগলের মত দরজায় ঘুঁষি মারিতে লাগিল।

উপর হইতে টানিয়া খোলা সহজ, নিচ হইতে খোলা সহজ নহে, বিশেষ করিয়া দরজাটা ভাল করিয়া হাতে নাগাল পাওয়া যায় না। ঘুঁষি মারিতে মারিতে তাহার হাতের মুঠা কাটিয়া রক্ত বাহির হইল। যখন হয়রান হইয়া সে মাটিতে বসিয়া পড়িল, তখন তাহার গা বহিয়া দর দর করিয়া ঘাম ঝরিতেছে। সে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—'হায়রে, আমার লোভের এই শাস্তি। এই অন্ধকার মাটির নিচে আমাকে মরতে হবে। গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও ত কেউ এখানে শুনতে পাবে না, আমি নিজেই যে সে পথ বন্ধ করেছি!'

লোচনেরও অসুখ, সেও আসিতে পারিবে না!

ক্রমে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল।

পরের দিন বণিক বাড়িতে হুলুস্থূল কান্নাকাটি, চরণকে কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। গ্রামের চারিদিকে লোক ছুটিতেছে পুকুরে পুকুরে জাল ফেলা হইয়াছে। মন্দিরের কথা কেহ ভাবে নাই, ভাবিবার কথাও নয়।

এদিকে লোচন জ্বর বিকারে বিছানায় পড়িয়া। বিকালবেলা আকাশ অন্ধকার করিয়া ঝড়

আসিল। এক একবার বাতাস ঝাপটা দেয় আর কোঠাঘরগুলি পর্যন্ত যেন নড়িয়া উঠে!

লোচন বিছানায় ছটফট করিতেছে, মাঝে মাঝে প্রলাপ বকিতেছে। মাঝে মাঝে যখন একটু জ্ঞান হয়, চারিদিক চাহিয়া দেখে। একবার দেখিল দরজার কাছে চণ্ডীদাসী ঘুমাইয়া আছে।

আবার শুনিল বাতাস হাঁকিতেছে, 'হু হু' করিয়া বাঁশঝাড়ের ভূতটা কাঁদিতেছে। তাই ত, আজ না তাহাদের মন্দিরে যাইবার কথা ছিল? এমন দিনে কি আর যাওয়া যায়? আরো কিছুদিন দেরী করিতে হইবে।

আবার দেখিল, যেন চরণ সেই ঝড়ে বৃষ্টিতে মন্দিরের উঠানে একটা পাথরে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল, ভূতটা যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিল!

লোচন স্পষ্ট শুনিল চরণ তাহার নাম ধরিয়া 'লোচন, লোচন' বলিয়া চিৎকার করিতেছে। যতবার তাহার ঘুম আসে ততবার সেই চিৎকার শুনিতে পায়—'লোচন! লোচন! লোচন!'

শেষে আর স্থির থাকিতে পারিল না, লাফাইয়া বিছানা হইতে নামিয়া দরজা দিয়া ছুট দিল।

চণ্ডীদাসী পিছনে পিছনে ছুটিল—'কোথা যাও? কোথা যাও? পাগল হলে নাকি? ও-মাগো—দেখ এসে লোচনের কি হল?'

কোনদিকে দৃষ্টি নাই, কাহারও কথায় ভ্রূক্ষেপ নাই, লোচন সোজা মন্দিরের দিকে ছুটিয়াছে। বাঁশঝাড়ের কাছে আসিতে সাদারঙের কি যেন একটা সড় সড় করিয়া গাছের উপর হইতে নামিল। লোচন মচমচ করিয়া বাঁশের খোলাটা মাড়াইয়া চলিয়া গেল।

মন্দিরের উঠানে আসিয়া পৌঁছিয়া সে একবার থামিল, একবার চারিদিকে চাহিল, তারপর চিৎকার করিয়া ডাকিল—'চরণ!' কেউ কোথাও নাই, কেবল বাঁশঝাড়ে 'হুহু' করিয়া কে যেন গোঙাইতেছে।

আবার আরো জোরে ডাকিল—'চ-র-ণ!'

এবার যেন তাহার মনে হইল মাটির ভিতর হইতে কে কি বলিল! সে ছুটিয়া গিয়া দরজার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ডাকিল, অমনি যেন শুনিল ভিতরে কে কাঁদিতেছে।

তখনই দুইহাতে দরজা ধরিয়া সে টানিতে লাগিল। এতদিন ভুগিয়া তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তবু সে দরজা খুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষটায় দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সেও অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

জ্ঞান হইলে চাহিয়া দেখিল, চণ্ডীদাসী তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতেছে। তাহার হাতে একটা লণ্ঠন। তাহাকে চোখ খুলিতে দেখিয়া চণ্ডী যেন বাঁচিল। সে আস্তে আস্তে লোচনকে উঠাইয়া বলিল—'শিগগির বাড়ি চল। আমি ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। শিগগির চল!'

লোচন খানিক হতভম্বের মত বসিয়া থাকিয়া, হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আর বলিল—'বাতিটা দাও দেখি!'

বলিয়া, চণ্ডীর হাত হইতে বাতি কাড়িয়া লইয়া সে কুঠুরির ভিতর নামিয়া পড়িল।

চরণ তখন অসাড়, অচেতনের মত পড়িয়া আছে, মাঝে মাঝে তাহার মুখ দিয়া গোঁ-গোঁ শব্দ বাহির হইতেছে।

চণ্ডী উপর হইতে, 'ও লোচন, ও লোচন' বলিয়া ডাকিতেছে ভয়ে তাহার গলার স্বর বাহির হয় না।

লোচন তাহাকে বলিল—'চুপ কর, এখন যা বলি তাই কর। আমি একে তুলে ধরছি, তুমি টেনে নাও।'

লোচন ছিল লম্বা, চরণ ছিল ছোট খাট। লোচন চরণকে উঁচু করিয়া ধরিল, চণ্ডী তাহাকে কোনও মতে টানিয়া উপরে তুলিল।

মানুষের মনের বলই আসল বল। তা না হইলে ঝড়ের রাতে দুর্বল শরীর নিয়া লোচন এতদূর কি করিয়া চরণকে বহিয়া আনিল? চণ্ডী বাতি হাতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল বটে। কিন্তু লোচন সেদিন যে সাহস দেখাইয়াছে, তেমন সাহস অল্প ছেলেই দেখাইতে পারে।

লোচন ও চরণের সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে কিছুদিন লাগিল। সুস্থ হইয়া তাহারা সমস্ত ধন ঘরে আনিল।

চরণ বলিল—'ভাই লোচন! আমি যেমন তোমাকে ঠকিয়ে লোভ করে নিজে সব নিতে গিয়েছিলাম, তেমনি শাস্তিও আমার হয়েছে। এ টাকার ভাগ আমি নেব না, সমস্তই তোমার।'

লোচন তাহাকে বলিল—'তা, হবে না, তোমাকে নিতেই হবে। আমার ভাগও তোমার কাছে রাখতে হবে। গরিবের বাড়িতে কোথায় এত টাকা রাখা যায়? কিন্তু কি ভাগ্যিস, যতদিন আমি বিছানায় পড়েছিলাম, ততদিন আর কেউ এর সন্ধান পায় নি!'

তখন চরণ বলিল—'পাবে কি করে? ভূতের ভয়ে কি কেউ সেদিকে যায়? মনে নেই, তোমার যখন জ্বর হয়েছিল আমি এসে তোমাকে বলেছিলাম যে, আমরা কুঠুরির দরজা খুলেছি বলে ভূতেরা রেগেছে, বাঁশঝাড়ে তারা 'হু-হু' করে চেঁচায় শোনা যায়?'

'ঠিক, ঠিক, আমিও সেদিন ঝড়ের সময় শুনেছি 'হু-হু' শব্দ হচ্ছিল!'

'সে ব্যবস্থা আমিই করেছিলাম। এখন অবশ্য এতে আমাদের কাজ দিল, কিন্তু তখন করেছিলাম তোমাকেই ভয় দেখাবার জন্য। মন্দ যারা তারা সবাইকে মন্দ মনে করে। আমার নিজের মনে যখন মতলব এল, দুজনে যাবার আগেই একলা গিয়ে ঘড়াগুলো নিয়ে আসব, তখন মনে হল তুমিও ত এই মতলব করতে পার। তখন তোমার জ্বর বেশি ছিল না। আমি করলাম কি, দু'তিনটা বড় বড় বাঁশের চোঙা কেটে এমন করে বাঁধলাম যে, তার ভিতর দিয়ে জোরে বাতাস গেলে বিকট আওয়াজ হয়। সেগুলোকে মন্দিরের বাঁশঝাড়ে ঝুলিয়ে দিলাম। একে বাঁশঝাড়েই নানারকম শব্দ হয়, তাতে এই চোঙাগুলো থাকাতে অদ্ভুত শব্দ হতে লাগল। গ্রামের লোকেরা পর্যন্ত সে শব্দ শুনে ভয় পেয়েছে। ভাই, আমি কত দুষ্টু, দেখলেই ত! আমি এ টাকা কিছুতেই নিতে পারব না।'

লোচন সে সব কথা শুনিল না।

সে বলিল—'আচ্ছা, বন্ধুর উপহার বলেও অন্ততঃ নাও।'

প্রাচীন কালে কাশী. কাঞ্চী, অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, অবন্তী ও দ্বারকা এই সাতটিকে হিন্দুদের প্রধান তীর্থস্থান বলে মনে করা হত। কাশী যেমন উত্তর ভারতের প্রধান তীর্থস্থান তেমনি কাঞ্চী প্রধান তীর্থস্থান দক্ষিণ ভারতের।

প্রাচীনকালে কাঞ্চীর পুরো নাম ছিল কঞ্চীপুরম্। এ থেকেই হয়েছে আধুনিক কাঞ্জীভরম্ নামের সৃষ্টি। কাঞ্চী মাদ্রাজ শহর থেকে ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে পল্লব বংশীয় রাজারা কৃষ্ণা ও কাবেরীর মাঝখানে রাজ্য স্থাপন করে কাঞ্চীপুরকে তাঁদের রাজধানী করেন। তাঁদের সময়ে কাঞ্চীপুরে নানা ধর্মমন্দির স্থাপিত হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ফা হিয়ান কাঞ্চীকে জগতের শ্রেষ্ঠ নগর বলে উল্লেখ করে গেছেন। এখন সেখানে ধর্মমন্দিরগুলি ছাড়া প্রাচীন কীর্তি কিংবা নগরের শ্রেষ্ঠত্বের কোন নিদর্শনই বর্তমান নেই।

কাঞ্চী নগরটি দু'ভাগে বিভক্ত, একটি বড় কাঞ্চী বা শিবকাঞ্চী, অপর ভাগের নাম ছোট কাঞ্চী বা বিষ্ণু কাঞ্চী। শিব কাঞ্চীতে শিবমন্দির আছে, সেই অঞ্চলে শৈব অর্থাৎ শিবের উপাসকদের বাস। বিষ্ণু কাঞ্চীতে আছে বিষ্ণুমন্দির, বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসকরা বাস করেন সেই অংশে। বর্তমানে বিষ্ণু কাঞ্চীই লোকসংখ্যায় এবং ঐশ্বর্যে বড়, তাই মনে হয় শিব কাঞ্চীর বড় কাঞ্চী নামকরণ শৈবরাই করেছেন। দুই কাঞ্চীর মাঝখানে একটি বাজার।

দক্ষিণ ভারতে যে কোন দেব-মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে একটি সমুচ্চ দ্বারপথ দিয়ে যেতে হয়। একে গোপুরম বলে। উৎসবাদিতে যখন আলোকমালায় সজ্জিত হয় তখন এই গোপুরম এক চমৎকার শোভা ধারণ করে। এই গোপুরমের চূড়া ভিতরের প্রধান মন্দিরের চূড়া থেকেও অনেক উঁচু হয়। ঐ অঞ্চলে প্রত্যেক দেব মন্দিরের থাকে দুটি করে মূর্তি। একটিকে বলা হয় অচল মূর্তি, এটি আকারে বড়

এবং সাধারণতঃ পাথরে তৈরি। মন্দির থেকে এটিকে নড়াচড়া করানো হয় না বলেই এর এই নামকরণ হয়েছে। মন্দিরের দ্বিতীয় মূর্তিটির নাম ভোগমূর্তি। এটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও ধাতুনির্মিত। উৎসবের সময় এই মূর্তিটিকে রথে বা দোলায় চাপিয়ে নগর প্রদক্ষিণ করানো হয়। ভোগ মূর্তিকে নগর-প্রদক্ষিণ করাবার পূর্বে এবং পরে এনে রাখা হয় একটি নাটমন্দিরে। একে বলে মণ্ডপম।

প্রধান মন্দিরের নিকটেই এই নাট মন্দির অবস্থিত। নাট-মন্দির কারুকার্য করা বহু স্তম্ভের ওপর নির্মিত। শিব কাঞ্চীর মন্দিরটিতে ৫৪০টি স্তম্ভ আছে। বিষ্ণু কাঞ্চীর নাট মন্দিরে আছে ৯৬টি। গোপুরম, মণ্ডপম্ ও প্রধান মন্দির ছাড়া বিশেষ দর্শনীয় হচ্ছে কুণ্ড বা পুষ্করিণী। শিব কাঞ্চীর কুণ্ডটি প্রকাণ্ড, চারদিকে পাথরে বাঁধানো ঘাট, মধ্যস্থলে দ্বীপের মত একটি মন্দির। উৎসবের সময় এই দ্বীপ-মন্দিরটি হাজার হাজার প্রদীপে সাজানো হয়। দক্ষিণ ভারতের প্রত্যেক কুণ্ডেই আলোকসজ্জার জন্যে থাকে এরূপ একটি বা একাধিক মন্দির বা দীপ-স্তম্ভ।

উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের মন্দিরের কথা তোমরা শুনে থাকবে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের কাছে যে কুণ্ড আছে তাতেও আছে অনুরূপ একটি দ্বীপের মত দীপ মন্দির। উড়িষ্যা দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত নয়, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের নিকটে অবস্থিত বলেই দাক্ষিণাত্যের রীতি সেখানে প্রবেশ করেছে মনে হয়।

শিব কাঞ্চীতে গোপুরম্ দিয়ে ঢুকেই দক্ষিণ দিকে কুণ্ড, বামে মণ্ডপম্। একটু পরেই আমগাছতলায় একাম্রনাথ মহাদেবের স্থান। আমগাছটি খুবই পুরনো, বৈশিষ্ট্যও এর কম নয়। এর চারটি শাখায় চার প্রকার ফল ধরে। মন্দির-প্রাঙ্গনের চারদিকে নানা মন্দির ও বিগ্রহ। প্রধান বিগ্রহটি বালুকায় নির্মিত লিঙ্গমূর্তি। এর পুজোয় জল ব্যবহার করা নিষেধ। লিঙ্গমূর্তির পিছনে পাথরে তৈরী অচল মূর্তি—হর গৌরী ও শিশু কার্ত্তিক। অচল মূর্তির সম্মুখেই সেই হরগৌরী ও কার্ত্তিকেরই ছোট ধাতব ভোগ-মূর্তি। শিব কাঞ্চীতে এই একাম্রনাথ মহাদেবের স্থান ছাড়া আরো ১০৭টি মন্দির আছে। এখানে ফাল্গুন মাসে মহোৎসব হয়। তখন উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে বহু তীর্থযাত্রী আসে।

শিব কাঞ্চী থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে বিষ্ণুকাঞ্চীর প্রধান মন্দির, বরদারাজ স্বামীর মন্দির অবস্থিত। এখানেও গোপুরম আছে, গোপুরম্ পার হয়েই দক্ষিণ দিকে কুণ্ড, বামে নাট মন্দির। এই নাট-মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও এর স্তম্ভগুলির কারুকার্য অনেক সূক্ষ্ম ও সুন্দর। মন্দিরে. কৃষ্ণ-পাথরে তৈরি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুর সুবৃহৎ অচলমূর্তি। অচল মূর্তির সম্মুখে ধাতু নির্মিত ছোট লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্তি। এর একতল উপরে প্রধান বিগ্রহ বরদারাজ স্বামী স্থাপিত। এই মন্দিরের প্রধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখ মাসে। পনেরো দিন ধরে চলে এই উৎসব। তখন দেশ বিদেশ থেকে আসে এখানে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী। উৎসবের সময় ভোগমূর্তিটি আগে মণ্ডপে এনে গরুড়বাহনে নগর-প্রদক্ষিণ করিয়ে কিছুক্ষণ নিয়ে রাখা হয় একাম্রনাথ শিবের মন্দিরে। পরে মণ্ডপে ফিরিয়ে এনে মন্দিরে তুলে রাখা হয়।

এই দু'টি প্রধান মন্দির ছাড়া কাঞ্চীতে বামন অবতার মন্দির, কামাক্ষী দেবীর মন্দির, সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর (কার্ত্তিকের) মন্দির, কৈলাসনাথ স্বামীর মন্দির, বৈকুণ্ঠনাথ স্বামীর মন্দির, কচ্ছপেশ্বর স্বামীর

মন্দির, ত্রৈলোক্যনাথ স্বামীর মন্দির ইত্যাদি বহু মন্দির রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি খুবই প্রাচীন এমন কি প্রধান মন্দির দুটির চেয়েও অনেক প্রাচীন মন্দির আছে।

এদেশের লোকের ভাষা তামিল। তামিল একটি দ্রাবিড় ভাষা। এর সঙ্গে আর্য ভাষা বা সংস্কৃতের কোনো সংশ্রব নেই। তাই না জানলে এ ভাষার কিছুই আমাদের বোধগম্য হবার কথা নয়। এর স্বরবর্ণ আমাদের মতোই, তবে তাতে হ্রস্ব এ ও দীর্ঘ এ আছে। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণ মাত্র দশটি। শুধু ক লিখে অবস্থাভেদে ক, খ, গ, ঘ এই চারপ্রকার বিভিন্ন উচ্চারণ করতে হয়। এই-ভাবে শুধু চ দিয়েই চ, ছ, জ, ঝ এই চার বর্ণের কাজ হয়ে থাকে। দশটি ব্যঞ্জনবর্ণের নাম, ক, ঙ, চ, ঞ, ট, ণ, ত, ন, প, ম।

তামিলভাষী লোকদেরও তামিল বলা হয়। তামিলেরা ধুতির নিচে কোপীন ব্যবহার করে। তাদের ধুতির বহর ৪৮ থেকে ৫৪ ইঞ্চি, কিন্তু লম্বে মাত্র তিন হাত। তারা কাছা দেয় না। মেয়েদের শাড়ী পনর ষোল হাত লম্বা হয়। তাদের শাড়ী পরবার রীতি খুব সুন্দর। এখানে সিঁথিতে সিঁদুরের ব্যবহার নেই। সধবারা কপালে এক প্রকার গুঁড়োর টিপ পরে। তাঁদের ঘোমটা পরার রীতি নেই, বিধবা হলেই চুল ফেলে দিয়ে সেখানে ঘোমটা দেবার রীতি। ব্রাহ্মণেরা নিরামিষাশী। তামিলেরা মাথার সম্মুখের অংশ কামিয়ে ফেলে। বাঙ্গালীদের মতোই তাদের মাথা খোলা থাকে, তবে দরবার ইত্যাদির জন্যে তাদের জাতীয় শিরস্ত্রান আছে। নাগরিকেরা সাধারণতঃ বাস করে কুটিরেই। পাকা বাড়ির সংখ্যা খুবই কম সেখানে। সেখানে অতিথি অভ্যাগতদের পান সাজিয়ে দেবার রীতি নেই। অতিথির সম্মুখে পান-দান রাখা হয়, তিনি ইচ্ছামত সেজে খেতে পারেন।

পুস্তক পরিচয়

আলোর পরশ

সুন্দরম প্রকাশনী

শংকর দাশগুপ্ত

দাম—১·১৫

কল্যাণী কার্লেকর

পাৎলা একটুখানি ছড়ার বই, কল্পনার হাল্কা আলোয় উজ্জ্বল। 'খুব ছোটদের' থেকে সাত বছর বয়সের ছেলেপিলেদের জন্য রচিত এই ছড়াগুলি চাঁদ, তারা, মেঘ, ফুল, জন্তু, পাখি, রেলগাড়ি, এরোপ্লেন প্রভৃতি নানা জিনিস নিয়ে লেখা। বাংলার পুরনো ছড়ার মতো একটা এলোমেলোভাব এদের একটা বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এদের বইয়ের মধ্যে সাজাবার সময়ে বিষয় সাদৃশ্যের দিকে একটু দৃষ্টি রাখলে ভালো হ'ত।

খুকুর জন্মদিনে

সুরুচি সেনগুপ্ত

খুকুর জন্মদিনের নেমন্তন্নে ওর মতই খুদে সব বন্ধুরা এসে জুটেছে।

এলো লিলি, এলো শীলা
জামার রং লাল নীলা,
এলো রোজি, পিনকি, রিঙ্কু, শুভা
এলো তীর্থা, জবা আর অঞ্জনা অনুভা।.

সারা বিকেল ওরা হৈ হুল্লোড় ক'রে খেলা করে।

শেষ হয়ে গেলে খেলা
পেট ভরে খেল সন্ধে বেলা।
লুচি মাংস—কি যে মজা!
রসগোল্লা খাজা গজা,
পায়েস দই, সঙ্গে আছে রাবড়ি—
সন্দেশ খাও, যত পারো
কাঁচাগোল্লা আরো আরো—
ছানাবড়া, বোঁদে শোন-পাপড়ি।

তখন রাত হয়েছে। খেয়ে দেয়ে হেসে খেলে বন্ধুরা চ'লে গেলে, ক্লান্ত হয়ে খুকু খাটের উপরে ঘুমিয়ে পড়ে।

বড় টেবিলখানার 'পরে
রইল সাজানো থরে থরে
জন্মদিনের খেলনাগুলো তার
যে এসেছে, সে ই এনেছে
আদর ক'রে দিয়ে গেছে
রং বেরংএর কত উপহার।
আছে বড় বড় 'ডল্'
পোষাকেতে ঝলমল্
খরগোশ কানখাড়া
আছে পক্ষীরাজ ঘোড়া
টুকটুকে ছবি আঁকা,
বইও যেতেছে দেখা
হনুমান, সিংহ, সাপ,
বাঘ আছে, ওরে বাপ!
কুমীরও রয়েছে দেখি
টুকিটাকি আরো কি কি!

হঠাৎ কি একটা শব্দে খুকুর ঘুম ভেঙে যায়। সে চোখ দুটো খুলে দেখে কি, টেবিলের উপরকার সেই বড় ডল্টা তার নীল চোখ দুটো ঘুরিয়ে বলছে—

রাত এখন নিঃঝুম,
আরামে তো দিচ্ছ ঘুম,
বল, আমি কার সাথে দুটি কথা কইব?
সারারাত ঠায় এমনি দাঁড়িয়েই কি রইব?
আমার সঙ্গে নাহয় একটু খেলতে!
ঘুম ঢুলঢুল্ চোখ দুটো নাহয় একটু
মেলতে!

কি ঝগড়াটে মেয়েরে বাবা!

খুকু কিছু বলবার আগেই খাড়া কান দুটো আরো খাড়া ক'রে খরগোশটা বলে ওঠে—

ছুটাছুটিই আমার কাজ,
ব্যস্ত আমি সকাল সাঁঝ,
'শশব্যস্ত' তাই বলে 'ব্যস্তবাগীশ'
লোককে

কেউ রুখতে পারে নাক' আমার
চলার রোখকে।
আমায় কেন রাখলে ক'রে বন্দী?
বেশ তোমাদের ফন্দি!

খরগোশ থামতে না থামতেই 'হাসিখুসি' ১ম ভাগখানা বলতে থাকে—

খুকু, তুমি ঘুমচ্ছ তো বেড়ে,
এদিকে যে অ'য়ে অজগর এসে গেল তেড়ে
আ'য়ের আমটা খাওনা কেন পেড়ে?
আর যদি কেউ খেয়েই ফেলে কেড়ে?
তখন করবে কি?
কেঁদে মরবে কি?

ও বাবা! কান্না নয়, ভয়ে খুকু প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল আর কি! কালো ডোরা কাটা হলদে বাঘটা কি বলবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছে—

আমি বনের বাঘ—
আমার বড্ড বেশি রাগ
রক্ষা নেই তার, আমি যাকে করব তাক।
সুন্দরবনে বাসস্থান
'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' ব'লে লোকে করে
সম্মান।

বাঘটা ভালো ক'রে না থামতেই সিংহটা লাফিয়ে উঠে—

আমি সিংহ পশুরাজ,
ডাকি যেন গর্জে বাজ
দুর্গার সনে অসুর দমন করি,
'সিংহবাহিনী' গৌরব তাঁর
আমারই পিঠে চড়ি'
স্কন্ধ দেশে কেশর গুচ্ছ গুচ্ছ
দেহ সুগঠিত উচ্চ।
বীরকে সকলে পুরুষ সিংহ কহে
বাঘ টাগ কেউ আমার সমান নহে।

কুমীরের দুপাটি ধারালো দাঁত দেখা যায়,—সে বলে—

ডাঙ্গায় বসেই যত দম্ভ,
জলে নামলেই হতভম্ব,
এই মুরোদেই এত লম্ফ ঝম্প!

এবার ফণা তোলা সাপটা এসে আসর জমিয়ে বসে—

বাসুকী আমার পূর্বপুরুষ
সে কথা কি আছে রে হুঁস্?
শিবের গলাটি জড়িয়ে তার মাথায় উঠিয়া বসি দুধ কলা দিয়ে মানুষ আমারে পূজা করে করে খুসি।
যদি কভু রেগে যাই,
হালে কারো পানি নাই
উচ্ছন্ন করে দিনু চাঁদ সদাগরকে
বেহুলা কতনা কষ্টে বাঁচাইল বরকে
ভুলে যেয়ো নাকো পরীক্ষিতের কথা,
'মহাভারতে'র অমৃতময়ী গাথা।

বেজী টিটকারি দিয়ে ব'লে ওঠে—

আহা মরে যাই,
বীরত্বের কতনা বড়াই!
আমারে দেখিলে শুধু পালাই পালাই!
ব্যাঙ খেয়ে বড় দেখি তেজ
মাটিতে লুটিয়ে চল লেজ।
মানুষ উপমা দিয়ে কয়—
'দুধ দিয়ে কাল্‌সাপ পোষা ভালো নয়।

সাপ বলে—ফোঁস্—
বেজী বলে, রোস্—
ও কি?

ল্যাজটাকে কড়িকাঠে ঠেকিয়ে, দাঁত

মুখ খিঁচিয়ে মুখ পোড়া হনুমানটা কি কামড়াবে টামড়াবে নাকি? নাঃ—সে কামড়ায় না চেঁচিয়ে বলে,—

. হুপ্ হুপ্ হুপ্
তোরা সবাই বেকুব।
না চেঁচিয়ে করতো দেখি চুপ।
আমি রামের সেবক হনু, কি চাস তোরা বল
উপড়ে আনব হিমাচল,
শুষে ফেলব সাত সাগরের জল।
কি চাস তোরা বল।

হনুমানের কথা শুনে ওরা ঠাণ্ডা হয়ে বসল।

বলল সবাই হেসে হেসে
যাব আমরা চাঁদের দেশে।

শুনে খুকু ভয়ে ভয়ে বলে,

উড়ে যাবে? কই তোমাদের ডানা
দুপাশে—দুখানা?

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ আসে কোত্থেকে রে বাবু? ঐ যে মস্ত কাঠের ঘোড়াটা খুর ঠুকছে—

স্বরটা করে মিহি
বলছে চি হি চিঁহি হিঁহিঁ
ধিনৃতা ধিনা ধিনৃতা—
তার তরে নেই চিন্তা—
আমি পক্ষীরাজ ঘোড়া
ভাখ্না ডানা জোড়া
আমার পিঠে চড়না তোরা
মেঘের সাথে ভেসে ভেসে,
নিয়ে যাবো চাঁদের দেশে।

মুখ কাঁচুমাচু করে খুকু আবার বলে,

বাবা কাকারা সবাই বলে,
সে পথে বড় গোলমাল চলে।
বড় কলের জাহাজ চড়ে উড়ে
বিজ্ঞানীরা আসছে সবাই ঘুরে।
চাঁদের দেশে পারবে না কো যেতে
মিছিমিছি উঠলে কেন মেতে?
আধেক পথে চাঁদ যদি দেয় বাধা
সব শুদ্ধ্ পড়তে হবে বাঁধা।

ওরা চেঁচিয়ে ওঠে

বাধা দিলেও করব না ভয়,
যুদ্ধ করেই করব রে জয়।
যাবোই আমরা যাবই যাব
কিছুতেই ভয় না পাব।

সবাই ওরা গিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে বসে। ডলটা খুকুকে বলে—

কি গো খুকু, হয়ে কাৎ,
ঘুমোবেই কি সারা রাত
আলসে তোকে বলবে সবাই
মজা করে চলনারে যাই।

কি আর করবে? ভয়ে ভয়ে খুকুও গিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে বসে

নীল আকাশে চাঁদ উঠেছে
রূপোর থালার মতো
জ্যোৎস্না দেখে সকাল ভেবে
ডাকছে পাখি কত!
কোকিল ডাকে কু কু,
দোয়েল দেয় শিস্
রাতের বাতাস বইছে ফিস্‌ফিস্।

ওইরে খুকু যা ভয় করেছিল, তাই হল—একটু এগোতেই চাঁদ এসে ওদের পথ আগলে দাঁড়ায়,

ও বাপুরা, সেজে গুজে যাচ্ছ কোন খানে?

শুনে ওরা খল্‌খলিয়ে খিল্‌খিলিয়ে হাসে
এখনো সে খবর বুঝি যায় নি তোমার কানে?

ও চাঁদ, যাব তোমার দেশে

তুমি বাদ সেধোনা এসে।
চাঁদ রেগে বলে,
ও রে রে রে রে রে
সাহস গেছে বেড়ে ?
দপ্‌দপ করে বিজ্ঞানীরা যত,
রকেট করে এসেও থতমত।
মনে ভাব তোমরা বুঝি তাদের চেয়েও বড় ?
ভালো চাও তো মানে মানে এবার সরে পড়।
ওরা বলে,
পথ ছেড়ে দাও,
নইলে লড়াই চালাও ॥
চাঁদ বলে, বটে !
ভয় নেইকো ঘটে !
দুনিয়াটা জুড়ে আছ,
তবু সাধ মেটেনি আজো !
দখল করতে এসেছ আমার রাজ্য।
তবে যুদ্ধ অনিবার্য !
শুনে ওরা হেসেই খুন—
খোকাখুকুর কপালেতে টিপ দাও,
শুনে 'আয় চাঁদ' ডাক
কি মুরোদের এত জাঁক !
সূর্যের কাছে আলো ধার করি,
শুক্লপক্ষে কর জারিজুরি
কৃষ্ণপক্ষে মুখ ঢেকে রাখ,
চোরের মতন লুকাইয়া থাক।
যুদ্ধ করার জন্য,
কোথায় তোমার সৈন্য ?

আকাশের তারাগুলি ঝিক্‌মিকিয়ে চিক্‌মিকিয়ে ওঠে
চেয়ে দেখ সারা আকাশে,
চাঁদের এপাশে, ওপাশে সেপাশে,
আমরা করিনে তো শুধু ঝিক্‌মিক্‌
রীতিমত সৈনিক।
হনুমান বলে,
শোনো চাঁদ বাছাধন,
পড়নি কি রামায়ণ ?
সূর্যকে পুরেছিনু বগলে ?
এবার তোমারে এই
মুঠোতে ভরিয়া নেই,
কীর্তি রাখিয়া যাই খগোলে।
বলেই সে তার কালো কুচকুচে মুঠোটা
খুলে দেখায়।
হঠাৎ চীৎকার শোনা যায়—
আর কেন দেরী ?
বাজাও রণভেরী !

রণভেরী বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটাও লাফিয়ে ওঠে, তার গলার ঘণ্টাটা বেজে ওঠে ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ! চোখ খুলে খুকু দেখে ও হরি, দেয়ালের ঘড়িটা ঢং ঢং করে বাজছে—আটটা বেজে তবে ঘড়িটা থামল। স্কুলের বাসটাও দেখি বাড়ির গেটের কাছে ভোঁ ভোঁ করছে—

জন্মদিনের উপহারগুলো টেবিলের উপরে তেমনি সাজানো রয়েছে। রণভেরী বাজলেও যুদ্ধের জন্য তাদের কোনো তাগাদা দেখা যায় না।

খুকু হাই তুলে বিছানা থেকে নেমে পড়ে।

(পাকিস্তান থেকে এসে অরুমিতুরা সোনাপোতায় ছিল। বাবা কলকাতায় মেসে থাকতেন, হঠাৎ দুর্ঘটনায় মারা যান। ওরা সোনাপোতা ছেড়ে সিঁথির ছোট্ট বাড়িতে এল। কাছেই মামার বাড়ি। মিতু স্কুলে ভর্তি হল। মাও সেখানে সেলাই শেখাবেন। অরুর স্কুল একটু দূরে।

ক্রমে গ্রামের ছেলে অরু ক্লাসের সব চেয়ে মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত হল। বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই নিশীথবাবু তাকে কত ভাল ভাল কথা বলতেন। এই নিশীথবাবুর ছেলে কল্যাণের সঙ্গে অরুর সবচেয়ে বেশি বন্ধুতা হল।

মিতুর ভাব হল তার ক্লাসের মেয়ে দুর্বা আর মাল্যশ্রীর সঙ্গে।

হঠাৎ দুচার দিনের জ্বরে কল্যাণ মারা গেল। অরু খুব কাতর হয়ে পড়ল।

পাড়ার মধ্যে অরু নিজেকে একটু আলাদা করে রাখত, সব সময়ে মিশত না, মিছিল ইত্যাদিতে যোগ দিত না, সেটা কিছু ছেলের অসহ্য লাগছিল। একদিন একটি ছেলের সঙ্গে মারামারি হল।)

চোদ্দ

অরু আজকাল রোজ ব্যায়াম করে। অন্তুদার কাছে নানারকম আসন শেখে। মা বলেন, ব্যায়াম করলে ভালো ভালো জিনিস খেতে হয়। আমরা গরিব। ওসব কোথায় পাব ?'

অরু বলে, 'বেশি দামি হলেই বেশি উপকারী হয় না মা, অন্তুদা বলে আমরা সস্তায় যে সব জিনিস পাই, তা অনেক দামী ফলমুলের চেয়েও বেশি উপকারী। পেয়ারাতে আপেলের মতোই ভিটামিন আছে। তুমি শুধু আমাকে রোজ সকালে ছোলা-ভিজানো আর আখের গুড় দেবে। মিতুটাকে বলি ব্যায়ামট্যায়াম করতে—তা ত কিছুতেই করবে না।'

'ধেৎ, ছোটদার যতসব—' বলে মিতু আপত্তি জানালো।

মা বলেন, 'ও সারাদিন যা পরিশ্রম করছে, তা ওর বয়সী মেয়ে ক'জন করে? এর ওপর আর ব্যায়াম করতে হবে না।'

অরু বলে, 'সত্যি মা, মিতুটা খুব খাটে। তবুও ছাখো প্রত্যেক বছর ফার্স্ট হচ্ছে। দেখো, বড় হয়ে চাকরী করলে ওকে অনেকদূর পর্যন্ত পড়াব।'

মা হেসে ফেলেন। বলেন, 'হয়েছে। নিজেরটা আগে দেখ। সেটাই বেশি দরকার।'

অরু বলে, 'আমি তো বৈজ্ঞানিক হব। আইনস্টাইন, জগদীশচন্দ্রের মতো। জানো মা, আমাদের অংকের মাস্টারমশাই কাল সকলকে জিজ্ঞেস করছিলেন পাঁচকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে কি হয়। সকলে বলেছিল শূন্য। শুধু আমিই বলেছিলাম ওরকম ভাগের কোনো উত্তরই হয় না। শুনে মাস্টারমশাই বললেন আমার যা কল্পনাশক্তি আছে, তাতে আমি বড় হয়ে বৈজ্ঞানিক হব।'

মা বলেন, তোমরা মানুষ হলেই তো আমার গর্ব। রাস্তা দিয়ে যখন যাব সকলে দেখিয়ে বলবে, ঐ ছাখো, বৈজ্ঞানিক অরূপ কুমার বসুর মা যাচ্ছেন।

পনেরো

আরেকদিন বিকেলে একটা পুলিসের গাড়ি এসে অরুদের বাড়ির সামনে থামল। গাড়ি থেকে নামল একজন সার্জেণ্ট, পেছনে অরু এবং আরো একজন ভদ্রলোক। না, অরুর মুখ হাসি হাসি। কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। কিন্তু জামাপ্যাণ্ট সব ভিজে কেন? মা মিতু দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠল।

মিতু তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিল। সার্জেণ্ট বাড়িতে ঢুকে মাকে বলল, 'আপনিই অরূপের মা? অরূপের মতো ছেলের জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ একটা পুকুর থেকে একটি ডুবন্ত ছেলেকে ও বাঁচিয়েছে। ছেলেটি এখন হাসপাতালে। জ্ঞান ফিরেছে। আপনার ছেলের নাম আমরা পাঠাচ্ছি যাতে এই সাহসিকতার জন্য যথাযোগ্য পুরস্কৃত হয়।

পাশের ভদ্রলোকটি এগিয়ে এলেন। বললেন, 'আমরা যে আপনাদের কাছে কি রকম কৃতজ্ঞ তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমারই ভাইপোকে অরূপ বাঁচিয়েছে। দাদা বৌদি হাসপাতালে আছে বলে এখনই আসতে পারল না। আমাকে আপনার কাছে তাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পাঠিয়েছে। যদি আপনারা সকলে আমাদের বাড়ি পায়ের ধুলো দেন তবে ধন্য হব। অবশ্য দাদা বৌদি এর মধ্যে আপনাদের কাছে আসবে।

আরো অনেক উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন। পুলিসের গাড়িও চলে গেল

মার চোখ দিয়ে আনন্দে জল গড়িয়ে পড়ে! সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরের কাছে সাষ্টাংগ হয়ে বলেন, 'ঠাকুর, আমার জীবনের এই সম্বলটুকু নিও না। এদের বাঁচিয়ে রাখো। মানুষের মতো মানুষ করো। আর আমি কিছু চাই না।'

মিতু ছোটদাকে জিজ্ঞেস করে, 'ছোটদা, তোর ভয় করল না পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়তে! যদি ছেলেটা তোকে জড়িয়ে ধরত?'

অরু বলে, 'তুই কি ভাবিস আমি অস্তুদার আখড়ায় শুধু ব্যায়াম শিখতে যাই? কি করে ডুবন্ত মানুষকে বাঁচাতে হয়, আগুন লাগলে কি করতে হয়, ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হয় কি করে সব সেখানে দেখানো হয়। তাছাড়া সাঁতার তো আমি ছোটবেলা থেকেই জানি। কতবার নদী পার হয়েছি। তুইও তো হয়েছিস।'

সত্যিই, মিতুও কতবার সাঁতরে নদী পারাপার হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় এসে মনে হয় সব ভুলে গিয়েছে। এতকালের মধ্যে দুবার মাত্র মার সাথে গংগাস্নান করতে গিয়েছিল। তাও সাঁতার কাটে নি ভয়ে। মাও বারণ করেছিলেন।

ষোলো

অরু ফিরছিল স্কুল থেকে। রাস্তার মোড়ে লালবাড়িটার রোয়াকে দেখল কয়েকটি ছেলে বসে আছে। তার মধ্যে আছে সেই ছেলেটি যার সংগে তার মারামারি হয়েছিল। সেই ঘটনার পরে তাকে আজই প্রথম দেখল। অরু মনে মনে বিরক্ত হয়। অরুকে দেখে হয়তো আবার কিছু বলবে। বিশেষ করে তার ওপর এখন আক্রোশ আছে, তাছাড়া ওর সংগীরাও আছে। অরু ওদিকে না তাকিয়ে সোজা চলতে লাগল।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখল কেউই তাকে কিছু বলল না।

হঠাৎ সেই ছেলেটি সংগীদের মধ্যে থেকে উঠে এসে অরুকে ডাকল, 'অরূপ, শোনো।'

অরু ফিরে তাকাল। ছেলেটি তাকে বলল, 'আমার নাম রজত। তোমার চাইতে বয়সে আমি অনেক বড়। কিন্তু আজ যদি তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাই তুমি কি ক্ষমা করতে পারবে ভাই?'

অরু অবাক হয়ে তাকে দেখল। এতদিন তাকে এইভাবে ভালো করে দেখেনি। প্রথমে ভাবল, ছেলেটি হয়ত ঠাট্টা করছে তার সংগে। তার কপালে একটা কাটার দাগ। ওখানেই একদিন অরু ইঁট দিয়ে মেরেছিল।

ছেলেটি আবার বলল, 'ছোটবেলায় আমার বাবা মা দুজনেই মারা যান। মামার বাড়িতেই মানুষ। মামাও খুব গরিব আমাকে বেশিদূর লেখাপড়া শেখাতে পারেননি। অথচ, বিশ্বাস কর, আমি পড়াশোনায় খারাপ ছিলাম না। নিজে মূর্খ হয়েছি বলে অন্য কেউ লেখাপড়া করে তা দেখতে পারি না। তাদের বিদ্রূপ করি। একটা চাকরী নিয়ে যে নিজের পায়ে দাঁড়াব, তাও পারছি না। মূর্খকে কে চাকরী দেবে বল? সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কাটাই। আর ভালো লাগে না।'

ছেলেটির চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে তা মুছে চারিদিকে তাকায়, পাছে রাস্তার লোক কেউ দেখে ফেলে।

অরু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারে না। তারপর সে যা করে, তা যে কোনোদিন করবে সে কি নিজেও ভেবেছিল।

ছেলেটির হাতটা সে তার নিজের দুহাতের মধ্যে ধরে বলে ওঠে, 'আমাকে ক্ষমা কর রজতদা।'

সতেরো

রমেশবাবুরা এসেছিলেন অরুদের বাড়িতে। রমেশবাবু, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে বাবলু—যাকে অরু পুকুর থেকে তুলে বাঁচিয়েছিল। অনেক করে বলে দিলেন অরুর মাকে একদিন তাঁদের বাড়ি যেতে।

কয়েকদিন পরে অরুরা গেল তাঁদের বাড়ি। বিরাট বাড়ি। সামনে ফটক—তাতে লেখা আছে 'কুকুর হইতে সাবধান।'

ওরা ফটকের সামনে দাঁড়াতেই একজন লোক এগিয়ে এল—বোধহয় দারোয়ান। ও কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই কোথা থেকে বাবলু ছুটে এল। সোজা অরুর হাত ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে গেল। মিতুরা পেছন পেছন চলল।

ফটক থেকে বারান্দা পর্যন্ত একটা সোজা সুরকির রাস্তা চলে গিয়েছে। দুপাশে সারি সারি ফুলের গাছ আর সবুজ মাঠ। অরু ভয়ে ভয়ে চলতে লাগল, যদি হঠাৎ কোনো কুকুর এসে সামনে হাজির হয়।

বাবলুকে অরুর খুব ভালো লাগে। সব সময়ই ছটফট করছে! অরুকে নানা জিনিস দেখাচ্ছে। একেই একদিন মৃতপ্রায় অবস্থায় পুকুর থেকে তুলেছিল।

মনে পড়ে সেদিনকার কথা। ওকে ডুবতে দেখেও রাস্তার লোক শুধু 'গেল গেল' বলে চিৎকার করছিল। কেউই জলে নামছিল না—হয়ত সাঁতার জানত না বলে। অরু এক মুহূর্তের মধ্যে তার জুতো খুলে ফেলে বইপত্র রাস্তার ওপর ফেলে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে।

বাবলুর দিকে তাকিয়ে আজ হঠাৎ অরুর মনে হয়, বাবলুর পায়ে যদি একটা কাঁটা ফোটে, সেটা তার বুকে গিয়ে বিঁধবে। যাকে বাঁচানো যায় তার ওপর কি একটা প্রাণের টান জন্মে যায়?

তারা বাইরের ঘরে বসেছিল। রমেশবাবু ও তাঁর স্ত্রী কিছুক্ষণ পরেই এলেন। অরুদের জন্যে নানারকম খাবার এলো। মা আপত্তি করতে লাগলেন কিন্তু বাবলুর বাবা-মা কিছুতেই শুনলেন না।

তাঁরা বসে কিছুক্ষণ গল্প করলেন। অরুর মনে হল কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলের কথা ফুরিয়ে গেল। একই ধরণের কথাবার্তা কিছুক্ষণ ধরে চলল। সেই একঘেঁয়ে আলোচনা—অরুর প্রশংসা, হঠাৎ কি রকম গরম পড়েছে তার কথা, বাবলুর দুষ্টুমির কথা।

বাবলু অনর্গল কথা বলতে লাগল। তার বন্ধুদের কথা, তাদের কুকুর জেসপারের নাম কাকু রেখেছে একটা ইংরাজী বইএর থেকে। জানো জেসপার অংক জানে। তুমি ওর সামনে দুটো বল দাও, ও গুনে দুবার ঘেউ ঘেউ করবে। তিনটে বল দিলে তিনবার। ও পাঁচ পর্যন্ত গুনতে পারে। জেসপার এখন বেড়াতে গিয়েছে। আমাদের ড্রাইভার রামবাহাদুরের সংগে। জানো আমাদের আগে আরেকজন ড্রাইভার ছিল—লক্ষণ সিং। তার জেল হয়েছিল একজন লোককে চাপা দিয়েছিল বলে।

লোকটা পরে মরেই গিয়েছিল। আমরা তখন কাশ্মীরে ছিলাম। আমার কিচ্ছু মনে নেই। তখন খুব ছোট ছিলাম কিনা।

রমেশবাবু বাবলুকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। অরুর মাকে বললেন 'হ্যাঁ, একটা ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলাম আমি। কলকাতার বাইরে থাকাতে বেঁচে গিয়েছিলান। তবুও কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে চেয়েছিলাম মৃত লোকটির আত্মীয়স্বজনের জন্যে। কিন্তু ডাঃ প্রতীপ মিত্র কিছুতেই রাজী হলেন না।'

তাঁর মুখে মামার নাম শুনে অরুরা চমকে উঠলো। মা কোনরকমে বললেন, 'কেন? তিনি এর মধ্যে এলেন কি করে?'

রমেশবাবু বললেন, 'কারণ মৃতব্যক্তি ডাক্তার মিত্রের ভগ্নীপতি ছিলেন।'

মা সোফার একপাশে হেলে পড়লেন। অরুমিতুও যেন সব কথা হারিয়ে ফেলেছে।

মা হঠাৎ উঠে বললেন, 'আজ আমরা আসি।'

রমেশবাবু 'একটু বস্থন' বলে উঠে গেলেন। পাশের ঘরে তাঁর স্ত্রীর সংগে কি কথা বলছেন শোনা গেল

কিছুক্ষণ পরে আবার এসে বললেন, 'একটা কথা বলতে আমি খুবই লজ্জা বোধ করছি, আপনি কি ভাবে নেবেন তাই ভেবে। আপনাদের কাছে আমার যে ঋণ তা শোধ কর' যাবে না। আমাদের বাবলুকে যে আমরা ফিরে পেয়েছি, সে অরুরই জন্যে। তবুও খুশী হয়ে আমি যদি তাকে কিছু পুরস্কৃত করি, আশা করি আপনি তাতে বাধা দেবেন না।' এই বলে পকেট থেকে তিনি একটা চেক বের করলেন।

মা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'রমেশবাবু, মৃত্যু বা জীবনের দাম টাকায় কষে বের করবার হিসেব আমি শিখিনি। আশীর্বাদ করুন অরুকে, সেও যেন জীবনে তা না শেখে। তার বাবার জীবনের দাম আপনার কাছে কত টাকা তাও যেমন সে জানতে পারেনি, বাবলুর জীবনের দামও আপনার কাছে কত টাকা তাও তাকে জানতে দেবেন না। সে জানুক জীবন অমূল্য। একটা অমূল্য জীবন সে যদি নিজের জীবন দিয়েও বাঁচাতে পারে, সেটাই তো তার পুরস্কার।'

রমেশবাবুর স্ত্রীও এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা দুজনেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। রমেশবাবুর হাত থেকে চেকটা মাটিতে পড়ে গেল।

মা বললেন, 'হ্যাঁ, প্রতীপবাবু আমারই দাদা।' তারপর অরুমিতুর হাত ধরে রাস্তায় নেমে পড়লেন।

ক্রমশঃ

ছুটির আশ্বিন

করুণাময় বসু

শ্রাবণের কাঁচঘরে রোদ মুছে গেলে,
সবটুকু মোছে নাকি, কিছু স্বপ্ন কিছু রঙ রয়ে যায় বাকি
বিষ্টি ভেজা আকাশের সব শেষে মায়াভরা আবির বিকেলে,
শ্রাবণের কাঁচঘরে রোদ মুছে গেলে ঃ
সেই রঙ একদিন
নিয়ে আসে পৃথিবীতে জ্বলজ্বলে রূপালি আশ্বিন।
হীরে পান্না চুণী মুক্তো গুঁড়ো করে তার সব রঙ
রোদ হয়, পাখি হয়, হাসি আর মায়া ঝরা গান,
জগতের যতো কিছু ভালোবাসা, যতো সব খুসি ভরা প্রাণ,
ছুটির বাঁশির সুরে কতো দূরে ঘণ্টা বাজে ঢঙ ঢঙ ঢঙ।
সেই রঙ কাঁচপোকা রূপ ধরে ঘাসে ঘাসে সোনালি সবুজে,
ঝিলমিল কাঁচনীল দিঘি জলে রাজ হাঁস কি যে খোঁজে
চোখ দুটি বুজে ;
সব যেন হীরে হয়, ঝকমকে রোদের আকাশ,
শুধু কটি শুভ্র মেঘ ময়ূর পঙ্খীর মতো ভেসে যায়
দুর দেশে নিরুদ্দেশে ঃ চোখে আনে স্বপ্নের আভাস।
আজো রূপকথা-দেশে হাত নাড়ে, ছায়া ফেলে মায়ার পুতুল,
তাই বুঝি আলো হয় প্রজাপতি, জোনাকিরা তারা হয়,
ভালোবাসা ফুল।
লাল রঙ, চাঁপারঙ মেঘ হয়, জ্যোৎস্না হয়, হাত নাড়ে
মায়ার পুতুল।
সেই আলো, সেই রঙ ঠোঁটে করে নিয়ে আসে টিয়ে পাখি,
মনুয়ার ঝাঁক,
তাইতো বসন্ত আসে, ঘুম চোখে চেয়ে থাকে হেমন্ত অবাক।
ফিরে আসে ঝিনুকের ঝিকিমিকি, কাঁচনীল আঁকা ঝিল,—
ঝিলমিল জলে যেন দোল খায় শরতের ঝকঝকে দিন,
মাঠে মাঠে ছেলেদের ছুটোছুটি, নীলু আর পুঁটি বলে,
জানো মাগো, এলো আজ খুসি ভরা ছুটির আশ্বিন।

খেলা

সুখলতা রাও

কাকা। ও টেঁপি, ও বেচু, এদিকে আয়!

টেঁপি ও বেচু। কি কাকা? কেন ডাকলে?

কাকা। নূতন খেলা শিখবি, বস্।

নেপাল ও বিপিন: আমরাও শিখব।

কাকা। আচ্ছা এস। এ কিন্তু ছেলেমানুষী খেলা। এর নাম জল-মাটি-আকাশ খেলা। তোমরা সকলে আমার সামনে বস। তোমাদের মধ্যে যে কোন একজনের দিকে আঙ্গুল দিয়ে আমি, জল-মাটি-আকাশ এই তিনটার মধ্যে একটার নাম করে তাড়াতাড়ি এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণে যাব। এই দশ গোণার মধ্যে যাকে যেই জিনিসের নাম করেছি সেইখানে থাকে এমন একটা জন্তুর নাম বলতে হবে। মনে কর আমি বললাম মাটি—এক-দুই-তিন চার····· দশ। যার দিকে দেখিয়ে বললাম সে অমনি গরু কি ঘোড়া মানুষ কি বাঘ, যা মাটিতে থাকে এমনি একটা কিছু বলবে। যদি না বলতে পারে, তবে তাকে আবার আমার মত অন্যদের জিজ্ঞাসা করতে হবে জল-মাটি-আকাশ বলে। এইবার মন দাও আরম্ভ করি।' (বেচুর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে) আকাশ—এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ ছয়-সাত-আট-নয়-দশ!'

বেচু। বাঃ, ভাবতে দেবে না?

কাকা। হাঃ হাঃ, ভাবতে ত সময় দিলাম। ঐ দশ গুণবার মধ্যেই বলতে হবে। আচ্ছা, তোমরা সকলে মনে মনে কয়েকটা নাম ঠিক করে রাখ।

নেপাল। জল জিজ্ঞাসা করলে মাছ বললে হবে?

কাকা। না, তা হবে না। আকাশ জিজ্ঞাসা করলে পাখি বললেও চলবে না। মাছের নাম, যেমন রুই, কাতলা, পুঁটি এই সব আর পাখির নাম, যেমন কাক চিল চড়াই, এই সব বলতে হবে। এবার আবার জিজ্ঞাসা করি। বিপিন, আকাশ—এক-দুই-তিন্—বিপিন। টিয়া।

কাকা। বেশ, বেশ। টেঁপি—মাটি—এক-দুই-তিন-চার—টেঁপি। গণ্ডার।

কাকা। বাঃ রে, চালাক মেয়ে! তোরা দেখি আমাকে ঠকিয়ে দিলি। তাহলে আবার বলছি। বেচু—আকাশ—এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ ছয়—'

বেচু। এ-এ-এই গরু!

(সকলের হাসি)

কাকা কত বড় গরু আকাশে উড়তে দেখেছিস রে? নে, এবার তুই জিজ্ঞাসা করবি। কিছুক্ষণ খেললেই অভ্যাস হয়ে যাবে। আমরা এক চালাকি করতাম—জল-মাটি আকাশ জিজ্ঞাসা

করবামাত্র আগে চি বলে ফেলতাম। তারপরে, আকাশ হলে ইল (চিল) মাটি হলে ইতা (চিতা) আর জল হলে বলতাম ইংড়ি (বা চিংড়ি!) তবে একটা নিয়ম আছে, একজন একই নাম উপরি উপরি তিনবারের বেশি বলতে পারবে না। অবশ্য যে জিজ্ঞাসা করছে সে মাটি বা জল বা আকাশ উপরি উপরি যতবার খুসি জিজ্ঞাসা করতে পার। কিন্তু, যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সে যদি যতবার মাটি বলা হয় ততবারই মানুষ বলে, তাহলে চলবে না।

(শচি ও সুধীরের প্রবেশ)

শচি। বারে, আমাদের খেলতে ডাকলে না কাকা ?

কাকা। তোমরা যে ছেলেমানুষি খেলা খেলতে চাও না। আচ্ছা এবার একটা বুদ্ধির খেলা বলি শোন। তোমরা যারা ভূগোল পড়েছ তারা খেলতে পারবে। গোল হয়ে সবাই বস। নেপাল, তুমি একটা কোন নদী বা পর্বত বা শহরের নাম কর।

নেপাল। বালিগঞ্জ।

কাকা। না, ওরকম ছোটখাট জায়গার নাম নয়। এমন নাম বলতে হবে যা একটু বড় ভূগোলের বই-এ আছে। যা তোমরা সচরাচর পড়ার মধ্যে পাও।

নেপাল। তবে, কলিকাতা।

কাকা। এবার বিপিন 'ত' দিয়ে আরম্ভ এমন একটা নাম কর—নদী, হ্রদ, প্রণালী বা শহর' যাই হক।

বিপিন। তমলুক।

কাকা। শচি বল 'ক' দিয়ে!

শচি। কয়ে উকার-উকার এসব থাকতে পারে ত ?

কাকা। পারে।

শচি। কৃষ্ণা।

সুধীর। আমি তবে কি দিয়ে বলব ?

কাকা। এটা একটু গোলমেলে কথ বটে। 'ন' দিয়ে আরম্ভ করাই ভাল।

সুধীর। নায়াগারা। এবার নেপাল বল র-দিয়ে।

নেপাল। রাশিয়া। তাহলে বিপিন কি দিয়ে বলবে কাকা ?

কাকা। য দিয়ে বলতে পারে। এবার ত তোমরা খেলাটা বুঝলে. এবার আমি যাই। তিনবার যে ঠেকে যাবে, বলতে পারবে না, সে হেরে যাবে। মানুষের নাম দিয়েও এ খেলা করা যায়, তাতে ভূগোল জানবার দরকার হয় না যেমন প্রথম জন যেন বলল 'নলিনী', দ্বিতীয় 'নবদ্বীপ', তৃতীয় 'পরেশ', চতুর্থ 'শচি'—এই রকম আর কি।

সন্দেশি স্বাদ

অশোক দাশ

সন্দেশ সন্দেশ, কোথা বাড়ি কোন দেশ
তিনকোণা পার্কের ধারে কি ?
কানে কানে বলে যাও, এত মধু কোথা পাও
মৌমাছি তোমা সাথে পারে কি ?
বহুদিন আগে নাকি, আমাদের দিয়ে ফাঁকি
ঢের লোক এই স্বাদ পেয়েছে,
বাবা যবে ছোট ছিল,—দাদু তার বাবা ছিল
দোঁহে মিলে ঢের মধু খেয়েছে।
তবু বাবা আজকেও, আপিসের কাজকেও
রাতে রেখে সরিয়ে, বিছানাতে গড়িয়ে
প্রাণ ভরে ঘ্রাণ নেয় সন্দেশি ভাণ্ড
বল দেখি এ সকল কোন দেশী কাণ্ড !!
আমরাতো জানতাম ছোট আছি আমরাই
ছোটদের অধিকারে সন্দেশ কামড়াই !
তবু দেখ আজকেও যেই আসে বইটা
বাড়িভরা কি রকম লাগে হৈ হৈটা !
বাবা বলে লেখাপড়া কোরোনাক পণ্ড
বাংলা বা ব্যাকরণ পড় তো দু দণ্ড
বয়েসেতে ঢের বড়, তায় গুরুজন তো
তাই সাজি ভালো ছেলে (উপমা জ্বলন্ত !)
বই নিয়ে বাবা বসে, কোনো ধারে চায়না
ধাঁধাঁ না সমাধা হ'লে শান্তি তো পায়না ;
তার পরে যত আছে কবিতা বা গল্প
চটপট পড়ে নেয়, সময় যে অল্প।
দিদি বলে হোক দেরি, চাটনি তো টকে না
যদি কোনো এক ফাঁকে
পড়িয়ে নিয়েছ 'মা'কে
মেজাজটা ভালো থাকে, কাউকে মা বকে না।
দিদিমা তো কানে শোনে, চোখে নাহি দৃষ্টি
সব শুনে বলে 'এ যে আনন্দ বৃষ্টি'
পড়া হোলে বাবা বলে 'লেখা বড় মিষ্টি'
মা বলেছে 'এই বই অপূর্ব সৃষ্টি'

নাম রহস্য : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
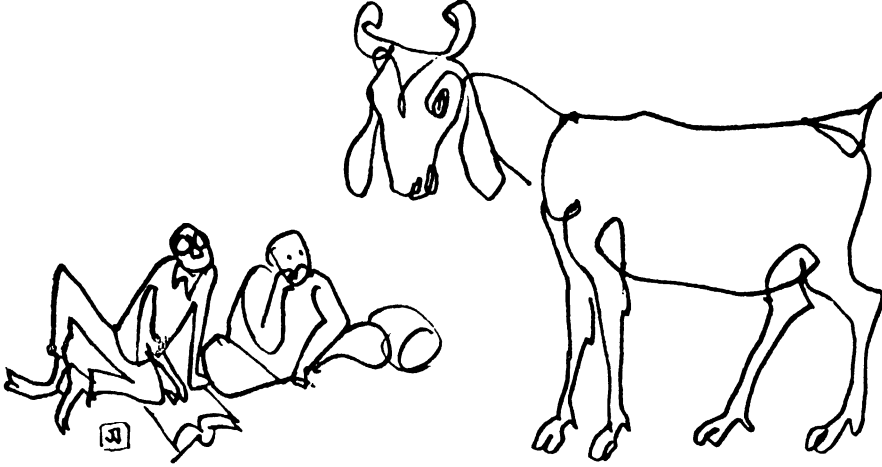
আমার জ্ঞাতি ভাই গজানন গাঙ্গুলী ফোঁৎ করে নাক দিয়ে আওয়াজ করলেন একটা। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছাগলের কী কী নাম হতে পারে হে প্যালারাম ?'

এমন একটা বেয়াড়া প্রশ্নে আমি ঘাবড়ে গেলুম। ছাগলের কী নাম হতে পারে এ নিয়ে আমি কখনো ভাবিনি। পরীক্ষায় এরকম কোশ্চেন কোনোদিন আসেনি।

আমি ঘাড় টাড় চুলকে বললুম, 'ছাগলের নাম কী আর হবে ! যারা বাঁদর নাচায়, তাদের সঙ্গে তো প্রায়ই একটা ছাগল থাকে দেখি। তারা তাকে গঙ্গারাম বলে ডাকে। আমার ধারণা, সব ছাগলেরই নাম গঙ্গারাম।'

বিকট মুখ করে গজাননদা বললেন, 'তোমার মুণ্ডু ! নিজের নাম প্যালারাম, তাই গঙ্গারাম ছাড়া আর কীই বা ভাববে তুমি ? অথচ তুমি না পরীক্ষায় বাংলায় লেটার পেয়েছিলে ?'

বাংলায় লেটার পাওয়াটা খুব অন্যায় হয়ে গেছে আমার, স্বীকার করতে হল সেকথা। ছাগলের নাম কী কী হতে পারে এ যার জানা নেই, তার লেটার পাওয়ার এক্তিয়ার নেই কোনো।

আমার খুব অপমান বোধ হল। বিরক্ত হয়ে বললুম, 'ছাগলের কী আবার নাম হবে ? ঝুমকি, টুমকি, মেনি'—

যেই মেনি বলেছি, গজাননদা অমনি ফ্যাঁচ করে উঠলেন।

'মেনি ? তোমার মাথা। মেনি তো একচেটে বেড়ালের নাম, ছাগলের হবে কী করে ? বোর্ডের উচিত, তোমার লেটারটা কেটে দেওয়া।'

এবার আমি চটে গিয়ে বললুম, 'তা হলে আপনিই বলুন না, ছাগলের কী কী নাম হয়।'

'আমিই যদি জানব, তাহলে তোমায় জিজ্ঞেস করব কেন হে? ভেবেছিলুম তোমার একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছ, তুমি একটা বাত্‌লে দিতে পারবে। এখন দেখছি তোমার মাথায় স্রেফ ড্রায়েড্ কাউ ডাং—অর্থাৎ কিনা ঘুঁটে।'

বৌদি বাড়ির ভেতরে তালের বড়া ভাজছেন, বাতাসে তার প্রাণকাড়া গন্ধ আসছে। বৌদি আবার বলে গেছেন, দুটো তালের বড়া খেয়ে যেয়ো প্যালারাম, তালক্ষীরও করে রেখেছি।' এসব জটিল ব্যাপার না থাকলে অনেক আগেই উঠে পড়তুম আমি—ছাগলের নাম নিয়ে এ অপমান কে সহ্য করত এতক্ষণ!

আমি বললুম, 'আপনিই বা এ নিয়ে এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ছাগলের নাম যা খুশি হোক না, আপনার তাতে কী! আপনি তো আর ছাগল পোষেন না।'

গজাননদা থেমে থেমে একটা আধপোড়া দেশলাইয়ের কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে চটপট বাঁ কানটা চুলকে নিলেন। তারপর মুখ বাঁকা করে বললেন, 'ঘাবড়াচ্ছি কেন? আরে—টু হাণ্ড্রেড্ অ্যাণ্ড ফিফ্‌টি রুপিজ।'

'অ্যাঁ!'

'অ্যাঁ আবার কী! আড়াই শো টাকা। ক্যাশ।'

'কার টাকা? কিসের ক্যাশ?'—আমি কাকের মতো হাঁ করে চেয়ে রইলুম গজাননদার দিকে।

'অমন জগদ্দল একটা হাঁ করেছ কী বলে?'—গজাননদা এবার ডানদিকের কানটা চুলকোতে লাগলেন: 'টাকা আমার ব্রহ্মময়ী মাসিমার। তাঁরই ক্যাশ।'

তালের বড়ার সঙ্গে বেশ উৎসাহ বোধ করতে করতে আমি ঘন হয়ে বসলুম।

'কিছু বুঝতে পারছি না, খুলে বলুন।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে গজাননদা সবটা বিশদ করলেন।

মেসোমশাই অনেক টাকা রেখে অনেক দিন আগে স্বর্গে গেছেন। ব্রহ্মময়ী মাসিমা সেই টাকা দিয়ে এতদিন তীর্থ-টীর্থ করছিলেন। মেসোমশাই নামকরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন, অনেক শিষ্যও তাঁর ছিল। সেই শিষ্যদের একজন হালে মাসিমাকে একটা ছাগলছানা দিয়ে গেছেন প্রণামী হিসেবে।

এখন মাসিমার তো ছেলেপুলে নেই—এই ছাগলছানাটাকে ভীষণ ভালবেসেছেন তিনি। এর জন্যে স্পেশ্যাল ছোলা-কলা বরাদ্দ, মায় ছোট্ট একটা খাট—তাতে নেটের মশারি পর্যন্ত। কিন্তু মুশ্‌কিল হল, এমন আদরের ছাগলের জন্যে কোনো নামই তিনি ঠিক করতে পারছেন না। এর এমন একটা নাম চাই যে শুনলে কান জুড়িয়ে যাবে, প্রাণ ঠাণ্ডা হবে। তাই ব্রহ্মময়ী মাসিমা ডিক্লেয়ার করেছেন, তাঁর ছাগলের জন্যে নাম যে ঠিক করে দেবে—তাকে তিনি আড়াইশো টাকা প্রাইজ দেবেন। ক্যাশ!

ছাগলের এই আপ্যায়ন শুনে পিত্তি জ্বলে গেল আমার। মনে মনে ভাবলুম, শ্রীমান প্যালারাম না হয়ে ব্রহ্মময়ীর ছাগল হতে পারলে জন্মটা সার্থক হত।

গজাননদা বললেন, 'বুঝলে, সেই জন্যেই—'

বললুম, 'ওপন কম্পিটিসন গজানন দা ?'

'উঁহু !'—ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে গজাননদা বললেন, 'তুমি যদি প্রাইজটা মেরে দেবার তালে থাকো, তা হলে সে গুড়ে বালি। কম্পিটিসন মাসিমার বোনপোদের মধ্যে স্ট্রিক্‌ট্‌লি রেস্ট্রিক্‌টেড্। আর তাও কি কম নাকি ?

ব্রহ্মময়ী মাসীকে ছেড়ে দিয়ে—আমার মা আর বাকী পাঁচজনের ছেলেমেয়ে নীট্ বত্রিশজন ! জানো তো আমার দু বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, তাদের বলেছিলুম তোরা পার্টিসিপেট করিস নি—তা হলে দুজন কম্পিটিটর কম হয়, তারা বললে, আড়াইশো টাকা যদি ফাঁকতালে পেয়ে যাই, ছাড়ব কেন ? কি রকম মীননেস দেখেছ ?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয় ।'

'তা হলে প্যালারাম—'কাতর হয়ে গজাননদা বললেন, 'দাওনা একটা নাম-টাম বলে। বাংলায় যখন লেটার পেয়েছ, তোমার অসাধ্য কী আছে ? আর যদি পাই; বুঝেছ প্যালারাম—পঁচিশ টাকা কমিশন দেব তোমাকে ।'

এ-কথা শুনে আমার মনটা নরম হল একটু। পঁচিশ টাকাই বা মন্দ কী ! পাঁচ টাকাই বা কে দিচ্ছে আমাকে !

'শুধু একটাই নাম পাঠাতে হবে ।'

'না—সেরকম বাঁধাবাঁধি নেই কিছু ।'

'তা হলে এক কাজ করা যাক। অনেকগুলো নাম পাঠিয়ে দিই। একটা লেগে যাবে নির্ঘাত ।'

সে কথা ভালো। আমি কাগজ পেনসিল নিয়ে আসি বরং ।'

গজাননদা কাগজ-পেনসিল আনলে আমি বললুম, 'তা বলে প্রথম অ দিয়েই শুরু করা যাক ।

'অ ?'—গজাননদা আঁতকে উঠলেন: তোমার মতলব কি রে ? গোটা স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ কপচাতে চাও নাকি ?'

আমি বললুম, 'ডিস্‌টার্ব করবেন না। আমার মুড আসছে—লিখে যান। প্রথমে লিখুন অঞ্জনা।

'অঞ্জনা ? অঞ্জনা মানে কী ?'

'অঞ্জন মানে কাজল। অঞ্জনা মানে—কাজলের মতো যার রঙ, অর্থাৎ কিনা—কালো !'

'ধুৎ !'—গজাননদা আপত্তি করলেন: 'ছাগলটা মোটেই কালো নয়। লাল-সাদা-কালো-হলদে এসব মিশিয়ে বেশ চিত্তির-বিচিত্তির চেহারা।'

'অ—চিত্তির-বিচিত্তির। তা হলে—তা হলে—অপরূপা।'

'এটা বেশ হয়েছে—' খুসি হয়ে গজাননদা বললেন, 'লেগে যেতে পারে। দিই পাঠিয়ে।'

ব্যস্ত হবেন না—চান্‌স্ নিয়ে লাভ কী ? আরো লাগান গোটা কতক। এবারে আ। আ—আ —লিখুন আজীবনী।'

'আজীবনী ! সে আবার কী ?'

'মানে সারা জীবন বেঁচে থাকবে, এই আর কি! নামের ভিতর দিয়ে আশীর্বাদ করা হ ছাগলকে!'

গজাননদা বললেন, 'সারাজীবন তো সবাইই বেঁচে থাকে, যখন যারা যায় তখন একবারে মারা যায়। এ নামের কোনো মানে হয় না!'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আপনি তো বি-কম ফেল, সাহিত্যের কী বোঝেন? যা বলা লিখে যান। লিখুন আজীবনী।'

আজীবনী লেখা হল।

'এবারে ই। ই—ই—ই—আচ্ছা, ইন্দ্রলুপ্তা হলে কেমন হয়?'

'ইন্দ্রলুপ্তা?'—গজাননদা খাবি খেলেন: 'সে কাকে বলে? ওতো—ইন্দ্রলুপ্ত মানে তো টাক! এ তুমি কী বলছ হে প্যালারাম! ছাগলের নাম টাক হলে মাসিমা আমায় প্রাইজ দেবেন?'

'তা হলে ওটা থাক। আচ্ছা ইন্দীবরী?'

'ইন্দিবরী?'—গজাননদা ভুরু কোঁচকালেন।

'ইন্দীবর মানে নীলপদ্ম।'

'নীলপদ্ম? বাঃ—বেড়ে।'—গজাননদা বেশ ভাবুকের মতো হয়ে গেলেন: 'আহা নীলপদ্ম চোখ জুড়ায়, প্রাণ জুড়োয়। কিন্তু ছাগলটার রঙ তো নীল নয়।'

'তাতে কি হয়েছে? আমাদের নীলিমাদি রঙও তো নীল নয়, ফুটফুটে ফর্সা। পাড়ার কাঞ্চন বাবুর রঙ মোটেই সোনার মতো নয়। স্রেফ কুচকুচে কালো। জানেন তো কবি বলেছেন—নামে কিব করে—'

'গজাননদা ফিল-আপ করলেন: 'ছাগল যে নামে ডাকো—ডাকে ব্যা-ব্যা করে। ঠিক ইন্দিবরী থাক।'

বললুম, 'এবার উ। লিখুন—উপ্-উপ্-উপ্—'

'হনুমানের মতো উপ্-উপ করছ কেন?'

'উপেন্দ্রবজ্রা।'—এই জাঁদরেল নাম শুনে গজাননদা বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন: ভীষণ কড়া নাম হে—উচ্চারণ করতেই হৃৎকম্প হয়! কাকে বলে?'

কাকে বলে সেকি আমিই জানি! কোথায় যেন দেখেছিলুম শব্দটা। বললুম, 'নামে কি আসে যায়, চালিয়ে দিন না। জাঁদরেল নামেরও তো গুণ আছে একটা।'

অনিচ্ছার সঙ্গেই গজানন লিখলেন উপেন্দ্র বজ্রা।

'এবার ঊ। ঊ-ঊ-নাঃ, ঊ বড় বেয়াড়া, ঊর্ধ্বময়ী ছাড়া কিছু মনে আসছে না। আর ঊর্ধ্বময়ী নাম দিলে—'

গজানন দা বললেন, 'মাসিমা ভাববেন—তাঁর ছাগলের ঊর্ধ্বলোক, মানে মৃত্যু কামনা করা হচ্ছে। তা হলেই প্রাইজের আশা ফিনিশ! ও সব চলবে না। তা ছাড়া প্যালারাম, তুমি যে-ভাবে অ-আ-ই-ঈ-

চালাচ্ছ—' 'ঈ বাদ দিয়েছি তো। ওতে ঈশ্বরী ছাড়া আর কিছু হয় না।'

'না না, ঈশ্বরী নয়। ঈশ্বরী ছাগল মানে স্বর্গীয় ছাগল, উর্ধ্বময়ীও তাই। ডেনজারাস্। আমি বলি কি প্যালারাম—এই স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের প্যাঁচ ছাড়ো—নইলে গোটা দিনেও শেষ হবে না যে!'—

গজানন দা কাতর হয়ে বললেন, 'ওদিকে তালের বড়াগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!'

তালের বড়ার নামে আমাকেও প্ল্যান বদলাতে হল!

'তা হলে শর্টকাট করা যাক। লিখুন—ক-এ কুসুমিকা, খ-এ—আচ্ছা খ থাক—গ-এ গরবিনী, ঘ-এ ঘোরাননা? না—ঘোরাননা বাজে—মাসিমা ভাববেন তাঁর ছাগলের মুখ ঘোড়ার মতো বলা হচ্ছে—চ-এ—চ-এ চিত্রলেখা।'

'না-না, চিত্রলেখা তোমার বৌদির নাম!'—গজাননদা আর্তনাদ করলেন: 'ছাগলের ও নাম দিলে তোমার বৌদি আর রক্ষে রাখবে না, তালের বড়া আর তালক্ষীর একেবারে গেল।'

আমি ভয় পেয়ে বললুম, 'ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন। তা হলে চ-এ চারুপ্রভা, ছ-এ—ছ-এ ছাগলিকা, জ—জ-এ জয়ধ্বজা, ঝ-এ—ঝ-এ ঝঞ্ঝিকা—'

'ঝঞ্ঝিকা—ঝড়-টড় নাকি? না-না ও-সবের মধ্যে যেয়ো না।'—গজাননদা ছটফট করতে লাগলেন: 'প্লীজ প্যালারাম, শর্টকাট কর—তালের বড়াগুলো—'

'ঠিক—তালের বড়াগুলো।'—আমিও উত্তেজিত হয়ে উঠলুম: 'তা হলে আর বর্ণমালা নয়—অ্যাট্ র‍্যান্‌ডম্—মানে যা মনে আসে। লিখে যান—বিচিত্রিতা, নবরূপা, মনোহরা—'

'মনোহরা কি একটা খাবার নয়? মাসিমা ভাববেন কে তাঁর ছাগলকে কেটে খাওয়ার—'

'তা হলে মনোরমা। লিখুন পল্লবিকা—পাতা-টাতা খায়—ফুল্লনলিনী—দেবভোগ্যা—'

গজাননদা আবার বাধা দিলে: 'দেবভোগ্যা? সে তো ঘিয়ের বিজ্ঞাপনে লেখে হে! তুমি কি ঘি দিয়ে ছাগল রান্নার টান্নার পরামর্শ দিচ্ছ?'

'থাক—থাক। লিখুন দেবকন্যা, টঙ্কারিণী, ডামরী—'

'বেজায় শক্ত ঠেকছে।'

'হোক শক্ত। ব্রহ্মময়ী নামটাই বা কি এমন নরম? অমন নাম যাঁর, কড়া নামেই হয়তো তিনি খুশি হবেন। লিখে যান শূরসুন্দরী, সুখময়ী—'

লিষ্টি যখন শেষ হল, তখন পুরো আটাশটা নাম।

আমি বললুম, 'আরো দুটো মনে পড়েছে। য-র ল-ব-হ-ক্ষ—লিখুন হংসপদিকা, ক্ষুরেশ্বরী—'

'ক্ষুরেশ্বরী?'

'ক্ষুরের ঈশ্বরী যে। অর্থাৎ কিনা—মাসিমার ছাগলের মতো ক্ষুর আর কোনো ছাগলেরই নেই।'

'রাইট। ক্ষুরেশ্বরী চলতে পারে। কিন্তু প্যালারাম, লিস্ট একটু বড় হল না?'

'তা হোক। লটারীতে বেশি টিকেট কিনলে প্রাইজের আশাও বেশি—বুঝতে পারেন তো? দিন দিন পাঠিয়ে—একটা লেগে যাবে নির্ঘাত।'

'ফুল-চন্দন পড়ুক তোমার মুখে।'

'ফুল-চন্দনের অগে তালের বড়া পড়া দরকার। আর পঁচিশ টাকা কমিশন।'

'নিশ্চয়—নিশ্চয়। সে আর বলতে। তবে পঁচিশ টাকা একটু বেশি হল না প্যালারাম? যদি কুড়ি টাকা দিই?'

আমি চটে বললুম, বলোকি? লিস্ট ফেরৎ দিন আমার।'

'আচ্ছা—আচ্ছা, পঁচিশ টাকাই থাক। চলো—তালের বড়া খেয়ে আসা যাক।'

বিস্তর খাটুনি হয়েছিল। উৎসাহিত হয়ে তালের বড়া খেতে গেলুম।

খেতে খেতে এবার মিটমিট করে হাসতে লাগলেন গজাননদা।

'কী হল, হাসছেন যে?'

'জানো, ভূতো এসেছিল কাল।'

'ভূতো দা?'

'হাঁ, আমার আর এক মাসতুতো ভাই। একনম্বর গবেট। আমার কাছ থেকে আবার নামের সাজেসন চায়!'—গজাননদা বললেন, 'তা দিয়েছি বলে।'

'কী বলে দিলেন?'

'আন্দাজ করো দিকি?'—চোখ মিটমিট করতে লাগল তাঁর।

'বলতে পারলুম না।'

'গঙ্গারাম। ও যেমন হাবা গঙ্গারাম—তাতে ও নাম ছাড়া ওকে আর কী দেব? শুনে ধন্যি হয়ে চলে গেল। হা—হা—হা—'

শুনে আমিও হাসলুম: 'হা—হা—হা—'

প্রাইজের রেজাল্ট বেরুবে পরের রবিবার। পঁচিশ টাকার আশায় আশায় খবর জানতে গেলুম। দেখি গজাননদা আরশোলার মত মুখ করে বসে।

'পাননি প্রাইজ?'

'নাঃ!—' হাঁড়ি ফাটার মতো আওয়াজ করে গজাননদা বললেন, 'তোমার ইন্দীরবী—আজীবনী—অপরূপা—ফুল্লনলিনী—হংসপদিকা—সব চিৎ। প্রাইজ কে পেয়েছে, জানো? ভূতো।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ, সেই গঙ্গারাম! একত্রিশ জন বোনপো-বোনঝি বাংলা ডিক্‌শনারী উজাড় করে দিয়েছিল। মাসীমা বললেন, ছাগলের নামে ও-সব কাব্যি দিয়ে কী হবে! গঙ্গারাম! আহা—মা গঙ্গা, তায় রাম নাম! নাম করতেই পুণ্যি! বলে, ছাগলটার পায়ে ঢুপ করে একটা পেন্নাম করে প্রাইজটা ভূতোকেই দিয়ে দিলেন।'

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলুম। আজও বাড়ির ভেতর থেকে ভাদ্র মাসের তালের বড়ার গন্ধ আসছিল, কিন্তু বৌদি যে সে বড়া আমায় খেতে দেবেন, সে ভরসা আর হল না আমার।

সত্যজিৎ রায়

গত বছরটা সিনেমা তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে তোমাদের জন্য আর সিনেমার কথা লেখাই হয়ে ওঠেনি। তোমাদেরই লেখা কিছু চিত্রনাট্য নিয়ে এর আগেকার আলোচনা করেছিলাম (শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭৫)। এবার চিত্রনাট্য থেকে 'স্যুটিং স্ক্রিপ্ট' (shooting script) কিভাবে তৈরি হয় সেটা একবার দেখা যাক।

চিত্রনাট্যে যে জিনিসটা লিখে বোঝানো হয়েছে, সেটাকে সিনেমার নিজস্ব ভাষায় কী ভাবে বোঝানো হবে, সেটাই লেখা থাকে স্যুটিং স্ক্রিপ্টে। আগেই বলেছি যে সিনেমার ভাষা শুধু ছবির ভাষা নয়। শব্দেরও ভাষা। শব্দ বলতে মানুষের কথাবার্তা, পাখির ডাক, মেঘের ডাক, রেলগাড়ির শব্দ, গানবাজনা ইত্যাদি যা কিছু আমরা কানে শুনি সবই বোধ হয়। স্যুটিং স্ক্রিপ্টে তাই ছবির সঙ্গে সঙ্গে শব্দের কথাটাও থাকে একটা বাড়ি তৈরি করতে যেমন প্ল্যান বা নক্‌শার প্রয়োজন হয়। সিনেমা করতে গেলেও ঠিক তেমনিই দরকার হয় স্যুটিং স্ক্রিপ্টের। এ জিনিসটা ঠিকভাবে তৈরি না হলে পরিচালক কাজের সময় খেই হারিয়ে একগাদা গণ্ডগোল পাকিয়ে বসেন।

লিখে গল্প বলা আর সিনেমার গল্প বলার মধ্যে তফাৎ থাকলেও, দুটোর মধ্যে একটা মিল আছে সেটা লক্ষ্য করার মত।

তোমরা জান যে গল্প লিখতে গেলেই সেটাকে বাক্য বা sentenceএ ভাগ ভাগ করে লিখতে হয়। সিনেমার গল্পকেও একটা নিজস্ব কায়দায় ভাগ ভাগ করে বলার প্রয়োজন হয়। ছবি তোলার কাজটাই হয় টুকরো টুকরো ভাবে। তারপর সেই ছবির টুক্‌রো পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে সিনেমার গল্প তৈরি হয়।

এই ছবির টুক্‌রোকে বলা হয় 'শট' (shot)। শটগুলো ঠিক কথার মত কাজ করে। তবে এমন অনেক কথা আছে যা একটা মাত্র শটে বোঝানো সম্ভব হয় না যেমন একটা শট্‌-এ দেখা গেল —

শুধু এই শটটার যদি মানে করতে হয় তাহলে দাঁড়ায়—'একটা লোক আকাশের দিকে চেয়ে আছে।'

কিন্তু তার পরে শটটা যদি হয় এই—

—তাহলে দুটোয় মিলে অন্য মানে হয়ে যাচ্ছে—'একটা লোক আকাশে চাঁদ দেখছে।'

পরিচালক যদি বোঝাতে চাইতেন যে 'একটা লোক এরোপ্লেন দেখছে', তাহলে অবিশ্যি দ্বিতীয় শটটা চাঁদের না হয়ে এরোপ্লেনের হত। কিন্তু এরোপ্লেনের ব্যাপারে পরিচালক একটা কায়দা করতে পারতেন যেটা চাঁদের ব্যাপারে সম্ভব নয়। এরোপ্লেনের শব্দ আছে, চাঁদের নেই। ধরা যাক প্রথম শটটার সঙ্গে সঙ্গে একটা এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল। তক্ষুণি মনে হবে যে 'লোকটা আকাশে এরোপ্লেন দেখছে।' ফলে দুটোর জায়গা একটা শটেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

শট্‌ এর পর শট জুড়ে সিনেমার এক একটা scene বা দৃশ্য, দৃশ্যের পর দৃশ্য জুড়ে এক একটা sequence (পরিচ্ছেদ বা chapter), আর sequence এর পর sequence জুড়ে একটা পুরো সিনেমার গল্প তৈরি হয়। শট, সীন, সিকুয়েন্স ইত্যাদি পর পর কীভাবে আসবে সেটাও সুটিং স্ক্রিপ্টে লেখা থাকে।

একটা কথা এই ফাঁকে বলে রাখি—যিনি সিনেমা তৈরি করবেন, তিনি যদি একটু আধটু ছবি আঁকতে পারেন তাহলে তাঁর পক্ষে খুব সুবিধে হয়। সুটিং স্ক্রিপ্ট তৈরি করার ব্যাপারে আঁকাটা অনায়াসেই কাজে লাগানো যেতে পারে। অবিশ্যি এই আঁকা খুব ভালো না হলেও চলে, কারণ এটা নিজের দরকারেই আঁকা—মোটামুটি জিনিসটা বুঝিয়ে দিতে পারলেই হল।

সন্দেশের গ্রাহক (১৩১৭) ভাস্কর মিত্রের পুরস্কার পাওয়া 'রাম ভালো ছেলে' চিত্রনাট্যের প্রথম প্যারাগ্রাফ থেকে কি রকম সুটিং স্ক্রিপ্ট হতে পারে সেটা দেখা যাক। চিত্রনাট্যে আছে—

'সকাল বেলা রাম আর তার বন্ধুরা মিলে ইস্কুল যাচ্ছে। সবার হাতেই বই খাতা। দুজনের হাত থেকে আবার দড়ি বাঁধা দোয়াত ঝুলছে। পাঁচজন বন্ধু একসঙ্গে যাচ্ছে—কেউ কিন্তু চুপ করে

নেই। অনবরত কথা বলে যাচ্ছে পাঁচজন। গ্রামের পথ দিয়ে যেতে মাঝে মাঝে গাছপালা এসে পড়ছে, আর গাছ দেখলেই রামের বন্ধুরা মাথা তুলে দেখছে গাছে পাখি আছে কিনা। পাখি চোখে পড়লেই হল, সঙ্গে সঙ্গে তারা ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করছে। রাম কোনবার ঢিল ছুঁড়ছে না, বরং ওদের ঢিল ছোঁড়া দেখলেই ওর চোখে মুখে দুঃখের চিহ্ন ফুটে উঠছে।'

এই হল প্রথম প্যারাগ্রাফ।

সুটিং স্ক্রিপ্ট করার আগে একটা জিনিস লক্ষ্য করা দরকার। চিত্রনাট্যে বলা হয়েছে 'অনবরত কথা বলে যাচ্ছে পাঁচজন'—অথচ কী কথা বলছে সেটা বলা হয়নি। সিনেমার জন্যে কথাগুলোর দরকার, কাজেই সুটিং স্ক্রিপ্টে সেটা লিখে দিতে হবে।

রামের চার বন্ধুর নাম দেওয়া যাক—হারু, বিশু, পটলা ও কানাই।

রাম ভালো ছেলে (সুটিং স্ক্রিপ্ট)

প্রথম দৃশ্য। গ্রামের রাস্তা। সকাল বেলা

দূর থেকে দেখা যায় পাঁচজন ছেলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে। তারা কথা বলছে—কিন্তু এতদূর থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

একজন ছেলে রাস্তা থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে একটা গাছের দিকে তাগ করে মারল।

একটা পাখির ডাক শোনা গেল। মনে হল সেটা গাছ থেকে উড়ে পালাল। ছেলেগুলো আবার হাঁটতে শুরু করল।

এবার পাঁচজনকে আরো কাছ থেকে দেখা যায়। তারা হাতে বই খাতা দোয়াত ইত্যাদি নিয়ে হেঁটে চলেছে—বোঝাই যায় তারা ইস্কুল যাচ্ছে।

ক্যামেরাও এদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে।

এবারে ছেলেদের কথা বোঝা যায়।

বিশু: হাতের চেয়ে গুলতিতে আরো ভালো টিপ হয়।

পটলা: আর তীর ধনুক?

কানাই: সবচেয়ে ভালো বন্দুক, তারপর তীর ধনুক, তারপর গুলতি।
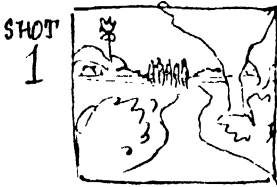
হারুঃ আমার হাতের টিপ বন্দুকের চেয়েও ভালো।

কানাইঃ অ্যাঃ!

হারুঃ সেবারে এক ঢিলে একটা শালিক মারলাম যে! রামের সামনে ত। রাম, তোর মনে নেই?

রামকে বেশ কাছ থেকে দেখা যায়। সে গম্ভীর। হারু আবার প্রশ্ন করে।

হারু (নেপথ্যে): কীরে—মনে নেই?

রামঃ আছে।

কাছ থেকে হারু ও কানাই। কানাই তার মুখে দুঃখের ভাব আনে।

কানাই (ঠাট্টার সুরে): রামের মনটা যে বড্ড নরম—তাই ওর দুঃখু হয়েছিল।
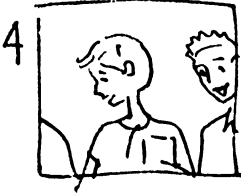
আবার পাঁচজনকেই দেখা যায়। কানাইয়ের কথায় রাম ছাড়া সকলেই হো হো করে হেসে ওঠে।

কাছেই একটা পাখি ডেকে ওঠে।

সবাই হাঁটা থামিয়ে বাঁয়ে উপর দিকে দেখে।
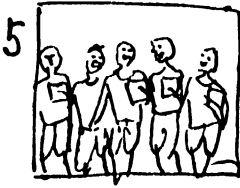
একটা শিমুল গাছের ডালে একটা বুলবুলি বসে আছে। সেটা আবার ডেকে উঠল।
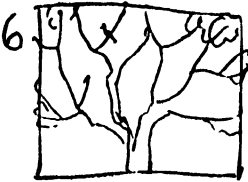
কাছ থেকে হারু ও কানাই।

কানাই (ফিস্‌ফিস্ করে): দেখা, তোর হাতের টিপ!

হারু (ফিস্‌ফিস্ করে): দাঁড়া।

হারু ঢিল তুলতে নীচু হয়।

8
রাম গম্ভীর মুখে হারুর দিক থেকে গাছের দিকে দেখে।
9
একটা ডাল থেকে পাশের আরেকটা ডালে পাখিটা উড়ে গিয়ে বসে।
10
রাম আবার হারুর দিকে দেখে।
11
হারু হাতে ঢিল নিয়ে পা টিপে টিপে দল থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়ে আসে।
12
হারু তাগ করে।
13
পাখিটা হঠাৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়
14
হারু বোবা বনে যায়।
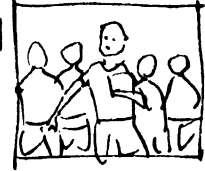
রাম হেসে আবার স্কুলের দিকে রওনা দেয়।

চিত্রনাট্যের প্রথম প্যারাগ্রাফ থেকে ১৫টা শটে এইভাবে একটা সুটিং স্ক্রিপ্ট হতে পারে। এছাড়া যে আর কোনভাবে হতে পারে না তা নয়। একই গল্প যেমন দুজন লেখক দুরকমভাবে লিখতে পারেন, সেরকম একই চিত্রনাট্য থেকে বিভিন্ন পরিচালক তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ভাবে সুটিং স্ক্রিপ্ট করে নিতে পারেন। আমি এখানে শুধু একটা উপায় বাতলে দিলাম।

এবারে চিত্রনাট্যের সঙ্গে আমার সুটিং স্ক্রিপ্টের যে তফাৎগুলো রয়েছে সেটার কারণ বলি।

প্রথমে, চিত্রনাট্যে আছে পাঁচজনেই অনবরত কথা বলছে। অথচ সুটিং স্ক্রিপ্টে রামকে দিয়ে বিশেষ কিছুই বলানো হয়নি, কারণ আমার মনে হয়েছিল যে রাম যদি পাখি মারার ব্যাপারটা পছন্দ না করে, তাহলে তার বন্ধুদের কাণ্ডকারখানা দেখে সে নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে। সুতরাং এ অবস্থায় কথা না বলে মুখ ভার করে থাকাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক নয় কি?

দ্বিতীয়তঃ চিত্রনাট্যে রয়েছে 'মাঝে মাঝে গাছপালা এসে পড়ছে' আর গাছে পাখি দেখলেই ছেলেরা ঢিল মারছে। মাঝে মাঝে ব্যাপারটা সিনেমায় দুবার দেখালেই দিব্যি বুঝিয়ে দেওয়া যায়। বার বার দেখাতে গেলে জিনিসটা একঘেঁয়ে হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

পাখি উড়ে পালানোর ঘটনাটা অবিশ্যি চিত্রনাট্যে নেই, কিন্তু এটার ফলে হারুর বিরক্তি আর হতাশা, আর তার সঙ্গে রামের ফুর্তিতে বেশ একটা মজার ব্যাপার হয়। রামের চরিত্রটাও এতে বেশ বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

এবার আরেকবার উপরের শটগুলোর দিকে দেখ।

১নং শটে ছেলেদের খুব দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। একে বলে Long Shot। ২নং শটে অপেক্ষাকৃত কাছ থেকে দেখা যাচ্ছে; একে বলে Medium Shot বা Med Shot। ৩নং শট ২নং-এর চেয়েও বেশি কাছের শট; একে বলে Close Shot। পাখিটাও যে Long Shot সেটা বুঝতেই পারছ। অন্য শটগুলো যে কী সেটা তোমরা ছবি দেখে নিজেরাই আন্দাজ করে নিতে পারবে।

এ ছাড়াও আরো কয়েকরকম শট হয়, সেটার কথা তোমাদের পরের বার বলব!

ক্রমশঃ

ছোট্টদের জন্য ছোট্ট গল্প

উমরী-ঝুমরী

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

ছোট্ট বাগান বাড়িতে একলা মানুষটি থাকেন।

সবাই তাঁকে ভালবাসে সবাই ডাকে মাসিমা।

শেষরাতে মাসিমা জেগে উঠলেন—'বাগানে কাদের খোকা কাঁদছে ?'

মালিকে ডেকে খুঁজে দেখলেন, দুটো বেড়ালছানা গাছের তলায় পড়ে কাঁদছে—'ওঁয়া ! ওঁয়া !' এখনো চোখ ফোটেনি, কিন্তু দু তিনমাস বয়সের ছানার মতন বড়। মালী বলল—'বনবেড়ালের বাচ্চা !'

মাসিমা ওদের ঘরে এনে পুষলেন। নাম রাখলেন 'উমরী' আর 'ঝুমরী'। খেয়েদেয়ে ওরা বেশ মস্ত হয়ে উঠল—সারা গায়ে কালো ডোরা কাটা, চোখ দুটো হলদে, ঠিক যেন বাঘের বাচ্চা !

মাসিমা এত খাওয়ান, তবু উমরী-ঝুমরী চুরি করে খায় ! ছোট্ট জালের আলমারিতে দুধ থাকে। উমরী খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দুই পা দিয়ে আলমারিটা ঝাঁকায়, দুধ ছলকে মাটিতে পড়ে। ঝুমরী চেটে খায়। আবার ঝুমরী আলমারী ঝাঁকায়, উমরী দুধ খায়।

সারাদিন ওরা পাড়াময় ঘুরে বেড়ায়। রাতে শহর ছাড়িয়ে শালবনে চলে যায়। আবার ভোরবেলায় বাড়ি ফিরে আসে। একদিন আর তারা ফিরল না।

মাসিমার ভারি দুঃখ। সবাই বলল—'দুঃখ করবেন না মাসিমা, ওরা ঐরকমই হয়!'

'বনের বেড়াল ঘরে এসে দুধু ভাতু খায়,
খেতে খেতে আড় নয়নে বনের পানে চায়!

তবু মাসিমা ওদের জন্য দুঃখ করেন, রোজ ওদের খাবার রেখে দেন।

হঠাৎ একদিন সকালে যেই না দরজা খুলেছেন অমনি 'ম্যা—ও' বলে উমরী-ঝুমরী লাফিয়ে ঘরে ঢুকল !!

ছোট্টদের জন্য ছোট্ট ছড়া

ছড়া

সামসুল হক।

খোকন যাবে চাঁদে
চাঁদ ধরবে ফাঁদে
চাঁদের মা খবর শুনে
একলা বসে কাঁদে।

আর কেঁদোনা আর কেঁদোনা চাঁদের মা বুড়ি
খোকন আমার আনবে শুধু গোটা কতক নুড়ি

নুড়ির ভিতর রাজকন্যে
বন্দী আছে, সেই জন্যে
পাড়ি চাঁদের পথে
দ্যায় অ্যাপোলোর রথে।
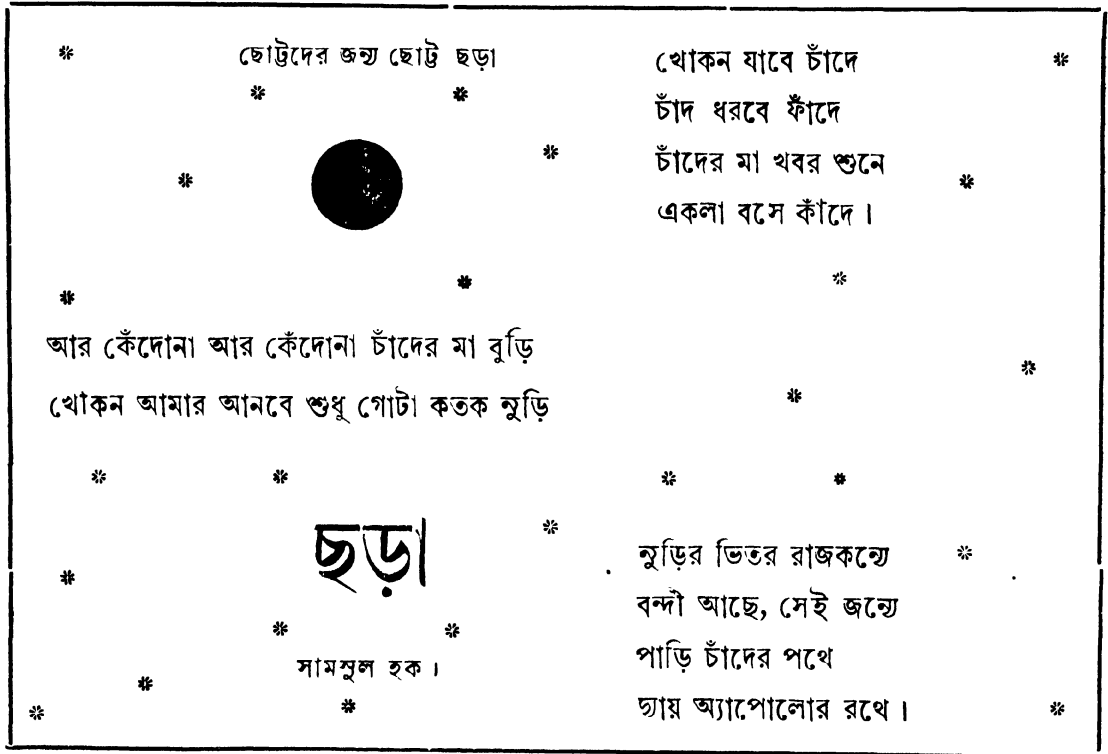
চন্দনা

(কাব্য)

বানী রায়

বাঁশের খাঁচায় চন্দনা
গাইছে গান শোন না
উঠোনম চায় লাউএর লতা,
তাকেই শোনায় অনেক কথা।
গাইছে গান চন্দনা,
কান পেতে শোন না।

(গান) আমি খাঁচায়, খাঁচায়, খাঁচায়,
তুমি মাচায়, মাচায়, মাচায়।
আমার ডানাদুটো নাচায়, নাচায়, নাচায়,
তোমার বোঁটাখানা ছাঁটায় ছাঁটায় ছাঁটায়।
ওরে আমার লাউরে,
কোথায় তুমি যাঁউরে?
আমায় তুমি নাউরে।
ওরা রাঁধে জাউরে,
তোমায় ধরে খাঁউরে,
কোথায় তুমি যাঁউরে?

লাউ (চটে) রেখে দে তোর বাজে কথা,
হাঁউ—মাঁউ—খাঁউ;
নিজের ল্যাজে তা দিয়ে নে,
ধরবে তোকে মাউ;
মিয়্যাও, মিয়্যাও, ম্যাও।

বেড়াল (প্রবেশ করে)
ম্যাও, ম্যাও, ম্যাও,
আমায় খাবার দাও।
ডাকলে আমায় কে?
ধরে তাকে নে।

লাউ (তাড়াতাড়ি)
ওই যে পাখিটা
কেটে নে ল্যাজটা,
ভেঙে ফেল খাঁচা,
বেয়ে ওঠ্ মাচা।

বেড়াল (বেয়ে উঠতে উঠতে)
ম্যাও, ম্যাও, ম্যাও,
আমায় খেতে দাও,
যাকে আমি পাঁউ,
ধরে ধরে খাঁউ।
ম্যাও, ম্যাও, মিউ।

(চন্দনা ভয়ে কাঁপছে, খাঁচায় শব্দ হচ্ছে ঠকাঠক্, ঠকাঠক্)

লাউ— কথার তোর আস্পর্ধা,
এবার যাক গর্দানটা।
কাকে কে খায়
এবার দেখ্ সেটা;
ঠকাঠক্—ঠকাঠক্
কাঁপিস কেন, ব্যাটা?
মালা জপ না কি এটা?
শেষের মালা জপে নে,
হেঃ, হেঃ, হেঃ।

(শব্দ শুনে চাষা ও চাষানী ঘর থেকে
বেরিয়ে এল)

চাষা— আরে, আরে, আরে !
এটা কেরে ? এটা কেরে ?
কলুর সেই বেড়াল বেঁড়ে।
আয় দুজনে যাই তেড়ে।

(বেড়াল নামতে যেয়ে মাচা ভেঙে
ধপাৎ করে পড়ল)

চাষা— পিঠে লাঠির ঘা মেরে
তাড়াব তোকে, ও বেঁড়ে,
ধপাং—ধপাং—ধপ্
চোপ্, চোপ, চোপ্ !
মাচা ভেঙে দিলি,
লাঠির ঘা খা,
দূর, দূর যা !

(বেড়ালকে মারল)

চাষানী— আহা, দেখ চন্দনা
কেমন করে কাঁপছে সোনা,
লাউএর পাতায় করত খেলা,
ভেঙে গেল মাচাটা।
ওরে সোনার চন্দনা !

(আদর করল)

চাষী— মাচা ভেঙে তুই
পড়লি এসে ভুঁই,
লাউকে কোথায় থুই ?

চাষানী— কেন, কেন, কেন,
ভাবছ বসে হেন ?
রেঁধেছি যে জাউ,
তরকারীটা চাই
লাউকে নিয়ে যাই।
ঘস্ ঘস্, ঘসাৎ,
বঁটিতে দেই ফালা
ঘুচে যাক জ্বালা।'
ওরে চন্দনা,
আর ভয়ে কাঁপিস না।
রাখবনা লাউমাচা
শূন্যেই ঝুলবে খাঁচা ;
বেড়াল তোকে ধরবে না।
ভয়ে আর কাঁপিস না,
চন্দনা চন্দনা !

চন্দনা—(ঝুলতে ঝুলতে)
দে দোল, দে দোল !
বাধাস কেন গোল ?
উপকারী বন্ধুকে হিংসা
করিস না,
এই কথাটাই শেষ কথাটা
বলছে, শোন্, চন্দনা।

এক যে ছিলেন রাজা, তাঁর চারটি রাজপুত্র।

চারটি রাজপুত্রের মধ্যে তিনটিই ছিল বেশ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায়। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে কনিষ্ঠ রাজপুত্র ছিলেন অত্যন্ত খর্বাকৃতি। তবে দুর্বল নয়। বরং অধিকতর বলবান।

দীর্ঘকায় তিন রাজকুমারের রূপও ছিল কার্ত্তিকের মতো সুন্দর। কিন্তু, ছোট রাজপুত্র শুধু মাথায় বেঁটে নয়, তাঁর চেহারাও খুব সুশ্রী ছিল বলা চলে না। রাজা তাই তাঁর রূপবান রাজপুত্রদেরই ভালোবাসতেন বেশি। আর বেঁটে রাজকুমারকে একটু উপেক্ষার চক্ষেই দেখতেন। অর্থাৎ, রাজার কাছে ছোট ছেলেটির বিশেষ আদর ছিল না।

ছোট ছেলে কিন্তু, তার দাদাদের চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধিমান ছিল। সে ঠিক বুঝতে পারতো যে তার বাবা যতটা দাদাদের ভালোবাসেন ততটা তাকে ভালো বাসেন না। কেন বাসেন না সে কারণটাও সে বুঝে ফেলেছিল। সে দাদাদের মত দীর্ঘ ও গৌরবর্ণ নয়। তার চেহারাও অন্য রাজপুত্রদের মতো সুন্দর নয়।

এটা বুঝতে পেরে তার মনে ভারি কষ্ট হ'ত। একদিন রাজাকে একলা পেয়ে সে কাছে গিয়ে প্রণাম ক'রে পদধূলি মাথায় নিয়ে বললে : পিতা! আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। আমি আপনাকে বলতে এসেছি রূপবান এবং দীর্ঘ ও বলিষ্ঠদেহ হলেই সে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হয় না। খর্বকায় রূপহীন মানুষও অনেক সময় তাঁদের চেয়ে অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে। কোনও জিনিষের আকৃতি বড় হলেই তার মূল্য বেশি হয় না। হীরা-মণি-মাণিক্য অতি ক্ষুদ্র হলেও তা বহু মূল্যবান! মাতৃপূজায় নিবেদনের জন্য ক্ষুদ্র ছাগই বলির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, বিরাটকায় হাতি কখনো নির্বাচিত হয় না। একটা ছোট্ট টাট্টু ঘোড়া যে বেগে ছুটতে পারে, একটা বড় গাধা তা পারে না। সুতরাং ছোট বলে আপনি আমাকে অবহেলা করবেন না। আমার বৃহদাকার জ্যেষ্ঠদের চেয়ে আমি ক্ষুদ্রাকার হলেও অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ জানবেন। আমার এই আত্মশ্লাঘা ও স্পর্ধা প্রকাশ দয়া করে ক্ষমা করবেন।

কনিষ্ঠপুত্রের মুখে এই রকম জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে মহারাজের মুখ প্রসন্ন হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। রাজসভায় পাত্রমিত্র পারিষদবর্গও বেশ খুশি হ'লেন। কিন্তু, জ্যেষ্ঠ তিন রাজপুত্র ছোট ভায়ের মুখে এই স্পর্ধার কথা শুনে রেগে উঠলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই রাজার প্রতিবেশী রাজ্যের এক প্রবল শত্রু নৃপতি বহু সৈন্য সামন্ত নিয়ে এই রাজ্যকে ভীষণ আক্রমণ করলে। একে একে তিন দীর্ঘকায় সুপুরুষ বলিষ্ঠ রাজপুত্রই যুদ্ধে হেরে গিয়ে রণক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করলেন। তখন সেই অবহেলিত খর্বকায় ছোট রাজপুত্র একটা ভীম হুংকার দিয়ে রণস্থল প্রকম্পিত করে শাণিত তরবারি হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন এবং এমন বীর বিক্রমে শত্রু সৈন্যকে সুকৌশলে ঘিরে ফেলে আক্রমণ করলেন যে শত্রু সৈন্য ভয় চকিত হয়ে নিমেষে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। কনিষ্ঠ রাজপুত্র সেই সুযোগে তাদের এমন আঘাত করতে লাগলেন যে সে আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে শত্রুসৈন্য রণক্ষেত্র ছেড়ে ভয়ে পালাতে শুরু করলো। ছোট রাজপুত্র তাঁর সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে ক্রমাগত শত্রু নিপাতে উত্তেজিত করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে শত্রুসৈন্য সব নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন যুদ্ধে জয়লাভ করে বিজয়ী ছোট রাজকুমার পিতার কাছে এসে তাঁর চরণে প্রণাম করে বললেন আপনার অতি প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা যা করতে পারেনি, আপনার অনাদৃত কনিষ্ঠপুত্র তা বিধাতার আশীর্বাদে সুসম্পন্ন করেছে পিতা। আমার সানন্দ প্রণাম নিন।

মহারাজ সিংহাসন থেকে নেমে এসে কনিষ্ঠ রাজপুত্রকে মহাসমাদরে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে বললেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি এতদিন যে অন্যায় অবিচার করেছি সে জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তুমি ঠিকই বলেছিলে পুত্র, যে জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। দীর্ঘকায় ও রূপবান হ'লেই বীর হয় না। মানুষ ক্ষুদ্রকায় হ'লেও তাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। তুমি আমাকে আজ যে বিপদ থেকে উদ্ধার করলে তার পুরস্কার স্বরূপ তোমাকেই আমি আজ যুবরাজ পদে বরণ করলুম। আমার পরে তুমিই এরাজ্যের রাজা হ'য়ে সিংহাসনে বসে রাজ্য পরিচালনা করবে।

ছোট রাজকুমারের অগ্রজেরা কনিষ্ঠের এই সম্মানে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হ'য়ে ছোট ভাইকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য যখন প্রায় সিদ্ধ হবার উপক্রম সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে ওঁদের এক ভগ্নী ভাইয়েদের এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে রাজার কর্ণগোচরে নিয়ে এলেন এই সাংঘাতিক ব্যাপারটা! মহারাজ এ খবর শুনে অত্যন্ত রেগে উঠলেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ নৃপতি। অগ্রজ তিনজনকে ডেকে পাঠিয়ে শুধু তীব্র ভৎর্সনাই করলেন না যথোচিত কঠিন শাস্তিও দিলেন তাদের। সাধারণ লোক এই রকম অন্যায় কাজ করলে তাদের যে রকম দণ্ড দেওয়া উচিত, মহারাজ নিজের অপরাধী পুত্রদের সেই রকমই দণ্ড বিধান করলেন। 'রাজপুত্র' ব'লে তাদের অপরাধের বিচারে কিছুমাত্র দয়া দাক্ষিণ্য দেখালেন না। তারতম্যও করলেন না কিছু।

প্রজামণ্ডলী শুনে সমবেত কণ্ঠে মহারাজের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো এবং তাদের শত্রুজয়ী বীর যুবরাজ কনিষ্ঠ পুত্রের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন।

মহারাজও বিজয়ী পুত্রকে কাছে ডেকে সস্নেহে বললেন: আমার অন্যায় হয়েছিল। তুমি আমাকে ক্ষমা করো পুত্র। তোমার প্রতি আমি সত্যই অবিচার করেছিলুম। পুরুষের যথার্থ সৌন্দর্য তার রূপ নয়, তার বল বীর্য ও সাহসেই সে সবার হৃদয় জয় ক'রে। সুপুরুষ হলেই সে শ্রেষ্ঠ মানুষ হয় না – এ সত্য আমি আজ তোমারই কাছে শিখলুম। বিচক্ষণ ও শক্তিমান মানুষের বিজয়লাভই জগতে স্বাভাবিক। আমি আশীর্বাদ করি ভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন।

বিজয়গর্বে পুলকিত ও যুবরাজপদে বর্তমানে অভিষিক্ত কনিষ্ঠ রাজকুমার পিতার চরণে আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বললেন: আপনার আশীর্বাদই আজ আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ পিতা! আমি যে আপনার হৃদয় জয় করতে পেরেছি এই আমার পরম লাভ। আপনি আমার ভাইয়েদের অপরাধ মার্জনা করুন। আপনার চরণে এই মিনতি করি। ওরা নির্বোধ। নির্বোধের প্রতি অনুকম্পা করাই মহতের কাজ।

মহারাজ আনন্দে বিজয়ী পুত্রকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বললেন: তুমি শুধু বীর নও পুত্র! তুমি মহৎ! তোমাকে আমি আজ থেকেই এই সিংহাসনেও রাজমুকুট এবং শাসন দণ্ড দিয়ে আমি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করব। তুমি আমার পরিবর্তে এই রাজ্যের রাজা হলে। এই শুভদিনে আজই তোমার রাজ্যাভিষেক হবে প্রজারা শুনে আহ্লাদে জয়ধ্বনি দিয়ে রাজধানী মুখরিত করে তুলল!

ব্যাপারটা কি!

বিবেকানন্দ সেনগুপ্ত

কেউ এসেছে দরজা খুলে
কেউ খুলেছে জানলা
ব্যাপারটা কি? বিয়ে আসছে
যাবে শুনছি কালনা।

বিয়ে আসছে বউ আসছে
বাঁশি বাজছে শানাই
হেসে বললেন রাঙা দিদিমা
এই না হলে মানাই!

বিয়ে আসছে? বিয়ে নয়কো
ভোটে জিতেছেন ঠাকুর
বাজনা বাজছে তাই গাঁয়ে আজ
তাক্ ডুমাডুম তাকুর।

লোমহর্ষক যাদু

যাদুকর এ, সি, সরকার

যাদুর খেলা রকমারি॥ সব যাদুই চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর। তবুও এদের রকমফের আছে। কোন কোন খেলা ভয়ের সঞ্চার করে—কোন খেলা আনে রোমাঞ্চ আর শিহরণ। কোন কোন যাদু কৌশল নিয়ে আসে বিস্ময়ের বন্যা আবার কোন কোনটিতে তোমরা পাও কৌতুক। যাদু প্রদর্শনীর খেলার তালিকা বানাতে গিয়ে আমরা পর পর এমনভাবে খেলাগুলো নির্বাচন করি যাতে সব রকম রসেরই যোগান দেওয়া সম্ভব হয়।

ভয়ের খেলার পর্যায়ে পড়ে জ্বলন্ত জীবন্ত কঙ্কালের দাপাদাপি প্রভৃতি যত ভুতুড়ে কাণ্ড। রোমাঞ্চ আর শিহরণপূর্ণ খেলার মধ্যে আছে যত সব কাটাকুটির ব্যাপার যেমন গলাকাটা, জিভকাটা ইত্যাদি।

বিভিন্ন রকমের দর্শকের পছন্দ বিভিন্ন ধরণের। কোন দর্শক দেখতে চান সাদামাঠা বিস্ময় আর কৌতুকের খেলা। কোন কোন দর্শক আবার শুধুমাত্র ভয়ের খেলার মধ্যেই পান তৃপ্তি। এমন দর্শকের সংখ্যাও কম নয় যার রোমাঞ্চ আর শিহরণ না হলে যাদের মন ভরে না।

শুধুমাত্র বড় বড় প্রেক্ষাগৃহেই নয় ছোট ছোট বৈঠক মজলিশেও এমনি ধারা শিহরণপ্রেমী দর্শকের দেখা মেলে খুব। সেবার জাপান থেকে ফেরার পথে তাইপে বিমান বন্দরের লাউঞ্জে সাক্ষাৎ পেলাম এমনি একজন দর্শকের। ভদ্রলোক বিমানবন্দরের এক কর্মী। আমার প্লেনের ক্রু আর এয়ার হোস্টেসরা আমাকে ঘিরে বসে এটা ওটা যাদুর খেলার ফরমায়েস করছেন। আর আমি এটা ওটা ছোট খাটো ভেল্কী দেখিয়ে খুশি করছি ওদের। এমন সময় এলেন তিনি। বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে একটা খেলা দেখে তিনি বললেন একটা রোমাঞ্চ আর শিহরণ জাগানো খেলা দেখাতে। প্লেনে ওঠার তখন মাত্র আর দশ মিনিট বাকী। তবুও তার বায়না রাখতে এগিয়ে এলাম। পকেট থেকে একটা চকচকে বড় ছুঁচ বের করে ওদের সবার সামনে ধরলাম। সবাই হাতিয়ে দেখলেন—সাধারণ নতুন ছুঁচ একটা। ওদের একজনের কাছ থেকে একটা রুমাল চেয়ে নিয়ে আমার বাঁ হাতটা চাপা দিয়ে আমি ডান হাতে ছুঁচটা ধরে ছুঁচসুদ্ধ হাত নিয়ে ঢোকালাম রুমালের তলায়। মুখে ফুটে উঠলো বেদনার অভিব্যক্তি। হিং—টিং—ছট বলে রুমালটা তুলে নিতে সবাই অবাক হয়ে দেখলেন আমার বাঁ হাতের প্রথম আঙ্গুলটার এদিক থেকে ঢুকে ছুঁচটা ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে কিন্তু কোন রক্তপড়ছে না। বিস্ময়কর কাণ্ড দেখে সবাই হাততালি দিয়ে উঠলেন। পরে রুমাল চাপা দিয়ে খুলে আনলাম ছুঁচটাকে আঙ্গুল থেকে।

এবার শোন কেমন করে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা তোমরাও করতে পার। একই রকম মোটা দুটো ছুঁচ নেবে। একটা ইঞ্চি তিনেক আর অন্যটা ইঞ্চি আড়াই লম্বা। ইঞ্চি আড়াই লম্বা ছুঁচটার

মাঝখানে টুকরো করিয়ে নিয়ে সেখানে একটা তারের ইউ ফাঁস লাগিয়ে নেবে। এই ফাঁস এমন মাপের হবে যাতে এই ফাঁস বাঁ হাতের প্রথম আঙ্গুলের গায়ে আটকে থাকতে পারে। রুমাল দিয়ে ঢাকা দেবার সময়ে এই কায়দা করা ছুঁচটাকে রাখতে হবে বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে। তিন ইঞ্চি লম্বা কৌশলহীন ছুঁচটাকে রুমালের তলায় নিয়ে গিয়ে এই কায়দা করা ছুঁচের সঙ্গে বদলাবদলি করে নিয়ে কৌশলে বসিয়ে দিতে হবে আঙ্গুলের উপরে। তারের ফাঁসটা থাকবে দর্শকদের উল্টো দিকে অর্থাৎ তোমার শরীরের দিকে।

পরে রুমাল চাপা দিয়ে এই কৌশল করা ছুঁচটা খুলে বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে সেখান থেকে বড় ছুঁচটা বের করে আনতে হবে। তবেই কেল্লা ফতে। সবাই অবাক হবে তোমাদের কেরামতি দেখে।

রূপসী শরৎ

মনীষ বসু

ধান ক্ষেতে বাড়ি কার ?
নীলাকাশ শাড়ি কার ?
ওড়না আলোর কার ?
কাশের ঝালর কার ?
দোয়েলের বাঁশি কার ?
কুমুদের হাসি কার ?
ছুটি-চিঠি হাতে কার ?
চাঁদ-হাসি রাতে কার ?

শেফালির মালা কার ?
শিউলির ডালা কার ?
তুলো-মেঘ চুল কার ?
শিশিরের দুল কার ?
হ্রদে মুখ আঁকা কার ?
বলাকার পাখা কার ?
'শরৎ'—যে নাম তার—
সে রূপের কি বাহার !!

রমেশ ছেলেটা একটু পাগলাটে গোছের। শরীরে তার আশ্চর্য ক্ষমতা, চেহারাখানাও তেমনি বিরাট। বড়লোকের ছেলে, নিজের মোটর আছে, চালাতেও পারে খুব ভাল।—তাই বি এ পরীক্ষা দিয়ে সে দিন-রাত মোটর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ যাচ্ছে হরিহরনগর, কাল ফাকনা, পরশু ভজ-হরিপুর—আবার তার পরের দিনই দেখ সে ফিরে এসেছে।

প্রমথ যে এক্স্‌পার্ট ডিটেক্‌টিভ হয়েছে সেটা রমেশের বিশ্বাসই হয় না। জার্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যণ্ড, সুইজারল্যাণ্ডের বড় বড় ডিটেক্‌টিভের আড্ডায় থেকে, তাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ভাল ভাল সার্টিফিকেট নিয়ে প্রমথ সেদিন বিলাত থেকে ফিরেছে। সরকারী ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্টে তার ৮০০৲ টাকা মাইনের চাকরী পাবার কথা হচ্ছে। তবু রমেশ তাকে হেসেই উড়িয়ে দেয়। প্রমথ মুচকি হেসে বলে, 'একদিন বুঝবে ভায়া, ফাঁপরে পড়লে শর্মা ছাড়া আর গতি নাই। সবুরে মেওয়া ফলে।'

সেদিন সকালে আমরা প্রমথর বাড়ির বৈঠকখানায় বসে গল্প করছি, এমন সময় রমেশ এসে বলল, 'আজ ভাই হরিহরনগর যাচ্ছি। তুমি তো সেবার বলেছিলে, যখন যাব আমার সঙ্গে যাবে—চল না ভাই।' প্রমথ বলল, আজ আবার আমাকে পীরনগরে একটা কেসে যেতে হবে—বড় interesting কেস্। তুমি কটায় রওয়ানা হবে?' রমেশ বলল, 'আমি ৮॥০ টায় যাব। প্রমথ বলল, 'আমাকেও প্রায় ঐ সময়ই যেতে হবে। দুজনে এক সঙ্গে রওয়ানা হওয়া যাবে,—কি বল? আমি আমার উইলিস নাইট্ সেডানখানা নেবো।' রমেশ বলল, 'আচ্ছা, তাই হ'বে। আমি আমার ফোর্ডেই পাড়ি দেবো। তা হলে এখন চল্‌লাম ভাই; স্নান, খাওয়া-দাওয়া সেরে তো বের হতে হবে।'

ঠিক সাড়ে আটটার সময় রমেশ একটা ছেঁড়া কোট পরে পুরানো তেলমাখা একটা টুপি মাথায় দিয়ে তার টু-সিটার ফোর্ডখানা নিয়ে প্রমথদের বাড়ীর সামণে হাজির হলো। প্রমথও তখন প্রস্তুত, শুধু পীরনগর থানার দারোগার কয়েকটা কাগজ নিয়ে আস্‌বার কথা, সেজন্য সে অপেক্ষা করছে। খানিক বাদে দারোগা এসে হাজির হলেন—কিন্তু কাগজ পত্রের একখানা উকিলের বাড়ি ফেলে এসেছিল বলে

আবার তাকে কাগজ আনতে পাঠান হলো। প্রমথ রমেশকে ডেকে বলল, 'তুমি রওয়ানা হয়ে পড় ভাই; আমার যেতে কত দেরী হবে কে জানে?' রমেশও তখনই রওয়ানা হয়ে পড়ল। আমি প্রমথর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তার উইলিস্ নাইটে চড়ে বসেছিলাম; কাজেই আমিও পিছনে পড়ে রইলাম।

যা হোক্, দারোগার ফির্তে বেশি দেরী হলো না, রমেশ যাবার দশ বারো মিনিটের মধ্যেই সে কাগজ নিয়ে এসে হাজির হলো। আমরা তাকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হয়ে পড়লাম।

তখনও গরম পড়েনি, রোদের ঝাঁঝ মোটেই নাই। বেশ দিব্যি ফুর্‌ফুরে হাওয়া বইছে, আমরাও খুব আরামে চলেছি। সোজা রাস্তা, দুধারে মাঠ, মাঝে মাঝে রাস্তায় একটু চড়াই-উৎরাই। কোন কোন জায়গায় রাস্তার কাছেই ছোট ছোট ঢিপি আছে, কোন কোন জায়গার জমি উঁচু-নীচু। ক্রমে দুধারের জমি একটু বেশি উঁচু-নীচু হয়ে গেছে।

আমরা তখন পীরনগরের কাছাকাছি! রাস্তা খুব সোজা, তাই অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। মনে হলো, দূরে রাস্তার ধারে নালার পাশে একটা মোটর কাৎ হয়ে পড়ে আছে। ক্রমে কাছে এসে দেখলাম এ যে রমেশের মোটর। তখন আমরা মোটর থেকে নেমে ছুটে দেখতে গেলাম ব্যাপারখানা কি? মোটরটা বেশি কিছু জখম হয়নি, শুধু বাঁ পাশের মাডগার্ড দুখানা দুম্‌ড়ে গেছে আর wind screen এর কাঁচটা ভেঙেছে। রমেশকে কিন্তু কোথাও দেখতে পেলাম না। 'রমেশ।' 'রমেশ।' বলে কত ডাক্‌লাম, কোনই সাড়াশব্দ পেলাম না।

পাশেই একটা ঢিপি ছিল, তার উপর চড়ে চারিদিকের দৃশ্য অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। সেটার উপর চড়ে আমরা চারিদিক দেখতে লাগলাম, সঙ্গে বাইনোকিউলার ছিল, তা দিয়েও দেখলাম—রমেশের কোন চিহ্ন নাই।

ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্য মনে হলো। রমেশের রওয়ানা হবার ১০।১২ মিনিট পরেই আমরা রওয়ানা হয়েছি; আমাদের গাড়ীর speedও অনেক বেশী। রমেশের accidentটা হবার বড় জোর ৫।৭ মিনিট পর আমরা সেখানে পৌঁছেছি; অথচ রমেশের কোন পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না। যদি দৌড়েও গিয়ে থাকে, ৫।৭ মিনিটের মধ্যে সে অদৃশ্য হতেই পারে না, কারণ চারিদিকে সমান জমি থাকাতে সাম্‌নের ৩।৪ মাইল পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর দৌড়েই বা যাবে কেমন করে? wind screenটা যেভাবে ভেঙেছে, তা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে রমেশ সেটার সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে—সম্ভবতঃ তার মাথাটাই ঠুকেছে। তা হলে সে অন্ততঃ কিছুক্ষণ মাথা ঘুরে পড়েছিল। তার পরেই উঠে তাড়াতাড়ি চলা তার পক্ষে অসম্ভব হবে—দৌড়ান ত দূরের কথা। আর, কেনই বা সে দৌড়াতে যাবে? যদি দৌড়ে না গিয়ে থাকে তা হলে তো এতক্ষণে বেশীদূরও যেতে পারেনি। তবে কেন তাকে দেখা যাচ্ছে না? যদি বেশীরকম জখম হয়ে থাকে আর নিজে চল্‌তে না পারায় অন্য কেউ তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তো দেখাই যেত। অত বড় লাশ বয়ে নিয়ে যাওয়া কি কম কথা।

এইরকম নানা জল্পনা-কল্পনা চলেছে। এমন সময় প্রমথ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, 'চল চল, শীগ্‌গির চল।

বাঁ দিকের ঐ খাদটার দিকে গিয়ে দেখে আসি।' বাঁয়ে প্রায় ৩০০ হাত দূরে একটা খাদ দেখা যাচ্ছে। সেটার দিকে আঙ্গুল দিয়ে প্রমথ দেখাল। আমরাও উচ্চবাচ্য না করে তার সঙ্গ নিলাম। খাদের ধারে গিয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখলাম খাদ বেশী গভীর নয়, নীচে একটা ছোট ঝরণা বয়ে গেছে। প্রমথ চেয়ে দেখে চিৎকার করে উঠল 'ঐ ঐ।' আমরাও চেয়ে দেখলাম, খাদের এক পাশে রমেশের কোটটা আর টুপিটা পড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি খাদের নীচে নামবার জন্য আমরা একটু পেছিয়ে গেলাম। এক জায়গায় মাটিতে ধাপ কাটা আছে দেখে সেখান দিয়ে আস্তে আস্তে নামতে লাগলাম। ধাপের মাটি নরম ছিল, তার উপর পায়ের দাগও ছিল। প্রমথ দাগ পরীক্ষা করে বল্‌ল, 'যে লোক এখান দিয়ে নেমেছে তার পা ছোট, কিন্তু পায়ের চেহারা দেখলে বোঝা যায় লোকটির বয়স অনেক। আরেকটা অস্পষ্ট দাগ দেখা যাচ্ছে সেও বয়স্ক লোকেরই তবে, এ দাগ অনেক বড় পায়ের। এর কোনটাই রমেশের পায়ের দাগ হতে পারে না। আর, খালি পায়ে সে যাবেই বা কেন?' এই কথা বল্‌তে বল্‌তে আমরা নীচে নেমে পড়লাম।

রমেশের কোট আর টুপি হাতে তুলে নিয়ে প্রমথ অনেকক্ষণ ভাল করে দেখল। কোটের পকেটে কিছুই নাই; একটা পকেট ছিঁড়ে গেছে। পাশ দিয়ে একটা ছোট ঝরণা বয়ে যাচ্ছে, তার জলে কোট আর টুপি ভিজে গেছে। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই, আশেপাশে কোথাও পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে না। প্রমথ বল্‌ল, 'নিশ্চয়ই ঝরণার জলের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল; না হলে পায়ের দাগ গেল কোথায়? দেখে শুনে যা মনে হচ্ছে, দুটি লোক রমেশকে বয়ে নিয়ে এই পথ দিয়ে গেছে। কিম্বা হয়তো উপর থেকে কেউ ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে; নীচে দুটি লোক ছিল। তারা ওকে তুলে নিয়ে চলে গেছে। পকেটে যা কিছু জিনিসপত্র ছিল, তা লোক দুটি নিয়ে গিয়েছে, কোটটা ফেলে রেখে গিয়েছে। টুপিটা তো মাথা থেকে পড়ে যাবেই! এখন চল, আবার উপরে গিয়ে পাশের জমি পরীক্ষা করে দেখা যাক্‌।'

উপরে উঠে খাদের কিনারের জমি পরীক্ষা করে দেখা গেল, এক জায়গায় মাটি খানিকটা যেন ধসে পড়েছে। ঠিক তারই নীচে খাদের মধ্যে কোট আর টুপি পাওয়া গেছিল। তখন স্পষ্টই বোঝা গেল, রমেশকে ঐখান দিয়ে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

আর একটু এগিয়ে রাস্তার দিকে যেতে একটা হাতুড়ি পাওয়া গেল। একেবারে নতুন হাতুড়িটা। শুধু তার হাতলের উপরে একটা আঙ্গুলের ছাপ রয়েছে। ছাপ দেখে প্রমথ বলল, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে লোকটার পায়ের দাগ খাদের ধারে মাটির উপর পাওয়া গেছে। এ দাগ সেই লোকেরই হাতের আঙ্গুলের। পাদুটো যে ধরণের ধ্যাবড়া গোছের, হাতের আঙ্গুলও এর সেই রকমই ধ্যাবড়া—কথা শেষ হতে না হতেই প্রমথ হঠাৎ চমকে থেমে গিয়ে, চোখ বড় করে বলে উঠল।

'দেখেছ?—এই দেখ। হাতুড়ির উপর রক্তের দাগ। এখন কি আর কোন সন্দেহ আছে? এ নিশ্চয়ই একটা খুনের ব্যাপার। চল্‌ শীগগির, আবার একবার খাদের মধ্যে নেমে দেখি, লোকগুলো

যেদিকে রমেশকে নিয়ে গেছে সেইদিকে এগিয়ে আর কিছু দেখতে পাই কি না।'

তাড়াতাড়ি খাদে নেমে আমরা এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম। একটু যেতে প্রমথ চেঁচিয়ে উঠল—'ঈ-ঈ-স্।' চেয়ে দেখি প্রকাণ্ড এক জেঁাক প্রমথর পায়ে কামড়ে ধরেছে। চারিদিকেই দেখি জোঁক কিলবিল। সামনেও যাবার উপায় নেই ঘন জঙ্গলে অন্ধকার। খাদ বেশী চওড়া নয়, তাই দুধারের গাছ নুইয়ে পড়ে ঘন জঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছে! তখন আর উপায় কি। তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম।

প্রমথর পায়ের জোঁক ছাড়িয়ে আমরা তখনই সেই হাতুড়ি কোট আর টুপি নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে মোটর চালিয়ে পীরনগরের থানায় উপস্থিত হলাম। সেখানে পৌছে প্রথমেই থানার ইন্‌স্পেক্টারকে কোট টুপি আর হাতুড়ি দিয়ে সব ঘটনা বলা হলো, ডায়রিতে সব কথা লেখাও হয়ে গেল।

তখনই ইন্‌স্পেক্টারবাবু ২।৩ জন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে আমাদের গাড়ীতে চড়ে সেই জায়গায় ফিরে এলেন। সব দেখে শুনে তিনিও বললেন, 'খুন যে হয়েছে' সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু। এরকম রহস্যময় খুন আমি আমার জীবনে দেখিনি। এতবড় লাশকে মুহূর্তের মধ্যে সরিয়ে ফেলা এক আশ্চর্য ব্যাপার। আশে পাশে কোথাও তো লুকাবার জায়গা নেই। ব্যাপারটা যা হয়েছে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। হাতুড়ির ঘা মেরে, অথবা হাতুড়ি ছুঁড়ে মেরে প্রথমে রমেশবাবুকে বে-দম করা হয়েছে। তখন মোটরটা খানায় পড়ে যাওয়া রমেশবাবুর মাথা wind screen-এ ঠুকে যায়; তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। তারপর তাঁকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে এত ঘটনা ঘটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। এখনই এ বিষয়ের তদন্ত হওয়া দরকার।

তখনই আমরা আবার থানায় ফিরে এলাম। তখন অনেক বেলা হয়েছে, তাই আমরা ডাক বাংলায় চলে গেলাম। স্নান খাওয়া সেরে বিষণ্নমনে আবার থানায় এলাম। ইনপেক্টারবাবু তখন একটা পুরস্কারের 'নোটিস' লিখছিলেন—যে এ বিষয়ে খবর এনে দিতে পারবে তাকে ১০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রমথ তাঁকে বারণ করে বলল, 'দেখুন ইন্‌স্পেক্টারবাবু, অমন কাজও করবেন না। আগে নিজেদের ডিপার্টমেণ্ট থেকে খুব ভাল রকম খোঁজপাত করুন; কলকাতার সি আই ডি থেকে থেকে দুটি পাকা লোক আনান। আমি তাদের সব বাৎলে দেবো; তারা এ বিষয়ে তদন্ত চালাক। যদি দুতিন দিনে কিছু না হয় তা হলে শেষটায় নোটিশ দেওয়া যেতে পারে।'

ইন্‌স্পেক্টারবাবু বললেন, 'আপনি স্বয়ং যখন উপস্থিত আছেন তখন আর ভাবনা কিসের? কলকাতা থেকে সি-আই-ডি আনতে হলে অনেক দেরি—সরকারী ব্যাপার তো আর চট্ করে হবার জো নেই। উপরওয়ালা থেকে নীচ পর্য্যন্ত সরকারী দপ্তুরমাফিক হুকুম, নোট ইত্যাদি হবার পর অর্ডার বেরুবে; ততদিনে এ কেস্ বাসি হয়ে যাবে। এমন serious case-এ এক মুহূর্ত দেরি করা চলে না। এমন একটা রহস্যময় ব্যাপার কতক্ষণ আর চাপা থাকে? বাড়িতে, রাস্তায়, ডাকঘরে, ইস্কুলে, বাজারে চায়ের দোকানে সেদিন শুধু একই কথা।

এদিকে, আমরা আবার সেই খুনের জায়গায় ফিরে এলাম। সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টারবাবু, দারোগা, ৮।১০ জন পুলিশ, একটি স্থানীয় ডিটেকটিভ। প্রমথ যেভাবে বুঝিয়ে দিল সেইভাবেই দুই তিন দলে

ভাগ হয়ে সকলে তদন্তে চলে গেল। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় সকলেই আবার ঘটনাস্থলে ফিরে এল—কোনই খবর নাই। নিরাশ হয়ে তখন সকলে রমেশের মোটরে থানায় ফিরে এলাম।

প্রমথ অনেকক্ষণ চিন্তিতভাবে মাথায় হাত দিয়ে থেকে বলল, 'পুরস্কারের নোটিসটি তা হলে দিয়েই দিন। রমেশের বাবা খুব বড়লোক ছিলেন—তিনি সম্প্রতি মারা গেছেন। ওঁদের কোন টাকার অভাব নেই, ১০০০৲ ছেড়ে ৫০০০৲ টাকা পুরস্কারও দিতে স্বীকার করলে কোন ভাবনা নেই; পুরস্কারের পুরো টাকা আদায় করবার ভার আমি নিলাম। বেশী টাকা পাবার লোভে অনেকেই এ বিষয়ের খোঁজ নেবে। খুনীর জানা লোকে পুরস্কারের লোভেও খুনীকে ধরিয়ে দিতে পারে।'

তখনই ছাপতে দেওয়া হলো—৫০০০ টাকা পুরস্কার ইত্যাদি। রমেশবাবুর সম্বন্ধে যে সঠিক খবর দেবে যার দ্বারা খুনীর সন্ধান পাওয়া যাবে, অথবা রমেশবাবু জীবিত থাকলে তার সন্ধান পাওয়া যাবে। সেই এ পুরস্কারটা পাবে।

পরদিন সকালেই পীরনগরের রাস্তা ঘাটে দেওয়ালের উপর প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে দেওয়া হলো—৫০০০ টাকা পুরস্কার ইত্যাদি ইত্যাদি।

চারিদিকে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ, থানার সামনেও বিস্তর লোক—কোন খবর পাওয়া যায় কি না। প্রমথর সঙ্গে আমিও থানায় গিয়ে বসে আছি, সকলের মুখেই গভীর ভাবনার চিহ্ন। কত লোক আসছে যাচ্ছে, সকলেই খবর জিজ্ঞাসা করে চলে যাচ্ছে। একটি লোক শুধু অনেকক্ষণ ধরে কোণায় দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় বড় পাগড়ি, বড় চাপ দাড়ি। লম্বা গোঁফ চোখে কালো ঠুলি, পরণে ধুতি পাঞ্জাবী হাতে মোটা লাঠি। অনেকক্ষণ তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখায় দারোগাবাবু তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন তার কি চাই। সে এগিয়ে এসে আস্তে চাপা গলায় বলল সে বাইরের লোকের সামনে সে কিছু বলতে পারে না নিরিবিলি হলে বলবে। তখনই বাইরের সব লোকদের বিদায় করে দেওয়া হলো। বাইরের দরজাটাও বন্ধ করে দেওয়া হলো।

লোকটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে, একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। মাথার পাগড়ি আর চোখের ঠুলি খুলে, লাঠিটা রেখে সে দাড়িতে হাত দিল। হঠাৎ একটানে দাড়ি-গোঁফ খুলে ফেলল, সেগুলো ছিল নকল দাড়ি-গোঁফ—ওমা এযে রমেশ!!

তখন স্পষ্ট গলায় সে বলল, 'রমেশবাবুকে জীবিত এনে হাজির করেছি—এখন ৫০০০ টাকার পুরস্কারটা দিন তো আমায়।'

সকলে আমরা এত চমকে গেছিলাম আর এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে মিনিটখানেক আর কারো মুখে কথা সরল না।

রমেশই প্রথম কথা বলল। প্রমথর দিকে চেয়ে, চোখ টিপে মুচকি হেসে সে বলল, 'কিহে ডিটেকটিভ সাহেব?'

খুনের ব্যাপারটা কি রকম একবার শুনিই না।'

প্রমথ বলল 'চল চল, আর চালাকি মেরো না। মিছামিছি এতগুলো লোককে হয়রাণ করালে,

এত খরচপত্র করালে। ৫০০০৲ টাকা তো পাবেই। তবে সে টাকাটা তোমাকেই বের করতে হবে, লক্ষ্মী ছেলের মত একখানা ৫০০০৲ টাকার চেক লিখে ফেলতো। সেই চেক্ ভাঙ্গান হলেই তোমায় ৫০০০৲ টাকা দেওয়া হবে। এখন বাড়ি যাই চল।'

তখনই আমরা তিনজন ডাকবাংলায় ফিরলাম। প্রমথ বেচারার মুখ একেবারে কাঁচুমাচু, সে ফিরবার সময়ই বল্‌ল, 'আমি ঠিক জানি তুমি গা ঢাকা দিয়েছিলে!' রমেশ বল্‌ল, 'আর চাল মেরো না দাদা। তোমার বিদ্যে সব বোঝা গেছে।'

ডাকবাংলায় ফিরে রমেশ সব ঘটনা খুলে বল্‌ল, 'পথে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখলাম বন্ধু হিতেন ঘোষের মোটর থেমে আছে। নেমে হিতেনকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপারখানা কি। হিতেন বলল, 'সামনের টায়ার দুটো আরেকটু পাম্প করা দরকার, তাই দাঁড়িয়েছি। আমিও দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।'

'হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি জাগল। তখনই কোটের পকেট থেকে সব জিনিসপত্র বের করে নিয়ে পাশের পকেটটা টেনে ছিঁড়ে কোটটা আর টুপিটা খাদের মধ্যে ফেলে দিলাম। তারপর মোটরটাকে আস্তে আস্তে ঠেলে নালায় ফেললাম, একটা হাতুড়ি দিয়ে wind screen-এর কাঁচখানাকেও ভাঙলাম। তাড়াতাড়িতে হাতটা একটু কেটে গেল তাই হাতুড়িটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তারপর হিতেনের মোটরে সোজা পাড়ি দিলাম। সে গেল হরিহরনগর আমি পথে পীরনগরেই নেমে রইলাম—শুধু মজা দেখবার জন্য। তারপর যা হলো তা আর বলে দরকার কি?'

থানায় যা কিছু ঘটেছিল সবই আমি সঙ্গে সঙ্গে জানতে পেরেছি—আমার একটি চর থানায় দুদিন হল চাকরি নিয়েছে। যখন দেখলাম ৫০০০৲ টাকা পুরস্কার, তখন আর লোভ সামলান গেল না। খুন তো হয়েছেই—তার প্রমাণও তোমরা নাকি পেয়েছিলে—তবে লাশটা উধাও হওয়া কোন কাজের কথা নয়, তাই এই জল-জ্যান্ত লাশখানা সশরীরে থানায় হাজির হলো। এখন ডিটেকটিভ সাহেব কি বলেন?'—প্রমথর মুখে কথাটি নাই, বেচারা বলবে আর কি?

দাদু-ভাইয়ের ছড়া

জ্যোতিভূষণ চাকী

দাদু, হঠাৎ জেগে রাতে
দেখি পুঁথি তোমার হাতে,
মস্ত বড়ো বড়ো।
তুমি কী যে অতো পড়ো?

আমি বুড়ো মানুষ।
ও ভাই হাত-পা আমার কাঁপে।
তোদের মত কি ক'রে আর
খেলব দৌড় ঝাঁপে?
তাইতে রাতের বেলা
আমি একাই খেলি একটুখানি
পড়া পড়া খেলা॥

ছড়া

আশানন্দন চট্টরাজ

'সা-রে গা মা, সা রে গা-মা,
সা রে-গা-মা, পা ধা-' ;
বিট্‌কেল্‌ সুরে গায়—
'পেঁচাতক' দাদা ॥

শুনে তাহা পুঁতে ধান
ছ'টি 'সিংহনুমান'—
'ফেউট' যখন মাঠে
মাখে জল, কাদা
'সা রে-গা মা, সা-রে-গা মা,
সা-রে-গা-মা, পা-ধা ॥

'পা-ধা নি সা, পা-ধা-নি-সা,
পা-ধা-নি-সা, ধা-নি'— ;
ব'লে তোলে 'হাতিতির' —
তানপুরাখানি।

দেখে 'ভালুকচ্ছপ'—
খেতে ভোলে মুড়ি, চপ্‌
শুধু ধীরে বেহালায়
চলে ছড়্‌ টানি।
পা-ধা-নি সা, পা-ধা-নি সা,
পা-ধা-নি-সা, ধা-নি' ॥

পেচা + চাতক = পেচাতক
সিংহ + হনুমান = সিংহনুমান
ফেউ + উট = ফেউট
হাতি + তিতির = হাতিতির
ভালুক + কচ্ছপ = ভালুকচ্ছপ

রোটাং-পাস

অসিত গুপ্ত

পাঠানকোটে ট্রেন থেকে নেমে প্রথমে আমরা গিয়েছিলাম ডালহাউসী। এই ডালহাউসী পাহাড়ে রবীন্দ্রনাথ খুব ছোটবেলায় তাঁর বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। সেই বাড়িটা এখনো আছে, এক বাঙালী মহিলা থাকেন সেখানে। শলাটোপ যাবার পথে বক্রোটা পাহাড়ের ওপর সবচেয়ে উঁচুতে ওই বাড়িটা আমরা দেখেছিলাম। যেখান থেকে বক্রোটা পাহাড়ে ওই বাড়িটায় উঠতে হয় সেখানটার ওরা নাম দিয়েছে টেগোর রোড।

কিন্তু ডালহাউসী, চম্বা ধরমশালা, পালামপুর, কুলু, মানালী—এসব কোন জায়গার গল্প এখানে বলা চলবে না। বললে ফুরোবে-ই না। তার চেয়ে শুধু রোটাং-পাস-এর কথা বলি। এক রোটাং-পাস-ই কি কম! ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। সেদিন ভাবতে পারি নি, কোনোদিন ফিরতে পারব কলকাতায়। আজ মনে হয়, আমরা-ই গিয়েছিলাম তো, না আর কেউ?

সাত ই জুন আমরা পৌঁছেছিলাম মানালী তে। সেখানে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমরা ঠিক করলাম এসেছি যখন তখন ভূগোলের সেই রোটাংটা দেখে আসি। বইয়ের পাতা আর পায়ের পাতা তো এক নয়, বিস্তর তফাৎ। ভারতের প্রায় সীমানা, পৃথিবীর এক ভীষণ গিরিপথ রোটাং—দেখতে পারলে জন্ম সার্থক হবে। ওঃ, উত্তেজনায় আমরা প্রায় মারা যেতে লাগলাম।

কিন্তু খোঁজখবর নিতে গিয়ে আমরা পড়লাম খুব মুসকিলে; ভয়-ও পেলাম খানিকটা! একেকজন একেক রকম বলে। কেউ বলল, রোটাং-এর হাইট হচ্ছে চৌদ্দহাজার, কেউ বলল, না না তেরো হাজারের বেশি নয়! টুরিস্ট অফিস বলল, সোজা সড়ক। অন্যেরা চালাক চালাক হাসি হেসে জানাল, সোজা পথে গেলে একদিনে আর পৌঁছাতে হচ্ছে না।

আরো পিলে-চম্‌কানো কথা শুনলাম। কেউ কেউ সাবধান ক'রে দিল বেলা তিনটের আগে নেমে এস। নইলে ওই সময়টা রোটাং-এ ভীষণ খারাপ এক আঁধি (ঝড়) হয়, তার মুখে পড়লে আর রক্ষে নেই। এই যে জুন মাসেই সেটা চলে। বাস-এর লোকটা একথা শুনে হেসেই উড়িয়ে দিল। বলল, 'বাঙালী, ছোকরা হয়ে ভয় পাচ্ছ কেন? আমি কমসে কম আশিবার রোটাং যাতায়াত করেছি ওসব কিচ্ছু নয়।' বুঝলাম লোকটির কাছে রোটাং পাস এ-পাশ, ও-পাশ করার মতন ব্যাপার।

কপাল ঠুকে তো আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পাহাড়ে চড়ে চড়ে আমাদের সাহস বেড়ে গিয়েছিল। ভাবলাম, এ-কেল্লাও ফতে ক'রে দেব। নয়-ই জুন ভোরবেলা আমরা ডবল-ডবল গরম জামা এঁটে হাজির হলাম বাস স্ট্যাণ্ডে। আগের দিন রাত্তিরে রুটি, জ্যাম, ডিম, কলা একটু একটু মিষ্টি এসব কিনে একটা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ রেখেছিলাম গুছিয়ে; ফ্লাস্কে জল। গরম জামা যা পরবার সব গায়ে

পরে নিয়েছিলাম। খাবারের ঝোলাটি ছাড়া আর কোনো বোঝা বাড়াতে চাইনি। খাড়া উঁচুতে উঠতে কষ্ট হবে তো, তাই।

হোটেলের তিব্বতী লোকটিকে আগের রাত্তিরে বলে রেখেছিলাম আমরা। খুব ভোরে ডেকে দিও আমাদের। 'আর একটু গরম জল ক'রে দিও। একেবারে নেয়ে বেরুবো। সারাদিন রুক্ষু থাকতে বড় খারাপ লাগবে। মানালীতে জুন মাসেও বেশ মিঠে মিঠে ঠাণ্ডা।

আমাদের কথা শুনে তিব্বতী লোকটির খুব আনন্দ হ'ল। ও বলল. ডেকে তো নিশ্চয়ই দেব। খাবারদাবারও ক'রে দেব। যাবার আগে খেয়ে যেয়ো। আমি জানি তোমরা ঠিক উঠতে পারবে, বাঙালীরা সব পারে। বাঙালীদের খুব তেজ (সাহস)। লোকটি আরো বলল, দেখো, তোমাদের সঙ্গে হয়তো অনেকে যাবে। কিন্তু ওই মঢ়ী পর্যন্ত। ওখানেই ওরা ছবি-টবি খিঁচে (তুলে) ফের নেমে আসবে।

আগে রহলা পর্যন্ত বাস যেত না, এখন যায়। রহলা হচ্ছে মানালী থেকে চব্বিশ কিলো-মিটার দূরে অতি ছোট্ট একটি জায়গা। সেখান থেকে খাড়াই আরম্ভ হয়েছে। আগে একদিনে রোটাং পৌঁছানো যেত না। কোঠী বলে একটা জায়গায় রাত কাটানো হত। এখন সে সবের বালাই নেই।

তিব্বতী লোকটিকে বলে রেখেছিলাম, আমাদের ঘুম ভাঙাতে। কিন্তু তার দরকারই হ'ল না। চারটে থেকে আমরা জেগে ব'সে। ঘুম হবে কোথা থেকে। উত্তেজনায় সারা শরীর যেন খাড়া। গরম জলে ভালো করে স্নান করে অল্প স্বল্প কিছু মুখে দিয়ে আমরা বাস্ এ চড়ে বসলাম। সাড়ে ছটা নাগাদ বাস আমাদের রহলা পৌঁছে দিল।

রহলা পর্যন্ত রাস্তা তেমন সুবিধের নয়। পাথুরে ঘোরানো প্যাঁচানো রাস্তা। তবে এসব রাস্তা আমরা হিমালয়ের পথে ঢের দেখেছি। ঘুমের জাবর কাটতে কাটতে তাই আমরা রহলা পৌঁছে গেলাম।

আকাশ তখন ফর্সা। দূরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় নতুন রোদ দিনের খেলা সুরু করেছে। রোটাং-এর চড়াই যেখানে সুরু ঠিক তার মুখে তিব্বতীদের ছোট্ট একটি দোকান। সেখানে রুটির সঙ্গে আরেক দফা চা খেয়ে আমরা গরম হয়ে নিলাম।

তারপর হাঁটা আরম্ভ হ'ল। আমাদের সঙ্গে অনেকে ছিল। অল্প বয়সী ছেলে, কয়েকজন মেয়ে, জোয়ান, প্রৌঢ়। গোড়াতে শক্ত কিছু মনে হয়নি। ভেবেছিলাম, এমনি করে বেশ পৌঁছে যেতে পারব। চারদিকে কেবল পাথর আর পাথর। ইংরেজীতে যাকে বলে বোল্ডার। পাহাড় থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে এসে এক পায়ে চলা পাথুরে রাস্তা তৈরি হয়েছে।

আমার সঙ্গে সঙ্গে এক রোড ইন্স্পেক্টর চলেছিল। মঢ়ীর কাছে রাস্তা তৈরি হচ্ছে, লোকটি রোজ অতখানি উঠে কুলি-কামিনদের তদারক করে; কি-ই বা মাইনে পায় কিন্তু এই কষ্টের কাজ করতে তার মুখ একটুও বেজার দেখলাম না। লোকটি পাহাড়ী। কত গল্প করছিল আমার সঙ্গে। আমাকে বুনো যোয়ান, বুনো রসুন গাছ চিনিয়ে দিল। হাতে ঘসে ঘসে দেখাল অবিকল

সেইরকম গন্ধ। আমাদের পাশ দিয়ে পাহাড়ীরা ভেড়ার পাল নিয়ে ছোট ছোট ঘোড়া নিয়ে টপাটপ ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছিল। ঘোড়ার গলায় টুং টুং করে ঘণ্টা বাজছিল। এরা যাচ্ছে আরো দূরে। ওদের অনেকে গরম কালটা ওখানে গিয়ে থাকে। বেশি ঠাণ্ডা খোঁজে। ঠাণ্ডায় জন্তু-জানোয়াররা ভালো থাকবে। ভেড়াদের গায়ে খুব বড় বড় আর পুরু লোম হবে। শীতের মুখে ওরা নেমে আসবে ফের নিচে। তখন ভেড়ার গায়ে লোম কেটে ফেলা হবে। তাই দিয়ে হবে পশমিনা। এই সব পশমিনার বিস্তর দাম হয়, পৃথিবীময় ছড়িয়ে যায় ভারতের পশমিনা।

বেশ বুঝতে পারছিলাম, পথ ক্রমশঃ কঠিন হচ্ছে। রীতিমত হাঁপ ধরছিল, গরম হচ্ছিল। ওপরের দিকে উঠলে, ভীষণ নিশ্বাসের কষ্ট হয়। অক্সিজেন তখন কমে যেতে থাকে।

বেশ রোদ উঠে গিয়েছিল, তখন আর একটুও মিঠে মনে হচ্ছিল না। গা থেকে কোট, গলা থেকে মাফলার খুলে ফেললাম। তখন খুব ঘামছি। টের পাচ্ছিলাম ভেতরের গেঞ্জীটাও ভিজে উঠেছে। মনে মনে ভাবলাম—বাপ! মঢ়ী না পৌঁছুতেই এই, তারপর না জানি কি হবে! ততক্ষণে আমার সঙ্গীটি বিদায় নিয়েছে।

মঢ়ীর খানিক আগে রাস্তা বানাচ্ছিল কুলীরা। ও সেখানেই থেকে গেল। রাস্তা বানানো মানে গড়ানে পাথরগুলোকে একটু একটু সমান ক'রে দেওয়া। রাস্তার ছ'ধারে খাদ, তাই একটু চেঁছে যদি পথ বাড়ানো যায়—তারই চেষ্টা। বিদায় নেবার সময় লোকটি কিন্তু আমাকে 'নমস্তে' বা 'নমস্কার' এসব কিছু বলল না। আমার ডান হাতটা নিজের হা'তে নিয়ে ঝাঁকিয়ে বলল, 'জয় হিন্দ্।' শুনে আমার এত ভালো লাগল যে কি বলব!

পাক্কা তিন ঘণ্টা সমানে হেঁটে আমরা মঢ়ী পৌঁছুতে পারলাম। এই মঢ়ীতে খানিক বিশ্রাম, তারপর আবার উঠতে হবে। দেখলাম রহলা থেকে যারা আমাদের সঙ্গে আসছিল, তারা অনেকেই আর সঙ্গে নেই। বোধ হয় চড়াই ভাঙতে না পেরে ফিরে গেছে।

মঢ়ীতে পৌঁছেই অবাক কাণ্ড! ডান হাতি গুঁড়ো গুঁড়ো কিছু বসতি। পাহাড়ী আর তিব্বতীরা তাতে থাকে। আর, বাঁ-দিকে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বরফের বিছানা পাতা। এ-যাত্রা একসঙ্গে এত বরফ দেখিনি। দেখে আমরা শরীরের ধকল যেন ভুলে গেলাম। আমাদের হোটেলের সেই লোকটি ঠিক বলেছিল। সত্যি সত্যি দেখলাম যারা মঢ়ী পর্যন্ত কোন গতিতে পৌঁছুতে পেরেছে তারা এই বরফের বিছানায় শুয়ে গড়িয়ে নানা পোজে শুধু ছবি তুলতে লাগল।

আমরা তিব্বতীদের দোকানে, বাইরে বেঞ্চিতে বসে একটু খাবার-দাবার খেয়ে নিলাম। অঢেল ছুধ মেশানো চা খেলাম। আর ওরা রেকাবির সাইজের সাবুর পাঁপড়ের মতো একরকম শক্ত শক্ত জিনিস বানায়, খানিক খেলেই দাঁত ব্যথা করে। তা-ও একটু খেয়ে দেখলাম।

তারপর আবার চলা। যেতে যেতে তিব্বতী এবং ওখানকার পাহাড়ীরাও বলে দিয়েছিল তোমরা কিন্তু তিনটের আগে নেমে এস। বলা যায় না, ঝড়ের মুখে পড়তে পার। মঢ়ী থেকে সব ফাঁকা।

কয়েকজন ছাড়া আর কেউ সঙ্গে এল না। ক্রমে পাহাড় আরো ঘন হয়ে এল, পথ আরো কঠিন। আগে যাও বা দু' একটা গাছপালা দেখা যাচ্ছিল, এরপর সব ফর্সা। শুধু পাথর আর পাথর, পাহাড় ভেঙে ভেঙে ওঠা আর ওঠা।

আস্তে আস্তে হিমেল হাওয়া দিচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম, আমরা এবার বরফের রাজ্যে ঢুকছি। আমি পিঠ খাড়া করে একা একা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলাম। কোথা থেকে যেন একটা দারুণ শক্তি এসেছিল মনে। ভয়ও যে করছিল না, তা নয়। এই রকম নির্জন দুর্গম রাস্তায় যদি কিছু বিপদ হয়!

একটা ভয়ংকর দৃশ্য দেখে মনটা খুব খারাপ হ'য়ে গেল। দেখলাম অনেক নিচে খাদের মধ্যে একটা খচ্চর পড়ে রয়েছে। খচ্চরটা তখনও বেঁচে। পা ফসকে বোধহয় গড়িয়ে পড়ে গেছে। কিন্তু তাকে তোলার কোনো উপায় নেই। আহা, বেচারা তখনও পা ছুঁড়ছে!

হিমালয়ে যতবার গেছি, ততবারই দেখেছি আমাদের মিলিটারীরা খুব কাজ করে। এবারেও দেখলাম। রোটাং এর পথে তারা নানা মাপ জোখ করছে, রাস্তা বানাচ্ছে। তারা বলল, পাহাড়ী রাস্তায় যাও তবেই পৌঁছুতে পারবে। এ পথে গেলে সারাদিন লেগে যাবে। তখন সত্যি ভয় হ'ল।

মঢ়ীর পর খানিকটা পথ বেশ ভালো পেয়েছিলাম। সোজা রাস্তা, তেমন চড়াই নেই। এক পাশে বরফের চওড়া চওড়া দেওয়াল। জীবনে এত বরফ কখনো একসঙ্গে দেখিনি। পায়ের তলায় মাটি নেই, পাথর নেই কেবল বরফ। মনের আনন্দে, প্রায় পাগল হয়ে গিয়ে সেই বরফের দেওয়ালে নাম লিখে ফেললাম। জানি মুছে যাবে। সাদা সাদা বরফ মুঠো মুঠো দেওয়াল থেকে খসিয়ে নিয়ে মুখে পুরলাম মাথায়-কপালে ঘসলাম।

কিন্তু বরফের আনন্দ বেশিক্ষণ রইল না। পাহাড়ী রাস্তায় ঘস্‌টে ঘস্‌টে উঠতে গিয়ে দম নিক্‌লে গেল। একবার পড়লে কোথায় যে তলিয়ে যেতাম তার ঠিক নেই। সঙ্গে তখন জনপ্রাণী নেই, সামনে পেছনে কেউবা। কেবল আমাদের সঙ্গে দুটি পাঞ্জাবী ছেলে। কি ভালো ছেলে তারা। মস্ত বড় বড় দেশী বিদেশী ডিগ্রী আছে, তবু রাজস্থানে তারা নিজের হাতে চাষ করে।

ছেলে দুটি যেন পাহারা দিয়ে রইল আমাদের। আমাকে বলল, দেখ মেয়েদের ছেড়ে তুমি বেশি এগিয়ে যেয়ো না। কিংবা মেয়েরা যদি উঠতে না পারে, ওদের রেখে যেয়ো না মাঝপথে। ওরা উৎসাহ দিতে দিতে চলল, অনেক জায়গায় তুলল হাত ধরে টেনে।

তারপর সেই রাস্তা। ওঃ ভাবতে গেলে গা শিরশির করে। যারা অমুক অভিযানে, তমুক অভিযানে যান, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু আমরা তো ওরকম মাউন্টেনীয়ার নই নেহাৎই ক্যাল-কেশিয়ান বাবু।

আমরা তখন সোলাং নালা-টালা পেরিয়ে রহলা ফলস্ এর কাছাকাছি চলে গেছি। চারদিকে শুধু বরফের ধোঁয়া ঠেকছে তুলোর মতো ধবধবে তুষার। জমাট ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগছে মুখে। মনে হ'ল আমরা আকাশের খুব কাছে চলে এসেছি চারদিক নিস্তব্ধ গম্ভীর।

সরু ফিতের মতো বরফের রাস্তা।

কোনরকমে একজন লোক চলতে পারে এইরকম পায়ে হাঁটা পথ। থামবার উপায় নেই, পিছনের সঙ্গী আসছে কি না তা ঘুরে দেখবার উপায় নেই। যদি কেউ পড়ে যায়, তাকে ফেলে রেখেই এগিয়ে যেতে হবে এমন ভয়ংকর রাস্তা।

ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে ভয় করে। একবার পা হড়কালে সোজা পাতালে। আর, বরফের গা তেমনি পিছল। ওখান থেকে ইচ্ছে করলেও ফেরা যায় না। ফিতের মতো ওই সরু বরফের পথটুকু পার হ'তেই হবে।

মনে হ'ল রাস্তা কোনদিন ফুরোবে না। তখন কিন্তু মনে আর কোন ভয়ডর নেই। এমনকি, একবারও কলকাতার কথা মনে হয়নি।

আর আধ ঘণ্টাখানেক হাঁটলেই আমরা পৌঁছে যাই রোটাং পাস। সেই পাঞ্জাবীদের একটি ছেলে শেখোঁ তার নাম, একটা হকিস্টিক হাতে নিয়ে টপাটপ উঠে গেল। দূর থেকে শিস্ দিয়ে দিয়ে ডেকে, চিৎকার করে আমাদের রাস্তা বাত্‌লাতে লাগল। ওকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। বরফ মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাত পা নাড়ছে চেঁচাচ্ছে সাহস যোগাচ্ছে।

কিন্তু আর পারলাম না, মুখ থেকে আমরা ফিরে এলাম। দূর-দুর্গম জায়গায় সঙ্গে মেয়েরা থাকলে এই হয়। আরেকটি পাঞ্জাবী ছেলে তখনো আমাদের সঙ্গেই ছিল। সে খুব চেষ্টা করল। বলল, এই তো আরেকটু! একটুখানি কষ্ট করলে পৌঁছে যাবে। শেষে দোরগোড়া থেকে ফিরে যাবে?

আমি হয় তো পারতাম। কিন্তু তাহলে পথের মাঝখানে, ওই জনমানবহীন জায়গায় ফেলে যেতে হয় মেয়েদের। সেটা উচিত মনে হল না। তাছাড়া, পাঞ্জাবী ছেলেটাও বারণ করল। বলল, হয় সবাই চল. নয় একটু জিরিয়ে নিয়ে ফিরে যাও। যদি রহলা-র বাস গিয়ে না পাও তাহলে আমাদের গাড়িতে অপেক্ষা কর। আমরা তোমাদের মাশলী পৌঁছে দেব।

কি আফশোস, কি আফশোস! সেই ছেলেটাও চলে গেল। আমরা খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে ফিরতে লাগলাম। আমাদের গায়ে এসে ঢুঁ মারতে লাগল ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘ। গোড়ায় এটা খেয়াল করিনি। খানিক নামতে নামতেই মনে হল আকাশ কালো করে আসছে। এক আধবার মেঘের ঢাকঢাক গুড়গুড়ও শুনলাম বোধহয়। পাহাড়ে মেঘের ডাক, বিদ্যুতের চমক সবই অন্যরকম মনে হয়। সমতলের সঙ্গে কোথায় যেন একটু তফাৎ থাকেই।

ওঠার সময় খুব শক্তি ছিল; পিঠ খাড়া ক'রে উঠছিলাম। শেষটুকু উঠতে পারি নি ব'লে বোধ-হয় মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মোটকথা খুব গা ছেড়ে দিয়ে নামছিলাম। শরীরে একটুও শক্তি ছিল না পায়ে জোর ছিল না। সেই সরু ফিতের মতো বরফের রাস্তায় আমি দু'দুবার আছাড় খেলাম। আরেকটু হলেই হয়েছিল আর কি! এই ভ্রমণকাহিনী আর শোনাতে হত না!

মঢ়ী পৌঁছে ফের একটু পেটকে শান্ত করতে হ'ল। সেখান থেকে আরো তিনঘণ্টা হাঁটলে তবে রহলা পৌঁছানো যাবে। কিন্তু তার আগেই বৃষ্টি নামল।

প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা তারপর আকাশ ভেঙে। গড় গড় করে পাথর গড়াতে লাগল। চারদিক অন্ধকার করে এল। একে মেঘ বৃষ্টি তারপর সন্ধ্যে হয়ে আসছে। লোকজন কেউ নেই। কখনো সখনো দু একটা পাহাড়ী—ভেড়া নিয়ে খচ্চর নিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। বেদম ভয় করতে লাগল। ওঠার সময় কিন্তু তত ভয় ছিল না।

এর মধ্যে আমি আবার দুচারবার আছাড় খেলাম। জল পড়ে পড়ে পাথরগুলো পিছল হয়ে গিয়েছিল। নামবার সময় তাড়াতাড়ি নামতে হয় প্রায় ছুটে। সেই ভিজে পাথরগুলোয় পা পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে হড়কে চলে যাচ্ছিলাম। একবার কোমরে লাগল, হাঁটুতে লাগল। গায়ের গরম জামাগুলো পর্যন্ত বৃষ্টিতে সপসপে হয়ে উঠল। আমরা দাঁড়কাকের মতো ভিজে কোনরকমে টলতে টলতে রহলা ফিরে এলাম।

যাক বাস এখনো আসেনি · ভোরবেলা যে বাসটা আমাদের নিয়ে এসেছিল, সেটা দেড়টা নাগাদ ফিরে যায়। আবার রোটাং অভিযাত্রীদের জন্যে একটা বাস সন্ধ্যের মুখে আসে। আকাশের অবস্থা খারাপ দেখে পথে-ঘাটে বিপদের ভয়ে বাসটা সেদিন একটু দেরি করেই এল।

এতক্ষণ ঠাণ্ডায় কিন্তু আমরা জমে গিয়েছিলাম। তবু কাঁপিনি। যেই না বাসে ওঠা অমনি সে কি হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা আমাদের ধরল! ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে, ভিজে জামাকাপড়ে শরীর প্রায় ন্যাতার মতো—আমরা ফিরে চললাম মাশলীর দিকে।

ভালবেসো

দীপকরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

(বহুব্রীহি)

ভালবেসো ফুলেদের মিঠে মিঠে গন্ধ
ভালবেসো নদীটার আঁকা বাঁকা ছন্দ ॥
ভালবেসো আষাঢ়ের টুপ্ টাপ্ বৃষ্টি।
ভালবেসো ভেসে আসা দোয়েলের শিস্‌টি ॥
ভালবেসো ভেঙে পড়া শুকনো যে ডালটা।
ভালবেসো জলহীন মজে আসা খালটা ॥
ভালবেসো রোগীকে,, ভালবেসো দুঃখীকে
ভালবেসো পাপীকে, ভালবেসো সুখীকে ॥
ভালবেসো ঠিকে ঝি রসিকের মাকেও ॥
ভালবেসো ভাল কে—মন্দ যে তাকেও ॥

কাঞ্চনপুর-সমাচারের পাতা খুলেই কালু হৈ হৈ করে উঠল—

'কি আশ্চর্য ! এ-যে দেখি আমাদের নন্দনকাননের বিষয় লিখেছে।'

'কৈ ? কৈ ? দেখি ! দেখি !'—বলে আমরা সবাই ছুটে এলাম, এমন কি পাশের ঘর থেকে কাজল, হাসি আর বীণাও এসে হাজির হল।

প্রবন্ধের নাম 'বাগান বাড়ির রহস্য', লেখক 'প্রভাকর।'

মালু বলল—'ইনি কোন প্রভাকর ? যিনি মধ্যে মধ্যে ভূতের গল্প আর রহস্যের গল্প লেখেন ?'

হাসি বলল 'নিশ্চয়ই। আমরা বাড়িটা সম্বন্ধে যে-সব কথা শুনেছি, সেই ধরণের কথাই ত লিখেছেন। আবার দেখ্—কতবড় ছবি দিয়েছেন।'

বীণা বলল—'সব কথা কিন্তু ঠিক লেখেননি। লেখক ধরেই নিয়েছেন যে ওটা ভূতের বাড়ি বলে কেউ বাস করে না।'

আমি বললাম—'আমরা সে-সব কথা সীতা আর তার দিদিমার কাছে শুনেছি, সুতরাং আমরা যা জানি সেটাই ঠিক কথা। তারা ত ভূতের কথা বলেনি।'

কালু বলল—'লেখকেরা লোকের মনে কৌতুহল জাগাবার জন্য ও-সব ভূত-টুতের কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে লেখেন। আসলে সেটা একটা গুজব মাত্র। প্রভাকরের লেখা অনেক এ্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়েছি—বেশ লেখেন ভদ্রলোক !'

'কিন্তু—এতদিন ধরে পোড়োবাড়ি দেখে আসছি—হঠাৎ তার বিষয়ে এই প্রভাকরের এত মাথাব্যথা কেন ?' জিজ্ঞাসা করল বুলু।

মালু এতক্ষণ কোন কথা বলেনি, অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন চিন্তা করছিল। কাজল-বীণারা তাদের ঘরে ফিরে যাবার পরে সে বলে উঠল—'হয় ত সেই খামখেয়ালি বৃদ্ধের অশরীরী আত্মাই এ বিষয়ে কোন নির্দেশ দিয়েছে! হয়ত সত্যিই ওখানে গুপ্তধন আছে, এইবারে রহস্য উদ্ঘাটন করা যাবে। হয়ত—'

কালু তাকে আজগুবী কল্পনা করার জন্য ধমক দিল না, কিন্তু তার হয়তর স্রোতে বাধা দিয়ে বলল—'ও-সব অশরীরী-টশরীরীর কথা বাদ দে। আমরা যা-যা জানি তার সঙ্গে এই খবরের কাগজের তথ্যগুলো ভাল করে মিলিয়ে দেখতে হবে। তারপর একবার—'

তার কথা শেষ হবার আগেই ব্যস্ত হয়ে বুলু বলে উঠল 'নানা ও ভূতের বাড়িতে আমাদের আর গিয়ে দরকার নেই। প্রভাকর-বাবুও ত লিখেছেন যে ওখানে ভূত আছে।'

মালু গাল ফুলিয়ে বলল—'অমনি এককথায় অলৌকিক সব কিছুকে উড়িয়ে দিলেই হল? কেন—আমরা নিজেরাই কি ঐ পোড়োবাড়িতে ভুতুড়ে আলো দেখিনি? লোক না থাকলেও ফিসফাস শুনিনি?'

* * *

সেদিন বিকালে আমাদের খেলার ক্লাস হল না, সেই সুযোগে, মিস্ বিশ্বাসের অনুমতি নিয়ে, আমরা 'নন্দনকাননের' দিকে বেড়াতে বেরোলাম। বুলু মুখে যতই আপত্তি করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গ ছাড়ল না। দূর থেকেই দেখতে পেলাম যে কোনদিন যেখানে জন-মানুষ দেখিনি, একটা রিকশাও থামতে দেখিনি, সেই পোড়োবাড়িতে আজ একটা বড় মোটর আর একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে আর বাগানে, দোতলার বারাণ্ডায়, ছাদে, এমন কি গোল টাওয়ারটার মাথায় পর্যন্ত লোকজন ঘোরাফেরা করছে।

আমি বললাম—'এত লোক কি সবাই কাঞ্চনপুর-সমাচার পড়ে তামাশা দেখতেই এসেছে, না গুপ্তধনের সন্ধানে এসেছে? আমাদের কি এখন আত্মপ্রকাশ করা উচিত হবে?'

বুলু ভয় পেয়ে গেল—'যদি ওরা গুণ্ডা-ডাকাত-শয়তান হয়ে থাকে? যদি ওদের কাছে ছুরি-পিস্তল-হাত-বোমা থাকে? তার চেয়ে চল্ আমরা এক্ষুণি স্কুলে ফিরে যাই!'

কালু তাকে ধমক দিলেও তার আর আমার কথার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করল। নন্দন-কাননের সামনা-সামনি, বড়রাস্তার উত্তর দিকে অনেকগুলি গাছ, পাথর আর ঝোপঝাড় ছিল। আমরা পা-টিপে-টিপে বড় রাস্তা থেকে নেমে, ঝোপের পিছন দিয়ে একেবারে নন্দনকাননের গেটের সামনে পৌঁছলাম। সেখান থেকে আমরা গাড়িগুলো, এমন কি লোকগুলিকেও বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, অথচ, ঝোপের আড়ালে থাকার দরুণ, তাদের পক্ষে আমাদের দেখা সম্ভব ছিল না। 'ট্যাক্সিটা আমাদের কাঞ্চনপুরেরই কিন্তু প্রাইভেট গাড়িটা কলকাতার'—এই বলে কালু তার নোটবুকে গাড়িগুলির নম্বর ও বর্ণনা লিখে নিল।

'কালো রঙের এ্যাম্বাসাডার গাড়ি, লাল রঙের গদি, নতুন ঝকঝকে, কিন্তু (এখন) ধুলোমাখা, নম্বর—'

মালু বলে উঠল—'কালো রঙের এ্যাম্বাসাডার! তাহলে নিশ্চয় এখানে একটা বড় রকমের ডাকাতি হতে চলেছে!' কালুর বাইনোকুলারটা নিয়ে আমরা সবাই ভাল করে লোকগুলিকে দেখছিলাম। মালুর কথায় হেসে উঠলেও আমরা সকলেই বেশ উত্তেজিত বোধ করছিলাম।

কালু বলল—'আমার মনে হয় যে এরা সকলে এক দলেরই লোক। ঐ জাঁদরেল, টাকমাথা, আধবুড়ো ভদ্রলোকটিই নিশ্চয় বাড়ির কর্তা অথবা দলের পাণ্ডা। বাকি সকলে তাঁর কর্মচারী বা দলের লোক।'

হঠাৎ চারটি লোক ব্যস্তসমস্ত ভাবে ফটক দিয়ে বেরিয়ে এসে, রাস্তা পার হয়ে, আমাদের কয়েক ফুটের মধ্যে দাঁড়াল, সম্ভবতঃ বাসের অপেক্ষায়। কিন্তু ওরা রাস্তার উত্তর ধারে দাঁড়াল কেন? কাঞ্চনপুরে যাবার বাস ত থামবে রাস্তার দক্ষিণে।

মালু কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কালু তাকে থামিয়ে দিল। লোকগুলি অবশ্য খুব জোরে জোরে আর

উত্তেজিতভাবে তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেই এমন ব্যস্ত ছিল যে অন্য কোন দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপও ছিল না। নির্জন রাস্তায় ঝোপের আড়ালে বসে যে কেউ তাদের কথা শুনতে পারে এমন কথা তারা কখনও ভাবেনি।

শুঁটকো, লম্বা লোকটি হাতমুখ নেড়ে বলছিল—'যতসব পণ্ডশ্রম! এত এত সোনাদানা যদি এই বাড়িতেই লুকোন থাকত, তাহলে ত সেটা দশ বছর আগেই পাওয়া যেত। তখন ত আর কম খোঁজা হয়নি!'

বুড়ো লোকটি চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বলল—'সে কথা সত্যি, সে কথা অবশ্য সত্যি। কিন্তু বুড়োকর্তার টাকাগুলো কি হল সেটাও ত আশ্চর্যের কথা। তাছাড়া তিনি নাকি উইল করেছিলেন, সেটাই বা কোথায় গেল?'

কালো মতন ছোকরাটি মিন মিন করে কি যেন বলল—শোনা গেল না। ধূর্ত চেহারার লোকটি বিশ্রীভাবে হেসে উঠল।

তাদের কথা ভালভাবে শুনবার জন্য যেই আমরা কয়েক পা এগোতে গেছি। অমনি শুকনো পাতার মধ্যে খচমচ আওয়াজ হয়ে গেল। আমরা ত ভয়ে কাঠ—ধরা পড়ে গেলাম বুঝি! মনে হয় যেন ওরা শব্দটা শুনতে পেয়েছিল। ধূর্ত-ধূর্ত চেহারার চতুর্থ ব্যক্তি চাপা স্বরে অন্যদের ধমক দিল—'চুপ আহাম্মুকের দল! ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছিস যে, হয়ত বা ছোটকর্তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা—'

সৌভাগ্যের বিষয় অন্য লোকগুলি তার কথায় কান দিল না।

বুড়ো বলল—'একি তোমার কলকাতা শহর পেয়েছ যে দেয়ালে-দেয়ালে কান পাতা থাকবে? ছোটকর্তার নড়তে চড়তে সময় লাগে।'

শুঁটকো লোকটি আবার হাঁউমাউ করে বলতে লাগল—'ভাগনাবাবু এতই কি বোকা ছিল? নিশ্চয় সে টাকাকড়ি হাতিয়ে উইল-টুইল ছিঁড়ে ফেলে পালিয়ে গেছে। হয়ত বা মরেই গেছে এতদিনে!'

বুড়ো বলল—'সে যাই হোক, কর্তার যখন হুকুম হয়েছে তখন সমস্ত বাড়িটা ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে, দরকার হলে বাগানও।'

ধূর্ত চেহারার লোকটি আবার বিশ্রীভাবে খ্যা-খ্যা-খ্যা-খ্যা করে হেসে উঠল।

এই সময় কাঞ্চনপুর থেকে ঝাউতলা যাবার শেষ বাসটা এসে পড়ল, লোকগুলি হুড়মুড় করে বাসের দিকে ছুটল।

ঠিক তার আগেই বুড়ো ধূর্তকে বলল—'মনে রেখো দিদিমা আর নাতনীর সম্পূর্ণ ভার তোমার উপর। সব কথা বার করতে হবে, যদি ভালমুখে না হয়—তাহলে'—আবার খ্যা-খ্যা করে হেসে ধূর্ত যে কি উত্তর দিল সেটা আমরা শুনতে পেলাম না। বাসটা লোকগুলিকে নিয়ে ঝাউতলার দিকে চলে গেল আর আমরা স্তম্ভিত আতঙ্কে বসে রইলাম!

* * * *

এইখানে আমাদের কিছুটা পরিচয় দেওয়া দরকার। আমরা—মানে কালু, মালু, বুলু আর আমি (টুলু) কাঞ্চনপুর থেকে দশমাইল দূরে ভারি চমৎকার একটা হোস্টেলে থেকে স্কুলে পড়ি। কাজল-হাসি-বীণা-নন্দিতা-বিজলী ইত্যাদি আরো শতখানেক মেয়েও হোস্টেলে থাকে, স্কুলের বাকি মেয়েরা পশ্চিমে কাঞ্চনপুর, উত্তরে দেওদারগঞ্জ অথবা পূর্বদিকে ঝাউতলা থেকে স্কুলে আসে।

আমাদের স্কুলটা যে কত ভাল আর এখানে যে আমরা কত স্বাধীনতা পাই সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা

কঠিন। তাছাড়া মাঝে মাঝে শনিরবিতে আমরা স্কুলের পাশে দাদুর বাড়িতে যাই ও সেখান থেকে এ্যাডভেঞ্চার করতে বেরোই। আমরা চারজনে—মানে কালু-মালু-বুলু-টুলু—নানা বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াই বলে বন্ধুরা আমাদের নাম দিয়েছে গোয়েন্দা-গণ্ডালু। আমাদের এক একটা এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী শুনলে রোমাঞ্চকর গল্পের মতন মনে হবে।

নন্দনকানন নামে যে পোড়ো বাড়িটার কথা বলে গল্প সুরু করলাম, সে বাড়ির ইতিহাস আরো বেশি রোমাঞ্চকর—ঠিক একটা উপন্যাসের মতন। মস্ত এক ধনী ব্যক্তি শ্রীকালিকিংকর মুখোপাধ্যায় বুড়ো বয়সে ভীষণ খামখেয়ালি হয়ে পড়েছিলেন। শ্যামকিংকর ও রামকিংকর নামে দুই ছেলের হাতে নিজের ব্যবসাপত্রের ভার দিয়ে তিনি এই নির্জন জায়গায় সুন্দর বাগানবাড়ি বানিয়ে একপ্রকার বনবাস করতেন। ছেলেরা অবশ্য মধ্যে মধ্যে আসতেন, কিন্তু এই অজ পাড়াগাঁয় তাঁরা দুদিনও টিঁকতে পারতেন না। পুরোন চাকর বনমালী, ভাগনে তপন আর স্থানীয় ঠাকুর-মালী-দারোয়ান নিয়ে সারা বছর কালিবাবু এখানেই থাকতেন। বাড়ির নাম রেখেছিলেন নন্দনকানন। দিনরাত মামা আর ভাগনেতে মিলে বাড়ির চারপাশে বিচিত্র সুন্দর ফুল-ফলের গাছপালা লাগাতেন ও তার পরিচর্যা করতেন। যদিও বাড়ি ও বাগান বহু বছর অযত্ন ও অবহেলায় পড়ে রয়েছে, তবু এখনও বিভিন্ন ঋতুতে এখানে যা ফুল ফোটে তাতে বেশ কল্পনা করে নেওয়া যায় যে একসময়ে এই বাগান সত্যি-সত্যিই নন্দনকাননের মতন সুন্দর ছিল।

তপনবাবু ছিলেন একটু কবি প্রকৃতির মানুষ। গল্প লেখার দিকেও তাঁর ঝোঁক ছিল। কালিবাবু তাঁকে বেশি লেখাপড়া করান নি, বাড়িতে বসেই নিজের চেষ্টায় তিনি বি-এ পাশ করেছিলেন! কাজকর্মের সন্ধানও কালিবাবু করতে দেননি! অনেকেই তাঁকে বলতে শুনেছিল যে তিনি ভাগনের নামেই এই নন্দনকানন উইল করে লিখে দিয়ে যাবেন এবং তার জীবনধারণের উপযুক্ত টাকাকড়ি দিয়ে যাবেন। এর বেশি উচ্চাশা তপন চ্যাটার্জির ছিল না। ঝাউতলারই একটি মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছিলেন কালিবাবু শেষ কয়েকটা বছর ভাগনে-বৌএর আদর-যত্নে ভারি আরামে কাটিয়েছিলেন।

কিন্তু কালিবাবুর খামখেয়াল দিনকার দিন বেড়েই চলছিল। ছেলেমানুষের মতন তিনি জিনিসপত্র লুকিয়ে রেখে মজা করতেন। তপনবাবুকে মাঝে মাঝে বলতেন—'টাকা-কড়ি কি তোমার হাতে তুলে দিয়ে যাব ভেবেছ? বুদ্ধি খাটিয়ে আদায় করে নিতে হবে।'

হঠাৎ কালিবাবু যখন মারা গেলেন তখন কিন্তু দেখা গেল যে বাড়ি বা টাকাকড়ি কোন কিছুই তিনি ভাগনেকে দিয়ে যান নি। তাঁর কোন উইলই পাওয়া গেল না।

রামবাবু আর শ্যামবাবু যদিও বহু টাকার মালিক, তবু তাঁরা পিসতুতো ভাইকে কিছুই দিতে সম্মত হলেনই না, উপরন্তু অভিযোগ করলেন যে কালিবাবুর অনেক টাকার নাকি হিসাব নেই। নিশ্চয় তপনবাবুই সেগুলি সরিয়েছেন। নিজের সামান্য কটি জিনিসপত্র নিয়ে তপনবাবু তখনকার মতন শ্বশুর-বাড়িতে চলে গেলেন। শ্বশুর-শাশুড়ীর ইচ্ছা ছিল যে তাঁদের জামাই শ্যামবাবু-রামবাবুর বিরুদ্ধে মামলা করুন, কিন্তু তপনবাবু কিছুতেই রাজি হলেন না। এই নিয়ে ঝগড়াঝাটির ফলে একদিন তপনবাবু বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। তাঁর মেয়ে সীতা তখন খুবই ছোট। তারপরে আর তাঁর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

ক্রমে সীতার মা এবং তারপরে তার দাদামশাই মারা গেলেন। তারপর থেকে হঠাৎ সীতার নামে তার দিদিমার কাছে মাসে মাসে টাকা আসতে লাগল। কিন্তু তার বাবা ফিরে এলেন না।

সীতা আমাদের সঙ্গেই কাঞ্চনপুরের স্কুলে পড়ত। সে বড় চাপা মেয়ে, কারো কাছে নিজের দুঃখের

কথা বলতে চাইত না। গোয়েন্দা-গণ্ডালু নামে আমাদের খুব নামডাক হল, আমরা অণিমাদির হারানো ধনরত্ন খুঁজে দিলাম (জমিদার বাড়ির রহস্য—সন্দেশ, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭১) তাঁর ভাইবোনের সন্ধান করে দিলাম (গুণ্ডা ও গণ্ডালু—ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭২) আবার তিব্বতী গুহায় চোরের দল ধরলাম (তিব্বতীগুহার রহস্য—ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৫) তখন একদিন সীতা বলেছিল—তোরা এতজনের এত জিনিস খুঁজে বার করলি, আমার জন্য কি কিছুই করতে পারিস না?'

সীতার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কালিবাবু নিশ্চয়ই উইল করে তার বাবাকে বাড়ি আর টাকা দিয়েছিলেন।

আমি বললাম—'তাহলে ত সরকারি দপ্তরে সেই উইলের কপি থাকত। উইল যাঁরা করতে সাহায্য করেছিলেন সেইসব উকিল, সাক্ষী, তাঁরাই বা কোথায় গেলেন?'

সীতা বলল—'কালিদাদু যে কিরকম খামখেয়ালি হয়ে পড়েছিলেন তা ত তোরা জানিস না। হয় ত নিজে হাতে উইল লিখে, কোন অখ্যাত লোককে সাক্ষী মেনে তারপর উইলটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছিলেন।'

এই বিষয়ে আমরা একটা গোপন পরামর্শ সভা বসালাম। স্থির করলাম যে সীতাকে এখন কোন কথা বলে আশা দেওয়া হবে না, কিন্তু আমরা গোপনে-গোপনে নন্দনকাননে গিয়ে লুকোন উইল আর টাকার সন্ধান করব।

বাড়ির আসবাব-পত্র অবশ্য সবই শুনেছি শ্যামবাবু আর রামবাবু বিক্রি করে দিয়েছিলেন। বহুদিন অব্যবহারে দরজা-জানলা ভাল করে বন্ধ হত না। কাজেই আমাদের অনুসন্ধান চালানো কঠিন ছিল না।

কালু আর মালু খুবই উৎসাহের সঙ্গে গোয়েন্দা গিরিতে নেমেছিল। বুলু আর আমি অবশ্য প্রথম থেকেই কিছুটা অনিচ্ছুক ছিলাম। কালিবাবু মারা যাবার পরেই নাকি তাঁর ছেলেরা লোক লাগিয়ে সমস্ত বাড়ি ও বাগান ভাল করে খুঁজে দেখেছিলেন। তাঁরা যদি তখন কিছু না পেয়ে থাকেন, তাহলে এত বছর পরে আমাদের পক্ষে কি কিছু খুঁজে পাওয়া সম্ভব?

কালু বিজ্ঞভাবে বলল—'শুধু লোক লাগালেই যদি সব কাজ হত, তাহলে কি আর কোন ভাবনা ছিল? গোয়েন্দা গিরি করতে হলে বুদ্ধি খাটান চাই!'

আমি বলেছিলাম—'কিন্তু, বুদ্ধি খাটাতেও ত কিছু সূত্রের প্রয়োজন হয় এক্ষেত্রে আমরা অনুসন্ধান করব কিসের উপর নির্ভর করে?'

বুলু ভয়ে ভয়ে বলেছিল—'তাছাড়া, ওটা ত শুনছি ভুতের বাড়ি। কাঞ্চনপুরের মেয়েরা অনেক গুজব শুনেছে!' আগাছায় ভরা বাগান আর অযত্নে শ্রীহীন বাড়িটা দেখে সত্যিই ভুতুড়ে মনে হত।

মালু তার অভ্যাসবশতঃ তার সেই ছোট্ট লাল ডায়রিটাতে অনেক কথা লিখে ফেলেছিল। তার দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে ঐ বাড়িতে গুপ্তধন আছে আর কালিবাবুর অশরীরী আত্মা তাঁর নাতনী সীতার জন্যই সেই ধন পাহারা দিচ্ছে—তাই আর কেউ সেটা খুঁজে পায় নি।

কালু বলল—'তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে তিনি আমাদের কোন সূত্র বলে দিচ্ছেন না কেন? মানুষে না বুঝুক, অশরীরী আত্মা ত বুঝবে যে আমাদের নিজেদের কোন স্বার্থ নাই, আমরা সীতার জন্যই ঐ ধনরত্নের খোঁজ করছি!'

মালু দুঃখিত হয়ে বলেছিল—'যা বুঝিস না, তাই নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করিস না ত! যখনই আমরা ঐ নন্দনকাননে যাই আমি ত বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারি যে আমরা ছাড়াও ওখানে কেউ আছে। চোখে না দেখি, কানে না শুনি, তবু তার উপস্থিতিটা খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারি!'

আমাদেরও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে যেন ঐ পোড়োবাড়িতে কে বা কারা ঘোরাফেরা করছে আড়াল থেকে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

কালু কিন্তু বলে যে পোড়োবাড়িতে ওরকম মনে হয়—ওটা একটা ভ্রম। হাওয়ায় আলগা দরজা জানলার খটখট, গাছপালার খসখস—সব কিছুই যেন ভৌতিজনক হয়ে ওঠে।

মালু আমাদের ডেকে নিয়ে দাদুর বাড়ির ছাদ থেকে রাত্রে হানাবাড়িতে একটা আবছা আলো দেখিয়েছিল, মালুর মতে সেটা ভৌতিক।

কালু বলেছিল—ভূত না হাতি! নিশ্চয় কোন ভিখিরি বা ভবঘুরে খালি বাড়ি পেয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা কিন্তু ঐ বাড়িতে কোন লোক থাকার কোন চিহ্ন দেখতে পাইনি।

তবে হ্যাঁ—দুচার দিন কাকে যেন দেখেছি। কিন্তু একই ব্যক্তিকে যে দেখেছি এ কথা হলফ করে বলতে পারব না। কেমন করে জানি সে আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে যেত এবং অবিলম্বে অন্তর্ধান করত। সে-বা তারা মানুষ না ভূত সে বিষয়ে মালুর মনে সন্দেহ ছিল। একদিন কিন্তু একজনকে দেখেছিলাম যে নিঃসন্দেহে মানুষই। বাড়ির পিছনের গাছের ছায়ায় সে বোধকরি ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমাদের পায়ের শব্দে জেগে উঠে যদিও সে তখনই চলে গিয়েছিল তবু তারই মধ্যে আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছিলাম যে তার লম্বা, দোহারা চেহারা, পরিষ্কার রঙ, সাধারণ পোষাক আর মুখে এমনই গোঁফদাড়ির জঙ্গল যে তার আসল চেহারা বোঝাই মুস্কিল!

বুলু ভয়ে আঁতকে উঠেছিল ও কালু নিজের হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরেছিল। আমার কিন্তু লোকটিকে দেখে গুণ্ডা বা ডাকাত বলে মনে হয় নি বরঞ্চ চেহারার মধ্যে একটা ভদ্রতার ছাপ লক্ষ্য করেছিলাম। আর মালু তার বিষয়ে কত যে কবিত্ব করেছিল তার ঠিক নেই—তার চোখদুটো নাকি ভারি করুণ আর উদাস, তার মুখ দেখেই নাকি মনে হয় যে তার কোন রহস্যময় ইতিহাস আছে, ইত্যাদি আরো কত কি!

* * * *

হঠাৎ একদিন সীতা স্কুলে এসে কালুর হাতে হিসাবের খাতার মতন একটা সরু লম্বা বাঁধানো খাতা গুঁজে দিয়েছিল।

'এটা আবার কিরে?'

কালু খাতাটার পাতা ওলটালো আর আমরা ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলাম।

প্রথম পৃষ্ঠায় কেমন জানি মজার খোঁচা খোঁচা অক্ষরে লেখা ছিল—'শ্রীতপনকুমার চট্টোপাধ্যায়।'

কালু জিজ্ঞাসা করল—'তোর বাবার খাতা কেন স্কুলে নিয়ে এসেছিস?'

সীতা বলল—'খাতাটা হঠাৎ পেলাম। তোরা ত অনুসন্ধান চালাচ্ছিস—এটার মধ্যে যদি কোন সূত্র পাস—'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'এতদিন পরে হঠাৎ এই খাতা কোথায় পেলি?'

সীতা বলল—'বাবার বইপত্তোর গোছাতে গিয়ে খুঁজে পেলাম। কালিদাদুর জিনিসপত্র নিলাম করবার সময়ে তাঁর ছেলেরা এসব পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবা ততদিনে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন বলে এগুলি পান নি।'

কালু ব্যস্ত হয়ে বলল—'তার মধ্যে আর কিছু ছিল না? যেমন বাড়ির প্ল্যান বা ম্যাপ-জাতীয় কিছু?'

ঘাড় নেড়ে সীতা বলল—'না, কেবল দুচারখানা বই, এই খাতাটা আর কয়েকটা ব্যক্তিগত চিঠিপত্র।'

আমি বললাম—'খাতাটা ঠিক তোর বাবার ত?'

'নিশ্চয়, দেখনা কালিদাত্থর হাতে বাবার নাম লেখা রয়েছে—'

'তোর কালিদাত্থর হাতের লেখা? ঠিক জানিস?'

সীতা হেসে বলল—'এরকম লেখা কি চিনতে ভুল হতে পারে?'

আমরাও হেসে ফেললাম। সত্যিই লেখাটা ভারি অদ্ভুত।

মালু বলল—'মলাটের পাতায় অত কি দেখছিস? খাতাটা খুলেই দেখনা ওর ভিতর কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা।'

কালু খাতাটা খুলতেই আমরা সবাই তার উপর ঝুঁকে পড়লাম। প্রথম দুতিন পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে একটা ছোট পদ্য পাওয়া গেল, এও সেই রকম মজার খোঁচা খোঁচা অক্ষরে লেখা।

কালু জোরে জোরে পড়ল—

'বুদ্ধির অসাধ্য কিছু নাই ত্রিভুবনে,
সকলে সম্মান করে বুদ্ধিমান জনে।
কেন বৎস ম্লান হেরি বদন তোমার?
বুদ্ধিবলে নিজ ধন কর না উদ্ধার।'

উত্তেজনায় মালু চেঁচিয়ে উঠল—'বলেছিলাম না! বলেছিলাম না! নিশ্চয় সীতার বাবাকেই সীতার কালিদাত্থ সব টাকা দিয়ে গেছেন। নিশ্চয় এই খাতার মধ্যেই তার সূত্র পাওয়া যাবে!'

আমরাও কম উত্তেজিত হই নি। কিন্তু সীতা বলল—'সে কথা ত কালিদাত্থ মাকে অনেকবার বলেছিলেন। অথচ তিনি মারা যাবার পরে উইল বা দানপত্র জাতীয় কিছুই পাওয়া গেল না, সে-সব কোথায় থাকতে পারে তারও কোন সূত্র পাওয়া গেল না।'

কালু খাতার পৃষ্ঠা ওলটাতে লাগল। দুই পাতা বাদ দিয়ে আবার একটা কবিতা।

কালু জোরে জোরে পড়ল :—

'নন্দন কানন শোভা মনোরম কিবা,
দিবা নিশি দেখি বসি সব কাজ ছাড়ি,
প্রস্ফুটিত ফুলদল কিবা মনোহর।
তাহাদেরই মাঝে আমি এ-জীবন যাপি,
সঙ্গি মম লতা গুল্ম সঙ্গি মম গাছ,
এ-নির্জন বাসে মোর খেদ নাই মনে,
প্রকৃতির রূপে তৃপ্ত আমার অন্তর।
রূপে মগ্ন নিদ্রা মোর, রূপে পূর্ণ জাগা,
প্রকৃতির রূপে চক্ষু মুগ্ধ হয়ে আছে,
তাই মোর কাছে বিশ্ব এমন সুন্দর।
নাগরিক জীবনের কাঁদা আর হাসা,
অনায়াসে তাই আমি ভুলে যেতে পারি।
ঋতুতে ঋতুতে নব রূপ দেখি তাই,
কি প্রভাতে কি সন্ধ্যায় মনোহর অতি।
এই মোর জীবনের দৈনিক লিপিকা
আমার লেখনী যেন রূপস্রষ্টা তুলি,
দুই চোখ ভরে দেখি প্রাণ ভরে আঁকি,
কত তার রূপ-রেখা কত তার রং
ফোটাতে পারি বা কত পারি না কতক,
নন্দন কানন মোর পরম সুন্দর।

সীতা বলল—'শুনেছি যে সত্যিই কালিদাত্থ শেষজীবনে সব কিছু ছেড়ে এই নন্দনকাননের বাগান নিয়েই দিন কাটাতেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবাও!'

কালু আবার এক-এক করে পাতা ওলটাতে লাগল কিন্তু আর কোন কিছু লেখা ছিল না খাতায়।

মালু বলল—'হয়ত ঐ কবিতাগুলোর মধ্যেই কোন সাংকেতিক ভাষায় গুপ্তধনের সন্ধান দেওয়া আছে।'

কিন্তু বহু মাথা ঘামিয়েও আমরা পদ্য দুটির মধ্য থেকে কোন সাংকেতিক ভাষা উদ্ধার করতে পারলাম না।

এরপর আমরা সুযোগ পেলেই নন্দনকাননে গিয়ে খোঁজাখুঁজি সুরু করে দিলাম, কিন্তু কোথায় কি ভাবে এবং কি খুঁজব সেটা সঠিক জানা না থাকায় আমাদের সব অনুসন্ধান ব্যর্থ হল। ক্রমে আমরা খোঁজা বন্ধ করলাম এবং শেষে এসব কথা ভুলেও গেলাম। ঠিক এই সময়েই কাঞ্চনপুর সমাচারের প্রভাকর নন্দনকাননের রহস্য প্রবন্ধ লিখলেন। তারপরে কি হল সেটা ত আগেই বলেছি।

* *

স্কুলে ফিরে এসে প্রথম সুযোগেই আমরা—গণ্ডালুদল—একটা গোপন বৈঠক করলাম।

কালু জিজ্ঞাসা করল—বল, এর পরে কি করা যেতে পারে?

বুলুর ত প্রথম থেকেই এক কথা—কিছু করিস না—পুলিশে খবর দিয়ে দে!

আমি বললাম—'পুলিশে খবর দিবি কিরে! যতদূর বোঝা যাচ্ছে যে ওখানে আড্ডা গেড়েছে শ্যামবাবুর দল। সীতার বাবার নামে যদি কোন উইল না থাকে তাহলে ওরাই ত বাড়ির মালিক। ওদের বাড়ি ওরা ভেঙ্গে ফেললেই বা কে কি করতে পারে?'

মালু আনমনা ভাবে বলল—'কখনই তা পারবে না, তোরা দেখে নিস! কালিবাবুর আত্মা নিশ্চয় তাঁর প্রিয় নন্দনকাননকে রক্ষা করবে!'

কালু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল—যতদিন কালিবাবুর লোকেরা ওখানে ঘোরাফেরা করছে, ততদিন আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। সীতাকেও বলতে হবে।

* * *

আমরা তাকে কিছু বলবার আগেই পরদিন সীতা আমাদের চুপিচুপি বাগানের পিছনে ডেকে নিয়ে বলল—'জানিস, কাল রাত্রে আমাদের বাড়ি অদ্ভুত এক চুরি হয়ে গেছে!'

—চুরির আবার ভাল আর অদ্ভুত কিরে?

—অদ্ভুত বলব না? চোর এসে টাকা-কড়ি, গয়নাগাঁটির খোঁজ না করে কেবল কাগজ-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে কেন? বই-খাতা ছড়িয়ে ফেলে কেবল কালিদাদুর লেখা চিঠি কখানা নিয়ে গেছে!

আমাদের মুখে আগের দিনের ঘটনাগুলি শুনে সীতা চোখ গোল গোল করে বলল—'ও, এইবারে বুঝেছি! কাল বিকেল থেকে কেবল খবরের কাগজের রিপোর্টাররা দিদাকে আর আমাকে বিরক্ত করছে! একেবারে সব নাছোড়-বান্দা!'

—সত্যি রিপোর্টার ত তারা? ব্যাজ দেখিয়েছিল?

সীতার আবার অবাক হবার পালা।

সে বলল—ব্যাজ আবার কি? ওসব দেখতে চাইনি ত!

কালু গলা নামিয়ে বলল—চাইবিও না। যদিও ওরা অধিকাংশই নকল রিপোর্টার—তবু ওদের বুঝতে দিস না যে ওদের সন্দেহ করছিস। আর—সেই খাতাটার কথা ভুলেও বলবি না!

পরদিন ছিল রবিবার। স্কুল থেকে অনুমতি নিয়ে আমরা দাদুর বাড়ি সারাদিন কাটাতে গিয়েছিলাম। ভোর থেকেই চারজনে চিলে কোঠায় জড় হলাম। পালা করে দু-একজন বাইনোকুলার দিয়ে নন্দনকাননের উপর

দূর থেকে নজর রাখছি—দুএকজন সেই রহস্যময় খাতাটার মর্মোদ্ধার করবার চেষ্টা করছি। এতরকম খামখেয়ালি কাজ আমরা করে থাকি যে দাদু বা অণিমাদি একটুও আশ্চর্য হন নি। কেবল ঘনশ্যামদা যখন স্নানের জন্য তাড়া দিল, তখনই, লক্ষ্মী মেয়ের মতই এক এক করে স্নান সেরে নিলাম।

এতদূর থেকে অবশ্য নন্দনকাননে কি-ঘটছে-না ঘটছে সেটা বাইনোকুলার দিয়েও ভাল করে বোঝা যায় না। শুধু এইটুকু বুঝলাম যে সেখানে কিছু লোকজন ঘোরাফেরা করছে।

এদিকে কালু সকাল থেকে খাতাটা পরীক্ষা করছে। পাতলা ছুরি দিয়ে সে মলাট দুটো একটু চিরে দেখল তার ফাঁকে কিছু লুকোন আছে কিনা। সন্তর্পণে সে খাতার পাতাগুলো গরম করল, জল বুলোল, এ্যালকোহল মাখাল—যদি কোন গোপন লেখা ফুটে বেরোয়, সেই আশায়।

তারপর সে নিশ্চিন্তভাবে বলল—নাঃ, ওখানে কিছু নেই, যা কিছু রহস্য আছে সব ঐ কবিতাটার মধ্যে। আবার সেটাই দেখি ভাল করে।

প্রথমেই আমরা কবিতাটার প্রত্যেক লাইনের প্রথম অক্ষরগুলি পড়লাম—ন-দি-প্র-তা-স······নাঃ এর ত কোনই মাথামুণ্ডু নেই!

তারপর প্রত্যেক শব্দের প্রথম অক্ষর নিলাম—ন-কা-লো-ম-কি—এও ত একেবারে আবোল তাবোল!

বুলু বলল—কবিতার উল্টোদিক থেকে, মানে তলার দিক থেকে পড় ত দেখি?

কালু পড়ে গেল—ন-ফো-ক-দু···দূর-দুর যত হিজিবিজি!

মালু বলল—রঙ্গলাল দা যে চিঠিতে লুকোন মণিমুক্তোর খবর জানিয়েছিল, তাতে প্রত্যেক শব্দের দ্বিতীয় অক্ষর ব্যবহার করেছিল। (জমিদার বাড়ির রহস্য—সন্দেশ ভাদ্র আশ্বিন—১৩৭১)।

এখানে কিন্তু তাতেও ভাল ফল পাওয়া গেল না। এমন কি ১৩৭৫এর পূজোর সন্দেশের প্রতিযোগিতার মতন প্রথম অক্ষরের পর একটা অক্ষর বাদ, দ্বিতীয়ের পর দুটো বাদ এর ভাবে হিসাব করতে গিয়ে আরো উদ্ভট কম ব্যাপার দাঁড়াল!

সবাই যখন আমরা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি, হঠাৎ মালু উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল—দেখ্ ত দেখত—প্রত্যেক লাইনের শেষ অক্ষরগুলো পর পর বসিয়ে দেখত।

কালু মনে মনে তিনচারটা লাইন পড়েই চেঁচিয়ে উঠল—আরে, আমরা কি বোকা রে, এত সোজা সংকেতটা কি বলে এতক্ষণ ধরতে পারি নি!

এবারে আমরা সবাই মিলে প্রত্যেক পংক্তির শেষ অক্ষরটা পড়লাম আর মালু তার ছোট্ট লাল ডায়রিতে সেগুলি পর পর লিখে নিল:—বা-ড়ি-র—পি-ছ-নে-র গা-ছে-র—সা-রি—ই-তি—কা-লি-কি-ং-ক-র।

আমরা সবাই জানি যে নন্দনকাননের বাড়ির পিছনে একটা ছোট মাঠ আছে, গাছপালাও আছে। ঠিক এক সারি গাছ কি? মনে করতে পারলাম না। তবে, এটা মনে পড়ছে যে সেখানে নানারকম গাছ আছে, যেমন আম গাছ দেবদারু গাছ আবার কিছু কিছু ফুলগাছ।

আর কি আছে সেখানে? মাটিতে পোঁতা গুপ্তধন?

—আমরাই কি সেগুলো খুঁজে বার করতে পারব?

মালু ত তখনই রওনা হতে প্রস্তুত। চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে সে বলল—দেখ্, দেখ্, এখন ওখানে কেউ নেই—চল্-না আমরা একবার ঘুরে আসি।

বুলু ব্যস্ত হয়ে আপত্তি জানাল। আমিও তেমন উৎসাহ প্রকাশ করলাম না।

আমাদের সকলের কথা শুনে নিয়ে কালু ভেবে চিন্তে জবাব দিল—ওরা সীতাদের উপর নজর রাখতেই ব্যস্ত এখনও আমাদের কোন সন্দেহ করছে না। আমরা নাহয় ভাণ করব যে 'কাঞ্চনপুর সমাচার পড়ে' ভূতের বাড়ি দেখতে এসেছি।

•

দাদুর বাড়ি বেলা ১১টার মধ্যেই ভাত খাওয়া হয়ে যায়। খেতে খেতে মালু বলল—দাদু, আমরা কিন্তু খেয়ে উঠেই বেড়াতে বেরোব। ক—ত দি—ন যে বেরোই না!

কৃত্রিম দুঃখের সঙ্গে দাদু বললেন—তাই ত দিদিমণিরা! তি···ন সপ্তাহ কেটে গেছে, লম্বা পাড়ি জমানো হয় নি। কোনদিকে যাবে আজ?

তাঁর প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে মালু গাল ফুলিয়ে বলল—'যান, অমন করলে আপনার বাড়ি আসবই না।'

সবাই হেসে উঠল। আর অণিমাদি ঘনশ্যামদাকে বললেন যেন আমাদের জন্য কিছু জলখাবার গুছিয়ে দেয়।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম—খাবার কি হবে? আমরা ত ঘণ্টাদুই ঘুরেই চলে আসব।

কিন্তু কালু ইসারায় আমাকে চুপ করতে বলল। আমাদের ঘোরাফেরা নিয়ে মাঝে মাঝে বকবক করলেও, ঘনশ্যামদা যা চমৎকার খাবার তৈরি করে আমাদের জন্য, তার কোন তুলনা হয় না!

ঝোলাঝুলি নিয়ে আমরা ত দেখতে দেখতে প্রস্তুত!

কালুর ব্যাগে না আছে কি? বাইনোকুলার, টর্চ, ছুরি, দড়ি, খাতা, পেনসিল, এমন কি সাধারণ প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিস পর্যন্ত। বেরোবার সময় অণিমাদি মনে করিয়ে দিলেন—ছাতা নিতে ভুলো না কিন্তু, বৃষ্টি হতে পারে।

আমরা লম্বা লম্বা পা চালিয়ে কাঞ্চনপুরের রাস্তা দিয়ে পশ্চিমদিকে—মানে নন্দনকাননের দিকে রওনা হলাম। আগেই ত বলেছি যে এই রাস্তাটা খুব নির্জন। আর নন্দনকাননের কাছটা ত একেবারে জনমানবহীন, কেবল পাথর, ঝোপঝাড় আর বড় বড় গাছে ভরা। রাস্তার উত্তর দিকে তবু দাদুর বাড়ির কাছাকাছি কিছু ধানক্ষেত ইত্যাদি আছে, কিন্তু দক্ষিণদিকটা সম্পূর্ণ রুক্ষ, অনুর্বর, কাঁটাঝোপ আর খোয়াই-ভরা (তাই জন্যই অবশ্য দাদুর বাড়ির ছাদ থেকে বাইনোকুলার দিয়ে সোজা নন্দনকানন দেখা যায়)। ঠিক আগের দিনের মতন নন্দনকাননের কাছাকাছি পৌঁছে আমরা রাস্তা থেকে নেমে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে একেবারে বাড়ির ফটকের সামনে চলে যাব মনে করেছিলাম। কিন্তু, একটু দূর থেকেই দেখতে পেলাম যে সেইদিনের দেখা লোকগুলি আবার বাড়ি থেকে বেরোল। আমাদের দিকে তাকিয়ে তারা কি যেন বলাবলি করল—শুনতে পেলাম না।

চাপাস্বরে কালু বলল—বাইনোকুলার নামিয়ে ফেল—! বুলু ভয়ের সঙ্গে বলে উঠল—ওমা—কি হবে—আমাদের দেখে ফেলল যে!

—দেখলই বা—কত লোকে রাস্তা দিয়ে যায়। ওরা ত আর আমাদের চেনে না—সন্দেহ করবার কোন কারণ নাই।

তবু বুলুর ভয় আর যায় না!

শেষে আমি বললাম—এত কাছে এসে এখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেই বরং বেশি সন্দেহ করবে। তার চেয়ে আমরা চল্ কিছুই হয়নি এমন ভাবে সোজা রাস্তা দিয়ে গল্প করতে করতে এগিয়ে যাই—ওদের দিকে তাকিয়েও দেখব না।

কথাটা মালুর ভাল লাগল, সে বলল—যার যত মজার গল্প জানা আছে সব বলতে থাক। খুব হাসতে হাসতে যেতে পারি যেন।

'হাসব কিরে ? ভয়ে আমার হাত-পা যে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে !' মুখে একথা বললেও, কার্যতঃ বুলুও আমাদের এই মজার খেলায় যোগ দিল, হাসির গল্প শুনল, হাসল, এমন কি নিজেও বলল।

আমরা বাড়িটা পার হয়ে ১০০ গজও যাই নি, এমন সময়ে ঝাউতলা যাবার বাস এসে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন ফিরে দেখতে সাহস হল না। মিনিট খানেক পরে তাকিয়ে দেখি যে রাস্তায় জনমানুষ নেই।

আমি বললাম—এ বেশ চমৎকার হল। আমরা স্বচক্ষে দেখলাম যে লোকগুলি ঝাউতলা চলে গেল।

কালু বলল—ঠিক বলেছিস, চল এবার নিশ্চিন্ত মনে নন্দনকাননের ভিতর একটু ঘুরে ফিরে দেখি।

বুলুর মৃদু আপত্তি অগ্রাহ্য করে আমরা এবারে প্রায় ছুটতে ছুটতে আবার নন্দনকাননে ফিরে এলাম। যদিও জানি কেউ কোথাও নেই, তবু কেন জানি না আমাদের এই বহু পরিচিত বাড়িতে ঢুকতেও ভয় ভয় করছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল কে যেন দেখে ফেলবে !

কালু বলল—দেখলই বা—তাতে কি হয়েছে ? এটাত কত বছর পোড়োবাড়ি হয়ে রয়েছে। আমরা যদি এখানে একটু বেড়াতে আসি, তাতে কার কি আপত্তির কারণ থাকতে পারে ?

আগে যখন নন্দনকাননে এসেছি, তখন অধিকাংশ দরজা জানলা খোলা পেয়েছি। পুরোন হয়ে গিয়ে সেগুলি ভাল বন্ধ হত না। এবারে কিন্তু সামনের সব দরজা জানলা বন্ধ করা হয়েছে দেখলাম। আমরা আর ঠেলাঠেলি করে দেখলাম না দরজা খোলা যায় কিনা, পাশ দিয়ে ঘুরে একেবারে বাড়ির পিছনের বাগানে চলে গেলাম।

বাড়ির সামনে এককালে কাঁকড়ের রাস্তা ছিল, ইঁটের সারি লাগানো কেয়ারি ছিল, এখন অযত্নে সব খারাপ হয়ে গেছে। বাড়ির ঠিক পিছনেও মনে হয় যেন একটা কাঁকড়ের রাস্তা ছিল, তারপরেই একটা এলোমেলো গাছের সারি। সবচেয়ে পিছনে একটা মাঠ একেবারে দূরের পাঁচীলে গিয়ে মিশেছে। এককালে হয়ত এখানে সুন্দর বন ছিল, এখন চোরকাঁটা আর ঝোপ-ঝাড়-আগাছায় ঢেকে আছে। আমাদের বহুবার দেখা এই গাছগুলি আবার আমরা নতুন কৌতূহল নিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলাম।

মালু অনেক গাছ চেনে, বুলুও কিছু কিছু খবর রাখে। কিন্তু কালু আর আমি এ-বিষয়ে একেবারে আনাড়ি। তবু আমরা কেউই এই গাছগুলোর মধ্যে কোন রহস্য বা কোন সূত্র দেখতে পেলাম না। পূর্ব থেকে পশ্চিমে এক সারিতে প্রায় ১৩।১৪টা গাছ রয়েছে, তাদের তলায় বড় বড় ঘাস আর ঝোপ গজিয়েছে। মধ্যে মধ্যে দু একটা ফাঁক আছে, সেখানে আগে অন্য গাছ ছিল কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

কালু একটা বড় লাঠি নিয়ে প্রত্যেক গাছের তলায় চারদিক দিয়ে খোঁচা মেরে দেখল। কিন্তু কোথাও কোন গোপন দরজা, সুড়ঙ্গ অথবা পাথরের সন্ধান পাওয়া গেলনা, যার তলায় গুপ্তধন থাকতে পারে।

কোন সূত্র না পেলে বাগানের এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত খুঁড়ে দেখা কি আর সম্ভব ?

মালু বলল—হয়ত সেই খাতার মধ্যেই আরো সূত্র আছে। হয়ত ঐ পদ্যটাই আরো ভাল করে পড়ে দেখলেই আমরা বুঝতে পারব কোন গাছটা আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

হঠাৎ বুলু ফিসফিস করে বলে উঠল—কে যেন আমাদের লক্ষ্য করে দেখছে—আমার বড় ভয় করছে। আমরা সত্যিই বড় বেশি চেঁচামেচি হৈ চৈ করছিলাম। বুলুর কথায় হঠাৎ চুপ করে গেলাম।

কালু চাপাস্বরে বলল—ভয় পাবার কোন কারণ অবশ্য নাই। তবু, এসব ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকাই ভাল।

কিন্তু আমরা চারিদিকে বারবার তাকিয়েও কোথায় সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেলাম না।

মালু উদাসভাবে বলল—এই বাড়িটাতে ওরকম মনে হয় রে! আগেও ত আমাদের বারবার মনে হয়েছে কে যেন আমাদের দেখছে! হয় ত সত্যিই দেখছে—কিন্তু আমরা ত আর তাকে দেখতে পাব না!

এসব কথাতে কালুর মন ছিল না, সে তখনও গাছগুলো ভাল করে দেখছিল।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি বললাম—পশ্চিমের ঐ লম্বা সাদা গাছটা আমার ভারি সুন্দর লাগে, কেমন ঝিরঝিরে পাতা!

বুলু বলল—একটা পাতা ছিঁড়ে একটু শুঁকে দেখ্—আরো ভাল লাগবে। এই গাছটা চিনিস না—এটা ত একটা যুকালিপ্টাস গাছ।

মালু বলল—আর তার আগের গাছটা, যেটাতে হলদে হলদে ফুলের থোপা ঝুলে রয়েছে—সেটা হল সোঁদাল, যাকে ইংরাজিতে বলে ল্যাবার্নাম বা ইণ্ডিয়ান ল্যাবার্নাম! কেমন লাঠির মতন ফল হয়েছে দেখ্।

কালু ততক্ষণে বাগানের পূর্বপ্রান্তে চলে গেছে—সে বলল—পূর্বদিকের মস্ত গাছটা আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। এটাকে চিনিস তোরা কেউ? আমি বললাম—'না!'

বুলু বলল—তাও জানিস না? ওটা হল সপ্তপর্ণী। প্রত্যেক পাতায় সাতটা করে ফলক আছে—গুণে দেখ।

আমি বললাম—আর তার আগের গাছটা দেবদারু।

কালু বলল—তার আগেরটা আমগাছ—আমিও তা বলে দিতে পারি। গত বছর ঐ গাছটা থেকে কেমন কাঁচা আম পেড়ে খেয়েছিলাম, মনে আছে?

আরো কতগুলো বড় বড় গাছ ছিল সেই সারিতে। একটা মস্ত বড় ফুলের গাছ—তার নাম মালু বলল নাগকেশর। একটা পলাশ ফুলের গাছ, সেটাকে আমারা সবাই চিনলাম, কারণ, এই অঞ্চলে পলাশফুল খুব বেশি ফোটে, ফাল্গুন চৈত্রমাসে মনে হয় যেন বনের ধারে ধারে আগুন লেগেছে! এ-ছাড়া টগর, করবী আর ফুরুস ফুলের গাছও আমরা সকলেই চিনলাম কারণ আমাদের বাগানে এইসব ফুলগাছ আছে।

একটা গাছ আমরা আর কেউই চিনতে পারছিলাম না।

বুলু বলল যে সেটা ভেরেণ্ডা গাছ।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এই হল ভেরেণ্ডা? যার থেকে 'ভেরেণ্ডা-ভাজার' কথা এসেছে? চলনা, এর ডালপালা ভেঙ্গে নিয়ে যাই, ভেজে দেখি কেমন লাগে!

বুলু বলল—ভাজতে পারিস, কিন্তু ভুল করে আবার খেয়ে ফেলিস না যেন! এটাকে 'ক্যাস্টর' গাছও বলতে পারিস—ক্যাস্টর অয়েল খাসনি কখনও?

—খাইনি আবার! ছ্যা—অতি জঘন্য!—এই গাছও আবার কেউ যত্ন করে বাগানে পুঁতে রাখে!

আরো একটা গাছের পরিচয় আমরা আর কেউ বুঝিনি, এমন কি বুলুও না।

মালু ততক্ষণে তার খাতায় গাছগুলোর নাম টুকে নিচ্ছিল—কি জানি যদি কোন-সূত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে।

আমাদের প্রশ্ন শুনে সে হেসে বলল—ও গোবিন্দর মা, তোমার গাল ফুলল কি করে?

ও-হো—এতো সেই খুকুমণির ছড়া—গালফুলো গোবিন্দর মা—! ওটা বুঝি চালতা গাছ?

কখন যে আকাশ কালো করে মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল, আমাদের কারো খেয়ালই হয়নি! হঠাৎ বড় বড়

ফোঁটায় বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল।

এ-যে দেখছি রীতিমতন ধারাবর্ষণ সুরু হয়ে গেল। অণিমাদি মনে করিয়ে দিলেও ছাতা আনিনি কেউ। আর এত বেশি বৃষ্টিতে ছাতাতেই বা কতটুকু লাভ হত?

বাড়ির একতলার একটা ঘরের বাগানের দিকের একটা জানলা দেখতে পেয়ে আমরা সবাই দৌড়ে গিয়ে সেই জানলা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লাম।

প্রথমেই মালুর ঝোলা থেকে ছোট তোয়ালে বার করে আমরা সকলে মুখ-হাত-মাথা মুছে নিলাম আর চিরুণি বার করে চুল আঁচড়ে নিলাম।

তারপরে কালু তার টর্চ জ্বালিয়ে চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। আগে এই বাড়িটা অযত্নে পড়েছিল, দরজা-জানালা গুলো ভাল করে বন্ধ করা যেত না। দরজা বন্ধ করবার মতন কেউ ছিল না এখানে। এবার লোকজন এসে সব খিল-ছিটকিনি মেরামত করেছে দেখলাম। কোথাও কোথাও বা তালা লাগানো হয়েছে। যাই হোক, আমরা ত বৃষ্টি থামলেই চলে যাব। পরে আবার এসে ঐ পিছনের গাছের সারিতে গুপ্তধন খুঁজব বাড়ির ভিতর আমাদের কিসের দরকার?

হঠাৎ দড়াম করে একটা শব্দ করে বাইরের জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। বুলু একটা চিৎকার করে উঠল আর কালু ছুটে গিয়ে জানলার কড়া ধরে খুলতে চেষ্টা করতে লাগল।

এই কয়েক মিনিট মাত্র আগেই ঐ জানলা খোলা ছিল, ঐখান দিয়ে আমরা সবাই ঘরে ঢুকলাম, এর মধ্যেই এত চেপে জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল কি করে? স্তম্ভিত ভাবটা একটু কাটতেই আমরা সবাই এসে হাত লাগালাম কিন্তু পাল্লা দুটো একটুও নাড়াতে পারলাম না।

বুলু ভয়ে কাঁদতে সুরু করেছিল। কালুর আর আমারও মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একমাত্র মালু দৃঢ়ভাবে বলল—এই বাড়িতে আমাদের কখনই কোন বিপদ হতে পারে না, দেখিস, সব ঠিক হয়ে যাবে একটু পরেই।

আমি কালুকে সাবধান করে দিয়ে বললাম—আমার কাছে কিন্তু বাড়তি ব্যাটারি নেই। দেখিস আবার সেই চেরাপুঞ্জির গুহার মতন অন্ধকারে না পড়তে হয়! (গুণ্ডা ও গণ্ডালু—ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭২)

মালু একগাল হেসে তার ঝোলা থেকে মস্ত বড় একটা মোমবাতি বার করে ঠিক ঘরের মাঝখানে বসিয়ে সেটাকে জ্বালাল। তখনই আমরা আবছাভাবে সমস্ত ঘরটা দেখতে পেলাম, এর আগে কিছু লক্ষ্য করিনি। এবার ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম।

একতলার এই ঘরটা ছিল বাড়ির দক্ষিণে, ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। এর পূর্ব এবং পশ্চিমে দুটো দরজা ছিল, যা দিয়ে অন্য ঘরে যাওয়া যায় এবং উত্তরে আরো দুটো দরজা ছিল, সেগুলো বাড়ির সামনের হলঘরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিল। ঘরের দক্ষিণে, মানে বাড়ির পিছনের বাগানের দিকে ছিল পাশাপাশি দুটো বড় বড় জানলা—যার একটা জানলা দিয়ে আমরা ঘরে ঢুকেছিলাম।

আমরা বৃষ্টির চোটে হঠাৎ জানলা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম তখনও অন্য দরজা জানলাগুলি বোধ হয় বন্ধই ছিল, কিন্তু এমন চেপে বন্ধ ছিল কিনা সেটা লক্ষ্য করিনি।

কিন্তু—এখন দেখি যে ছয়টি দরজা জানলার মধ্যে প্রত্যেকটিই একেবারে চেপে বন্ধ হয়ে আছে—এমন কি যেখান দিয়ে আমরা ঢুকলাম, সেই জানলাও।

ভয়ে ভয়ে আমি বললাম—কেউ কি ইচ্ছে করে আমাদের বন্ধ করে দিয়েছে নাকি?

কালু চাপাস্বরে প্রশ্ন করল—তবে কি সত্যি সত্যিই কেউ আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল ? কে সে ?

ঠিক সেই সময়ে বাইরে কে যেন 'খ্যা-খ্যা-খ্যা-খ্যা' করে হেসে উঠল—এই পূর্বপরিচিত বিশ্রী হাসি! শুনে আমাদের গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল।

কালুর সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি দেখে আমরা আবার নতুন করে চমৎকৃত হলাম।

কিছুই যেন হয়নি এমনভাবে জানলার কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলল—'বাইরে কে আছেন, জানলাটা একটু খুলে দিন না! আমরা বৃষ্টিতে আশ্রয় নিতে গিয়ে আটকা পড়ে গেছি। খুলে দিন—তাড়াতাড়ি খুলুন!'

আবার আমরা বাইরের জানলায় সবাই মিলে ধাক্কা লাগালাম। যে অথবা যারা বাইরে থাকুক—নিশ্চয় আমাদের কথা এবং সেই ধপাধপ শব্দ শুনতে পেল।

কিন্তু কেউ কোন সাড়া দিল না। জানলাও খুলে দিল না। মোমবাতির আলো ছাড়া ঘরে আর কোন আলো নাই। জানলার ফাঁক দিয়ে একবিন্দুও বাইরের আলো ঘরে আসে না। জানলায় কান লাগিয়ে শুনতে চেষ্টা করলাম—বাইরের ঝুপঝুপ বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দও শোনা যায় না।

* * * *

এমনিভাবে কতক্ষণ যে কেটে গেল কে জানে। ঘরের মধ্যে মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম।

ওদিকে বাইরে কি এখনও বিকেল আছে? না সন্ধ্যা? নাকি রাতই হয়ে গেল।

কিছুক্ষণের জন্য আমরা যেন পাথরের মত স্থাণু হয়ে গিয়েছিলাম।

কালুই হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে বলে উঠল—উঃ, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে। বার কর ত—ঝোলাঝুলিতে কি আছে, বার কর তাড়াতাড়ি! নাহলে বুদ্ধিটা মোটেই খুলছে না।

কালুর কথায় আমাদের সকলেরই খেয়াল হল যে সত্যিই খুব খিদে পেয়েছে; ভয়ের চোটে এতক্ষণ বুঝতে পারিনি।

নানা এ্যাডভেঞ্চার করে বেড়ানই আমাদের অভ্যাস। এই জন্য বহুবার বহু বিপদে পড়তে হয়েছে। আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছি যে বিপদের সময়ে কেবলই সেই বিপদের কথা ভাবতে থাকলে বেশি ভয় লাগে। তার চাইতে যদি কিছুক্ষণের জন্য বিপদের কথা ভুলে থেকে হাসি-তামাশা খাওয়া-দাওয়া করা যায়, তাহলে, পরে বুদ্ধি খোলে ভাল।

কালু খাবার কথা বলতে না বলতেই মালু তার ঝুলি থেকে পুরোন খবরের কাগজ বের করে, মোমবাতির চারদিক ঘিরে আমাদের খাবার জায়গা সাজিয়ে ফেলল। ততক্ষণে বুলু আর আমি কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে খাবার বার করে কাগজের প্লেটে রাখলাম—মাংসের সিঙ্গাড়া,—ঘরে তৈরি চকোলেট কেক, সন্দেশ আর চারটে আপেল। তাছাড়া ফ্লাস্কে ছিল গরম কফি। (সত্যি, ঘনশ্যামদার কোন তুলনা হয় না!)

আমাদের অলিখিত আইন অনুসারে আমরা খাবার সময়ে কোন ভয়ের কথা আলোচনা করি না—বিশেষতঃ যদি সত্যি ভয়ের কারণ ঘটে থাকে।

এটা সেটা আলাপ-আলোচনা করতে করতে খাওয়া শেষ করলাম তারপরে কালু জিজ্ঞাসা করল—কটা বাজে?

জিজ্ঞাসা করবামাত্র আমরা সবাই নিজেদের হাতের দিকে তাকালাম, যদিও একমাত্র মালু ছাড়া আর কারো হাতেই ঘড়ি বাঁধা ছিল না।

মালু বলল—এগারোটা !

শুনে বুলু একেবারে আঁৎকে উঠল ! এত রাত হয়েছে ! এখনও আমরা ফিরছি না দেখে নিশ্চয় স্কুলে আর দাদুর বাড়িতে হৈ চৈ পড়ে গেছে ! হয়ত খুঁজতে লোক বেরিয়েছে !

আমি বললাম—নারে, লোক বেরোয়নি, আর সেটাই হল সবচেয়ে বেশি চিন্তার বিষয়। আমরা যে কোনদিকে বেরিয়েছি সেটা কেউ জানেই না ত খুঁজবে কোথায় ?

মালু বলল—শুধু তাই নয়। স্কুলে আমরা দাদুর বাড়ি রাত কাটাবার অনুমতি নিয়েছিলাম আর দাদুকে বলেছি যে বেড়াতে বেড়াতে দেরী হয়ে গেলে সোজা স্কুলেই ফিরে যাব। সুতরাং আজ রাত্রে কেউ আমাদের জন্যে ভাববেও না, খোঁজও করবে না।

বুলু বলল—ওমা, কি হবে ? খোঁজ করবে না ? যদি আমরা এই বন্ধ ঘরে না খেতে পেয়ে মরে-টরে যাই !

কালু বলল—ভাগ্, কাল ত খোঁজ পড়বে। এই যে এত-এত খেলি ! এরপরে একরাত না খেলেই মরে যাবি ?

বুলু হাঁড়িমুখ করে বলল—তাছাড়া আরো কত কি ভয়ের কারণ ঘটতে পারে ত ? এ বাড়িতে গুণ্ডা-ডাকাত দুষ্টু লোক থাকতে পারে ত ?—আর—আর—আর—সেই তারা—সেই খ্যা-খ্যার দল বোমা-বন্দুক নিয়ে আসতে পারে ত ? যেন নামটা উচ্চারণ করতেও বুলুর ভয় লাগছিল।

কালু আবার ধমক দিল—ভীতু কোথাকার !

মুখে বুলুকে ধমকালেও, মনে মনে আমাদের সকলেরই ঐ একই চিন্তা ছিল।

তবু কালু আবার বলল—ও-সব কথা ভেবে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে আয়, সময় নষ্ট না করে ঐ গুপ্তধনের বিষয়েই চিন্তা করা যাক। যদি নিতান্তই গুণ্ডার দল আসে। তাহলে আমরা গুপ্তধনের সূত্র খুঁজে পাব ভাবলে আর তারা আমাদের মারবে না।

আবার আমরা কালিবাবুর লেখা সেই কবিতাটা (মালুর ডায়রি থেকে) পড়তে লাগলাম, বাড়ির পিছনের গাছগুলোর অবস্থান, চেহারা সব কিছু নিয়ে নতুন করে চিন্তা করতে লাগলাম।

কতক্ষণ যে মাথা ঘামালাম কে জানে ! নাঃ—মিছে গলদঘর্ম হওয়া, হয় আমাদের মাথাগুলো আজ ভাল খুলছে না, নয়ত সত্যিই এর মধ্যে কোন রহস্য নেই !

আবার বুলু কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করল—'কটা বাজে ?'

'এগারোটা'—বলে ফেলেই মালু ব্যস্ত হয়ে তার ঘড়িটা কানের কাছে নিয়ে গিয়ে শুনতে লাগল।

কালু বলল—ভাগ ! তখনও বললি এগারোটা, এখনও বলছিস এগারোটা, সাংঘাতিক রকম ভদ্রলোক হয়ে পড়েছিস দেখছি !

আমরা সবাই তার কথায় হেসে উঠলাম।

একহাত লম্বা জিভ কেটে মালু বলল—ঐ যাঃ—আজ তো ঘড়িতে চাবি দিতেই ভুলে গেছি ! এটা হল বেলা এগারোটা !

বুলু ভীতভাবে বলল—এখন তা হলে সত্যি সত্যি কটা বাজল ? রাত একটা-দুটো বেজে গেল কি ?

কালু বলল—ভালই ত। তার মানে রাত কাবার হতে আর বেশি দেরী নাই !

হঠাৎ একটা খুট শব্দে জানালার দিকে ফিরে তাকিয়ে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ আগেও

দেখেছিলাম যে জানলার পাল্লা দুটো একেবারে চেপে বন্ধ করা আছে, আর এখন দেখছি যে সেটা সামান্য একটু আলগা!—হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়লাম। মালুই সেটা সকলের চেয়ে আগে দেখতে পেয়েছিল। জানালার নিচে পড়ে আছে ছোট এক টুকরো সাদা কাগজ। আমরা হলফ করে বলতে পারি যে পাঁচমিনিট আগেও সেটা ওখানে ছিল না। নিমেষের মধ্যে কালু সেটা তুলে নিল হাতে, আর আমরা সবাই তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

কাগজের ঠিক মাঝখানে, সুন্দর হাতের লেখায়, শুধু কয়েকটি কথা লেখা ছিল—'জানলা খোলা আছে—নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যাও—ইতি বন্ধু।'

এবারে কালু একলা ধাক্কা দিতেই জানলা সত্যি সত্যিই খুলে গেল। কি আশ্চর্য!—বাইরে এত আলো কেন? তবে কি সত্যিই রাত কাবার হয়ে গেল?

প্রশ্নটা করেই আমরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলাম। কারণ পূর্বদিকের আকাশ অন্ধকার আর সূর্যাস্তের আভায় পশ্চিমের আকাশ তখনও লাল হয়েছিল।

কোথায় আমরা ভেবেছিলাম যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুঝি বন্দী হয়ে আছি। তা নয় এখনও সবে সন্ধ্যা!

তাড়াতাড়ি সব জিনিসপত্র গুছিয়ে ঝোলা-ঝুলিতে ভরলাম।

কালু তাড়া দিয়ে বলল—পা চালিয়ে চল। তাহলে ঠিক সময়েই হোস্টেলে গিয়ে ঢুকতে পারব, শুধু শুধু বকুনি খেতে হবে না।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ঠিক তখনই একটা কাঞ্চনপুর ঝাউতলা বাস এসে পড়ল। হুড়মুড়িয়ে তাতে চেপে আমরা মিনিট কয়েকের মধ্যেই স্কুলে পৌঁছে গেলাম।

* * *

পরদিন সীতাকে আমরা কিছু বলার আগেই সে চুপি চুপি আমাদের ডেকে নিয়ে, বলল 'জানিস, কাল আবার আমাদের বাড়ি চোর এসেছিল। দিদা এমন ভয় পেয়েছেন যে আমাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়ি বন্ধ করে কলকাতায় তাঁর ভাইয়ের কাছে চলে যাবেন ঠিক করেছেন!'

মালু ব্যস্ত হয়ে বলল—'বারে আমরা তোরই ধনরত্ন উদ্ধার করতে চলেছি—আর তুই চলে যাবি?'

আমি বললাম—'আগে থেকেই ওকে অত আশা দিস না, ধনরত্ন সত্যিই আছে কিনা আর থাকলেও আমরা তা উদ্ধার করতে পারব কিনা, কিছুই ত এখনও জানা যায় নি—।

বুলু বাধা দিয়ে বলল—'তাছাড়া—ওসব গোলমেলে ব্যাপারে আমাদের না থাকাই ভাল ওদেরও চলে যাওয়াই ভাল—শেষকালে যদি সত্যিই কোন বিপদ হয়?'

সীতা কাঁদ কাঁদ ভাবে বলল—'তাহলে, কি করি বল্ ত?'

কালু এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি এবার ভেবেচিন্তে বলল 'তোদের বিপদ হলে অবশ্য আমরা কোন সাহায্য করতে পারব না। দিদার পক্ষে ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু—'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মালু বলল 'কিন্তু, সীতাকে এখন নিয়ে গেলে চলবে কেন? তার চেয়ে দিদা তাঁর বাড়ি বন্ধ করে কলকাতায় চলে যান, আর সীতাকে আমাদের সঙ্গে হোস্টেলে রেখে যান না কেন?

মালুর এই প্রস্তাব আমাদের সকলের ত ভাল লাগলই। বিকালে সীতার মুখে কথাটা শুনে তার দিদারও এত ভাল লেগে গেল যে পরদিনই, মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করে, সীতাকে হোস্টেলে রাখবার সব ব্যবস্থা করে ফেললেন।

বিকেল বেলা আবার আমরা ঘণ্টাখানেকের জন্য বেড়াতে বেরোলাম।—স্কুলের দিনে ত আর লম্বা পাড়ি জমাবার সুযোগ হয় না, স্কুলের কাছাকাছি, মাঠের মাঝখানে একটী ছোট টিপির উপর বসে আমরা বাইনোকুলার দিয়ে নন্দনকাননের দিকে দেখছিলাম আর কথাবার্তা বলছিলাম। আবার দেখলাম যে বাড়িটা বন্ধ আর জনমানবশূন্য।

মালুর এখনও দৃঢ় বিশ্বাস যে ওই বাড়িতে আমাদের কোন বিপদ হবে না, হতেই পারে না!

বুলু রাগ করে বলছিল—ভালয় ভালয় রক্ষা পেয়ে এসে এখনই আবার এত সাহস দেখাচ্ছিস! চব্বিশ ঘণ্টা আগেও আমাদের সকলেরই ভয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

মালু বলল বিপদে পড়েছিলাম, আবার বিপদ থেকে রক্ষাও ত পেয়েছিলাম।

কালু যেন নিজের মনেই বলতে লাগল—সত্যিই ব্যাপারটা রহস্যজনক। প্রথম প্রশ্ন হল—সেই ধূর্তমতন লোকটা কি সত্যিই আমাদের বন্দী করতে চেয়েছিল? কেন? আমাদের সন্দেহ করবার কি কারণ তার থাকতে পারে?

আমি বললাম—লোকটাই দুষ্টু!—কি বিশ্রী তার খ্যা-খ্যা হাসি!!

কালু—দ্বিতীয় প্রশ্ন হল—যদি সে সত্যিই আমাদের কোন কারণে বন্দী করতে চেয়ে থাকে, তাহলে পরে আবার হঠাৎ ছেড়ে দিল কেন?

মালু বলল—'বারে' দুষ্টু লোকটাই যে আমাদের মুক্তি দিয়েছে—একথা তুই মনে করছিস কেন?'

কালু—সে যদি আমাদের না ছেড়ে দিয়ে থাকে, তাহলে কে ছেড়ে দিয়েছিল?—চিঠিটাই বা কে লিখেছিল? এই হল আমাদের তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রশ্ন!

মালু—ওরকম বিশ্রী লোকের কখনও ওরকম সুন্দর হাতের লেখা হতে পারে? তাছাড়া দুষ্টু খ্যা-খ্যা ত আমাদের শত্রু, যে চিঠি লিখেছিল সে হল আমাদের বন্ধু!

কালু—তুই কি বলতে চাস যে কালিবাবুর আত্মাই আমাদের মুক্তি দিয়েছে? সেই কি আমাদের চিঠিও লিখেছে? তোর বিদেহী আত্মা তাহলে চিঠিপত্র লিখতে পারে? কাগজ কলম কোথায় পায়?

মালু রেগে যাচ্ছে দেখে আমি অন্য যুক্তি দেখালাম—'বন্ধু' সই করে যে চিঠিটা লিখেছে তার হাতের লেখার সঙ্গে কালিবাবুর হাতের লেখার ত বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই! নাকি—মরবার পরে মানুষের হাতের লেখা বদলিয়ে যায়?

আমার কথায় বুলু আর কালু হেসে উঠল আর মালু আরো রেগে বলল—'এটা বুঝি হাসির কথা হল!'

কালু তখনই হাসি থামিয়ে বলল—'সত্যিই এটা হাসির কথা নয়, কারণ ব্যাপারটা রীতিমতন রহস্যজনক। অশরীরী আত্মা-টাত্মা অবশ্য আমি বিশ্বাস করি না। নিশ্চয় ঐ দুষ্টু খ্যা-খ্যার দল, আমাদের জব্দ করবার জন্য বা যে কারণেই হোক, বন্দী করেছিল। আর, কোন অজ্ঞাত ভাল লোক এসে আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু রহস্যটা হল, সে সোজাসুজি জানলা খুলে আমাদের সাহায্য করল না কেন? চিঠি-টিঠি ঢুকিয়ে নিজে সরে গেল কেন?

এরপরে আমরা কিছুক্ষণ বসে সেই কবিতা আর গাছপালার রহস্য উদ্ধার করবার চেষ্টা করলাম।

সেই মূল খাতাটা কালুর বাক্সের ভিতর ভাল করে তালা বন্ধ করে রাখা ছিল, সেটা আমরা কখনই সঙ্গে নিয়ে বেরোতাম না। কিন্তু মালুর লাল ডায়রিতে কবিতাটা লেখা ছিল। আমিও একটা কাগজে সেটা লিখে

ব্যাগে রেখেছিলাম, যদিও দরকারের সময়ে সেটা খুঁজে পাওয়া গেল না। বৃথাই মাথা ঘামানো, নতুন কিছুই বার করতে পারলাম না।

* * * *

পরদিন সকালে ডাকের চিঠি বিলি করবার সময়ে কেষ্টদাসী আমাদের ঘরে একটা খাম দিয়ে গেল, তার উপর সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা ছিল—'কালু-মালু-টুলু-বুলু'। খামের উপর কোন টিকিট বা ডাকঘরের ছাপ ছিল না। নিশ্চয় কেউ এসে হোস্টেলের গেটের 'লেটার-বক্সে' খামটা ফেলে দিয়ে গিয়েছিল।

মালু তার ব্যাগ থেকে আগের চিঠিটা বার করল। মিলিয়ে দেখলাম, শুধু যে হাতের লেখা এক তাই নয়, কাগজও ঠিক একই রকম।

এই চিঠিটাতেও কোন সম্বোধন ছিল না, কেবল লেখা ছিল—'কলকাতার লোকেরা আবার কলকাতায় ফিরে গেছে। সুতরাং এখন নির্ভয়ে অনুসন্ধান চালাতে পার। ইতি বন্ধু!'

কে এই বন্ধু? কেন সে বার বার চিঠি লিখছে?

আমি বললাম—সত্যিকারের বন্ধু ত? নাকি সে খ্যা-খ্যার দলেরই কেউ বন্ধু সেজে আমাদের ফাঁদে ফেলাবার চেষ্টা করছে?

মালু—তাই যদি হবে, তাহলে সেদিন সে আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও আবার ছেড়ে দিতে যাবে কেন?

* * * *

পরদিন সীতা স্কুলে এল না, আমরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু বিকেলে যখন সে একেবারে মালপত্র নিয়ে এসে হাজির হল, তখন আমরা ভারি খুসি হলাম। আরো খুসি হলাম যখন তার থাকবার জায়গা হল আমাদের ঘরেই। যদিও সীতা কোনদিন বাড়ি ছেড়ে থাকেনি তবু, আমাদের সকলের দলে পড়ে, হোস্টেলের নিয়মকানুন শিখে নিতে তার দুদিনও সময় লাগল না।

এইসব গোলমালে দিন দুই আমরা আমাদের নন্দন কাননের রহস্যের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর পাইনি। অবশ্য, একেবারেই যে ভুলে গিয়েছিলাম একথা বললে ভুল হবে। মালু আবিষ্কার করেছিল যে স্কুল বাড়ির তিনতলার ছাদের একটা বিশেষ কোণ থেকে, দাদুর বাড়ির পাশ দিয়ে, নন্দন কানন দেখা যায়। রোজ অন্ততঃ সকাল ও বিকেলে দুবার আমরা বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে বাড়িটা দেখতাম। কিন্তু, আবার সেটা যে পোড়োবাড়ি সে-পোড়োবাড়ি হয়ে গিয়েছিল—কোনদিন কারো দেখা পাইনি। হয়ত শ্যামবাবুর দল সত্যিই কলকাতায় ফিরে গিয়েছিল, আর হয়ত রামবাবুরা 'ছোটকর্তার' দল নন্দনকানন নিয়ে মাথাই ঘামায় নি।

মধ্যে মধ্যে আমরা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে বা অবসর সময়ে ঘরে বসে এইসব বিষয়ে আলোচনা করতাম। কিন্তু অনেকদিন ভালভাবে অনুসন্ধান করবার সময়ও পাইনি আর, নতুন কোন সূত্র না পেলে কিভাবে যেখোঁজ করব তাও বুঝে উঠতে পারিনি।

* * * *

হঠাৎ একদিন কালু জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা সীতা, তুই না বলেছিলি যে নন্দনকাননের প্রত্যেকটি গাছ তোর বাবা আর তোর কালিদাদু নিজেরা প্ল্যান করে, কোথায় কোনটা ভাল লাগবে হিসেব করে লাগিয়েছিলেন, কারণ তাঁদের খুব বাগানের শখ ছিল?

সীতা বলল—'মার কাছে সেইরকমটাই ত শুনেছিলাম।'

কালু বলল—একটা মজার ব্যাপার কি তোরা কেউ লক্ষ্য করেছিস? বাড়ির সামনের বাগানে, এমন কি দুইপাশেও সমস্ত গাছই খুব হিসাব করে লাগানো হয়েছে, ঠিক যেখানে যেটি মানায়। কিন্তু, পিছনের গাছের সারিতে সব এলোমেলো ব্যাপার—ফুলগাছের সঙ্গে ফলগাছ বা অন্যগাছ বড় গাছের সঙ্গে ছোটগাছ, সব একেবারে খিচুড়ি পাকিয়েছে। আবার কোথাও তিন-চারটা গাছ একসারিতে পরপর আছে, কোথাও বা ফাঁক রয়েছে—

আমি বলতে গিয়েছিলাম—'হয়ত সীতার মা বাগানের গাছ বলতে সামনের গাছগুলিই বোঝাতে চেয়েছিলেন পিছনে আর কে অত হিসাব করে গাছ লাগায়?

অধৈর্য হয়ে কালু বলে উঠল—'তোরা ব্যাপারটা মোটেই বুঝতে পারছিস না! বাড়ির পিছনে গাছ-পালা যদি নাই থাকত, কিম্বা এ-অঞ্চলের অন্যান্য জায়গার মতন কেবল শাল-পলাশের ছড়াছড়ি হত, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না!—কিন্তু য়ুকালিপ্টাস গাছ, রেড়ি বা চালতার গাছ—এসব ত ইচ্ছা করে না লাগালে, আপনি আপনি হবার মতন গাছ নয়!

মালু উৎসাহিত হয়ে উঠল—তার মানে তুই বলতে যাচ্ছিস যে কোন গাছের পরে কোন গাছটা লাগান হয়েছে তার মধ্যে একটা বিশেষ অর্থ আছে? মানে, রহস্যটা গাছের ডালে বা গাছের তলায় নাই—গাছের নামের মধ্যেই লুকোন আছে? তার মানে তুই একটা নতুন সূত্র খুঁজে বার করেছিস? কি মজা! কি মজা!!

কালু কিন্তু তাকে দমিয়ে দিয়ে বলল—নতুন সূত্র আগে বার করেই নিই, তারপরে লাফাস!

আমি বললাম—এমন ত হতে পারে যে পিছনের গাছের সারি এলোমেলো হয়েছে কেবল সেই খামখেয়ালি বুড়োর খেয়ালে।

মালু—তাহলে সেই বৃদ্ধের খামখেয়ালের পরিচয় বাগানের অন্য কোথাও নেই কেন?

সীতা এতক্ষণ চুপ করে বসে আমাদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনছিল। এক ফাঁকে সে আস্তে আস্তে বলল—গাছের নামগুলি পরপর লিখেই দেখ না, সত্যি সেটার মধ্যে কোন সূত্র পাওয়া যায়, না গাছগুলোর মতন তাদের নামগুলোও এলোমেলো?

কালু 'সাবাশ' বলে তার পিঠ চাপড়িয়ে দিল, মালুকে বলল—'নে-নে, কোন গাছের পর কোন গাছ ছিল ভেবে ভেবে লিখে ফেল তাড়াতাড়ি!'

মালুর সেই লালটুকটুকে ডায়রিতে গাছগুলোর নাম আগে থাকতেই লেখা ছিল। খাতাটা বার করে সে গড়গড়িয়ে পড়তে শুরু করল—পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে—য়ুকালিপটাস, ল্যাবার্নাম, টগর, ফুরুস—আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম—য়ুকালিপটাস আর ল্যাবার্নাম গাছের পরে কিন্তু খানিকটা ফাঁকা ছিল। সেখানে হয়ত অন্য গাছ ছিল, মরে গিয়েছে হয়ত!

কালু বলল—সেটা যখন আমরা সঠিক জানি না, তখন যা প্রত্যক্ষ জানতে পাচ্ছি তাই নিয়েই আমাদের অনুসন্ধান চালান যাক। হয়ত যদি তে লাভ কি?

মালু আবার পড়ে গেল—য়ুকালিপ্টাস, ল্যাবার্নাম, টগর, ফুরুস, করবী, চালতা, ভেরেণ্ডা, নাগকেশর, পলাশ, আম, দেবদারু, সপ্তপর্ণী।

আমরা সবাই মিলে কাগজ পেনসিল নিয়ে হিসাব সুরু করলাম।—প্রথম অক্ষরগুলো নিলে হয় য়ু-ল্যা-ট-ফু ইত্যাদি। শেষ অক্ষর নিলে স-ম-র-স-বী-তা…দূর ছাই; কোন কিছুরই দেখি মাথামুণ্ডু নাই!

কালু বলল আচ্ছা, গাছের নামগুলো পুব থেকে পশ্চিমে হিসাব করত দেখি? বাড়ির দিকে দাঁড়ালে সেটা হবে বাঁ থেকে ডানদিকে। আমরা ত বাঁ থেকে ডানদিকেই লিখি।

মালু আবার হিসাব করে বলল—প্রথম অক্ষর নিলে স-.দ-আ-প-না-ভে···, শেষ অক্ষর নিলে—র্ণী-রু-ম-শ-র-গু।—এত যেন আরো হিজিবিজি! আমি বললাম—ফাঁকগুলোতে কি কি গাছ ছিল জানতে পারলে সুবিধা হত।

কিন্তু কালু মাথা নেড়ে বলল—নারে, ফাঁক ত মোটে তিনটে, তাও বেশি বড় ফাঁক নয়। সূত্রটা একবার ধরতে পারলে, হিসাব করে, ওখানে কি গাছ ছিল আন্দাজে বুঝে নেওয়া যাবে।

* * *

গাছের নামগুলো এমনভাবে আমাদের মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল যে সমস্ত পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে দিনকতক আমরা কেবল সেই বিষয়েই চিন্তা করতাম আর কেবল সবকিছু ভুল করতাম! সুযোগ পেলেই পরস্পরের সঙ্গে কেবল এই বিষয়ে ফিসফিস করতাম আর অন্যান্য বন্ধুদের এড়িয়ে চলতাম। ক্লাসের সব মেয়েরা আমাদের পাঁচজনের উপর চটে গেল, টিচারেরা বকতে সুরু করলেন।

একদিন মালু মণিকাদির ক্লাসে বসে বসেই ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা গাছের নামগুলো যদি বাংলায় না হয়ে ইংরাজিতে লেখা হয়ে থাকে?

কালু উত্তরে বলতে গিয়েছিল য়ুকালিপ্টাস আর ল্যাবার্নাম ত ইংরাজিতেই লেখা আছে—।

কিন্তু মণিকাদি এত ঘনঘন ওদের দিকে তাকাতে লাগলেন যে মালু আর কিছু বলতে সাহস পেল না।

ছুটির পরে আমরা সুযোগ পাবা মাত্র গাছগুলোর ইংরাজি নাম বসাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু একটুও কাজ এগোল না। আমের আর ভেরেণ্ডার ইংরাজি আমরা জানি Mango আর Castor দেবদারুকে Deodar বলা যেতে পারে হয়ত। কিন্তু বাকি গাছগুলো?

আমরা অনেকক্ষণ ধরে ইংরাজি-বাংলা অভিধান ঘেঁটেও সব গাছের ইংরাজি নাম পেলাম না।

আবার, যদি আমরা পুরোপুরি বাংলায় লিখতে চেষ্টা করি তাহলেও মুস্কিল। ল্যাবার্নামের জায়গায় নাহয় সোঁদাল লেখা যেতে পারে। কিন্তু য়ুকালিপ্টাসের বাংলা যে কি হতে পারে তা আমরা ভেবেও পেলাম না আবার অভিধানেও পেলাম না।

পরদিন অণিমাদির বাংলা ক্লাসের প্রথমেই মালু পড়া শিখে না আসার জন্য একটু বকুনি খেল। অবশ্য, আমরা কেউই এ কয়দিন ভালভাবে পড়া শিখতে পারিনি এবং সকলেই বারবার দিদিদের কাছে বকুনি খেয়েছি।

তবু, বাংলা ক্লাসে অণিমাদির কাছে বকুনি খেয়ে মালুর একটু বেশি মন-খারাপ হল।

অণিমাদি বাংলা পড়ান ভারি চমৎকার—একেবারে যেন গল্পের মতন। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে আমাদের পড়ার বই থেকে একটা প্রবন্ধ পড়াবার আগে তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমের গোড়ার কথাটা একটু বলে নিচ্ছিলেন, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনছিলাম আর ঠিক যেন চোখের সামনে পাচ্ছিলাম যে বীরভূম জেলার এক রুক্ষ-শূন্য-প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পালকি করে চলেছেন রবীন্দ্রনাথের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দারুণ রোদে সকলেই শ্রান্ত-ক্লান্ত। হঠাৎ দেখা গেল এক জায়গায়, ডালপালা মেলে স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে মস্ত দুটি ছাতিম গাছ। গাছের তলায় ঘন ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে তাঁদের ক্লান্তি দূর হল। মহর্ষি কৃতজ্ঞচিত্তে ঈশ্বরের ধ্যান করতে বসলেন।

পড়াতে পড়াতে অণিমাদি বলছিলেন—ছাতিম গাছ দেখেছ ত? সুন্দর দেখতে, মস্ত বড় গাছ, প্রত্যেক পাতায় সাতটি করে ফলক আছে বলে এর নাম সপ্তপর্ণী—

হঠাৎ কালু চাপাস্বরে বলে উঠল—ইউরেকা!

সবাই তার দিকে ফিরে তাকাতেই সে থতমত খেয়ে বইয়ের দিকে তাকিয়ে ঝুঁকে পড়ল। কিছুক্ষণ তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে অণিমাদি আবার পড়াতে লাগলেন। এই প্রান্তরটি মহর্ষিকে এমনই মুগ্ধ করেছিল যে তিনি সেটি ক্রয় করে নিয়ে সেখানেই এক আশ্রম স্থাপন করলেন।

আরো কত কিছু বলে গেলেন অণিমাদি—অন্যান্য মেয়েদের প্রশ্ন করলেন, তারা উত্তর দিল। কিন্তু আমাদের কয়েকজনের মাথায় আর কোন কিছুই ঢুকল না। একের পর এক ক্লাস হয়ে গেল। টিচারেরা একে একে এলেন—পড়ালেন—চলে গেলেন। কোন কিছুই কিন্তু ভাল করে বুঝতে পারলাম না।

অবশেষে যখন ছুটির ঘণ্টা পড়ল, তখন যেন আমরা ক'জন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আমবাগানের কিনারে আমাদের প্রিয় সেই গোপন জায়গায় গিয়ে আমরা সবাই মিলে কালুকে চেপে ধরলাম—বল্—বল্—কি সূত্রের সন্ধান পেয়েছিস তাড়াতাড়ি বল।

কালু বলল—ত্মাখ, গাছগুলোর নাম ইংরাজিতে লেখা আছে না বাংলায়, এই ভেবেই আমরা অস্থির হচ্ছি, কিন্তু বাংলাতেই যে কোন কোন গাছের একাধিক নাম আছে, সেটা ত এর আগে ভেবে দেখিনি—

মালু বলল—ঠিক ঠিক, আজ বাংলা ক্লাসেই ত জানলাম যে সপ্তপর্ণী আর ছাতিম হল একই গাছ।

আমি বললাম—তাতেই বা কি লাভ হল? ছাতিম—দেবদারু—আম…এর মধ্যেই বা কি সূত্র পেলাম?

কালু অধৈর্য হয়ে বলল—আমার কথাটা শেষ করতেই দে-ন', তাহলেই বুঝবি। আজ অণিমাদির বাংলা গদ্যর ক্লাসে আমার হঠাৎ ওঁর গতকালকের পদ্য ক্লাসের কথাটাও মনে পড়ে গেল—মনে নেই, উনি কি পড়াচ্ছিলেন?—

'রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে,
নিন্দ বিধুমুখি, তুমি নিন্দ বিধাতারে!'

মনে পড়ে গেল যে অণিমাদি বলেছিলেন রসাল মানে হল আমগাছ। তাই ত আমি 'ইউরেকা' বলে ফেলেছিলাম!

আমি বললাম—তাহলে আমাদের গাছের নামগুলো দাঁড়াল ছাতিম—দেবদারু—রসাল—

বাধা দিয়ে কালু বলল—প্রথম অক্ষরগুলো হিসাব করে দেখ—ছা-দে-র—

মালু উৎসাহের চোটে কালুকে জড়িয়ে ধরল আর সীতা বলে উঠল—'কালু, তুই একটা জিনিয়াস।'

আমি কিন্তু তাদের দমিয়ে দিয়ে বললাম—ছাদের নাহয় একটা কথা হল, কিন্তু তারপর? পলাশ, নাগকেশর আর ভেরেণ্ডা—প-না-ভে—তার মানে কি?

মালু বলল—ভেরেণ্ডাকে অবশ্য আমরা রেড়ীও বলতে পারি যে রেড়ীর তেলে আগেকার দিনে প্রদীপ জ্বালা হত গ্রামে।

আমি—তাতেই বা কি লাভ হল? প-না-রে মানে?

মালু একটু ভেবে বলল—দেখ্, ঐ আম গাছটার পরে কিছুটা ফাঁক ছিল, সেখানে কি গাছ ছিল জানতে পারলে হয়ত একটা কিনারা হত—

হো হো করে কালু হেসে উঠল—'কিনারা ত হয়েই গেল!—তবু বুঝতে পারছিস না? কি-না-রে—পনারে নয় কিনারে—এখনও বুঝলি না? ঐ যে তোরা কি সব গান করিস "রক্তিম কিংশুক কলিকা' সেই কিংশুক কাকে বলে জানিস না? পলাশ-পলাশ—পলাশের জায়গায় কিংশুক বসালেই পাবি কিংশুক-নাগকেশর-রেড়ী—মানে কিনারে। ছাদের কিনারে।

—তাহলে ঐ ফাঁকে আর অন্য গাছ ছিল না?

—থাকবার দরকার কি? একটা শব্দ শেষ হল, তাই বোঝাবার জন্য ইচ্ছা করেই ফাঁক রাখা হয়েছিল নিশ্চয়। আমরা সকলেই বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু একটু পরই আবার দমে গেলাম।

রেড়ী-গাছের পরে আবার কিছুটা ফাঁক ছিল। তারপরে পর-পর আবার চারটে গাছ ছিল—চালতা-করবী-ফুরুস আর টগর। অনেক মাথা ঘামিয়ে এবং অভিধান ঘেঁটেও আমরা এগুলির অন্য কোন নাম পেলাম না।

অথচ চাক-ফুট মানে যে কি হতে পারে তাও বুঝলাম না।

শেষের দিকের গাছ দুটো ছিল সোঁদাল আর য়ুকালিপটাস। অথবা ল্যাবার্নাম আর য়ুকালিপটাস। কিন্তু—যেভাবেই দেখি না কেন, সোঁয়ু অথবা ল্যায়ু, কোনটারই ত মানে বোঝা যায় না!

দেখতে দেখতে আরো একটা সপ্তাহ কেটে গেল। বন্ধুদের হাসি তামাসা আর সহ্য হয় না—তারা বলে—'আবার কি সব জট পাকিয়েছিস যে গণ্ডালুদল? সীতাকে সীলু বানিয়ে এবার পঞ্চালু হলি নাকিরে তোরা?'

আমরা একটু হেসে তাদের সব প্রশ্ন এড়িয়ে যাই। অবশেষে আবার রবিবার এসে গেল। আমরা আবার দাদুর বাড়ি থেকে সারাদিনের জন্য নন্দনকাননে অভিযানে বেরোব বলে ঠিক করলাম।

সীতাকে নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আর কথা কাটাকাটিও হয়ে গেল। সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বুলু ভয় পাচ্ছিল। বলছিল যে আমাদের হাতে পেয়েও খ্যা-খ্যা-গুণ্ডারা ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু সীতাকে সঙ্গে পেলে নাকি কিছুতেই আমাদের ছাড়বে না!

আমি ভয় পাচ্ছিলাম সীতার নিজের জন্য। সত্যিই যদি তার বাবার কিছু গুপ্তধন থাকে, আর তার বাবার যদি খোঁজ না পাওয়া যায়, তাহলে ত সীতাই সব কিছুর উত্তরাধিকারিণী হবে। এরকম পরিস্থিতিতে যদি গুণ্ডারা সীতার কোন ক্ষতি করতে চেষ্টা করে?

সীতা কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল—বারে? তোরা কত এ্যাডভেঞ্চার করিস, কত বিপদে রক্ষা পাস!—আর আমাকে এইটুকু বিপদে রক্ষা করতে পারবি না?

কালু আর মালুর সহানুভূতি গোড়া থেকেই সীতার দিকে। কালু আমাদের জন্য কতগুলি নিয়ম বেঁধে দিল।

(১) সবসময় চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখব।

(২) যতই উত্তেজিত হই, কখনও চিৎকার করে কথা বলব না।

(৩) দরকার হলে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করব।

(৪) একটামাত্র জানলা বা দরজা খোলা থাকলে কখনই সেই ঘরে ঢুকব না।

(৫) কখনই সবাই একসঙ্গে কোন ঘরে ঢুকব না, অন্তত: একজন করে বেরোবার দরজা বা জানলার মুখে পাহারা দেব।

মালু বলল—'আজ ত আমাদের অনুসন্ধান চালাতে হবে বাগানে আর ছাদে। বৃষ্টি-বাদলেরও ভয় নেই যে সেবারকার মতন আশ্রয় নিতে ঘরে ঢুকতে হবে।'

বুলু শিউরে উঠে বলল—ভিজে কাক হলেও ঘরে ঢুকছি নারে বাবা! ঢের শিক্ষা হয়েছে!

কালু তার ঝোলার মধ্যে মোটা একগাছা দড়ি ঢোকাতে ঢোকাতে বলল—'আর নিতান্তই যদি ছাদেই আটকা পড়ি তাহলে এই দড়ি বেয়েই নেমে আসতে পারব!'

বেলা সাড়ে এগারোটার সময়ে আমরা খাবার দাবার ঝোলাঝুলি সহ নন্দনকাননের দিকে রওনা হলাম। বেরোবার সময়ে অণিমাদি বলে দিলেন—বেলাবেলি ফিরতে হবে কিন্তু। সেবার তোমরা বড় বেশি সন্ধ্যা করে ফিরেছিলে।

প্রথমটায় বেশ হৈ চৈ করতে করতে চলেছিলাম আমরা, কিন্তু নন্দনকাননের কাছাকাছি এসে গলার স্বর নিচু করলাম আর তারপর, রাস্তা থেকে নেমে, ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে চুপি চুপি এগোতে লাগলাম।

বাইনোকুলার দিয়ে আমরা সবাই পালা করে দেখছিলাম। হঠাৎ একবার বুলু বলে উঠল—ঐ কে-যেন—কিন্তু, আমরা কাউকে দেখতে পেলাম না!

মালু বিজ্ঞভাবে বলল—'এ বাড়িতে ওরকম মনে হয় রে! আমাদের বন্ধু নিশ্চয় চোখের আড়ালে থেকে আমাদের রক্ষা করেন।'

বাড়ির সামনের দিকে আমরা কাউকে দেখলাম না। মাঝের দরজাটা খোলা ছিল, কিন্তু আমরা সেদিকে পা না বাড়িয়ে সোজা পিছনের বাগানে চলে গেলাম।

ঐ-ত সেই গাছপালার সারি যেগুলো দেখে প্রথমে সম্পূর্ণ এলোমেলো বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু পরে তার মধ্যে একটা সংকেত বাক্য লুকোন আছে বুঝতে পেরেছি। আমরা আবার বাঁ দিক থেকে হিসাব সুরু করলাম—ছাতিম-দেবদারু-রসাল = ছাদের, কিংশুক-নাগকেশর-রেড়ী = কিনারে, চালতা-করবী-ফুরুস-টগর = চাকফুট? তার মানে?

বুলু হঠাৎ বলে উঠল—মনে পড়েছে, ঐ গাছে আমরা লাল লাল ফুল ফুটে থাকতে দেখেছি। করবী না বলে যদি ওটাকে রক্তকরবীর গাছ বলে ধরি—তাহলে হয় চা-র-ফু-ট!

কালু বলল—চার ফুট? হ্যাঁ হ্যাঁ, তার হয়ত একটা মানে হতে পারে।

আমি বললাম—চারফুট কি?

—আরে সেইটুকুই ত এখন আমাদের বুঝতে বাকি। আর সব ত মিলেই গেছে!

মৃদুস্বরে কথা বলতে বলতে আমরা গাছের সারি ধরে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমদিকে হাঁটছিলাম।

টগর গাছের কাছাকাছি এসে বুলু হঠাৎ বলে উঠল—মজা দেখ—ঐ সোঁদাল গাছটার গায়ে কে যেন একটা হনুমানের ছবি আটকে দিয়েছে!

সত্যিই গাছের গায়ে পেরেক দিয়ে একটা ছোট্ট ছবি আটকানো ছিল, খুব ভাল ছবি না হলেও, সেটা যে বাঁদরের ছবি এটা বুঝতে কোনই অসুবিধা হচ্ছিল না।

কিন্তু কেন যে এরকম ছবি কেউ গাছের গায় আটকে দিল সেটাই বুঝতে পারছিলাম না।

বুঝল প্রথমে কালুই। আমাদের নিয়ম ভুলে গিয়ে সে নিজেই চিৎকার করে উঠল—'বুঝেছি, এবারে ঠিক বুঝেছি! সোঁদাল গাছের আরেকটা নাম হল বান্দরলড়ি বা বাঁদরলাঠি। ঐ লাঠির মতন ফলগুলো হয়ত বাঁদরদের খুব প্রিয়!—তাহলে কি হল? বান্দরলড়ি-য়ুকালিপটাস—মানে বায়ু।'

—আমি আপত্তি তুললাম—

'ছাদের কিনারে চারফুট বায়ু?' সে আবার কোন দেশি কথা রে? বাতাসের আবার তিনফুট চার ফুট মানে কি? আর ছাদের কিনারের বাতাসই বা কি রকম? অন্য বাতাসের থেকে তার তফাৎ কি?'

কালু কিন্তু উৎসাহিত হয়ে বলে চলল—ওরে, এ তোদের উনপঞ্চাশ বায়ুর একবায়ু নয়, এ হল বায়ু কোণ! তার মানে উত্তর-পশ্চিম কোণ।

মালু বলল—'ছাদের কিনারের চারফুট উত্তর পশ্চিম কোণ? উত্তর দিক মনে হল বাড়ির সামনের দিক আর পশ্চিমদিক হল কাঞ্চনপুরের দিক। বায়ুকোণ মানে হল বাড়ির সামনের কাঞ্চনপুরের দিকের কোণটা।'

আমি তখনও মেনে নিতে পারছিলাম না—'চারফুট বায়ুর অর্থ ত তবু বোঝা গেল না। বায়ুকোণের চার ফুট দূরে? উপরে? নিচে? তার মানে—'

মালু বাধা দিয়ে বলল—এখানে বসে বসেই কি তার মানে বুঝতে পারব? চল্ না তাড়াতাড়ি ছাদের বায়ু কোণ গিয়ে খুঁজি।'

বুলু ভীতস্বরে বলল—'ওরে বাবা, স্পষ্ট প্রমাণ পাচ্ছিস যে এখানে লোক আছে, আমাদের গতিবিধির উপর তারা নজর রাখছে! তবু কোন সাহসে আবার ঐ বাড়িতে ঢুকবি?'

মালু অধৈর্য হয়ে উঠেছিল—'আর কত দেরী করবি? চল্ না তাড়াতাড়ি!'

কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে কালু বলল—'বুলু ঠিকই বলেছে, আমাদের খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। কিন্তু,

এখন দুপুর বেলা, তাছাড়া, ঘরেও ঢুকছি না, সোজা ছাদের উপর উঠছি। সাবধানে অনুসন্ধান করলে বিপদের কারণ আছে বলে মনে হয় না। এতদূর এগিয়ে সাফল্যের এত কাছে এসে কি আর পেছিয়ে যাওয়া চলে?'

আমরা সকলেই এবার ছাদে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। যদিও আমার মনে ভয় হচ্ছিল যে বাঁদরের ছবি যে লাগিয়েছে সেই নিশ্চয় গুপ্তধন উদ্ধার করে নিয়ে চলে গেছে, অন্যরা সে কথা মানতে রাজি হলনা।

মালু বলল, 'তাই যদি হত, তাহলে সে কখনই বাঁদরের ছবি রেখে চলে যেত না! নিশ্চয়, তার বুদ্ধিতে কুলোয় নি শেষ পর্যন্ত। —তাই—'

কালু চাপাস্বরে বলল—'চুপ। বাড়ির ভিতর ঢুকছি, এখন আর এ বিষয়ে কোন কথা নয়!'

সত্যি আমাদের সকলের যে কি দারুণ একটা ভয়-মেশানো রোমাঞ্চকর, উত্তেজনা হচ্ছিল সে কি বলব! একবার ভাবছি গুপ্তধনের কথা, আবার লুকিয়ে থাকা গুণ্ডার কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠছি!

একতলা বা দোতলার কোন ঘরের দিকে না তাকিয়ে আমরা সোজা সিঁড়ি দিয়ে ছাদের উপর উঠে গেলাম।

কালুর নির্দেশ অনুসারে (পালা করে) আমরা একজন সিঁড়ির কাছাকাছি থেকে সিঁড়ির উপর নজর রাখব, একজন নজর রাখব বাইরের দিকে, আর বাকি দুজন ছাদের বায়ুকোণ অনুসন্ধান করব। পূর্বদিকে কোণার টাওয়ার বাদে, সমস্ত ছাদটা সাদা আর কালো মার্বেল পাথরের টাইলে, ঠিক দাবাখেলার বোর্ডের মতন করে বাঁধানো ছিল।

কালু তার ঝোলা থেকে একটা টেপ বার করে মেপে দেখল যে প্রত্যেকটি টাইল ঠিক একফুট লম্বা এবং একফুট চওড়া। এতে আমাদের কাজটা সহজ হয়ে গেল।

কালু বলল—প্রথমে আমরা ছাদের উপরেই বায়ুকোণে খুঁজব—কিনারা থেকে চারফুট ভিতরে। যদি সেখানে কিছু না পাওয়া যায়, তাহলে চারফুট নিচে, দেয়ালের গায়ও খুঁজে দেখতে হবে।'

এক-দুই-তিন-চার গুণে আমরা চারফুট ভিতরের টাইলটা যেই বার করেছি, কালু চাপাস্বরে বলে উঠল—একি? টাইলটা আলগা কেন?

মালু কাঁদকাঁদ ভাবে বলল—'নিশ্চয় সেদিন আমাদের ঘরে বন্ধ করে খ্যাঁ-খ্যা গুণ্ডার দল সমস্ত গুপ্তধন বার করে নিয়েছে!'

আমি বললাম—তাকি কি করে হবে? ওরা যদি আগেই সংকেতের মর্ম উদ্ধার করতে পারত, তাহলে ত আগেই কাজ সারতে পারত? তাছাড়া, সংকেতটা পাবেই বা কোথায়? খাতাটা ত হোস্টেলে আমাদের কাছে ছিল। সীতাদের বাড়ি হাজার বার খোঁজাখুঁজি করেও ত ওরা কিছু পায় নি।

কালু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—'অত বকবক না করে কাজে হাত লাগা ত দেখি সকলে!'

প্রথমেই সীতা আর মালু টাইলটার চারধারে ভাল করে চেপে চেপে দেখল কোন গোপন স্প্রিং-এর সাহায্যে সেটাকে তুলে ফেলা যায় কিনা।

তা যখন গেল না তখন কালু একটা ছুরির সাহায্যে টাইলটা তুলবার চেষ্টা করতে লাগল। যেই সে একদিক থেকে একটুখানি তুলতে পেরেছে, অমনি সীতা তার মধ্যে কালুর হাতের লাঠিটা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

এরপরে, চাপ দিয়ে, টাইলটা তুলে ফেলা খুবই সহজ হল। আর তুলবামাত্র তার তলা থেকে একটা চ্যাপ্টা মতন এ্যালুমিনিয়মের তৈরি বাক্স বেরিয়ে এল।

ততক্ষণে আমরা পাঁচজনেই সেখানে এসে হাজির হয়েছি তার আগেকার নিয়মকানুন ভুলে গিয়ে আবার সবাই চেঁচামেচি সুরু করেছি !

কালুই বাক্সটা বার করল, কিন্তু নিজে সেটাকে না খুলে সীতার হাতে দিয়ে বলল—'খোল খোল তাড়াতাড়ি খোল—তোরই ত—।

সীতার হাত থরথর করে কাঁপছিল। কোনমতে সে বাক্স খুলে কতগুলি সরকারি চেহারার কাগজপত্র বার করল। যদিও আমরা আইনের ভাষার মারপ্যাঁচ বুঝি না, তবু কাগজটা পড়ে আমাদের একটুও বুঝতে অসুবিধা হল না যে এটাই সেই উইল, যাতে কালিবাবু তাঁর ভাগনে তপন চ্যাটার্জিকে নন্দনকানন নামে বাগান বাড়ি আর আরো কি সব টাকাকড়ি দান করেছেন।

সীতার হাত থেকে কাগজটা মাটিতে পড়ে গেল।

রুদ্ধস্বরে সে বলল—'বাবা ! বাবা ! বাবা যদি থাকতেন !'

হঠাৎ বুলু সিঁড়ির দিকে তাকিয়েই বলে উঠল—'সাধারণ বক্রোক্তিতে ধাবমান নরাধম লুণ্ঠিত কোহিনুর' (মানে—সাবধান। লুকো !)

কিন্তু, বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছিল, তখন আর আমাদের সাবধান হবার বা জিনিসপত্র লুকোবার সময় ছিল না।

সিঁড়ির দরজা দিয়ে ছাদে এলেন আমাদের পূর্বপরিচিত পুলিশ অফিসার শ্রীগণেশ গাঙ্গুলি, (কালুর ভাষায় গোবর গণেশ) আর তাঁর সহকারী শ্রীবিদ্যুৎ বসু (অথবা চাল্যুৎ বসু) এই বাগানে দেখা সেই দাড়িওয়ালা লম্বা ভদ্রলোক এবং দুচারটি পুলিশ।

জমিদার বাড়ির সেই রহস্যময় ঘটনার সময়ে এই পুলিশ অফিসাররা আমাদের একেবারেই আমল দেন নি, অবশ্য শেষ পর্যন্ত দেখা গেছিল যে ওঁরা আগাগোড়াই ভুল সূত্র ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং রহস্যের সমাধান, ওঁদের সাহায্য ছাড়াই আমরা করলাম। সেই থেকে গণেশবাবু আর বিদ্যুৎবাবু আমাদের কিছুটা সমীহ করেন, বিশেষতঃ কালুকে। (সন্দেশ—ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭১)।

গণেশবাবু এগিয়ে এসে বললেন—'সাবাশ, গোয়েন্দা গণ্ডালু, তোমাদের নাম আবার সার্থক হল।'

কালু কিন্তু জেরা করবার ভঙ্গিতে বলল—'আপনাদের খবর দিল কে ? উইল খুঁজে পেয়ে আবার ঢুকিয়ে রেখেছিলেন কেন ?

বিদ্যুৎবাবু হেসে বললেন—ওদের ঠকাতে পারলেন না, মিঃ গাঙ্গুলি। বলে দিন।

এই সব কথাবার্তা হতে হতে সেই লম্বা ভদ্রলোকটি ঠিক আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

গণেশবাবু বললেন—আর কেউ জানবার আগে তোমাদেরই জানা উচিত, ইনিই হচ্ছেন শ্রীতপন চট্টোপাধ্যায়, তোমাদের বান্ধবীর বাবা এবং বর্তমানে এই নন্দনকাননের আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী !

তপনবাবু নামটা উচ্চারণ করতে না করতেই সীতা 'বাবা' বলে তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছিল এবং তিনি তাকে কাছে টেনে নিলেন আর আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন !

বিদ্যুৎবাবু বললেন—'আরো একটা পরিচয় দিই, ইনিই হলেন রহস্যের গল্প লেখক 'প্রভাকর', যাঁর লেখা তোমরা সবাই ভালবাস আর যাঁর লেখা পড়ে তোমরা নন্দনকাননের বিষয়ে এত উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলে।

আমি বললাম—তা কেন, তার আগেই ত আমরা সীতাকে কথা দিয়েছিলাম যে তার গুপ্তধন উদ্ধার করে দেব।

মালু তপনবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—আপনিই বুঝি আমাদের সেই অদৃশ্য বন্ধু ? আপনিই বুঝি

আমাদের সেদিন ঘর খুলে ছেড়ে দিয়েছিলেন ? চিঠি লিখে সেদিন সাহায্য করেছিলেন আর পরদিন উৎসাহিত করেছিলেন ? আর আপনি নিশ্চয় বাঁদরের ছবিটা গাছে আটকেছিলেন ?

তার প্রশ্নের স্রোতে হাবুডুবু খেতে খেতে তপনবাবু হেসে বললেন—'হ্যাঁ-না-হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ ! তোমাদের ঘরে বন্দী করেছিল বড়দার গোমস্তা, আবার ছেড়ে দিয়েছিলও সে নিজেই, কারণ, বড়দা জানতে পারলে খুব রাগ করতেন। আমি আড়ালে থেকে সব লক্ষ্য করছিলাম, কিন্তু সে আমাকে দেখেনি। যখন দেখলাম যে ছাড়া পেয়েও তোমরা বেরিয়ে আসছ না, তখন খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর চিঠি ফেললাম।

সীতা এতক্ষণ পরে প্রথম কথা বলল।

অভিমানে গাল ফুলিয়ে সে অনুযোগ করল—তুমি এত কাছে ছিলে তবু আমাদের কোন খোঁজ নাওনি কেন বাবা ?

খোঁজ নিইনি কিরে ? সব সময়েই খোঁজ রাখতাম। সম্পত্তি উদ্ধার করবার আগে আত্মপ্রকাশ করব না, এটাই যে আমার প্রতিশ্রুতি ছিল, তাইজন্য খোলাখুলিভাবে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারিনি। তোর বন্ধুদের সাহায্যে আজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা হল ও আজ সোজাসুজি নিজের পরিচয় দিতে পারলাম।

কালু বলল—আপনি কি ইচ্ছা করেই কাঞ্চনপুর সমাচারে সেই প্রবন্ধটা লিখেছিলেন ?

তপনবাবু বললেন—প্ল্যানটা ভাল হয় নি ? তোমরাও নতুন উৎসাহে সুরু করলে বলেই গুপ্তধন আবিষ্কার করতে পারলে ?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আসলে গুপ্তধন কে আবিষ্কার করল ? আপনি, না আমরা ?

তপনবাবু হেসে বললেন—দুজনরাই, তবে পরস্পরের সাহায্য নিয়ে ! আমি ত আর সেই খাতাটা দেখিনি। তবে তোমরা সেদিন যা চেঁচামেচি করছিলে সেটা শুনে এবং তোমাদের কারো ফেলে যাওয়া একটা কাগজে সেই কবিতার একখানা কপি পেয়ে, তবে ত সাংকেতিক বাক্যের মানে বার করতে পারলাম। উইলটা খুঁজে বার করেছি সবে গতকাল, তখনই গণেশবাবু আর বিদ্যুৎবাবুকে দেখিয়ে আবার সেইখানেই রেখে দিয়েছি। একটা মাত্র নাম নিয়ে কেবল তোমাদের সামান্য একটু অসুবিধা হচ্ছে দেখে ঐ বাঁদরের ছবিটা গাছে আটকে দিলাম !

* * * *

ওঃ, কি মজাই যে লাগছে আমাদের, আর সীতার ত কথাই নেই ! দাদুর বাড়ির মতন এবার আমাদের আরো একটা 'বাড়ি' হল, ছুটি কাটাবার জায়গা হল। সন্দেশের গ্রাহক-গ্রাহিকারা যদি কেউ ছুটিতে কাঞ্চনপুরে বেড়াতে এস, তাহলে তোমাদের নন্দনকাননের ছাদের কিনারের বায়ুকোণ থেকে পিছনের গাছের সারি পর্যন্ত সবই ভাল করে দেখিয়ে দেব !

যারা গ্রাহক কার্ড চেয়েছ, সব চিঠি রেখে দিলাম,
আগামী মাসের সন্দেশের সঙ্গে পাঠাব। সঃ সঃ

ডাকাতে কালী

মহাশ্বেতা দেবী

সকাল বেলা উঠেই ভোলার মনে পড়ল আজ ওদের বাড়ি রান্না হবে না। ঘরে ধান নেই বলে কাল দাদার সঙ্গে মা খুব ঝগড়া করেছিল।

—মন্বন্তরে মানুষ পোকামাকড়ের মত মরেছিল মনে নি? কার ঘরে এখন ধান চাল আছে বল দিকি?

মদন জোরে জোরে জাল টানছিল। বড় জাল নয়, খাপলা জাল। তবু খালে বিলে এই চৈতী মরসুমে জল শুকোয়। ল্যাঠা, শোল, কই, মাগুর মাছ ওঠে। জঙ্গলে মেটেআলু হয়। ল্যাঠামাছ আর মেটেআলুর ঝাল রান্না করলে দুটো খাওয়া যায়।

—তোকে বলতেছি একবারটি দুলোঠাকুরের কাছারী যা!

—গিয়ে কি আমার আর দু'খানা হাত গজাবে?

—যেয়ে বল্ গা যা, ঠাকুর, এবার মোদের নাঙল নি, বলদ নি, তোমার ক্ষেত মোরা চষতে পেরিনি তা খাজনা দোব কি?

—উনি একেবারে দয়ার ঠাকুর অমনি মোকে মাপ করে দেবে!

—তা বেবস্তা একটা করবি তো?

—করব!

—কি করবি?

—সে যা হয় করব। খাজনা দেব না।

—খাজনা দিবি না?

—না।

—হাই দেখ সব্বনেশে কথা!

—আমরা কেউ দেব না। খাজনা নিতে এলে জঙ্গলে পেলিয়ে যাব। মন্বন্তরের পর দেশ বলে একেবারে খাঁ খাঁ কত্তেছে আর তোমার দুলোঠাকুর একেবারে কোম্পানীর জুলুম জুড়ে দিয়েছে।

—ধান তো চাইতে পারিস?

—হ্যাঁ, দুলোঠাকুর তোমার জন্যে ধানের মরুই খুলে রেখেছে।

—তবে আন্না হবে কি?

—হরিমটর!

তখন মা খুব বকেছিল দাদাকে। বলেছিল—সোম্সারে মন নি তোর। ভাইটা খেতে পায় না, বোনটা ধুঁকতেছে, তুই যেয়ে সীতে সাজতেছিস!

মদনদের একটা গানের দল আছে। রতন আর ছিদাম রাম-রাবণ সাজে। মদন যখন—রাম আমায় বাঁচাও গো, রাবণ ব্যাটা আমায় ধরে পেলিয়ে যেছে গো! বলে কাঁদতে কাঁদতে গান গায় তখন কদ্দাই গাঁয়ের দুলে পাড়ায় এমন কেউ নেই যে কাঁদে না।

এখন, এই মন্বন্তরের পর গান গেয়েও কিছু মেলে না। আগে আগে পোষলা করবার আগে মদনরা গানের দল নিয়ে বেরোত। বলত

—দুরো ছাই, পোষলা করব কি ডাল আর বেগুন পোড়া দিয়ে?

—নয়তো কি পরমান্ন খাবি?

—খাব তো! মাছ খাব, পরমান্ন খাব, হাঁসের মাংস খাব, দেখিস!

তা বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে ওরা সত্যিই এত এত চাল, গুড়, দুধ, ঘি আনত। ছিদাম জালে আঠা মাখিয়ে বালিহাঁস ধরত, আর রতন দুলোঠাকুরের বড়পুকুরের মাছ চুরি করত।

গাঁয়ের সবাই পোষলা করতে যেত বানঝাটিয়ায় কবরখানার পেছনে। সারসার বান কাটত খোঁড়া নিতাই। ভোলারা উনোন খোঁড়াকে বলে বানকাটা। একেবারে চারটে পাঁচটা বানে হা হা করে আগুন জ্বলত। খেসারী ডাল, কুমড়ো দিয়ে মাছচচ্চড়ি, শোলমাছের আদা-হিং দিয়ে ঝোল, ল্যাঠামাছের অম্বল, বড় বড় বেগুন পোড়া, নতুন গুড়ের পরমান্ন, সে যে কত কি রান্না হত।

এখনো ভাবলে ভোলার মন হু হু করে। আজ কতদিন ভোলা গরম ভাত খায়নি, কতদিন মা দু'বেলা ভাত রাঁধে না। অথচ আগে আগে, ভাত নরম হয়ে গেলে মা হাঁড়ি ধরে পুকুরের জলে চারটি ভাত ঢেলে দিত বলত হাঁস খাবে। গরুর গামলায় চারটি ফ্যানেভাতে দিত। নরম ভাত মা খেতে পারত না। ঝনঝনে ভাত, থালার ওপর লাফাবে তবে মা খাবে।

এখন আর ধান নেই, চাল নেই, বামুনকায়েতরা মা-কে দিয়ে ধান ভানায় না, ভোলা ইঁদুরের গর্ত খুঁজতে মরাইয়ে গেল। ওর বোন টুনির একটা দাঁত আজ পড়ে কি কাল পড়ে এমনি হয়ে আছে। দাঁতটা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে যদি ইঁদুরের গর্তে না রাখো, তাহলে এই বড় বড় মুলোর মত দাঁত গজাবে। বড় দাঁত দেখলে টুনির শাশুড়ী টুনিকে নেবে না।

টুনির বয়স এই পাঁচ কি ছয়। কিন্তু তিন বছর বয়সেই ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। চারখানা গাঁ পেরিয়ে সেই মানকর গাঁয়ে। যে মানকরে বুড়ো নবাব ভাস্কর পণ্ডিতকে কেটেছিল। টুনি অবিশ্যি এখন শ্বশুর বাড়ি যাবে না। অনেক বড় হয়ে তবে যাবে।

তখন টুনিকে পৌঁছুতে ভোলা সঙ্গে যাবে। মাথায় একটা ঝাঁকা চাপিয়ে তাতে চাল নেবে, কাপড় নেবে, তেলের ভাঁড়, দইয়ের সরা, একটা রুই মাছ। নিয়ে গিয়ে বলবে তোমাদের বউ নাও গো!

ওরা বলবে এসো এসো কুটুম এসো। পাত পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাও।

টুনির বর ভোলার চেয়ে এক আঙুল বড়। মাঝে মাঝে ও গরু চরাতে পোচকামিনীর বিলে যায়। পোচকামিনী মানে পশ্চিম গামিনী। গঙ্গা নাকি আগে ওখান দিয়ে পশ্চিম দিকে বইত। তার পর গঙ্গা অন্য-দিকে চ'লে গেল। যে জলটুকু রেখে গেল তারই নাম পোচকামিনীর বিল। সে জলে শালুক ফোটে, পদ্ম ফোটে। কোজাগরী পূজোর রাতে মা লক্ষ্মী এসে ঐ পোচকামিনীর বিলের পদ্মফুলে বসে থাকেন।

বসে বসে দেখেন কোন গাঁয়ে আলো নিবল, নিশুত হল। সবাই ঘুমোলে, সব নিশুত হলে মায়ের প্যাঁচা উড়ে উড়ে সব দেখে এসে বলে এবার চল দিখি।

মা পূজো নিতে যান।

গল্প কথা নয়, তিন সত্যি কথা। ভোলার ঠাকুমা যখন ছোট ছিল, তখন ভোলার ঠাকুর্দার সঙ্গে ঝগড়া করে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে পোচকামিনীর বিলের ধারে লুকিয়ে বসে ছিল।

ভেবেছিল রাত হলে জ্যোছ্‌নায় পথ দেখে দেখে বাপের বাড়ির গাঁ ভাবতায় চলে যাবে। কিন্তু মা লক্ষ্মী বলেছিলেন শীগগিরি বাড়ি যা, তোদের বাড়ি আজ নারকেল নাড়ু হচ্ছে। না গেলে সবগুলো তোর ননদ খেয়ে নেবে।

অমনি ভোলার ঠাকুমা এক ছুটে চলে গিয়েছিল বাড়ি। বলেছিল মা লক্ষ্মী আমায় পেঠিয়ে দিলে। বললে ঘরে নাড়ু হচ্ছে।

সেই পোচকামিনীর বিলের ধারে টুনির বর গোপাল ভোলার সঙ্গে বাঘ-কুমীর খেলে। খেলায় হারলেই ও ভোলাশালা বলে চেঁচাবে। কেউ বকলেই বলবে শুধোও না, ভোলা আমার শালা হয় কি না!

ভোলা একদিন গোপালকে খুব ঠেঙিয়েছিল। মনে করতেই এখন ওর হাসি পেল। ভোলা ধান শূন্যি মরাইয়ে ইঁদুরের গর্ত খুঁজতে গেল।

—সাপের গর্তে হাত দিও নি দাদা! টুনি বললে।

—তুই এখানে আয় না।

—আমি বলে আন্না কত্তেছি।

—কি আন্না কত্তেছিস?

—মা মেটেআলু সিজোতে (সেদ্ধ করতে) বললে আর কলমী শাক।

—মা কোথায়?

—ছুলোঠাকুরের কাছারীতে।

—কেন?

—তাও জান না? ঠাকুরের কাছারীতে কাল ডাকাতরা চিঠি দেছে—ডাকাতি করবে।

—তাই বুঝি?

—জানবে কোত্থেকে? কুম্ভকন্নের মত ঘুমোগে যা! উ দিকে য্যাত মানুষ সবাই কাছারীতে গিয়ে কথা শুনতেছে।

—টুনি, তোর মুখে কি রে?

—জামরুল।

—কে দিলে?

—গোপ্লাটা দিলে? বললে তুই দুটো খা, ভোলাকে দুটো দিবি। ওদের বাড়ি, জানলি দাদা, রোজ ভাত আন্না হয়।

—গোপলা কি রে? বর হয় না?

জামরুল খেতে খেতে ভোলা দুলোঠাকুরের কাছারীতে গেল। দুলো ঠাকুর মুরলী সেনদের নায়েবকে নায়েব, গোমস্তাকে গোমস্তা। মন্বন্তরের পর এ বছর গাঁকে গাঁ শ্মশান হয়ে গেল। নাটোরের রাণীভবানী ছাড়া কেউ খাজনা ছাড়লেন না তবু। জমিদার যদি বাঘ হয় দুলোঠাকুর বাঘের ওপর টাগ। খাজনা আদায় করবেই করবে। মুরলীসেনের বয়স হয়েছে। উনি এখানে থাকেন না। থাকেন কুঞ্জঘাটায়।

দুলোঠাকুর কাছারীবাড়িতে পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজ নিয়ে মহাপ্রতাপে বসে আছে। এই দেশজোড়া দুর্ভিক্ষ, ধানের খেত হা-হা করছে, তা দুলোঠাকুরের বাড়িতে এখনো পাঁচরকম চালের ভাত রান্না হয়। কনকচুড় চালের ভাতের সঙ্গে ঠাকুর নিরিমিষ খায়, বর্ণশালী চালের ভাতের সঙ্গে বোয়াল মাছ, গোবিন্দভোগ আতপের ভাতের সঙ্গে ঘনদুধ। এইরকম সব!

কিন্তু কাছারী অব্দি যাওয়া হল না! ভোলার মা থাকোমণি চেঁচাতে চেঁচাতে আসছিল।

—জমিদারকে বলে দেব, তোমাকে গারদসৈ করাব। আমার থাকবার মধ্যে আছে ঐ ঘরখানা আর একখানা কাঁসার থালা। তা পজ্জন্ত নে' নেবে?

—কে নেবে মা?

—দুলোঠাকুর! ইদিকে ডাকাতের ভয়ে তো কাঁপতেছ। বলতেছ দুলে-বাগ্দীরা যদি আমায় পওরা (পাহারা) দেয় তবে প্রাণে বাঁচি।

—কেন? পওরা দেবে কেন?

—ডাকাত আসবে যে! ঠাকুরকে মা কালীর কাছে কাটবে, ধানের মরুই লুটে নেবে! তা তুমি এখানে কি করতেছ?

—কাছারী যাচ্ছিলাম।

—তা আর যাবে না? একজন তো আমার ওপর রেগে দেশান্তরী হয়েছেন এখন তুমি যেয়ে কাছারীর প্যায়দার লাঠি খাও! আমার সুখের ষোলকলা পুন্ন হোক।

কথা বলতে বলতেই থাকোমণি হালদার বাগানের বেড়া থেকে পট পট করে কয়েকটা উচ্ছে ছিঁড়ে নিল। মা যেন কি! ভাত খায় তার সঙ্গে মানুষ উচ্ছে সেদ্ধ খায়। মেটে আলু আর কলমীশাকের সঙ্গে উচ্ছে? কিন্তু দাদার কথাটা মা কি বললে?

—কে বললে দাদা দেশান্তরী হয়েছে?

মেলা বকিস্‌নে ভোলা!

থাকোমণির থমথমে মুখ দেখে ভোলা অবাক হয়ে গেল। ভয়ও পেল একটু। এখনো মা ইচ্ছে করলে লাঠি ধরে চিতাবাঘ তাড়াতে পারে। মন্বন্তরে গাঁ কে গাঁ উজোড় হয়ে জঙ্গল হয়ে গিয়েছে। চিতাবাঘ এখন মানুষের ঘরের কানাচে ঘোরে। চোর ডাকাতের ভয়ে সন্ধে না হতেই খিল আঁটতে হয় দরজায়।

থাকোমণি একা লাঠি হাতে বসে থাকে আর ঝিমোয়। বাইরে শব্দ পেলেই চেঁচিয়ে ওঠে কে রে?

মার মনে বোধহয় দুঃখ হয়েছে দাদার জন্যে।

কিন্তু বাড়িতে ঢুকতেই দেখা গেল কোথায় দেশান্তরী কোথায় কি! মোহন বসে বসে ছোট কাটারী দিয়ে একটা শোলমাছের গা থেকে আঁশ ছাড়াচ্ছে।

—মাঁছ কি পুড়িয়ে খাবো? থাকোমণি জিগ্যেস করলে।

টুনি বললে—না গো মা, দাদা চাল এনেছে।

—কে চ ল দিলে?

—তাতে তোমার কি? তুমি চাল পেয়েছ ভাত রাঁধ গা! আমি রইতে তোমার ভাবনা কি? চাল দিয়েছে মোতালেক গোলদার।

—তোরে চাল দিল কেন?

—মোরে কি শুধু? অতন, ছিদাম, আমি, সবেরে চ'ল দিলে; তেল-লবণ দিলে। না দিয়ে কি করবে বল্? ডাকাতরা চিঠি দেছে না?

—উনিকেও চিঠি পেঠিয়েছে?

—পাঠায় নি?

—হাই সব্বনাশ গো!

—তোর মুখে শুধু এক কথা! তা, গোলদার বলতেছে তোমরা বাছারা লাঠি সড়কী নে' আমার গোলা পওরা দিও ক'দিন! আমি তোমাদের বরং চাল দেব!

—এ যে অনেক চাল মোহন!

—কম লোব কেন?

—মোতালেক গোলদারের গোলার চাল? এই কনকচুর?

—ড্যাঙাজমিতে চষেছিল তো! তাই জানতে পারিনি!

—মাছ কে দিলে?

—তোমার বেয়াই। গোপলার বাবা। বললে বাপ মোহন মাছটা নে' যাও আর বললে টুনিরে নে যাবে।

—টুনি বসত করতে যাবে কি রে?

—তুমি যেমন মা! তিনি বললে ভোলা আর টুনিরে একন ওনার কাছে রেখতে। বললে আমাদের গাঁয়ে মন্বন্তর হোক যা হোক, এখনো দু'বেলা ভাত হয়। তা আমরা সবাই খাব, তোমার বুন আমার বউ হয়ে না খেয়ে শুকোবে?

—তা টুনি কেমন করে অত্খানি আস্তা হাঁটবে?

—হাঁটবে কেন? উনিকে হ্যাঁ বললে লোক পেঠিয়ে বাঁকে বইসে নে যাবে।

দুলে-বাগদীর ঘরে কে আর পালকী বেয়ারা পাবে বল? অথচ তিনবছরের, চার বছরের পুতুল-পুতুল বরবউকে তো আর হাঁটিয়ে নেওয়া যায় না? তাই ওরা বাঁকে বসিয়েও বউ নিয়ে যায়। একদিকে বউ বসে, অন্যদিকে বর। পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে গিন্নীবান্নীরা বউ ভোলাতে থাকে।

—ও বউ কাঁদিস নি, মোয়া দোব, মুড়কি দোব, পুতুল দোব!

থাকোমণি নিশ্বাস ফেলে বললে—তা নিতে হয় নে' যাক! দুটো মাস খেয়ে পরে বাঁচুক ওরা। আষাঢ় মাসে আউশ হলে তখন নয় টুনিরে নে' আসব।

—সে হবে খ'ন। এখন ক'দিন যাক। আমায় দেখ কাজে কাজে বাইরে রইতে হবে। তুই কি একলা ঘরে থাকবি?

—কেন? রাতে পওরা দিবি, দিনে আসবি নি ঘরে?

—আসব। মা, মাছ অম্বল করিস্। আমি আমড়া পেড়ে দে' যাব।

থাকোমণি চারটি চাল বের করে নিলে। তারপর চালের ধামা তেলের ভাঁড় ঘরের সিন্ধুকে তুলে রাখতে গেল। এক সময়ে সিন্ধুকে বাসনকোসন থাকত। এখন সিন্ধুকের ওপর কাঁথা পেতে থাকোমণি ঘুমোয়। চাল লুকিয়ে না রাখলে সর্বনাশ হবে। মানুষ চেয়ে চেয়ে পাগল করবে আর না পেলে রাতে ঘরে সিঁধ দেবে।

আজ একটা আশ্চর্য দিন বটে। কতদিন উনোনই জ্বলে না। আজ দেখ গরম ভাত, শোল মাছের অম্বল, উচ্ছে-কলমী সেদ্ধ।

থাকোমণি অবিশ্যি ঐ মেটে আলু সেদ্ধই মেখে নিয়ে গরাসে গরাসে খেল। বলল—ভাতে জল ঢেলে ছিকেয় উঠ্যে আখি। তোরা রেতে খাস এখন।

খেয়েদেয়ে, উঠোনে হিজল গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে মোহন বিকেলবেলা উঠে পড়ল। চুল আঁচড়ে, হাতে লাঠি নিয়ে ভোলাকে বলল—ভোলা পুঁটুলিটা দে!

ঐ পুঁটলিতে মোহনের গানের দলে সীতে সাজবার জন্যে পাটের রং-করা চুল, একখানা লাল কাপড়, লাল নেকড়া ফুলের মত কুঁচি দিয়ে সেলাই করে গাঁথা একছড়া মালা এইসব থাকে।

—পুঁটলি কেন দাদা?

—পওরা দেওয়ার কাজ কি নিত্যি হয়? গান গেয়ে দুটো ভাতের বেবস্তা হয় না কি তাও দেখতে হবে তো?

—তবে যে বললি গান শুনে মানুষ কিছু দেয় না?

—যাদের ঘরে হরিমটর তারা দেয় না। যাদের আছে তারা দেয় বই কি? মন্বন্তরে কি সবাই মরে নাকি?

মোহন গান ভাঁজতে ভাঁজতে বেরিয়ে গেল। ঠিক এই সময়ে ভোলার মনে পড়ল তাই তো! টুনির দাঁতের জন্যে ইঁদুরের গর্ত তো খোঁজা হয়নি? কিন্তু এমন সন্ধ্যের মুখে গোলাঘরে ঢোকা ঠিক হবে না। ভোলা ঠিক করল কাল এক সময়ে গর্ত দেখে রাখবে।

—ভোলা, হাঁস দুটো ঘরে তোল্। থাকোমণি পিদীম দেখালে তুলসীতলায়। ঐ তুলসীগাছটা কোত্থেকে বীজ এসে পড়ে আপনা থেকে জন্মেছে। যেদিন থেকে হয়েছে সেদিন থেকে টুনি, ও মা, ঠাকুর গাছ হয়েছে, ঠাকুর গাছে পিদীম দে! বলে আবদার করে।

তাই থাকোমণি পিদীম দেখায় একবার। আজও দেখাল। ভোলা হাঁস ঘরে আনল। ছেলেমেয়েকে ঘরে তুলে দোরে খিল এঁটে থাকোমণি টেকো নিয়ে বসল। ভাল হোক মন্দ হোক একটু সুতো কাটতে পারলে অন্তত তার বদলে নুন-হলুদটা পাওয়া যায়। লঙ্কা, বেগুন, কুমড়ো থাকোমণি চিরকাল উঠোনে আস্তায় (চাষ করে, পোঁতে)। জাল ফেলে, ছিপ ফেলে মাছ ধরে, গুগলী আনে জল সেঁচে।

দরকার হলে গুলতি দিয়ে পাখি মারে, চর থেকে বালি খুঁড়ে কচ্ছপের ডিম আনে।

ভোলার মনে আজ আনন্দ হয়েছে। আজ গরম ভাত হল। দাদা একটা সুখবর আনল যে টুনিকে আর ওকে কয়েকমাস হয়তো টুনির শ্বশুর বাড়ি থাকতে হবে। টুনির শাসুড়ীর অনেক থালাবাসন কিন্তু এখনো ও চোর-ডাকাতের ভয়ে বাসন বের করে না। এতবড় একখানা পেতলের পরাত সোনার মত করে মেজে তাতে ডালভাত

মেখে টুনিদের সব কটা কুচোকাচাকে নিজে হাতে খাইয়ে দেয়। হয়তো ভোলাকেও খাইয়ে দেবে। ভোলা কি টুনির সঙ্গে দইয়ের ভাঁড়ের মত বাঁকে বসে গোপালদের গাঁয়ে যাবে?

ভোলা আর টুনি ঘুমিয়ে পড়বার অনেক পরে সেই পচিমে, যেদিকে তুলোঠাকুরদের কাছারীবাড়ি সেইদিক থেকে যেন একটা হই-হই, গণ্ডগোল শোনা গেল। থাকোমণি বললে—দুর্গা, দুর্গা! তারপর লাঠিটা চেপে ধরে সিন্দুকের ওপর চেপেচুপে বসল।

সকাল বেলা গ্রামে কি হই হই, কি চেঁচামেচি! এমন ডাকাতের কথা কে কবে শুনেছে যে ভৈরবী সঙ্গে নিয়ে ডাকাতি করতে আসে? তাও যে সে ভৈরবী নয়, মা-কালীর ভৈরবী। হাতে ত্রিশূল, কপালে একটা চোখ।

—কে বললে?

থাকোমণি হালদারবাড়িতে গ্রামের পাঁচমাথা যেখানে জটলা করছে সোজা সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। থাকোমণি ও গাঁয়ের মেয়েও বটে, বউও বটে, ও সকলের সামনেই যাওয়াআসা করে।

হালদার কর্তা বললেন—জলজীয়ন্ত দেখা! বল না গো ঠাকুর।

তুলো ঠাকুর কাঁদ কাঁদ মুখে বললে—এই ত্রিশূল হাতে, চুলের জটা উড়তেছে, সঙ্গে তিনটে ষণ্ডাপারা লোক বটে! এক নাপে দাওয়ায় উঠে তিনি বললে মা আমায় পেঠিয়েছে, আমি মা-কালীর ভৈরবী! টাকা চাইনা, ধান চাইনা, আমি তো বেটার বুকে ত্রিশূল বিঁধে মায়ের পূজো করব।

থাকোমণি বলল—এই কথা বললে?

—তবে আর কি বলছি গো থাকোমণি! য্যাতক্ষণ এইসব কথা উনি বলতেছে আর আমি ওনার ঠ্যাং ধরে মেরনি মা, ধরোনি মা, বলতেছি ত্যাতক্ষণে……

—ত্যাতোক্ষণে কি?

—মন্তরের বল গো থাকোমণি! মন্তরে য্যামন মরুইয়ের দোর খুলে গেল। মন্তরে য্যামন ওনার স্যুমুন্দিরা যেয়ে চালের ধামা, চালের ডোল (বড় বেতের পাত্র) নিয়ে আমারি লাল-কালো বলদ দুটো খুলে, গাড়িতে চাপিয়ে নে' চলে গেল?

—তুমি কি করতেছিলে?

—আমার বুকে উনি ত্রিশূল ঠেকিয়ে দেঁড়িয়েছিল।

থাকোমণি বললে—এই মন্বন্তরে মানুষ পোকমাকড়ের মত মরল ঠাকুর! তুমি কারে একমুষ্টি চাল দিলে না, কারেও দেখলে না মুখ তুলে। খাজনা-খাজনা করে এমন পাগল হয়েছ যে কাল বললে, তোর ঘরখানাই কেড়ে লোব। একন ডাকাত ঠেঙিয়ে মারবে, কেড়ে নে' যাবে দেখতেছ?

গ্রামের সবাই বলতে লাগল—এ দেবতার লীলা হে ঠাকুর! তোমার মুনিব মাশায়কে খবরটি জানিয়ে দাও না কেন? ত্রিশূলটা দেখেছিলে ঠাকুর? সঙ্গে আরো শ্মশানের চেলারা ছিল না?

তুলোঠাকুর বললে—তা আমি না হয় মুনিবকে খবর দেব কিন্তু মায়ের কি মাথার ব্যামো হয়েছে? তিনি হলু গে তিভুবনের মা-ঠাকরুণ। এবার মন্বন্তরে যে গুলো মরল সেগুলোকে তো উনিই মারলে! এখন সব ছেড়ে দে ধামা ধামা চাল খাবে শুধু? য্যাত চিন্তা করতেছি ত্যাত য্যান মাথা ভেঁা ভেঁা কত্তেছে। যাই! যেয়ে মাথায় এটু ঠাণ্ডা তেল দেই গা!

হালদার কর্তার অনেক কাল আগে মাথা খারাপ হয়েছিল এখনো মাঝে মাঝে ক্ষেপে যান। এখন হঠাৎ চটে উঠে তিনি বললেন—

তিনি মা কালী! তিনির যা ইচ্ছে হবে তিনি তাই খাবে। তুমি কোনদিন পাঁচ পয়সার পুজো দেওনা তোমার অত চেটাং চেটাং কথা কিসের? ভাল চাও তো মরুই-গোলা খুলে রেখে পালাও। কাল ত্রিশূল ঠেকিয়েছে আজ ত্রিশূল ঢুকিয়ে দেবে কি না তা কে জানে? বোম্ কালী!

থাকোমনি খুব চিন্তা করতে করতে বাড়ি ফিরল।

কিন্তু সেদিন রাতেই দোলুঠাকুরের রাধার ঘাটের কাছারীতে ডাকাত পড়ল। পরদিন বানঝাটিয়ার কাছারীতে। ভৈরবীর সঙ্গে না কি তিনটে সর্বনেশে চেলা থাকে তারা জবাফুলের মালা নাচিয়ে এমন লাফাতে থাকে আর এমন চেঁচায় যে কাছে এগোয় কার সাধ্যি। এ গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই বলতে লাগল মা এবার দোলুঠাকুরের রক্তে চান করবেন, এর নাম দৈবলীলা!

শেষ অব্দি মুরলী সেনের কাছে গিয়ে দোলুঠাকুর পা ধরে কেঁদে পড়ল। মুরলী সেনের বয়স হয়েছে। উনি বললেন, দেখি। আমি কি করতে পারি।

ছেলেকে ডেকে বললেন—খবর না দিয়ে হঠাৎ করে কাদাই যাই চল। সেখানে যেয়ে প্রজাদের ডেকে কাছারী করি। দোলুঠাকুরের বড় বাড় বেড়েছে নিশ্চয়। নইলে আমারি কাছারীতে ডাকাত কেন?

—খাজনা মোটে ছাড়েনি।

—একেবারে না।

—না। আপনার নাম খুব খারাপ হয়েছে। সবাই বলে···

—কি বলে।

এ পোড়ার দেশে কি নাটোরের রাণী ভবানী ছাড়া মনিষ্য নেই। সবাই সোনার খাটে চেপে বসে দুধভাত খাচ্ছে তবু প্রজার খাজনা কেউ ছাড়লে না একটা সন?

এই কথা শুনে মুরলী সেন একটু হাসলেন। বললেন—চল কাদাই যাই চল। খাতাপত্তর হিসেব করে দেখতে হবে পুরনো প্রজার কে আছে, কে মরেছে, কার ভাগে কতটা জমি দেওয়া হল, এইসব। দুলে-বাগদী প্রজাই তো কয়েকঘর আছে। তাদের সঙ্গে দুলোঠাকুরের ভাব কেমন কে জানে?

জমিদার বলে কথা। কাছারীবাড়িতে যেন সোরগোল পড়ে গেল। দুলোঠাকুর বললে—আমাদের ওপর মায়ের বড় রাগ কর্তা। আপনি এসলেন না কেন।

—আমার কাছারীতে ডাকাত পড়লে কি তুমি সামলাবে?

—এজ্ঞে, পুকুরে জাল ফেলাই, মাছ ধরাই?

—মোটেই না। তুমি আগে খাতাপত্তর বের করো তো। আমি নিজে দেখতে চাই কতজনা বেঁচে আছে, কতজনা মরেছে। কালই চারদিকে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিও। কাছারীতে এবার পুন্নে হবে। কিন্তু সেজন্যে কারোকে দিতে হবে না কিছু।

পুন্নে মানে পুণ্যাহ। জমিদার এসে বসেন আর প্রজারা তাঁর খাজনা নিয়ে আসে। কাছারী বাড়িতে ঢালাও খাওয়াদাওয়া হয়। যে যেমন মানুষ, সে তেমনি আয়োজন করে। রাণীভবানীর কাছারীবাড়িতে পুণ্যাহর দিন বড় বড় নৌকোয় ডাল ঢালা হয়, চাদর বিছিয়ে ভাত ঢালা হয় উঠোনে। মোটাভাত ডাল তরকারী পাতলা দই আর গুড় যে যত পারে খায়।

—তাহলে যে ডাকাতরা নেচে এসবেন কর্তা? পুণ্যাহর খবর পেলে নেচে এসবেন।

—সে আমি বুঝব।

সেইরাতেই ভৈরবী আর তাঁর চেলারা এলেন। মুরলী সেন নিজে বসে আছেন মাদুর পেতে কাছারী ঘরে। দরজার ফোকরে চোখ রেখে দেখছেন। চেয়ে থাকতে থাকতে অন্ধকারে চোখ যেন চলে না বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

কিন্তু রাত তিনপ্রহর বাজে কি বাজে না, সেই সময়ে তিনি দেখতে পেলেন। কাছারী ঘরে বসে আর সবাই ভয়ে কাঁপছিল।

সত্যিই তো কালীর ভৈরবী! কালী প্রতিমার সঙ্গে যেমনটি থাকবার কথা, তেমনি কুচকুচে কালো রঙ। কপালে একটা চোখ, গলায় ফুলের মালা আর হাতে ত্রিশূল।

উঠোনে দাঁড়িয়ে যেই ভৈরবী বোম্‌কালী বলে চেঁচিয়েছে অমনি মুরলী সেন—তোর কি লীলে মা। বলে ঠাস করে হাত-পা শূন্যে তুলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

কি আশ্চর্য। আজ রাতে আর কাছারীতে ডাকাত পড়ল না।

পরদিন সকালে কি কাণ্ড দেখ, টুনির ছবিদাঁতটা পড়ে গেল। পড়ে যেতেই টুনির বেজায় কান্না। থাকোমণিকে বললে—আমার মাথা নেড়া করেছিলি ত্যাখন সবাই 'নেড়ী। তেলকুমড়ি। তেলে ভাজা বড়ি।' বলে ক্ষেপাত। আমার দাঁত তুই শীগগির নেংটি ইঁদুরের গর্তে ফেলতে বল্। নইলে আমার বড় বড় দাঁত গজাবে না?

এদিকে ঢেঁড়া পড়ে গিয়েছে। গাঁয়ে গাঁয়ে সাজসাজ রব। পুণ্যাহর দিনের আগে আগেই এবার পুণ্যাহ হবে। মুরলী সেন সবাইকে ডেকেছে কাছারীতে। সার সার বান কেটে খিচুড়ি আর কুমড়োভাজা, আমড়ার অম্বল, রান্না হবে। বুঝি খাজনাপত্তর নিয়েও কথা হবে। হয়তো ভৈরবীর চেলাচামুণ্ডার শাস্তির জন্যে ধুমধাম করে কালীপুজোও হতে পারে। তাই সবাই যেতে সুরু করেছে।

গাঁয়ে তো কারো এখন একখানা বই দু'খানা আস্ত কাপড় নেই। থাকোমণি গামছা পরে সাজিমাটি দিয়ে ছেলেমেয়ে আর নিজের কাপড় কেচে নিয়ে চৈত্রের রোদ্দুরে শুকিয়ে নিলে। নেয়ে ধুয়ে তবে যাবে কাছারীতে। যাবার আগে চারটি পান্তাভাত খেয়ে নেবে সবাই। কেননা এসব কাজকর্মের খাওয়া-দাওয়া হতে হতে বেলা গড়াবে।

মোহন যে সেই গোলদারের বাড়ি কাজে গিয়েছে এখনো আসেনি। থাকোমণি তাড়াতাড়ি তেল হাত বুলিয়ে নিয়ে মাথার একরাশ চুলের জট ছাড়াতে বসল উঠোনে। ভোলাকে বলল—যা ঐ বড় মরুইয়ে। ওখেনে ইঁদুরের খোঁদল (গর্ত) আছে।

—এদিকে নি?

—আবার কথা কয়! আরে! বড় মরুইয়ে নেইল্ (বেজী) দুটোর কথা জানিস না?

—জানি বই কি?

নেইল্ থাকলে সাপের ভয় থাকে না! ইদিকের মরুইয়ে কি আছে কে জানতেছে? ইঁদুরের গন্ধে গন্ধে সাপ খোঁদলে সাঁধায় (ঢোকে) জান না?

ভোলা এই এতটুকু নেকড়ায় টুনির দাঁতটাকে নিলে। দুটো চাল আর দাঁতটা নেকড়ায় জড়িয়ে মনে মনে বলতে লাগল—ইঁদুর দাদা, তুমি চাল খেও আর টুনিকে তোমার দাঁতটি দিও।

বড় মরাইয়ে যবে ধান থাকত তবে থাকত। এখন মরাই অন্ধকার, এই উঁচু, ঢুকতে অব্দি ভয় করে।

—এককোণে রেখে চলে আয় ভোলা!

বাইরে থেকে থাকোমণি ডেকে বললে বটে কিন্তু হঠাৎ ভোলার হাতে কি ঠেকল, নরম নরম।

মরাইয়ের আঁধার কোণে এই লম্বা কালো চুল! ভোলা ভাল করে চাইতে গিয়ে যেই দেখেছে চকচকে ত্রিশূল আর তিনটে চারটে মাথা অমনি—মা গো! বলে এমন চেঁচিয়েছে যে বলবার কথা নয়। তার চেয়েও সর্বনেশে কথা হল অন্ধকার থেকে একটা মুণ্ডু—বোম্‌কালী! সর্বনাশ হয়ে যেছে গো। বলে আরো জোরে চেঁচালে।

থাকোমণি কিছুই শোনেনি, শুধু দুটো চিৎকার। তাই শুনেই হাতে খেঁটে (ছোট লাঠি) নিয়ে—আমার নাম থাকোমণি! বলে ছুটে এসেছিল ও। বড়মরাইয়ের কোণের দিকে তাকিয়েই—তবে রে! তোদের এই কীর্তি? বলে থাকোমণি মুণ্ডুগুলোকে টানতে লাগল মরাইয়ের দরজার দিকে চুল ধরে।

সারিসারি সবাই বেরুল। ছিদাম, রতন, গণেশ, সখারাম! মোহনের গলায় লালনেকড়ার মালা, পরণে লাল কাপড়। একদিকে বগলে একরাশ পাটের রং করা কালো চুল। থাকোমণি গিয়ে ত্রিশূলটা বের করে এনে হাত জোড় করলে। বললে একবার ত্রিশূল ধর দেখি মা! নয়ন সাথক করি। নজ্জা নি শরীলে? একঝুড়ি গোঁফ বেইরে যেয়েছে উ দিকে তুমি মাযের ভৈরবী সাজতেছ?

—হল তো?

ছিদাম আর রতন এ-ওর দিকে চাইলে।

—চাল কোথায় থুয়েছিস্?

—ঐ তো, মরুইয়ে।

সত্যিই তো। মরাইয়ের কোণে শুধু চালের ডোল আর চালের ধামা। চালের দিকে চেয়ে চেয়ে থাকোমণি বলল।

—ই কুবেরের ঐশজ্জু যি!

—লয়তো কি এমনি এমনি ক'দিন ধরে রেতে বিরেতে লেচে বেড়াচ্ছি?

মোহন বলতে গিয়ে হেঁচে ফেললে। যতই চত্তিরের গরম হোক, গরমে ঘেমেও সর্দি বসে যাবে তো!

ত্রিশূল কোত্থেকে পিলি?

—হালদার ঠাকুররা দিলে।

—হালদার ঠাকুর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ গো! মাধব হালদার! উনিই তো বুদ্ধি দে' মোদেরকে……লইলে চিঠি লিখত কে?

মোরা লিখতে জানি?

রতন বললে—উনি ছাড়া মোদের বুদ্ধি দিত কে? মোরা বলে দুধের বাছা! মোদের অত মন্দবুদ্ধি আছে?

—হালদার ঠাকুর?

থাকোমণি হালদার ঠাকুরের কথা মনে করে হেসে ফেলল। ওকে হাসতে দেখে মোহনরাও হাসতে সুরু করলে।

থাকোমণি বললে—দুলোঠাকুরকে জব্দ করতে তোদের এত ছলাকলা? বামুনের বুকে ত্রিশূল ঠেকিয়ে লাচ করলি তোর পাপ হবে না?

পুজো দেব, পেরাশ্চিত্তির করব।

—জমিদার জানে যদি? হাই সর্বনাশ গো!

—তুই জানালে তবে জানবে। নইলে জানবে কেমন করে?

কি করবি তুই ভাবতে থাক। মোরা ভাল মত ছান করি গা! কালি-ঝুলি, কপালে তিনেত্তর, গায়ে য্যান চুলকোনি উঠে যেয়েছে গো গরমে! বোম্‌কালী!

ওরা মরাইয়ের অন্ধকারে ত্রিশূল আর কাপড়খানা রেখে পুকুরে নাইতে গেল। ভোলার চোখ উত্তেজনায় বড় বড় হয়ে গিয়েছিল, কোন হুঁস ছিল না।

—মোরা পরে যাব মা! মোহন হেঁকে বললে।

থাকোমণি ছেলেমেয়েকে নিয়ে নেয়ে ধুয়ে, চুল আঁচড়ে কাছারীর দিকে রওনা দিলে।

কাছারীর দিক থেকে খুব 'জয় হোক—জয় হোক' শোনা যাচ্ছে। শুনতে শুনতে থাকোমণির মুখ হাসিতে ভরে গেল। নিশ্চয় খাজনা পত্তরের কোন একটা সুবন্দোবস্ত হয়েছে। নইলে কি মানুষ এত 'জয় হোক' বলে চেঁচাত?

—তাড়াতাড়ি চ!

থাকোমণি টুনিকে কাঁধে বসালে, ভোলার হাত ধরলে। চৈত্তী বেলায় তাত উঠছে। বাতাসে কি নতুন খেসারীর ডাল আর ঘি-মৌ-মৌ চালের খিচুড়ীর সুগন্ধ। টুনি বাতাসের গন্ধ শুঁকে শুঁকে বললে—বামুনরা আদা-হিং-মৌড়ী সম্বরা দিয়ে খিঁচুড়ী রাঁধে, নয় গো মা? তাই-এমন বাস উঠতেছে?

॥ হাত বাড়ালেই ॥

রমা ভট্টাচার্য

হাত বাড়ালেই ধরতে পারি
প্রকাণ্ড এই আকাশ
হাত বাড়ালেই হাতের মুঠোয়
ধরতে পারি বাতাস ॥
সুনীল আকাশ অসীম স্বপন
জাল তো বোনায় না
বাউল বাতাস উদাস সুরের
গান তো শোনায় না ॥
চাঁদের বুড়ির রূপকথাটি
ফুরিয়ে গেছে কবে
বন কেটে আজ বসত হ'ল
দূর যে নিকট হ'বে ॥
এখন সবই ধরা সহজ
আকাশ বাতাস চাঁদ
তেপান্তরের মাঠের পারে
ধূসর বনের বাঁধ ॥
হাতের মুঠোয় ধরতে পারি
নিকট এবং দূর
আজ তবুও সুদূরে রয়
মনের অচিন পুর ॥

[জীবন আলেখ্য]

সূত্রধার। [নেপথ্যে থেকে] অতি প্রাচীন দেশ এই ভারতবর্ষ, অতি পুরাতন এর হিন্দু সভ্যতা। যুগে যুগে এই জাতি যখনই কোন সংকটে পড়েছে তখনই এক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, তিনি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই পথে জাতিকে পরিচালিত করেছেন। ভারতের মর্মবাণী ত্যাগ, সাম্য, মৈত্রী ও ভগবদ বিশ্বাসের কথা তিনি নতুন করে শুনিয়েছেন, এদেশের মানুষ আবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে, এগিয়ে চলেছে। ভারতীয় আদর্শের পথে যাঁরা এই ভাবে বার বার পথ দেখিয়েছেন, তাঁরাই ভারত পথিক। এ যুগে মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এমনি এক ভারত পথিক। সাম্য, মৈত্রী ও ভগবদ্ বিশ্বাসকে তিনি বার বার তুলে ধরেছেন জগদ্‌বাসীর সামনে।

প্রথম দৃশ্য

নেপথ্যে। [গানের সুর]

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।

[মঞ্চের পর্দা উঠলো। দেখা গেল পথ। দূরে বন্দর দেখা যায়, দেখা যায় জাহাজ। মঞ্চের উপরে লেখা : ১৩ই জানুয়ারী ১৮৯৭। ডারবান—দক্ষিণ আফরিকা। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। প্রবেশ করলেন দুটি লোক—গান্ধিজী ও মিস্টার লাফটন। দুজনেরই পরণে কোট প্যাণ্ট।]

গান্ধিজী। দিনে দিনে যাওয়াই ভাল ছিল।

লাফটন। জাহাজের ক্যাপ্‌টেন যে বললেন অন্ধকারে যাবার সুবিধা হবে, চট্ করে কেউ চিনতে পারবে না।

গান্ধিজী। আমি তো কোন অন্যায় করিনি, তবে রাত্রের অন্ধকারে চোরের মতো লুকিয়ে পালাবো কেন?

লাফটন। ওরা তৈরী হয়ে আছে, তোমাকে চিনতে পারলেই তো মারবে। ওদের যত রাগ তো তোমার উপরেই।

গান্ধিজী। কেন? আমি কি করেছি?

লাফটন। তুমি ভারতে গিয়ে সভা করে ওদের নিন্দে করেছ। বই লিখে ওদের সমালোচনা করেছ।

গান্ধিজী। মানুষের কাছে মানুষের মতো ব্যবহার প্রত্যাশা করা করা কি অন্যায়? এখানকার সাহেবরা কালো লোকদের সঙ্গে যে ব্যবহার করে তা তো অন্যায়—নিন্দনীয়, আমি মানুষ হিসাবে তার প্রতিকার চাইব না?

লাফটন। সে কথা এদের ভালো লাগে নি।

গান্ধিজী। কিন্তু সত্য তো কারও ভাল লাগা মন্দলাগার উপর নির্ভর করে না। মানুষ সবাই সমান, সবাইকার সমান অধিকার।

লাফটন। স্বার্থ মানুষকে দুর্বল করে দেয় তখন মানুষ আর সত্যকে স্বীকার করতে পারে না। এরা বলেছে—মিস্টার গান্ধী জাহাজ থেকে নামলেই তাকে আবার জলে ফেলে দেব।

গান্ধিজী। আর জলে ফেলে দেবে কি করে? আমরা তো বন্দর পার হয়ে এলাম। [হাসলেন]

লাফটন। ওরা বন্দরে ঢুকতে পারেনি। পথে অপেক্ষা করছে। মারপিট করার জন্য তৈরী হয়ে আছে। সেই পথটুকু পার না হলে আমি নিরাপদ মনে করতে পারছি না।

গান্ধিজী। যদি মারে তো মার খাবো।

লাফটন। হেঁটে যাওয়া নিরাপদ নয়। আমি বরং একখানা গাড়ী ডাকি।

গান্ধিজী। ওরা তো গাড়ী থামিয়েও মারতে পারে।

লাফটন। আপনি আমার বন্ধু। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আপনি মার খান এ আমি চাই না। সেই জন্যেই আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছি।

গান্ধিজী। আপনার সদিচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি কতজনকে একা রুখবেন?

লাফটন। আমি থাকতে আপনাকে মার খেতে দোব না। আসুন একখানা গাড়ী ডাকি—

[দুজনে বেরিয়ে গেলেন। বিপরীত দিক দিয়ে প্রবেশ করলো একদল ছেলে।]

প্রথম ছেলে। ওই তো গান্ধী যাচ্ছে—গান্ধী—

দ্বিতীয় ছেলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই গান্ধী! ছবির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

তৃতীয় ছেলে। ভালমানুষ সেজে অন্ধকারে পালাচ্ছে—

সকলে। গান্ধী যাচ্ছে—গান্ধী যাচ্ছে— [বেগে প্রস্থান]

[নেপথ্যে। গান্ধী—গান্ধী—মারো—মারো—! গান্ধী ও লাফটন-এর প্রবেশ। পরক্ষণেই মঞ্চের উপর এসে পড়লো কয়েকটি ইঁটপাটকেল। তারপরেই হুড়মুড় করে এসে ঢুকলো ছেলেছোকরার দল।

গান্ধিজীর দিকে তারা এগিয়ে গেল। লাফটন বাধা দিলেন। কয়েকজন লাফটনের হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গেল। আরেকদল সুরু করলো গান্ধিজীকে প্রহার করতে। মার খেতে খেতে গান্ধিজী কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। মঞ্চের এক পাশে একটি বাড়ির কয়েকটা রেলিং দেখা যাচ্ছিল। দুহাতে সেই রেলিং ধরে গান্ধিজী দাঁড়ালেন। মার চলতে লাগলো।]

জনতা। মার—মার—মেরে খতম্ করে দে—

[ছাতা হাতে এক মেমসাহেবের প্রবেশ]

মেমসাহেব। ব্যাপার কি? কি হচ্ছে এখানে?

[জনতার কয়েকজন মুখ ফেরালো।]

জনতার একজন। গুডমর্নিং, মিসেস্ আলেকজাণ্ডার।

মেমসাহেব। ব্যাপার কি মিস্টার জোনস্?

জোন্স। মারপিট্ হচ্ছে, আপনি এখানে দাঁড়াবেন না।

মেমসাহেব। মারপিট? [কয়েক সেকেণ্ড ভাল করে ভীড়ের মধ্যে তাকালেন] একটা লোককে তোমরা সবাই মিলে মারছো! এ কি বিশ্রী ব্যাপার!

জোন্স্। লোকটা বড় দুষ্ট।

মেমসাহেব। ও কে?

জোনস। দুষ্ট ভারতীয় মিষ্টার গান্ধী।

মেমসাহেব। মিস্টার গান্ধী? ব্যারিস্টার গান্ধী? সে কি করেছে? এভাবে মার খেলে সে তো এখনি মরে যাবে। এ তো নিছক গুণ্ডামি—বর্বরতা! No no, you should not do this—no no—I will not allow it—

[ছাতার বাঁট দিয়ে দুপাশের লোককে সরিয়ে ভীড়ের ভিতর ঢুকে পড়লেন। বরাবর গিয়ে দাঁড়ালেন গান্ধিজীর পাশে। ছাতা খুলে গান্ধিজীকে আড়াল করলেন। গান্ধিজীকে মারতে গেলে এবার মেমসাহেবের লাগবে, কাজেই জনতা ক্ষান্ত হলো।]

জনতার একজন। আপনি সরে যান।

মেমসাহেব। কেন?

লোকটি। আমরা ওকে মেরে শেষ করবো।

মেমসাহেব। কেন? ও কে?

লোকটি। মিস্টার গান্ধি।

মেমসাহেব। কে সে?

লোকটি। মিস্টার গান্ধিকে চেনেন না?

মেমসাহেব। না।

লোকটি। একজন ভারতীয় ব্যারিস্টার, মস্ত শয়তান!

মেমসাহেব। আই সী (I See) তাই তোমরা সবাই মিলে একজন লোককে মারছ? তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। গেট্ ব্যাক্—গেট্ ব্যাক্—আমি এখনি পুলিশ ডাকবো—

লোকটি। এ মেমসাহেব কে? একে হটাও।

দ্বিতীয়। পুলিশ সুপারের বউ, মিসেস আলেকজাণ্ডার।

তৃতীয়। তাহলে এবার সরে পড়াই ভাল।

চতুর্থ। কেন ভয়ে নাকি?

তৃতীয়। বলছে পুলিশ ডাকবো।

চতুর্থ। বলুক, ভয় করিনা। মেমসাহেব চলে গেলে আবার মারবো, ছাড়বো না।

দ্বিতীয়। পুলিশ আসছে—পুলিশ—

[নেপথ্যে। গেট ব্যাক্—গেট্ ব্যাক্—জনতা ত্বরিতপদে বেরিয়ে গেল। পুলিশের প্রবেশ। সঙ্গে পুলিশ

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট।]

সুপার। [গান্ধিজীর কাছে এসে।] থ্যাংক্ গড! আপনি গুরুতর আহত হননি। আসুন—

গান্ধিজী। [রেলিং ছেড়ে দাঁড়ালেন। দু-এক পা চলার চেষ্টা করলেন। তারপর আবার রেলিং ধরলেন।] আমি চলতে পারবো না, আমার মাথা ঘুরছে, পা টলছে।

মেমসাহেব। গুরুতরভাবে প্রহৃত হয়েছেন!

সুপার। আসুন, আমি আপনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

[গান্ধিজীর হাত ধরলেন। গান্ধিজী তাঁর কাঁধের উপর ভর দিয়ে কোন মতে অগ্রসর হলে।]

নেপথ্যে। Hang old Gandhi On the sour apple tree—

সুপার। ইনসপেকটার, এদের কয়েকটাকে গ্রেপ্তার কর—

গান্ধিজী। না না। এদের কোন দোষ নেই। এদেরকে ভুল বোঝানো হয়েছে, এরা তাই বিশ্বাস করেছে।—

সুপার। আপনাকে এইভাবে মেরেছে…

গান্ধিজী। সেজন্য আমার কোন অভিযোগ নেই। এরা একদিন নিজের ভুল বুঝতে পারবে।

সুপার। Strange! আপনার কোন অভিযোগ নেই?

গান্ধিজী। না।

সুপার। আমি আপনাকে বুঝতে পারলাম না।

[দুজনে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেলেন। পিছনে পুলিশ।]

নেপথ্যে। গান।

সে কোন পাগল যায় পথে তোর
যায় চলে ওই একলা রাতে—
তারে ডাকিস নে তোর আঙিনাতে।
সুদূর দেশের বাণী ও যে যায় বলে,
হায়, কে তা বোঝে
কী সুর বাজায় একতারাতে॥ [রবীন্দ্রনাথ]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পথের দৃশ্য। পাশে মাঠের মাঝে কয়েকটী তাঁবু পড়েছে। প্রায় বাইশ শো নরনারী বালক বালিকা সেখানে সমবেত হয়েছে। (পুরুষ ২০৩৭, রমণী ১২৭, বালক ৫৭)

১৯১৩ সাল: দক্ষিণ আফরিকা, ট্রান্সভাল: ভোকস্রস্ট ঝর্ণার পাশে

সভা হচ্ছে। গান্ধিজী জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। গান্ধিজীর পোষাকের জৌলুস নেই। মোটা কাপড়ের হাফসার্ট ও হাফ্প্যাণ্ট।]

গান্ধিজী। মেরে ভাই ঔর বহিনোঁ, জেনারেল স্মাট্সের গবর্মেণ্ট ভারতীয়দের উপর অবিচার করতে সুরু করেছে। তিনি কালা কানুন করেছেন যাতে ভারতীয়কে সেখানে থাকার জন্য পরোয়ানা নিতে হবে। তিনি ইমিগ্রেসন রেস্‌ট্রিকসন এ্যাক্‌ট্‌ করেছেন, যাতে বাইরে থেকে কোন ভারতীয় সে রাজ্যে ঢুকতে না পারে। তিনি ভারতীয় বাসিন্দাদের মাথা পিছু তিন পাউণ্ড কর বসিয়েছেন। ভারতীয়দের কোন কথাই তিনি শোনেন না। আমরা এই অঞ্চলের পুরানো বাসিন্দা অথচ আমাদেরকে এখানে মানুষের মতো বাস করতে ওরা দেবে না। ওদের হাতে গবর্মেণ্ট, ওরা এই জুলুম চালাবে। কিন্তু আমরা এই অন্যায় আইন মানবো না।

জনতা। আমরা জুলুম সইব না।

গান্ধিজী। জেনারেল স্মাট্সের সঙ্গে আমরা অনেক কথা বলেছি, ভারতীয় নেতা মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে এসে কথা বলেছেন স্মাট্স্ অন্যায় স্বীকার করেছেন কিন্তু আইন রদ করেন নি। আমরা এবার তাই সেই আইন ভাঙবো। আমরা ট্রানসভালে বিনা অনুমতিতে ঢুকবো, মাথা পিছু এই কর তুলে না দেওয়া অবধি হরতাল চালাবো। সেজন্য জেলে যেতে হয় যাবো।

জনতা। আপনি বললে আমরা জেলে যাবো।

গান্ধিজী। পুলিশ মারধরও করতে পারে। সেই মার সইবার জন্য তৈরী থাকতে হবে। পিছু হটলে চলবে না।

জনতা। আপনি সঙ্গে থাকলে আমরা পিছু হটবো না।

গান্ধিজী। আমি অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থাকবো।

জনতা। আমরাও ঠিক থাকবো।

গান্ধিজী। ট্রানসভাল আর মাত্র আটমাইল পথ। কাল সকালেই আমরা এই পথ অতিক্রম করবো। সকলেই তোমরা তৈরী হয়ে নিও। এখন সবাই বিশ্রাম কর গে—

[ভীড় ধীরে ধীরে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেল।
সবার পিছনে গান্ধিজী বেরিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় এক সাংবাদিক প্রবেশ করলো।]

সাংবাদিক। গুড মর্নিং মিস্টার গান্ধি।

গান্ধিজী। গুড মর্নিং। আপনি কে জানতে পারি ?

সাংবাদিক। আমি একজন সাংবাদিক।

গান্ধিজী। বলুন ?

সাংবাদিক। আপনি এই যে অভিযান করছেন এর আগে জেনারেল স্মাটসের সঙ্গে একবার আলোচনা করা কি ভাল ছিল না ?

গান্ধিজী। আমি তাঁকে টেলিফোন করেছিলাম। তিনি টেলিফোন ধরেননি, তাঁর সেক্রেটারী টেলিফোন ধরে বলেছেন, আমাদের সঙ্গে তিনি কোন কথা বলতে চান না, আইনের কোন রদবদল হবে না, আমরা যা খুসি করতে পারি। কাজেই এখন সত্যাগ্রহ ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন পথ নেই।

সাংবাদিক। এই অভিযানের কি ফল হবে তা আপনি ভেবেছেন কি ?

গান্ধিজী। জানি, জেল খাটতে হবে।

সাংবাদিক। তাতে কি আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে ?

গান্ধিজী। অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানো হবে।

সাংবাদিক মজুরদের কি লাভ হবে?

গান্ধিজী। ভারতীয় হিসাবে তারা আত্মমর্যাদা পাবে।

সাংবাদিক। আপনি তাহলে আত্মমর্যাদা ফিরে পাবার আশা রাখেন?

গান্ধিজী। নিশ্চয়। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি, সংকল্পে দৃঢ় থাকি তাহলে এই অবিচার নিশ্চয় সংশোধন হবে। তবে তার জন্য আমাদের কিছু কষ্ট সইতে হবে।

সাংবাদিক। কাল সকালে তাহলে আপনারা টান্সভালে প্রবেশ করছেন?

গান্ধিজী। নিশ্চয়। ভগবান আমার সহায়, আমি জয়যুক্ত হবই।

সাংবাদিক। আচ্ছা, গুড নাইট!

গান্ধিজী। নমস্তে।

[সাংবাদিক বেরিয়ে গেলেন।]

[আলো নিভে গেল। ধীরে ধীরে মৃদু স্তিমিত আলো ফুটে উঠলো। দেখা গেল গান্ধিজী খড়ের উপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে আছেন। আশে পাশে আরো কয়েকজন। সহসা টর্চের আলো এসে পড়লো। একজন পুলিশ অফিসার প্রবেশ করলো।]

অফিসার। হ্যালো—হ্যালো—হ্যালো—

[জমাদার ও কয়েকজন পুলিশের প্রবেশ।]

জমাদার। ইউ মেন গেট আপ! (You men get up)

গান্ধিজী। কে?

অফিসার। গেট আপ্!

গান্ধিজী। (উঠে বসলেন) কে?

অফিসার। আমি পুলিশ অফিসার।

গান্ধিজী। ওঃ। আসুন।

অফিসার। তুমিই মিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

গান্ধিজী। হ্যাঁ।

অফিসার। তোমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।

গান্ধিজী। কোথায় যেতে হবে।

অফিসার। স্টেশনে।

গান্ধিজী। এখন রাত ক'টা।

অফিসার। তিনটে।

গান্ধিজী। আমাকে কয়েক মিনিট সময় দিন তৈরী হয়ে নিই।

[বেরিয়ে গেলেন। পিছনে পুলিশ গেল। ইতিমধ্যে আর সবাই উঠে পড়লো। এক কোণে একটি হারিকেন লণ্ঠন জ্বলছিল, অনুগামী সি কে নাইড়ু আলোটা জোরালো করে দিলেন।]

নাইডু। আপনারা গান্ধিজীকে ধরতে এসেছেন।

অফিসার। হ্যাঁ।

নাইডু। এই দুপুর রাতে?

অফিসার। আমাদের উপর এই রকম নির্দেশ আছে।

পাশের সত্যাগ্রহী। গান্ধিজীকে ধরে নিয়ে গেলে কাল সকালে আমরা কি করবো?

নাইডু। গান্ধিজী যা করতে বলেছেন। অভিযান আমাদের প্রোগ্রাম মতো ঠিক চলবে।

[গান্ধিজী প্রবেশ করলেন]

গান্ধিজী। হ্যাঁ, প্রোগ্রাম ঠিক চলবে। সকালে উঠে তোমরা যথারীতি অগ্রসর হবে। পুলিশ যাকে ধরতে চায় ধরবে, পুলিশ যদি মারে চুপ করে মার খাবে। কিন্তু থামলে চলবে না। যতক্ষণ একজন মানুষও থাকবে ততক্ষণ এগিয়ে যাবে। নাইডু, তুমি এদের পরিচালনা করবে, তোমার উপরই সব দায়িত্ব দিয়ে গেলাম। আমরা সত্যাগ্রহী, ভগবান আমাদের সহায়, জয়ী আমরা হবই। চললাম। [বেরিয়ে গেলেন]

সকলে। গান্ধিজীকি জয়!

[সবাই পিছু পিছু বেরিয়ে গেল।

বাইরে মোটরের আওয়াজ পাওয়া গেল। আর তারই সঙ্গে ভেসে এলো—গান্ধিজীর জয়!]

নেপথ্যে। গান: রাত্রি এসে কোথায় মেশে দিনের পারাবারে

তোমায় আমায় দেখা হল সেই মোহানার ধারে।

সেইখানেতে সাদায় কালোয়

মিলে গেছে আঁধার আলোয়—

সেইখানেতে ঢেউ উঠেছে এ পারে, ওই পারে। [রবীন্দ্রনাথ]

তৃতীয় দৃশ্য

পথের দৃশ্য। দূরে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। ভেসে আসছে সমুদ্রগর্জনের রেশ।

মঞ্চের উপর ফেস্টুনে লেখা: ১২ই মার্চ ১৯৩০ সাল। ডাণ্ডীর সমুদ্র সৈকতে লবণ আইন অমান্যের অভিযান।

মঞ্চের একদিক দিয়ে গান্ধিজী প্রবেশ করলেন, পিছনে একে একে উন-আশী জন আশ্রমিক অনুগামী।

গান্ধিজী মঞ্চ পার হয়ে গেলেন। অনুগামীরাও চলে গেল।

নেপথ্যে। সংগীত:

গাব তোমার সুরে দাও সে বীণাযন্ত্র

শুনব তোমার বাণী দাও সে অমরমন্ত্র।...

যাব তোমার সাথে দাও সে দখিন হস্ত,

লড়ব তোমার রণে দাও সে তোমার অস্ত্র।

জাগব তোমার সত্যে দাও সেই আহ্বান।

ছাড়ব সুখের দাস্য, দাও দাও কল্যাণ॥ [রবীন্দ্রনাথ]

[গ্রামবাসীরা প্রবেশ করলো। মঞ্চের এক পাশে হাত জোড় করে দাঁড়ালো।

গান্ধিজী আবার মঞ্চে প্রবেশ করলেন। পেছনে অনুগামীর দল!]

জনতা মহাত্মা গান্ধি কী জয় !

[একজন সাইকেল পিওন এসে গান্ধিজীকে প্রণাম করলো, দুখানি টেলিগ্রাম দিল গান্ধিজীর হাতে।

গান্ধিজী টেলিগ্রাম পড়লেন। মৃদু হাসলেন। পাশেই ছিল সাংবাদিক, এগিয়ে এলো।]

সাংবাদিক। . কার টেলিগ্রাম ? কোথেকে এসেছে ?

পিওন। জার্মানি ও আমেরিকা।

সাংবাদিক। একবার দেখতে পারি ?

[গান্ধিজী। টেলিগ্রাম দুখানি তার হাতে দিলেন।]

সাংবাদিক। [উচ্চকণ্ঠে পড়লো] আমি একজন জার্মান চিকিৎসক। আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। ভগবানের কাছে আপনার জন্য প্রার্থনা করি। আপনার কল্যাণ হোক্।

[পরের টেলিগ্রামখানি পড়লো] ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন— পাদ্রী হোমস—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

[সাংবাদিক টেলিগ্রাম দুখানি ফিরিয়ে দিলে। গান্ধিজী তাঁর পিছনের অনুগামী খড়্গবাহাদুরের দিকে টেলিগ্রাম দুখানি এগিয়ে দিলেন, যে সে দুটি কাঁধের ঝোলার মধ্যে রাখল।]

সাংবাদিক। কিছু বলবেন ?

গান্ধিজী। দুশো মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করে এসেছি। ভগবানের আশীর্বাদ আছে বলেই ওই দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আমার এই তীর্থযাত্রা। বারে বারে আমার মনে হয়েছে আমি যেন অমরনাথ অথবা কেদারবদরীর পথে চলেছি।

জনতা। মহাত্মা গান্ধিকী জয়।

গান্ধিজী। [জনতার পানে তাকিয়ে] বৃটিশ সব দিক থেকে ভারতকে ধ্বংস করতে চায়। অর্থের দিক থেকে, সংস্কৃতির দিক থেকে, আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে। বৃটিশ শাসন আমাদের অভিশাপ। এই শাসন ব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলাই আমার ধর্ম, আমি সেই চেষ্টা করতেই বেরিয়েছি। শাসকেরা এদেশে নুন বিক্রী করে তা থেকে বছরে দশ কোটি টাকা কর আদায় করে। যে সব গরিব মানুষ সমুদ্রের ধারে বাস করে তাদেরও নুন খাবার উপায় নেই। সমুদ্র থেকে নুন কুড়োলেই তাদেরকে পুলিশে ধরবে। আইনের নামে গরিবের উপর এই অত্যাচার। এই অত্যাচারের আমি শেষ করবোই। সত্যাগ্রহীর পরাজয় নেই, জয়ী আমরা হবই, ভগবান আমার সহায়।

জনতা। মহাত্মা গান্ধিকী জয় !

গান্ধিজী। লবণ আইন অমান্য করে আমি এবার নুন তৈরী করবো। দেশের মানুষের সেবার জন্য যারা রাজদণ্ড ভোগ করতে প্রস্তুত তারা নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী আইন অমান্য করে লবন তৈরী করতে পারে। ১৯২০ সালে আমি জাতিকে ডাক দিয়েছিলাম অসহযোগ সংগ্রামে। সে আহ্বান ছিল প্রস্তুতির আহ্বান। আবার আজ আমি আহ্বান জানাচ্ছি, আইন অমান্যের আহ্বান। এ ডাক হল সংগ্রামের ডাক—চরম নিষ্পত্তির ডাক।

[অনুগামীদের প্রতি] এসো—

জনতা ; মহাত্মা গান্ধিকী জয় !

[গান্ধিজী এগিয়ে গেলেন। অনুগামীরা অনুসরণ করলো। দূরে সমুদ্রের জলকল্লোলে শোনা গেল। আর তারই সঙ্গে শোনা গেল জনতার জয়ধ্বনি।

মঞ্চের আলো নিভে গেল। আবার আলো জ্বললো। দেখা গেল গান্ধিজী ও তাঁর অনুগামীরা শুয়ে আছেন। টর্চের আলো ফেলে পুলিশ প্রবেশ করলো।]

গান্ধিজী। [ঘুম ভেঙে] কে?

পুলিশ। পুলিশ।

গান্ধিজী। ওঃ [উঠে বসলেন]।

পুলিশ। উঠুন। আপনাকে গ্রেপ্তার করার হুকুম আছে।

গান্ধিজী। ১২৪ ধারা নাকি?

পুলিশ। না ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ।

গান্ধিজী। আদেশটা শুনতে পাই না?

পুলিশ। [টর্চের আলোয় পরোয়ানা পড়লো।] ১৮২৭ সালের ২৫ আইনে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধিকে গ্রেপ্তার করা হলো।]

গান্ধিজী। একশো বছরের পুরানো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের আইন ১৯৩০ সালে বৃটিশ গবর্মেণ্ট প্রয়োগ করছেন। বেশ! [হাসলেন] তা আপনি?

পুলিশ। আমি ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।

গান্ধিজী। আপনাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা জানানোর ব্যবস্থা নেই বলে আমি দুঃখিত। রাত এখন ক'টা?

ম্যাজিস্ট্রেট। পৌনে একটা। আপনি তৈরী হয়ে নিন।

গান্ধিজী। আমাকে কুড়ি পঁচিশ মিনিট সময় দিন।

[গান্ধিজী বেরিয়ে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের ইঙ্গিতে একজন পুলিশ তাঁর পিছনে গেল।
ম্যাজিস্ট্রেট পায়চারী করতে লাগলেন; অন্যান্য অনুগামীরাও উঠে পড়লেন। গান্ধিজী প্রবেশ করলেন।]

গান্ধিজী। আমি প্রস্তুত। চলুন কোথায় যেতে হবে।

[অনুগামীদের প্রতি] আমি চললাম। এই নাও আমার বিবৃতি।

[একখানি কাগজ দিলেন খড়্গ বাহাদুরের হাতে।]

ম্যাজিস্ট্রেট। আসুন।

[ম্যাজিস্ট্রেট বেরিয়ে গেলেন। গান্ধিজী অনুসরণ করলেন। পুলিশের দলও পিছনে গেল।
একজন সাংবাদিক প্রবেশ করলো।]

সাংবাদিক। মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল?

খড়্গ বাহাদুর। হ্যাঁ।

সাংবাদিক। কোন বিবৃতি দিয়ে গেলেন?

[খড়্গ বাহাদুর কাগজখানি তার হাতে দিলেন।]

সাংবাদিক। [টর্চের আলোয় পাঠ করলেন] স্বরাজ আসবেই। সেজন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমার গ্রেপ্তারে হতাশ হলে চলবে না। আমি কেউ নই। ভগবানে বিশ্বাস রেখে এগোতে হবে। গাঁয়ের সবাই নুন তৈরী করবে, সুতো কাটবে, বিলিতী বস্ত্র পোড়াবে, মদ ও আফিং বন্ধ করবে, অস্পৃশ্যতা মানবে না, সরকারী চাকরী ছাড়বে, সরকারী ইস্কুল ছাড়বে, জনসেবায় আত্মনিয়োগ করবে। স্বরাজ আসবেই।

[বাইরে মোটর গাড়ীর স্টার্ট দেবার শব্দ হলো।]

সাংবাদিক। পুলিশ ভ্যান চলে গেল। [দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।]

অনুগামীরা। মহাত্মা গান্ধিকী জয়।

নেপথ্যে। গান :

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে!
আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে॥
তেমনি করে আপন হাতে
ছুঁলে আমার বেদনাতে
নূতন সৃষ্টি জাগল বুঝি জীবন 'পরে॥ [রবীন্দ্রনাথ]

চতুর্থ দৃশ্য

পথের দৃশ্য।

মঞ্চের উপর ফেস্টুনে লেখা : নভেম্বর মাস, ১৯৪৬ সাল, নোয়াখালি।

গান্ধিজী মঞ্চের এক দিক দিয়ে প্রবেশ করলেন, অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পিছনে চলেছেন কয়েকজন অনুগামী : আভা গান্ধী, সুশীলা নায়ার, কানু গান্ধী; সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, সুধীর লাহা, অমৃতলাল চ্যাটার্জী, ঠক্কর বাপা, পরশুরাম, প্যারীলাল প্রভৃতি। কয়েকজন গ্রামবাসী এসে পথের পাশে হাত জোড় করে দাঁড়ালো। গান্ধিজী অনুগামীদের সঙ্গে আবার প্রবেশ করলেন।

সতীশবাবু। আমরা শ্রীরামপুরে এসে পৌঁছালাম।

গান্ধিজী। শ্রীরামপুর। [থমকে দাঁড়ালেন। চারিপাশে একবার তাকিয়ে দেখলেন।] এখানেও তো বাড়িঘর পোড়ানো হয়েছে দেখছি। সামনের ওই পোড়া বাড়িটা কার?

বৃদ্ধ গ্রামবাসী। ওখানে চৌধুরীবাবুরা থাকতেন।

গান্ধিজী। বেশ বড় বাড়ি বলে মনে হয়।

গ্রামবাসী। পঁয়ত্রিশখানা ঘর ছিল।

গান্ধিজী। সব বাড়িটাই পুড়েছে?

গ্রামবাসী। হ্যাঁ।

গান্ধিজী। খুন হয়েছে?

গ্রামবাসী। হয়েছে।

গান্ধিজী। কতজন?

গ্রামবাসী। আটজন।

গান্ধিজী। [কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে এলেন।] এখনও সব আধপোড়া কঙ্কাল পড়ে আছে। হায় রাম!

গান্ধিজী। এখানে এখন আর কেউ থাকে না?

গ্রামবাসী। না।

[একটা কুকুর এগিয়ে এলো। তিব্বতী লোমওয়ালা কুকুর। গান্ধিজীর পানে তাকিয়ে সে ডেকে উঠলো —ভৌ ভৌ ভৌ!]

গ্রামবাসী। আশীজন বাসিন্দা ছিল এই বাড়িতে এখন এই কুকুরটি মাত্র আছে।

[কুকুরটি গান্ধিজীর কাছে এগিয়ে এলো—ভৌ ভৌ ভৌ!]

গ্রামবাসী। যা—যা—যা— [কুকুর। ভৌ ভৌ ভৌ!]

গান্ধিজী। থাক্ থাক্ থাক্।

[কুকুরটি গান্ধিজীর সামনে এসে গান্ধিজীর মুখের পানে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।]

গান্ধিজী। কেন এমন হলো? কি এদের অপরাধ। [হতাশভাবে আকাশের পানে মুখ তুলে তাকালেন।]

[গ্রামবাসীর প্রতি] এই গাঁয়ে কত ঘর হিন্দু ছিল?

গ্রামবাসী। সাতান্ন ঘর।

গান্ধিজী। এখন কত ঘর আছে।

গ্রামবাসী। তিন ঘর।

গান্ধিজী। মানুষগুলোর কি হল?

গ্রামবাসী। কিছু খুন-জখম হয়েছে, বাকি সব পালিয়ে গেছে।

গান্ধিজী। তোমরা থাকতে এমন হলো কেন?

গ্রামবাসী। দুবৃত্তেরা বাইরে থেকে এসেছিল, তাদেরকে আমরা ঠেকাতে পারিনি। এজন্য আমরা দুঃখিত। যারা পালিয়ে গেছে তাদের আমরা ফিরিয়ে আনতে চাই। আমরা শান্তি চাই। আগের মতই মিলেমিশে থাকতে চাই।

গান্ধিজী। মুখে ও মনে যদি আমরা এক হই, আমাদের কাজ নিশ্চয়ই সফল হবে!

[আলো নিভলো। আলো জ্বললো। গান্ধিজী শূন্য মঞ্চের উপর দিয়ে অনুগামীদের নিয়ে চলে গেলেন।]

নেপথ্যে। গান: যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল, একলা চল, একলা চলরে—

[গ্রামবাসীরা মঞ্চে প্রবেশ করে হাত জোড় করে দাঁড়ালো। গান্ধিজী অনুগামীদের সঙ্গে প্রবেশ করলেন।]

গান্ধিজী। এ কোন গ্রাম?

বৃদ্ধ গ্রামবাসী। করপাড়া।

সতীশবাবু। এখানে রাজেন্দ্র লাল রায়ের বাড়ি না?

গান্ধিজী। রাজেন্দ্রলাল রায় কে?

সতীশবাবু। নোয়াখালির উকিল সমিতির সভাপতি রায় সাহেব রাজেন্দ্রলাল রায়।

গ্রামবাসী। তিনি ও তাঁর বাড়ির লোকেরা সবাই খুন হয়েছেন। তাঁর বাড়িখানিও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

গান্ধিজী। তোমরা এ অন্যায় হতে দিলে কেন?

গ্রামবাসী। বাইরে থেকে গুণ্ডার দল এসেছিল ছুরী লাঠি নিয়ে, আমরা সেখানে কি করবো? আমাদের কথা তারা শুনবে কেন?

গান্ধিজী। আত্মবিশ্বাস থাকলে তোমরা এখানকার মানুষগুলিকে রক্ষা করতে পারতে। পরস্পরে যদি প্রীতি

থাকতো, পরস্পরকে যদি আপনার লোক বলে তোমরা ভাবতে পারতে তাহলে কখনো এমন ব্যাপার ঘটতে পারতো না।

গ্রামবাসী। আমরা বড় ভয় পেয়েছিলাম মহাত্মাজী।

গান্ধিজী। গুণ্ডারা ভয় দেখাতেই চায়। কিন্তু যখনই তারা বুঝবে তোমরা তাদের চেয়েও সাহসী তখনই তারা তোমাদেরকে সম্মান দেবে।

[কয়েকজন সাংবাদিকের প্রবেশ]

সাংবাদিক দল। নমস্তে মহাত্মাজী।

গান্ধিজী। আপনারা?

সাংবাদিক। আমরা সাংবাদিক। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

গান্ধিজী। বেশ!

একজন সাংবাদিক। এখানকার অবস্থা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

গান্ধিজী। ঘুরছি, দেখছি। এই গ্রামগুলি ভারতের আত্মাস্বরূপ। গ্রামের উন্নতিই আমি চাই। গ্রামের কল্যাণই হিন্দুস্থানের কল্যাণ।

দ্বিতীয় সাংবাদিক। এই অবস্থা······

গান্ধিজী। এই অবস্থা এই মনোভাব থেকে জাতিকে উন্নীত করতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় এই পূর্ববঙ্গেই দেহরক্ষা করবো, এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমি একাই সংগ্রাম করবো। আমার সত্য ও অহিংসার নীতি এখানে আমি কাজে লাগাবো।

তৃতীয় সাংবাদিক। হিন্দু মুসলমান অধিবাসী বিনিময় সম্পর্কে আপনি কি বলেন?

গান্ধিজী। এতো হলো চিন্তার দুর্বলতা। হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক সে ভারতীয়। ধর্মের কারণে কাউকে স্থান ত্যাগ করতে হবে এর কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই।

চতুর্থ সাংবাদিক। এখানে আপনি কতদিন থাকবেন?

গান্ধিজী। তা জানি না। তবে আমি এখানে আলোর সন্ধান করছি। আমার চতুর্দিক অন্ধকার। আমাকে কাজ করতে হবে, যদ্দিন না সেই আলোর সন্ধান পাই ততদিন এখানে থাকতে হবে বৈকি। গাঁয়ের মানুষ অন্ধকারে বাস করছে, এই অন্ধকার দূর করতে হবে।

পঞ্চম সাংবাদিক। কি করে এই অন্ধকার দূর হবে?

গান্ধিজী। দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর করতে পারলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্প্রীতি ফিরে আসবে। সেই উদ্দেশ্যেই আমি এখানে এসেছি। হিন্দু ও মুসলমান কেউ কারও শত্রু হতে পারে না। ভারতেই তারা লালিত পালিত, ভারতবর্ষেই তারা জীবন যাপন করবেন; ভারতবর্ষেই তারা মরবেন। ধর্মের পরিবর্তন এই মূল সত্যটাকে বদলে দিতে পারে না। এর মূল কথাটা হ'চ্ছে অবিশ্বাস। পরস্পরের প্রতি এই অবিশ্বাস দূর করে স্থায়ী সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমি সেই চেষ্টা করতে নোয়াখালিতে এসেছি।

[মঞ্চের আলো নিভলো। পরক্ষণেই আলো জ্বললো। দেখা গেল সেই একই দৃশ্য। মঞ্চের পিছনে কাপড়ের ফেস্‌টুনে লেখা:

খিলপাড়া ইউনিয়ন

গান্ধী সম্বর্ধনা সভা

[গ্রামবাসীরা সভা করে বসেছে। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মানপত্র পাঠ করছেন। পাশে গান্ধিজী বসে আছেন ও অনুগামীরা।]

প্রেসিডেন্ট। [মানপত্র পাঠ] হে ভারত শ্রেষ্ঠ মানব, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে চলিল আপনি নোয়াখালিতে অবস্থান করিতেছেন।…আমরা আপনার যথোপযুক্ত সম্মান করিতে পারি নাই এজন্য আমরা আপনার নিকট লজ্জিত আছি।·· এই দেশে হিন্দু মুসলিম দুই জাতি বহু শতাব্দী ধরিয়া পরস্পর ভাই ভাই হিসাবে বসবাস করিয়া আসিতেছে।…তবে এই খুঁটিনাটি লইয়া এত দাঙ্গা কেন?…আপনি বর্তমান যুগে ভারতের কেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেতা, বিশেষতঃ আপনি ভারতবাসী, আপনার নিকট আমাদের এই দাবী—আপনি এখানে থাকিয়া আত্মবিবাদ মিটাইয়া দিয়া সম্মিলিত ভাবে ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে জয়যুক্ত করুন।...আমরা আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, কিভাবে এখানে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইবে, আপনি তাহার পথ নির্দেশ করুন। আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

গান্ধিজী। কেউ কাউকে শত্রু বলে ভাববেন না। পারস্পরিক সামঞ্জস্যবিধান ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মধ্যে দিয়েই ভারতের মুক্তিলাভ হবে, অস্ত্রের হানাহানিতে তা সম্ভব হবে না।

সমবেত কণ্ঠে। [ভজন গান] রঘুপতি রাঘব রাজারাম
ঈশ্বর আল্লা তেঁরে নাম
সবকো সম্মতি দে ভগবান—

[মঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে এলো। নেপথ্যে সুর উঠলো : যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল, একলা চল, একলা চলরে—]

যবনিকা নেমে এলো।

॥ শেষ ॥

বাঘ ও হরিণ

সুধীর কাব্যশ্রী

বাঘকে বলে হরিণ এসে
একটি কথা শোনো,
হিংসা করা দাও ছেড়ে ভাই
নেই এতে লাভ কোনো।

পেট ভরে খাও ঘাস পাতা জল
মেজাজ হবে তাজা,
হিংসা যদি ছাড় তবে
করব তোমায় রাজা।

ভগবানের নামটি কর
তুলসী তলায় বসে,
মনের দুঃখ দূর হবে ভাই
মধুর ভাবের রসে।

আমার কথা শুনে তুমি
মুখ কর না কালো,
এবার তুমি ভালো হলে
বাসব তোমায় ভালো

বাঘ বলে, ভাই যা' বলেছ
সবই ভালো কথা,
জীবন হানি করা মানে
বড়ই নিঠুরতা।

এবার থেকে সাধু হয়ে
শুধুই হরিণ খাব,
রোজ হরিণের মাংস খেলে
হিংসা ভুলে যাব।

পূজোর ছুটি

উমা দেবী

পূজোর ছুটি এলে এবার কাশ্মীরে সব চল্,
যেখানে নীল আকাশ-তলে ভূস্বর্গ চঞ্চল।
আর রোদের সোনা-রঙ
ধরে কমলাফুলি ঢঙ।
নাচে ভঙ্গিভরে এঁকে-বেঁকে বরফ-গলা জল,
এদিক ওদিক ভেঙে নামে জোয়ার জাগা ঢল।

কোরাস— যাবোই আমরা যাবোই এবার কাশ্মীরে ভাই যাবোই,
কন্‌ফারেন্সে না হ'লেও হিল-কন্‌সেনন্‌ তো পাবোই।

বরফ ঢালা গিরির চূড়া রোদ্দুরে ঝকমক
কোথায় লাগে দুধের ফেনা—কোথায় লাগে বক—
হারে হীরামণির কুচি।
যদি শ্লেজিঙএ হয় রুচি
কিংবা যদি বরফ-ভাঙা স্কেটিং-এ হয় সখ,
পাহাড় ভেঙে চল ওপরে করিসনে বকবক!

বড়ও নয় ছোটোও নয়—বেছে নে তোর ঘোড়া—
সামনে পিছে ঝুঁকলে পড়ার কেয়ার করি থোড়া।
রেখে—রেকাবে দুই পা
রুখে সামনে উঠে যা—
দেখিসনে তোর পাশেই কোথায় ঝুলছে ডালে বোড়া,
সম্মুখে ঐ হাসছে যখন গিরি বরফ-মোড়া।

ঝিরঝিরিয়ে ঝরছে ঝোরা শৈলসানুতে,
মিলন-মেলা হচ্ছে যেন রাধায় কানুতে।
ঘোড়ার তেষ্টা যদি পায়—
যদি এদিক ওদিক যায়—
দু'পাশে তার দিসনে ঠোকা কঠিন জানুতে—
ঢিলে ক'রে দিবি লাগাম আলতো না ছুঁতে।

পেরিয়ে যাবি রূপালি ফার সুনীল পাইন গাছ,
দেখবি ঘোড়ার জল-ডিঙোনো উপল-ভাঙা নাচ।
যখন হ্রেষাধ্বনি করে,
উঠবে আমোদে মন ভরে,
তুইও তখন গান ছড়াবি যে সুর খুশি—বাছ,
নেইবা হলি নীলাকাশের পাখি—জলের মাছ।

চারদিকে আজ ডালিম ফুলের লাল-ঝাণ্ডার দল,
পথের পাশে ঝুলছে ডালে রাঙা আপেল ফল।
তোর ইচ্ছে যদি হয়
তুই নিবিরে নিশ্চয়—
মিঠে নাসপাতি যার মধ্যে থাকে সুবাস-ভরা জল
নীল-পদ্মের বেসাত-ঢালা দীঘির ছলাৎছল।

ঝিলম নদীর ঢেউয়ে দোলে নৌকো সারে সার—
চেনার বাগের ছায়ায় সবুজ রোদ্দুর দেদার।
ঘাসে ফুলের জাজিম পাতা
মাথায় নীলাকাশের ছাতা
তুষার গিরি চারপাশে তুই চক্ষু জুড়াবার
জেগে জেগে মিলবে সুযোগ স্বপ্নটি দেখার।

কোরাস— চলো এবার আমরা সবাই কাশ্মীরেতে যাই—
চরকডাঙা ফেলে যদি বরফ-ডাঙা পাই।

ডালদীঘিতে পদ্মফোটার লেগেছে মরশুম,
ঝাঁঝিয়ে ওঠে ভোমরাদেরও পাখ-কাঁপাবার ধুম।
যদি নিষাদ-বাগে যাও—
রাঙা আপেল ছিঁড়ে খাও—
পাক-ধরা নাসপাতির বাসে আসবে নাকো ঘুম
সন্ধ্যা মেঘে লাগবে যখন জাফরানি কুমকুম।

রুপালি ফার পপলার আর সুনীল পাইন গাছে,
উত্তুরে হিমেল হাওয়া কাশ্মীরি নাচ নাচে
আকাশ নীল ঝরোকা খুলে
রোদে সোনালি রঙ গুলে
আঁকে উজ্জ্বল পাহাড়গুলো দূরে এবং কাছে—
রোদ-বরণী মেয়ের মুখে সোনার যাদু আছে।

চেনার গাছের ডালে ডালে ফলেছে আখরোট,
রাত্রিবেলা রোজ সেখানে নীল-পরীদের জোট।
তাদের দাবা খেলার বোড়ে
তারা আখরোট ফল ছোঁড়ে,
অচেনা কেউ দেখলে তাদের বেজায় রকম চোট
রাজ্যি তাদের—যদিও কেউ দেয়নি কোনো ভোট।

কোরাস— যাবোই আমরা যাবোই এবার কাশ্মীরে ভাই যাবোই—
চেনার-পাতার কাঁচা-পাতায় পদ্মমধু খাবোই।

অজয় হোম

ফুটবল

ভেবেছিলাম সুপার লীগ শুরুই হবে না ওয়াড়ি ক্লাব মামলা করার জন্যে। কিন্তু সিটি সিভিল কোর্টের বিচারপতি মামলা খারিজ করে দেন। যে দু'জন খেলোয়াড়ের অন্তর্ভুক্তিতে ওয়াড়ির আপত্তি ছিল, তার যুক্তি মোটেই জোরদার ছিল না।

তোমরা যখন এখবর পড়ছ, তখন সুপার লীগ হয়তো শেষ হয়েছে। শীল্ডের খেলা চলছে। হয়তো বলছি একারণে বর্তমানে ফুটবলের যা পরিস্থিতি যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ না আঁচালে বিশ্বাস নেই। সুপার লীগে মোহনবাগান এখন দু'টো খেলাতেই বিজয়ী। ইস্টবেঙ্গল একটি পয়েণ্ট হারিয়েছে।

লীগের খেলা শেষ হল মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গলের খেলা চ্যারিটি হিসেবে। এই খেলাটিও হবে কি হবে না এই সন্দেহ দোলায় বহুদিন ঝুলেছিল। কোনও চ্যারিটি খেলা খুব উচ্চমানের হয় না তাই এখেলারও পরিণতি তাই হয়েছে।

খেলার কোনও বাড়তি আকর্ষণ ছিল না, একমাত্র বড় দলের সঙ্গে বড় দলের খেলা ছাড়া। খেলার এক মিনিট বাকি থাকতে একটি বিতর্কমূলক অফসাইড গোলে ইস্টবেঙ্গল জয়ী হয়। এই গোলটির জন্যে মাঠে খেলোয়াড় এবং সমর্থকরা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। তিন মিনিট খেলা বন্ধ থাকে। পরে অতীতদিনের দুই দিকপাল খেলোয়াড় বলাই দাস চট্টোপাধ্যায় এবং বর্তমান ফুটবল সম্পাদক করুণা ভট্টাচার্যের মধ্যস্থতায় মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা শুভবুদ্ধি ফিরে পান। বোঝেন রেফারির যে কোনো

সিদ্ধান্তকে মাঠের মধ্যে খুসি মনে নেবার শিক্ষাই প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি। খেলোয়াড়রা এই দুই সত্যিকারের স্পোর্টসম্যানের জন্যে খেলা ছেড়ে চলে যান না, শেষ মিনিটের বাকি খেলা শেষ করেন।

খুব ভালো লেগেছে আমার রেফারি শ্রীঘোষের স্বমতে অবিচল থাকা। তাঁর এই দৃঢ়তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। অফসাইড গোলটি রেফারির মতে যে খেলোয়াড় অফসাইডে ছিলেন তিনি খেলাতে কোনও অংশ গ্রহণ যেমন করেন নি তেমন করেন নি কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি। শুধু অফসাইডে অবস্থান অপরাধ নয় এই আইনের বয়ানে রেফারি অফসাইড দেন নি। কারণ ঘন ঘন বাঁশি বাজালে খেলার গতি মন্থর হয়ে পড়ে; কিন্তু ফিফার অধুনা নির্দেশ হল—আক্রমণে খেলোয়াড়ের অংশ থাক আর না থাক অফসাইডে থাকলেই তাঁর বিরুদ্ধে বাঁশি বাজানো উচিৎ। নিশ্চয়ই রেফারি শ্রীঘোষের ফিফার এই শেষ নির্দেশ মনে ছিল না। কিন্তু দর্শক সমর্থক খেলোয়াড়দের কোনো সময়েই ভুললে চলবে না যে মাঠে রেফারির নির্দেশই চূড়ান্ত।

খেলায় দুপক্ষেরই রক্ষণভাগে দুর্বলতা বড় প্রকট হয়ে দেখা গিয়েছিল। ইস্টবেঙ্গলের ৩ ব্যাক প্রথায় রক্ষণভাগের ব্যূহে ফাঁক যদিবা ক্ষমা করা বায় কিন্তু মোহনবাগানের ৪ ব্যাক প্রথায় কেন এমন ব্যর্থতা দেখা দিল! বিতর্কমূলক ওই অফসাইডের প্রশ্ন থাকলেও ইস্টবেঙ্গলের ফরোয়ার্ডরা সি প্রসাদ এবং কে সাহাকে পর পর কাটিয়ে তারপর গোল করেছেন। সময়ে সময়ে হাবিব, পরিমল দে, এ বি গাঙ্গুলী এবং অশোক চ্যাটার্জি খুবই ভালো খেলেছেন।

এই খেলার একটিমাত্র ভালো দিক হল যে অতীতদিনের দুঃস্থ খেলোয়াড়দের জন্য ৬৭,৭০০ টাকার এক অর্থভাণ্ডার গড়ে দিয়েছে।

সুপার লীগ খেলা হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, পোর্ট কনিশনার্স, বি এন আর এবং বাটার মধ্যে।

প্রথম ডিভিসন একক লীগের ফলাফল—ইস্টবেঙ্গল ১৬ খে, ১৩ জ, ৩ ড্র, ০ পরা, ৩০ গোল স্বপক্ষে, ২ গোল বিপক্ষে, মোট ২৯ পয়েন্ট। মোহনবাগান ১৬ খে ১২ জ ৩ ড্র ১ পরা ৩০ স্বঃ ৪ বিঃ ২৭ পয়েন্ট। তালিকার শেষস্থান পুলিসের। ১৬টি খেলায় মাত্র ৪ পয়েন্ট পেয়েছে। মহমেডাম স্পোর্টিং শেষ ৪টি ম্যাচ খেলে নি।

দ্বিতীয় ডিভিসনের ফলাফল—কুমারটুলি ১৬ খে ১৩ জ ৩ ড্র ০ পরা ২৬ স্বঃ ১২ বিঃ ২৯ পয়েন্ট। টালিগঞ্জ অগ্রগামী ১৬ খে ১২ জ ৪ ড্র ০ পরা ৩৮ স্বঃ ৬ বিঃ ২৮ পয়েন্ট। তালিকার শেষে বি ওয়াই এম ইউনিয়ন ১৬ খেলায় মাত্র ৪ পয়েন্ট লাভ করেছে।

তৃতীয় ডিভিসন—ভবানীপুর ১৬ খে ১৪ জ ১ ড্র ১ পরা ২৩ স্বঃ ৫ বিঃ ২৯ পয়েন্ট। বেহালা ইউথ ১৬ খে ১৩ জ ১ ড্র ২ পরা ২৮ স্বঃ ১৬ বিঃ ২৭ পয়েন্ট। তালিকার শেষে শ্যামবাজার ইউনাইটেড ১৬টি খেলায় ৫ পয়েন্ট পেয়েছে।

চতুর্থ ডিভিসন—চৈতালী সঙ্ঘ ১৭ খে ১৫ জ ১ ড্র ১ পরা ৩৮ স্বঃ ৯বিঃ ৩১ পয়েন্ট। বেলেঘাটা

এ সি ১৭ খে ১৩ জ ২ ড্র ২পরা ২০ স্বঃ ৪ বিঃ ২৮ পয়েণ্ট। তালিকার শেষে শ্যামবাজার ক্লাব ১৭ খেলায় ৫ পয়েণ্ট লাভ করেছে।

চ্যারিটি ম্যাচের শেষে বাড়ি ফিরছি, বাসে দুই ভদ্রলোকের কথোপকথন হচ্ছে। হঠাৎ কানে এল একজন উত্তেজিত হয়ে বলছেন ইন্দিরা গান্ধী তো ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীকরণ করলেন, কিন্তু সত্যিকারের উপকার হতো ফুটবলকে রাষ্ট্রীকরণ করলে। তারপর তাঁরা আর কি বলাবলি করছিলেন তা ভীড়ে হৈ হৈতে কানে আসে নি।

রাত্রে শুয়ে ওই কথাটা আবার মনে পড়ল। ভাবলাম, সত্যিইতো ফুটবল সারা পৃথিবীর জনসাধারণের খেলা। ভারতের মতো গরিব দেশে এর চেয়ে সস্তার খেলা আর কিছু হতে পারে না। সাজসরঞ্জাম এবং সামগ্রীর খরচ অন্য যে কোনও খেলার তুলনায় নগণ্য। অথচ একমাত্র এই খেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং অনুশীলন করলে দেশের যুবশক্তির স্বাস্থ্য ভালো হতে পারত।

রাষ্ট্রীকরণ করলে কেন্দ্রীয় সরকারকে সমস্ত রাজ্য সরকারের উপর অর্ডিনান্স জারি করতে হবে—ফুটবল অনুশীলনের জন্যে সাজসরঞ্জাম থেকে আরম্ভ করে খেলার উপযোগী জমিদখল ইত্যাদি সবরকম সুবিধা প্রতিটি রাজ্য সরকারকে খেলোয়াড়দের জন্যে করে দিতে হবে; বিশেষতঃ দরিদ্র পল্লীর আশেপাশের জমিতে যাদের আর কোনও খেলার ব্যবস্থা নেই। কেন্দ্রীয় সরকারকে যুব শক্তিকে উৎসাহ দিয়ে ফুটবল খেলাকে পৌঁছে দিতে হবে প্রতিটি গণ্ড এবং ক্ষুদ্রতম গ্রামেও।

টেনিস

বুখারেস্টে ডেভিস কাপের আন্তঃআঞ্চলিক সেমিফাইনালে রুমানিয়ার কাছে ৪-০ খেলায় হার স্বীকার করে ভারত এবছরের মতো বিদায় নিল। হারাটা ৫-০ খেলায় হতে পারতো, বৃষ্টি শেষ সিঙ্গলস্ খেলায় হারার হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। খেলা বন্ধ হবার সময় রুমানিয়ার সেভার ড্রন ভারতের আনন্দ অমৃতরাজের বিরুদ্ধে ২-১ সেটে এগিয়ে ছিলেন। অমৃতরাজের পাশা উল্টে যদি বিজয়ীই হতেন তবে সে জয়ের মূল্যে ভারতের কিছুই লাভ হতো না। কৃষ্ণানের পর আর চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে যাবার আশা নির্মূল হয়ে গেল। কৃষ্ণানের পর আর কাউকে তেমন দেখছি না যে তাঁর অভাব পূরণ করতে পারবে।

ক্রিকেট

ইংল্যাণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট জিতে অ্যাসেজ রেখেছে। সোবার্স ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলেন না। নিউজিল্যাণ্ড প্রথম টেস্টে ইংল্যাণ্ডের কাছে শোচনীয়-ভাবে ২৩০ রানে হেরেছে। দ্বিতীয় টেস্ট এখন চলছে, তাতে ইংল্যাণ্ডই জয়ী হবে বলে মনে হচ্ছে, একদিন বৃষ্টির জন্যে খেলা হয় নি।

(১) সব্যসাচী ও শর্মিলা বসু, ২৭৬৩, বয়স ১৬, ১০

ভাই তোমাদের কবিতাটির বিষয়বস্তু ও ভাষা ভালোই হয়েছে। কিন্তু মিলগুলো ঠিক হয় নি। 'শেষের' সঙ্গে 'বেশে' মেলে , কিন্তু বসে মেলে না। 'বাজীর' মঙ্গে 'কাজি' মেলে, কিন্তু রোজ-ই মেলে না। 'মাল্গার' সঙ্গে 'খেলা', কিম্বা 'মেলা'রসঙ্গে 'পালা'ও মেলে না , ভাই। গ্রাহক কার্ড পেয়েছ কি ? না পেয়ে থাকলে গ্রাহক সংখ্যা ইত্যাদি দিয়ে, আমাদের অফিসের ঠিকানায় চিঠি দিও। ওপরে গ্রাহক কার্ড ' লিখে দিও।

(২) শুভ্রা বিশ্বাস, ২০২৯, বয়স ১৪

কবিতা বা লেখা পাঠালেই যে ছাপা যায়, তা কিন্তু নয়। তবে একটু ভালো হলেই ছাপি। তুমি ১৭ বছর পূর্ণ না হওয়া অবধি, ধাঁধার উত্তর, চিঠিপত্র, প্রতিযোগিতা, হাতপাকাবার আসর সব কিছুতে যোগ দিতে পার।

(৩) মিত্রা রায় চৌধুরী, ১৪২৫, বয়স ১৩

কোন কোন বছরের বাঁধানো সন্দেশ কিনতে পাবে, সে তো পত্রিকাতেই ছাপা হয়। প্রায় প্রতি মাসে সব দেওয়া হয়। আমাদের অফিসেই পাবে।

(৪) সুতনু গুপ্ত, ২৩৬৩, বয়স ১৩

গ্রাহক কার্ড এখনো না পেলে আমাদের অফিসে লিখো। উপরে 'গ্রাহক কার্ড' লিখে দিও। তোমার হাতের লেখা বয়সের তুলনায় খুব কাঁচা হলেও, খুব স্পষ্ট, আমার একটুও অসুবিধা হচ্ছে না। পত্রবন্ধুর নাম ও সংখ্যা দিয়ে আমাদের অফিসে চিঠি লিখো। তা হলেই হল। কবিতাটি ভাই চলল না। কারণ মিলের গোলমাল আছে।

(৫) উত্তম কুমার বটব্যাল, ১৪৮১, বয়স ১২

তোমার ভ্রমণ কাহিনী মোটের উপর বেশ হয়েছে। তুই লাইনের মাঝে আরেকটু জায়গা রেখো, ভাই, সম্পাদকের সুবিধার জন্য।

(৬) সন্দীপন দেব, ২০৪০, বয়স ৬ বছর ১০ মাস

'সন্দেশ' অফিসে আগে থেকে জানিও কি কি বই চাও, তাহলে সব রকমের বই-ই দেখতে

পাবে। গ্রাহকদের জন্য দাম-ও টাকায় দশ পয়সা করে কমিয়ে দেওয়া হয়। কলেজ স্ট্রিটের দোকানেও প্রায় সব বই পাবে (আগে থেকে জানালে)।

(৭) লিপি ঘোষ, ২৩০০, বয়স ১২

এখনো গ্রাহক কার্ড না পৌঁছে থাকলে, অফিসে জানিও। এখনকার ধারাবাহিক গল্প ভালো লাগছে না?

(৮) অসিত নাথ ভট্টাচার্য, ২৬৫৩, বয়স ১১

২৫শে বৈশাখ তুমি কি করেছিলে? শীগ্‌গিরই রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বিস্তারিত-ভাবে গল্পেসল্পে বেরুবে।

(৯) তপন বিকাশ সাহা, ২৪৫৪, বয়স ১২

তোমাদের হোস্টেল গ্রাহক হলেই, তুমিও গ্রাহক হলে। ঐ সংখ্যা দিয়ে তোমারো চলবে। পুরস্কার প্রতিযোগিতা ছাড়া সব কিছুতেই যোগ দিতে পারবে।

(১০) শুভ্রা সান্যাল, ২৫৯৯, বয়স ১১½

তুমি গ্রাহিকা হয়েছ বলে, শুধু তুমি কেন, আমরাও খুসি হয়েছি। কবিতাটি কিন্তু চলল না ভাই। তোমার নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে গদ্যে কিছু লেখো না কেন?

(১১) বাণী সরকার, ২১৭৫, বয়স?

ভালো লেখা হলেই ছাপা হয়, তার মধ্যে ভালোবাসার কথাই ওঠে না। গুপী-গাইনের গল্প ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীই লিখেছিলেন, সত্যজিৎ রায় প্রয়োজন মত অদল-বদল করে তাকে চিত্ররূপ দিয়েছিলেন। এ কথাই তো সর্বদা বলা হয়।

(১২) জয়ন্তী রায় চৌধুরী, ১৩৬৮।

তুমি ১৯৬৮ সালের চতুর্থ শ্রেণীর প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় কলিকাতা কেন্দ্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছ জেনে খু—উব খুসি হলাম। তুমি আমাদের অভিনন্দন জেনো। বড় হয়েও সব পরীক্ষায় এমনি ভাল করবার চেষ্টা করো—কেমন?

(১৩) অনামী, মনামী ২১৯৪, বয়স ১২, ১৫।

তোমাদের পাঠানো সুন্দর রাখী পেয়ে ভারি খুসি হলাম।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

নতুন গ্রাহকেরা (আর পুরোন গ্রাহক যারা পাওনি) তারা যদি সম্পাদকের সই করা গ্রাহক কার্ড চাও, তাহলে কার্যালয়ে চিঠি লেখো।

যে সব ভাই বোনদের নাম নতুন যোগ করা হয়েছে তারাও আলাদা কার্ড পাবে। তারাও লেখো।

লেখো—'আমি গ্রাহক কার্ড পাইনি, আগামী মাসের সন্দেশের সঙ্গে তা পাঠিয়ে দেবেন। ইতি—নাম, ঠিকানা, গ্রাহক সংখ্যা।

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

বুড়ো জেলে তার ছোট ছেলে আর আমি

জীবন সর্দার

মাছ ধরার কায়দাকানুন আমার জানা নেই কিন্তু মাছ ধরা দেখতে আমার ভারি ভাল লাগে। ছিপ হাতে, জাল কাঁধে কিংবা মাছ ধরার ফাঁদ নিয়ে কোন লোককে দেখলেই তার পিছু নিয়েছি অনেকদিন। তারা মাছের স্বভাবের, হাবভাবের, নানান খবর দিতে পারে।

যবে থেকে মানুষ শিকার করছে ডাঙ্গায়, হয়তো, তখন থেকেই মানুষ মাছ ধরছে। চাষ আবাদ শেখার পর থেকেই বনে বনে শিকার করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে কিন্তু মাছ ধরা বন্ধ হলোনা। বরং মাছ ধরার কৌশল আরও ভাল হয়েছে এখন। ডোবা পুকুর খাল নদীর পর মাঝ সাগরেও জাল পড়ছে মাছের। মাঝ সাগরে মাছ ধরা দেখিনি। আন্দামানে একটি দ্বীপের সমুদ্রতীরে একটি বুড়ো জেলে আর তার ছেলেকে মাছ ধরতে দেখে দাঁড়ালাম। ছিপ দিয়ে নয়, নাইলনের সুতোয় বড়শি বেঁধে তাতে মাছের টোপ গেঁথে ছুঁড়ে দিচ্ছে ডাঙ্গা থেকে বহুবার সুতো টেনে দেখলে টোপ উধাও, মাছ ধরা পড়েনি। হঠাৎ একবার একটানে ছেলেটি তুলে নিয়ে এলো ডোরাকাটা সবুজ একটি মাছ।

সবুজ মাছটির গায়ে আঁশ নেই। চোখের পেছন থেকে পিঠের উপর দিয়ে লেজ অবধি দুটো আর কানকোর ধার থেকে পেটের পাশ দিয়ে লেজ অবধি দুটো, মোট চারটি ডোরায় তাকে দেখতে হয়েছে চমৎকার। পাঁচটি শুঁয়ো চ্যাপটা মুখের চারপাশে বেড়ালের গোঁফের মত উঁচিয়ে আছে!

মাছটির খাবি খাওয়া দেখে আমার কষ্ট হলো। বঁড়শি থেকে ওটাকে ছাড়াবার জন্য হাত বাড়াতেই, বুড়ো জেলে থামো থামো বলে ছুটে এলো। বললে, এ মাছ ধরলেই কাঁটা ফুটিয়ে দেবে। কাঁটায় বিষ আছে ভীষণ জ্বালা করবে। আমি বললাম, যেমন সিঙ্গি মাছে হয়? সে শুধু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বঁড়শি নেড়ে নেড়েই মাছটি ছাড়িয়ে ফেললে। জলে পড়ে মাছটি অসাড় হয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর আর দেখা নেই। মাছটির চলে যাওয়া দেখছিলাম আমি বুড়ো জেলে দেখছিল আমাকে। বঁড়শির সুতো ঘোরাতে ঘোরাতে সে বললে, মাছ ধরবেন?

আমি বললাম, মাছ ধরার কায়দা কানুন আমার জানা নেই। মাছধরা দেখতেই ভালবাসি। তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, যে মাছটি ছেড়ে দিলেন তার নাম কি?

বুড়ো মানুষ কথা বলার লোক পেয়ে গেল। মাছটির নাম সে বললে না, বললে, মাছের নাম দিয়ে কি হবে, খেতে পারলেই হলো। খাবার জন্য মাছ ধরা। কে কোথায় কবে কোন মাছের কি নাম দিয়ে দিয়েছে

এখনও সেই নাম চলছে সেখানে। খেতে কেমন, দেখতে কেমন কোথায় যাবে কি খায় আসল নাম হওয়া উচিত তা দেখে।

সত্যি কথা। যে মাছটি ধরতে দেখলাম, তাকে সিঙ্গি মাছ বলে চালানো যায়—দেখতে তেমনি। কিন্তু ওরা হয়তো বলে 'বিল্লি'। খাদ্য খাদক হিসেবে যে কটি মাছ চিনি তাদের স্বভাব খানিকটা জানি তার বাইরে আমাদের জ্ঞান কম। কারণ, মাটি আর হাওয়ার জগত থেকে জলের জগৎ একদম ভিন্ন। জলের তাপ চাপ তার স্রোত রং এমন কি গাছ পাহাড় কিছুই আমাদের ডাঙ্গার জগতের সাথে মেলে না। মাছের আকার গড়ন ঠিক তার পরিবেশ অনুযায়ী। তাই বোধহয়, মাছ যেভাবে নিশ্বাস নেয়, খাবার খায়, চলে বেড়ায়, জন্ম দেয় নতুন মাছের তার সাথে ডাঙ্গার প্রাণীর মিল নেই। ডাঙ্গার পশুপাখির কত রকমফের, তাও তো পরিবেশের জন্য। 'জল-পরিবেশের' রকমফের যত মাছেরও রকমফের তত। কিন্তু ওদের সামান্য মিল কি কিছু নেই!

আমাকে এতক্ষণে চুপচাপ থাকতে দেখে, বুড়ো জেলে, মুখ থেকে বিঁড়ি সরিয়ে বললে, আগে আমি চিলকায় মাছ ধরতাম জাল দিয়ে। এখন জাল টানার জোর নেই হাতে। তাই সুতো টানি। সুতোর বড়শিতে জলের তলার দিকের মাছগুলোই ধরা পড়ে, সেগুলো মাটি থেকে খুঁটে খায়। জাল দিয়ে নানারকম মাছ ধরেছি। লক্ষ্য করবেন, প্রায় সব মাছগুলোরই পিঠের রং গাঢ়, কারো নীলচে কারো বা সবজে, আর পেটের রং শাদা। মাছের ঝাঁক যখন জলের উপর ভেসে ওঠে পিঠের রং মিলে যায় জলের রংএর সাথে। কিন্তু কোন জাতের মাছ কি খায় তা জানি বলেই জায়গা বুঝে জাল পাততুম। ঝাঁক আসার অপেক্ষায় থাকতুম না।

ইলিশ ধরেছেন কখনো? আমি জিগগেস করলাম। খুব, খুব ধরেছি—সে বললে! ইলিশ নোনা জলের মাছ, আরো বললে সে; চিলকার জল নোনা, ইলিশ সেখানে অনেক তবে খেতে খুব ভাল না। ইলিশ মাছ বর্ষার নদীর উজান ঠেলে, সমুদ্র থেকে উৎস মুখে চলে। চিলকা থেকে উজান ঠেলে যাবার মত এমন নদী নেই, যেমনটি গঙ্গা।

গঙ্গা রূপনারায়ণ আর ইছামতীতে আমি ইলিশ ধরা দেখেছি। মাঝনদীতে আড়াআড়ি জাল ফেলে সারাদিন কিংবা সারারাত কাটিয়ে দেয় জেলেরা নৌকোয়। স্রোত উজিয়ে আসতে ইলিশ দুটো চারটে করে আটকা পড়ে জালে। সময় বুঝে জেলেরা জাল গুটিয়ে তোলে। বর্ষার নদীর জলে ইলিশ ডিম ছাড়তে ঢোকে সবাই বলেছে। আমি রুই কাতলার ডিম জোগাড় করতে দেখেছি জেলেদের। ডিম ফুটলে চারামাছ নিয়ে কারবার করে তারা।

যে কথা আমি ভাবছিলাম সে কথা তাকে বলার আগেই তার সুতোয় টান পড়ল। কি মাছ কে জানে, খুব টানাটানি চলল কিছুক্ষণ তারপর বড়শি ছিঁড়ে পালিয়ে গেল মাছটা। কিছুক্ষণ বেশ উত্তেজনায় কেটে গেল। খেয়াল করিনি মেঘে আকাশ কখন ঢেকেছে। ঝেঁপে বৃষ্টি নাবল। বুড়ো জেলে নড়ল না জায়গা ছেড়ে, আমি আর ছেলেটি ছুটে জেলেদের ছাউনীতে এসে দাঁড়ালাম।

আমরা দুজন যেখানে এসে দাঁড়ালাম তার পাশেই জেলে ডিঙ্গিগুলি উঁচু হয়ে রয়েছে। আর একটু নীচে নাবলেই হাঁটু জল সেখানে। জলে ডোবা কাঠের গুঁড়ি থেকে একটি ডোরাকাটা চাঁদামাছ খুঁটে খুঁটে শ্যাওলা খাচ্ছে। ছোট ছেলেটিও তাই দেখছিল। রং বেরংএর ছোট মাছগুলির চলাফেরা ভারি মজার দেখতে।

এই মাছগুলি ধরনা কেন তোমরা? আমি জিগগেস করলাম।

যে মাছ কেউ খায় না তা ধরে কি হবে—সাফ জবাব তার।

কেন, রং বেরং মাছ লোকে পোষে সখ করে। বিক্রি ত' হবে। কথার মোড় ঘুরিয়ে বললাম, সুন্দর রং বেরংএর আর কি কি মাছ এখানে দেখতে পাওয়া যায়!

হরেক, হরেক রকম। ভাঁটায় যখন জল নাববে আরও, এক টুকরো খাবার ফেলবেন জলে, দেখবেন লাল নীল হলুদ সবুজ কত মাছ আসবে। কোন কোন মাছ শুধু শ্যাওলা, জলের পাতা গাছ খায়, তারা আসবে না। আমি ঠিক করলাম, আচ্ছা পরীক্ষা করা যাক।

বৃষ্টি ধরে গেল খানিক বাদে। আরও কিছু পরে, ভাঁটায় জল কমে গিয়ে তলার মাটি স্পষ্ট দেখা দিল। হলুদ, বালি আর কালো পাথরের উপর এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে। আমরা সেই হাঁটু জলে রঙিন মাছের আসা যাওয়া দেখতে পারতাম। ছোট ছেলেটি ওর বঁড়শিতে ধরা একটি মাছ ছিঁড়ে ছিটিয়ে দিল জলে। কোন মাছের দেখা নেই। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে তবুও। সবার আগে এলো ডোরাকাটা চাঁদা মাছ। হলুদ গা, খয়েরী ডোরা পিঠ থেকে পেটের তলা অবধি। টুকরো মাছ ছুঁলোনা সে। পাথরের গা থেকে শ্যাওলা খেতে শুরু করলো আপন মনে। আমাদের পায়ে ঠুকরে গেল বালু রংএর ইঞ্চি দুয়েক বড় চারটে মাছ। ওদের কিছু খেতে দেখলাম না। অল্প একটু জলে কিলবিল শুরু করে দিল। মাছের টুকরোগুলি নিয়ে গেল লালচে রংএর কটি মাছ। এ ওর মুখ থেকে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল। এক ছুটে খাবার নিয়ে এক জায়গায় থেমে খাবারটি গিলে আবার এলো খলসে জাতীয় একটি মাছ। ইঞ্চি দুয়েক লম্বা। মোটা শরীর চওড়া লেজ। পাখনা গুলো দেহের তুলনায় বড়। সারা গায়ে লাল আর নীল ডোরা ডোরা। পাখনা গুলোতে লাল নীল ছিট ছিট। মাছ গুলো ঝাঁক বেঁধে এলো। দেখলো খাবার কিছু আছে কিনা। পেলনা। ফিরে গেল গভীর জলের দিকে। জল কমছে। আমরাও এগিয়েছি গভীর জলের দিকে। আমাদের পা চারটের নড়াচড়া বন্ধ হলেই মাছের আনাগোনা শুরু হয়। ডাইনে বাঁয়ে সামনে সবদিকেই রঙিন মাছের মেলা। ছোটছেলেটি একবার জলের উপর হাতের চেটো দিয়ে ছপ্ ছপ্ করে শব্দ করতেই, ওর হাতের কাছে এক কড় সমান লম্বা শাদা এক ঝাঁক মাছ ছুটে এলো। শব্দ শুনেই এসেছিল। শব্দ থেমে গেল। খাবার পেলনা। ফিরে গেল। যে দিকে ওরা গেল, সে দিকেই চক্ চক্ করে উঠলো একটি সোনালী মাছের গা। মাছটি দেখতে আর একটু এগোতে গিয়ে বাধা পেলাম ছেলেটির কাছে।

সে বললে, এর পরেই গভীর জল। চলুন ফিরি।

নতুন পড়ুয়া: প্রপ ১৫৬। উৎপল কুমার চক্রবর্তী। কলকাতা।
প্রপ ১৫৭। সত্যশ্রী উকিল। শান্তিনিকেতন।

[সমস্ত পড়ুয়াদের প্রথম কাজ নিজ নিজ পরিবেশের বিবরণ দপ্তরে জানানো। যারা নতুন প্রকৃতি-পড়ুয়া হয়েছ, ছোট্ট করে লিখে তোমাদের প্রাকৃতিক-পরিবেশের বিবরণ শিগ্গির আমাকে জানাও। জী. স.]

পিসে রহস্য

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছগনলালের পিসের সঙ্গে পরিচয়টা অনেকদিনই,
শুনলে কিন্তু অবাক হবে—আজও তাঁহার মুখ দেখিনি।
ভাবতে পারো চিঠিপত্রে চলে তবে আদান প্রদান,
কিংবা তিনি টেলিফোনে দূরের থেকে কুশল শুধান,
কিংবা হয়তো আমার পিসের হবেন তিনি মাসতুতো ভাই,
পিসীর বাড়ি এ-ওর খবর তিনিও পান, আমিও পাই।

মোটেই তা নয়, খবর কোনও কষ্ট ক'রে হয় না পেতে,
ঘটে মোদের নিত্য দেখা লোক্যাল ট্রেনে হাওড়া যেতে!
কলকাতাকে চাকরি করি আমি, নিতাই, হরেন, বরেন;
ছগনলালের পিসেও বোধ হয় তেমনি কোথাও চাকরি করেন

ব্যাণ্ডেলেতে আমরা সবাই ট্রেন ধরি রোজ 'আটটা নয়'-এ,
এক কামরায় প্রায়ই উঠি: সত্যি বলছি, ঠাট্টা নয় এ,—
তবুও তাঁর মুখ দেখিনি। ভাবছ বোধ হয়, নেশার ঘোরে
বকছি প্রলাপ? তা নয়, ভায়া, বলছি কালীর দিব্যি ক'রে,
খাইনেকো মদ, গাঁজা, গুলি। ভাবছ কি হে বোকার মতো?
ব'ললে খুলে মালুম হবে—বিষয়টা নয় জটিল তত।

ঠাকুর যখন চোখ দিয়েছেন—দেখতে তখন নেইকো বাধা—
ছগনলালের পিসের মূর্তি,—ঘাড়টা ছোটো, পেটটা নাদা ;
দিন দু'বেলা দেখছি তাঁহার বিপুল বপু গাঁট্টা গোট্টা,
গ্রীষ্মকালে পাঞ্জাবী আর শীতের সময় ওভার কোটটা ;
বিরাট টিফিন-ক্যারিয়ারটা দেখেছি তার নিত্যসঙ্গী ;
(ছগনলালের সঙ্গে মেলে ভদ্রলোকের চলার ভঙ্গী)।

দেখেছি তাঁর গরুড়-নাসা, কোটরগত চক্ষু দু'টি,
প্রশ্ন কিছু করলে পরেই জোড়া ভুরুর জোর ভ্রূকুটি।
সব দেখেছি, কেবল তাঁহার মুখ না দেখার কারণটা এই,—
নাকের নীচে আকণ্ঠ মুখ গোপন থাকে কম্ফটারেই।
কি বসন্ত, কিবা শরৎ, কিবা নিদাঘ, বর্ষা কি শীত—
কম্ফটারের মধ্যে বন্দী মুখখানি তাঁর দিবস-নিশীথ।
সবাই যখন মরছি ঘেমে বোশেখ মাসে দারুণ গ্রীষ্মে—
হাসিও পায়, দুঃখও হয় কম্ফটারের করুণ দৃশ্যে।

কেউ বা বলে, 'ভদ্রলোকের মাথায় আছে ইস্ক্রু ঢিলে।"
কেউ বলে, 'ভয় দেখলে শ্রীমুখ চমকে যাবে পেটের পিলে।'
নানান রকম সন্দেহেতে নিন্দে রটায় বদ্‌লোকেরা,
কেউ বা বলে, 'গন্না-খাঁদা, ভদ্রলোকের ঠোঁটটা চেরা।'
কেউ বলে, 'ওঁর নীচের গালে 'শ্বেতী' আছে,' কেউ বলে, 'আব।'
কেউ বলে, 'না, গলগণ্ড।' ঠিক যে কি তার প্রমাণাভাব।

'দুর্ঘটনায় গেছে কাটা 'থুৎনি'টা ওঁর' কেউ বা বলে।
কা'রও মতে ছগনলালের বিষয় নিতে ঠকিয়ে ছলে
সাজল পিসে জালিয়াৎ এক, ধরা পড়ার তাই এত ভয়।'
কেউ বলে 'বিপ্লবীদলের ফেরারী কেউ হবেন বোধ হয়।'
কেউ বলে 'ও ছগনলালের হারিয়ে যাওয়া খুড়তুতো ভাই।
বয়স আরও বেশি হ'ত হ'লে আসল পিসে মশাই।
তারকবাবু সোজা মানুষ, বলেন, 'কেন বাড়াও কথা ?
টনসিলেতে দোষ আছে তাই সর্বদা এই সতর্কতা।'

কেউ বা বলে, 'গোয়েন্দা ও, মোদের পরে নজর রাখে ;
ছুতো পেলেই ফাঁসিয়ে দেবে যায় না বলা কখন কা'কে ?'
এমনি নানা আলোচনা চুপি চুপি চলত, ক্রমে
প্রকাশ্যেতেই হ'ল শুরু শুনিয়ে ওঁরে ; জোর কদমে
যখন চলে নিন্দেবান্দা করতে তাঁকে অভিযুক্ত,—
তিনি তখন কাগজ পড়েন সকল বিকার চিহ্নমুক্ত।

কালা যে নন বেশ বোঝা যায়, বোবা কিনা বোঝাই কঠিন।
তিন বছরে একটি কথা শোনেনি কেউ। প্রতিটি দিন
করেন ডেলি প্যাসেঞ্জারি ; ট্রেনে ক'রেই আসন গ্রহণ
'যুগান্তর' বা 'বসুমতী' পাঠে তিনি নিমগ্ন হন।

কোনও দিন বা পড়েন নভেল, কোনও দিন বা ধর্মগ্রন্থ ;
স্টেশনেতে নেমেই ছোটেন বাস ধরিতে হন্তদন্ত।
কোন্‌খানে যান জানবে বলে কানাই সেদিন নিছল পিছু,
ঘণ্টাখানেক মিথ্যে ঘুরে ফিরেছে না-জেনেই কিছু।
পিছন ফিরে যেই চেয়েছেন কটমটিয়ে পিসেমশাই
কানাই দেছে ভঙ্গ রণে, আছাড় খেয়ে কলার খোসায়।

বিপিন গড়াই নাছোড়বান্দা, হাওড়া থেকে করলে 'ফলো'
বেলেঘাটায়, সেখান থেকে চেতলা হাটে হাজির হ'ল ;
এসপ্ল্যানেডে বাস ছেড়ে সে পিসের পিছে উঠল ট্রামে ;
কুমোরটুলির কাছে নেমে পাক খাইয়ে ডাইনে বামে
গলি ঘুঁজির গোলক ধাঁধায়—বাগবাজারের ট্রাম ডিপোতে
হঠাৎ পিসে উধাও হলেন। বেকুব বনে সেখান হ'তে
ফিরল বিপিন অনেক রাত্রে। বিষ্ণুচরণ পরের দিনই
লা'গল ডিটেক্‌টিভের কাজে, উঠল বাসে টিকিট বিনি ;
চীৎপুরেতে পিসের পিছে যেই নেমেছে, খপাৎ ক'রে
ছগনলালের পিসের এক হাত বজ্র মুঠোয় ধরল ওরে ;

আর এক হাতের আঙুল তুলে মোড়ের পুলিস দেখিয়ে হেসে
এক ঝাঁকুনি দিয়ে হাতে চলতি বাসে এক নিমেষে
লাফিয়ে তিনি গেলেন উঠে। বিষ্ণুচরণ হাতের ব্যথায়
কষ্ট পেল হপ্তাখানেক, আর থাকে না পরের কথায়।
ছগনলালের আদিনিবাস মোগলসরাই কিংবা কাশী,
খাস-বাঙালী এখন তারা তিনপুরুষে হুগলীবাসী।
ক্লাস নাইনের সহপাঠী ছিল ছগন, বছর বারো
তার পরে আর নেই যোগাযোগ, খোঁজ রাখিনি কেউ কাহারও।

আসল কারণ শহরে তার বাড়িটা নয় মোদের পাড়ায় ;
কাটাই ব্যস্ত উদয়াস্ত আমরা যে-যার কাজের তাড়ায় ;
ক্বচিৎ দেখা পথে ঘাটে ঘটত আগে, বন্ধ আছে
তাও ইদানীং নানা রকম গুজব শুনি লোকের কাছে ;
দেনায় দোকান বিকিয়ে গেছে, ছগনলালের নেই কো পাত্তা
চারটি বছর ; বউ মরিতেই হিমালয়ের কোন্ মহাত্মা

এসে নাকি দীক্ষা দেছেন, তাই হয়েছে সন্ন্যাসী সে।
বছর খানেক যেতেই বাড়ির দখল নেছেন এই এক পিসে।
পিসি কবে হলেন গত, কোথায় ছিলেন কেউ জানে না।
ছগনলালের দেখিয়ে চিঠি,—শোধ ক'রে তার বাজার দেনা
আছেন তিনি নির্বিবাদে, কাউকে কিন্তু মুখ না দেখান।
কা'রও সঙ্গে কন না কথা, একলা ঘরে স্বপাকে খান।
রাখেন নাকো চাকরবামুন,—গোপন কথা শুধাই কাকে?
জানান তিনি পত্র লিখে যারে যা তাঁর বলার থাকে।

প্রশ্ন করে পায়নি জবাব,—পাড়ার লোকে হাল ছেড়েছে।
সন্দেহেতে নিন্দে করে মন্দ লোকের গাল ভেরেছে।
ক্লাইভ স্ট্রিটে হঠাৎ সেদিন দেখা সুদাম শেঠের সঙ্গে,
খোস-খবরের এমন গেজেট মিলবে নাকো রাঢ়ে বঙ্গে।
কথায় কথায় বললে সুদাম, গেছল নাকি নেমন্তন্ন
ছগনলালের ছেলের ভাতে। 'ভেক নিয়ে মাস কয়ের জন্য
হৃষীকেশের আশ্রমে সে পাকড়েছে এক জবর শ্বশুর।
ছগনলালের ভাগ্য ভালো, আদর যত্নের নেইকো কসুর।'

আমরা অবাক। 'বলিস কিরে? করছে কি সে।' বললে সুদাম,
'পত্নীভাগ্যে লুঠছে টাকা। শালিমারে মস্ত গুদাম,
ধর্মতলায় বসেন শ্বশুর; পোস্তাতে তাঁর গদির চার্জে
আছে ছ জন; পোক্ত হচ্ছে সেইখানে কারবারের কার্যে।
ভবিষ্যতে সেই তো মালিক, বউ যে বাপের একটি মেয়ে,
ছেলে তো নেই। আমরা বলি, ঘরজামাইয়ের চাকরি পেয়ে
তাই বলে কি এমনি করেই কাটাতে হয় দেশের মায়া।
সুদাম বলে ছগন মোদের তেমন ছেলে নয় কো, ভায়া।

শ্বশুরবাড়ি রয় না বেশী, হুগলীতে যায় রোজ রাতে ও।
টিফিন ক্যারিয়ারে ভ'রে চর্বচুষ্য লেহ্যপেয়
প্রচুর খাদ্য বউ সাথে দেয়, রাতের আহার তাতেই চলে।
শ্বশুর দেখে মর্যাদাবোধ বড়োই খুশি। কেউ তা হলে
দেখতে কেন পায় না তাকে। সুদাম বলে উচ্চ হেসে,
তোদের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করে, ছদ্মবেশে
তাই সে করে রোজ যাতায়াত। পুড়িয়ে পৈতে, মুড়িয়ে মাথা
ছগন যখন গেরুয়া নেয়—জানল পাড়া; এখন যা তা
ব'লবে সবাই—সেই ভয়ে সে মুখ ঢাকে রোজ আসতে যেতে।
সুখের দিনে সাধ করে তার কষ্ট ঐ এক হচ্ছে পেতে।

এতক্ষণে ছগনলালের পিসের হল রহস্যভেদ।
সবাই ছিলুম বেকুব বনে—মনের মধ্যে রইল এ খেদ।
বিপিন, কানাই এ বৃত্তান্ত যে শুনবে সেই উঠবে ক্ষেপে।
রাত পোহালে হবেই দেখা, তখন হঠাৎ ধরব চেপে—
আমরা মিলে সাত আট জনে ; যতই জোয়ান হোক বাছাধন—
গায়ের জোরে পারবে না কো ; ছিঁড়ব টেনে মুখের বাঁধন।
তার পরেতে আশ মিটিয়ে মারব গাঁট্টা চাপড় চাঁটি ;
বিয়ের ভোজে বাদ পড়েছি—করব আদায় সেই খাওয়াটি—
নিদেন পক্ষে একশ টাকা ফাইন। ছগন লালের পিসে
লোকটা ধূর্ত ছদ্মবেশী—প্রথম থেকে জানতামই সে।
সমস্যাটার সমাধানে ভুল করেছি একটু খালি,
ফেরারী নয়, গোয়েন্দা নয়,—আসলে সে ছগনলালই।

বাঘ এসেছে॥

পরিমল ভট্টাচার্য

বাঘ এসেছে বাঘ এসেছে
হালুম হালুম ডাক !
টিটু মিঠু আঁৎকে উঠে
বাপরে ! বিকট হাঁক !
ঘরের ভেতর চ্যাঁচায় দাদু
ঠানদি চ্যাঁচায় সাথে।
পড়শিরা সব ছুটে এল
বর্শা লাঠি হাতে।

কেউ বা বলে ঝোপের ভিতর
ঐ দেখা যায় কালো
হৈ হৈ রৈ লাফ দিয়ে বাঘ
ঐ তো রে পালাল।
ধর ধর ধর—পড়ল ধরা।
দেখ রে চুপি চুপি।
সত্যিকারের বাঘ নয় ভাই
ছিনাথ বহুরূপী !!

১২ই অক্টোবর

আজ সকালে উশ্রীর ধার থেকে বেড়িয়ে ফিরছি, এমন সময় পথে আমার প্রতিবেশী অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোকের হাতে বাজারের থলি। বললেন, আপনাকে সবাই একঘরে করবে, জানেন ত। আপনি যে একটি আস্ত শকুনির বাচ্চা ধরে এনে আপনার ল্যাবরেটরিতে রেখেছেন, সে কথা সকলেই জেনে ফেলেছে। আমি বললাম, 'তা করে ত করবে। আমি ত তা বলে আমার গবেষণা বন্ধ করতে পারি না।'

অবিনাশবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'তা আর কী করে করবেন ; কিন্তু তাই বলে আর জিনিস পেলেন না। একেবারে শকুনি !'

শকুনির বাচ্চা যে কেন এনেছি তা এরা কেউ জানে না, কারণ আমি কাউকে বলিনি। শকুনির যে অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি আছে সেইটে নিয়ে আমি পরীক্ষা করছি। শকুনির দৃষ্টিশক্তিও অবিশ্যি অসাধারণ ; কিন্তু টেলিস্কোপ মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে মানুষও তার দৃষ্টিশক্তি অনেকটা বাড়িয়ে নিতে পারে। ঘ্রাণশক্তি বাড়ানোর কোন উপায় কিন্তু আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। সেটা সম্ভব কিনা জানার জন্যই আমি শকুনি নিয়ে পরীক্ষা করছি। অবিশ্যি বৈজ্ঞানিকেরা গিনিপিগ জাতীয় প্রাণী নিয়ে যেসব নৃশংস পরীক্ষা করে, সেগুলো আমি মোটেই সমর্থন করি না। আমি নিজে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে কখনো কোন প্রাণীহত্যা করিনি। শকুনিটাকেও কাজ হলে ছেড়ে দেব। ওটাকে আমারই অনুরোধে ধরে এনে দিয়েছিল একটি স্থানীয় মুণ্ডা জাতীয় আদিবাসী।

অবিনাশবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়িমুখো হব। এমন সময় ভদ্রলোক একটা অবান্তর প্রশ্ন করে বসলেন—'ভালো কথা—গোরিলা জিনিসটাত আমরা কলকাতার জু গার্ডেনে দেখিচি, তাই না ?'

বুঝলাম ভদ্রলোকের জন্তুজানোয়ার সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই কম। মুখে বললাম, 'মনে ত হয় না ; কারণ বাঁদর শ্রেণীর ও জন্তুটি ভারতবর্ষের কোনো চিড়িয়াখানায় কোনদিন ছিল বলে আমার জানা নেই।'

খামখা তর্ক করতে অবিনাশবাবুর জুড়ী আর নেই। বললেন, 'বললেই হল। পষ্ট মনে আছে একটা জাল দিয়ে ঘেরা খোলা জায়গায় বসিয়ে রেখেছে, আমাদের দিকে ফিরে ফিরে মুখভঙ্গী করছে, আর একটা সিগারেট ছুঁড়ে দিতে দু আঙুলের ফাঁকে ধরে মানুষের মত—'

আমি বাধা না দিয়ে পারলাম না।

—'ওটা গোরিলা নয় অবিনাশবাবু, ওটা শিম্পাঞ্জি। বাসস্থান আফ্রিকাই বটে, তবে জাত আলাদা।'

ভর্দলোক চুপসে গেলেন।

—'ঠিক কথা। শিম্পাঞ্জিই বটে। ষাটের উপর বয়স হল ত, তাই মেমারিটা মাঝে মাঝে ফেল করে।'

এবার আমি একটা পালটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

'আপনার হঠাৎ গিরিডিতে বসে গোরিলার কথা মনে হল কেন ?'

ভদ্রলোক তাঁর প্রায় তিনদিনের দাড়িওয়ালা গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন ওইযে কাল কাগজে বেরিয়েছে না—আফ্রিকার কোথায় নাকি এক বৈজ্ঞানিক গোরিলা নিয়ে কী গবেষণা করছেন, আর তার কী জানি বিপদ হয়েছে—তাই আর কি।'

আমি যখন কোন জরুরী গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকি, তখন আমার খবরের কাগজ টাগজ আর পড়া হয় না। তাতে আমার কোন আক্ষেপ নেই, কারণ আমি জানি যে আমার ল্যাবরেটরিতে যেসব খবর তৈরি হয়, বহুকাল ধরেই হচ্ছে, তার সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোন খবরের কোন তুলনাই হয় না। তবুও গোরিলার এই খবরটা সম্পর্কে আমার একটা কৌতূহল হল। জিগ্যেস করলাম, 'বৈজ্ঞানিকের নামটা মনে পড়ছে ?'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'দূর্‌! আপনার নামই মাঝে মাঝে ভুলে যাই, তার আবার··· আপনাকে বরং কাগজটা পাঠিয়ে দেবো, আপনি নিজেই পড়ে দেখবেন।'

বাড়ি ফেরার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই অবিনাশবাবুর চাকর বলরাম এসে কাগজটা দিয়ে গেল। খবরটা পড়ে ভারী আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বৈজ্ঞানিকটি আমার পরিচিত ইংলণ্ডবাসী প্রোফেসর জেমস ম্যাসিংহাম। কেম্ব্রিজে

যেবার বক্তৃতা দিতে যাই, সেবার আলাপ হয়েছিল। প্রাণীতত্ত্ববিদ্। একটু ছিটগ্রস্ত হলেও, বিশেষ গুণী লোক বলে মনে হয়েছিল।

খবরটা এসেছে আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশের কালেহে শহর থেকে। সেটা এখানে তুলে দিচ্ছি—

অরণ্যে নিখোঁজ

ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক জেম্‌স ম্যাসিংহাম গত সাতদিন যাবৎ কঙ্গোর কোন অরণ্যে নিখোঁজ হয়েছেন বলে জানা গেল। ইনি গত দুমাস কাল যাবৎ উক্ত অঞ্চলে গোরিলা সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন, এবং সে সম্পর্কে প্রচুর নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন বলে জানা যায়। স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে অন্তর্হিত অধ্যাপকের অনুসন্ধান চলেছে, তবে তাঁকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয় অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন।

খবরটা পড়ার আধঘন্টার মধ্যেই আমি কেম্ব্রিজে আমার বন্ধু প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ও পর্যটক প্রোফেসর জুলিয়ান গ্রেগরিকে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। গ্রেগরিই ম্যাসিংহামের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেয়। তার কাছ থেকে সঠিক খবরটা পাওয়া যাবে বলে আশা করছি।

১৫ই অক্টোবর

আজ শকুনির বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিলাম। ঘ্রাণশক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়েছে বলে মনে হয়। তবে মানুষের পক্ষে এ শক্তি আয়ত্ত করা ভারী কঠিন। কোন কৃত্রিম উপায়ে এটা সম্ভব বলে মনে হয় না। আমি নিজে আমার গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে একটা ওষুধ তৈরি করছি। এবং সেই ওষুধ দিয়ে একটা ইন্‌জেকশন নিয়েছি। তার ফল এখনও কিছু পাইনি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এত শিক্ষাদীক্ষা সত্ত্বেও অনেক ব্যাপারে মানুষ জীবজন্তুর চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে।

গ্রেগরির কাছ থেকে এখনো উত্তর পেলাম না। সেকি তাহলে ইংলণ্ডে নেই? গোরিলা সংক্রান্ত ঘটনাটা সম্পর্কে এখনো কৌতূহল বোধ করছি। অবিনাশবাবু আজ বললেন যে কঙ্গো থেকে আরেকটা খবরে বলা হয়েছে যে পুলিশ হাল ছেড়ে দিয়েছে এবং ম্যাসিংহাম মৃত বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে।

১৬ই অক্টোবর

এইমাত্র গ্রেগরির টেলিগ্রাম পেলাম। বেশ ঘোরালো ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। ও লিখছে—'অ্যাম প্রোসিডিং টু কালেহে স্যাটারডে স্টপ ক্যান ইউ কাম টু স্টপ বিলিভ ম্যাসিংহাম ইজ অ্যালাইভ বাট ইন্ ট্রাবল স্টপ কেবল ডিসিশন ইমিডিয়েটলি।'

অর্থাৎ, শনিবার কালেহে রওনা হচ্ছি; তুমিও আসতে পার-কি? আমার বিশ্বাস ম্যাসিংহাম এখনো জীবিত, তবে সম্ভবত সংকটাপন্ন। কী ঠিক কর চটপট তার করে জানাও।'

আফ্রিকার এক ইজিপ্ট ছাড়া আর কোনো দেশে এখনো যাওয়া হয়নি আমার। তাছাড়া বছর খানেক থেকেই লক্ষ্য করছি যে জীবজন্তু সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা আমার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ইদানিং পাখির উপরেই জোরটা দিচ্ছিলাম। আমার বাবুই পাখির বাসা নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'বেতার' পত্রিকায় ছাপা হয়ে বিশেষ প্রশংসা পেয়েছে। শকুনির উপর কাজটাও শেষ হয়েছে বলেই ধরা যায়, এবং সেটা নিয়ে জানাজানি হলে যথারীতি

বৈজ্ঞানিক মহলের প্রশংসা পাবই। এই ফাঁকে দিন পনেরর জন্য কঙ্গোটা ঘুরে এলে মন্দ কী? জীবজন্তুর দিক থেকে বিচার করলে আফ্রিকার মত দেশ আর নেই; আর মানুষের পূর্বপুরুষ যে বাঁদর, সেই বাঁদরের সেরা হল গোরিলা, আর সেই গোরিলার বাসস্থান হল আফ্রিকা। আমার পক্ষে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা ভারী কঠিন। গ্রেগরিকে টেলিগ্রাম করে দেবো—সী ইউ ইন কালেহে। ম্যাসিংহামের যাই বিপদ হোক না কেন, তাকে উদ্ধার করা আমাদের কর্তব্য।

১৭ই অক্টোবর

আফ্রিকা সফরে যে আমার আবার একজন সঙ্গী জুটে যাবে সে কথা ভাবিনি। অবিশ্যি সেবার সেই রাক্ষুসে মাছের সন্ধানে সমুদ্রগর্ভে পাড়ি দেবার বেলাও ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছিল। সেবার যিনি সঙ্গ নিয়েছিলেন, এবারও তিনিই নিচ্ছেন; অর্থাৎ, আমার প্রতিবেশী অবৈজ্ঞানিকের রাজা শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

আজ সকালে আমার এখানে এসে আমাকে গোছগাছ করতে দেখেই ভদ্রলোক ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়েছিলেন। বললেন, 'যদ্দিন কূপমণ্ডূক হয়ে ছিলুম, বেশ ছিল। কিন্তু একবার ভ্রমণ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছি, আর কি মশাই চুপচাপ বসে থাকা যায়? আফ্রিকার কথা ছেলেবেলায় সেই কত পড়িচি—সেই জন্তুজানোয়ার, সেই কালো কালো বেঁটে বেঁটে বুনো মানুষ···আপনি যাচ্ছেন সেই দেশে, আর আপনার সঙ্গ নেবোনা আমি? খবরটাও ত প্রথম আমিই দিই আপনাকে। আর খরচের কথাই যদি বলেন ত সমুদ্রের তলা থেকে পাওয়া কিছু মোহর এখনো আছে আমার কাছে। আমার খরচ আমি নিজেই বেয়ার করব।'

আমি ভদ্রলোককে কত বোঝালাম যে সমুদ্রের তলার চেয়েও আফ্রিকার জঙ্গল অনেক বেশি বিপদসঙ্কুল জায়গা, সেখানে সর্বদা প্রাণটি হাতে নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। অবিনাশবাবু তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন 'আমার কুষ্ঠীতে আছে আমার আয়ু সেভেনটি এইট। বাঘ-সিংহ আমার ধারে কাছেও আসবে না।'

অগত্যা রাজি হতে হল। পরশু রওনা। অবিনাশবাবুকে বলে দিয়েছি যে ধুতি পাঞ্জাবী পরে আফ্রিকার বনে চলাফেরা চলবে না; যেখান থেকে হোক তাকে এই দুদিনের মধ্যে প্যাণ্ট কোট জোগাড় করে নিতে হবে।

২৩শে অক্টোবর

মধ্য আফ্রিকার বেলজিয়ান কঙ্গো প্রদেশের কালেহে শহর। সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছটা। মিরাণ্ডা হোটেলে আমার ঘরের ব্যালকনিতে বসে ডায়রি লিখছি। দুদিন আগেই এখানে এসে পৌঁছেছি, কিন্তু এর মধ্যে আর লেখার ফুরসৎ পাইনি।

প্রথমেই বলে রাখি, আফ্রিকা অসাধারণ সুন্দর দেশ। বইয়ে পড়ে এদেশের সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোন ধারণাই করা যায় না। আমি যেখানে বসে লিখছি, সেখান থেকে পূব দিকে কিভু হ্রদ দেখা যাচ্ছে, আর উত্তর দিকে রুয়েনজোরি পর্বতশৃঙ্গ। জঙ্গলের যেটুকু আভাস পেয়েছি, তার ত কোন তুলনাই নেই।

অবিশ্যি এইসব উপভোগ করার মত মনের অবস্থা কতদিন থাকবে জানিনা। গ্রেগরির সঙ্গে কথাবার্তায় যা বুঝেছি, ভাববার কারণ আছে অনেক। যা জানলাম তা মোটামুটি এই—

ম্যাসিংহাম গোরিলা সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন বেশ অনেকদিন থেকেই। আগে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে গোরিলা নাকি ভারী হিংস্র জানোয়ার, মানুষ দেখলেই আক্রমণ করে। সম্ভবতঃ গোরিলার ভয়ঙ্কর চেহারা

থেকেই এ-বিশ্বাসের উৎপত্তি। যে সব বৈজ্ঞানিকের উদ্যম ও সাহসের ফলে এ ধারণা ভুল বলে প্রচারিত হয়, তাদের মধ্যে ম্যাসিংহাম একজন। অসীম সাহসের সঙ্গে গোরিলার ডেরার একেবারে কাছাকাছি গিয়ে দিনের পর দিন তাদের হাবভাব লক্ষ্য করে ম্যাসিংহাম এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন যে বিনা কারণে গোরিলা কখনো কোন মানুষকে আক্রমণ করে না। বড় জোর নিজের বুকে চাপড় মেরে দুমদাম শব্দ ক'রে এবং মুখ দিয়ে নানারকম আওয়াজ ক'রে মানুষকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

এই তথ্য আবিষ্কার করার পর থেকে ম্যাসিংহামের গোরিলা সম্পর্কে প্রায় নেশা ধরে যায়, এবং প্রতিবছরই দুতিনবার করে আফ্রিকায় এসে গোরিলা নিয়ে নতুন নতুন গবেষণা করতে থাকে। একটি বাচ্চা গোরিলাকে সে ধরতে পেরেছিল এমন গুজবও শোনা যায়।

এবারেও সে এসেছিল সেই একই কারণে। কিন্তু অন্যান্যবার তার সঙ্গে বন্দুকধারী শিকারী থাকে এবার ছিল মাত্র চারজন নিরস্ত্র কুলি। জঙ্গলের ভিতর ক্যাম্প করে কাজ করছিল ম্যাসিংহাম, এবং রোজই কুলিদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে যখন তখন একা একা বেরিয়ে পড়ছিল। মাস দেড়েক ওই ভাবে চলার পর একদিন সে নাকি বেরিয়ে আর ফেরেনি। তারপর থেকে দশ দিন ধরে পুলিশের সার্চ পার্টি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ম্যাসিংহামের কোন সন্ধান পায়নি।

যে ব্যাপারে গ্রেগরির সবচেয়ে বেশি চিন্তা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে এই যে আফ্রিকায় আসার কিছুদিন আগে থেকেই ম্যাসিংহামের মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন তার বন্ধুরা লক্ষ্য করেছিল। তফাতটা শুধু তার স্বভাবে নয়; চেহারাতেও যেন বোঝা যাচ্ছিল। চুলগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি রুক্ষ, চোখদুটো সর্বদাই যেন লাল, আর চাহনিতে একটা ত্রস্ত অথচ বিরক্ত ভাব। অনেকের ধারণা হয়েছিল যে ম্যাসিংহাম বোধহয় কোন আফ্রিকান উদ্ভিজ্জ ড্রাগ জাতীয় জিনিস খাওয়া অভ্যাস করেছে, যার ফলে তার একটা বিশ্রী রকম নেশা হয়। আফ্রিকায় অনেক বুনো লোকরা এইসব শিকড় বাকল খেয়ে নেশা করে।

কথাটা শুনে আমি বললাম, 'এসব ড্রাগ খেয়ে ত অনেক মানুষ আত্মহত্যাও করে বলে শুনেছি।'

গ্রেগরি বলল, 'সে ত করেই। কিন্তু ম্যাসিংহাম আত্মহত্যা করেছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কারণ তার সঙ্গে এবার অনেক জিনিসপত্র ছিল—সেগুলোও পাওয়া যাচ্ছে না।'

'জিনিসপত্র মানে? বইখাতা ইত্যাদি?'

'না। তার চেয়েও অনেক বেশি। সে এবার সঙ্গে করে একটি পোর্টেব্‌ল গবেষণাগার নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। আত্মহত্যা করলে সেসব জিনিসগুলো গেল কোথায়? না, শঙ্কু—আমার বিশ্বাস সে বেঁচে আছে, এবং জঙ্গলের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে তার পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে, আর সে পরীক্ষা এমন জাতের যেটা সে কারুর কাছে প্রকাশ করতে চায় না।'

আমি বললাম, 'এত ঢাকাঢাকির কী প্রয়োজন থাকতে পারে সেটা আন্দাজ করতে পারছ?'

গ্রেগরি কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'ইদানিং ম্যাসিংহামের একটা অদ্ভুত ধারণা হয়েছিল যে পৃথিবীর যত প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌ আছে—ইন্‌ক্লুডিং মি—তারা সবাই নাকি তার মৌলিক গবেষণার ফল আত্মসাৎ করে নিজেদের বলে চালাচ্ছে।'

'ইনক্লুডিং ইউ?' আমি রীতিমত অবাক হয়ে গেলাম কথাটা শুনে।

গ্রেগরি বললে, 'হ্যাঁ, তাই। যদিও তার গবেষণা ও আমার গবেষণার বিষয় ও রাস্তা সম্পূর্ণ আলাদা।'

'তাহলে বলতে হয় ওর সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

গ্রেগরি আক্ষেপের ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু কী ব্রিলিয়েন্ট লোক ছিল বলত! আর কী আশ্চর্য সাহস! ওর যদি সত্যিই কোন অনিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে বিজ্ঞানের সমূহ ক্ষতি হবে।'

আমি এবার জিগ্যেস করলাম, 'এসে অবধি গোরিলা চোখে পড়েছে একটাও?'

গ্রেগরি বলল, 'একটিও না।'

'বল কী?'

'নট এ সিঙ্গল ওয়ান। অথচ যেখানে ওদের যাবার কথা সেসব জায়গায় এর মধ্যে আমি দুবার ঘুরে এসেছি। আমি ত ব্যাপারটার কিছুই কুলকিনারা করতে পারছি না। দেখ তুমি যদি পার।'

আগামীকাল গ্রেগরির সঙ্গে আমরাও সাফারিতে বেরোব। ওর আশাও ক্ষীণ হয়ে এসেছিল: আমি এসে পড়াতে তবু খানিকটা উদ্যমের সঞ্চার হয়েছে!

অবিনাশবাবু বেশ ভালোই আছেন। নিজেই ঘুরেটুরে বেড়াচ্ছেন। পরনে ভাগনের টুইলের শার্ট, গিরিডির অবসরপ্রাপ্ত ব্যারিস্টার সুরেন ঘোষালের খাকি হাফপ্যান্ট, আর মাথায় একটা জীর্ণ খাকি সোলাটুপি—সেটা যে কার কাছ থেকে ধার করে আনা সেটা জানা হয় নি। আজ সকালে দেখি ভদ্রলোক কোত্থেকে একছড়া কলা কিনে এনেছেন। ভারতবর্ষের বাইরেও যে কলা পাওয়া যায় সে ধারণা ওঁর ছিল না। বললেন, 'গোরিলাও ত বাঁদরের জাত, সামনে পড়লে একটা কলা দিয়ে দেখা যাবে খায় কিনা।'

২৫শে অক্টোবর সকাল সাড়ে ছ'টা

কাল সারাদিন ঘোরাঘুরির পর হোটেলে ফিরে আর ডায়রি লিখতে পারিনি, তাই আজ সকালেই কাজটা সেরে রাখছি।

রহস্য অদ্ভুত ভাবে ঘনিয়ে উঠেছে। ম্যাসিংহাম বেঁচে আছে সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এমন কি এও মনে হতে পারে যে সে সুস্থই আছে—অন্তত শরীরের দিক দিয়ে।

সকালে আমাদের বেরোতে বেরোতে প্রায় সাড়ে আটটা হয়ে গেল। দল বেশি বড় না। আমি, গ্রেগরি অবিনাশবাবু, এখানকার একজন শিক্ষিত নিগ্রো শিকারী যুবক জোসেফ কাবালা ও পাঁচজন বান্টু জাতীয় কুলি। কুলিদের সঙ্গে চলেছে আমাদের খাদ্য ও পানীয়, জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য কাটারিজাতীয় জিনিস, ও বিশ্রামের জন্য ফোল্ডিং চেয়ার, তেরপল, মাটিতে খাটানোর বড় ছাতা ইত্যাদি। কাবালার সঙ্গে বন্দুক ও টোটা রয়েছে, আর আমার কোটের পকেটে রয়েছে আমারই তৈরি অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র—অ্যানাইহিলিন পিস্তল। অবিনাশবাবু আবার তার হাতে তার পৈত্রিক সম্পত্তি একটি কাঁঠাল কাঠের লাঠি নিয়েছেন—ভাবখানা যেন তার একটা ঘায়ে তিনি একটি মস্ত গোরিলাকে ধরাশায়ী করতে পারেন। ভদ্রলোকের ষাটের উপর বয়স আর প্যাকাটে চেহারা হলে কী হবে—এমনিতে বেশ শক্ত আছেন। উনি বলেন এককালে নাকি মুগুর ভাঁজতেন—তবে সেটা ওঁর অন্য অনেক কথার মতই আমার বিশ্বাস হয় না।

পাহাড়ের গোড়া অবধি জীপে গিয়ে সেখান থেকে পায়ে হেঁটে জঙ্গলের ভিতর ঢুকলাম আমরা। এই জঙ্গল পাহাড়ের গা বেয়ে ক্রমশ উপর দিকে উঠেছে। আফ্রিকার দু'জাতের গোরিলার মধ্যে একটা—অর্থাৎ যাকে বলে মাউন্টেন গোরিলা—এই জঙ্গলেই পাওয়া যায়। অন্য জাতটা থাকে সমতল ভূমিতে। ম্যাসিংহাম পাহাড়ের জঙ্গলেই তাঁর গবেষণা চালাচ্ছিলেন। আমাদের আজকের গন্তব্যস্থল হচ্ছে ম্যাসিংহাম যেখানে ক্যাম্প ফেলেছিলেন সেই জায়গা। গ্রেগরি এর আগেও একবার গেছে সেখানে, এবং কিছুই পায় নি। নেহাৎ আমার অনুরোধেই সে দ্বিতীয়বার সেখানে চলেছে।

ডেভিড লিভিংস্টোন তাঁর লেখায় এইসব জঙ্গলের বর্ণনা দিয়ে গেছেন! তিনি বলেছেন, এসব জঙ্গল এত গভীর এবং এ গাছের পাতা এত ঘন, যে ঠিক মাথার উপর সূর্য থাকলেও, পাতা ভেদ করে দু একটা 'পেনসিল অফ লাইট' ছাড়া আর কিছুই মাটিতে পৌঁছাতে পারে না। কথাটা যে কতদূর সত্যি তা এবার বুঝতে পারলাম।

আমাদের ভারতীয়দের ধারণা যে বট-অশ্বত্থ গাছই বুঝি পৃথিবীর সবচেয়ে জাঁদরেল গাছ। এখানের কয়েকটা গাছ দেখলে তাদের সে গর্ব খর্ব হয়ে যায়। বাওবাব বলে এক রকম গাছ আছে যার গুঁড়ি মাঝে মাঝে এত চওড়া হয়, যে দশজন লোক পরস্পরের হাত ধরে গাছটাকে ঘিরে ধরলেও তার বেড় পাওয়া যায় না। অবিশ্যি যে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি তাতে বাওবাব গাছ নেই। এ জঙ্গলের গাছের মাহাত্ম্য হচ্চে দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে নয়। এক একটা সিডার ও আবলুশ গাছ প্রায় দুশো ফুট উঁচু। অবিশ্যি যতই উপরে উঠছি ততই বেশি করে পাইন বা ফার জাতীয় পাহাড়ী গাছ চোখে পড়ছে। এছাড়া লতাপাতা, অর্কিড ও ফার্ণের ত কথাই নেই।

জন্তু জানোয়ার এখনো বিশেষ চোখে পড়েনি। বাঁদরের মধ্যে দুটি বেবুন চোখে পড়েছে, আর অন্য জানোয়ারের মধ্যে একটি উড়ন্ত কাঠবেড়ালি। আশ্চর্য জিনিস এটি। ভারতীয় কাঠবেড়ালির প্রায় দ্বিগুণ সাইজ, গায়ের রঙ বাদামি, আর শরীরের দুদিকে পায়ের সঙ্গে লাগানো দুটি ডানা। পা দুটো ফাঁক করে গাছের ডাল থেকে লাফ দিয়ে দিব্যি চলে যায় এগাছ থেকে ওগাছে। ফ্লাইং স্কুইরল দেখে অবিনাশবাবু বললেন, 'ষাট বছর বয়সে জঙ্গলে ঘুরে যা এডুকেশন হচ্চে, ইস্কুলে কলেজে মানে-বই মুখস্থ করে তার সিকি অংশও হয় নি। এখানকার বাঘ ভাল্লুকও কি ওড়ে নাকি মশাই?'

প্রায় সাড়ে তিন মাইল হাঁটার পর প্রথম গোরিলার চিহ্ন চোখে পড়ল। পুরুষ গোরিলারা গাছের ডাল ভেঙে গাছেরই উপর একরকম মাচা তৈরি করে। স্ত্রী গোরিলা বাচ্চা নিয়ে সেই মাচার উপর রাত কাটায়, আর পুরুষটা নীচে মাটিতে থেকে পাহারা দেয়। এটা আমায় জানা ছিল, এবং এইরকম একটা মাচা হঠাৎ আমার চোখে পড়ল।

গ্রেগরি বলল, এই মাচাটা আমরা এর আগের দিনও দেখেছি। তবে গোরিলারা এক মাচায় এক রাতের বেশি থাকে না। কাজেই এ মাচাটা যখন বেশ কিছু দিনের পুরোন, তখন কাছাকাছির মধ্যে গোরিলা থাকবে এমন কোন কথা নেই।

একটা গন্ধ মিনিট খানেক থেকে আমার নাকে আসছিল, গ্রেগরিকে সেটার কথা বলতে সে যেন কেমন অবাক হয়ে গেল। সে বলল, 'কোন বিশেষ গন্ধর কথা বলছ কি? আমি ত এক গাছপালার গন্ধ আর ভিজে মাটির গন্ধ ছাড়া কিচ্ছু পাচ্ছি না।'

আমি মাচার দিকে এগিয়ে গেলাম। গন্ধ দ্বিগুণ তীব্র হয়ে উঠল। এ গন্ধের সঙ্গে কি গোরিলার কোন সম্পর্ক আছে? আমার ইনজেকশন কি তাহলে এতদিনে কাজ করতে শুরু করল! গন্ধটা যে বুনো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, আর এসব গন্ধ এর আগে আমি কক্ষনো পাইনি।

গ্রেগরিকে এ বিষয় আর কিছু না বলে এগিয়ে চললাম। মিনিট দশেকের মধ্যে গন্ধটা মিলিয়ে এলো। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার সেটা আসতে শুরু করল। অবিনাশবাবুকে বাংলায় বললাম, 'আশেপাশের গাছের দিকে একটু চোখ রাখবেন ত—ওইরকম মাচা আরো দেখা যায় কি না।'

কিছুদূর যাবার পরেই আবার আমারই চোখে পড়ল আরেকটা গোরিলার মাচা। এবার আর আমার মনে

কোন সন্দেহই রইল না যে আমার ইনজেকশনের ফলে আমি প্রায় আধমাইল দূর থেকে গোরিলার মাচার অস্তিত্ব বুঝতে পারছি।

* * * * *

দুপুর আড়াইটে নাগাৎ আমরা ম্যাসিংহামের ক্যাম্পের জায়গায় পৌঁছলাম। মস্ত মস্ত ফার আর বাদাম গাছে ঘেরা একটা পরিষ্কার, খোলা, প্রায়-সমতল জায়গা। জমিতে দুজায়গায় আগুন জ্বালানোর চিহ্ন। আর এখানে সেখানে তাঁবুর খুঁটির গর্ত রয়েছে। উত্তর দিকটা পাহাড়ের খাড়াই, আর দক্ষিণে ঢাল নেমে সমতল ভূমির দিকে চলে গেছে। সকলেই বেশ ক্লান্তি অনুভব করছিলাম তাই কাবালা কুলিদের বলল মাটিতে বসার বন্দোবস্ত করে দিতে। দুপুরের খাওয়াটাও এখানেই সেরে নিতে হবে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিশ্রামের বন্দোবস্ত হয়ে গেল। একটা ক্যাম্প চেয়ারে বসে স্যাণ্ডউইচে কামড় দিতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম অবিনাশবাবু আমাদের সঙ্গে না বসে একটু দূরে পায়চারি করছেন। কারণটা বোঝা আমার পক্ষে কঠিন হল না। পাছে গ্রেগরি তাঁকে কোন প্রশ্ন করে বসে, এবং ইংরিজিতে তার উত্তর দিতে হয়, সেই আশঙ্কাতেই তিনি দূরে দূরে রয়েছেন। অবিনাশবাবুর ইংরিজি বলার ক্ষমতা 'ইয়েস নো ভেরিগুডের' বেশি এগোয় না; অথচ সব প্রশ্নের উত্তর ত আর এই তিনটি কথায় দেওয়া চলে না।

স্যাণ্ডউইচ খাওয়া সেরে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দূরের গাছপালা দেখছি, এমন সময় অবিনাশবাবুর গলা পেলাম—

'ও মশাই—এটা কী একবার দেখে যান ত।'

ভদ্রলোক দেখি একটা পাইন গাছের গুঁড়ির দিকে ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছেন। গ্রেগরি আর আমি এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি গাছের গুঁড়িতে ছুরি দিয়ে খোদাই করা এক লাইন ইংরিজি লেখা। সেটা অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায়—

'তোমরা মূর্খ। যদি বাঁচতে চাও ত ফিরে যাও।'

খোদাই নমুনা দেখে মনে হল সেটা টাটকা। আমরা লেখাটা পড়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। এটা যে একটা আশ্চর্য আবিষ্কার সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। কথা বললেন প্রথম অবিনাশবাবু, এবং তার স্বরে রীতিমত বিরক্তির ভাব—

'আমাদের সবাইকে মূর্খ বলছে! লোকটার ভারী আস্পর্ধা ত!'

গ্রেগরি বলল, 'এ লেখা কিন্তু এর আগের দিন ছিল না। আমরা পরশুই এখানে এসেছিলাম। অর্থাৎ এটা লেখা হয়েছে গতকাল। তার মানে ম্যাসিংহাম কাল আবার এখানে এসেছিল।'

এটা যে ম্যাসিংহামেরই লেখা, এবং এটা যে তার অনুসন্ধানকারীদের উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে, সে বিষয় আমার মনেও কোন সন্দেহ ছিল না।

গ্রেগরি এবার অবিনাশবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'এ মোস্ট ইউজফুল ডিসকাভারি। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'ভেরি গুড।'

আমি মনে মনে বললাম, ভেরি গুড ত বটেই। এই লেখা থেকেই অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল যে ম্যাংিসহাম মরেনি। সে দস্তুরমত বেঁচে আছে, দিব্যি তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, এবং সে কাজে বাধা পড়ে সেটা সে মোটেই চাইছে না। কিন্তু সে কাজটা যে কী, এবং কোথায় সে আত্মগোপন করে রয়েছে, সেটা এখনো রহস্য।

আমরা হোটেলে ফিরলাম প্রায় রাত সাড়ে দশটায়। ফেরার পথেই স্থির করেছিলাম যে আমাদেরও জঙ্গলের ভিতর তাঁবু ফেলে কাজ চালাতে হবে।

ম্যাসিংহাম শাসিয়েছে যে তার অনুসন্ধান যে করবে তার মৃত্যু অনিবার্য। সে জানে না সে একথাটা লিখে কতবড় ভুল করেছে। ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুকে এমন হুমকিতে যে হটানো যায় না, সে কথাত আর ম্যাসিংহাম জানে না। ভাবনা ছিল এক অবিনাশবাবুকে নিয়ে, কিন্তু তিনিও দেখছি বারবার বলছেন, 'লোকটার দম্ভটা একটু থেঁৎলে দেওয়া দরকার।'

২৫শে অক্টোবর দুপুর দেড়টা

আমরা কিছুক্ষণ হল জঙ্গলে এসে ক্যাম্প ফেলেছি। ম্যাসিংহাম যেখানে ক্যাম্প ফেলেছিল, সেখানেই। একটু বিশ্রাম করে দুপুরের খাওয়া সেরে আবার বেরোব। আজ মেঘলা করে রয়েছে বলে জঙ্গলের ভিতরে আরো অন্ধকার। এখানে আমাদের দেশের মতই এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টি হয়। তবে এখন বৃষ্টি না হওয়াই ভালো ; হলে আমাদের কাজের অনেক ব্যাঘাত হবে।

আজ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে একটা ভারী আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করেছি ; সেটা এই ফাঁকে ডায়রিতে লিখে রাখি। কাল কয়েকটা বেবুন আর লিমুর ছাড়া বানরজাতীয় আর কিছুই চোখে পড়েনি, আর আজ সকাল থেকে এই চারঘণ্টার মধ্যে সাত রকমের বাঁদর দেখেছি। আর আশ্চর্য এই যে তাদের সকলেরই হাবভাব যেন ঠিক একই রকম ; মনে হয় তারা সকলেই যেন গভীর বন থেকে রীতিমত ভয় পেয়ে বাইরের দিকে চলে আসছে। সে এক দৃশ্য !

আমাদের মাথার উপরের গাছের পাতা আর লতাগুলো যেন একমুহূর্ত স্থির থাকতে পারছে না। সাঁই সাঁই সাঁই শব্দে লেমুর, ম্যানড্রিল, বেবুন, শিম্পাঞ্জি সব পালিয়ে চলেছে মুখ দিয়ে নানারকম ভয়ের শব্দ করতে করতে। আমাদের দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই। এমন কেন ঘটছে তা এখনও ঠাহর করতে পারিনি। গ্রেগরি এর আগে তিনবার আফ্রিকার জঙ্গলে এসেছে। কিন্তু এমন দৃশ্য সে কখনো দেখেনি। এই যে বসে বসে ডায়রি লিখছি, এখনো তাদের চীৎকার চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছি। এই ঘটনাও কি ম্যাসিংহামের সঙ্গে জড়িত ?

নিজেকে ভারী ব্যর্থ বলে মনে হয়েছে। এখনো পর্যন্ত একেবারে বোকা বনে আছি। অন্তত এটুকু যদি জানা যেতো যে ম্যাসিংহাম ঠিক কী কাজটা করছে, তাহলেও মনে হয় অনেক রহস্যের কারণ বেরিয়ে পড়ত।

* * *

২৬শে অক্টোবর ভোর পাঁচটা

ভোরের আলো এখনো ভালো করে ফোটেনি। তাঁবুতে বসে পেনলাইটের আলোতে আমার ডায়রি লিখছি। যে অদ্ভুত ও ভয়াবহ ঘটনাটা ঘটে গেল, সেটা এইবেলা লিখে না রাখলে পরে আর কখন সময় পাব জানি না। সত্যি কথা বলতে কি পাইন গাছের গুঁড়িতে লেখা হুমকিটা আর অগ্রাহ্য করতে পারছি না। প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে পারব কিনা সে বিষয়ও সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

কাল দুপুরে লাঞ্চের পর আমরা আবার উত্তর-পূর্বদিকের রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করলাম। মাইল খানেক যাবার পর লক্ষ্য করলাম বাঁদরের গোলমালটা কমে এসেছে। গ্রেগরি বলল, মনে হচ্ছে গোরিলা ছাড়া যত বাঁদর ছিল সব বন ছেড়ে বাইরের দিকে পালিয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কারণ কিছু বুঝলে ?'

গ্রেগরি ভ্রূকুটি করে বলল, 'ভয় পেয়েছে এটুকু বুঝলাম, তার বেশি নয়।'

আমি প্রায় ঠাট্টার সুরেই বললাম আমাদের দেশে যদি কোথাও একটা কাক মরে, জঙ্গলে সে তল্লাটে যত কাক আছে সব কটা এক জোটে ভীষণ চীৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। এটাও কি সেই ধরণের ব্যাপার নাকি?'

গ্রেগরি চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ থেকেই ওর মধ্যে একটা অবসন্ন ভাব লক্ষ্য করছি, সেটা বোধহয় শারীরিক নয়, মানসিক। গ্রেগরির বয়স পঞ্চাশের উপর হলেও রীতিমত স্বাস্থ্যবান লোক—ইয়ং বয়সে বিজ্ঞানের সঙ্গে খেলাধুলোও করেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কী হয়েছে বলত?'

গ্রেগরির মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে সেটা এখন প্রকাশ করলে তুমি হাসবে, কিন্তু সেটা যদি সত্যি হয়, একমাত্র তাহলেই এইসব অদ্ভুত ঘটনাগুলোর একটা কারণ পাওয়া যায়। অথচ তাই যদি হয়, তাহলে ত উঃ!—'

গ্রেগরি শিউরে উঠে চুপ করে গেল। আমিও তাকে আর প্রশ্ন করে বিরক্ত করলাম না। আমার নিজের সন্দেহটাও ডায়রিতে প্রকাশ করার সময় আসেনি। মনে হয় গ্রেগরি ও আমি একই পথে চিন্তা করে চলেছি—কারণ বিজ্ঞানের কী অসীম ক্ষমতা সেটা আমরা দুজনেই জানি।

কিছুক্ষণ থেকেই অনুভব করেছিলাম যে আমরা নীচের দিকে চলেছি। এবার দেখলাম আমাদের সামনে একটা নালা পড়েছে। একটা ওকাপি জল খাচ্ছিল, আমাদের দেখেই পালিয়ে গেল। নালার জল গভীর নয়। কাজেই সেটা হেঁটে পার হতে আমাদের কোন কষ্ট হল না।

নালা পেরিয়ে দশ পা যেতে না যেতেই একটা পরিচিত তীব্র গন্ধ এসে আমার নাকে প্রবেশ করল। আমি জানি সে গন্ধ আমি ছাড়া আর কেউ পায়নি। কাউকে কিছু না বলে হেঁটে চললাম।

এবার যেটা চোখে পড়ল সেটা গাছের উপরে মাচা নয়—ভিজে মাটিতে গোরিলার পায়ের ছাপ। একটা নয়; দেখে মনে হয় সম্ভবত পঞ্চাশটা ছোটবড় গোরিলা বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে সেখানে ঘোরা ফেরা করেছে। কিন্তু কেন?

কাবালা দেখি তার বন্দুক উঁচিয়ে তৈরি; বুঝলাম সে রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। সে চাপা স্বরে বলল, একসঙ্গে এত গোরিলার পায়ের ছাপ আমি জীবনে কখনো দেখিনি। ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছেনা আমার। যখন থেকে বাঁদরদের পালাতে দেখেছি, তখন থেকেই খট্‌কা লাগতে শুরু করেছে আমার।'

আমাদের বাণ্টু কুলিদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করছিলাম, কাবালাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, 'ওরা আর এগোতে চাইছে না।'

আমি বললাম, 'কেন? ওদের কি ধারণা সামনে গোরিলার দল রয়েছে?'

কাবালা বলল, 'হ্যাঁ।'

আমার নাকের গন্ধ কিন্তু বলছিল যে তারা কাছাকাছির মধ্যে নেই—কিন্তু সে কথাত আর ওদের বললে বিশ্বাস করবে না!

এর মধ্যে গ্রেগরি হঠাৎ বলে উঠল, 'শঙ্কু' একবার ওপরের দিকে চেয়ে দেখ।'

মাথা তুলে এক আশ্চর্য জিনিস দেখলাম। চারিদিকের গাছের ডাল ভাঙা। গুঁড়িগুলো রয়েছে, কিন্তু ডালপালাগুলো সব কারা যেন ভেঙে সাফ করে নিয়ে গেছে।

গ্রেগরির দিকে চেয়ে দেখি তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চাপা গলায় সে বলল, 'লেট্‌স গো ব্যাক, শঙ্কু!'

'কোথায়?'

'আপাতত ক্যাম্পে ফিরে যাই চল। আমাকে একটু চুপচাপ বসে ভাবতে হবে।'

'তোমার কি মনে হয় ডালগুলো গোরিলারা ভেঙেছে?'

'তাছাড়া আর কি? সম্প্রতি এমন ঝড় এখানে হয়নি যাতে ওইভাবে গাছের ডাল ভাঙবে। আর ওগুলোকে যে কাটা হয়নি সে ত দেখেই বুঝতে পারছ।'

সত্যি বলতে কি, আমারও ওই একই সন্দেহ হয়েছিল। যে গোরিলার পায়ের ছাপ মাটিতে দেখছি, তারাই গাছের ডালগুলো ভেঙেছে।

* * * *

গ্রেগরির কথামত ক্যাম্পে ফিরে আসতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। গরম কোকো খেয়ে ক্লান্তি দূর করে গ্রেগরির ক্যাম্পের বাইরে বসে তাকে জিগ্যেস করলাম, 'তুমি কী ভাবছ ওসব?'

গ্রেগরি তার শান্ত অথচ ভীত চোখ দুটো আমার দিকে ফিরিয়ে বলল, 'আমার মনে হয়না আমরা ম্যাসিংহ্যামের সঙ্গে যুঝতে পারব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে তার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এক নৃশংস কাজে ব্যবহার করতে চলেছে।'

আমি দৃঢ়স্বরে বললাম, 'তাহলে আমাদের কর্তব্য তাকে বাধা দেওয়া।'

গ্রেগরি বলল, 'জানি! কিন্তু সে কাজটা করতে যে সামর্থ্যের প্রয়োজন সেটা আমাদের নেই! সুতরাং আমাদের পরাজয় অনিবার্য।'

আমি বুঝতে পারলাম যে এ অবস্থায় গ্রেগরির মনে উৎসাহ বা আশার সঞ্চার করা প্রায় অসম্ভব। মুখে বললাম, 'ঠিক আছে। এখন ত বিশ্রাম করা যাক—কাল সকালে দুজনের বুদ্ধি এক জোট করলে একটা কোন রাস্তা বেরোবেনা, এটা আমি বিশ্বাস করি না।'

সন্ধ্যা থাকতে সকলেই টিনের খাবারে ডিনার সেরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তিনটি ক্যাম্পের একটিতে আমি আর অবিনাশবাবু, একটিতে গ্রেগরি ও একটিতে কাবালা! বাণ্টু কুলিগুলো বাইরে শোয়—তারা এখন আগুন জ্বালিয়ে জটলা করছে। একজন আবার গান শুরু করল। সেই একঘেঁয়ে গান শুনতে শুনতেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাঝরাত্রে কোন এক সময়ে ঘুমটা ভাঙল অবিনাশবাবুর ঠেলাতে, আর ভাঙতেই কানের খুব কাছে তার ফিসফিসে ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—

'ও মশাই!—শিম্পাঞ্জি! শিম্পাঞ্জি!'

'শিম্পাঞ্জি?' আমি সটান উঠে পড়লাম। কোথায় দেখলেন? কখন?'

'এই ত, দশ মিনিটও হয় নি। এতক্ষণ গলাটা শুকিয়ে ছিল তাই কথা বলতে পারি নি।

'কী হল ঠিক করে বলুন ত।'

'আর মশাই, এরকম মাটিতে বিছানা পেতে তাঁবুর ভেতর শুয়ে ত অভ্যেস নেই—তাই ভালো ঘুম হচ্ছিল না এমনিতেই। কিছুক্ষণ আগে ভাবলুম বাইরে গিয়ে একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়ে আসি। কনুইয়ে ভর করে কাঁধদুটোকে একটু তুলেছি, এমন সময় দেখি তাঁবুর দরজা ফাঁক করে ভিতরে উঁকি মারছে।'

কী যে উঁকি মেরেছে সেটা আমার বুঝলে বাকি নেই, কারণ তাঁবুর ভেতরটা আমার সেই পরিচিত গন্ধে ভরপুর হয়ে আছে। অনেক দিনের পুরোন ঝুলেভরা ঘরের গন্ধের সঙ্গে বারুদের গন্ধ মেশালে যেমন হয়, কতকটা সেই রকম গন্ধ।

অবিনাশবাবু বলে চলেছেন—

'কলকাতার চিড়িয়াখানায় যেরকম দেখেছি ঠিক সেরকম নয়। সাইজে অনেক বড়, বিরাট চওড়া কাঁধ, আর অর্ধেক মুখ জুড়ে দুই নাকের ফুটো, আর হাত দুটো—'

আমি অবিনাশবাবুর কথা শেষ হবার আগেই কাম্পের বাইরে চলে এসেছি, হাতে আমার পিস্তল। আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে চারিদিকে চাঁদের আলো থৈ থৈ করছে, সাদা তাঁবুগুলো সেই আলোয় ঝলমল করছে। জঙ্গল নিঝুম নিস্তব্ধ। বাল্টু কুলিগুলো আগুনের ধারে পড়ে ঘুমোচ্ছে। অন্য তাঁবু দুটিতেও মনে হল দুজনেই ঘুমোচ্ছে। তবু গ্রেগরিকে খবর দেওয়া দরকার মনে করে তার তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেলাম।

তাঁবুর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দুবার তার নাম ধরে ডেকেও সাড়া না পেয়ে ভারী আশ্চর্য লাগল—কারণ, আমি জানি গ্রেগরির ঘুম খুব পাতলা। তবে সে উঠছেনা কেন?

দরজা ফাঁক করে ভেতরেঢুকেই চমকে উঠলাম।

গ্রেগরির বিছানা খালি পড়ে আছে। বালিশ চাদর সবই রয়েছে, এবং সেগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এখন আর সেখানে কেউ নেই।

বালিশে হাত দিয়ে দেখলাম গরম; অর্থাৎ অল্পক্ষণ আগেও সে ছিল।

অবিনাশবাবু ধরা গলায় বললেন,—'লোকটা গেল কোথায়?'

আমি ষোল আনা বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম, 'গোরিলার কবলে।'

একটি গোরিলা এসে প্রথমে আমাদের ক্যাম্পে উঁকি মেরেছে। তারপর গ্রেগরির ক্যাম্পে ঢুকে তাকে কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে গেছে—কোথায়, তা এখনো জানি না।

কাবালার গলা শুনতে পাচ্ছি। ওকে ব্যাপারটা বলি। ওর উপর এখন অনেকখানি ভরসা রাখতে হবে।

২৬শে অক্টোবর

একটা ভয় ছিল যে কাবালা বেগতিক দেখে আমাদের পরিত্যাগ করবে। কিন্তু তাত হয়ই নি, বরং সে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লেগেছে।

আজ সকাল সাতটায় আমরা ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়েছি। দিনের আলো পরিষ্কার হলেই দেখেছিলাম তাঁবুর বাইরে গোরিলার পায়ের ছাপ। সেই ছাপ ধরে প্রায় দু মাইল পথ এসেছি আমরা। আশ্চর্য এই যে ছাপটা আমাদের পাহাড়ের জঙ্গল ছেড়ে সমতল ভূমির জঙ্গলের দিকে নিয়ে চলেছে! এদিকটায় নিয়মমত মাউন্টেন গোরিলা থাকার কথাই নয়, এবং এদিকটায় ম্যাসিংহামকে খোঁজাই হয় নি। একটা নালা পেরিয়ে উল্টো দিকে এসে ছাপটা আর খুঁজে পাইনি। তার একটা কারণ হতে পারে এই যে এদিকের জমিটা আরো অনেক বেশি শুকনো আর পাথুরে। সামনে একটা টিলার মত রয়েছে সেটার নীচে আমরা বিশ্রামের জন্য বসেছি। আজ আমরা প্রথম থেকেই ঠিক করেছি যে আর পিছনে ফিরব না, যেখানে সন্ধে হবে সেখানেই ক্যাম্প ফেলব। কুলিগুলো এখনো অবধি রয়েছে। গ্রেগরির অন্তর্ধানের ফলে তারা খুঁৎখুঁৎ করতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু বেশি করে বকশিস দেওয়াতে তারা রয়ে গেছে।

অবিনাশবাবুর গলা পাচ্ছি। আমাকেই ডাকছেন। দেখি কী হল।

২৭শে অক্টোবর

এমন বিভীষিকাময়, অথচ এমন রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবরণ লিখতে যে ভাষার দরকার হয়, সেটা আমার
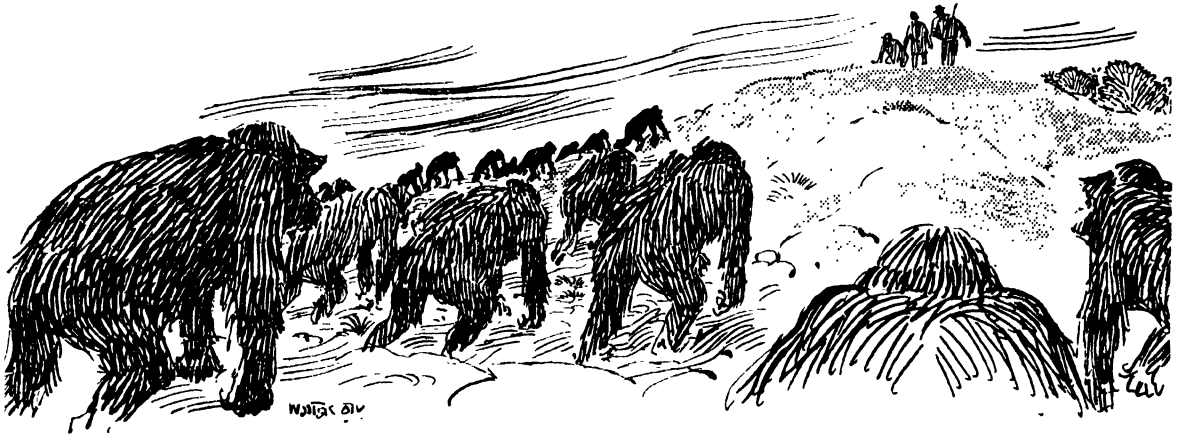
জানা নেই। কাল বিকাল থেকে পর পর যা ঘটেছে তা সহজ ভাবে লিখে যাবো, তাতে কতটা বোঝাতে পারব জানি না।

কাল ডায়রি লিখতে লিখতে অবিনাশবাবুর ডাক শুনে উঠে গিয়ে দেখি তিনি টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর দৃষ্টি উল্টো দিকে। কী জানি একটা দেখতে পেয়ে ভদ্রলোক তারস্বরে আমার নাম ধরে ডাকছেন। আমায় দেখতে পেয়েই বললেন, শিগ্‌গির উঠে আসুন।

কাবালা নালায় গিয়েছিল হাতমুখ ধুতে—এখনো ফেরেনি। আমি একাই গিয়ে টিলার উপরে উঠলাম। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই অবিনাশবাবু কাঁপা গলায় বললেন, 'কুষ্ঠী বোধহয় মিলল না।' তারপর তাঁর কম্পমান ডান হাতটা তুলে দক্ষিণের সমতল ভূমির জঙ্গলের দিকে নির্দেশ করলেন। যা দেখলাম তাতে আমারও আতঙ্ক হওয়া উচিত, কিন্তু দৃশ্যটা এতই অদ্ভুত ও অভূতপূর্ব, যে ভয় না পেয়ে সম্মোহিতের মত চেয়ে রইলাম।

আন্দাজ প্রায় একশো গজ দূর থেকে একটা গোরিলার দল আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা সংখ্যায় কত হবে জানি না, তবে শ'খানেকের কম নয়। গাছ থাকার জন্য তাদের সবাইকে এক সঙ্গে দেখা যাচ্ছে না, আর প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে তারা যেন সংখ্যায় আরো বেড়ে যাচ্ছে। কাবালাও এর মধ্যে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে; সে শুধু বলল, 'কুলিগুলো পালিয়েছে।' আমাদের দুজনের কাছেই অস্ত্র রয়েছে, কিন্তু সে অস্ত্র এই গোরিলা বাহিনীর সামনে কিছুই না।

এত বিপদেও, চোখের সামনে মৃত্যুকে এগিয়ে আসতে দেখেও, পালাবার কথা চিন্তা করতে পারলাম না। অবিনাশবাবু মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছেন, আর অস্ফুটস্বরে কেবল বলছেন, 'মা, মা, মাগো!' কাবালা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'তুমি যা করবে, আমিও তাই।' আমি কথা না বলে হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিলাম—যা থাকে কপালে—দাঁড়িয়ে থাকব।

গোরিলাগুলো পঞ্চাশগজের মধ্যে এসে পড়েছে। তাদের গায়ের গন্ধে আমার নাক প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে আসছে তারা। এবার লক্ষ্য করলাম, কোন কোন গোরিলা আবার সঙ্গে শিকার নিয়ে চলেছে; কোনটার কাঁধে হরিণ, কোনটার কাঁধে বুনো শুয়োর, আবার দুটোর হাতে দেখলাম ভেড়া। এসব জিনিস কিন্তু গোরিলার খাদ্য নয়; তারা নিরামিষাশী—ফলমূল খেয়ে থাকে।

কাবালা হঠাৎ সামনের গোরিলাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওটার মাথায় কী বলত ?'

ওই গোরিলাটাই বোধহয় দলপতি—এবং গোরিলা যে এত বড় হয় সেটা আমার ধারণাই ছিল না। দেখলাম তার মাথায় কী যেন একটা জিনিস রোদের আলোয় চক্‌চক্ করছে।

ক্রমে গোরিলাগুলো দশ গজের মধ্যে এসে পড়ল। ঠিক মনে হয় একটা কালো লোমশ অরণ্য আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে ভারী অদ্ভুত লাগল। সেটা হল তাদের চোখের ভাব। কেমন যেন একটা থমকানো মুহ্যমান ভাব। যন্ত্রচালিতের মত দৃষ্টিহীন ভাবে যেন এগিয়ে আসছে তারা। একটা গোরিলা একটা পাথরের সঙ্গে ঠোক্কর খেলো ; কিন্তু তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সামলে নিয়ে আবার এগিয়ে আসতে লাগল।

অবিনাশবাবু বোধহয় অজ্ঞান। কাবালাও হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে।...

* * * *

আমরা মরিনি। আমাদের পাশ দিয়ে গা ঘেঁষে গোরিলার দল চলে গেছে। যখন আমাদের সঙ্গে ধাক্কা লাগার উপক্রম হয়েছে, তখন পাশে সরে গেছি। অবিনাশবাবুকে কাবালা কোলে তুলে নিয়েছিল। কারো কোন অনিষ্ট হয়নি, কেউ জখম হয়নি। এমন কি একথাও মনে হয়েছে যে গোরিলাগুলো যেন আমাদের দেখতেই পায়নি। চোখ থেকেও যেন তারা দৃষ্টিহীন, এবং দৃষ্টিহীন ভাবেই তারা গন্তব্য স্থানের দিকে এগিয়ে গেছে।

গোরিলার পায়ের আর নিশ্বাসের শব্দ মিলিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর অবিনাশবাবু জ্ঞান ফিরে পেলেন। আমিও টিলার উপর বসে পড়েছিলাম। এমন একটা অভিজ্ঞতার পর আর পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। অবিনাশবাবুই প্রথম মুখ খুললেন। বললেন, 'আমার কুষ্ঠীর জোরটা দেখলেন ?'

কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু অবিনাশবাবুর কথায় কান দেবার সময় নেই আমার। আজ প্রথম আমি অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখতে পেয়েছি। এখন আমাদের রাস্তা একটাই—গোরিলা যেই পথে গেছে সেই পথে যাওয়া। তবে আজ আর নয় ; আজ বেলা হয়ে গেছে। কাল ভোরে রওনা হব। অনেক পায়ের ছাপ পড়েছে মাটিতে। অনায়াসে সেই ছাপ অনুসরণ করে আমরা চলতে পারব। আমার বিশ্বাস ওই পায়ের ছাপই আমাদের ম্যাসিংহ্যামের সন্ধান দেবে। আমি জানি আমাদের অভিযান চূড়ান্ত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। জয়-পরাজয় মরণ-বাঁচন সবই কালকের মধ্যেই নির্ধারিত হয়ে যাবে।

২৭শে অক্টোবর, রাত ২টা

এর মধ্যেই যে আবার ডায়রি লিখতে হবে তা ভাবিনি। কিন্তু এসব ঘটনা টাট্‌কা টাট্‌কা লিখে ফেলাই ভালো। এই প্রথম আমরা অ্যানাইহিলিন পিস্তল ব্যবহার করতে হল। এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। ঘটনাটা বলি।

গোরিলাদের দল চলে যাবার এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা নিজেরাই টিলার পাশে ক্যাম্প ফেলে রাত্রিযাপনের আয়োজন করে নিয়েছিলাম। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর রাত্রে ঘুম হবেনা মনে করে আমরা তিনজনেই একটা করে আমার তৈরি সম্নোলিন বড়ি খেয়ে নিয়েছিলাম। রিস্টওয়াচে সাড়ে পাঁচটার সময় অ্যালার্ম দিয়ে আমরা আটটার মধ্যেই সকলে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম।

আমার ঘুমটা ভেঙে গেল একটা বাজের শব্দে। উঠে বুঝতে পারলাম বাইরে বেশ ঝোড়ো হাওয়া বইছে, আর তার ফলে তাঁবুর কাপড়টা কেঁপে কেঁপে উঠছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর তাঁবুর দরজার ফাঁক দিয়ে

বাইরেটা দিনের মত আলো হয়ে উঠছে। অথচ এর মধ্যেও অবিনাশবাবু দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ভাবলাম একবার উঠে গিয়ে দেখি কাবালার তাঁবুটা ঠিক আছে কিনা।

দরজা ফাঁক করে বাইরে আসতেই ঝড়ের তেজটা বেশ বুঝতে পারলাম। আকাশে চাঁদের বদলে কালো মেঘ প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে।

কাবালার তাঁবুর দিক চাইতেই এক ঝলক বিদ্যুতের আলোতে সাদা তাঁবুর সামনে একটি অতিকায় কালো প্রাণীকে দেখতে পেলাম। সেটা কাবালার তাঁবুর দিক থেকে আমাদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছে। আমার হাতে টর্চ ছিল, সেটা প্রাণীটির দিকে ফেলতেই তার চোখদুটো জলজ্বল করে উঠল। গোরিলা—কিন্তু ঠিক সাধারণ গোরিলা নয়। সচরাচর একটা বড় সাইজের গোরিলা ছফুটের বেশি লম্বা হয় না। এটার হাইট অন্তত আটফুটের কম না। মানুষের মত দুপায়ে হেঁটে সেই আট ফুট লম্বা ও পাঁচ ফুট চওড়া দানবটা এগিয়ে আসছে আমারই তাঁবুর দিকে।

মনে মনে বললাম—এটাইত স্বাভাবিক। গ্রেগরিকে ধরে নিয়ে গেছে, এবার ত আমাকেই নেবার পালা! আমিও যে ম্যাসিংহামের অনুসন্ধান করছি, আর আমিও যে বৈজ্ঞানিক—সুতরাং আমার উপর ত তার আক্রোশ হবেই!

অবিশ্যি এত কথা ভাববার আগেই আমি তাঁবুতে ফিরে এসে আমার ব্রহ্মাস্ত্রটি বার করে নিয়েছিলাম। সেটা হাতে করে বাইরে বেরোতেই একেবারে গোরিলার মুখোমুখি হয়ে গেলাম। কিছু বুঝতে পারার আগেই জানোয়ারটা একটা লাফ দিয়ে তার বিশাল লোমশ হাতদুটো দিয়ে আমাকে জাপটে ধরল। আমি সেই মুহূর্তেই আমার সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা পিস্তলটা তার বুকের উপর ধরে বোতামটা টিপে দিলাম। একটা তীক্ষ্ণ শিসের মত শব্দ হল, আর পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে অতিকায় গোরিলাটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এদিকে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। তাঁবুতে ফিরে আসব, এমন সময় বিদ্যুতের আলোতে দেখি, যেখানে গোরিলাটা ছিল সেখানে মাটিতে একটা চকচকে ধাতুর জিনিস পড়ে আছে। জিনিসটা হাতে নিয়ে তাঁবুতে ঢুকে ল্যাম্পের আলোয় দেখে বুঝলাম সেটা একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এরকম যন্ত্র এর আগে আমি আর কখনো দেখিনি। সকালে এটাকে পরীক্ষা করে দেখব ব্যাপারটা কী। এখন বেজেছে রাত দেড়টা। আপাতত আরেকটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

২৯শে অক্টোবর

ম্যাসিংহাম অনুসন্ধান পর্বের শেষে আমার মনের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা দেওয়া ভারী কঠিন। আনন্দ, দুঃখ, আতঙ্ক, অবিশ্বাস—সব মিলিয়ে মনটা কেমন যেন জট পাকিয়ে গেছে। সব চেয়ে আশ্চর্য লাগছে এই ভেবে যে ম্যাসিংহামের মত পণ্ডিত ব্যক্তিরও এই দশা হতে পারে। মানুষের মস্তিষ্কের ব্যাপারটা চিরকালই বোধহয় জটিল রহস্য থেকে যাবে।...

গোরিলা-সংহারের পর সাড়ে তিন ঘণ্টা মাত্র ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম ভাঙতে একটু অবাক হয়ে দেখি অবিনাশবাবু আমার আগেই উঠে বসে আছেন। বললেন, 'ওটা কী রেখেছেন মাথার পাশে—কোঁ কোঁ শব্দ করছে?'

সত্যিই ত!—গোরিলার জায়গায় যে ধাতুর জিনিসটা পেয়েছিলাম, সেটা আমার বালিশের পাশেই রাখা ছিল। ঠিক এরকমই একটা জিনিস সেদিন গোরিলা বাহিনীর দলপতির মাথায় লাগানো দেখেছিলাম। এখন দেখি সেই যন্ত্রটার ভিতর থেকে একটা মিহি সাইরেণের মত শব্দ বেরোচ্ছে। আমি সেটা হাতে তুলে নিলাম। শব্দ থামল না।

জিনিসটা দেখতে একটা ছোট্ট বাটির মত—মনে হয় ইস্পাত জাতীয় কোন ধাতুর তৈরি। 'বাটির' দুদিকে দুই কানায় দুটো বাঁ্যাকানো পাতের মত জিনিস রয়েছে, সেটা ফাঁক করে মাথার উপর দিয়ে নামিয়ে দিলে মাথার দুপাশে আটকে যায়। ফলে বাটিটা মাথার উপর উপুড় হয়ে বসে যায়—একেবারে ঠিক ব্রহ্মতালুতে। বাটির ভিতরে দেখলাম ছোট ছোট আশ্চর্য জটিল সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রয়েছে।

অবিনাশবাবু বললেন, 'ওটা পেলেন কোথায়? কাল রাত্তিরেও ত দেখিনি। এর আগে ওরকম জিনিস কোথায় দেখেছি বলুন ত—কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে!'

পরীক্ষার প্রথম ধাপ হিসেবে পাতদুটোকে দুহাতে ধরে ফাঁক করে বাটিটাকে উপর দিকে রেখে যন্ত্রটা ঠিক গোরিলার মত করে মাথায় পরে ফেললাম, আর পরামাত্র আমার শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা শিহরণ খেলে গেল।

তারপর আর কিচ্ছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম তার আগেই আসল যা ঘটনা সব ঘটে গেছে। মিরাণ্ডা হোটেলের বারান্দায় বসে আমি অবিনাশবাবুর মুখে সে সমস্ত ঘটনা শুনি। আর শুনে অবধি মনে হচ্ছে—ভাগ্যিস অবিনাশবাবু সঙ্গে ছিলেন!

আমার কী হয়েছিল জিগ্যেস করাতে অবিনাশবাবু বলতে শুরু করলেন—

আরে মশাই আপনি বলছেন আপনি অজ্ঞান হয়েছিলেন, কিন্তু অজ্ঞান ত কই কিছু বুঝলুম না। যন্ত্রটা মাথায় পরলেন, তারপর তিড়িং করে একটা লাফ দিয়েই বেশ যেন ফুর্তির সঙ্গে তাঁবু থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। আমি ভাবলুম আপনি কিছু পরীক্ষা টরীক্ষা করতে গেছেন, এক্ষুণি ফিরবেন। ওমা—দশ মিনিট গেল, বিশ মিনিট গেল—কোন পাত্তাই নেই আপনার। তখন কেমন যেন একটা সন্দেহ হল। আমিও বাইরে বেরোলুম, এদিক ওদিক দেখলুম, টিলায় উঠলুম—কিন্তু কোথাও আপনার কোন চিহ্ন দেখতে পেলুম না। অন্য তাঁবুটার কাছে গিয়ে দেখি ওইযে কাফ্রি ছোকরাটা—ক্যাবলা না কী নাম—সে তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে চেয়ে কী জানি দেখছে। আমায় দেখেই বললে, 'গোরিলা এসেছিল রাত্রে। প্রোফেসর ঠিক আছেন ত?'

আমি বললুম, 'প্রোফেসর উইথ সাইনিং হেডক্যাপ গো আউট হাফ-অ্যান-আওয়ার।'

শুনে সে ভারী ব্যস্ত হয়ে বললে, 'আমাদের এক্ষুণি বেরোতে হবে। মাটিতে নিশ্চয়ই প্রোফেসরের পায়ের ছাপ পড়েছে। সেই ছাপ আমাদের ফলো করতে হবে।'

ভাবলুম জিগ্যেস করি সে কিসের আশঙ্কা করছে, কিন্তু ইংরিজি মাথায় এলো না, তাই চুপ করে গেলুম।

দশ মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লুম। তাঁবুর বাইরে থেকেই পায়ের ছাপ শুরু হয়েছে—সেই ধরে এগিয়ে চললুম। কিন্তু আশ্চর্য কী জানেন? সেই ছাপ কোথায় গিয়ে মিশেছে জানেন? সেদিনের পাঁচশো গোরিলার পায়ের ছাপের সঙ্গে। সেগুলো যেদিকে গেছে, আপনিও সেদিকেই গেছেন। দেখে কী মনের অবস্থা হয় বলুন ত? তবে আপনার ছাপটা টাটকা বলে সেটা আরো স্পষ্ট, তাই পথ হারাইনি কোথাও।

দুপুর নাগাৎ হাঁটতে হাঁটতে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলুম যেখানে জঙ্গলটা ঘন হয়ে গিয়ে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড বড় বড় গাছ—একটারও নাম জানিনা, আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার—একটি শব্দ নেই। পাখি জানোয়ার ব্যাঙ ঝিঁঝিঁ কাক চড়ুই তক্ষক ফক্কক কিচ্ছুনা। এমন থমথমে বন এক স্বপ্নেই দেখিচি। ঠিক মনে হয় যেন মড়ক লেগে সব কিচ্ছু মরে টরে ভূত হয়ে গেছে।

তবে তার মধ্যেও দেখলুম আপনার পায়ের ছাপ ঠিকই রয়েছে; আর দেখলে মনে হয়—অন্তত ক্যাবলা

তাই বললে—যে আপনি যেন যাকে বলে দৃপ্ত পদক্ষেপেই এগিয়ে চলেছেন।

আরো দশ মিনিট চলার পরেই কী সব যেন শব্দ কানে আসতে লাগল—দুম্-দাম্ ধুপ্-ধাপ্ খচ্-খচ্—নানারকম শব্দ। ক্যাবলা দেখি তার বন্দুকটাকে বাগিয়ে ধরেছে। আমার কিছুই ধরার নেই—এমনকি লাঠিখানাও ছাই তাঁবুতে ফেলে এসেচি—তাই ক্যাবলার কাঁধখানাই খাবলে ধরলুম।

কিছুটা পথ চলার পর এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলুম, আর সেই সঙ্গে শব্দের কারণও বুঝতে পারলুম আমার ত এমনিতে মৃত্যুভয় নেই, কারণ জানি সেভেনটি এইটের আগে মরব না, কিন্তু তাও যা দেখলুম তাতে গলা শুকিয়ে রক্ত জল হয়ে গেল।

দেখি কি—বনের মধ্যিখানে একটা খোলা জায়গা। আগে খোলা ছিল না—আশেপাশের সব গাছ ফাছ কেটে জায়গাটাকে পরিষ্কার করা হয়েছে। সেই খোলা জায়গার মধ্যিখানে রয়েছে কাঠের পাঁচীল দিয়ে ঘেরা কাঠের তৈরি একটা বেশ বড় রকমের বাড়ি। পাঁচীলের মধ্যিখানে আমরা যেদিক দিয়ে আসছি সেদিকে রয়েছে একটা ফটক। আর সেই ফটক আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক প্রহরী। কিন্তু সে প্রহরী মানুষ নয়, সে এক সাক্ষাৎ দানবতুল্য গোরিলা। আমাদেরই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা, অথচ দেখে মনে হয় সেটা যেন আমাদের দেখতেই পাচ্ছে না।

ফটকের ফাঁক দিয়ে ভেতরের কম্পাউণ্ডটা দেখা যাচ্ছিল; সেখানে দেখি কি অন্তত পক্ষে শ'দুএক গোরিলা! তাদের কেউ টহল ফিরছে, কেউ মোট বইছে, কেউ কাঠ কাটছে, আর আরো কত কী যে করছে যা বাইরে থেকে ভালো বোঝাও যায় না।

আপনার পায়ের ছাপ বলছে যে আপনি সটান ওই ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছেন। কোথায় গেছেন, বেঁচে আছেন কি মরে গেছেন, তা মা গঙ্গাই জানেন। আমি ত কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কিন্তু ক্যাবলা দেখলুম আদপেই ঘাবড়ায় নি। বললে, 'ভেতরে যাওয়া দরকার, কিন্তু বুঝতেই পারছ—ফটক দিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ, আর বন্দুকটা থেকেও না থাকার সামিল।'

আমি বললুম, 'দেন হোয়াট ইউ ডুইং?

ক্যাবলা উত্তর দিলে না। সে মাথা তুলে এদিক ওদিক গাছের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। তারপর একটা প্রায় মনুমেন্টের মত গাছের উঁচু দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ওই যে দেখছ ঝুলন্ত লতাটা গাছের ডালের সঙ্গে পাকিয়ে রয়েছে, মনে হচ্ছে ওইটের প্যাঁচ খুলে ঝুলে পড়লে ওই কাঠের বাড়ির চালে পৌঁছানো যাবে।

আমি বললাম, 'হু গো?'

ক্যাবলা বললে, 'আমি ত যাবই, কিন্তু তুমি বাইরে একা থেকে কী করবে? আর তোমার বন্ধু ত ভিতরে। আমার মতে দুজনেরই যাওয়া উচিত।'

বললুম, 'বাট গোরিলা?'

ক্যাবলা বললে, 'আমার ধারণা গোরিলারা ম্যাসিংহামের আদেশ ছাড়া কিছু করবে না। ম্যাসিংহাম কিছু জানতে না পারলেই হল। চলো—সময় বেশি নেই—আর গ্রেগরি শঙ্কু দুজনেই বিপন্ন।'

বলব কি মশাই—ছেলেবেলা টার্জানের বই দেখে কত আমোদ হয়েছে, কিন্তু সেই আফ্রিকার জঙ্গলে এসে কোনদিন যে আবার আমাকেই টার্জানের ভূমিকা নিতে হবে সেত আর কস্মিনকালেও ভাবতে পারিনি!

ক্যাবলা দেখলুম চোখের নিমেষে ওই রামঢ্যাঙা গাছটা বেয়ে তরতরিয়ে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাত উপরে উঠে

গেল। তারপর লতাটার নাগাল পেয়ে সেটার প্যাঁচ খুলতে শুরু করল। খোলা হলে পর সেটাকে ছেড়ে দিতেই সেটা মাটিতে পৌঁছে গেল। ক্যাবলা প্রথমে সেই লতা বেয়ে মাটিতে নেমে চোখের একটা আন্দাজ করে নিল। তারপর লতার মুখটা হাতে ধরে গুঁড়ি বেয়ে গাছের আরেকটা ডালে গিয়ে উঠলে। সেখান থেকে সে আমায় ইশারা করে বুঝিয়ে দিলে যে সে লতাটা ধরে ঝুলে পড়ে দোল খেয়ে কাঠের বাড়ির ছাতে গিয়ে নামছে; নেমেই সে লতাটাকে আবার ছেড়ে দিয়ে আমার দিকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে। আমি যেন ঠিক সেই ভাবেই দোল খেয়ে চলে যাই; একবার সেখেনে পৌঁছুলে সে নিজেই আমাকে ধরে নামিয়ে নেবে।

আমি ইষ্টনাম জপ করতে শুরু করলুম। আপত্তির সব কারণগুলো বলতে হলে অনেক ইংরেজি বলতে হয়, আবার যদি শুধু 'নো' বলি ত ভাবতে কাওয়ার্ড—তাতে বাঙালির বদনাম হয়। তাই চোখ বুঁজে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে বলে দিলুম—ইয়েস, ভেরি গুড।

তিন মিনিটের মধ্যে টার্জানের খেল দেখিয়ে ক্যাবলা কাঠের বাড়ির ছাদে পৌঁছে গেল। তারপর লতাটাকে ছেড়ে দিতেই সেটা আবার সাঁই করে দুলে ফিরে এলো, আর আমিও সেটাকে খপ্ করে ধরে নিয়ে গাছে চড়তে শুরু করলুম। কীভাবে চড়িচি সে আর বলে কাজ নেই; হাঁটুর আর কনুইয়ের অবস্থা-ত আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্চেন।

ডালের উপর পৌঁছে লতাটাকে নিজের কোমরের চারপাশটায় বেশ করে পেঁচিয়ে নিলুম। তারপর দুগগা বলে চোখ কান বুঁজে ডাল থেকে দিলুম ঝাঁপ। একটা যেন প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া তার সঙ্গে কানের মধ্যে সন্ সন্, পেটের মধ্যে গুড় গুড়, আর হাত পা যেন ছিম ছিম—কিন্তু পরক্ষণেই দেখলুম আমি একেবারে ক্যাবলার খপ্পরে। সে আমাকে জাপটে ধরে আমার কোমর থেকে লতার প্যাঁচ খুলে দিলে, আর আমিও হাঁপ ছাড়লুম। ঠাকুরমার দেওয়া অবিনাশ নামটা যে কত সার্থক সেটাও তখনই বুঝলুম।

এবার ক্যাবলা ইশারা করে ছাদের মধ্যেখানে একটা উঁচু মত চৌখুপির দিকে দেখালে। বুঝলুম সেটা একটা স্কাইলাইট—যেমন আমাদের গিরিডিতে রাইট সাহেবের বাংলোর উপরে রয়েচে। এবার দুজনে হামাগুড়ি দিয়ে সেই স্কাইলাইটের কাছে গিয়ে তার দুটো জানালার মধ্যে দিয়ে মাথা গলিয়ে দিলুম। যা দেখলুম সে এক আশ্চর্য ব্যাপার।

যে ঘরটা দেখা গেল সেটা মাঝের ঘর—আর মনে হল বেশ বড়। যে অংশটা দেখলুম তাতে একটা বেশ বড় কাঠের টেবিল রাখা রয়েচে। সেই টেবিলের উপর আপনি আর গ্রেগরি সাহেব চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন—দুজনেরই মাথায় আঁটকানো সেই চকচকে বাটি। আপনাদের দুজনেরই চোখ খোলা, আর সেই চোখ স্কাইলাইটের দিকেই চাওয়া—কিন্তু সে চোখে কোন দৃষ্টি নেই, একেবারে কাঁচের চোখের মত চোখ।

টেবিলের পাশে একটি সাহেব পায়চারি করচেন আর কথা বলছেন। উপর থেকে সাহেবের মাথার টাক আর তার পিছন দিকের লম্বা চুলটাই দেখতে পাচ্ছিলুম, কিন্তু গোরিলাদের দাপাদাপির জন্য তার একটি কথাও শুনতে পাচ্ছিলুম না।

ক্যাবলা বললে, 'চলো, নীচে নেমে বাড়ির ভেতরে ঢোকার একটা রাস্তা করা যাক।'

ছোকরা ভারী তৎপর—যেমন কথা তেমনি কাজ। ছাতের পাশ দিয়ে একটা কাঠের খুঁটি ধরে ঠিক বাঁদরের মত নিঃশব্দে নীচে নেমে গেল। তারপর দেখি হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমায়—আমাকেও নাকি ওই ভাবেই নামতে হবে! ভাবুন ত এই বয়সে এসব ডানপিটেদের কি বলে? ছোকরা বোধহয় আমার কিন্তু কিন্তু ভাব বুঝতে পারলে। সে ইশারায় বোঝালে—তুমি লাফ মারো, আমি তোমায় ধরব। চোখ বুজে মারলুম লাফ। বললে

বিশ্বাস করবেন না—ক্যাবলা আমায় ঠিক ফুটবলের মত লুফে নিলে। কী শক্তি ভাবুন ত!

বাড়ির যেদিকটায় নামলুম সেটা হল পেছন দিক। একটা খোলা জানালা ছিল মাটি থেকে হাত চারেক উঁচুতে। সেটা বেয়ে সাবধানে ভেতরে ঢুকলুম। এ ঘরটা ছোট, বোধ হয় ভাঁড়ার ঘর। কাঠের তাক রয়েছে, তাতে টিনের কোটোতে খাবার টাবার রয়েছে। সামনে ক্যাবলা আমি ঠিক তার পিছনে পা টিপে টিপে একটা দরজা দিয়ে আরেকটা ঘরে ঢুকলুম। আসতেই তার পাশের ঘর থেকে সাহেবের গলা পেলুম। মনে হল সাহেবের বেশ উল্লাস হয়েছে। ভেজানো দরজার চেরা ফাঁকে চোখ লাগিয়ে বুঝলুম এটাই সেই মাঝের বড় ঘর। যাতে আপনারা দুজনে বন্দী হয়ে রয়েছেন। ম্যাসিংহাম সাহেব কথা বলে চলেছেন, আর মাঝে মাঝে অট্টহাসি করে উঠছেন। তার কথা শুনে মোটমাট যা বুঝলুম তা হচ্ছে এই—

ম্যাসিংহামের তৈরি ওই বৈদ্যুতিক বাটির গুণ হল এই, যে মানুষ বা মানুষের পূর্বপুরুষ বাঁদর জাতীয় যে কোন প্রাণী ওই বাটিটি মাথায় পরলেই তাকে ম্যাসিংহামের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে! প্রথমে একটি গোরিলাকে ম্যাসিংহাম এইভাবে বশ করে। তারপর সেই গোরিলার সাহায্যে অন্য গোরিলাদের দলে টানে। এই গোরিলাগুলো হয়ে পড়ে তার বিশ্বস্ত চাকর। শুধু চাকর নয়—তাঁর সৈন্য এবং তাঁর বডিগার্ডও বটে। গ্রেগরি সাহেব তাঁর কাজের ব্যাঘাত করছিলেন বলে তিনি গোরিলার সাহায্যে তাকে পাকড়াও করেন, এবং মাথায় বাটি পরিয়ে তাঁকে বশ করেন। আর আপনি ত নিজে থেকেই বশ হয়ে তাঁর কাছে গেছেন। ম্যাসিংহাম আপনাদের মত দুজন সেরা বৈজ্ঞানিককে হাত করে গোরিলা বাহিনীর সাহায্যে বৈজ্ঞানিক জগতের একেবারে একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসবেন ভাবছিলেন। আপনারা তিনজনে কাজ চালিয়ে যাবেন, এবং যদি বাইরের লোক কেউ নাক গলাতে আসে, তাহলে গোরিলা লেলিয়ে দিয়ে তার দফারফা করা হবে।

ম্যাসিংহামের প্রলাপ শুনে আমরা একেবারে হকচকিয়ে গেলুম। ক্যাবলা রাগে ফুলতে ফুলতে বললে, 'আড়ি পেতে কোন লাভ নেই। চলো ঘরের ভিতর ঢুকি।'

আমি কিন্তু আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলুম যেটা ক্যাবলার চোখে পড়েনি। আমাদের ডানদিকে একটা দরজা রয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে আরেকটা ঘর দেখা যাচ্ছে। আমি দরজাটার দিকে গিয়ে সেটা ফাঁক করতেই ভিতরের সব যন্ত্রপাতি চোখে পড়ল। বুঝতে পারছিলুম, আমার সাহস ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দরজাটার মুখে দাঁড়িয়ে ক্যাবলাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলুম। তারপর দরজাটা আরো খানিকটা ফাঁক করলুম। বুঝলুম সেটাই যাকে বলে কন্ট্রোল রুম! দেয়ালের গায়ে কাঠের তক্তার উপর নানারকম বোতাম হ্যাণ্ডেল সুইচ ইত্যাদি রয়েছে, আর প্রত্যেকটার উপর ইংরিজিতে লেখা রয়েছে কোনটা কী কাজ করে। বুঝলুম এখান থেকেই বোতাম টিপে, মানুষ গোরিলা ইত্যাদি যে কেউ ম্যাসিংহামের বশ, তাদের সবাইকেই চালানো যায়। সেদিন যে বাটির ভিতর থেকে শব্দ বেরোচ্ছিল, তাও সে এখান থেকে বোতাম টেপার জন্যই।

ক্যাবলা দেখি এগিয়ে এসে দরজাটা আরো খানিকটা ফাঁক করলে। তারপর আমার দিকে ফিরে ফিস্ ফিস্ করে বললে—ভেতরে এসো। ঢুকতে যাবো—কিন্তু বাধা পড়ল। ক্যাবলা পিছিয়ে বাইরে চলে এলো। একটু গলা বাড়াতেই দেখি দরজার ঠিক পাশেই একটা বিশাল কালো লোমশ পিঠ দেখা যাচ্ছে। বুঝলুম কন্ট্রোল রুম পাহারা দেবার জন্যেও একটি গোরিলা প্রহরী রাখা হয়েছে।

এবারে বোর্ডের একটি বিশেষ লেখা চোখে পড়ল 'মাস্টার কন্ট্রোল'। লেখার নীচে দুটি সুইচ—একটিতে লেখা 'অন', আর একটিতে 'অফ'। 'অন' সুইচে এখন বাতি জ্বলে রয়েছে। বুঝলাম অন্যটি যদি টেপা যায়, তাহলে সব বৈদ্যুতিক কাজ বন্ধ হয়ে হয়ে যাবে—গোরিলাগুলো আবার স্বাধীন হয়ে যাবে, আর আপনারাও দুজনে জ্ঞান

ফিরে পাবেন। কিন্তু সুইচ টিপব কী করে? ওই কালদানবের দৃষ্টি এড়ানো যে অসম্ভব। আর শুধু তাই নয়—গোরিলাগুলো স্বাধীন ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলে আবার কী করে বসে তাও ত বলা যায় না। তারা যদি এসে আমাদের আক্রমণ করে তখন কী হবে?

হঠাৎ খেয়াল হল যে পাশের বড় ঘর থেকে আর ম্যাসিংহ্যামের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না। ব্যাপার কী?

আবার সেই ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম। এবার উঁকি মেরে দেখি ম্যাসিংহ্যাম আমাদের দিকে পিঠ করে টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে। একটা ধুপ ধুপ করে শব্দ হল। দেখি একটা গোরিলা একটা প্লেটে করে মাংসজাতীয় কী একটা খাবার এনে ম্যাসিংহ্যামের সামনে রাখলে। স্পষ্ট শুনলুম সাহেব বললে 'থ্যাঙ্ক ইউ'। গোরিলাটা যেদিক দিয়ে এসেছিল আবার সেই দিকেই চলে গেল।

সবে ভাবছি এ অবস্থায় কী করা উচিত, এমন সময় ক্যাবলা চক্ষের নিমেষে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল! বিদ্যুদ্বেগে দরজাটা খুলে এক লাফে ম্যাসিংহ্যামের পিছনে পৌঁছে ধাঁ করে পকেট থেকে একটা সবুজ রুমাল বার করে সাহেবের মুখটা বেঁধে দিয়ে তার চীৎকারের পথটা বন্ধ করে দিলে! তারপর তাকে জাপটে ধরে চেয়ার থেকে কোলপাঁজা করে তুলে একেবারে আমাদের ঘরে নিয়ে এলো।

এবার সাহেবের মুখ দেখলাম। ঘন পাকা ভুরুর নীচে নীল চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। অসহায় অবস্থায় পড়ে সেই চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটচে। বুদ্ধি থাকতে পারে সাহেবের, কিন্তু গায়ের জোরে দেখলেন ক্যাবলার কাছে সে একেবারে নেংটি ইঁদুর।

এবার ক্যাবলা সাহেবকে কণ্ট্রোল রুমের সামনে নিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'সুইচ টেপো'। বলেই কণ্ট্রোল রুমের দরজা পা দিয়ে ঠেলে খুলে দিলে। কালদানব দাঁড়িয়ে আছে—এমন বীভৎস, ভয়াবহ জানোয়ার জীবনে দেখিনি মশাই। আমাদের পুরাণের অসুর বোধহয় ঐ জাতীয়ই একটা কিছু ছিল। অবাক হয়ে দেখলুম—গোরিলটা ম্যাসিংহ্যামকে ওইরকম বন্দী অবস্থায় দেখেও আর কিচ্ছু না করে কেবল একটা কুর্ণিশ করলে।

ক্যাবলা আবার বললে, সুইচ টেপো।

ম্যাসিংহ্যাম ক্যাবলার দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে প্রশ্ন বোঝালে—কোন সুইচ?

ক্যাবলা চাপা গম্ভীর স্বরে বললে—দ্য সুইচ টু সেণ্ড দেম ব্যাক।

ম্যাসিংহ্যামের অবস্থা তখন এমন শোচনীয় যে নৃশংস উন্মাদ হওয়া সত্ত্বেও তখন তার জন্যে একটু মায়া হচ্ছিল।

ক্যাবলা সাহেবের ডান হাতটা একটু আলগা করে দিয়ে তাকে সুইচ বোর্ডের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। সাহেব কাঁপতে কাঁপতে একটা হলুদে রং-এর বোতাম তার ডান হাতের তর্জনী দিয়ে টিপে দিলে, আর দিয়েই, কেমন জানি অসহায় ভাবে ক্যাবলার বুকের উপর চিত হয়ে পড়লে। সঙ্গে সঙ্গেই, প্রথমে ম্যাজিকের মত বাইরের দুপ্‌দাপ্ শব্দ সব একসঙ্গে থেমে গিয়ে একটা অস্বাভাবিক থমথমে ভাবের সৃষ্টি হল। পাশে চেয়ে দেখি অতিকায় দানবের চোখের দৃষ্টি একেবারে বদলে গেছে। সে এদিক ওদিক চাইছে—নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে।

এদিকে ক্যাবলা কিন্তু তখনো ম্যাসিংহ্যামকে জাপটে ধরে আছে, আর ম্যাসিংহ্যামের দৃষ্টি রয়েছে গোরিলার দিকে। ক্যাবলা আমায় ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'কাঁধ থেকে আমার বন্দুকটা নাও—নিয়ে পিছিয়ে গিয়ে গোরিলাটির দিকে তাগ করে থাকো—ইফ হি ডাজ এনিথিং, প্রেস দ্য ট্রিগার!'

সার্কাসের খেলাই যখন দেখালুম, তখন শিকারীর খেলা দেখাতে আর কী? গম্ভীরভাবে ক্যাবলার হাত থেকে বন্দুকটা খুলে নিয়ে দশ হাত পিছিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর বন্দুকটা উঁচিয়ে গোরিলাটার দিকে তাগ করলুম।

জন্তুটা প্রথমে কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে মুখ দিয়ে একটা ঘর ঘর শব্দ করে দাঁত খিঁচিয়ে দুহাত দিয়ে তার নিজের বুকের উপর দুম দুম করে কয়েকটা কিল মারল। তারপর—আশ্চর্য ব্যাপার—কাউকে কিছু না বলে চার পায়ে ভর করে নিঃশব্দে দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে চলে গেল।

এবার বড় ঘরে গেলুম। আপনারা দুজনে তখনও যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব করে টেবিলের উপর শুয়ে আছেন। একটা প্রচণ্ড দাপাদাপির শব্দ পেয়ে বাঁ দিকে ঘুরে জানলা দিয়ে দেখি বাইরের এক অদ্ভুত কাণ্ড চলেছে। কতগুলো গোরিলা জানিনা—অন্তত শ পাঁচেক ত হবেই—সবকটা একসঙ্গে নিজেদের বুকে কিল মারছে। দুম্‌দুম্‌ ধুপ্‌ ধুপ্‌ দুম্‌ দুম্‌—হাজার দুরমুশের শব্দে কান পাতা যায় না।

তারপর ক্রমে শব্দ থেমে এলো, আর দেখলুম কি—সব কটা গোরিলা একসঙ্গে পুবমুখো হয়ে কম্পাউণ্ডের গেটের দিকে চলতে শুরু করল। আপনার ও গ্রেগরি সাহেবের মাথা থেকে যন্ত্রদুটো যখন খুলছি, ততক্ষণে গোরিলার পায়ের শব্দ প্রায় মিলিয়ে এসেছে।

তার পরের ঘটনা আর কী বলব। ম্যাসিংহাম সাহেবকে যে পাগলা গারদে রাখা হয়েছে সে খবর ত জানেন। আর গোরিলাদের হাতের তৈরি তার কাঠের বাড়িটিকে যে যন্ত্রপাতি সমেত পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলা হয়েছে তাও জানেন। এখন শুধু এইটেই বলার আছে, যে ভবিষ্যতে কোথাও কোন হাঙ্গামের কাজে ফিরে যেতে হলে আমাকে বাদ দিয়ে যাওয়াটা নিরাপদ হবে কিনা, সেটা ভেবে দেখবেন!

ইচ্ছে করে

তমাল চট্টোপাধ্যায়

ইচ্ছে করে মেলতে এখন
মেলতে মনের ডানা
ইচ্ছে করে দিতে আমার
আকাশ পারে হানা!
ইচ্ছে বড় জানব আমি,
এলে বাতাস বেগে
নিথর মেঘও হঠাৎ কেন
অমনি ওঠে জেগে।

ইচ্ছে করে জানতে আমার,
জানতে কিসের মোহে
আকাশখানা সেজেই আছে
নীলের সমারোহে।
জানতে ভীষণ ইচ্ছে করে
শঙ্খ চিলের কাছে
কোন সুখেতে সারা জীবন
আকাশ ছুঁয়ে আছে।

সবার চেয়ে ইচ্ছে জানার
'চোখ গেল' যে পাখি
হৃদয়-ভাঙা কিসের ব্যথায়
সিক্ত করে আঁখি!

পৃথিবীর মানুষের চন্দ্রে অবতরণ

মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ

১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই, মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ স্বপ্ন দেখছে, কবে সে পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে পাড়ি দেবে চাঁদের দিকে। যা এতদিন ছিল স্বপ্ন, তাই বাস্তবে পরিণত করার উদ্দেশ্যে তিনটি মানুষকে নিয়ে অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযান তার ঐতিহাসিক যাত্রাপথে বেরিয়ে পড়লো। শুরু হল ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিক ও রোমাঞ্চকর অভিযান। এবারকার অভিযানের মূল লক্ষ্য—চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ। মাত্র পনের বছর আগেই এ ছিল নিছক কল্পনা।

ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি, বুধবার। কাঁটায় কাঁটায় ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ২ মিনিটে দূরবর্তী কন্‌ট্রোল থেকে বোতাম টেপা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে উৎক্ষেপণ মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ৩৬৪ ফুট উঁচু স্যাটার্ন-৫ রকেটের নিম্নভাগ থেকে লক লক ক'রে আগুনের শিখা বেরিয়ে এসে সমস্ত কিছু ঢেকে ফেললো—এবং সেই শাদা ও কমলা রঙের অগ্নি স্তম্ভের ভেতর থেকে প্রায় চার হাজার টন ওজনের যন্ত্র-দানবটি পৃথিবীর মাটি ছেড়ে আকাশে উঠলো। তার চূড়ায় একটি কুঠুরির মধ্যে রয়েছেন নীল এ. আর্মস্ট্রং (অধিনায়ক), এডুইন ই. অ্যাল্‌ড্রিন এবং মাইকেল কলিন্‌স।

ডান দিক থেকে—আর্মস্ট্রং, অ্যাল্‌ড্রিন ও কলিন্‌স্।

যন্ত্র-দানবটি প্রতি সেকেণ্ডে ১৫ টন হিসেবে জ্বালানি গিলে চলল এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ৯০ হাজার রেল ইঞ্জিন অথবা ১৫ লক্ষ মোটর গাড়ির শক্তি নিজের বুকের মধ্যে সঞ্চয় ক'রে নিয়ে অতলান্তিকের আকাশ পথে দক্ষিণ দিকে ছুটে চললো। কয়েক সেকেণ্ড বাদে তাকে আর দেখা গেল না,—সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

প্রথম পর্যায়ের রকেট জ্বললো মাত্র সোয়া দু' মিনিট তারপর তা আপনা থেকে খসে পড়ে গেল। তারপর যেই দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেটের প্রজ্বলন শুরু হ'ল, অমনি রকেট উৎক্ষেপণে মহাকাশচারীদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত 'লঞ্চ এস্‌কেপ টাওয়ার'-এর প্রয়োজন ফুরলো, তাই তা খসে পড়লো। তারপর এক সময় দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেটও বিদায় নিলো। ফ্লোরিডা থেকে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার এগার মিনিটের কিছু বেশী সময় পরে অ্যাপোলো আফ্রিকার পূর্বাকাশে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রবেশ ক'রল।

অ্যাপোলো ঘণ্টায় ১৭,৫০০ মাইল বেগে ১১৯ মাইল উঁচুতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ শুরু ক'রল। আকাশে ওঠার পরই অ্যাপোলোর অধিনায়ক আর্মস্ট্রং জানালেন যে, তাঁরা সঠিক পথে চলেছেন।

এরপর প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে অ্যাপোলো পৃথিবী প্রদক্ষিণ করল এবং মাত্র দেড়বার পৃথিবী প্রদক্ষিণের পর অস্ট্রেলিয়ার আকাশে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে রকেটের তৃতীয় পর্যায় চালু ক'রে অ্যাপোলোকে গতিবেগ দেওয়া হ'ল ঘণ্টায় ২৪,২০০ মাইল। এই বিপুল গতিবেগ তাকে পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে ছিটকে বের ক'রে দিল চাঁদের দিকে।

রকেটের তৃতীয় পর্যায়টি জ্বললো ৫ মিনিট ২০ সেকেণ্ড এবং অ্যাপোলোকে পৃথিবীর অভিকর্ষ-বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে তাকে ঠেলে দিল চাঁদের পথে। চাঁদের পথে যাত্রার কয়েক সেকেণ্ড পরেই মহাকাশচারীরা পৃথিবীতে খবর পাঠালেন,—জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছি।

এরপর পৃথিবীর কন্‌ট্রোল থেকে সাংবাদিকদের জানানো হ'ল, অ্যাপোলো নিখুঁতভাবে ছুটে চলেছে।

কিছুক্ষণ পরেই মহাকাশচারীরা তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেললেন। এরপর কম্যাণ্ড মডুল বা মূল মহাকাশযানকে ঘুরিয়ে 'চাঁদের ভেলা'-র সঙ্গে মুখোমুখি জুড়লেন এবং তাকে তার গ্যারেজ থেকে বের ক'রে নিয়ে এলেন। তারপর আবার মুখ ঘুরিয়ে, চাঁদের ভেলাকে সামনে রেখে, অ্যাপোলো ছুটে চললো তার লক্ষ্যস্থলের দিকে।

এ পর্যন্ত ওরা কথা বলেছেন খুব কম, যেটুকু না বললে চলে না সেইটুকুই। তাও বলেছেন পৃথিবীর কন্‌ট্রোলের সঙ্গে শুধু নীরস যান্ত্রিক তথ্য নিয়ে।

কিন্তু পৃথিবীর অভিকর্ষ থেকে ছাড়া পেয়েই যেন অধিনায়ক আর্মস্ট্রংয়ের মুখ খুলে গেল। তিনি কন্‌ট্রোলকে বললেন,—ঠিক এই

মুহূর্তে জানালার ভেতর দিয়ে সমগ্র উত্তর আমেরিকা, আলাসকা থেকে শুরু ক'রে উত্তর মেরু এবং সেখান থেকে কিউবা উপকূল পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ছ'টা অ্যাপোলো-১১ এর তিন নভশ্চর বিছানায় গেলেন। কেপ থেকে যাত্রার প্রায় ১২ ঘণ্টা পর এবং প্রায় ৬০ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে একটু অবসর, নিদ্রার কোলে একটু মাথা রাখা।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে তাঁরা প্রথম নৈশ ভোজন সেরে নিলেন। স্যাল্‌মন মাছের স্যালাড, মুরগীর মাংস, ভাত, কেক, কলা এবং আঙ্গুরের রস। আহারটা নেহাৎ মন্দ হল না।

এর আগেই তাঁরা পৃথিবীর বুকে রঙীন ছবি পাঠিয়েছেন টেলিভিশনে। কিন্তু অ্যাল্‌ড্রিন তাঁর ক্যামেরার কাজে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হননি। তাই তিনি রসিকতা করে বললেন,—হ্যালো, হাউসটন (Houston), পৃথিবীটাকে একটু ঘুরিয়ে দিতে পার? কত আর সমুদ্র দেখবো। এর চেয়ে আর একটু কিছু বেশী দেখতে চাই।'

নীল আর্মস্ট্রং বললেন,—আমরা হাওয়াই দ্বীপ ভালভাবে দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমাদের চোখের সামনে উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল স্পষ্ট। ওই তো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র…ক্যালিফোর্নিয়া…মেক্‌সিকো।

ছবিগুলি তোলা হয় মহাকাশের ৬০ হাজার মাইল দূর থেকে। মহাকাশের কালো পর্দার পটে পৃথিবীকে একটি বিরাট নীল, সবুজ, সাদায় মেশানো বলের মতো মনে হচ্ছিল।

রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে মহাকাশচারীরা ছোট্ট একটি রকেট চালালেন। এর ফলে অ্যাপোলো তার কক্ষের উপর ক্রমাগত পাক খেতে লাগল। মহাকাশযানের ভিতরে উষ্ণতা যাতে একই রকম থাকে, এতে তারই ব্যবস্থা হল।

মহাকাশচারীরা, একটানা আট ঘণ্টা ঘুমালেন। মহাকাশে প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হ'ল। ভারতীয় সময় বিকেল চারটে নাগাদ তাঁরা ঘুম থেকে উঠলেন। উঠেই ব্রেকফাস্ট—ফলের স্যালাড, টোস্ট, চকোলেট এবং ফলের রস।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭টার খবর—অ্যাপোলো পৃথিবী থেকে এক লক্ষ মাইল দূরে চলে গিয়েছে।

হাউসটন, ১৮ই জুলাই—ফ্লাইট ডায়নামিক অফিসার ডেভিড রীড বলেছেন,—গতরাত্রে মহাকাশযানের গতিপথের সামান্য ত্রুটি সংশোধনের জন্যে একটি রকেট ব্যবহার করা হয়। এর ফলে অ্যাপোলোর গতিবেগ একটু বেড়ে গেছে। আর এজন্য নির্দিষ্ট সময়ের তিন মিনিট আগেই সে চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করবে।

অন্যান্য খবরের মধ্যে আছে, মহাকাশচারীরা নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে নিয়েছেন। মহাকাশযান লক্ষ্যভেদী বাণের মতো চাঁদের কক্ষপথের দিকে ছুটে চলেছে। এমনি নির্ভুল তার গতিপথ যে, চাঁদের কক্ষপথে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গতিপথের আর বিন্দুমাত্রও রদবদল করার প্রয়োজন হবে না,—যদিও সেরকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

১৯শে জুলাইয়ের খবর,—ভারতীয় সময় সকাল ৮টা ৪২ মিনিটে অ্যাপোলো—১১ চাঁদের অভিকর্ষ এলাকার মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই তৃতীয়বার মানব-আরোহীসহ মহাকাশযান পৃথিবীর প্রভাব ছাড়িয়ে চাঁদের রাজ্যে প্রবেশ ক'রল।

ভারতীয় সময় দুপুর ১২টা ২ মিনিট। অ্যাপোলো চাঁদের ২৯,৯০০ মাইলের মধ্যে চলে গিয়েছে, গতিবেগ ঘণ্টায় ২,৬০০ মাইল। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন থেকে খবর এল,—মহাকাশচারীরা এখন চাঁদের রাজ্যে এসে গিয়েছেন। এখন তাঁরা চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশের জন্য তৈরি। এই সময় তাঁরা চাঁদকে দেখলেন। তাঁরা বললেন,—কী সুন্দর ওই ছবি! আর্মস্ট্রং জানালেন,—চাঁদ এখন সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে। এখন পৃথিবীর আলোকে চাঁদ

আলোকিত। তিনি আরও জানালেন,—সূর্যের চতুর্দিকের জ্যোতির্বলয় দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে শুধু গ্যাস। এটা যেন একটা ভুতুড়ে দৃশ্য!

ভারতীয় সময় রাত ৭টা ২ মিনিট। অ্যাপোলো চাঁদ থেকে ১১,৭৪৩ মাইল দূরে, গতিবেগ ঘণ্টায় ২,৮৬০ মাইল।

রাত ১০টা ৩৩ মিনিটে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে অ্যাপোলো—১১-কে চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হ'ল। এর দশ মিনিট পরে, রাত ১০টা ৪৩ মিনিটে, অ্যাপোলো-১১ চাঁদের পেছন দিকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে পৃথিবীর বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল

চাঁদের ভেলাটি নাকের ডগায় নিয়ে রাত ১১টা ১৭ মিনিটে চাঁদের পেছন দিক থেকে আবার এপিঠে দেখা দিল। এই ৩৪ মিনিট হাউসটনের নিয়ন্ত্রণকারীদের সঙ্গে মহাকাশচারীদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। আর এই সময়ের মধ্যেই মহাকাশচারীরা মহাকাশের গতিবেগ কমিয়ে আনেন।

এর পরের খবর। অ্যাপোলো-১১ চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করেছে। এর দরুণ চাঁদের বুকে মানুষের প্রথম অবতরণের ব্যাপারে কাজ আরও কিছুটা এগিয়ে গেল।

রবিবার ২০শে জুলাই, ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ২৭ মিনিট। ভেলার নাবিক অ্যাল্‌ড্রিন একটি সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ভেলায় ঢুকলেন—অ্যাপোলো তখন চন্দ্র প্রদক্ষিণ ক'রে চলেছে।

এর ২৫ মিনিট পরে সেই সুড়ঙ্গ-পথে একইভাবে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলেন অধিনায়ক আর্মস্ট্রং। দু'জনে মিলে ভেলার যন্ত্রপাতিগুলি সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ক'রে নিলেন। হ্যাঁ, প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি ঠিক আছে—হাউসটনের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রকে সে সংবাদ জানিয়ে দেওয়া হ'ল।

সেখানে কয়েকহাজার বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ্ ও চিকিৎসক বসে আছেন তাঁদের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য। চীফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ বেরি এবং তাঁর সহকর্মীরা মহাকাশচারীদের হৃদস্পন্দন, রক্তের চাপ, মস্তিকের স্থিরতা সব কিছু দেখে নিলেন।

হার্টের অবস্থা জানবার জন্য, প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দূর থেকে 'ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাফ' নেওয়া হল। 'চমৎকার।' চিকিৎসকরা বললেন, হ্যাঁ, এগোতে পার।

ভারতীয় সময় রাত ১১টা ১৮ মিনিট বাজার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের ভেলা, 'ঈগল' মূল মহাকাশ যান কলম্বিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাঁরা তখন চাঁদের ওপিঠে।

বিচ্ছিন্ন হলেও 'ঈগল' 'কলম্বিয়া'র পাশে থেকেই চন্দ্র প্রদক্ষিণ করতে থাকল। চাঁদের এপিঠে পৃথিবীর সামনে এসে অধিনায়ক আর্মস্ট্রং খবর পাঠালেন—আমাদের ঈগল পাখির চমৎকার দুটি পাখা আছে।

নীচে, প্রায় ৭০ মাইল (১১০ কিলোমিটার) নীচে, বন্ধুর, ভাঙ্গাচোরা, উপলখণ্ড সমাকীর্ণ আগ্নেয় পর্বত। চাঁদের নিরক্ষরেখা বরাবর ভেলাটি এগিয়ে চলেছে। দূরে অ্যাপেনাইন পর্বতশিখর, তার দক্ষিণপ্রান্ত জুড়ে অশ্রু সাগর—একটির পর একটি দৃশ্য আসছে, আর সরে যাচ্ছে। তাঁরা চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে চলেছেন।

শান্ত-সাগর (sea of tranquility) যেখানে তারা অবতরণ করবেন তার উপর দিয়েও 'ঈগল' কয়েকবার উড়ে গেল। এরপর একসময় পৃথিবী থেকে কলম্বিয়া মারফৎ নির্দেশ গেল, এবার শান্ত-সাগর এর তটভূমির দিকে ভেলার মুখ ঘুরিয়ে নাও। তারপর জ্বালাও রকেট।

ভারতীয় সময় রাত১২টা ৪৪ মিনিটে সেই রোমহর্ষক, কল্পনাতীত বিপজ্জনক অধ্যায় শুরু হল। তাঁরা রকেট ইঞ্জিন চালু করে নীচে চাঁদের দিকে নামতে শুরু করলেন।

চন্দ্রপৃষ্ঠের ৭০ মাইল উপরে চাঁদের আকাশে প্রদক্ষিণরত 'কলম্বিয়া' থেকে কলিন্‌স খবর পাঠালেন, সব কিছু নিখুঁতভাবে চলছে।

এইসময় হঠাৎ বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। হাউসটনে নিদারুণ উদ্বেগ। ফ্লাইট ডিরেক্টর ইউজিন ক্রানৎজ ধীর স্থির মানুষ, কোন অবস্থাতেই বিচলিত হন না। বেশ সংযতভাবে তিনি বললেন,—সবাই তাকিয়ে থাকো যন্ত্রের দিকে, মিটারের দিকে, গ্রাফের দিকে—কোন কথা নয়, ফিস্‌ফিসানি নয়! হ্যাঁ তোমাদের প্রতি শুভেচ্ছা, সকলের প্রতি শুভেচ্ছা, মহাকাশে চাঁদের রাজ্যে আমাদের মানুষের প্রতি শুভেচ্ছা।

ঠিক সেই মুহূর্তে কলিন্‌স আবার চাঁদের এপিঠে এলেন! বললেন,—ঈগল নামছে হেলিকপটারে যেমন করে মাটিতে নামে পাখি যেমন করে সামান্য একটু কাত হয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে ঠিক তেমনিই নামছে, এইতো আমি দেখতে পাচ্ছি। কুৎসিৎ, বিদঘুটে, চার ঠ্যাংওয়ালা ঈগল ওদের দুজনকে নিয়ে সুন্দরভাবে নামছে।

বিরাট সূর্যমণ্ডল তখন জমির চাঁদের সঙ্গে কোণাকুণি ভাবে রয়েছে। সূর্যের আলোয় মসীকৃষ্ণ ছায়া পড়েছে চন্দ্রমণ্ডলে। নভোমণ্ডলে সূর্যের এরূপ অবস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চাঁদে নামার সময়টি নির্দিষ্ট হয়েছে। কারণ, এরূপ আলো ছায়া থাকায় অভিযাত্রীরা পাহাড়-পর্বত বিপদসঙ্কুল গহ্বর সব স্পষ্ট দেখতে পাবেন, সম্ভাব্য বিপদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে পারবেন।

তারপর এল সেই চরম মুহূর্ত। ভারতীয় সময় রাত ১টা ৪৮ মিনিটে ঈগল, আর্মস্ট্রং ও অ্যাল্‌ড্রিনকে নিয়ে চাঁদের মাটিতে নামল। এমন কিছু চোটও তাঁদের গায়ে লাগল না। শান্ত সাগরের তীরে সমতল ভূমির ওপর মাকড়সার মতো চারটি পা ছড়িয়ে দিয়ে ঈগল বেশ শান্তভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। চাঁদের শান্ত-সাগর থেকে ভেসে এল প্রথম মানুষের কণ্ঠস্বর—হ্যালো, পৃথিবী, চাঁদ থেকে বলছি, আমি পৃথিবীর মানুষ। হ্যাঁ, এইমাত্র চাঁদের ভেলা ঈগল-এ চেপে আমরা এখানে নামলাম। আমি নীল আর্মস্ট্রং আর আমার সঙ্গী অ্যাল্‌ড্রিন।

নামবার সময় সামান্য ধুলোর মেঘ সৃষ্টি হল। খুব সম্ভবত ভেলার ইঞ্জিনটিই এজন্য দায়ী।

ভেলার জানালায় দাঁড়িয়ে আর্মস্ট্রং পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রকে বললেন,—মাফ করবেন নামতে বোধহয় একটু বেশী সময় লাগলো। চারদিকে কেবলই গিরিখাদ, শিলাখণ্ড। নামবার উপযুক্ত স্থান বেছে নিতে একটু সময় লাগলো।

অ্যাল্‌ড্রিন জানালার পাশে এসে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে বললেন,—যতরকমের পাথর থাকতে পারে সব দেখতে পাচ্ছি। একদিক থেকে পাথরগুলির যে রং দেখা যাচ্ছে, অন্যদিক থেকে দেখলে তা সম্পূর্ণ আলাদা।

২১শে জুলাই, ভারতীয় সময় সোমবার সকাল ৮টা ২৬ মিনিট ২০ সেকেণ্ড, মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর মুহূর্ত। ঠিক তখনই পৃথিবীর মানুষ চাঁদের বুকে প্রথম পদচিহ্ন রেখে এল—যুগ যুগান্ত অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কোনদিন হয়তো সেই চিহ্ন মুছে যাবে না। চাঁদ অনন্তকাল এই চিহ্ন বুকে নিয়ে জেগে থাকবে।

চাঁদের ভেলার ঢাকনা খুলে যে মুখখানা বেরিয়ে এল, সেটা অধিনায়ক আর্মস্ট্রং-এর মুখ। ভেলাটির একপায়ের সঙ্গে একখানা মই ঝোলানো রয়েছে। তারই দু'টি সিঁড়ি বেয়ে তিনি খানিকটা নামলেন তারপর উপরে হাত বাড়িয়ে টেলিভিশন ক্যামেরাটি এমন জায়গায় বসিয়ে দিলেন যেখান থেকে সে ঐতিহাসিক ব্যাপারটি দেখতে পারে এবং পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের সামনে সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্যটি হাজির করতে পারে।

মইটির দিকে চোখ রেখে একটির পর একটি সিঁড়ি বেয়ে তিনি সব চাইতে নীচের সিঁড়িতে পা রাখলেন। সেখানে একটু দাঁড়ালেন, এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন, তারপর বাঁ পাটি আর একটু নামিয়ে দিয়ে মাটি তাঁর ভার সইতে পারবে কিনা, যাচাই করে দেখলেন। বুঝতে পারলেন, ভয়ের কিছু নেই। পর মুহূর্তেই এক লাফে নেমে পড়লেন চাঁদের মাটিতে।

পৃথিবীর অগণিত মানুষ টেলিভিশনে দেখল, চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর মানুষ।

ক্যামেরায় স্পষ্ট ধরা পড়ল, চাঁদের মাটিতে তাঁর পা বসে যাচ্ছে। আর্মস্ট্রং বলেন,—হ্যাঁ, চাঁদের ধূসর মাটিতে আমার পা এক কি দুই ইঞ্চি প্রায় বসে যাবার উপক্রম হয়েছিল, তারপর আর অসুবিধা হয়নি।

প্রথমেই যে নুড়িটি সামনে পাওয়া গেল, তাই কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে তুললেন আর্মস্ট্রং। মাটির দিকে ঝুঁকে পাথর কুড়োতে তাঁর বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। তবুও একমুঠো মাটি তুলে পকেটে রাখলেন।

তখন সূর্যের আলোয় তাঁর ছায়া তার চেয়ে প্রায় ছগুণ বড় (৩৫ ফুট) দেখাচ্ছিল। তাঁর শরীর থেকে যেন ফস্‌ফরাসের মতো আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। আর তাঁর শাদা পোশাক চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে অনিশ্চিত পদক্ষেপে টলতে টলতে এগিয়ে চললেন। অ্যাল্‌ড্রিনকে জিজ্ঞেস করলেন,—আমি ঠিক ঠিক এগুচ্ছি তো?

'ঈগল'-এর ভিতর থেকে অ্যাল্‌ড্রিন বললেন,—আপনি খুব সুন্দরভাবে এগিয়ে চলেছেন।

চন্দ্রপৃষ্ঠ কেমন? এ সম্পর্কে আর্মস্ট্রং বললেন,—বালুকাময়, নুড়িতে আকীর্ণ। তবে চলে ফিরে বেড়াতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না।...আমরা বরং মসৃণ সমতলেই হেঁটে বেড়াচ্ছি।...আমেরিকার পশ্চিম মরুভূমি যেমন দেখতে চাঁদের ধূসর ভূমি অনেকটা সেই রকম। যেন একটা বড় ফুটবলের মাঠ। তবে খুব সুন্দর।

আর্মস্ট্রং আরও বললেন,—কেমন যেন ছায়া ছায়া অন্ধকার। কোথায় পা ফেলছি, ভালো করে দেখতে পারছি না। অথচ চোখ তুললেই চাঁদের ভেলাটিকে দেখতে পাচ্ছি। উপরের সবকিছু স্পষ্ট ভাবে দৃশ্যমান।

চির নিঃশব্দতা ও নীরবতার রাজ্যে তিনি একাই পা ফেলে চললেন—বিশ মিনিট। বিশ মিনিট পরে অ্যাল্‌ড্রিন ভেলা থেকে নেমে এসে তাঁর সঙ্গী হলেন।

ক্যাঙ্গারুর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে তাঁরা চলতে শুরু করলেন। কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত, তাঁদের অনেক কাজ।

প্রথমেই চন্দ্রজয়ের স্মারক ফলকটি বেশ জোরের সঙ্গেই পড়লেন আর্মস্ট্রং—বেতারে পৃথিবীর মানুষ তা শুনতে পেল।

'১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে পৃথিবী গ্রহ থেকে আগত মানুষ এখানে প্রথম পদার্পণ করেছিল। আমরা

এখানে এসেছিলাম সমগ্র মানবজাতির শান্তি-কামনায়।'

হাতে আরও কাজ। সময় মাত্র দু'ঘণ্টা। এরপরে অক্সিজেন ফুরিয়ে যাবে। দেহের ক্লান্তি যত বাড়বে, অক্সিজেনের খরচও তত বাড়বে। এই অবস্থায় বে-হিসেবী হওয়া চলে না।

অ্যাপলো-১১ থেকে তোলা বহু মাইল চওড়া একটি আলামুখ।

তাঁরা দু'জনে মিলে শত কোটি বছরের মরুপ্রান্তরে মার্কিন পতাকা পুঁতে দিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউস থেকে প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁদের ডাকলেন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা চলল তিন মিনিট।

আরও পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ভেলায় তুলে রেখে আর্মস্ট্রং ফিরে এলেন। তাঁরা যেন চাঁদের রাজা হয়ে বসেছেন, এমনই ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শিলাবৃষ্টির পরে শিশুদের মতো তাঁরা দু'জনে কাড়াকাড়ি ক'রে পাথর কুড়োতে লাগলেন।

কিন্তু সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে, সেইসঙ্গে অক্সিজেনও। কিন্তু আরও কাজ বাকি রয়েছে। তাঁরা সিস্‌মোমিটার যন্ত্র বসিয়ে দিলেন, তাতে ভূকম্পনের মতো চন্দ্রকম্পন ধরা পড়বে। পৃথিবীতে বসেই বিজ্ঞানীরা তা জানতে পারবেন। আর বসানো হ'ল 'লেসার রিফ্লেক্‌টার'। উদ্দেশ্য পৃথিবী থেকে নিক্ষিপ্ত আলোক প্রতিফলিত করে চাঁদ-পৃথিবীর দূরত্ব সঠিক বলে দেবে। বাস্তবিক, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে একটি আলোক-সংকেত প্রায় সেই মুহূর্তেই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এল।

ভারতীয় সময় ১০টা ২৩ মিনিটে হাউস্টন থেকে নির্দেশ গেল, কাজকর্ম বন্ধ রেখে ভেলায় ঢুকে পড়। বিপদ এসে যাচ্ছে। কাজকর্ম অসমাপ্ত রেখেই অ্যালড্রিন ভেলায় গিয়ে উঠলেন। অ্যালড্রিন প্রায় ১ ঘণ্টা ৫৪

মিনিট চাঁদের বুকে হেঁটে বেড়ান। এর কিছুক্ষণ পরে অধিনায়ক আর্মস্ট্রংও তাঁকে অনুসরণ করলেন। ঘড়িতে তখন ভারতীয় সময় ১১টা ২১ মিনিট। আর্মস্ট্রং প্রায় ২ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট চাঁদের বুকে হেঁটে বেড়িয়েছেন।

ভেলার ঢাকনা বন্ধ হয়ে গেল। ভেলায় উঠে দু'জনে মিলে আহারে বসলেন। আহার শেষে নিদ্রা। পরে হাউসটন থেকে জানানো হয়েছে, আর্মস্ট্রং চাঁদ থেকে যে ২৭ কিলোগ্রাম ধূলোবালি ও পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে এসেছেন, বিজ্ঞানের দিক থেকে তা অমূল্য বলেই মনে হচ্ছে। ছোট্ট একটু জায়গায় এত বিচিত্র ধরণের পাথর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, বিশেষজ্ঞরা স্বপ্নেও ভাবেন নি। আর্মস্ট্রং নিজে একজন ভূতত্ত্ববিদ। তিনি জানিয়েছেন, কিছু পাথরে অভ্রের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিছু পাথরে রয়েছে ব্যাসল্ট—যেটা আদিকালে লাভার অস্তিত্ব প্রমাণ করছে। একটি পাথরে বায়োটাইট আছে বলে মনে হচ্ছে। বিজ্ঞানের দিক থেকে এটা অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ, এতে সাধারণতঃ শতকরা ২ থেকে ৪ ভাগ জল থাকে। আর্মস্ট্রং তিন ইঞ্চি গভীরতা থেকে 'স্যাঁত স্যাঁতে' মাটি তুলেছেন। তবে কি সেখানে জল আছে? এবং সম্ভবত জীবনও? বিজ্ঞানীদের আশা, এইসব পাথর পরীক্ষা ক'রে তাঁরা শুধু চাঁদ ও পৃথিবীরই নয়, সমগ্র সৌরজগতের সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন।

এদিকে অ্যাপোলো-১১ এর তৃতীয় যাত্রী মাইকেল কলিন্‌স মূল মহাকাশযান কলম্বিয়ায় ক'রে প্রায় ৭০ মাইল ওপরে একটি কক্ষপথে ক্রমাগত ঘুরে চলেছেন। প্রতীক্ষা করছেন সেই দু'জন সহযাত্রীর জন্য যারা চাঁদে নেমেছেন। চাঁদে বেড়ানো শেষ, এখন ঘরে ফেরার পালা।

চাঁদের ভেলাটি চাঁদের মাটি ছেড়ে ২৬° কোণ সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে কলম্বিয়ার দিকে এগোতে থাকে। এর-পরে দুটি যানেরই সমস্ত কলকব্জা পরীক্ষা করে দেখা হল। তারপর কলম্বিয়া সামনের দিকে এগিয়ে এলো এবং তার নাকটা গলিয়ে দিল ঈগলের একটি ফোঁকরের মধ্যে। এইভাবেই চাঁদের আকাশে দু'জনের মিলন হল।

এরপর চন্দ্রবিজয়ী দুজন নভশ্চর তাঁদের অমূল্য সম্পদসহ কলম্বিয়ায় চলে এলেন। চন্দ্রযান ঈগল মহাকাশে পরিত্যক্ত হল।

মূল ইঞ্জিন চালানোর দরুণ অ্যাপোলোর গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৪৭৮ মাইল (৫৬০০ কি. মি.) থেকে বেড়ে ৫৬৫২ মাইলে (কি. মি.) উঠলো। এই গতিবেগ মহাকাশযানকে চাঁদের অভিকর্ষ থেকে বের করে আনার পক্ষে যথেষ্ট।

২২শে জুলাই, ভারতীয় সময় রাত ১১ টা ২৩ মিনিটে অ্যাপোলো-১১ সেই কাল্পনিক রেখাটি পার হয়ে এলো, যেখানে চাঁদ ও পৃথিবীর অভিকর্ষ সমান সমান।

২৩শে জুলাই, ভারতীয় সময় রাত ৪টা ১৭ মিনিটে অ্যাপোলো চাঁদ ও পৃথিবীর মাঝপথ অতিক্রম করল। তখন সে পৃথিবী থেকে প্রায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার মাইল দূরে ছিল ও তার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৩,৩৫৪ মাইল। অ্যাপোলো দুর্বার গতিতে ছুটে চললেও তার অভ্যন্তরে তিনজন অভিযাত্রীই তখন গভীর ঘুমে অচেতন।

২৪শে জুলাই, পৃথিবী ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। এদিকে পৃথিবীর আকর্ষণে অ্যাপোলোর গতিবেগ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যখন অস্ট্রেলিয়ার আকাশে ৭৫ মাইল উঁচুতে অ্যাপোলো পৃথিবীর আবহমণ্ডলীতে প্রবেশ করবে, তখন তার বেগ হবে ঘণ্টায় প্রায় ২৪ হাজার মাইল। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রবেশের পথটি যদি অত্যধিক খাড়া হয়, তবে বায়ুকণার সংঘর্ষে আগুন জ্বলে উঠবে এবং একটি জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মতো মহাকাশযানটি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আবার পথটি যদি বেশী কাৎ হয়, তবে মহাকাশ-যানটি নামতেই পারবে না, ছিটকে উপরে উঠে যাবে। অতএব প্রায় ৪ লক্ষ ফুট উপরে থাকতেই একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরে তাঁদের প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে নামবার জন্য প্রস্তুত হতে হ'ল। তখন ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৭ মিনিট।

রাত ৯টা ৫০ মিনিট—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পূর্বক্ষণে প্রধান রকেটটি সহ সারভিস মডুলটি বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হ'ল।

রাত ১০টা ৫ মিনিট—ক্যাপ্‌সুলটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ ক'রে একটি আগুনের গোলা বা জ্বলন্ত উল্কা-পিণ্ডের মতো হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে বেতার-সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দেখা গেল, একটি আগুনের গোলা উর্ধ্বাকাশ থেকে তির্যকগতিতে নেমে আসছে। বায়ুকণার ঘর্ষণে মহাকাশযানটির আবরণের তাপমাত্রা প্রায় ৩০০০° সেণ্টিগ্রেডে উঠেছিল—কিন্তু, সেজন্য মহাকাশচারীদের একটুও অসুবিধা হয়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই, ভারতীয় সময় রাত ১০টা ১৬ মিনিটে পৃথিবীর সঙ্গে আবার বেতার-সংযোগ স্থাপিত হ'ল। জানা গেল, ওই আগুনের গোলার মধ্যে বসে থাকা তিন চন্দ্রচারী নিরাপদেই আছেন।

এর তিন মিনিট পরেই, অর্থাৎ ভারতীয় সময় রাত ১০টা ১৯ মিনিটে, ক্যাপসুলটি প্যারাসুটে ভর ক'রে পূর্ব-নির্দিষ্ট স্থানে নিরাপদে নেমে এলো। উদ্ধারকারী জাহাজ 'হর্নেট' নিকটেই ছিল। তা থেকে হেলিকপ্‌টার-গুলি দ্রুতগতিতে ছুটে গেল ক্যাপসুলটির দিকে। কিন্তু ক্যাপসুলটি নামল উলটোভাবে, মানে মাথাটি নীচের দিকে, এবং নিম্নভাগ ওপরের দিকে। আটদিনের এই দুঃসাহসিক অভিযানে এইটিই একমাত্র ত্রুটি বলা যায়।

ক্যাপ্‌সুলটি উলটে পড়ায় বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে কয়েক মিনিট দেরী হ'ল। মহাকাশযানটি

উদ্ধারকারী ফ্রগম্যানদের একজন এখন ক্যাপসুলের অভ্যন্তরে টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করলেন। অভিযাত্রীরা জানালেন যে, তাঁরা বেশ ভাল আছেন। চাঁদ থেকে তাঁরা যে অমূল্য মাটি ও পাথর সংগ্রহ করে এনেছেন তা সম্পূর্ণ সংরক্ষিত আছে।

সমুদ্রে ভেসে থাকা অবস্থায় ক্যাপ্‌সুলের ঢাকনা খুলে একজন উদ্ধারকারী ফ্রগম্যান অভিযাত্রীদের হাতে 'কোয়ারেনটাইন' পোশাক দিয়ে দিলেন। উদ্ধারকারী নিজেও এই পোশাকে সজ্জিত ছিলেন। সর্ব-অঙ্গ আবরণকারী এই পোশাকে উপরে রয়েছে শিরস্ত্রাণ ও নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য আছে গ্যাস-মুখোস।

তিনজন অভিযাত্রীকে এখন ১৮ দিন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন (কোয়ারেন্‌টাইন) ক'রে রাখা হল। তারপর ১১ই অগস্ট্ তারিখে চিকিৎসকরা তাঁদের পরীক্ষা করে দেখলেন, চাঁদের মাটি থেকে এমন কোন রোগ তাঁরা বহন করে এনেছেন কিনা যা পৃথিবীতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে।

এইভাবে চাঁদের বুকে মানুষের পদচিহ্ন রেখে এসে তাঁদের ৮ দিনের মহাকাশ যাত্রা শেষ হ'ল। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ও অন্যরা বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ 'হরনেট'-এ উপস্থিত থেকে তাঁদের স্বাগত জানালেন, কিন্তু এখনই করমর্দন করতে তাঁরা পারলেন না। তাঁরা চন্দ্রলোক থেকে হয়তো অদৃশ্য জীবাণু বয়ে আনতে পাবেন, তাই এত সাবধানতা।

এইভাবে মানব ইতিহাসের সর্বাধিক রোমাঞ্চকর ও দুঃসাহসিক অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটলো। এ শুধু তিনটি মানুষের চন্দ্রাভিযান নয়, এটা আরও অনেক বড় জিনিস। অজানাকে জানবার যে অদম্য ও অতৃপ্ত পিপাসা সমগ্র মানবজাতির রয়েছে, এ অভিযান তারই প্রতীক।

চাঁদে পৌঁছানো যে শুধু একটা বৃহৎ পরিকল্পনার, একটা দুঃসাহসিক অভিযানের শেষ হ'ল, তা নয়। আসলে এ হ'ল আরও অনেক বড় বড় অভিযানের আরম্ভ। এবারে গ্রহে গ্রহান্তরে যাবার চেষ্টা হবে। আর মহাকাশে চাঁদই হবে প্রথম মহাকাশ-বন্দর বা আন্তঃগ্রহ স্টেশন। এই ছোট্ট পৃথিবীর সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে আবদ্ধ থেকে মানুষ আর সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না, এবার মহাকাশ জুড়ে তার যাতায়াত চলবে। কবে সেই শুভদিন আসবে, তারই প্রতীক্ষায় আমরা অধীর আগ্রহে দিন গুণবো।

বিজ্ঞান প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা

অমিতানন্দ দাশ

আষাঢ় সংখ্যার সন্দেশে বিজ্ঞানের প্রশ্ন চেয়ে পাঠানোর পরে জনা দশেক গ্রাহকের কাছ থেকে প্রশ্ন পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কোনো প্রশ্নই খুব চিত্তাকর্ষক হয় নি—এর প্রায় সব কটির উত্তরই স্কুলের বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে অথবা "জানবার কথা" জাতীয় সাধারণ বিজ্ঞানের বইতে পাওয়া যায়। পরে এর কোনো কোনোটির উত্তর দেওয়া হবে, তবে পুজা সংখ্যায় একটু নতুনত্ব হোক—তোমরাই বরং প্রশ্নের উত্তর দাও।

এই প্রতিযোগিতার দশটি প্রশ্ন হচ্ছে :—

(১) দিনের বেলায় চন্দ্রগ্রহণ হতে পারে কি?

(২) রকেটের ডানা থাকে না কেন?

(৩) বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়ে কি করে?

(৪) পাখি ডিমে তা দেয় কেন?

(৫) আমরা কিছুটা দূর থেকে কোন জিনিসের গন্ধ পাই কি করে?

(৬) টিউবওয়েলে যে জল ওঠে তা মাটির নীচে কিভাবে থাকে?

(৭) একটি থার্মোমিটার যদি রোদে থাকে, আরেকটি থাকে ইঁটের ঘরে—তবে এগুলি যে তাপমাত্রা দেখাবে তা কি খবরের কাগজে দেওয়া দৈনিক তাপমাত্রার সমান হবে? না হলে কি হবে? কেন?

(৮) মোমবাতির শিখায় কোনো জিনিস ধরলে তাতে কালি পড়ে কেন?

(৯) টিউবলাইটের আলোতে কোনো জিনিস জোরে নড়লে তাকে কি রকম দেখায়? কেন?

(১০) ইলেকট্রিক কলিং বেল বাজলে তার কাছে কোনো রেডিও থাকলে তাতে আওয়াজ হয় কেন?

শর্ত হলো—যথাসম্ভব সংক্ষেপে নির্ভুল এবং সম্পূর্ণ উত্তর চাই।

ডবল প্রতিযোগিতা—সবচেয়ে বেশী ঠিক উত্তরের আর সবচেয়ে ভালো উত্তরের। যাদের উত্তর সব মিলিয়ে সবচেয়ে ভালো হবে সেই তিনজনকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধার্য করা হবে। তাছাড়াও প্রত্যেকটি প্রশ্নের সবচেয়ে ভালো উত্তর ছাপা হবে—কাজেই কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলেও যেগুলি পারো সেইগুলির উত্তরই ভালো করে লিখে পাঠিও।

উত্তর দেবার শেষ দিন—৩১শে অক্টোবর। ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রতিযোগিতার ফলাফল বেরোবে।

যারা এখনও গ্রাহক নও তারাও নভেম্বর মাস থেকে গ্রাহক হলে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারো।

সুখলতা রাও

সুখলতা রাও কেবল ছোটদেরই মনের সাথী ছিলেন না, বড়দেরও তিনি বন্ধু ছিলেন, কত মা-মাসি পিসি তাঁর গল্প পড়ে শুনিয়ে দুষ্টু ছেলেদের চুপ করিয়েছেন, চঞ্চল মেয়েদের ঘুম পাড়িয়েছেন, তার ঠিক নেই। তারপর তারা যখন একটু বড় হয়ে নিজেরা পড়তে শিখেছে তখন তাঁরই গল্প পড়ে' খাওয়াদাওয়া ভুলে গেছে। তিনি শুধু গল্প কবিতা আর ছড়াই লিখতেন না, তার সংগে যে জলরং আর শাদাকালো ছবিগুলো থাকতো তার অধিকাংশই তিনিই এঁকেছিলেন।

তিনি যে পরিবারে জন্মেছিলেন, কালে সেই পরিবার কেবল বাংলাজোড়া বা ভারতজোড়া নয়, বিশ্বজোড়া নাম করেছিল।

সন্দেশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর বাংলা-দেশের শিশুসাহিত্যের সম্রাট তো ছিলেনই তা ছাড়া তিনি ছাপা-খানার ব্যাপারে ভারতবর্ষে একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন আর কতক-গুলো বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করায় বিলেতেও তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি তাঁর ছোটদের বইয়ের ছবি আর সন্দেশের প্রায় সব ছবি নিজে আঁকতেন। তাঁর পুত্র সুকুমার রায়ের আর পৌত্র সত্যজিৎ রায়ের লেখা আর ছবির সংগে দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই পরিচিত আর সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের খ্যাতি তো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

উপেন্দ্রকিশোরের সন্তানদের সবচেয়ে বড় সুখলতা রাও যে প্রতিভাময়ী হবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ছোটবেলা থেকে তিনি তাঁর বাবার কাছে গানবাজনা ও ছবি আঁকা শিখেছিলেন, ছোটবেলাতেই সন্দেশের জন্য লিখে হাত পাকিয়েছিলেন। তাঁর বিয়ের পরও তিনি শিল্পসাধনা ছাড়েননি, সন্তান জন্মাবার পরও সৃষ্টি করেই চলেছিলেন। নিজের ছেলেমেয়েদের তিনি তাঁর সুরের, রঙের, রসের ধারায় ডুবিয়ে রাখতেন। তিনি যে গান লিখতেন, মেয়েরা সেই গান নেচে নেচে গাইতো, তাছাড়া তিনি কাগজের পুতুল আর দৃশ্যপট এঁকে কেটে, শাদা পর্দার ওপর ছায়া ফেলে, ছায়াছবি দেখাতেন রামায়ণের গল্প, পরিকাহিনী। নিজের আর বন্ধুবান্ধবদের ছেলেপিলেদের ডেকে নিয়ে, ঘর অন্ধকার করে' এইসব ছবি দেখিয়ে তিনি সকলকে আনন্দ দিতেন।

আজ তিনি নেই। আর নোতুন, নোতুন লেখা লিখবেন না, ছবি আঁকবেন না, ছেলেপিলেদের আনন্দ দেবার নোতুন নোতুন উপায় খুঁজে বের করবেন না, কিন্তু আশিবছরের বেশিকালের দীর্ঘজীবন ধরে তিনি যা করে গেছেন তার ফল আমাদের দেশের ছেলেপিলেরা চিরকাল ভোগ করবে।

সন্দেশের পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে সুখলতা রাওয়ের আরও ছবি, কবিতা, গল্প ও গান ছাপা হবে।

একাদশ সূর্যদেব

পলাশবরণ পাল—গ্রাহক নং ১৭৮৮, বয়স ১৩½ বছর

গ্রীক সূর্যদেবতা এ্যাপোলো নাকি মাঝে মাঝে অলিম্পিয়ার স্বর্গ থেকে নেমে আসতেন পৃথিবীতে। কলিকালে স্বর্গ আর অলিম্পিয়ার মত ঘরের কাছে নয়। কূটতা আর নীচতায় সারা বিশ্ব যখন প্লাবিত—তখন স্বর্গ হয়তো আরও দূরে—হয়তো বা চাঁদের কাছাকাছি-ই সরে গেছে। সূর্যদেবতার নামাঙ্কিত ব্যোমযান সেই স্বর্গের দিকেই ছুটে চলে।

* * *

জুল ভার্নের বার্বিকেন-নিকল-মিশেল আরদাঁ বা এইচ জি ওয়েলসের কেভর-বেডফোর্ড প্রভৃতিকে শুধু গল্পকথার নায়ক বললে ভুল বলা হয়। এডগার পো তাঁর কাহিনীর নায়ককে বেলুনে করেই চাঁদে পাঠিয়ে দিলেন। অবশ্য গল্পের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তাঁর সংশয় ছিল এবং তা তিনি জানিয়েও গেছেন। ওয়েলসের 'ফার্স্ট মেন ইন দি মুন' বইয়ে মানুষ সত্যিই চাঁদে নামল। কিন্তু এ কাহিনীও বিজ্ঞানের দুঃসাহসিক জয়যাত্রা না হয়ে এক করুণ ট্র্যাজেডিতে পরিণত হল। তবু বলি, 'ফার্স্ট মেন ইন দি মুন'-এর শ্রেষ্ঠত্ব বিচার এখনই পুরোপুরি সম্ভব নয়। অদূর ভবিষ্যতে কোনো মানুষ হয়তো মাটির তলায় বসবাসকারী চান্দ্রপ্রাণী অথবা অতিকায় চান্দ্রমহিষদের দেখা পেলেও পেতে পারে!

তবে এ্যাপোলো-১১-র এই অভিযানের শেষে জুল ভার্নের 'দ্য লা তের আ লা লুন' * বইটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। জুল ভার্নের বইয়ে চন্দ্রযাত্রার কৃতিত্ব আমেরিকানদের। যদিও ফরাসী লেখকের বর্ণনায় একজন ফরাসীও অভিযানে সংগী হয়েছিলেন, তবু অভিযানের কৃতিত্ব পুরোপুরি 'গান ক্লাবে'র সদস্যদেরই। চন্দ্রযানটি উৎক্ষেপিত হয়েছিল আমেরিকার ফ্লোরিডা থেকে। এ্যাপোলো এগারোর অভিযানের প্রাক্কালে ফ্লোরিডার অবস্থার বর্ণনা বেরিয়েছে কাগজে, লক্ষ লক্ষ মানুষ চলেছে কেপ কেনেডির দিকে, হোটেলে তিলধারণের জায়গা নেই, পেট্রোল পাম্পে পেট্রল ফুরিয়ে গেছে, দোকান

পাট থেকে খাদ্য মদ্য নিঃশেষ ! সাংবাদিকদের তো কোনো অসুবিধেই নেই এখন, বর্ণনার জন্য মাথা ঘামাতে হবে না, জুল ভার্নের উপন্যাস থেকে পাতার পর পাতা টুকে দিলেই হলো !'

শুধু তাই নয়, মহাকাশযানের যে বর্ণনা দিয়েছেন ভার্নে, তার সংগে অ্যাপোলোর বর্ণনা প্রায় হুবহু মিলে যায়। গতিবেগের দিক থেকেও ভার্নের দূরদৃষ্টি নিখুঁত। চাঁদের ভূ প্রকৃতি সম্বন্ধেও জুল ভার্নের ধারণা প্রশংসনীয়। হাউস্টনের অনেক নাম-না-জানা বিজ্ঞানীর সংগে এ্যাপোলো-১১-র সাফল্যের জন্য জুল ভার্নের নামটিও যোগ করতে দ্বিধা নেই।

* * *

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর থেকে মহাকাশ-বিজয়ের যে ধারাটি প্রবাহিত হয়েছিল, তারই এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায় এ্যাপোলো ১১। গ্যাগারিন-তিতোফ-নিকোলায়েভ-কার্পেণ্টার শিরাগ্লেন-কোপার্ড বিকোভস্কি-তেরেস্কোভা-ফেওটিসৃটভ কোনোরভ-ইয়েগোরভ প্রভৃতিদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত পরবর্তী মহাকাশচারীরা—ম্যাকডিভিট স্ট্যাফোর্ড লোভেল-শোয়েইকার্ট-বেরেগোভয়-সাটালভ-খুরুনভ, ইলিসিয়েভ-ভলিনভ-বোরম্যান-আর্মস্ট্রং প্রভৃতি।

মিশন এ্যাপোলোর কাজ শুরু হয় ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে। এ্যাপোলো ১-এর করুণ পরিণতির কথা এখনও মনে পড়ে। যাত্রার পাঁচ দিন আগে মহড়ার সময় অক্সিজেনপূর্ণ কেবিনে আগুন ধরে গিয়ে তিন জন আরোহী—ভার্জিল, গ্রিসম, হোয়াইট মারা যান। গ্রিসম এর আগে লিবার্টিবেল-৭ এর একক আরোহী। এবং জেমিনী ৩-এর অন্যতম আরোহী ছিলেন। জেমিনী ৪-এর অন্যতর মহাকাশচারী হোয়াইট প্রথম মহাকাশে পদচারণা করেন। ···এরপর বিভিন্ন তদন্ত, যানের সংশোধন ইত্যাদি করবার জন্য আরো পাঁচটি যাত্রীবিহীন অ্যাপোলো উৎক্ষিপ্ত হয়। পরীক্ষামূলক ভাবে কক্ষপথে স্থাপিত হয়ে সেগুলি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে।

এরপর শিরা, ইজল, কানিংহ্যাম-এর তত্ত্বাবধানে এ্যাপোলো-৭ উৎক্ষিপ্ত হল (১১ ১০-৬৮)। কার্যসূচী সম্পূর্ণ করে তারা ফিরে এল পৃথিবীতে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গ্রিসমের মত শিরারও এই নিয়ে তিনবার মহাকাশ-পরিক্রমা। এর আগে সিগমা ৭-এর একক আরোহী এবং জেমিনী ৬-এর অন্যতম আরোহী ছিলেন তিনি।

'৬৮-র ২১শে ডিসেম্বর এ্যাপেলো-৮ উৎক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবীর অভিকর্ষের সাম্রাজ্য ছেড়ে চাঁদের এলাকায় ঢুকে পড়ে। চাঁদকে প্রায় ৬০ মাইল দূর থেকে ১০ বার প্রদক্ষিণ করে, অসংখ্য ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করে তিন মহাকাশচারী বোরম্যান, লোভেল, অ্যাণ্ডার্স পৃথিবীতে ফিরে আসেন। গ্রিসম বা শিরার মত লোভেলেরও মহাকাশ-পরিক্রমা এই নিয়ে তিনবার—বোরম্যানের দুবার। এর আগে জেমিনী ৭-এ তাঁরা দুজন একত্রে মহাকাশ-পরিক্রমা করেন—জেমিনী-১২ রও অন্যতম আরোহী লোভেল।

জেমিনী ৪-এর ম্যাকডিভিট, জেমিনী ৮ এর স্কট আর নবাগত শোয়েইকার্ট একত্রে মহাকাশ পাড়ি দিলেন এ্যাপেলো-৯ মহাকাশযানে—তেসরা মার্চ। ভূ-কেন্দ্রিক কক্ষপথে যানবদলের মহড়া দিয়ে তেরই

মার্চ তাঁরা পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

স্টাফোর্ড-সারনাজের চাঁদে নামার কথা ছিল, কিন্তু মাত্র কিছুদিন আগে শেষ মহড়ার জন্য তাদের যাত্রাপথ পরিবর্তনের কথা ঘোষিত হল। জেমিনী ৩-এর ইয়ং আর জেমিনী ৯-এর দুজন আরোহী—স্ট্রাফোর্ড (জেমিনী ৬-এরও আরোহী) এবং শরনাজ একত্রে মহাকাশ পরিক্রমা করলে এ্যাপেলো-১০ এ (১৮-২৬ মে) চাঁদের ৬০ মাইল উপরে চন্দ্রকেন্দ্রিক পথে ইয়ং যখন পাক খাচ্ছিলেন, তখন লুনার মডিউলে স্টাফোর্ড সারজন চাঁদের দশ মাইলের মধ্যে পৌঁছন। সেখানে নানা তথ্য সংগ্রহের পর প্রত্যাবর্তন।

এরপর এ্যাপেলো ১১।—আর্মস্ট্রং, কলিন্স, অ্যালড্রিন। বলা বাহুল্য এঁরাও নতুন নন। আর্মস্ট্রং জেমিনী ৮ কলিন্স জেমিনী ১০ এবং অ্যালড্রিন জেমিনী-১২-র আরোহী। এদের সঙ্গীরা হলেন যথাক্রমে এ্যাপেলো-৯ এর স্কট, ১০-এর ইয়ং, এবং ৮ এর লোভেল।

* * * *

এ্যাপোলো-১১-র মডিউল তিনটি—কম্যাণ্ড, সার্ভিস ও লুনার। কম্যাণ্ড মডিউল অর্থাৎ যাত্রীদের কামরার উচ্চতা প্রায় ১২ ফুট ৪ ইঞ্চি। মেঝের ব্যাস প্রায় ১২ ফুট ৯½ ইঞ্চি। ওজন প্রায় ৪৫০০ কিলোগ্রাম। মহাকাশযানটি এমন ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে বাইরে থেকে উল্কা ইত্যাদির আঘাত সইতে সে সক্ষম। ধাতব বহিস্ত্বক ও অন্তস্ত্বকের মাঝখানে রয়েছে নরম প্ল্যাস্টিকের আবরণ। প্রত্যাবর্তনের সময় আবহমণ্ডলের সংগে সংঘর্ষে যাতে মহাকাশযানের মেঝেতে আগুন না ধরে যায় তার জন্য মেঝের বাইরে পুরু রজনের প্রলেপ।

সার্ভিস মডিউলের দৈর্ঘ্য ৭ মিটার, প্রস্থ ৩.৯ মিটার, ওজন প্রায় ২১৬০ কিলো।

লুনার মডিউলটির পায়া বাদ দিয়ে উচ্চতা হ'ল ৬'১ মিটার, ব্যাস ৪'৮ মিটার, ওজন ১৩২৭৫ কিলো।

* * * * *

মনে হল সেই বজ্রনির্ঘোষ শুনতে পেলাম। মনে হল এই অনাদি-অনন্ত 'মহাবিশ্বের মহাকাল ফাড়ি চন্দ্র সূর্য-গ্রহ তারা ছাড়ি, ভূলোক-দ্যুলোক-গোলক ভেদিয়া' এক উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছি। মনে হল সেই আষাঢ়সন্ধ্যায় আমি কোন এক অজানা অদেখা-অচেনার দেখা পেলাম।

সাতটা-দুই। আকাশবাণী কলকাতার অনুষ্ঠানসূচী নয়—এ্যাপেলো-১১-র উৎক্ষেপ সময়। বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিসম্পন্ন স্যাটার্ন-৫ রকেট তাকে তুলে দেয় মহাশূন্যে, তারপর এ্যাপোলোকে উপযুক্ত গতিবেগ দিয়ে তার কাজ শেষ হয়। এ্যাপোলো এগিয়ে চলে। আর্মস্ট্রং জানান, 'আমরা নির্দিষ্ট পথে চলেছি।'

চন্দ্রগামী রকেটে ইঞ্জিনটি চালু করতেই গতিবেগ ঘণ্টায় সতেরো হাজার মাইল থেকে বেড়ে চব্বিশ হাজার দুশো মাইল হয়। পৃথিবীর অভিকর্ষ ভেদ করে চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা সুরু হল।

পরদিন, ১৭ই জুলাই—এ্যাপোলো এগিয়ে চলে। জেমস্ এ ম্যাকডিভিট বলেন,—'সব ঠিক

ভাবে চলেছে।' এ্যাপোলো ৯-এর এই আরোহী এখন হাউস্টনের মহাকাশ কেন্দ্রের চন্দ্রাবতরণ বিভাগের ম্যানেজার।

অ্যালড্রিন ক্যামেরার কাজে খুশি নন। ভূ-পৃষ্ঠের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রকে ঠাট্টা করে বলেন—'পৃথিবীটাকে একটু ঘুরিয়ে দিতে পারেন? এখান থেকে যে জল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।'

পরদিন ১৮ই জুলাই। এ্যাপোলো এগিয়ে চলে।

পরদিন ১৯শে জুলাই। রাত্রি দশটা বেজে তেত্রিশ মিনিটে চন্দ্রপ্রদক্ষিণ কক্ষে প্রবেশ করল এ্যাপোলো।

পরদিন ২০শে। প্রথম থেকেই শোনা যেতে লাগল, মহাকাশচারীরা চার ঘণ্টা আগে চাঁদে

ভোর চারটে বত্রিশে বেতার ঘুম-ভাঙানি সংকেতে মহাকাশচারীদের ঘুম ভাঙল।

অবশেষে রাত্রি এগারটা বেজে সতের মিনিটে চান্দ্রযান বিচ্ছিন্ন হল মূলযান থেকে। আড়াই ঘণ্টার যাত্রা সুরু হল।

রাত্রি একটা সাতচল্লিশে চান্দ্রযান আস্তে আস্তে অবতরণ করল চাঁদের মাটিতে। দু-মিনিট পরে আর্মস্ট্রং-এর কথা শোনা গেল, 'ঈগল' চাঁদে নেমেছে।

পরদিন। একুশে জুলাই, সোমবার। আমরা অপেক্ষা করে আছি, এগারোটা সাঁইত্রিশে আর্মস্ট্রং চাঁদে নামলেন।

মই দিয়ে নেমে নীচে একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপরেই ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে নেমে পড়লেন। চাঁদে পদক্ষেপের সংগে সংগে আর্মস্ট্রং বললেন, 'That's one small step for man but one giant leap for mankind.'—মিনিট কুড়ি পরে নামলেন অ্যালড্রিন। 'ভারী সুন্দর' —তিনি বলে উঠলেন। আর্মস্ট্রং-অ্যালড্রিন ইতিহাসখ্যাত দুই বীর হয়ে গেলেন। কিন্তু এমনি সময় শোনা গেল কলিন্সের স্বর—'ভুলে যাবেন না, এখানেও একজন আছেন।'

আর্মস্ট্রং আর অ্যালড্রিনকে অবশ্য শুধু চাঁদের দৃশ্য দেখলেই চলবে না, চাঁদের বুকে অনেক কাজ তাঁদের। চন্দ্রপৃষ্ঠের উপাদানের নমুনা সংগ্রহ, চাঁদে ছবি তোলা, পতাকা-শুভেচ্ছাবাণীর ফলক ইত্যাদি চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রোথিত করা, পৃথিবীতে টেলিভিশন চিত্র প্রেরণ—আরো কত কী!

চন্দ্রপৃষ্ঠে দু'ঘণ্টা আটাশ মিনিট বারো সেকেণ্ড কাটানোর পর মহাকাশচারীরা ফিরে এলেন 'ঈগলে'। কাজ শেষ। এবার প্রত্যাবর্তনের পালা।

* * *

এত বড় একটা কমেডি লেখার পর উপসংহারটা লম্বা করে দিতে ইচ্ছে করে না। বাইশে জুলাই শেষরাত্রি পৌনে তিনটেয় 'ঈগল' আর 'কলম্বিয়া' মিলিত হয়। পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু হয়। চব্বিশে জুলাই নির্ধারিত স্থানে ঝড়-ঝঞ্ঝার ফলে তার কিছু দূরে নির্ধারিত সময়ের ঘণ্টাখানেক পরে অবতরণ সুসম্পন্ন হল। তখন রাত্রি দশটা একুশ।

* * *

চাঁদ থেকে মহাকাশচারীরা যা নিয়ে এলেন তার মুল্য যেমন অপরিসীম তেমনি মহাকাশচারীরা যা রেখে এলেন তাও কম নয়। দড়ি, যন্ত্রপাতি, শ্বাসপ্রশ্বাসের সরঞ্জাম, একটি আমেরিকান পতাকা, ৭৮টি দেশের শুভেচ্ছাবাণী, দশ লক্ষ ডলার দামের ক্যামেরা, আড়াই লক্ষ ডলার দামের টেলিভিশন-ক্যামেরা, কম্পন-নির্ধারক যন্ত্র, লেসার রিফ্লেক্টর (অর্থাৎ একটি সুবিশাল আয়না), চার কোটি দশ লক্ষ ডলার দামের চান্দ্রযানের নিম্নাংশ—এ সবই তাঁরা রেখে এসেছেন। আর রেখে এসেছেন একটি ফলক—যাতে তিন মহাকাশচারী ও রাষ্ট্রপতি নিক্সনের স্বাক্ষর, আর লেখা আছে—আমরা ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে পৃথিবী থেকে এসেছিলাম। আমরা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যই এসেছিলাম।

* * *

'মহাবিশ্বে মহাকাশে' চাঁদকে দিয়ে আমাদের যাত্রা সবে শুরু। বায়ুমণ্ডলহীন চাঁদে মানমন্দির স্থাপন করে তারপর আমরা পাড়ি দেব অনন্তের পানে—ব্যোম্যানের **মত। অর্থাৎ আমাদের যাত্রা হল শুরু'।—'তারপরে ধরিত্রীর যুবক সন্তান

বাহিরিব জগতের মহাদেশ মাঝে
অতিদূর দূরান্তের জ্যোতিষ্কসমাজে
সুদুর্গম পথে।...

*-এর ইংরিজি অনুবাদ হয় ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন।
**—'2001—A SPACE ODYSSEY' দ্রষ্টব্য।

অথ যাত্রা কথা

জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাঃ ১৭৯১—বয়স ১৬ বছর ১০ মাস

অষ্টমীর রাত্রি, সমস্ত পাড়া সচকিত করে দুর্গাপুজোর ঢাক বাজছে, হঠাৎ হার্মোনিয়ম, তবলা ও বাঁশীর সমবেত ঐক্যতান শুরু হতেই দারুণ উৎসাহে প্রাণ লাফিয়ে উঠল। কিছু পরেই যাত্রা শুরু হবে। কোনোমতে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আসরের দিকে ছুট লাগালাম।

দুর্গামণ্ডপে আসর বাঁধা হয়েছে। সামনেই দশপ্রহরণধারিণী দুর্গামূর্তি। মাঝখানে একটু জায়গা ফাঁকা রেখে দর্শকরা আসর জমিয়ে বসেছে। দূরের সাজঘর থেকে আসরের মাঝ বরাবর একটি সরু পথ চলে এসেছে, এই পথেই নটানটীর দল প্রবেশ করবে। মাথার ওপর শালপাতার ছাউনী কাঁচাপাতার গন্ধ আসছে। দর্শকদলে ছেলে—মেয়ে—বুড়ো সকলেই আছেন, অনেকেরই চোখে একটু নিদ্রাবেশ বিলম্বিত লয়ের ঐক্যতান অনেকক্ষণ শুনতে শুনতে আমারও দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল হটাৎ 'ঠং' করে ঘণ্টার শব্দ হতেই ঘোর ভেঙে গেল। সচকিত লাল লাল চোখ তুলেই দেখি কয়েকটি

হলদে কাপড় পরা ছোট ছেলে, খুব করে মুখে সাদা খড়ির প্রলেপ লাগিয়ে মোটা মোটা ঠোঁট রঙ মেখে রাঙা করে আসরে এসে যুক্ত করে সরস্বতী বন্দনা শুরু করে দিল।

'এসো শ্বেত শতদলবাসিনী, এসো বীণারঙ্গিণী, এসো মা শ্বেতাঙ্গিণী।'

তাদের সব সশ এর উচ্চারণ ইংরেজী S এর মত।

তাদের হেঁড়েগলার গান আমার কানকে এমন চমকে দিল যে চোখ থেকে ঘুম বাণের মতো ছিটকে উধাও হয়ে গেল। গান শেষ হতে না হতেই এক উৎকটসজ্জিতা নারীবেশধারী পুরুষ নট এসে তার শক্ত শক্ত হাত বিচিত্র ভঙ্গীসহকারে বাঁকিয়ে চুরিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে গেল তারপরেই যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

যাত্রার নামটা ঠিক মনে নেই তবে রাজারাজড়ার ব্যাপার তাই পর পর যুদ্ধ হত্যা অট্টহাস্য ক্রন্দন গর্জন অভিশাপ ঘটে যেতে লাগল। আর তারপরেই ঘটল সেই অঘটন। প্রতিবেশী দুই রাজার যুদ্ধে নিহত রাজার মহিষী বন্দিনী হয়েছেন। একসময় হত্যাকারী রাজার সম্মুখীন হলেন তিনি। রাজমহিষী অর্থাৎ একজন লম্বাচোড়া পুরুষ মানুষ একটা সাদা শাড়ী পরে এলো, পরচুল পিঠের ওপর ফেলে পুরুষালী ভঙ্গিতে আসরে প্রবেশ করে নাকি সুরে মেয়েলী গলার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে স্বগতোক্তি করতে লাগল।

'যে আমার স্বামী পুত্রকে হথ্যা করেছে তাকে আমি বধ কর্বো' স্বামী ও পুত্রশোকে তার চোখের পরিবর্তে মুখ সজল হয়ে উঠল আর প্রত্যেক কথার সঙ্গে ঝলকে ঝলকে মুখের ভিতর থেকে অজস্র ধারায় পানের পিক ঝরতে লাগল।

মুহূর্তেই তার শোক আমাদের প্রচুর হাসির খোরাক জোগাল দৃশ্যটি আর যথেষ্ট শোকাবহ হয়ে উঠতে পারল না।

হঠাৎ দেখি একজন অতি সাধারণ ব্যক্তি রাজাকে একটু ঠেলে রাণীর পাশ দিয়ে আসরে ঢুকে পড়ল। তার দুঃসাহস দেখে আমরা তো হতবাক। কি হয় ভাবছি, হঠাৎ দেখি আসরের পেট্রোম্যাক্সের আলোগুলো প্রাণপণে দম দেবার কাজে সেই ব্যক্তি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কাজ শেষ হলে সে যাত্রার সংলাপের মধ্যে দিয়ে মূর্তিমান রসভঙ্গের মত বেরিয়ে গেল।

যাত্রার শেষের এক দৃশ্যে এক অতীব শোকাবহ ঘটনা। দুই বীর সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। উৎসাহজনক বাজনা বেজে উঠল। তাদের যোদ্ধার যোগ্য চেহারা সাজপোশাকও তাই। হাতে উদ্যত তলোয়ার ঝলসে উঠছে। হঠাৎ এই দারুণ মুহূর্তে ভাবাবেগে এক বীরের সংলাপ গেল হারিয়ে! এদিকে শ্রুতিধরও পাতা গোলমাল করে ফেলেছে। উদ্যত তরবারি হাতে দুই বীর যোদ্ধা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল যেন পাথরের মূর্তি! তারপর আর থাকতে না পেরে হতবাক্য বীর তার বীরোচিত মর্যাদার খোলস দূরে খুঁড়ে ফেলে শ্রুতিধরের উদ্দেশ চেঁচিয়ে উঠল—

'বার বার বলা হচ্ছে বইটো ধর বইটো ধর শুনা হয়নি, বেরা বেরা হতভাগা বেরিয়ে যা।'

তার তলোয়ার অবশেষে শ্রুতিধরের মাথাতেই পড়ে বুঝি! বহু কষ্টে তাকে শান্ত করা হল।

রাতের গাঢ় অন্ধকার বুঝি বা কিছু তরল হল। চারপাশের অনেক দর্শকই নিদ্রাচ্ছন্ন।

রাজা হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে সিংহাসনে অর্থাৎ হাতলভাঙা চেয়ারে বসলেন…।

যাত্রা শেষ হল। দুচোখ জ্বালা করছে। ঘরে ফেরার পথে ঈষৎ শীতের আমেজ। পূবাকাশ লাল হয়ে আসছে। ভোর হয়ে এল।

ড্র্যাগনের হাড়

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। উত্তর চীনের এক পাহাড়ের ওপর তিনজন বিদেশী ভদ্রলোক পাথর খুঁড়ে খুঁড়ে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এক বুড়ো চীনের নজরে পড়ল ব্যাপারটা। সে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনারা এখানে কি খুঁজছেন?—ড্র্যাগনের হাড়? এখানে পাবেন না; আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাদের এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে ঐ হাড় হাজারে হাজারে ছড়িয়ে আছে। চমৎকার ওষুধ বানাতে পারবেন তা দিয়ে।'

বুড়ো ভেবেছিল ঐ বিদেশী লোকগুলি নিশ্চয়ই খুব ধনী, আর তাঁরা ঐ হাড় খুঁজছেন ঝাঁঝালো কোনও ওষুধ বানাবার জন্য। নিশ্চয়ই তাই, নইলে এত জিনিস থাকতে ড্র্যাগনের হাড় খুঁজতে যাবেন কেন!

ড্র্যাগন হচ্ছে অতিকায় বিকটাকার এক জানোয়ার। যেমন ভীষণ তার চেহারা তেমনি উগ্র তার স্বভাব। মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে তার সর্বদাই আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে। সেই মুখের সামনে পড়লে আর রক্ষা নেই।

আসলে কিন্তু ড্র্যাগন বলে সত্যি কিছু নেই, ছিলও না কোনদিন। দৈত্য-দানবের মতো একটিও হচ্ছে একেবারে একটি কাল্পনিক জীব। কিন্তু সেকালকার চীনেরা অনেকেই বিশ্বাস করত এর কথা এবং এ নিয়ে অনেক গল্পও প্রচলিত ছিল তাদের মধ্যে।

'ড্র্যাগনের হাড়? হাজার হাজার! বল কি?'—বিদেশীদের মধ্যে একজন চলনসই চীনে ভাষা জানতেন, তিনিই বললেন।—'তাই খুঁজতেই তো আমরা বেরিয়েছি। আমাদের নিয়ে চল সেখানে, তোমাকে খুসি করে দেব।'

আসলে ঐ বিদেশী তিনজন ছিলেন সুইডেনের তিন নামকরা বিজ্ঞানী। তিনজনই ভূতাত্ত্বিক—প্যালিয়ণ্টজিস্ট, অর্থাৎ ফসিল নিয়ে গবেষণা করেন।

ফসিল কাকে বলে জান তো? বাংলায় ওকে বলা হয় জীবাশ্ম। অশ্ম মানে পাথর। তা হলে জীবাশ্ম হ'ল গিয়ে পাথর-হয়ে যাওয়া প্রাণী। তোমরা বলবে, 'বারে, প্রাণী আবার পাথর হয়ে যায় নাকি! সে তো রূপকথার গল্প—আরব্য-উপন্যাসে পড়েছি!' উত্তরে বলব, 'যায় বই কি, তবে এক-আধ বছরে নয়, লক্ষ লক্ষ বছরে এই রকম পরিবর্তন ঘটতে পারে। জীবজন্তু মরে গিয়ে যদি পলি বা ঐ রকম কোন পাথরের নিচে চাপা পড়ে যায় আর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ক্রমাগত ওপর থেকে তাদের ওপর চাপ পড়তে থাকে তা হলে তাদের দেহের নরম অংশ ক্রমে নষ্ট হয়ে গিয়ে শুধু পড়ে থাকে শক্ত হাড়গুলো। কিন্তু তখন আর তা ঠিক হাড় থাকে না—পাথরের মতই তার চেহারা একদম বদলে যায়। একেই বলা হয় ফসিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শরীরের অংশবিশেষ—এক-আধটা হাড়ের টুকরোই এভাবে পাওয়া যায়, কিন্তু সময় সময়, কালেভদ্রে পুরো একটা পাথুরে কঙ্কাল পাওয়াও অসম্ভব নয়। সেকালকার যে সব প্রাণী বা গাছ পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে সাধারণতঃ তারাই ফসিল হয়ে যায়, আর সেই রকম ফসিল দেখেই বিজ্ঞানীরা নানা ভাবে মাথা খাটিয়ে আসল প্রাণীটির বা গাছটির চেহারা, হালচাল কি রকম ছিল তার একটা আনুমানিক চিত্র বার করে ফেলেন।

তোমরা নিশ্চয়ই জান, পৃথিবীতে মানুষ আসবার অনেক আগে নানারকম অতিকায় জানোয়ার ঘুরে

বেড়াত। এরা ছিল সরীসৃপ জাতের। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের অনেক আগেই এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ আসবার পরেও অন্য জীবের যে সব অতিকায় জীব সেকালের পৃথিবীতে টিকে ছিল তাদেরও কোন কোনটা বড় কম ভয়ানক ছিল না। যেমন ধর অতিকায় লোমশ গণ্ডার, হাতির পূর্বপুরুষ ম্যাস্টোডন, অতিকায় স্লথ, গুহা-ভালুক, খাঁড়ার মত দাঁত-বার-করা বাঘ ইত্যাদি। আদিকালের সেই মানুষকে তাদের সঙ্গে লড়াই করে আত্মরক্ষা করতে হ'ত। এখন অবশ্য সে সব জানোয়ারের কোনটাই নেই, কিন্তু মাটির তলায়, পাহাড়ের গুহায় তাদের ভাঙ্গাচোরা কঙ্কাল, হাড়ের টুকরো ফসিল হয়ে ছড়িয়ে আছে। ঐ সব বিরাট বিরাট কিম্ভূত কিমাকার হাড়ের টুকরো দেখে অশিক্ষিত লোকেরা যে ড্রাগনের হাড় বলে ভুল করবে এতে আর আশ্চর্য কি? বুড়ো চীনেম্যানটিও চিরকাল তাই শুনে এসেছে এবং বিশ্বাসও করেছে। আর ঐ রকম ড্রাগনের হাড় দিয়ে তীব্র ঝাঁঝাল ওষুধ বানানো ছাড়া অন্য কোন কারণে যে কেউ ওগুলোর খোঁজ করতে পারে একথা সে ভাবতেই পারে নি।

পিকিং শহর থেকে ৩০।৪০ মাইল দূরে চৌকোটিন পাহাড়—চুনাপাথর জমে জমে তৈরি। সেইখানে চীনে লোকটি বিজ্ঞানী তিনজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল, তারপর বখশিস্ নিয়ে চলে গেল। ওঁরা দেখলেন পাহাড়ের গায়ে একটা বিরাট ফাটল; পাহাড় ধ্বসে গিয়ে তার খানিকটা ভরাট হয়ে গেছে, কিন্তু ভাঙ্গা টুকরোগুলো তখনও ইতস্তত: ছড়ানো। আর, তারই আশেপাশে ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার হাড়ের টুকরো—বেশির ভাগই তার ফসিল হয়ে গেছে। এমনটা যে দেখবেন ওঁরা কল্পনাই করতে পারেন নি। পাথর ভাঙ্গার যন্ত্রপাতি সঙ্গেই ছিল, সময় নষ্ট না করে তখনই কাজে লেগে গেলেন।

এই বিজ্ঞানীরা হচ্ছেন ডঃ অ্যাণ্ডারসন, ডঃ গ্রেঞ্জার আর ডঃ ৎসডানস্কি।

পাথর কেটে কেটে ফাটলের ভিতর দিয়ে আরও নিচে নেমে গেলেন ওঁরা। আর, অবাক্ কাণ্ড! গিয়ে দেখেন সেখানে রয়েছে একটা মস্ত গুহা। গুহার পাশ দিয়ে একটা ঝরনাও বয়ে চলেছে।

এবার গুহার দেয়াল কেটে কেটে পরীক্ষা সুরু হল। এদিকে কখন যে আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে বুঝতে পারেন কেউ। সহসা আকাশ ভেঙ্গে নামল বৃষ্টি। তাঁদের পাশে যে ছোট্ট ঝরনাটি ছিল বৃষ্টির জল পেয়ে সে দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে একটা পাহাড়ী নদীর আকার ধারণ করল। কার সাধ্য সেই নদী পার হয়ে বেরিয়ে আসে?

তিনদিন তিন রাত্রি সেইখানে সেই গুহার মধ্যে বন্দী হয়ে রইলেন বিজ্ঞানীরা। যে কোন মুহূর্তে জলে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাঁদের। চতুর্থ দিনে বোধ হয় ভগবান সদয় হলেন—জল একটু কমে এল। বহুকষ্টে স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে সাঁতার কেটে বেরিয়ে এলেন তাঁরা।

কিন্তু জায়গাটির মোহ ত্যাগ করা সহজ নয়; নদীর জল যেমন আচমকা এসেছিল, তেমনি আচম্‌কা সরে গেল। ডক্টর ৎসডানস্কি বললেন, 'আমি আজ শেষ না করে যাব না। তোমরা বরঞ্চ চলে যাও।'

অগত্যা তাঁকে সেখানে একা রেখে বাকি দু'জন তখনকার মত চলে এলেন।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। ৎসডানস্কি একা একাই গুহায় বাস করছেন; সারাদিন খুট্ খুট্ করে পাথর ভাঙ্গছেন আর এক একটা টুকরো নিয়ে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল পাথরগুলোর মধ্যে এমন কতকগুলো টুকরো রয়েছে যা অন্যগুলোর তুলনায় অনেক ছুঁচলো। যেন কেউ ঘসে ঘসে সেগুলোকে ঐরকম করেছে। তা ছাড়া সেগুলো জাতেও চুনাপাথর নয়—আরও শক্ত কোন পাথর দিয়ে তৈরি। তা হলে কি এগুলো কোন আদিম মানুষের তৈরি পাথরের অস্ত্র? আদিকালের কোনো গুহামানবের আড্ডা ছিল এখানে? আশেপাশে

সেকালকার অতিকায় জীবদের ফসিল পড়ে আছে, তাদেরই সঙ্গে লড়াই করবার জন্মই কি ঐসব অস্ত্র ব্যবহার করা হত ?

ইতিমধ্যে একদিন তাঁর সঙ্গী দু'জন তাঁর খোঁজ নিতে এলেন। ৎসডানস্কি তাঁদেরকে জানালেন তাঁর সন্দেহের কথা। এবার অ্যাণ্ডারসন এবং গ্রেঞ্জারও দস্তুর মতো বিচলিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের আর ফেরা হল না। তিনজনে মিলে ফের সুরু হল গুহার ভিতর তন্ন তন্ন করে খোঁজা। কিন্তু না, অনেক খুঁজেও আর কিছু পাওয়া গেল না। অগত্যা কাজ বন্ধ করে তিনজনেই তখনকার মতো চলে এলেন দেশে।

কিন্তু দেশে ফিরে এলে কি হবে ? ৎসডানস্কির মন পড়ে রইল ঐ চৌকোটিনের গুহার ভিতর। কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি আর থাকতে পারলেন না, আবার এসে হাজির হলেন সেখানে। এবারে ভালো করে তৈরি হয়ে এসেছেন। আবার সুরু হল সেই পাথর খোঁড়ার অভিযান।

একে একে নানা জন্তুর কঙ্কাল উদ্ধার হতে লাগল। সেকালকার অতিকায় গণ্ডার, হরিণ, হায়না, বন্য বরাহ এমন কি একটা অতিকায় বনবেড়ালের ফসিলও পাওয়া গেল। এর কোন কোনটা পাঁচলক্ষ বছর আগেই পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা জানতেন। ৎসডানস্কি সেইসব হাড়গোড়ের নমুনা নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করার জন্য সুইডেনে ফিরে এলেন। সেখানে নানান্ জন্তুর ফসিল আগে থেকেই সংগ্রহ করা আছে, তারই সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন। ঐ সব হাড়গোড়ের মধ্যে ছিল একটা ছোট্ট দাঁত।

ছোট্ট একটা দাঁত, কিন্তু তাই নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে হৈ-চৈ পড়ে গেল, কারণ, পরীক্ষা করে জানা গেল, ও রকম দাঁত মানুষ ছাড়া আর অন্য কোন প্রাণীর হতে পারে না। তবে কি ঐ দাঁতের মালিক পাঁচলক্ষ বছর আগেকার কোন মানুষ ? এবার শুধু ৎসডানস্কিই নন, আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী ছুটলেন সুদূর সুইডেন থেকে চীনে। চৌকোটিন পাহাড়ের ওপর আবার সুরু হল তন্ন তন্ন করে খোঁজা।

খুঁজতে খুঁজতে আবার পাওয়া গেল আর একটি দাঁত—অবিকল আগের দাঁতটির মত। পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা বললেন, এ দাঁতও মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর হতে পারে না। নিশ্চয়ই আদ্যিকালের কোন এক জাতের মানুষ এই পাহাড়ের গুহায় বাস করে গেছে—কম করে পাঁচলক্ষ বছর আগে। পিকিং শহরের কাছে গেছে তাই ওই মানুষের নতুন করে নামকরণ হ'ল—'পিকিং ম্যান্' অর্থাৎ কিনা পিকিংএর মানুষ। বিজ্ঞানীরা অবশ্য ল্যাটিন নামই পছন্দ করেন। তাঁরা ওর নাম দিলেন 'সিনান্থ্রোপাস্'—অর্থাৎ চীনের মানুষ।

এবার এগিয়ে এলেন আমেরিকার রকফেলার গবেষণা সমিতি। তাঁরা বললেন, এত পুরনো যুগের মানুষের কথা আগে বড় একটা শোনা যায় নি, সুতরাং এ নিয়ে আরও গবেষণা চলুক। যত খরচ লাগে লাগুক, আমরা যোগাব। তখন চীনে ভূতত্ত্ব বিভাগও একজোটে কাজ করার জন্য আসরে নেমে পড়লেন।

এল নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, কুলি, মজুর আর বিশেষজ্ঞের দল। পাশাপাশি আরও ভালো করে খননকার্য চলতে লাগল। খুঁড়তে খুঁড়তে সত্তর ফুট নিচে পাশাপাশি আরও দুটি দাঁত পাওয়া গেল। এবার আর দাঁত নয়, সেখানে পাওয়া গেল একটি আস্ত মানুষের ফসিল। উৎসাহী বিজ্ঞানীর দল কিন্তু কাজ বন্ধ করলেন না, সমানে খুঁড়ে চললেন গুহা।

এইভাবে একটির পর একটি করে পর পর চব্বিশটি মানুষের পূর্ণাঙ্গ কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ল। সব পাথর হয়ে গেছে—কিন্তু গড়ন ঠিকই আছে।

শুধু ফসিলই বেরোল না, সেই সঙ্গে পাওয়া গেল ঐ সব আদিম মানুষের ব্যবহৃত কতকগুলি জিনিস—পাথর

ঘসে ঘসে তৈরি করা এবড়োখেবড়ো কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র—তার কোনটা বর্শার ফলার মতো, কোনটা কুড়ুলের মতো। আর পাওয়া গেল কতকগুলি আধপোড়া হাড়, কতকগুলি ছাই আর বাদামের খোলা। অর্থাৎ এই সিনান্থ্রোপাস্ বা পিকিংম্যান্‌রা পাঁচলক্ষ বছর আগেকার জীব হলেও এরা লড়াই করবার জন্য পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে শিখেছিল আগুনের ব্যবহার জানত এবং জীবজন্তুর মাংস পুড়িয়ে খেতে শিখেছিল। কি কি জন্তু ওদের প্রিয় খাদ্য ছিল তা ঐ আধপোড়া হাড়গুলি পরীক্ষা করেই জানতে পারা গেল। এও জানা গেল যে তখনকার তুলনায় এই 'অতিসভ্য' মানুষেরা নরমাংস খেতেও বাদ দিত না। কারণ ঐ আধপোড়া হাড়গুলির মধ্যে মানুষের হাড়ও ছিল অনেকগুলো। তা ছাড়া ঐ বাদামের ভাঙ্গা খোলাগুলো দেখে বোঝা গেল ওগুলোও ওদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঐ সব বুনো বাদাম নিশ্চয়ই সে সময়ে আশেপাশের জঙ্গলে প্রচুর ফলত। বাদামগুলো যে ইঁদুর বা কাঠবেড়ালী বা ঐ জাতীয় কোনো জীব ওখানে এনে ফেলে নি সে বিষয়েও বিজ্ঞানীরা একমত হলেন, কারণ ইঁদুর বা কাঠবেড়ালীর বাদাম খাওয়ার ধরণ অন্য রকম; তারা বাদাম কুরে কুরে খায় খোলা ভেঙ্গে খায় না।

কেমন দেখতে ছিল এই পিকিংম্যান? মাথার খুলির গড়ন দেখে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন—: এদের মগজ ছিল অসম্ভব রকম ছোট—অত ছোট মগজ আর কোনো জাতের মানুষের মধ্যে দেখা যায়নি। এখনকার মানুষের তুলনায় বুদ্ধি যে ওদের তত পরিপক্ক হয়নি তা এই মগজের আকার থেকেই অনুমান করা যায়। এদের দাতের গড়ন পুরোপুরি মানুষের মতো হলেও এরা যে প্রধানত: মাংসভোজী ছিল তা দাঁত দেখলেই বোঝা যায়। ঠোঁট আর নাকের নিচের মাঝামাঝি অংশটা ছিল খুব চওড়া—অনেকটা বানরের মতো, আর চোয়ালটা ছিল বনমানুষের মতো। অর্থাৎ আসলে মানুষ হলেও বনমানুষ বা বানরের সঙ্গেই মুখের সাদৃশ্যটা ছিল যেন বেশী। তবু নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের মতে এরা সত্যিকার মানুষই ছিল—এবং বা বনমানুষদের দলে এদের কোন রকমেই ফেলা যায় না।

'সাওফা' (স্নেক ফার্ম)

সবিতা ঘোষ

(১)

ভাই সন্দেশী বন্ধুরা

এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে যে দেশে গেছিলাম তার নাম 'থাইল্যাণ্ড'। আগে বলা হত শ্যাম দেশ। এর রাজধানী হল ব্যাংকক। ব্যাংককে দেখার অনেক কিছুই আছে, যতদূর সাধ্য আমরা দেখে শুনে এসেছি। সুযোগমত তোমাদের কাছে সে সব বিষয়ে বলা যাবে। আজকে বলছি স্নেক-ফার্মের কথা। আচ্ছা, থাইল্যাণ্ড কোথায় সবাই জানো কি? 'ভিয়েৎনাম'—যেখানে খুব যুদ্ধ হচ্ছে, তার কাছেই! ব্রহ্মদেশের পূবদিকে থাইল্যাণ্ড, তার উত্তরে চীন, পূর্বে লাওস ও কাম্বোডিয়া। দক্ষিণে মলয়। এই থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাংকক একটি মস্ত বড় আধুনিক শহর, আবহাওয়া, গাছপালা ঠিক আমাদের দেশেরই মতো। বসন্তে কৃষ্ণচূড়ায় চারিধার লালে লাল। গ্রীষ্মে আম, কাঁঠাল খুব হয়। আবার গরম দেশের যে সব আপদ বালাই তাও আছে বইকি! খুব মশা, আরশোলা, পোকামাকড়দের দেশ। আর হ্যাঁ, গরম দেশের সবচেয়ে ভয়াবহ শত্রু সাপ খুবই আছে। আমরা যে এ্যাপার্টমেন্ট হাউসে ছিলাম, সেখানে বাগানে, মাছের চৌবাচ্চায়, সুইমিং পুলে অনেকবার সাপ দেখেছি। থাইরা সাপের পুজো করে। ওদের স্থাপত্যেও সাপের প্রাচুর্য! মন্দিরে মন্দিরে বুদ্ধমূর্তি আছে, তার কোনও কোনওটায় বুদ্ধদেব সাপের কুণ্ডলীর ওপর বসে ধ্যান করছেন। আর সাপ তার পাঁচটি ফণা ছড়িয়ে বুদ্ধদেবের মাথার ওপর ছাতা ধরে আছে, রোদ জল থেকে তাঁকে রক্ষা করছে। মন্দিরে ছাদের আলসে, সিঁড়ির দুধারের রেলিং-এ সমস্তই খোদাই করা সাপ দিয়ে তৈরি, থাইরা সহজে সাপ মারতেও চায় না। মালয়ের পেনাং সহরে একটি সর্পমন্দির আছে: মন্দিরটি চীনদের। সেখানে মন্দিরের ভেতর শত শত জ্যান্ত সাপ ছাড়া আছে। ছাদ থেকে সাপ ঝুলছে, মূর্তির গায়ে জ্যান্ত সাপ জড়ানো। পুজোর ভোগের থালার গায়ে সাপ, গাছের ডালে ডালে চিত্র বিচিত্র করা সাপ। দেখে কিন্তু ভয় করে না। কারণ একেবারে ঘুমন্ত যেন। মনে হয়, রবারের সাপ। শুনলাম ওষুধ দিয়ে নেশা করিয়ে ঝিমিয়ে রেখেছে, খুব লক্ষ্য করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে দেখলাম—এক একটা একটু একটু মাথা নাড়াচ্ছে। গাছের গায়ে দু, একটাকে খুব ধীরে ধীরে চলাফেরা করতে দেখলাম। সারা গা বিশ্রী শির শির করছিল। আমরা বেশিক্ষণ দাঁড়াতে ভরসা পেলাম না। কোনো একটার হঠাৎ নেশা ছুটে গেলেই হয়েছে আর কি!

সর্বত্রই বিজ্ঞাপণ দেখি টুরিস্ট্‌দের অবশ্য কর্তব্য নাকি বিখ্যাত মন্দিরগুলির সঙ্গে এখানকার স্নেক-ফার্মও দেখা। গতবারে সম্ভব হয় নি বলে এবারে টুনু আর আমি ঠিক করলাম—মাকে নিয়ে স্নেক-ফার্ম দেখে আসা যাক। একটা নতুন কিছু দেখা হবে। খবর নিয়ে জানা গেল সপ্তাহে দুদিন সাধারণের জন্যে খোলে। টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। মঙ্গলবার স্নেকফিডিং। সেদিন নিশ্চয় জ্যান্ত ব্যাং, ইঁদুর, পাখি ইত্যাদি খেতে দেয়। সে দৃশ্য দেখতে ভালো লাগবে না। বৃহস্পতিবার সাপের বিষ বের করে, ওটাই ইন্টারেস্টিং হবে। সুতরাং ৬ই জুন বৃহস্পতিবার আমরা স্নেক-ফার্ম দেখতে গেলাম। সকাল নটায় হাজির হতে হবে। ব্রেকফাস্ট খেয়েই আমরা ট্যাক্সি চড়ে বসলাম।

বিদেশে এই প্রথম অজানা জায়গায় আমি নিজে দায়িত্ব নিয়ে শাশুড়ি, ছেলে মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছি। থাইভাষার একটি বর্ণও জানি না, এখানকার লোকও থাই আর চীনে ভাষা ছাড়া কিছু বোঝে না বলেই যত অসুবিধে। কাল রাত্রে জেনে নিয়েছিলাম 'স্নেক-ফার্ম'কে এরা 'সাওফা' বলে। যদিও সাপ হল থাই ভাষায় 'ঙু' বেড়ালের তালব্য 'শ' এর মত এ থেকে কি করে 'সাওফা' হল জানি না। এখানে প্রত্যেক জিনিসের জন্যে বড্ড দর দস্তুর করতে হয়। ট্যাক্সিতে মিটার থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার করতে চায় না। স্নেক-ফার্ম সহরের অপর প্রান্তে, সুতরাং ড্রাইভার বললে বারো বাট অর্থাৎ চার টাকার মতো। তথাস্তু। চলেছি তো চলেইছি, লোকটি ঠিক বুঝেছে কি না কোথায় যেতে চাই, যদি অন্য কোথাও হাজির করে কি করবো, এই সব ভাবছি। দেখি ন'টা প্রায় বাজে। ঠিক দেখাল—'দেখ, দেখ, মা, কি সুন্দর বাগান, কি বড় বাড়ি। দেখি চুলালংকর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, চুলালংকর্ণ হাসপাতাল। তার পরই ট্যাক্সি ক্যাঁচ করে ব্রেক দিয়ে একটা ফটকের সামনে থামল। আমাদের খুব ভাগ্য যে ইংরাজী হরফে লেখা আছে স্নেক-ফার্ম। গেট দিয়ে গট্ গট্ করে ভেতরে ঢুকলাম, কেউ আটকাল না। টিকিট করতে হল না। ঢুকে দেখি একটা আপিস ঘর মতো জায়গা। সেখানেও কেউ এক অক্ষর ইংরিজি জানে না, আমাদের আসার উদ্দেশ্য বললাম, লোকটি ইসারায় 'করিডর'-এর ধারের ঘর দেখিয়ে দিল, বিদেশি দেখে ভাবল বোধহয় ইন্‌জেকশন নিতে এসেছি। গিয়ে দেখি সেখানে দেয়ালে তীর চিহ্ন দিয়ে লেখা আছে ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হয়। ভাগ্যে ঢুকে পড়িনি, তক্ষুনি ধরে ইনজেক্‌শন দিয়ে দিত!

অত বড় বাড়িতে কারো কোনো তাড়া নেই, ধীরে সুস্থে দু-একজন লোক চলাফেরা করছে। এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানি কথা বলার চেষ্টা বৃথা। কেউ কিছু বুঝবে না। ভীষণ বোকা, বোকা লাগছে। টিঙ্কু অস্থির করছে—'কই মা, সাপ কই'? মেয়ে দেখাল ঢালা বারান্দার পরই একটা মস্ত খোলা মাঠ, চারিদিকে পাঁচীল দেওয়া। জল কাদায় মাঠটা প্যাচপ্যাচে হয়ে আছে, স্কুলের ইউনিফর্ম পরা অনেক ছোট ছেলে, মেয়ের ভিড়। মাঠে ইতস্তত: কিছু ঘোড়া ঘাস খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি বললাম চল ঐ দিকে এগোই।

একটা প্রকাণ্ড গোল জায়গা পাঁচীল দিয়ে ঘেরা। ইস্কুলের ছেলেরা ঝুঁকে পড়ে তার ভেতর কি দেখছে। গুটি গুটি সকলে এগিয়ে ঐ পাঁচীলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। টুটুদের ঠাকুমা ছোট্টখাট্ট মানুষটি, তাঁকে ও টিঙ্কুকে সামনে রেখে আমরা পেছনে দাঁড়ালাম।

দেখি ঐ ঘেরা জায়গার মধ্যে আবার পাঁচীল দিয়ে তিনটে ভাগ করা। প্রথম ভাগটার মধ্যে দেখলাম—পাঁচীল ঘেঁসে চারদিকে খানিকটা খাল কাটা, আর মাঝখানে দ্বীপের মত ঘাসের জমি, কিছু বেঁটে বেঁটে গাছ ও আছে। একটা ঢাকা দেওয়া মাচার মতো করা আছে। খুব প্রকাণ্ড গোদা দুটো সাপ একটা গাছের গায়ে লটকে পড়ে আছে, আর একটা, জলে খানিকটা শরীর ডুবিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে কি ধরবার চেষ্টা করছে। দেখে তো চক্ষুস্থির! মাচাটার ছাদে ঢাকার নিচে অন্ধকারে ছায়ায় সাদাগাদি করে আরো কয়েকটা সাপ শুয়ে আছে। সেগুলোও খুব মোটা। এতক্ষণে সাড়ে নটা বেজেছে। একটি উর্দীপরা, ব্যাজ আঁটা থাই দারোয়ান গোছের লোক ব্যস্ত হয়ে এল। তারই শরণাপন্ন হলাম। ইসারায় ইংরিজিতে, হিন্দিতে নানাভাবে বোঝাতে চাইলাম আমরা সাপের বিষ তোলা দেখতে এসেছি। নটায় হবার কথা, কোথায় যেতে হবে? সে কিছুই বুঝল না।

আমি হতাশভাবে জিজ্ঞেস করলাম—তবে কি আজ তা হবে না?

সে জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে বলে দিল না হবে না! সকলের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। আমি বললাম এতদূর এলাম, আর আসাও হবে না সুতরাং খানিকটা ঘোরাফেরা করি এখানেই।

ক্রমশঃ

(বলেছিলাম পূজা সংখ্যার জন্যে নাটিকা লিখব, কিন্তু এই গল্পটা এমনি আমার মন জুড়ে বসেছে যে না লিখেও পারলাম না)

আসামের খাসিয়া পাহাড়ের কথা। লাইকর পাহাড়ের চুড়োয় উঠবার পথের পাঁচ ভাগের এক ভাগ পেরুলে, বাঁ দিকের হাঁটা পথে গিয়ে মুলকি গ্রাম। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে ছোট ছোট বাড়ি। বেশির ভাগের-ই টিনের ছাদ। পাড়ার মধ্যে দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে পাকদণ্ডী রাস্তা ধরে, নিচের ধান-খেতি থেকে উঠে আসা যায়। আরো তাড়াতাড়ি উঠতে হলে, এ বাঁক থেকে ও বাঁক, এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি, পাথর দিয়ে বাঁধানো সিঁড়িও আছে। ফাগু প্রায় সর্বদাই ঐ সিঁড়ি দিয়ে ওঠে ; শুধু নানা সঙ্গে থাকলে, পাকদণ্ডী দিয়ে আস্তে আস্তে উঠতে হয়। নইলে নানার হাঁপ ধরে। অথচ নানার হাত-পায়ের গুলি কি শক্ত !

আগে নাকি পিঠে আধমণি বোঝা নিয়ে নানাও দৌড়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারত। ফাগু এখনো যেমন ওঠে। রোজ সে নিচে পাড়ার মিশন স্কুলে পড়তে যায়। ফেরবার সময় ছোট নদীর উপরে কাঠের পুল পার হয়েই ব্যস, আর কথাটি নেই। বইয়ের ব্যাগ পিঠের পিছন দিকে ঝুলিয়ে দশ মিনিটে বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে, ডাক দেয়, 'মা, মা, মা, কি খাব ?'

অমনি নানাও বারান্দার কোণে তার ছোট ঘর থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে বলে—'আজ তোদের মুরগি কটা ডিম দিয়েছিল ?'

মা একটু চটে যায়। এই ঘেমে নেয়ে এল ছেলেটা, আর অমনি যত রাজ্যের বাজে প্রশ্ন। নানার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। ফাগুও বইয়ের ব্যাগ মাটিতে ফেলে, এক লাফে নানার গলা ধরে ঝুলে পড়ে। 'পাঁচটা নানা, পাঁচটা। আর কোনো ক্লাসের মুরগি এত ডিম দেয় নি !' মা নাক সিঁটকে বলে, 'তেরটা মুরগি আর মোটে পাঁচটা ডিম !! হুঁ !'

মা বলে নানা আসলে নাকি ওদের কেউ নয়। তা কি করে হতে পারে ফাগু ভেবেই পায় না। জন্মে অবধি তো নানাকে ঐ ঘরেই থাকতে দেখে আসছে। কালো গলা-বন্ধ ছেঁড়া কোট আর হাঁটু থেকে আঁটো খাকি রঙের ইজের পরা। কত ঘুড়ি বানিয়েছে নানা; কত মাছ ধরবার ছিপ, কত বাজপাখি মারার গুলতি। মা বলে 'ওসব হিংস্র পাখি মারিস্ নে; যদি উল্টে এসে ঠোকরায়! কাগ মার্।' কিন্তু নানা কাগ মারতে চায় না, 'এরা তো যে-সে কাগ নয় রে, ফাগু, এরা আসল দাঁড় কাগ। কি ভালো পোষ মানে, কি সুন্দর কথা বলে। তবে শেখাতে হয়। আমি একবার—'

এই বলে নানা থামে। ফাগু বলে, 'থামলে কেন? বলই না তুমি একবার কি করেছিলে?'

নানা আকাশের দিকে চেয়ে হেসে বলে, 'আমি আগে বন-বিভাগের চৌকিদার ছিলাম, জানিস? তোর দাদুও তাই ছিল। একবার ঝড়ের পর বনের মধ্যে একটা কাগের ছানা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। নিম গাছে তাদের বাসা ছিল, ঝড়ের দোলায় বোধ হয় পড়ে গেছিল। কাঠুরেদের ছেলেরা আগে ওটাকে তুলে, পকেটে পকেটে নিয়ে ঘণ্টাখানেক বেড়িয়েছিল। তারপর বাপমার কাছে বকুনি খেয়ে, আবার গাছের তলায় ফেলে দিয়েছিল। যদি কাগের মা ঠোঁটে করে বাচ্চাটাকে তুলে নেয়।

কিন্তু কাগের মারা তা নেয় না। বাচ্চার গায়ে মানুষের গন্ধ পেলে, তাকে ঠুকরে মেরে ফেলে।'

ফাগুর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। 'তুমি কি করে জানলে, নানা?'

'তোর দাদু ওটাকে পকেটে পুরে নিম গাছে চড়ে, যেই না ওকে বাসায় রাখল, অমনি কাগ-মা কাছে এসে, বাচ্চাটাকে ভালো করে দেখে শুনে, ঠোঁট দিয়ে ঠেলে আবার নিচে ফেলে দিল। ভাগ্যিস, আমি সেখানে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তাই খপ করে ধরে ফেলতে পারলাম। নইলে হয়েছিল আর কি! ওটাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে বৌকে দিলাম। তার ছেলেপিলে ছিল না বলে বড় দুঃখ। বললাম কাগ পাল, দুঃখ ঘুচবে। সে যে কি যত্নে কাগের ছানা পালল সে আর কি বলব।' ফাগু জিজ্ঞাসা করল, 'কার বৌ, নানা? সে এখন কোথায়?'

নানা বলল, 'আমার বৌ-রে ফাগু। সে এখন স্বর্গের রাজা উব্লেই-এর কাছে চলে গেছে। সেখানে কারো কোনো দুঃখ নেই। সেই থেকে আমিও তোদের বাড়িতে আছি।'

ফাগু রেগে গেল, 'সে কেন তোমাকে একা ফেলে চলে গেল? কি দুষ্টু!'

নানা হেসে বলল, 'দুষ্টু না রে, সে বড় ভালো ছিল। রাখতে পারলাম না, তাই! যাবার আগে আমাকে বলে গেল—রুনারকে দেখো। কাগটা বড় দুষ্টুমি করত কি না, তাই রুনার নাম রাখা হয়েছিল। বৌ যাবার পর, বাইশ বছর সে আমার কাছে ছিল। তারপর কোথায় উড়ে চলে গেছে। ভাবি, বৌয়ের সঙ্গে দেখা হলে কি বলব।'

ফাগু ভারি অবাক হল। 'বৌ তো মরে গেছে। তার সঙ্গে আবার তোমার দেখা হবে নাকি? নানা বলল, 'নিশ্চয় হবে!' ফাগু জিজ্ঞাসা করল, 'তাকে খুঁজে পাবে কি করে? তুমি কি স্বর্গের রাস্তা জান?

নানা বলল, 'যেমন করে সব নদী বড়পানি খুঁজে পায়, তেমনি করে। চল ছোটনদীতে মাছ ধরতে যাই।'

ছোট নদীর ধারে ওদের একটা বিশেষ মাছ ধরার জায়গা ছিল। উইলো গাছের ঝোলানো পাতার ছায়ায় চ্যাপ্টা একটা পাথরে বসে ওরা ছুটির দিনে মাছ ধরত। নানা কোথা থেকে বড় বড় পিঁপড়ের ডিম যোগাড় করে আনত টপাটপ মাছ পড়ত।

নানা বলত, 'খুব ছোট মাছ ধরতে হয়না। ওরা মাছেদের ছেলেপিলে। দেখিস না কেমন বিদ্যুতের ঝলকের মতো জলের মধ্যে খেলে বেড়ায়। যে মাছ খেলে পেট ভরে, শুধু সেই মাছ-ই ধরতে হয়।' এই বলে

নানা যত্ন করে ছোট মাছের গলা থেকে বঁড়শি খুলে নিয়ে, তাকে আবার জলে ছেড়ে দিত। ফাগু দেখে দেখে অবাক হয়ে বলত, 'তুমি জন্তু-জানোয়ার, মাছ, পাখি সব ভালবাস, না নানা? পোকা-মাকড়ও ভালবাস? সাপ-ও ভালোবাস?'

নানা হাসত, পোকা-মাকড়-সাপ তফাৎ থেকে ভালোবাসাই ভালো। দেখিস্ নি লাল শুঁয়ো-পোকা সরল-গাছ থেকে নেমেই কি রকম পাঁই-পাঁই ছোটে। খবরদার ধরিস্ নে, দূর থেকেই দেখিস্। ধরলেই তোর আঙুলে এই বড় বড় শুঁয়ো ফুটে যাবে, তার কি জ্বলুনি। আর সাপের কথা কি বলব! শীতকালে এরা নিরাপদ গর্ত খুঁজে নিয়ে ঘুমোয়। একবার আমার দাদা একটা পাথর সরিয়ে দেখে, তার পিছনে ফাটলের মধ্যে একটা লম্বা সবুজ সাপ চুপ করে পড়ে রয়েছে। তার নীল রঙের চোখ দুটো খোলা। নড়ছে-চড়ছে না। দাদা পাথরটাকে আবার ফাটলের মুখে বসিয়ে দিয়ে বলল 'বসন্তকাল এলেই ও আবার জাগবে।' আমি বললাম—'চোখ খোলা কেন? দাদা বলল—ওরা তো চোখ বন্ধ করে না। ও জেগে উঠে এই পুরনো ছালটা খুলে ফেলে দেবে। ভেতর থেকে কি সুন্দর নতুন ছাল বেরুবে। কিন্তু প্রথম প্রথম নতুন ছাল বেজায় নরম থাকে। তখন সাপ বেশি নড়েচড়ে না। আস্তে আস্তে গায়ে জোর এলে, আবার ফণা তোলে। আমি বললাম—তা হলে নতুন ছাল হলেই দুষ্টু সাপকে তোমরা মেরে ফেল না কেন? দাদা বলল—তাই কখনো করতে হয়? দুর্বল শত্রুকে কখনো মারতে নেই।'

ফাগু নানার কোল ঘেঁষে বসে বলল, 'আমার দাদু কোথায় গেছে?' নানা শুনে অবাক। 'বাঃ, তাও জান না? তোমার দাদু, দিদিমা, আমার দাদা, বৌদিদি, বৌ সবাই স্বর্গে গেছে। আমিও যাব।'

'কবে যাবে?' 'নৌকো এলেই যাব।'

ফাগু আশ্চর্য হয়ে বলে, 'এই পাহাড়ে নদীতেও নৌকো আসবে? কিন্তু আমাদের স্কুলের দিদিমণি বলেছেন পাহাড়ে নদী যেখানে নিচে নেমে বড়পানির সঙ্গে মিশেছে, শুধু সেই পর্যন্ত নৌকো আসে। তোমার নৌকো এত দূর আসবে না।'

নানা একটু ভেবে বলল, 'তা হলে আমাকেই বড় পানিতে যেতে হবে।'

ফাগু বলল, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব, নানা।'

নানা রেগে গেল। 'এই তো তোর সবে সাত বছর বয়স হয়েছে। এখনি বড়পানির নৌকোয় যাব বললেই হল কি না! আমি কত শিখেছি, কষ্ট করেছি, কাজ শিক্ষে করেছি, কত দুঃখ পেয়েছি, সুখ পেয়েছি, কত পাহাড়ের আগুন নিবিয়েছি, গাছ কেটেছি, জানোয়ার পেলেছি, বাঘ ভাল্লুক মেরেছি'—

ফাগু লাফিয়ে ওঠে। 'অ্যাঁ! তুমি বাঘ ভাল্লুক মেরেছ, নানা? কি করে মারলে? ফাঁদ পেতে?'

শুনে নানার কি হাসি। 'দূর, দূর, পুরুষ বাচ্চা কি ফাঁদ পেতে বাঘ-ভাল্লুক ধরে নাকি? ছাড়া জন্তু মারতে হয়।'

তবে কেন লাইকরের রাস্তার ধারে বাঘ ধরার ফাঁদ পেতেছে?'

'আরে ওতো পাছে তোদের ঘরে-পালা হাঁস-মুরগি, পাঁঠার ছানা, শূকরছানা ধরে নিয়ে যায়, তাই ফাঁদ পেতে বাঘ ধরার চেষ্টা।'

ফাগু বলল, 'ভিতরে একটা ছাগলছানা বেঁধে রাখে। রাতে সে ভয়ের চোটে মায়ের জন্য কাঁদে, আমি শুনতে পাই। তাকে বাঘে খেয়ে ফেলে।'

এই বলে ফাগু চোখ ঘষতে লাগল। নানা আবার রেগে গেল। 'তোর যেমন বুদ্ধি! মোটেই তাকে

বাঘে খায় না। সে একটা আলাদা খাঁচায় থাকে, বাঘ সেখানে ঢুকতে পারে না। বাঘ যেই খিল ধরে টানে, বাইরের খাঁচার দরজা পড়ে যায়। বাঘ সেই খাঁচায় আটকা পড়ে সে কি গর্জন করে! ছাগলছানা খুব ভয় পায় বটে, কিন্তু মোটেই তাকে বাঘে বা অন্য কিছুতে খায় না। পুরুষ বাচ্চাকে আগে ভয় পেতে শিখতে হয়, নইলে পরে সাহস পাবে কি করে?'

এমনি করে সময় কাটে। এক ছুটির দিন দুপুরে নানাকে মাথায় বোনা টুপি পরে বেরিয়ে যেতে দেখে, ফাগু বায়না ধরল সে-ও সঙ্গে যাবে। নানা বলল, 'না, না, তোর গিয়ে কাজ নেই। আমি ঝরণা দেখতে যাচ্ছি। তার কাছে আমার কোয়ার্টার ছিল, দশ বছর যাই নি ওদিকে। তুই থাক, নইলে মা রাগ করবে।' এই বলে নানা হন্‌হন্‌ করে চলল।

নানা বনের ধারে পৌঁছতে না পৌঁছতে ফাগু তাকে ধরে ফেলল। নানা অমনি বাড়ির দিকে ফিরল। ফাগু তবু বনের পথ ধরে চলল। শেষ পর্যন্ত নানাকেও সঙ্গে যেতে হল। সে কি বন! বাইরে দুপুরের রোদ চনচন করছে। বনের মধ্যে সবুজ ছায়ায় ভরা, একটুও রোদ নেই। শুধু মাঝে মাঝে যেখানে গাছ পাৎলা হয়ে এসেছে, সেখানে এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে। পায়ের নিচে স্যাঁৎসেঁতে, গাছের গায়ে লম্বা চুলদাড়ি ঝুলছে। নানা বললে, 'ওগুলো পরগাছা, গাছের রস আর বাতাস খেয়ে বাঁচে। ঝোপের কাছে যাস্‌ নে, যদি কুলোপানা চক্কর তোলে!' ফাগু অমনি সরে এল।

হঠাৎ কানে এল ঝর-ঝর শব্দ। 'ও নানা, ঐ বুঝি তোমার ঝরণা?'

নানা বলল, ঝরণা কি এত নিচে হয়? তবে ঝরণার-ই জল বটে। বড়পানির কাছে চলেছে। শুনছিস না কেমন হুড়হুড় কলকল করে গান গেয়ে ছুটে চলেছে। বছরের পর বছর জলের ঘসা লেগে প্রত্যেকটি ছোট পাথর গোল নুড়ি হয়ে গেছে।'

আরেকটু এগিয়ে নানা বলল, 'আয়, আমার হাত ধর, এবার পাথর বেয়ে উপরে উঠতে হবে।' খচমচ করে খানিক হামা দিয়ে, খানিক গাছের শিকড় ধরে ঝুলে, ওরা আশ্চর্য এক জায়গায় পৌঁছল। গাছপালা দূরে সরে গেছে। মাঝখানে ফাঁকা একটা জায়গা, সে-খানে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট তিন চারটি গর্ত থেকে বুড়বুড় করে জল বেরুচ্ছে। ফাগু তো অবাক। এই নাকি ঝরণা। এই জলই নাকি এত বড় শহরের লোকরা সবাই খায়? 'ও নানা, জল তো গড়িয়ে নষ্ট হচ্ছে, লোকে খাবে কি করে?'

নানা বলল, 'দূর বোকা, নষ্ট হবে কেন, ও তো বড়পানি যাচ্ছে। কিছু মাটিতে শুষে নিচ্ছে, কিছু গরু ছাগলে পার হবার সময় খেয়ে নিচ্ছে। শহরের জল ঐ যে ঐখান থেকে যায়।'

ফাগু চেয়ে দেখল ছোট ছোট টিনের চালের ঘরের মতো। তার দেয়ালে জাল দেওয়া জানলা। চোখ লাগিয়ে দেখল ভিতরে আরো সব গর্ত, তার থেকেও বুড়বুড় করে জল বেরিয়ে একটা জায়গায় জমা হচ্ছে। সেখান থেকে বড় বড় কালো পাইপে করে জল চলে যাচ্ছে।

'জল কোথায় যাচ্ছে,!'

নানা বলল, 'ঐ যে তোদের বাড়ির কাছে বড় ট্যাঙ্ক আছে ঐখান থেকে পাইপে করে শহরময় বিলি হচ্ছে। ও বন্দী জল, ও জল বড়পানি যায় না! চল, এখানে এলে আমার মন কেমন করে।'

'কেন, নানা?' 'কুড়ি বছর এখানে জল পাহারার কাজ করেছি। কোথায় আমার ঘর ছিল, দেখবি? পাশেই খানিকটা সমান জায়গা, পুরনো কোন বাড়ির একটুখানি পাথরের ভিত। একটা পাথরে নাড়া দিতেই সেটা গড়িয়ে গেল। তার নিচে থেকে ছোট একটা কাঠের বল বেরিয়ে এল। 'ওটা কি, নানা!' নানা সেটা কুড়িয়ে

নিয়ে বলল, 'নে এটা তোকে দিলাম। বৌয়ের একটা ছেলে ছিল, বাঁচল না। তার জন্যে বানিয়েছিলাম। চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

বাড়ি ফিরতে বড় দেরী হয়ে গেল। মা বেরিয়ে এসে লাইকরের রাস্তায় ছুটোছুটি করছিল। ওদের দেখেই বেজায় রেগে গেল। নানাকে যা তা বলে বকতে লাগল। ফাগুর গালে ঠাস ঠাস করে দুটো চড় দিয়ে, নিজেই হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। তারপর ফাগুর হাত ধরে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল।

রাতে খাবার সময় মা নানাকে বলল, 'আজ থেকে আপনার খাবার আপনার ঘরে দেবে।' ফাগুকে বলল, 'নানার সঙ্গে ফের বেরিয়েছ তো ঠ্যাং ভেঙে দেব। ও কি একটা নোংরা বল নিয়েছ? ফেলে দাও।' মা বলটা নিয়ে জানলা দিয়ে ফেলে দিল। নানা কিছু না বলে পা ঘষটাতে ঘষটাতে নিজের ঘরে চলে গেল। দুধ খেল না।

পরদিন ভোরে উঠেই এক দৌড়ে নানার ঘরে গিয়ে ফাগু দেখল, নানা নেই। তার কম্বলটা, লাঠিটা আর বন-বিভাগের পাহারা-ওয়ালাদের পুরণো চামড়ার কাঁধে আঁটা ব্যাগটাও নেই। ফাগু আস্তে আস্তে ফিরে এসে বই নিয়ে পড়তে বসল। সকালে যখন থালায় করে নানার জন্য দুধ রুটি নিয়ে কান্থাই নানার ঘরের দিকে যাচ্ছিল, তখন বই থেকে মুখ তুলে ফাগু বলল, 'নানা খাবে না। নানা চলে গেছে।'

শুনতে পেয়ে খাবার ঘর থেকে মা ছুটে এল। 'চলে গেছে কিরে? এই শীতে পঁচাত্তর বছরের বুড়ো যাবে কোথায়?' ফাগুর গলার কাছটা ব্যথা করছিল। বলল, 'বড়পানিতে গেছে। সেখানে ওর জন্যে নৌকো আসবে। বৌকে খুঁজতে যাবে। তুমি ওর বৌয়ের ছেলের বল্ ফেলে দিয়েছ।'

মার মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বাইরে গিয়ে আলু-খেত থেকে বলটা কুড়িয়ে এনে, হাতে নিয়ে বলল, 'তোর বাবা যখন কলকাতা থেকে ফিরে এসে বলবে নানা কই, আমি তাকে কি বলব?'

ফাগু বলল, 'বাবা নানার জন্যে গরম গেঞ্জি আনবে আর দুইপাশে রবার দেয়া জুতো। চামড়ার জুতোয় নানার পায়ের কড়াতে লাগে।' এই বলে ফাগুও ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল।

মা খানিক এদিক-ওদিক ঘুরে বলল, 'বড়পানি গেছে ঠিক জান? মটর-বাসে গেছে?'

ফাগুর হাসি পেল, 'মটর-বাসে যাবে কি? নদীর স্রোত ধরে ধরে যেতে হবে। কোনখানে নৌকো অপেক্ষা করছে—কে জানে?'

মা বলল, 'তাই চল্। তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি।' তৈরি হতে কতটুকুই বা সময় লাগল। একটা থলিতে কিছু শুকনো খাবার বেঁধে নিল মা। নিজে একটা মোটা লাঠি নিল, ফাগুর হাতে একটা দিল। দুজনে দুটো গরম জামা পরে নিল। ফাগু পকেটে করে বলটাও নিল। ওটা নানা ওকে দিয়েছে, ফেলে যাওয়া যায় না।

ঝরণা থেকে সরু নালার মতো বেরিয়ে, আরো সব নালার সঙ্গে জুড়ে মুনকি পৌঁছবার অনেক আগেই একটা ছোট নদী হয়ে গেছিল। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সেই নদী কেবলি নিচে নামছিল। লাইকার পাহাড়ের গোড়ায় নদীর জল ঘাগরার মতো ছড়িয়ে গিয়ে ঝপাং করে একসঙ্গে অনেকখানি নেমে পড়ল।

জায়গাটা বড় সুন্দর। বড় বড় ফার্ণ গাছ মাথার উপর যেন ছাতা ধরে আছে। নদীর ধার দিয়ে দিয়ে পায়ে চলা পথ। ফাগু বলল, 'এইখানে মাছ ধরতে হয়। বর্ষার সময় বেশি জল হলে মাঝে মাঝে সাহেবের বাগান থেকে ট্রাউট মাছ পালিয়ে আসে, এইখানে তাদের ধরতে হয়।'

মা অবাক হয়ে ফাগুর মুখের দিকে তাকাল। সরল গাছের মধ্যে দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দ কানে এল। মা বলল, 'ওরে ফাগু, একটু না বসলে তো আর পারব না।'

মা একটা চ্যাপ্টা পাথরের উপর বসে পড়ে, নিজের হাঁটু ঘষতে লাগল। নিচে নামবার সময় হাঁটুতে ভার পড়ে, হাঁটু ব্যথা করে। বুড়োদের করে, নানার-ও করে; কিন্তু ফাগুর করে না। ফাগু চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। পাথরের নিচে একটা খোঁদল। তার এক পাশে খানিকটা জল জমেছে। সেখানে মরা গাছের শেকড়ে এক রকম ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে, পালকের মতো দেখতে। নানা বলে ওগুলো পেঁয়াজ দিয়ে ভেজে খেতে হয়। মা ব্যাঙের ছাতা ছুঁতে মানা করে, বলে নাকি হাতে ঘা হবে।

খোঁদলের অন্য ধারে কিসের চোখ চক চক করছে। ফাগু নিচু হয়ে দেখল মেঠো ইঁদুরের বাসা। চারটে বাচ্চা নিয়ে মা ইঁদুর জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। ফাগুকে দেখে দাঁত খিঁচুল। ফাগু আস্তে আস্তে সরে এল।

লম্বা লম্বা ঘাসের পাতা, ফিকে বেগুনি ডোরা কাটা, হাতে ঘষলে কি ভালো গন্ধ বেরোয়। চওড়া বুনো লিলির পাতা। তার তলার দিকে ঠিক যেন একটু ফেনা লেগে রয়েছে।

মা দেখে বলল, 'ছিঃ, ফেলে দে, কিসের থুতু।'

ফাগুর হাসি পেল, 'মা তুমি কিচ্ছু জান না, থুতু হবে কেন, এর মধ্যে একটা ছোট্ট পোকা আছে। সে-ই নিজের গা থেকে ফেনা বের করে, তার মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকে, শত্রুরা দেখতে পায় না।'

মা বলল, 'এ সবই বোধ হয় নানা বলেছে? তোর বাবাকেও বলত। এসব জায়গা তোর বাবাও চেনেন। ওঠ, চল, নইলে নানাকে ধরতে পারব না। তোর বাবা কাল আসবেন।'

ফাগু শুনে আনন্দ রাখবার জায়গা পায় না। 'চল, চল, মা, নানা কতদূর এগিয়ে গেছে।'

মা বলল, 'কোন পথে গেছে, কে জানে।' 'নদীর ধার দিয়ে দিয়ে নিশ্চয় গেছে, মা। এই আমাদের ধানখেতির নদী গিয়ে লুমপংরিএর নদীর সঙ্গে মিশেছে। তারপর আরো কত নদী আছে মা, সবাই গিয়ে বড়পানিতে পড়েছে। ঐখানে নানার নৌকো বাঁধা থাকবে।'

শুনে মা লাফিয়ে উঠে, ফাগুর হাত ধরে টানতে টানতে, এক রকম দৌড়ে চলতে লাগল। চলতে, চলতে চলতে চলতে, দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল, ওরা তখন মুগুমির কাছে পৌঁছল। সেইখানে ঝম-ঝম করে পাহাড়ের গা বেয়ে নদী তিনশো ফিট নিচে নেমেছে। মা বলল, 'কি হবে ফাগু?'

ফাগু হাসল, 'ঐ দেখ, ঝরণার পাশ দিয়ে নিচে নামার পথ। এঁকে বেঁকে ঘুরে ঘুরে নেমেছে। কিন্তু তোমার হাঁটুতে যে ব্যথা।'

মা বলল, 'না, না, ব্যথা সেরে গেছে।' বলে আগে আগে নামতে লাগল। মাঝে মাঝে ঝরণার জলের ছিটে ওদের মুখে লাগছিল। ওখানে জলের তোড়ে মাটি কাঁপে কানে তালা লাগে। ওদের মুখে কথা নেই। পা হড়কালেও আর কথাটি নেই! মাঝে মাঝে মা একটু থামে। এমনি করে এক সময় ওরা নিচের জমিতে পৌঁছল।

ঝরণার জল যেখানে মাটিতে পড়েছে, সেখানে একটা পুকুরের মতো তৈরি হয়েছে। জল সেখানে পাক খাচ্ছে, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে উড়ছে। ধোঁয়ার মতো দেখাচ্ছে তাতে রোদ লেগে রামধনু তৈরি হচ্ছে। মা হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

এমন সময় পাশের ঝাউবন থেকে, বুকের মধ্যে কি একটা যত্ন করে ধরে, যে বেরিয়ে এল, সে নানা। 'নানা, নানা, নানা!' বলে ওরা দুজনে ছুটল।

মা নানার পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। নানা রেগে গেল। 'এই কি কাঁদাকাটির সময়? শিকারীদের গুলি লেগে বন-মোরগের ডানা জখম হয়েছে! কাঠি বাঁধতে হবে না?'

মায়ের বটুয়াতে সুতো, ছুরি সব পাওয়া গেল। কিন্তু নানার কোলে চোখ বন্ধ করে বন-মোরগ শুয়ে পড়ে থাকল। ফাগু কেঁদে বলল, 'মরে গেছে নাকি, নানা?' নানা বলল, 'চুপ, ব্যাটাছেলে কাঁদে নাকি। এইখানটা ধর, আমি কাঠি বাঁধি।'

কি সুন্দর বন-মোরগ, সোনালি, কমলা, লালচে, গলার কাছে সবুজ, নীল। আর হলদে পা। আস্তে আস্তে সে কালো চোখ খুলে তাকাল। অমনি তাকে কাঁধের কম্বলে জড়িয়ে, কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'চল, বাড়ি চল।'

বাড়ি? বাড়ি কি করে যাবে? বাড়ি যে ঢের দূর। নানা বলল, 'মোটেই দূরে নয়। ঐ বাঁক ঘুরলেই মটর-বাসের রাস্তা, মুলকির কাছে পৌঁছে দেবে।'

আরো অনেকক্ষণ পরে, বাসে বসে বসে নানার কানে কানে ফাগু বলল, 'নানা, বড়পানিতে তোমার জন্যে নৌকো বসে থাকবে না?' শুনে নানা অবাক্, 'নৌকো এলেই হল কি না!! পাখির যত্ন কে করবেটা শুনি? ও তো জেগে উঠেই সবাইকে ঠোক্‌রাবে। আর কাল না তোর বাবা আসছে? আমি না থাকলে সে কার সঙ্গে মাছ ধরবে, শুনি?'

চরম পত্র

প্রভাকর মাঝি

মন্ত্রী মশাই, আছেন তো বেড়ে
দপ্তরে নিজ কার্যে,
আমাদের পরে জানেন হচ্ছে
রোজ কত অবিচার যে।
ন মাসে ছ মাসে খদ্দের মেলে
রুজি-রোজগার বন্ধ
চোখ ফুটে গেছে একদা যে ছিল
বুদ্ধু, গাড়োল, অন্ধ।
অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে যদিও বা
কাবু করি কোনো ছোকরা,
দুটো কি তিনটে মেকি সিকি লাভ
ছুঁচো মেরে হাত নোংরা।
বিশ্বাস হয়, গত দেড় মাসে
জোটেনি একটি আধলা
যাকে খুশি স্যর, শুধাতে পারেন,
সাক্ষী বাচ্চু বাদলা।
একা চিৎকার মিছে—তাই বাঁধি চোরে
জোচ্চোরে জোট যে,
সভ্যসংখ্যা আমাদের আজ
সওয়া ন লক্ষ মোট যে।

আইন করুন: মাসের মাহিনা
লোকে পকেটেতে রাখবে,
আমাদের কাম ফতে হয় যাতে
পুলিশ সজাগ থাকবে।
হাট করে খুলে দরোজা সকলে
সারবে নিদ্রা-কর্ম
কাউকে অবিশ্বাস করাটা কি
বলুন মানব ধর্ম?
রোজগার নেই—বাইরে ভড়ং
রাখতে ইস কি কষ্ট।
ফিটফাট থাকা চাই চার দিকে
নৈলে পসার নষ্ট।
সভা ডেকে তাই উনত্রিশ দফা
দাবি পেশ করি নাগরী,
মানবেন, নয় কর্মবিরতি
খাবো পুলিশের চাকরি।
আমাদের দাবি মানতেই হবে
ভাববেন না এ রঙ্গ,
—চরম পত্র, ইতি সারা ভারতের
তস্কর সংঘ।

আমার জীবনে সবচেয়ে বড় এ্যাডভেঞ্চার

(সত্য ঘটনা)

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

কয়েক মাস হল আমি উড়িষ্যার সরকারী খনি কর্পোরেসন-এর দায়িত্ব নিয়ে ভুবনেশ্বরে বাস করছি। শুনতে পেলাম পাশের বাড়িতে থাকতে আসছেন অধ্যাপক জে, বি, এস হলডেন আর তাঁর সহধর্মিনী ডক্টর হেলেন স্পারওয়ে। আরও শুনলাম তাঁদের সঙ্গে আসছেন কয়েকজন তরুণ বৈজ্ঞানিক।

অধ্যাপক হলডেন-এর খ্যাতি তখন বিশ্বজোড়া। যদিও আমি বৈজ্ঞানিক নই তবু দলটির আসার জন্যে উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একদিন দেখি বড় বড় ট্রাক এল। তাতে যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র আর কিছু কিছু বই এল। রাজমিস্ত্রীরা কাজে লেগে গেল।

প্রায় সাড়ে তিন বিঘে জমি তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে একতলা একটা বাড়ি। বড় বড় ঘর আর বারান্দা জুড়ে গবেষণার কাজ শুরু হতে দেখলাম দূর থেকে।

রাজধানীর এই দিকটা পত্তন করা হয় জঙ্গল কেটে। গাছপালা বেশি না থাকলেও সাপখোপ, পোকা-মাকড়ের অভাব নেই। প্রতিবেশী বৈজ্ঞানিকদের হাবভাব দেখে মনে হল কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাবে তাঁরা বেজায় খুসি। নিত্য নতুন কোন প্রাণী আবিষ্কারের খবর ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপককে এনে দেখানো হচ্ছে।

ছাদের উপর দিয়ে উড়ে যায় দূরের পাখির ঝাঁক। সূর্যাস্ত থেকে সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসা পর্যন্ত একটি দলকে ছাদের ওপর দেখি দূরবীণ চোখে, খাতা পেনসিল হাতে। মালীদের কাছে শুনি ও বাড়িতে বিষধর সাপ বা কাঁকড়া বিছা মারা নিষেধ। গো-সাপ গিরগিটি, বোলতা, ফড়িং দেখে হুমড়ি খেয়ে পড়ার কি আছে বুঝতে পারে না তারা।

মধ্যে একবার কলকাতায় গিয়ে শুনে এলাম অধ্যাপক নাকি কোনো মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণী হত্যা না করেই জীববিদ্যা শিখেছিলেন। তিনি নাকি নিরামিষাশী, অদ্ভুত মানুষ।

আলাপ করবার সুযোগ মিলে গেল একদিন।

সরকারী অতিথিশালা থেকে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছি এমন সময় প্রবল ধারায় বৃষ্টি নাবল। বাঁক নেওয়ার সময় দেখি অধ্যাপক একটা বড় সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে কৃষি বিদ্যালয়ের দিকে হেঁটে চলেছেন। গায়ের গেরুয়া রঙের ঢিলে পাঞ্জাবি আর পায়জামা জুব জুব হয়ে ভিজে লম্বা চওড়া শরীরের সঙ্গে এঁটে গেছে। নিঃশব্দে পাশে এসে গাড়ি থামিয়ে বললাম—"আমি আপনার প্রতিবেশী, কোথায় যাচ্ছেন পৌঁছে দিতে পারি কি?"

মুখ থেকে ভিজে পাইপ সরিয়ে আমাকে ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, 'আপনি কি খণ্ডগিরির দিকে যাচ্ছিলেন? বেশ চলুন—পথে নামিয়ে দেবেন—ধন্যবাদ।'

অধ্যাপকের কাছে সেই একদিন মাত্র মিথ্যা কথা বলেছিলাম। তাঁকে অনুসরণ করেছি জানলে কখনই আমার গাড়িতে উঠতেন না তার আভাষ পেয়েছিলাম শিক্ষাসচিব ভেঙ্কাটারমনের গল্পে।

দিল্লী থেকে ফেরবার পথে হাওড়া স্টেশনে এসে পুরী এক্সপ্রেসে উঠে দেখেন অধ্যাপক হলডেন-কে দেওয়া হয়েছে উপরের একটা বাঙ্ক। সৌজন্য প্রকাশ করে আলাপ জমাবার অভিপ্রায়ে নিজের লোয়ার বার্থটি ছেড়ে

দিতে মহা ফ্যাসাদে পড়লেন। বৃদ্ধ এক লাফ দিয়ে তাঁর বাক্স সমেত উপরে উঠে গিয়ে বললেন, 'সত্তর বছর বয়সে মানুষ বৃদ্ধ আর পঙ্গু হয়ে যায় না—জামা খুলছি, দেখতে পারেন শরীরটা ক্ষত বিক্ষত। কিছুটা যুদ্ধে আর বাকিটা দেহ-র সহ্যসীমা পরীক্ষা করতে গিয়ে—এ সত্ত্বেও আমি এখনও করুণার পাত্র হয়ে যাই নি।'

হতবাক সহযাত্রী তিনজনকে প্রতিটি আঘাত চিহ্নের ইতিহাস শুনিয়ে তবে তাঁর ক্ষোভ যায়।

ভেঙ্কাট বলেছিল, 'মশায় বেশি ঘাঁটাবেন না, কখন কোন কথায় রেগে যাবেন তার ঠিক নেই।'

যাই হোক সেদিন অধ্যাপকের আহ্বানের সুযোগ নিয়ে আমরা দুজনে উপস্থিত হওয়া মাত্র জানতে পারলাম যে আমাদের দুটি ওয়ার-হেয়ার টেরিয়ার কুকুর কুইনী ও মার্কুর সঙ্গে ওঁদের সকলের ইতিমধ্যেই পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। তাদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে অধ্যাপক ও তৎ পত্নী পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে বুঝলাম শিশুর মতো সরল এই মানুষটির মন যেমন নরম তেমনি বন্ধু বৎসল। অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তা বলে লোকে ভুল বোঝে। ভণ্ডামির প্রতি অসহিষ্ণুতা রূঢ় ভাষায় প্রকাশ করে বসেন।

জীববিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। অনেক আলাপ আলোচনায় যোগ দিতে পারতাম না। তাছাড়া যে-সকল সমস্যা নিয়ে গবেষণা হচ্ছিল তার তখনও মীমাংসা হয় নি। কাজের ক্ষেত্র বেড়েই চলেছিল। আমরা যা উপভোগ করতাম সেটা হচ্ছে অবিরত কাজের মধ্যে নানাধরনের গল্প গুজব। দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, পুরা কাহিনী, ধর্মশাস্ত্র, ভূগোল যে কোন প্রসঙ্গে তর্ক উঠলে অধ্যাপকের কাছে সালিসি মানা হতো। তাঁর নির্দেশ মতো দেয়াল জোড়া তাক থেকে প্রমাণের বই নামাতে হত সুরেশ জয়াকারকে। বড় হল ঘরে দেয়াল ঘেঁসা লম্বা টেবিলের ওপর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, পরীক্ষা নিরীক্ষার বিবরণ-পঞ্জিকা। পাশেই সেই বই-এর তাক। ঘরের মাঝখানে আর একটা বড় টেবিলের ওপর ছড়ানো থাকত নানা ধরনের খাবার জিনিস। অধ্যাপক আর তাঁর গৃহিণী হেলেন-এর আতিথেয়তা ছিল একেবারে নিয়ম ছাড়া। টেবিলে যাও যা ইচ্ছা তুলে নিয়ে খাও, অথবা খেও না! গাছাড়া ভাব।

আমরা ছাড়া, আমেরিকান, ইংরেজ ও ভারতীয় আরও কেউ কেউ জ্ঞানপিপাসু ছেলেমেয়েরা বৈজ্ঞানিকদের আড্ডায় জুটতেন কিন্তু তাতে তাঁদের কাজের কোনো ক্ষতি হতো না। গবেষণাঘরের পাশেই ছিল সুন্দর সুন্দর ডিভান পাতা বসবার ঘর। অজস্র সাময়িক পত্রিকা আসত নানা ধরনের। কুসানে ঠেস দিয়ে বসে গেলেই হল। ভাল ভাল বইও থাকত হাতের কাছে।

প্রথম প্রথম দেখতাম হেলেন আর সুরেশ একটি বোলতার চাকের ওপর অবিরাম নজর রেখে বসে আছেন হাতের কাছে ঘড়ি, খাতা আর কলম নিয়ে। প্রতিটি বোলতাকে চিহ্নিত করে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে কখন কখন কতবার তাদের যাওয়া আসা। মিনিটে মিনিটে লিখে রাখা হচ্ছে সকল বৃত্তান্ত। চাকর বাকর ভাবত বদ্ধ পাগল। আমরাও বুঝতাম না এতখানি কষ্ট করবার কি সার্থকতা? একদিন অধ্যাপককেও একটু উত্তেজিত দেখলাম। শুনলাম জীববিদ্যার ক্ষেত্রে কিছু নতুন আবিষ্কার হয়েছে। মোটামুটি বুঝলাম যে ডিম থেকে প্রথমে বেরিয়ে আসছে পুরুষ বোলতা তার পরের ক্ষেপে কেবল স্ত্রী জাতীয় প্রাণী। এই নিয়ম নাকি জানা ছিল না!

দ্রোণাম রাজু রংকানা মানুষ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। নৃতত্ত্বে শিক্ষিত এক তরুণ দম্পতিকে আর এক রকম গবেষণা করবার জন্যে পাঠানো হয়েছিল আদিবাসীদের মধ্যে কোন গ্রামাঞ্চলে। মাঝে মাঝে অধ্যাপক নির্মল বোস আসতেন কলকাতা থেকে। ভূতত্ত্ববিদ্ প্যামেলা রবিনসন সুবিধা পেলেই দু'চার দিন করে থেকে যেতেন। হার্ভাড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিশারদ কোরা ডুবোয়া নিজের কাজে দীর্ঘকাল ধরে ভুবনেশ্বরে থাকতেন। তাঁরও তীর্থ ক্ষেত্র ছিল আমাদের ঐ পাশের বাড়ি।

জীববিদ্যায় শিক্ষানবিসি করতেন কেউ কেউ। দেখতাম শুঁয়াপোকা, কাঠফড়িং, মথজাতীয় পতঙ্গ, পিঁপড়ে ইত্যাদি প্রাণী কিভাবে জন্মায় তাই নিয়ে গবেষণা চলেছে। এই সব কাজের পারম্পর্য অবশ্য স্মরণে নেই।

আমাদের পুবদিকের বাগানে কাঁকড় ভরা মাঠের মাঝে একটা কল থেকে টিপ টিপ করে জল পড়ত। একবার দেখি সুরেশ আর হেলেন পশ্চিমের রোদে মুখ পুড়িয়ে নিবিষ্টভাবে সেই দিকে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে রয়েছে খাতা পেনসিল, দূরবীন। আমাদের জানানো হল হাটিম্‌-টিম্‌ পাখি বাসা বাঁধছে কলের কাছে। অনুমতি চাই ডিম পাড়া থেকে বাচ্চা বার হওয়া পর্যন্ত দেখার। সে কলে কেউ স্নান করে না অতএব গবেষণার কোনো অসুবিধে হল না।

দুজনে সারাক্ষণ প্রখর রোদে মুখ পুড়িয়ে কি যে দেখতন আর টুকে রাখতেন তা তাঁরাই জানেন। আমরা মজা পেতাম লম্বা লম্বা ঠ্যাং পাখি দুটোর রকম-সকম দেখে। দেখতাম কেমন করে কাঁকর সরিয়ে সরিয়ে সামান্য একটু গর্ত করে নিয়ে গোল গোল পাথর দিয়ে ঘিরে ফেলল। তারপর ডিম পাড়ল এমন ছিট ছিট রঙকরা যে আশপাশের কাঁকর ভরা জমির সঙ্গে মিশে গেল। সহজে দেখা যেত না। তবু কাছাকাছি কোনো চিল কিম্বা সাপ এসে পড়লে চট্‌ করে মাঠের ভিন দিকে সরে পড়ে পাখার ঝাপট আর কর্কশ চ্যাঁ চ্যাঁ আওয়াজে এমন তুল-কালাম শব্দ তুলত যেন ডিমগুলো আছে ঐদিকে। গবেষণার শেষে শুনলাম কিছু কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে আবহাওয়ার ব্যতিক্রমে। পুরুষ হাটিম্‌ টিম্‌ কলেরজলে গা ভিজিয়ে ডিমে তা দিত শুনে আমরা ত অবাক।

এরপর পাশের বাড়িতে দেখি একটি কালো রঙের মোটর গাড়ি আর আরও কালো একটি কুকুর পুষ্যি জুটে গেছে। এবার থেকে সাপ্তাহিক অভিযান শুরু হল চিল্কা ও নন্দন কাননে আরও ব্যাপক ভাবে পাখির গতিবিধি দেখার জন্যে।

পুষ্যিদের মধ্যে রয়েছে বন বিড়াল আর অনেক ছোট ছোট কচ্ছপ।

আমি তখন কেওঞ্ঝর, সুন্দরগড়, কোরাপুট, চেঙ্কানাল প্রভৃতি অনেক জেলাতে দুর্গম গহণ বনের ভেতর দিয়ে রাস্তা কাটিয়ে লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোম ও চুণা পাথরের আকরে নিয়ে যাচ্ছি। পাহাড়ে পাহাড়ে নদী উপত্যকায় ধাতু পাথরের খোঁজ চলেছে। ড্রিলিং হচ্ছে। সফর থেকে ফিরে এসে প্রত্যেক বুনো জানোয়ার দেখার গল্প করি।

অধ্যাপকের ইচ্ছে সকলে মিলে দেখে আসেন কিন্তু কাজ ফেলে যাওয়া হয়ে ওঠে না। সুন্দরগড়ের খণ্ডধারা আর কটক জেলার দৈটারী লোহার আকরগুলো সমুদ্র থেকে তিন হাজার ফিট উঁচুতে। অতি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায় এমনি পরিবেশে নতুন ধরনের বাংলো বাড়ি বানালাম। তখনও উৎপাদন শুরু হয়নি বলে পশু পাখির অবাধ যাওয়া আসা। জাপান ও য়ুরোপ থেকে অতিথিরা এসে মুগ্ধ হয়ে যান। অধ্যাপক কথা দিলেন আমেরিকা সফর থেকে ফিরে নিশ্চয় যাবেন।

তারপর শুনতে পেলাম তিনি ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন। সেই সময়ে রচিত একটি কবিতায় মরনোন্মুখ অধ্যাপক এই কাল ব্যাধি সম্বন্ধে যে মনোভাব প্রকাশ করেন নিয়ু স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায়, তাতে তাঁর চরিত্রের প্রকৃতি সহজেই বোঝা যায়। খুব যেন মজা হয়েছে এমন একটা ভাব।

তিনি ভুবনেশ্বরে ফিরে এসে ক্রমশঃ দুঃসহ যন্ত্রণা পেয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে এগিয়ে যান। তাঁর অনেক দরকারি কাজ অসমাপ্ত থেকে যেতে একবারমাত্র আক্ষেপ করে বলেন ইংলণ্ডের চিকিৎসকেরা মিথ্যা প্রবোধ না দিলে কিছু কিছু শেষ করতে পারতেন। তাছাড়া কখনও প্রকাশ করেন নি মনের বা দেহের কষ্ট।

মৃত্যুর রাত্রে সন্ধ্যার সময় বারান্দার ওপর তাঁর প্রিয় আরাম চেয়ারে বসেছিলেন। আমি আসতে আমার

একটা হাত দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'আমাদের জেনেটিক্স জার্ণালটা শিগগীর বার' হবে। তোমরা পড়। জঙ্গলে যাওয়া হল না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন, সুরেশকে ডেকে বললেন, 'ঐ ডানদিকের লতান গাছের কিছু ফুল মিসেস ঘোষকে দিয়ে এসো।'

পরদিন সকালে আমরা তাঁর মৃতদেহ বরফ বোঝাই একটি গাড়িতে তুলে কাকিনাড়া হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম। সেটা তিনি দান করেছিলেন পরিচিত চিকিৎসকদের কেটে কুটে দেখবার জন্যে যাতে বিজ্ঞানের কোনো সুরাহা হয়।

পাশের বাড়ির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ এইখানে শেষ হয়নি।

হেলেন ও অন্যান্য তরুণ বৈজ্ঞানিকেরা অনেকদিন থেকেই মৃত্যুর অনিবার্যতা স্বীকার করে নিয়ে নিজেদের মনকে প্রস্তুত করছিলেন, অধ্যাপকের সামনেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা হত। তাঁর সামনেই মৃত্যু সম্বন্ধে হাল্কা আলোচনা হচ্ছে দেখে বন্ধুদের কেউ কেউ, বিশেষ করে আমেরিকানেরা, ধাক্কা খেতেন মনে মনে। আমরা জানতাম মুখে যতই নির্বিকার ভাব দেখান না কেন, হেলেন কত বড় আঘাত পাবেন।

মৃত্যুর পর চোখের জল ফেলতে দেখিনি কিন্তু প্রতি মুহূর্তে হল্‌ডেন-এর গল্পে মুখর হয়ে উঠতেন। স্বামীর কাছে শোনা কত ছেলেবেলার গল্প বলতেন। গাইফক্‌স্ ডে-তে জন্মেছিলেন বলে অধ্যাপকের মজার অবধি ছিল না। কত দুষ্টামি করেছেন যে গুরুগম্ভীর মুরুব্বীদের চমকে দেওয়ার জন্য তার ইয়ত্তা নেই। সবচেয়ে প্রথম ছেলে বেলার স্মৃতি হচ্ছে উঁচু খাওয়ার টেবিলে বসে নানারকম মুখভঙ্গী করছেন। মায়ের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'মুখ থ্যাবড়া, নাক উঁচু সবরকম কুকুর হওয়ার চেষ্টা করছি।' তিনি নাকি তিন বছর বয়সেই পড়তে পারেন। পাঁচ বছর বয়সে নার্সের কাছে শেখেন জার্মান ভাষা।

অধ্যাপক বলতেন বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী পান তাঁর বাবার কাছ থেকে। প্রায় স্মরণ করতেন তাঁর সঙ্গে মেট্রোপলিটান সুড়ঙ্গ রেলপথ দিয়ে চলেছেন আর মাঝে মাঝে জানালা খুলে দুষিত বাতাসের নমুনা বোতলে পোরা হচ্ছে। দেখতেন তাই থেকে রবারের তৈরি টিয়ুব দিয়ে টেনে নিয়ে পরীক্ষা চলেছে।

অধ্যাপক প্রথম ভারতবর্ষে আসেন প্রথম মহাযুদ্ধে জখম হয়ে ১৯১৭ সালে। তখনই উর্দু ভাষার ব্যুৎপত্তি হয়। হিন্দু ধর্মেও আকৃষ্ট হন সেই সময়ে। তারপর চল্লিশ বছর পরে বিলেতের পাট চুকিয়ে দিয়ে ভারতের নাগরিক হয়ে গেলেন।

হেলেনের ভারতীয় ইতিহাস এ দর্শনে শিক্ষা শুরু হয় তাঁরই কাছে। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্‌স্টীটিউটে থাকাকালীন তিনি বৈষ্ণব ও শৈব জীবতত্ত্ব নিয়ে লিখতে শুরু করেন। সুরেশও অধ্যাপকের সঙ্গে মুখর হয়ে থাকত। অক্সফোর্ড থেকে এসেছিল জনাথন হাওয়ার্ড। মধ্যে অধ্যাপকের ভগ্নি নাওমি মিচিসনও হেলেনকে সান্ত্বনা দিতে এলেন। তারপর হাতি, বাঘ আর ভাল্লুক দেখাবার লোভ দেখিয়ে ওদের তিন্ জনকে নিয়ে গেলাম দৈতারী পাহাড়ে। তার আগে হেলেনকে নিয়ে গিছলাম খণ্ডধারা পাহাড়ে। পাহাড়ের পথে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় বৈজ্ঞানিকেরা স্থির থাকতে পারলেন না। প্রতি মুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে পরস্পরকে দেখান কোথায় কোন অদ্ভুত উদ্ভিদ, পাখির বাসা, মাকড়সার জাল, উইঢিবি, বহুরূপী—গাড়ি থেকে লাফিয়ে উচ্চৈস্বরে তাদের বিশেষত্ব ঘোষণা করতে লেগে যান।

আশে পাশে কোনো পশু থাকলেও এই সব তালকানা লোকদের কাছে দেখা দিল না।

বাংলোতে পৌঁছতে খনি ম্যানেজার এ'টি দাস দেখা করতে এসে সাম্প্রতিক ঘটিত কয়েকটি রোমহর্ষক গল্প শোনালেন পরপর দুরাত্রি প্রকাণ্ড এক বাঘ এসে হামলা করেছে তাঁর বাসার গেটের ঠিক সামনে। একদিন গুর্খা চৌকিদারকে পাহারার ঘাঁটির মধ্যে আটকে রেখে বাঘটা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বেচারা নাকি কুকরি বার করে নাড়তে থাকে আর বাঘটা কয়েক পা করে এগুতে ও পিছুতে থাকে। এটা ছাড়া একটা চিতা বাঘ এসে এই বড় বাংলোর মধ্যে থেকে কুকুর তুলে নিয়ে গেছে। তিনি আরও বললেন যে তাঁর লোকজনেরা সামনের ঐ পাহাড়ের মাথায় একটা বিরাট দন্তহীন হাতির কঙ্কাল দেখেছে।

আমি ভেবেছিলাম যে, বাঘ যখন দেখাতে পারি নি তখন টাটকা টাটকা বাঘ আসার গল্প শুনিয়ে দিলে হয়তো দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো যাবে, কিন্তু দাশের কথা শেষ হতে না হতে আমার গায়ের ওপর একটা কাঠি ফড়িং এসে বসল আর ব্যাঘ্রঝম্পের মত লাফিয়ে উঠে হেলেন সেটাকে ধরে ফেলে কেকের খালি বাক্সের মধ্যে বন্দী করে ফেললেন। সুরেশ আর জনাথন আর একটিকে কোথা থেকে ধরে নিয়ে এসে সেই বাক্সতেই ঢুকিয়ে নিল। তারপর বিজলী আলোর আকর্ষণে হরেক রকম মথ আসতে শুরু হতে তিন জনে জানোয়ার না দেখতে পাওয়ার খেদ ভুলে গেলেন। সমস্বরে অনুযোগ করলেন কীট পতঙ্গের এই ভূস্বর্গে এতদিন কেন আনি নি। হেলেনকে যখন স্মরণ করিয়ে দিলাম বহুবার নিয়ে আসতে চেয়েছি, তখন তিনি অভিমানের কণ্ঠে বললেন, 'কৈ, বাঘ দেখাতে তো পারলেন না—'

কীট সংগ্রহের উত্তেজনা কমতে ভোজনের পালা শেষ হল। বাইরের প্রশস্ত খোলা বারান্দার ওপর বসে কফি খেতে খেতে গল্প হল অধ্যাপকের বিষয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত। তারপর পাশাপাশি তিনটে ঘরে আমরা শুতে গেলাম! হেলেন আমাদের একপাশের ঘরে একা। আর এক পাশে সুরেশ আর জনাথন।

রাত্রি তখন বারোটা হবে। হেলেনের জোবালো মিহিকণ্ঠ শুনতে পেলাম, 'হু ইস্ ইট্?' কোন হ্যায়?' 'নেই মাংতা।' আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। স্ত্রী বললেন 'বোধ হয় স্বপ্নে কথা বলছে।'

সকালে উঠে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। হেলেন পাহাড়ের মাথার দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে চা খাচ্ছে। তার পাশে বসে বীণা বললে,—'এটা রাস্তা নয়?'

বললাম, 'আজ সকালে ত ঐ পথ দিয়েই উঠব—কাল রাত্রে কেউ বিরক্ত করেছিল নাকি?'

হেলেন বললে, 'কে প্রথমে আমার দরজা আর তারপর জানলা খোলবার চেষ্টা করেছিল।'

বললাম 'বীণা বলছিল—তুমি স্বপ্ন দেখেছিলে—' 'ননসেন্স, আমি তখনও লিখছিলাম।'

ততক্ষণে দেখলাম সুরেশ আর জনাথনও উঠে পড়েছে। আমরা চৌকিদারকে ডেকে পাঠালে সে বলল, হুজুর আমি তো ঐ দিকে আগুন জেলে বসে ছিলাম, কোনো মানুষ আসতে পারে না—'

আমরা তখন হেলেন-এর ঘরের দিকে গিয়ে দেখি জানালায় থাবার দাগ! সিঁড়ির নীচের ফুলের কেয়ারির উপর থাবার দাগ আরও গভীর এবং সুস্পষ্ট! তা ছাড়া কাঁটা তারের বেড়া থেকেও বাঘের গায়ের ছেঁড়া লোম পাওয়া গেল।

হেলেন বললে, আমি ভাবলাম কেউ মাতাল হয়ে এসেছে—হায় হায় একবার হালুম করে জানান দিলে পারত। নিদেন পক্ষে জানালাটা ফাঁক করে দেখে নিতাম।

সেদিনও গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ে ওঠবার সময় হাতির টাটকা পড়া ধূমায়মান মল আর ছাল ছাড়ানো বিধ্বস্ত গাছপালা ছাড়া পশুর কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। কিন্তু তরুণ বৈজ্ঞানিকেরা সেজন্য একদম ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি কারণ তাঁরা মশগুল হয়েছিলেন উদ্ভিদ আর কীট পতঙ্গ নিয়ে।

এ রাস্তা আমার হাতে গড়া। কতবার হেঁটে যাতায়াত করেছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত আকৃতির মাকড়সা কখনও চোখে পড়েনি। লতাপাতার মধ্যে এত বৈচিত্র আছে ধারণা ছিল না। সহরে গবেষণাগারের মধ্যে থেকে এদের দৃষ্টি এতখানি প্রখর হল কেমন করে ভাবতে ভাবতে মনে হল, একমাত্র বিজ্ঞানের শাসনাধীনে থাকলে দৃষ্টিশক্তি ব্যাপক হতে পারে। অধ্যাপকের কথা স্মরণ হল। তাঁর ছিল সকল বিদ্যায় সমান আগ্রহ।

সন্দেশের সম্পাদিকা আমার কাছে একবার জানতে চেয়েছিলেন জীবনের সব চেয়ে বড় এ্যাডভেঞ্চার কোথায় হয়েছিল? পূর্ব আফ্রিকার বিচিত্র মানুষ মাসাই, কিকুয়ু আর বিচিত্রতর পশু সিংহ গণ্ডার ও হায়েনার মধ্যে; না সিংভূম কেয়ঞ্জরের গহন বনে, অথবা দক্ষিণ আমেরিকার এ্যাণ্ডিস পাহাড়ে এ্যামেজন নদীর উপত্যকায় নতুবা চীন, জাপানে।

সরাসরি উত্তর দিই নি। আমি এ্যাডভেঞ্চার অন্বেষণে পরিব্রাজক নই। ধাতু পাথরের আকর খুঁজে বেড়ানো ছিল আমার পেশা। সুযোগ পেলে জঙ্গলে বাস করা ছিল নেশা।

রোমহর্ষক ঘটনা অনেক ঘটেছে কিন্তু অধ্যাপক হলডেন-এর শেষ কটা দিনের সাহচর্যকে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় এ্যাডভেঞ্চার বলে মনে করি।

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

নবম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

নভেম্বর ১৯৬৯—এপ্রিল ১৯৭০

কার্ত্তিক ১৩৭৬—চৈত্র ১৩৭৬

ফুরিয়ে যাবার আগে

তাড়াতাড়ি কিনে নাও।

পুরাতন সন্দেশ নতুন সন্দেশের সমানই মিষ্টি

মূল্য —সম্পূর্ণ বছর	সাধারণ	বাঁধানো
১৩৬৮ (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র নাই)	·৭৫	২·২৫
১৩৬৯ (বৈশাখ নাই)	১·৭৫	৩·২৫
১৩৭০ (সম্পূর্ণ বছর)	২·০০	৩·৫০
১৩৭১ (আষাঢ় নাই)	২·৭৫	৪·২৫
১৩৭২ (কার্ত্তিক নাই)	৩·৭৫	৫·২৫
১৩৭৩ (শ্রাবণ নাই)	৩·৭৫	৫·২৫
১৩৭৪ (সম্পূর্ণ বছর)	৪·০০	৫·৫০
১৩৭৫ (সম্পূর্ণ বছর)	৪·০০	৫·৫০
১৩৭৬ (সম্পূর্ণ বছর)	৫·০০	৬·৫০

দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট বা নয় বৎসরের সন্দেশ একসঙ্গে নিলে যথাক্রমে ১-২-৩-৫-৬-৮-৯ অথবা ১১ টাকা রিবেট দেওয়া হবে।
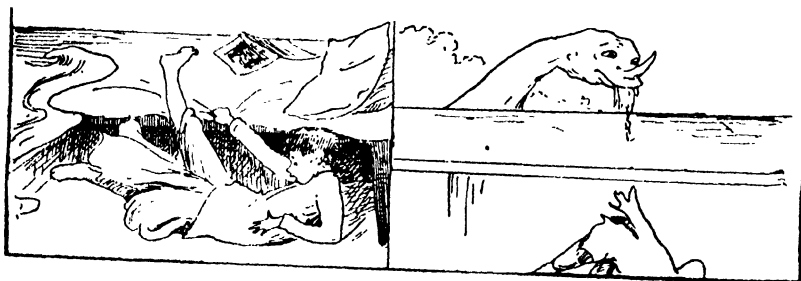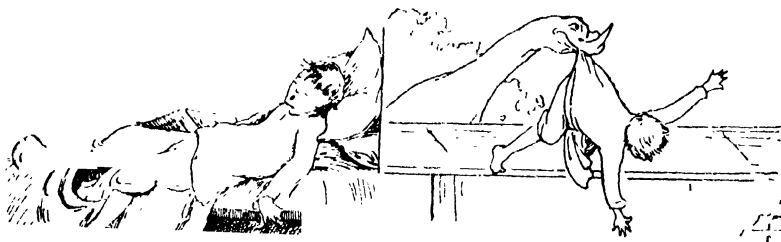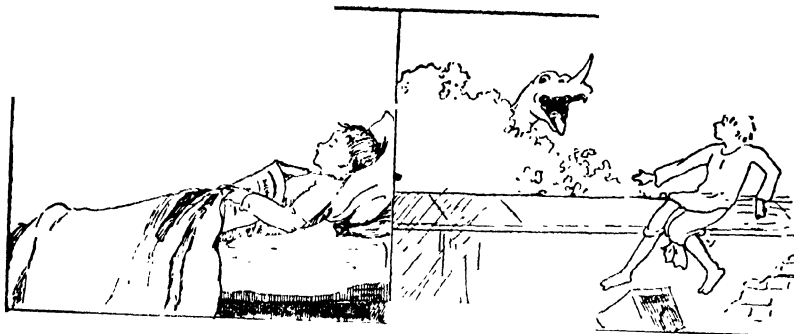
‘ঘুমের ঘোরে’

সুখলতা রাও

ঘুমের ঘোরে

সুখলতা রাও

গল্প পড়ার আশে
বইখানি নিয়ে বিছানায় শুয়ে
চোখটি বুজিয়া আসে।

স্বপ্ন দেখে সে হেন
দেয়ালেতে চড়ে মন দিয়ে পড়ে
সন্দেশ নিয়ে যেন।

হঠাৎ পিছনে তার
গলাটা বাড়িয়ে হুবহু দাঁড়িয়ে
গল্পের জানোয়ার!

বেজায় চমকে যেই
বিছানার ধারে পড়ে একেবারে
বিকট চেহারা সেই—

লাফ দিয়ে হুশ করে
নেয় তারে তুলে, শূন্যেতে ঝুলে
মাথা বন্ বন্ ঘোরে।

ফড় ফড় ফড়—ফটাং
ছিঁড়ে জামাখান হল খানখান
পড় পড় পড় পটাং।

ধাঁই করে যেই মাটি
লাগাল ধাক্কা, পড়িল পাক্কা
ঘুমের মাথায় চাঁটি।

নবম বর্ষ—সপ্তম সংখ্যা

কার্ত্তিক ১৩৭৬/নভেম্বর ১৯৬৯

(১)

টোপকী এয়ার পোর্ট ছাড়ার সাথে সাথেই আবহাওয়া ভীষণ খারাপ হয়ে পড়ল। প্রথমে ছেঁড়া ছেঁড়া হাল্কা মেঘ, তার পরেই ঘন কাল মেঘের মধ্যে পড়ে প্লেনের দিক হারিয়ে গেল। সুরু হয়ে গেল চোখ-ঝলসান বিদ্যুতের ঝিলিক। তার সাথে দিগন্ত-কাঁপান গুরু গুরু শব্দ।

ক্যাপ্টেন গাক্কা কো-পাইলট টিরুকিকে বলল—আজ কপালে দুঃখ আছে মনে হচ্ছে। মেঘ ঘনিয়ে এল কিনা ব্রান্টালুসি পাহাড়ের কোলেই।

টিরুকির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছিল।

চোখ অল্টিমিটারের উপরে রেখে বলল—ক্যাপ্টেন আমরা চোদ্দ হাজার ফিট উপর দিয়ে যাচ্ছি। ওর কথা শুনে হাসল ক্যাপ্টেন গাক্কা—ছেলেটা ভয় পেয়েছে। ভাবছে প্লেনটা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খাওয়ার ভয় করছে বুঝি ক্যাপ্টেন গাক্কা—না—তাতো নয়। ভয় অন্য জায়গায়।—ভয় ঐ চোখ ঝলসান আগুন জ্বালা বিদ্যুৎকে। ওর একটু ছোঁয়ায়…!

সে কথা আর ভাবতে পারল না কাপ্টেন গাক্কা। রেডিও অফিসার মারুটোকে হুকুম করল টান্টামোরার কণ্ট্রোল টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ করতে। রাডারের সাহায্য নিতে হবে এবার। সেটাই উচিত হবে এমন দিক অন্ধকার করা মেঘের মধ্যে।

নিচের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন গাক্কা—। ছোট ব্রান্টালুসি কি পার হয়ে এসেছে? হাত ঘড়িতে সময় দেখল একবার।—পার হয় নি এখনো। ছোট ব্রান্টালুসির মাথার উপর দিয়েই প্লেন চলেছে বোধহয়। যদিও চোখে কিছুই দেখতে পেল না। সব অন্ধকার। সময়ের হিসাব করেই বুঝতে পারল একথা।

ছোট ব্রান্টালুসি—তারপরেই বিরাট উপত্যকা জুড়ে ঘন জঙ্গল। লোকের পা পড়ে নি সেখানে আজ পর্যন্ত। তারো পরে আকাশে মাথা তুলে দৈত্যের মতন দাঁড়িয়ে আছে বড় ব্রান্টালুসি।

…বার হাজার নয়শো ফিটের মতন উঁচু। তাই পার হয়ে টণ্টামোরা রিপাব্লিকের রাজধানী—টাণ্টামোরা শহর।

নিজেই একবার অল্টিমিটার দেখল ক্যাপ্টেন গাক্কা।—নাঃ সব কিছুই ঠিক। বেঠিক কেবল ঐ চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎগুলো। বিশেষ এমন ভয়ঙ্কর ব্রান্টালুসির গোলক ধাঁধার উপরে।

রেডিও আফিসার মারুটো বলল, ক্যাপ্টেন—কণ্ট্রোল টাওয়ার।

—হালো হালো—ন'শো সাতাশ ফ্লাইট নম্বর।—প্রেসিডেন্টের স্পেসাল।—আবহাওয়া অফিসের খবরে কি বলছে।—জিজ্ঞাসা করল ক্যাপ্টেন গাক্কা।

—সাবধান। সাবধান। হঠাৎ বাতাসের চাপ কমে গেছে কুড়ি ডিগ্রী উত্তরে। প্রচণ্ড ঝড় আসছে তাই। বজ্র বিদ্যুৎ সঙ্গে নিয়ে। সোজা টাণ্টামোরার দিকে পাড়ি দাও। গতি কত? কোথায় আছ বল। জানতে চাইল কণ্ট্রোল।

—মিটারগুলোর দিকে তাকিয়ে সে সব খবর বলল ক্যাপ্টেন গাক্কা। আরও বলল—কোন দিকে দেখতে পাচ্ছি না কিচ্ছু। রাডারের সাহায্য চাই। এখনি!

—বেশ চালু কর তোমার রাডার।—সাবধান ঝড়ের গতি একশো তিন কিলোমিটার ঘণ্টায়! যাত্রী কত জানাও।

—পনেরজন স্কুলের ছেলেমেয়ে। প্রেসিডেন্টের নিমন্ত্রণে ভারত থেকে চলেছে টাণ্টামোরার স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিতে। আমাদের দেশের মানী অতিথি এরা। কণ্ট্রোল যেন ভোলে না একথা।

—না ভুলবে না। কণ্ট্রোলেরও কম চিন্তার কথা নয় এটা। সব সময়ে যোগাযোগ রাখ। শুভ কামনা রইল।

—ধন্যবাদ। উত্তর দিল ক্যাপ্টেন গাক্কা। যাক একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু বিদ্যুৎ কি বিচ্ছিরি ভাবে চমকাচ্ছে। হঠাৎ যদি একটা বাজ পড়ে প্লেনের উপরে!

এতগুলো ভিন্‌দেশী ছেলেমেয়ের জীবনের ভার তার হাতে। নাঃ, কোন অবস্থাতেই ঘাবড়ে গেলে চলবে না। তবেই সমূহ বিপদ হবে। কোপাইলট টিক্কি তো সেদিনকার ছেলে। মেঘ দেখে এখনও কপালে ওর ঘাম দেখা যায়। বিপদে পড়লে ওকেই দেখবে কে? রেডিও অফিসার মারুটো অবশ্য পুরোনো লোক। তবে এ অবস্থায় প্লেন চালানোর ব্যাপারে তার কাছে তো কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। সুতরাং যা কিছু করার তা করতে হবে একা গাক্কাকেই।

—হালো হালো—ন'শো সাতাশ ফ্লাইট। ক্যাপ্টেন গাক্কা…

—বলুন।

তোমার হিসাব ঠিক। ঠিক পথেই আসছ তুমি। তবে দুহাজার ফিট আরও উপরে উঠে যাও। মেঘ সেখানে কম। বিদ্যুতের ভয়ও কম। শুনতে পাচ্ছ?

—শুনেছি। ধন্যবাদ।

প্লেনকে আরও দুহাজার ফিট উপরে তুলে নিল ক্যাপ্টেন গাক্কা। —তারপর যন্ত্রপাতি আর রাডারের সাহায্যে সোজা উড়িয়ে নিয়ে চলল রাজধানীর দিকে। আর দু ঘণ্টা মাত্র সময় চাই। ব্যাস্। তারপরেই রাজধানী টাণ্টামোরা। হাওয়ার ধাক্কায় প্লেনটা যেন থর থর করে কাঁপছে। একশো তিন কিলোমিটারের ধাক্কা কি এসে পড়ল নাকি? তার উপরে রয়েছে হাওয়াশূন্য পকেটগুলো। তার মাঝে পড়ে প্লেনটা যেন মাঝে মাঝে গোঁত্তা খাচ্ছে।

কী যে হচ্ছে যাত্রীদের, তানুক্কাই জানে তা। তানুক্কা এ প্লেনের এয়ার হোস্টেস্।

—সব ঠিক আছে? আবার কন্ট্রোল জিজ্ঞাসা করল।

সব ঠিক। ধন্যবাদ! উত্তর দিল রেডিও অফিসার মারুটো।

ওরা থামতেই ক্যাপ্টেন গাক্কা—মাইকে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল—আমার ছোট্ট বন্ধুরা—তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমরা এখন ঝড়ের মধ্যে নিয়ে উড়ে চলেছি। এত ঝাঁকানি এত লাফানি এ শুধু তারই জন্য। তোমরা নিশ্চয়ই ঘাবড়ে যাওনি। না না—ভয়ের কিচ্ছু নেই। এ পথে আমি আজ গত ন বছরে যে কতবার যাওয়া আসা করেছি তার ঠিক নেই। এমন ঝড়ও বহুবার পেয়েছি। তবে কোন বার কোন বিপদে পড়িনি। এবারেও কিছু হবে না।—আর মাত্র দুঘণ্টা—তারপরেই তোমরা আমার সুন্দর দেশ—টণ্টামোরা রিপাবলিকের রাজধানী টাণ্টামোরা শহরে গিয়ে পৌঁছাবে। সেখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন প্রেসিডেণ্ট ব্রকেনসিল্। আর যারা টাণ্টামোরার জনসাধারণ—আমাদের স্বাধীনতা উৎসবের তোমরা অতিথি। তোমাদের এতটুকু কষ্টও আমি দেবনা। তানুক্কা তোমাদের সব কিছু দেখা শোনা করবে। এখন আমাকে তোমরা আমার কাজ করবার অনুমতি দাও।

মাইক বন্ধ হয়ে গেল। তানুক্কা হাসিমুখে গুরুদিৎ সিংএর কাছে এসে বলল—কি, তুমি ভয় পেয়েছ নাকি! ফ্যাকাসে মুখে কোনমতে হাসি টেনে এনে গুরুদিৎ বলল—ধেৎ। কে বলল।

তানুক্কা হেসে বলল, না, পাওনি ভয়। আমি জানি তোমরা সবাই খুব সাহসী।

—আমিনা খাতুন বলল—আমি একটু জল খাব দিদিমণি।

—জল! —না না—কোকাকোলা—প্লেনের ঝাঁকানি কমলেই দেব আমি। মাথায় ওর হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল তানুক্কা। ও ভগবান—বিলি গ্রাহাম বলল। এ ঝড় কি থামবে না?

—এই তো থামল বলে! কেন ভাল লাগছে না? বেশ তো দোলায় চেপেছ! হাসল তানুক্কা।

—প্লেনকে কি এখুনি কোথাও নাবিয়ে দেওয়া যায় না?—জিজ্ঞাসা করল লিজা গোমেজ।

—না গো, সুন্দরী নীল চোখ মেয়ে! হেসে বলল তানুক্কা—তোমরা জান না—এখন আমরা উড়ে চলেছি ব্রাণ্টালুসি পর্বতমালার উপর দিয়ে। পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি—মাঝে গভীর জঙ্গল। প্লেন নামবে কোথায় এখানে?

—রাজা সোম বলল—নিচে তো শুধু অন্ধকার—কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এ কোথায় এলাম আমরা? টাণ্টামোরা কত দূরে?

—এই তো এসে গেছি। মাত্র চারশ মাইল দূরে।

হামিদুল হক বলল—চারশো মাইল যেতে তো লাগবে চার'শ ঘণ্টা যা আস্তে চলেছে প্লেন তোমাদের!

প্রাণ খুলে হেসে উঠল তানুক্কা—এটা বেশ মজার কথা বলেছ তুমি। কিন্তু ঘড়ি দেখ ঠিক দেড় ঘণ্টা বাদেই পৌঁছে যাব আমরা।

রাধারাণী দাস বলল—তার থেকে তাড়াতাড়ি তো আমরা হেঁটেই চলে যেতে পারি।

শান্তা বড়দোলুই বলল—সেই ভাল—চল এমন বিচ্ছিরি প্লেন থেকে নেমে আমরা দৌড়ে চলে যাই।

শকুন্তলা তেওয়ারী বলল—হ্যাঁ দিদিমণি তুমি আমাদের নাবিয়েই দাও বরং। এ ঝাঁকানি আর ভাল লাগছে না। মুংলি টিরকে—চুপ করে বসে ওদের কথা শুনছিল এতক্ষণ, বলল—ছিঃ তোমরা সবাই ভয় পেয়েছ। তানুক্কা দিদিমণি ওদের দেশে পৌঁছে সবাইকে বলে দেবে একথা। তখন তোমাদের নিন্দা হবে মনে থাকে যেন।

কুণাল দত্ত বলল—ভয় পেয়েছি আমি! কক্ষনো না। ভয় তো পায় মেয়েরা।

প্রিয়া রায় বলল—ইঃ—ছেলেরা বুঝি সবাই বীর পুরুষ। সবাই ভয় পায়। যা ঝাঁকানী দিচ্চে প্লেনটা

টম কার্পেণ্টার বলল—ঝড়ে পড়লে অমন হবেই—আমি বই-এ পড়েছি। এ নিয়ে ভাবছ কেন তোমরা। ঝড় থামলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যত সব ভীতুর দল।

রাণা মজুমদার বলল—বাঃ, টম—সবাইকে ভীতু বলছ কেন। আমি তো দেখছি কেউই ভয় পায় নি। তবে কারও ভাল লাগছে না। এই আর কি। ভাল লাগবে কি করে বল?

তাহুক্কা বলল—নিশ্চয় কেউ ভয় পায় নি। তোমরা সিট বেল্টগুলো ঠিক করে বেঁধে রেখেছ তো?

—হ্যাঁ—সবাই এত সাথে উত্তর দিল।

—তবে আর কি। এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে।

হ্যালো ফ্লাইট ন'শো সাতাশ—হ্যালো হ্যালো। কণ্ট্রোল আবার ডাকল।

—ন'শো সাতাশ ফ্লাইট।—মারুটো জবাব দিল—কোন নতুন খবর আছে কি?

—হ্যাঁ যাত্রী তালিকা মিলিয়ে দেখতে চাই। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আদেশ। নাম আর বয়স বল।

এক কোণে রাখা নামের তালিকা নিয়ে পড়ে শোনাল রেডিও অফিসার মারুটো।

রাজা সোম বয়স আট। লিজা গোমেজ বয়স নয়। কুণাল দত্ত বয়স এগার। প্রিয়া রায় বয়স দশ। আমিনা খাতুন বয়স বার। টম কার্পেণ্টার বয়স চোদ্দ। রাণা মজুমদার—বয়স চোদ্দ, দলপতি। বিলি গ্রাহাম বয়স চোদ্দ। গুরুসিং সিং বয়স তের। হামিদুল হক বয়স তের। রুক্মিণী গণেশন বয়স বার। রাধারাণী দাস বয়স আট। শান্তা বড়দোলুই বয়স এগারো। শকুন্তলা তেওয়ারী বয়স তের। মুংলি টিরকে বয়স চোদ্দ। উপদলপতি।

—ধন্যবাদ। উত্তর দিল কণ্ট্রোল। তোমরা এখন ঠিক জঙ্গল মাজিনকোর উপর দিয়ে উড়ে চলেছ। ছোট ব্রাণ্টালুসি পিছনে পড়ে আছে।

—ধন্যবাদ বলল—মারুটো—খুব শিগগিরই বড় ব্রাণ্টালুসিও পিছনে পড়ে থাকবে।

—সে আশাই করছি আমরা—হেসে উত্তর করল হোলখ্ কণ্ট্রোল টাওয়ারের প্রধান। পরক্ষণেই চমকে উঠল ও।

এ কিসের আওয়াজ শুনতে পেল ও ফোনে। চেঁচিয়ে উঠল হোলখ,—হ্যালো হ্যালো ফ্লাইট ন'শো সাতাশ। হ্যালো—শুনতে পাচ্ছ আমাকে?

—উত্তরে অস্পষ্ট কিছু কথা যেন ভেসে এল ফোনে। তার সাথে প্রচণ্ড সব আওয়াজ। পরক্ষণেই সব নিশ্চুপ। শিউরে উঠল হোলখ্।

—হ্যালো হ্যালো ন'শো সাতাশ—কি হল তোমার।

ওদিকে যে সে কথা কেউ শুনতে পেল তেমন মনে হল না ওর। তবে কি!···কাছেই কোথাও যেন প্রচণ্ড শব্দ করে বাজ পড়ল। তাতেও বিচলিত হল না হোলখ্। উঠে দাঁড়িয়ে—কি বোর্ডের বিপদ সংকেত বোতামটা টিপে ধরল।

চারদিক থেকে সবাই ছুটে এল। হয়েছে কি!

—ফ্লাইট নশো সাতাশ—প্রেসিডেণ্টস্ স্পেশাল—হারিয়ে গেছে। রেডিওতে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বল কি? সবাই চেঁচিয়ে উঠল।

তারপর সুরু হয়ে গেল সকলের খোঁজা। রেডিওতে।

হ্যালো—হ্যালো—ন'শো সাতাশ। রাডার যন্ত্রেও আর ছায়া নেই।

* * * * * *

নানান হিসাব কসে দেখা গেল—দুর্ঘটনা যদি ঘটেই থাকে তবে তা ঘটেছে জঙ্গল মাজিনকোর ঠিক মাঝখানেই। ক্যাপ্টেন গাক্কা পাকা চালক—যদি কোন মতে প্লেনকে সামলে থাকেন তবু ঐ ঘোর জঙ্গলের মধ্যে নামবেন কোথায় ?

আর যদি অল্টিমিটারের ভুলের জন্য দুর্ঘটনা ঘটে থাকে তবে···বড় ব্রাণ্টালুসির অত উঁচু মাথাটা কি গাক্কা পার হয়ে আসতে পেরেছেন ?

হোলখ—হলফ করে বলল—প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পেয়েছে ও। তার দুটো মানে হতে পারে—এক, বড় ব্রাণ্টালুসিতে আছড়ে পড়েছে প্লেনটা। দুই—ঝড়ের মাঝে বাজ পড়েছে প্লেনে। দুটোই সমান বিপদজনক।

তবে !—মনে মনে সবাই বুঝল—এ তবে দুরাশা মাত্র। তবুও বড় ব্রাণ্টালুসির বুকে আছড়ে পড়ে ভাঙ্গার থেকে ঝড়ের বুকে বাজের হাতে পড়া হয়ত অনেক ভাল—তাতে অন্তত কিছু যাত্রীর প্রাণ বাঁচার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

কি যে হয়েছে তা অবশ্য কেউ কিছুই জানে না। শেষবারের মতন জানা গেছে ক্যাপ্টেন গাক্কা তার প্লেনকে কণ্ট্রোলের হুকুম মত অন্তত দুহাজার ফিট আরও উপরে তুলে নিয়েছিল।

তাই যদি হবে তবে তো প্লেন আসছিল অন্তত ষোল হাজার ফিট উপর দিয়ে—বড় ব্রাণ্টালুসির মাথা ছাড়িয়ে অনেক উপর দিয়ে।

যাই হোক না কেন—কণ্ট্রোলের সবার কাছে একথাটাই এখন সত্যি ফ্লাইট ন'শো সাতাশকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।—সে হারিয়ে গেছে। ছোট বড় ব্রাণ্টালুসির মাঝে গভীর জঙ্গল মাজিনকোর বুকে এখন যা করার তাই করতে হবে।

হাত ঘড়ির দিকে তাকাল হোলখ—রাত এখন প্রায় আটটা—এমন কিছু বেশী রাত নয়। কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়ে ওর মনের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল। বাইরে যে চলেছে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি। গত ক'বছরে এমন ঝড়ের চেহারা কেউ দেখেনি টণ্টামোরায়। এ ঝড় বৃষ্টিতে কে আর কি করতে পারবে ?

ওকে বাইরে তাকাতে দেখে অন্য সকলেও তাকাল বাইরের দিকে সবাই বুঝল ওর মনের কথা। সবার মুখই যেন ভয়ে শুকিয়ে গেল।

সবার মনে হল—আহা—ভীন দেশী ছেলেমেয়েগুলো আসছিল আনন্দ করতে। একি হল ভগবান—

হোলখ নিজের মনের জড়তা কাটিয়ে নিজেকে শক্ত করল—অন্য চিন্তা পরে—আগের কাজ আগে। তার উপরেই নির্ভর করছে—অনেকের বাঁচা মরা।

হুকুম করল হোলখ—তুমি টেলিফোন কর প্রেসিডেন্টের প্রধান সেক্রেটারীকে। আর তুমি এখুনি জানিয়ে দাও উদ্ধারকারী দলকে।

ফোন কর, যুদ্ধ দপ্তরকে এখুনি হেলিকপটর চাই। ঐ গভীর জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খোঁজার জন্য হাঁটা পথেও উদ্ধারকারিরা এখুনি রওনা হয়ে যাক। এক মুহূর্তও আর দেরী নয়।

সবাই টেলিফোন তুলল।

রাত নটার রেডিও খবরে—টণ্টামোরার সবাই শুনতে পেল, দুর্ঘটনার কথা। বাইরে তখনও গোঁ গোঁ করে গর্জে চলেছে ঝড়। আকাশ ভেঙ্গে ঝরছে অঝোরে বৃষ্টি।

ঘোষক বলল—আমাদের উদ্ধারকারী দল ঝড় জল মানবে না বলেছে। রাতের অন্ধকার আর খাড়া দেওয়াল ব্রান্টালুসির বাধাকে তারা আমলই দেবে না—তারা রওনা হয়ে গেছে দলে দলে।—তাদের প্রতিজ্ঞা—আমাদের ছোট্ট বিদেশী বন্ধুদের জন্য তারা সব কিছু করবে।

এমন ভীষণ ঝড়ে আকাশ পথে খোঁজ করা অসম্ভব। ঝড় থামলেই সে কাজও সুরু হয়ে যাবে।

এ ঘোষণার দশ মিনিট পরেই প্রেসিডেন্ট ব্রোকেনসিল সারা বিশ্বের উদ্দেশে বললেন—আমার নিজের ও টান্টামোরা রিপাবলিকের জনসাধারণের মনে যে আজ কী ভীষণ ব্যথা তা ভাষায় বলে বোঝাতে পারব না। সারা বিশ্বের প্রতিটি লোকের কাছে আমার অনুরোধ তারা যেন আমাদের হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট বিদেশী বন্ধুদের জন্য তাদের নিজ নিজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। আমি জানি টান্টামোরায় এখন যাদের কাজে এগোনো দরকার তাঁরা দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা তাদের সাধ্য মতন সব কিছু করবেন। আমিও নিজেও এখুনি যাচ্ছি বড় ব্রান্টালুসির পায়ের কাছের পাহাড়ি গ্রাম তিনিকায়। নিজে উপস্থিত থেকে সব কাজ পরিচালনা করব। যতক্ষণ না আমাদের ছোট্ট অতিথিদের নিরাপদে টান্টামোরায় ফিরিয়ে আনতে পারছি ততক্ষণ স্বাধীনতা উৎসবের সব কিছু বন্ধ থাকবে। ভগবান আমাদের সহায় হোন।

এ খবর বেশী রাত্রে এসে পৌঁছাল দিল্লীতে। রাষ্ট্রপতিকে ঘুম থেকে উঠিয়ে খবর শোনাল হল। তাঁর মন ব্যথায় ভরে উঠল। তারও কিছু পরে খবর কাগজওয়ালারা খবরটা হাতে নিয়ে থমকে গেল। হায় ভগবান। এ খবর ছাপাতে কি কারও ভাল লাগে। ক্রমশঃ

স্থানাভাবে শারদীয়া সংখ্যায় 'ব্রান্টালুসি দুর্ঘটনা' প্রবেশ করা সম্ভব হয় নি বলে আমরা খুবই দুঃখিত। এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে এই রোমাঞ্চকর উপন্যাসটি প্রকাশিত হবে। সঃ সঃ

যে চোরের সাজা নেই

অদ্রীশ বর্ধন

প্রতি শীতে এই কাণ্ড ঘটে। মস্কো লেনিনগ্রাদের মধ্যে পাতা টেলিফোন তার টেলিগ্রাফের দামী তারের কয়েকশো মিটার প্রতি শীতেই উধাও হয়। চোর কে, কর্তারা জানেন। কিন্তু আশ্চর্য! কেউ তাকে সাজা দেবার ব্যবস্থা করেন না।

আরও মজা আছে। গরম পড়লেই চোর তার ফিরিয়ে দিয়ে যায়। মস্কো-লেনিনগ্রাদ টেলিফোন লাইনের ৫০০ মিটার তার এইভাবে শীত পড়লেই গায়েব হয়, গরম পড়লেই ফিরে আসে।

পদার্থ বিজ্ঞানের কারচুপি যাঁরা জানেন, তাঁরা নিশ্চয় রহস্য ধরে ফেলেছেন। চোরের নাম তুষার। দারুণ ঠাণ্ডায় তুষারাহত হলো—তামার তার সঙ্কুচিত হয় আবার গরম পড়লেই বাড়ে। যে হারে বাড়ে, তা ইস্পাতের চাইতেও দেড়গুণ বেশি। কাজেই ৫০০ মিটার টেলিফোন তার উধাও হওয়া এমন কিছু নয়।

তুষার তাই সাজা পায় না। ৫০০ মিটার তার উধাও হলেও শীতে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যাহত হয় না বলে কর্তাদেরও মাথাব্যথা নেই।
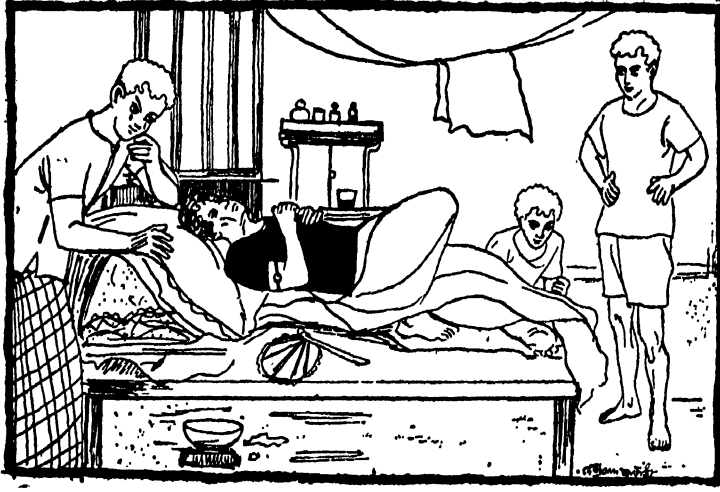
সোনার কলসি

(বলদাভীয় কাহিনী)

সুনীল সরকার

এক ছিল চাষী, তার তিন ছেলে। চাষী লোকটা ছিল পরিশ্রমী। কখনো চুপ করে বসে থাকতে পারত না সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি খাটত। আর ছেলে তিনটির বয়েস হওয়া সত্বেও কোনও কাজ করত না কেবল বসে বসে আড্ডা মারতো নয়তো নদীতে গিয়ে মাছ ধরতো।

পাড়া প্রতিবেশীরা বলত: বুড়ো বাপ খেটে খেটে মরে আর তোরা শক্ত সমর্থ ছেলে হয়েও বাপের রোজগার খাস। লজ্জা করে না?

ছেলেরা বলত: যদ্দিন বাবা আছেন তদ্দিন তো আরাম করে নিই। তারপর বাবা মরে গেলে একটা কিছু ভেবে দেখা যাবে।

এভাবে বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেল।

ইতিমধ্যে ছেলেরা আরো জোয়ান হয়ে উঠল। কিন্তু চাষী হয়ে গেল বুড়ো। তার আর খাটবার সামর্থ নেই। জমি চাষ করতে পারে না লাঙ্গল টানার শক্তি আর তার নেই। ফসল তোলা তো দূরে থাক খেত ভরে গেল আগাছায়।

ছেলেরা সব দেখে-শুনেও মাঠে যায় না। কোন কাজ করে না।

চাষী দুঃখ করে বলে: দেখ তোদের মা মারা যাবার পর বড় দুঃখ-কষ্ট করে তোদের মানুষ করেছি। তোরা বড় হয়েছিস। এবার আমার বিশ্রামের পালা। এখন তোরা কাজ করবি আর আমি বসে বসে খাব—কি বলিস?

ছেলেরা বলে : কি যে বল বাবা এখনো কি আমাদের কাজ করার মত বয়েস হয়েছে নাকি। বয়েস হোক তখন দেখবে, তোমাকে আর কোনো কাজ করতে দেব না।

চাষী আর কোন কথা বলল না। গরু আর লাঙ্গল নিয়ে মাঠে চলে গেল। সারাদিন মাঠে কাজ করে যখন বাড়ি ফিরে এলো তখন তার ভীষণ জ্বর। কোনরকমে লাঙ্গল গরু রেখে চাষী শয্যা নিল। রাত্রে তার জ্বর আরো বেড়ে গেল। ছেলেদের ডেকে বলল : ওরে, তোরা একজন বদ্যি ডেকে নিয়ে আয়। আমি বোধ হয় আর বাঁচব না।

বড় ভাই ছোট দু'জনকে বললে : ওরে তোরা বাবার কাছে থাক। আমি গিয়ে বদ্যি ডেকে আনি। আর হ্যাঁ শোন, এর মধ্যে যদি বাবা মর মর হয় তাহ'লে জিজ্ঞেস করিস, আমাদের জন্যে কি রেখে গেল। বলে বড় ভাই চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় ভাই একটি বদ্যি নিয়ে এল। সে দেখে শুনে বললে : না—আর বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই।

তিন ছেলেই তখন কাঁদতে আরম্ভ করল। বড় ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বলল : বাবা, তুমি তো আমাদের রেখে চলে যাচ্ছ। আমাদের কি উপায় হবে বল!

চাষী বললে : তোদের ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। শোন, নদীর ধারে আমাদের যে কয়েক বিঘা জমি আছে তার মধ্যে আমার সারা জীবনের সঞ্চয় এক 'কলসি সোনা' পুঁতে রেখেছি। তবে জমির কোনদিকটায় তা' আর এখন মনে পড়ছে না। বরং তোরা খুঁজে নিস। চলে চাষী ছেলেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ছেলেরা বাপের সৎকার করল। শ্রাদ্ধ করল—এমন কি, এক সপ্তাহ শোক প্রকাশ করল। কিন্তু ঘরে আর কোন খাবার নেই। যা ছিলো সব শেষ। না খেয়ে আর ক'দিন কাটানো যায়। বড় ভাই বললে : এভাবে না খেয়ে আলসের মত বসে না থেকে চল না সোনার কলসিটা খুঁজে নিয়ে আসি!

ওরা আর দেরি করল না। তিনজনে কোদাল নিয়ে চলে গেল মাঠে। গিয়ে জমি খুঁড়তে লাগল। কিন্তু সোনার কলসি আর পাওয়া যায় না। এভাবে সমস্ত জমি খুঁড়ে খুঁড়ে সোনার কলসি আর মেলে না। হাল ছেড়ে দেয় ওরা। বাড়ি চলে আসে। গরু দু'টো বিক্রি করে আরো কিছুদিন চলল।

এবার মেজো ভাই বললে : আমার মনে হয় বাবা মিথ্যে কথা বলেনি। বরং আমরা আরো চেষ্টা করে দেখতে পারি।

বড় ভাই বললে : বেশ, চল। বলে ওরা আবার তিনটি কোদাল নিয়ে মাঠে চলে গেল। এবার গভীর করে জমি খুঁড়তে আরম্ভ করল। এভাবে এক সপ্তাহ গোটা জমিগুলি খোঁড়ার পর হঠাৎ একদিন ছোট ভাই জমির নিচে আবিষ্কার করলো একটি মুখঢাকা বিরাট মাটির কলসি। ওরা সবাই মহানন্দে লাফিয়ে উঠল—কিন্তু অমনি হতাশও হল। কলসির ঢাকনা খুলে দেখল—তার মধ্যে সোনা

নেই। রয়েছে ধানের বীজ। রাগে দুঃখে ওরা কলসি ভেঙ্গে সমস্ত ধানের বীজগুলি মাঠে ছড়িয়ে দিয়ে বাড়ি চলে এল।

এরপর কয়েকমাস কাটল। বড় দুঃখ-কষ্টে দিন চলে ওদের। নদী থেকে মাছ ধরে সেই মাছ বিক্রি করে ওরা সংসার চালায়। কিন্তু তাতে একবেলার বেশি খাওয়া জোটে না।

একদিন ওরা ওদের জমির পাশে নদীর ধারে মাছ ধরতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলি। সে কি! গোটা জমিটাই দেখি ধান গাছে ভর্তি। আর সব ধানই যে পেকে গেছে এ দৃশ্য দেখে ওদের আনন্দ আর ধরে না। মহানন্দে ওরা জমির সমস্ত ধান কেটে নিয়ে এল বাড়ি। তারপর মরাই করে নিজেদের খাবার ধান রেখে বাকিটা বিক্রি করে দিয়ে পেলো প্রচুর টাকা।

বড় ভাই বললেঃ দেখ, বাবা 'সোনার কলসি' রেখে যাননি ভালই করেছেন। কারণ তাহ'লে আমরা এই সোনার ফসল পেতাম না। খাটবার শক্তিও হত না।

পালিয়ে গেছে টিয়ে

প্রণবকান্তি দাসগুপ্ত

মাঠ ছাড়িয়ে সবুজ বনে
পালিয়ে গেছে টিয়ে—
খুকুকে কাঁদিয়ে!
বলতে পার আবার টিয়ে
আসবে হেথায় কখন?…
খুকুমণির বিয়ে হবে—
বর আসবে যখন।
খুকুমণির মাথায় যখন
পড়বে ধানের শিষ
টিসটিসিয়ে টিয়ে তখন
দেবে খুসির শিস।

সাওফা (স্নেক ফার্ম)

সবিতা ঘোষ

(২)

কম্পাউণ্ডের মধ্যেই ওধারে আরো পাকাবাড়ি রয়েছে। দেখি ওখানে কি আছে, ঢুকতে দেয় কি না। ইতিমধ্যে গুটিকতক আমেরিকান ভদ্রলোক ও মহিলা আসছেন, যেন দেশের লোকের দেখা পেলাম রে! ধড়ে প্রাণ এল। যাহোক, এদের সঙ্গে কথা তো বলা যাবে।

এগিয়ে গিয়ে তিনচার জন ক্যামেরা-ঝোলানোর একজনকে ধরলাম।

বললাম আমরা 'ভেনম্ এক্‌সট্র্যাক্সশন' দেখতে এসেছি, সেটা কখন হবে, এরা কিছু জানেন নাকি। সাহেব আমার সাড়িপরা অপরূপ মূর্তির দিকে তাকিয়ে বলল বেলা তিনটেয়।

হেসে চলে গেল, ঐ পাকা ঘরগুলোর দিকে। আমি মার দিকে তাকাই, মা আমার দিকে। দশটাও বাজেনি। বেলা তিনটে অবধি থাকব কি করে? সেই চা, পাঁউরুটি খেয়ে আসা হয়েছে। টিঙ্কুর জেদ—এসেছি যখন থাকবই টুটুরও মনে হল তাই মত, যদি অবশ্য কোথাও দোকানে কিছু খেয়ে নেওয়া যায়। দোকানে তো মা কিছুই খাবেন না। মা কিন্তু তাতেই রাজি। বললেন, ছেলে, মেয়ে যদি কিছু খেয়ে এসে থাকতে পারে, আমার আপত্তি নেই। গাছতলায় বসে কাটিয়ে দেব, একবেলা ভাত না খেলে কি হবে? কিন্তু আমার মনে হল সমস্ত ব্যাপারটা শুনলে উনি খুব রাগ করবেন। সকলেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়বে। ফিরে যাওয়াই উচিত। আসার সময় রেস্টুরেন্ট গোছের কিছু তো কাছে চোখে পড়েনি। রাস্তায় প্রচণ্ড ট্র্যাফিক। আমার বাপু এত দায়িত্ব নেবার সাহস নেই! নিজেরা চা, কেক, বিস্কুট খাব, বুড়োমানুষকে অভুক্ত রেখে, কিছুতেই মনটা সায় দিল না। তার চেয়ে সবাই মিলে ফিরেই যাই!

মন স্থির করে গেটের কাছে এসেছি ট্যাক্সি ডাকব বলে। দেখি একটি স্মার্ট মত থাই ডাক্তার গলায় স্টেথস্কোপ ঝোলানো ঢুকলেন। শেষ আশা হিসেবে তাঁকে আমাদের সমস্যাটি বললাম। তিনি ইংরাজি বুঝলেন ও ইংরাজীতে উত্তর দিলেন। আমার বরাবর বিশ্বাস ছিল কোথাও কিছু ভুল থেকে যাচ্ছে। ডাক্তার সব শুনে কব্জি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন এখন দশটা, ঠিক এগারটার সময় বিষ তোলা হবে, তারপর সাপেদের খেতে দেওয়া হবে। অনেক ধন্যবাদ দিলাম ভদ্রলোককে। সকলের মুখে হাসি ফুটল। একসঙ্গে চারটি কণ্ঠ বলে উঠল, ভাগ্যিস। অর্থাৎ ভাগ্যে জিজ্ঞেস করেছিলাম! মনে বল এল, মাথায় উপস্থিত বুদ্ধি গজাল ভাবলাম, আরে, এতো ফলের দেশ, কিছু ফল কিনে খেলেই তো হয়।

হাতে ঠিক এক ঘণ্টা সময় আছে। সামনের রাস্তাটা ভীষণ চওড়া! চার ভাগে পার হতে হয়। প্রাণ হাতে নিয়ে ওপারে তো পৌছন গেল। কিন্তু কোথায় রেস্টুরেন্ট বা ফলের দোকান? আমাদের পাড়ায় দুপা যেতে না যেতেই কাফে রেস্টুরেন্ট। এ দেখি খালি বড় বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোর, স্যুভেনীর শপ, ক্যামেরার দোকান। মটর—না, না, মটর ভাজা নয়, মটর গাড়ির দোকান! টুটু বলল মা একটা গলিতে ঢুকে একটু চেষ্টা দেখা যাক্, না পেলে দুদিক ফস্কাবে, স্নেক ফার্মেই ফিরে যাব। পাশের গলিতে ঢুকে দেখি সত্যিই একটা খুব ছোট্ট রেস্টুরেন্ট, সামনেই কেক, বাদামভাজার প্যাকেট সাজানো রয়েছে। ভেতরে বেশ কিছু ফল। যাক্ বাবা বাঁচা গেল। খিদেও জোর পেয়েছে। সুন্দর কচি শাঁসভর্তী ডাব, ফ্রিজ থেকে বার করে দিল, চারজনকে চারটে। মুখটি ছোট্ট ঢাকনীর আকারে খোলা। স্ট্র (প্ল্যাস্টিকের সরু নল) দিয়েছে জলটা খাবার জন্যে। শাঁস কুরে বের করার জন্যে

চামচে। চমৎকার ব্যবস্থা। আমরা তিনজনে এর ওপরও আবার কেক খেলাম। বাদামভাজার প্যাকেট হাতব্যাগে স্টকে রইল। আর কুড়ি মিনিট সময় আছে। ধীরে সুস্থে বেরিয়ে স্নেক ফার্মের গেটে এসেই দেখি—ও বাব্বা, দরজা. বন্ধ। কিউ দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে, জনপ্রতি পাঁচবাট দিয়ে টিকিট কাটতে হচ্ছে। টিঙ্কু ফ্রি। একটা নানান সাপের রঙ্গীন ফটোগ্রাফ শুদ্ধ ছোট্ট বই সবাইকে অমনি দিল। ঢুকে দেখি সেই সাপের জায়গাগুলোর চারধারে থিক্‌থিক্‌ করছে লোক। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গিয়ে যতটা সম্ভব ঠেলেঠুলে ঢুকে পড়লাম। টিঙ্কু ছোট মানুষ, পাঁচীল ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল। আমরা তাকে চেপে ধরে রেখে গলা উঁচিয়ে দেখতে লাগলাম! ক্যামেরাওয়ালা লোকেরা টিপ করে রেডি। সত্যিই আমরা আজকাল ছবি তোলার ঝোঁক একদম কমে গেছে। অর্ধেক জায়গায় ক্যামেরা নিতে ভুলেই যাই।

একটু অপেক্ষা করতেই তিনজন লোক এলেন। একটি ডাক্তার, একটি সহকারী ও একটি বেয়ারা। তাঁরা পাঁচীলের গায়ের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। ডাক্তারের সহকারীটি ক্ষিপ্র হাতে একটা প্রকাণ্ড সাপের মাথাটা ধরে ফেললেন। বেয়ারাটি দড়ি ধরবার মত করে দুহাতে বাকী দেহটা মাটি থেকে তুলে ধরল। লেজটা ঝুলতে লাগল। ডাক্তার একটা খুব চ্যাপ্টা কাঁচের প্লেটমত এগিয়ে ধরলেন সাপের মুখের কাছে। বাইরে থেকে মাথার দুপাশে টিপে ধরে চাপ দিয়ে হাঁ করাতেই হলদে রঙের বেশ খানিকটা বমির মত বেরিয়ে এল, চা চামচের চার-চামচ আন্দাজ পরিমাণে। সেই কাচের প্লেটে জিনিসটা ধরা হল, এটাই সাপের বিষ। সাপটিকে ছেড়ে দিবার আগে, বেশ কয়েক টুকরো কাঁচা মাংস মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে কাঁচের প্রকাণ্ড নলের মধ্যে দিয়ে খানিকটা দুধ নিয়ে ঢক্‌ ঢক্‌ করে গলার ভেতর ঢেলে দিলেন। তারপর সাপটাকে ধপাস্‌ করে মাটিতে ফেলে দেওয়া হল। ও মড়ার মত পড়ে রইল। দুটোকেই এই ভাবে বিষ বের করে নিয়ে খাইয়ে দেওয়া হল। প্রথম ঘেরা জায়গার এই অতিকায় সাপগুলো কিং কোবরা।

ডাক্তারের দলটি পাশের ঘেরা জায়গায় গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গপালের মত আমরাও। ওরে বাবা, এখানে ছোটয় বড়য় মিলে শ' দুই তিন সাপ কিলবিল করছে। এরা কোবরা। ঐ রকম গোল করে খালকাটা। তাতে অসংখ্য সাপ সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছে। মাঠে তালগোল পাকিয়ে অনেকগুলো শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। আর বেঁটে বেঁটে গাছের ওপর গাদাগাদি করে ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালির মত আরো কত ঝুলছে! কাণ্ড দেখে সারা গা শিরশির করতে লাগলো। ছোট ছোট সাপগুলির গায়ে চিত্রবিচিত্র করা। ওরা বড় হলেই ক্রমে গায়ের ঐ বাহারী দাগ সব মিলিয়ে গিয়ে কুচকুচে কালো হয়ে যায়। এগুলি সবই কেউটে কোবরা বা কেউটে সাপ। কেঁচোর মত ছোট্ট থেকে সুরু করে ৬ হাত লম্বা লিক্‌লিকে সাপ; এক একটা সাপ কোন কিছু টিপ করে হঠাৎ ফণাটা চওড়া করে মাথাটাকে সোজা খাড়া করে মাটি থেকে এক ফুট, দু ফুট ওপরে তুলে রাখছে। তখন ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে!

সাপেরা তো ডাকে না। কিন্তু এক একটা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে খুব জোর হিস্‌ হিস্‌ শব্দ করে উঠছে। সাপের হিস্‌ হিস্‌ শব্দের কথা বইএ পড়েছি। তা যে এত জোর—তা ভাবিনি। এখানেও ডাক্তারের দল ঐ একই উপায়ে বিষ বের করলেন। কিন্তু এরা আকারে কিং কোবরার তুলনায় ছোট তাই বিষের পরিমাণ ও কম, প্রায় এক চা চামচে। এদের শুধু দুধ খাইয়ে দিয়ে ডাক্তারের দল চলে গেলেন। ভিড় ভেঙে গেল। তৃতীয় ঘেরা জায়গায় ব্যাণ্ডেড ক্রেট থাকার কথা, কিন্তু জায়গাটা খালি দেখলাম। ইস্কুলের ছেলেরা বই বগলে ইস্কুলে চলে গেল। আমাদের পেট কথঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হয়েছে, সুতরাং এক্ষুনি বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। আমরা কোবরার ঘেরা জায়গায় খানিকটা দাঁড়িয়ে রইলাম। অত অত সাপ, ঐ রকম স্বাভাবিক ভাবে ছাড়া থাকতে দেখিনি তো কখনো! কলকাতার চিড়িয়াখানায় কাঁচের ঘরে নির্জীব ভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি।

মফঃস্বলে যাদবপুরে, শান্তিনিকেতনে জলের মধ্যে বা ঘাসের মধ্যে কচিৎ সাপ দেখেছি, এক আধটা। এ যেন রিজার্ভ ফরেস্টে—প্রাকৃতিক আবেষ্টনীতে জন্তু দেখার মত। প্রায়ই দেখছি এক একটা বড় সাপ ক্ষুদে সাপকে লক্ষ্য করে শক্ত হয়, ফুট খানেক উঠে মাথায় ফণা ধরছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলাম। একটা বড় সাপের মুখের ভেতর একটা বাচ্চা সাপ—ওটাও এমন কিছু ছোট নয়, একফুট খানেক তো বটেই—তার মাথাটা ঢুকছে আর বের হচ্ছে। দেখে মনে হল যেন দুটোতে খেলা করছে। আমারই নজরে পড়ল। আমি সবাইকে দেখালাম। বড় সাপটা যতবারই ছোটটার মুণ্ডুখানা মুখে পুরতে যাচ্ছে, তত বারই পাশ দিয়ে মুণ্ডুটা বেরিয়ে যাচ্ছে।

বহুকাল এই কসরৎ চলছে। শেষে দেখতে দেখতে মনে হল, বড়টা ওটাকে গেলবার চেষ্টা করছে।··· ছেলেবেলার একটা ধাঁধা মনে পড়লো—দুটো সাপ যদি পরস্পরকে লেজের দিক থেকে গিলতে আরম্ভ করে তবে শেষ পর্যন্ত কি হবে—দুটোই ফুরিয়ে যাবে কি? এটা ওটাকে গিলে ফেলল, ওটা এটাকে, রইল বাকি শূন্য!! এক্ষেত্রে মুখের দিক থেকে একজন আরেককে গিলছে সুতরাং একটা থাকবেই। বড় সাপটা বেশ লম্বা। ছ'ফুট তো হবেই। সে সমস্ত শরীরটা স্থির করে রেখেছে। আর মুখটা হাঁ হয়েই আছে—আর ছোট সাপটা কোন মতেই এর কবল থেকে সমস্ত শরীরটাকে ছাড়াতে পারছে না। নিজের মাথাটা প্রাণপণ শক্তিতে বের করে রেখে ওর ঐটুকু শরীরের শক্তি অনুযায়ী খুব ঝট্‌কা দিচ্ছে, বড়টার মুখে কামড়াবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ একবার দেখি বড় সাপটা হাঁ বন্ধ করে ফেলেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছোটটার মুণ্ডুটিও নিজের মুখের ভেতর বন্ধ হয়ে গেছে। ছোটটার সমস্ত শরীরটা একবার করে থর থর করে কেঁপে উঠছে, আবার একটু স্থির হয়ে যাচ্ছে। আর ঠিক যেমন ঘড়ির ঘন্টার কাঁটাটার দিকে তাকিয়ে থাকলে সেটা নড়ছে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে এক সময় বুঝতে পারি কাঁটাটা খানিকটা সরে এসেছে, ঠিক সেই রকম আমাদের সকলের চোখ জোড়া ছোট সাপটার ওপরই নিবদ্ধ কিন্তু ওযে একটু একটু করে বড়টির পেটের ভেতর চলে যাচ্ছে তা বোঝাই যাচ্ছে না। তখনও সে কেঁপে কেঁপে উঠছে। একসময় দেখলাম অর্ধেকের ওপর অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা যাকে বলে সম্মোহিত হয়ে এ দৃশ্য দেখতে লাগলাম। টিকটিকির আরশোলা খাওয়া, বিছে খাওয়া দেখেছি। যাদবপুরে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে বর্ষাকালে জল জমলে সাপকে কইমাছ গিলতে দেখেছি। কই মাছের মাথাটি গিলে সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা হয়েছে—ফেলতেও পারছে না গিলতেও পারছে না। সাপটারই অসহায় অবস্থা। ······মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে, অন্য কোন দিকে দৃষ্টি যাচ্ছে না। চোখ জ্বালা করছে ঐ রকম একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার জন্যে, কিন্তু চোখ যেন ঐখানেই আটকে। আর ইঞ্চি দুই মাত্র বাকি। ঝটাপটি নেই, নিঃশব্দে একজনের জঠরের মধ্যে আর একজন স্বজাতি তলিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে কত কিই না মনে হতে লাগল। টিঙ্কু বলল 'উঃ আর কিছু দেখবে না মা, কতক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকব?' মা বললেন, 'আহা ঐ বাচ্চা সাপটার কি গতিই হল! এত ছোট সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউতো অমন আর কারো খপ্পরে পড়ে নি। আমার বাপু বিশ্রী লাগছে ভাবতে। কি বীভৎস দৃশ্য।'······আমার এতোক্ষণে হুঁশ হল। আচ্ছা আমি কম পাষাণ নই তো? আমি শুধু খাদ্য খাদক সম্পর্কটাই দেখেছি। কি অদ্ভুত ভাবে জ্যান্ত বাচ্চা সাপটা একটু একটু করে আর একজনের পেটের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে সেটাই উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছি, কিন্তু ওটার অবস্থা ভেবে একটুও দুঃখ বোধ এতক্ষণ হয় নি! আমার মনটা খুব শক্ত তো? আসলে আমি ওকে খাদক ছাড়া কিছু ভাবিই নি। মা বলায় এখন ভাবছি—সত্যি কি বিশ্রী ব্যাপার। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত দেথছি পৃথিবীতে একজনকে মেরে আর একজন খাচ্ছে। কিন্তু আগে মেরে ফেলে খেলে বোধ হয় জিনিসটা এমন ভয়াবহ হত না। এ যে জ্যান্ত জিনিসকে গিলে খেল!

এই সব ভাবতে ভাবতে দেখি যে ছোট্ট সাপের লেজের ডগাটুকুও আর বাইরে নেই—সবটাই অদৃশ্য। বড় সাপ তেমনি নিশ্চল পড়ে আছে! শরীরের যেটুকু অংশে ছোট সাপটা ঢুকেছে সেখানটা ফুলে রয়েছে।······

এবার আমরা গাছের ছায়ায় বেঞ্চে বসে সেই ছোট্ট বইটা পড়ে ফেললাম। এই বুকলেটটি রেডক্রসের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে বের করেছে এই স্নেক ফার্মের ও সাপের বিষয়ে সাধারণ বহু তথ্য রয়েছে। গুটি গুটি সেই পাকা বাড়ি দুটির দিকে এগোলাম। একটি বাড়িতে খণ্ড খণ্ড ফটোগ্রাফ দিয়ে, চার্ট দিয়ে বোঝানো রয়েছে কি করে 'এ্যান্টিভেনাইন' ইনজেকৃশন তৈরী হয়। ঢুকতেই থাইল্যাণ্ডের মস্ত ম্যাপ আছে, তাতে কোথায় কি জাতের সাপ আছে দেখানো আছে। ব্যাংককে দেখলাম ভাইপার কোবরায় থিক্‌থিক্ করছে। প্রতি বছর থাইল্যাণ্ডে বহু সংখ্যক লোক সাপের কামড়ে মারা যায়। রেডক্রস থেকে সাপের বিষের ওষুধ তৈরির জন্যে একটি প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা অনুভব করেন। সুতরাং সেই মতে ১৯২৩ সালে ২২শে নভেম্বর রাণী সাওফা মেমোরিয়াল ইন্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এতক্ষণে বোধগম্য হল কেন সা-ও-ফা বলে। রানীর নামের ইংরাজী বানান SAVOABHA। থাই ভাষায় 'ভ' টা 'ফ' হয়ে যায়। এইটিই পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় সাপের বিষ প্রতিষেধক ওষুধ তৈরী করার প্রতিষ্ঠান। এখন অবশ্য অনেক জায়গায় হয়েছে। খুব সম্প্রতি কলকাতাতেও হয়েছে।

এই পাকা বাড়ি দুটো মিউজিয়ামের মতো। কাচের ভিন্ন ভিন্ন জারে ওষুধ দিয়ে অনেক রকম মরা সাপ রাখা হয়েছে। অন্য বাড়িটায় নানা জাতের জ্যান্ত ছোট ছোট সাপ আছে। কিছু সাপের বাচ্চা এখানে রেখে স্নেকফার্মের জন্যে বড় করা হয়। আর বাকি বাচ্চা বড় সাপদের খাদ্য হিসেবে ওদের সঙ্গে রেখে দেয়। এই দুটি দেখে আর বইটা পড়ে যা যা জেনেছি—তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি!

চাষারা বিষাক্ত সাপ জ্যান্ত ধ'রে এনে এদের দেয় তার বদলে মোটা টাকা পায়। থাইল্যাণ্ডে সাধারণতঃ কিংকোবরা, কোবরা (কেউটে), ব্যাণ্ডেড ক্রেট (ডোরাকাটা ক্রেত সাপ), রাসেলস্ ভাইপার অর্থাৎ চন্দ্রবোড়া, কয়েক রকমের পিট্ ভাইপার, তার মধ্যে গ্রীণ ভাইপার (আমাদের লাউডগার মতো সবুজ) আর কিছু সামুদ্রিক বিষাক্ত সাপও পাওয়া যায়। নির্বিষ সাপ কামড়ালে অনেকগুলি দাঁতের দাগ পড়ে। কিন্তু বিষাক্ত সাপ কামড়ালে ঠিক দুটি বিষ দাঁতের ক্ষত হয়। সাধারণভাবে সাপ নিজের থেকে মানুষকে আক্রমণ করে না। আহত হলে আত্মরক্ষার্থে কামড়ে দেয়। সাপ রাত্রে ভাল দেখতে পায়, তাই দিনের আলোতে তত বেশি বের হয় না। সাপেদের কান নেই। তাই শব্দ শুনতে পায় না। শব্দ হলে মাটিতে যে কম্পন হয়, সাপ তার দেহ দিয়ে তাই অনুভব করে। জিভ দিয়ে সাপ গন্ধ শোঁকে। সাপ ছোট ছোট প্রাণী ইঁদুর, ব্যাঙ, পোকা মাকড় ধরে খায়। কিং কোবরা জ্যান্ত সাপ ধরে খায়। জলের সাপ মাছ খায়। এরা মরা জন্তু খেতে চায় না। একবার বেশ ভাল করে খেয়ে বেশ কয়েকদিন না খেয়ে পড়ে থাকে। শীতকালে 'হাইবারনেট' করে মানে মাস দুই ঘুমিয়ে থাকে। বেশির ভাগ সাপে ডিম পাড়ে। ভাইপারের কিন্তু একেবারে বাচ্চা হয়। সাপ বাচ্চা বেলায় ঘন ঘন, প্রায় মাসে একবার করে খোলস ছাড়ে। খোলস ছাড়ার পর গায়ের রং খুব উজ্জ্বল হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে খোলস ছাড়া কমে আসে। খোলস ছাড়ার পরই সাপ খুব চঞ্চল হয়ে ওঠে।

বিষাক্ত সাপের দুটি ফাঁপা দাঁত থাকে ওপরের চোয়ালে, সামনের দিকে, এদের বিষ দাঁত বলে। চোখের পেছনে দুটি বিষের থলি থাকে, ফাঁপা দাঁত দুটির সঙ্গে নল দিয়ে যুক্ত। বিষের থলির গ্রন্থি থেকে যে লালা নিঃসৃত হয় সেটাই সাপের বিষ। সাপ কামড়ান মাত্র, থলি থেকে বেরিয়ে, ঐ বিষ ক্ষতস্থান দিয়ে আক্রান্ত জনের শরীরে ঢুকে যায়।

সাপের টাট্‌কা বিষ টলটলে হলদে তরল পদার্থ,। একে শুকিয়ে ফেলা হয়। এই হলদে রংএর জমাট পদার্থের বিষক্রিয়া ঠিকই থাকে, দরকার মত জলে গুলে আবার তরল করে নেওয়া হয়। বিভিন্ন সাপের কামড়ে শরীরে বিভিন্ন বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কোবরা বা কেউটে সাপের কামড়ে স্নায়ুমণ্ডলী আক্রান্ত হয়। আর ভাইপার কামড়ালে বিষ রক্তে মিশে যায়। সাপে কামড়ালে দশ মিনিটের মধ্যে উপসর্গ দেখা দেয়। কেউটে কামড়ালে খুব দুর্বল, অবসন্ন লাগে। চোখ বন্ধ হয়ে আসে। কথা জড়িয়ে যায়। কোন কিছু গিলতে বা নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ক্রমে সমস্ত শরীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। শ্বাসরোধ হয়ে শেষ পর্যন্ত লোকে মারা যায়। ভাইপার কামড়ালে ক্ষত স্থান খুব লাল হয়ে ফুলে ওঠে, খুব যন্ত্রণা হয়। ক্ষত স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হয়। ভাইপারের বিষ শরীরে বেশি পরিমাণ গেলে ক্রমে দাঁতের মাড়ি দিয়ে, নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে, আর ক্রমে পায়খানা, প্রস্রাবের সঙ্গেও রক্ত পড়ে। এই ভাবে রক্তক্ষরণ হতে হতে রোগীর জ্ঞান লোপ পায় আর হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়। কিন্তু পক্ষাঘাত হয় না। অনেক সময় রোগী বেঁচে গেলেও ক্ষত স্থানে শোস হয়ে যায়, তা আর সারে না।

সাপে কামড়ালে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে ক্ষত স্থানের কাছাকাছি শক্ত করে বেঁধে দিতে হয়, যাতে বিষটা সারা শরীরে ছড়িয়ে না পড়ে। কোনরকম মাদকদ্রব্য রোগীকে দেওয়া চলবে না। দশ মিনিটের মধ্যে এ্যান্টিভেনাইন সেরাম (antivenine serum) দেওয়া দরকার। সাপের বিষ রক্তে একবার মিশলে 'বিষে বিষক্ষয়' করা এ্যান্টিভেনাইন সেরাম দেওয়া ছাড়া রোগীকে বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই। কতটা ইনজেক্‌শন কি ভাবে দিতে হবে সেটা নির্ভর করে কি জাতের সাপ, কতটা বিষ শরীরে ঢুকেছে তারই ওপর। ব্যাংককে ছয় রকম সাপের—যথা কোবরা, কিং-কোবরা, ব্যাণ্ডেড ক্রেট, রাসেলস্‌ ভাইপার, দুরকম পিট ভাইপাররে বিষ থেকে সেই সেই সাপে কামড়ানোর ওষুধ তৈরি হয়। যে জাতের সাপ কামড়েছে, সেই জাতের সাপের বিষ থেকে তৈরি সেরামই দিতে হবে। কি সাপ কামড়েছে জানা না গেলে অভিজ্ঞ ডাক্তার ক্ষত থেকে বুঝতে পারেন। এই ওষুধ থাইল্যাণ্ডের বিভিন্ন হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়। যে যে দেশে এ জাতীয় সাপের উপদ্রব আছে, সেই সেই দেশেও 'সেরাম' রপ্তানি হয়।

এক একটি সাপের বিষ অন্তত: দু'সপ্তাহ পর পর বের করতে হয়। একটি কোবরার একবারের বিষে কত লোক মরে বলা সম্ভব নয়, তবে ৫০,৩৭০ ইঁদুর, অথবা ১,০০০ খরগোস মরে। কোন সাপের বিষ বের করে নেওয়া হয়েছে, কোনটার হয় নি বোঝা যায়। চোখের পেছনেই বিষের থলি থাকে, সাপের মাথার দিকে লক্ষ্য করলে, চোখের পেছনে একটু ফোলা ঢিবির মত দেখা গেলে বুঝতে হবে বিষের থলি ভরতি আছে, বিষ বের করা হয় নি। কোবরা বা কেউটে সাপই সব চেয়ে বিষাক্ত, আর কেউটে সাপের কামড়েই সব চেয়ে বেশি লোক মরে। সুতরাং এই সেরামেরই সব চেয়ে চাহিদা বেশি। এই ইনস্টিটিউটে এই ওষুধই সব চেয়ে বেশি পরিমাণ তৈরি হয়। ঘোড়ার শরীরে ইন্‌জেক্‌শন ক'রে সাপের বিষ অতি সামান্য পরিমাণ দফায় দফায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ছয় থেকে আট মাস পর ঘোড়াটির বেশি পরিমাণ সাপের বিষ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা জন্মায়। তখন সেই ঘোড়ার শরীরের রক্ত নিয়ে সেই নির্দিষ্ট সাপের কামড়ের ওষুধ তৈরী হয়। এক জাতের সাপে কামড়ালে অন্য জাতের সাপের কামড়ের ওষুধ দিলে ফল হবে না!

কিংকোবরা সব চেয়ে বড়, এর চার মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য হতে হতে পারে। তার বিষের পরিমাণও স্বভাবতঃই বেশি। কিন্তু সম পরিমাণ বিষ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কোবরার বিষই সব চেয়ে কড়া। কিং-কোবরার দশগুণ বেশি জোরালো বিষ সাধারণ কোবরার। ডোরাকাটা ক্রেত সাপ দিনের বেলা চুপ ক'রে পড়ে থাকে। তাছাড়া তাকে খুব উত্তেজিত না করলে কামড়ায় না. কিন্তু এরাও খুবই বিষাক্ত সাপ। স্নেনফার্মে বিষ তোলার

পর জোর করে সাপেদের মাংসের টুকরো গিলিয়ে দেওয়া হয় কারণ এই সব সাপ জ্যান্ত প্রাণী ছাড়া খেতে চায় না। অথচ এত সাপের জন্যে প্রাণী রোজ জোগাড় করা সম্ভব না। তাই ঐ ভাবে জোর করেই মাংসের টুকরো খাইয়ে দিতে হয় নইলে টুকরো মাংস রেখে গেলে ওরা ছোঁবেও না। বিষ বের করার পর একটু ভাল করে খাওয়া দরকার। বিষ তোলার পর সাপেদের একটু আরাম দেবার ও শান্ত করার জন্যে দুধ খাইয়ে দেওয়া হয়, নইলে এটা কিছু একান্ত আবশ্যক নয়। ছোট জাতের সাপ আট, দশ মাসে সাবালক হয়। বড় সাপ এক থেকে দুই বছর সময় নেয়, বাচ্চা দেবার বা ডিম পাড়ার উপযুক্ত হতে। বিভিন্ন জাতের সাপ এক একবারে বিভিন্ন সংখ্যক ডিম পাড়ে। কোবরা ২০ থেকে ৩০টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে।

ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোতেও এক এক জাতের সাপ এক এক রকম সময় নেয়। ৪০ থেকে ১৩৬ দিন পর্যন্ত লাগতে পারে।

পোষা সাপের ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা করা সম্ভব হচ্ছে না। আর জ্যান্ত ছোট ভাইপারও নাকি কৃত্রিম আবেষ্টনীতে বড় করা যাচ্ছে না, মরে যাচ্ছে।

প্রথম সাক্ষাতে

অশোক চক্রবর্তী

প্রথম আয়না দেখে ছোট হবু চন্দর
হাসিতে পড়ে বা ফেটে, ভেঙিয়ে দেখায় চড়।
'আয়নারো ভেতরে
তুইটা আবার কে?
রূপের যা ছিরি—মরি, ঠিক হেন বান্দর!…
তুইও যে হাসিস্ বড়? ভেঙাস্, দেখাস্ চড়!'—
তেড়ে যায় আক্রোশে ছোটো হবু চন্দর।
কিল ছোঁড়ে আয়নায়,
কাচ ভাঙে, ফোটে গায়…
'ওমা গো,'—পালায় হবু—'কামড়েছে জব্বর!'

(পাকিস্তান থেকে এসে অরুমিতুরা সোনাপোতায় ছিল। বাবা কলকাতায় মেসে থাকতেন, হঠাৎ দুর্ঘটনায় মারা যান। ওরা সোনাপোতা ছেড়ে সিঁথির ছোট্ট বাড়িতে এল। কাছেই মামার বাড়ি। মিতু স্কুলে ভর্তি হল। মাও সেখানে সেলাই শেখাবেন। অরুর স্কুল একটু দূরে।

ক্রমে গ্রামের ছেলে অরু ক্লাসের সব চেয়ে মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত হল। বিজ্ঞানের ক্লাস অরুর সব চেয়ে ভাল লাগে। সে স্বপ্ন দেখে যে বড় হয়ে বৈজ্ঞানিক হবে। সে ব্যায়াম করে, নিজের শরীর ভাল করবার চেষ্টা করে।)

আঠারো

বছরে পর বছর কেটে গেল।

একদিন অরু এসে মাকে প্রণাম করল। সে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছে, তিনটে বিষয়ে লেটার নিয়ে।

আনন্দে মার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বললেন, 'যা তোর মামামামীকে, সীতামাসীকে প্রণাম করে আয় রূপ।'

মা আদর করে মাঝে মাঝে অরুকে রূপ বলে ডাকতেন।

মিতু সেদিন ছোটদার জন্যে অনেক কিছু রান্না করল। মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা, এবার ছোটদা কি পড়বে? ডাক্তারী, ইনজিনিয়ারিং, না বি এস-সি?'

মা চুপ করে থাকেন। ডাক্তারী ইনজিনিয়ারিং পড়তে অনেকদিন লাগে, অনেক টাকা লাগে। কোথায় পাবেন সে টাকা?

সন্ধ্যেবেলা মামা এলেন। বললেন, 'খুকী, আমি বলি কি, অরু আমার কাছে থেকে পড়ুক।

দীপুটা তো কিছু করতে পারল না। অরুকে দিয়ে যদি আমার সাধটা পূর্ণ করতে পারি, তাতেও কি তুই বাধা দিবি?'

মামার জন্যে দুঃখ হয় মিতুর। দীপুদা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে থিয়েটার নিয়ে মেতে উঠেছিল। মামা জানতে পেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরে নিজেই আবার খুঁজে নিয়ে এসেছিলেন। দীপুদা এখন সামান্য চাকরী করে। থিয়েটার টিয়েটার নিয়েই মেতে থাকে বেশিক্ষণ।

মা বলেন, 'বৌদির অতি আদরেই ছেলেটা নষ্ট হল। ওরকম বাবার ঐ ছেলে!'

মিতু ভাবে, তার ছোটদাও কি মার কাছে আদর পায় না? বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মাকে কোনদিন তাদের গায়ে হাত তুলতে দেখেনি। মার গম্ভীর ভৎর্সনাই ছিল যথেষ্ট।

—'কই কথার উত্তর দিলি না যে?' মামা মাকে বললেন।

মা কি যেন ভেবে যাচ্ছিলেন। উঠে বললেন, 'আমাকে একটু ভাবতে দাও দাদা।'

অবশেষে অরু বি এস-সিতেই ভর্তি হলো পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে। সে তাই চেয়েছিল।

কিন্তু কলেজের মাইনে অনেক বেশি। অনেক বই কিনতে হয় যার দাম স্কুলের বইএর চাইতে বেশি। মা একা কতদিক সামলাবেন? অরু চেষ্টা করে কয়েকটা টিউশন যোগাড় করে নিল।

সে সবেমাত্র হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছে। উঁচু ক্লাসের ছাত্রকে পড়াবার জন্যে তাকে কে রাখবে? কত অভিজ্ঞ শিক্ষক পাওয়া যায়। বাধ্য হয়ে সে নিচু ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র পড়ানোর টিউশন পেল অপেক্ষাকৃত কম মাইনেতে। সকাল সন্ধ্যে দুবেলায় পড়াতে হয়। অনেক রাতের আগে নিজের পড়ার বই ছোঁয়ার সময় সে পায় না।

দিনের পর দিন রাত জাগাতে তার শরীরও খারাপ হয়ে যায়। ক্লাসে লেকচারের সময় তার ঢুলুনি এসে যায়। প্রফেসরের অনেক কথা কানেই যায় না।

সেদিনও এভাবে ক্লাসে হয়ত তন্দ্রায় ঢুলে পড়ছিল। ফিজিক্সের অধ্যাপক জ্যোতির্ময়বাবু সেটা লক্ষ্য করেছিলেন সে বুঝতে পারে নি।

হঠাৎ পড়ানো বন্ধ করে জ্যোতির্ময় বাবু বললেন, 'নিউটন বলেছেন প্রতি ক্রিয়ারই একটা সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। ক্লাসে ঘুমানোর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া।'

সেদিন অরুকে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। এত অসহায় তার জীবনে কোনোদিন লাগেনি।

অনেক রাতে বই খুলে পড়তে গিয়ে তার চোখ জলে ভরে উঠলো। টপ টপ করে দু'ফোঁটা ঝরে পড়ল বইএর মধ্যের গ্যালিলিওর ছবিটার ওপর।

উনিশ

মানুষ ভাবে এক হয় আর।

বয়েস বাড়ার সংগে সংগে মার চোখটাও খুব খারাপ হয়ে গেল। চশমা নিয়েছেন। কিন্তু আগের মতো সেলাইএর কাজ করতে পারেন না। সূক্ষ্ম কাজ তো একেবারেই পারেন না।

সীতামাসী চাকরী কয়েক বছর আগেই ছেড়ে দিয়েছেন। বয়সও হয়েছিল। তাছাড়া অন্তুদাই জোরজার করে ছাড়িয়ে নিয়েছে। এখন অন্তুদাই ভালো চাকরী করে। মাকে সারাজীবনই কষ্ট করতে দেবে না।

সীতামাসী বলেন, 'তাতে কি? এখন চাকরী ছাড়লেই আমার খারাপ লাগবে। এতদিনকার অভ্যেস। সারাদিন কাটাব কি নিয়ে? বাড়িতেই বা দুজনের কাজ কত থাকবে?'

মা বলেন সীতামাসী নাকি অন্তুদাকে বিয়ে করার জন্যে বলেন। অন্তুদা কিছুতেই রাজী হয় না। অন্তুদা চাকরী ছাড়া নাইট স্কুল, ব্যায়ামের আখড়া এসব নিয়েই আছে।

সীতামাসী চাকরী ছাড়ার পরে যিনি হেডমিস্ট্রেস হলেন, তিনি একটু খিটখিটে প্রকৃতির। মাকে যে তিনি সুনজরে দেখছেন না, সেটা মিতু বুঝতে পারে।

মা বুঝতে পারেন তাঁর চাকরী করা আর বেশিদিন চলবে না। অরু কেবল হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছে। কত আশা, কত স্বপ্ন তাকে নিয়ে। মিতু তো স্কুল ছাড়াল না।

এ অবস্থায় চাকরী ছাড়লে চলবে কি করে তা তিনি বুঝতে পারেন না। সব সময় ভাবেন। শরীরও আস্তে আস্তে ভেঙে পড়তে লাগল।

মিতু সব বুঝতে পেরে ছোটদাকে বলল। অরু গম্ভীর হয়ে গেল। পরে বলল, 'আমার এখন চাকরীই করা উচিত, না রে মিতু?'

মিতু উত্তর দিতে পারে না। ছোটদার প্রতি মমতায় তার চোখ ছল ছল করে ওঠে।

মিতুই প্রথম জিনিসটা দেখল। ধোপাকে ছোটদার জামা দিতে গিয়ে পকেটে কি ঠেকল। বার করে দেখে একটা কার্ড। পোস্ট কার্ডের মতো।

ছোটদাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি রে, ছোটদা?'

মা সামনেই ছিলেন। ছোটদা যেন একটু থতমত খেয়ে গেল।

'দেখি' বলে মা ওটা হাতে নিলেন। এখন মিতু সব বুঝতে পারে। ক'দিন থেকে ছোটদা বলছিল চাকরীর জন্যে কোথায় গিয়ে কার্ড করাতে হয়। সেই কার্ডই ছোটদা করেছে।

মিতু ভেবেছিল ছোটদা চাকরীর চেষ্টা করছে জানলে মা খুব রেগে যাবেন। কিন্তু মা কিছুই বললেন না। কার্ডটা ছোটদাকে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'অনেক কিছুই আশা করেছিলাম। কিন্তু কিছুই হল না। আমার চাকরীও বেশিদিন করা সম্ভব হবে না। মিতুরও বিয়ে-থা দিতে হবে। একটা ভালো গোছের চাকরী যদি তোর হয়ে যায়। চাকরী করেও তো পড়াশোনা করে লোকে। এই তো তোর অন্তুদা চাকরী করতে করতে কতগুলো পাশ করে ফেলল।'

অরু হেসে বলে, 'মা, চাকরী করতে করতে পড়ে আই-এ-এস হওয়া যেতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না। টমাস এডিসনের যুগ তো নেই। এখন বিজ্ঞান অনেকটা এগিয়েছে।'

মিতু জানে অরুর জীবনের সাধ ছিল ইনজিনিয়ার হওয়া নয়, ডাক্তার হওয়াও নয়—বৈজ্ঞানিক হওয়া।

রাত্রে শোওয়ার সময় দুহাত জোড় করে সে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানায়, ভগবান যেন তার ছোটদার এই সাধ পূর্ণ করেন।

একদিন পরে রোগী দেখে ফেরার পথে মামা এলেন। অরু চাকরী খুঁজছে শুনে খুব রেগে গেলেন মার ওপর। মামাকে কখনো এত রাগতে দেখেনি মিতু।

মামা বললেন, 'চিরকাল তোর জেদটা নিয়েই থাকলি খুকী। ওরা একটু বড় হয় যাতে তা দেখলি না। ডাক্তারি না পড়ুক, বি-এসসিটা পাশ করুক। সেটাও হতে দিবি না?'

মা কোনো উত্তর দিতে পারেন না। মিতু জানে মামা তার মাকে খুব ভালবাসেন। যেমন ছোটদা তাকে। মাও হয়ত অরুকে মামার কাছে রাখতেন ডাক্তারী পড়ার জন্যে। মিতু এখন বড় হয়েছে। ও বুঝতে পারে ছোটদা মামার কাছে থেকে বড় ডাক্তার হোক, মামীমার সেটা ভালো লাগে না। সুমিতাদির কথাতেও তাই মনে হয়। এই তো সেদিন, মা মামীমা সকলে ছিলেন। সুমিতাদি সকলের সামনেই মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'হুঁ, সোনাপোতায় থাকলে তো মুদীর দোকান খুলতে হতো। কলকাতায় এসেই ডাক্তার হওয়ার সখ।'

মামীমা তাঁর মেয়েকে কিছু বললেন না কেন মিতু বুঝতে পারে না। মা আর কি বলবেন।

এসব কথা মা কি মামাকে বলতে পারেন?

দীপুদা অবশ্য মনখোলা লোক। অরুর ডাক্তারি পড়ার প্রস্তাব শুনে বলেছিল, 'ছাখ্ অরু, ডাক্তার হলে ডাক্তারি মেজাজটা রাখবি। বাবার মতো রোগীর বাড়ী গিয়ে তার হেঁসেলে বসে গল্প করলে সেই ডাক্তারকে রোগী বিশ্বাস করে না। এরকম ভাবে ঘরে ঢুকবি। তারপর ব্যাগটা পাশে নামিয়ে রেখে রোগীকে না ছুঁয়েই এইভাবে গম্ভীরভাবে বলবি, 'হুম। অ্যাকোয়া রেজিয়া এপ্সিলোন হিমোফিলিয়া।' তারপরে এমন করে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিবি যা পড়ে বোঝার সাধ্যি কোনো কমপাওনাদারের হবে না। রোগী তখন ভাববে সাক্ষাৎ বিধান রায়। কঠিন রোগী হলে দেখবি জল দিলেও সেরে যাচ্ছে। ওদিকে যার ইনফ্লুয়েনজা হয়েছে সে ভয়েই অক্কা পাচ্ছে। তোর তখন ভিজিটকে ভিজিট, টাকাকে টাকা।'

দীপুদার কথা শুনে অরুমিতু দুজনেই হেসে উঠল। এত হাসাতেও পারে দীপুদা।

অরু বলে, 'কমপাওনাদার কে দীপুদা?'

দীপুদা বলল, 'কেন, কমপাউণ্ডাররা। ডাক্তার যদি বত্রিশ টাকা পায়, কমপাউণ্ডার পাবে পঁচাত্তর পয়সা। অথচ কমপাউণ্ডার না এলে ডাক্তারখানার তো তারছেঁড়া ট্রামের অবস্থা।'

অরু হঠাৎ বলল, 'মামার মতো ডাক্তার যদি হতে পারতাম!'

মিতুর মনে হয়, দীপুদা মুখে যাই বলুক সেও জানে মামাকে রোগী কি দৃষ্টিতে দেখে। অনেক বড় ডাক্তারও মামাকে ফোন করে পরামর্শ চান।

কুড়ি

মিতু আজকাল বুঝতে পারে মা রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ জেগে থাকেন। ঘুমিয়ে থাকলে নিঃশ্বাসের শব্দ পড়ে, জেগে থাকলে পড়ে না। অনেকক্ষণ পর পর মার দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। মা তাদের জন্যেই সব সময় ভাবেন। মিতুর মাঝে মাঝে রাগ হয়।

বলে, 'মা সব সময় অত ভাবো কি বল তো? ওরকম করলে আমিও পড়াশোনা ছেড়ে দেব। দেখো না, আর একটু বড় হলেই আমিও চাকরী করব।'

মা ওর মাথায় হাত রেখে বলেন, 'হ্যাঁ রে, অরুটা তোকে কিছু বলে? ওকি ওর মামার কাছে থেকে ডাক্তারি পড়তে চায়? তা হলে না হয় পরের বছর—'

মার আবোল তাবোল কথায় মিতুর হাসি পায়। বলে, 'ও কোনোদিনই ডাক্তারি পড়তে চায় না। ও চেয়েছিল বিজ্ঞান পড়তে। তাই তো পড়ছিল। তবে এখন চাকরী না পেলে কিছুই পড়বে না।'

মা আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। বলেন, 'কতই বা বয়স হল। এই বয়সে চাকরী করবে তা কি আমি চেয়েছিলাম। আর চাকরী পাওয়াও কি সোজা কথা আজকাল।'

মিতু রেগে গিয়ে বলে, 'চাকরী মানেই কলমপেষা নয় মা। কতরকম কারিগরী বিদ্যা আছে। কম বয়স থেকেই শিখতে হয়। শেখার সময় মাইনে দেয়। শেখা হয়ে গেলে তো বড় চাকরী। তখন তোমার ছেলেকে দেখে কে।

মিতুর বিজ্ঞের মতো কথা শুনে মা হাসেন। পরে ভয়ের মুখে বলে ওঠেন, 'না না, কোনো কলকারখানার চাকরী আমি করতে দেব না। তারাপদবাবুর ছেলে ওরকম চাকরী করতে গিয়েই তো কলে কাপড় জড়িয়ে গিয়েছিল। কিছু করবার আগেই টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল।'

মিতু বলে, 'তোমার তো ঐ দোষ মা। যা দেখেছ শুনেছ, তাই যেন পৃথিবীতে অহোরহ হচ্ছে।'

কথা বলতে বলতে এক সময় মিতু ঘুমিয়ে পড়ে। মা শুয়ে শুয়ে ভাবেন তাঁর পোড়খাওয়া জীবনের কথা। জীবনে বড় বড় আঘাত এসে এই দুটি ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে তাঁকে অহেতুক ভীতু করে তুলছে। এদের ছেড়ে তিনি এক মুহুর্ত থাকার কথা কল্পনা করতে পারেন না।

অরু লুকিয়ে লুকিয়ে চাকরীর চেষ্টা অনেকদিন থেকেই করছিল। একদিন পিওন এসে একটা খাম দিল তার হাতে। খাম খুলেই যে চেঁচিয়ে উঠলো, 'মা, আমি চাকরী পেয়েছি।'

মা রান্না ফেলে তার কাছে এলেন। মিতুও ছুটে এল।

মা বললেন, 'কিসের চাকরী? কোথায়?'

অরু বলল, 'এই চাকরী করলে আমি হয়তো একটা লাইনে পড়াশোনার সুযোগ পাবে।'

মা বললেন, 'তা হলে তো ভালোই।'

অরু তবুও অনেকক্ষণ মার দিকে চেয়ে থাকল। বলল, 'অন্তুদাও বলছিল এ চাকরীতে পরে উন্নতি হতে পারে।'

মা বললেন, 'ভগবান আছেন। তিনি কি এত প্রার্থনা না শুনে পারেন?'

অরু আস্তে আস্তে বলল, 'কিন্তু মা—'

তারপরে আর বলতে পারছিল না। মিতু বুঝতে পারছিল না কেন দাদা ওরকম করছে।

পরে শুনল এ চাকরীটা ভালো পেলেও চলে যেতে হবে শুধু কলকাতা কেন, বাংলাদেশ থেকেও অনেক দূরে। বোম্বাইএর কাছাকাছি একটা জায়গায় থাকতে হবে দু'বছর। তারপরেও কলকাতায় ফিরবে কিনা তার কোনো ঠিক নেই। হয়ত চিরকালই বাইরে বাইরে কাটাতে হবে।

সব শুনে মা চুপ করে থাকেন।

রাত্রে খেতে বসে অরু বলল, 'আমি বলি কি মা, এ চাকরী নিয়ে দরকার নেই।'

মা বললেন, 'কেন? পরে হয়ত এরকম চাকরী পাবি না। আমিও আর কদিন। দু'বছর পরে যখন তোর পাকা চাকরী হবে তখন না হয় আমাদেরও নিয়ে যাবি, ভগবান না করুন, যদি তোর এখানে নাই আসা হয়। ততদিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

মাকে এত শক্ত হতে মিতু কোনোদিন দেখেনি। সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মার দিকে।

অরু বলে, 'আমি পূজোর সময়ই ছুটি নিয়ে চলে আসব।'

মা বলেন, 'দেখ, ক্ষতি হলে এখনই আর ছুটি নিয়ে দরকার নেই।'

মিতু রাত্তিরে অনেকক্ষণ জেগে থাকল। আর বাইশ দিন পরেই ছোটদা চলে যাবে। ছোটদাকে ছেড়ে কোনোদিন সে থাকেনি। এরপর যখন ছোটদা আসবে তখন হয়তো অন্যরকম দেখতে হয়ে যাবে। সে নিজেও তো আরো বড় হয়ে যাবে।

কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, ঠাকুর, ছোটদা যেন কলকাতাতেই চাকরী নিয়ে আসে। তখন একটা ভালো বাড়িতে উঠে যাবে। মাকেও চাকরী করতে হবে না।

তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ক্রমশঃ

* ১৩৭৬এর বৈশাখ মাস (মে ১৯৬৯) থেকে অরু-মিতুদের কথা সুরু হয়েছিল।
* সব কটি পুরোন সংখ্যাই পাওয়া যায়।
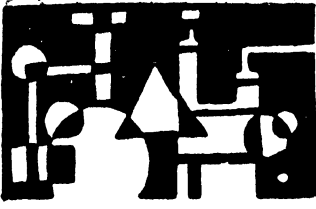
যে কাপড় পোড়ে না

অমল শঙ্কর রায়

কাপড় মাত্রই আগুনে পুড়ে যায় এই কথাই সাধারণতঃ তোমরা শুনে থাক। কিন্তু বিজ্ঞানের যুগে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও তাই। সাধারণতঃ তুলা, রেশম, পাট, শন এগুলোর তৈরী কাপড়ে আগুন লাগালে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। নাইলন ২৫০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপে গলে যায়, টেরিলিন গলে ২৬০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা তুলা, রেশম প্রভৃতি কাপড়ের উপর এমন কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য প্রলেপ দিতে পারেন যে ঐ সব তন্তুর কাপড় আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায় না। এ ধরণের কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যর নাম করছি, যেমন সোডিয়াম সিলিকেট্, সোডিয়াম টাংস্টেট্, স্ট্যানিক অকসাইড্ ইত্যাদি। এ ধরনের অদাহ্য কাপড় সাধারণতঃ সিনেমা হল, থিয়েটার বা কোন রঙ্গালয়ে ব্যবহার করা হয়, যাতে ঐ কাপড়ের কোন অংশ আগুনের সংস্পর্শে এলে সেটা পুড়ে যায় না। আর তার কোন অংশ যদি একটুখানি পোড়ে তাহলে সে আগুন ঘরময় ছড়াতে পারে না।

কাঁচও আগুনে পোড়েনা। সেজন্য কাঁচের তৈরি কাপড়কেও অদাহ্য কাপড় হিসাবে গণ্য করা হয়। তবে কাঁচের কাপড় পরাতে একটু মুস্কিল এই যে, কাঁচের তৈরি সুতা ভেঙ্গে গেলে তার টুকরো অনেক সময় শরীরের চামড়ার ভিতর ঢুকে যায় ও পরে সেগুলি বের করে ফেলা বেশ একটু মুস্কিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্যই বোধ করি কাঁচের তৈরি পোষাকের বিশেষ চল নেই।

এখন আর এক রকম তন্তুর নাম করব যেটা আগুনে পোড়ে না। ঐ তন্তুর নাম অ্যাস্‌বেস্‌টস্। এটি একটি খনিজ তন্তু। প্রাচীন গ্রীসিয় গল্পে এর উল্লেখ আছে। ইউরোপের মধ্য যুগীয় সম্রাট সার্লেমান (charlemane) অ্যাস্‌বেস্‌টসের তৈরি টেবিল ক্লথ ব্যবহার করতেন। তাঁর খাবার টেবিলের উপর প্রকাণ্ড একটা ঐ ধরণের কাপড় পাতা থাকত। আর তিনি প্রতিদিন খানা শেষ হয়ে গেলে ঐ টেবিলক্লথটা ঘর গরম রাখবার জন্য যে উনুন ব্যবহার করা হত, তার ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। নবাগত অতিথিরা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতেন, কাপড়টা আগুনে পুড়ল না। দেখে তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাতেন। কারো সাহস হত না জিজ্ঞাসা করতে কি দিয়ে ঐ কাপড়টা তৈরি।

তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে, একবার সম্রাট সার্লেমান ঐ রকম একটা ব্যাপার দেখিয়ে ইতিহাসের ধারা পর্যন্ত ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। শোনো, সে গল্প। সার্লেমানের সঙ্গে পারস্যের সম্রাট

হারুণ-অল-রসিদের রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল। রসিদের প্রতিনিধিরা সার্লেমানের রাজসভাতে আনাগোনা করতেন। এক সময়ে দুজনের ভিতরে কলহ সুরু হয় ও প্রায় যুদ্ধ লাগার অবস্থায় এসে দাঁড়ায়।· এমনি সময়ে সার্লেমান অদ্ভুত এক ভেল্কি দেখিয়ে রসিদের প্রতিনিধিদের বোকা বানিয়ে দেন। সার্লেমানের ব্রহ্মাস্ত্র ছিল ঐ অ্যাস্‌বেস্‌টসের তৈরি কাপড়। ভোজের টেবিলে সকলে বসেছেন। ভোজ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সার্লেমান টেবিলক্লথটি ছুঁড়ে ফেললেন ঘরের এক পাশে শীত নিবারণের জন্য যে উনুন ছিল তার ভিতর। দেখে উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলে হাঁ করে চেয়ে রয়েছেন। তাঁরা ভাবছেন, সম্রাটের হঠাৎ হল কি? তিনি কি আগুনে কাপড় কি ভাবে পোড়ে তাই তাদের দেখাতে চান? শেষ পর্যন্ত কি হয় তাই দেখবার জন্য তারা উৎসুক হয়ে রইলেন। দেখা গেল কাপড়টা মোটেও জ্বলে গেল না,—পূর্বে যে অবস্থায় ছিল পরেও সেই অবস্থাতে রইল। সভাসদবর্গ,—বিশেষ করে বিদেশীরা পরস্পর পরস্পরের দিকে আকাতে লাগলেন। বিদেশীরা অর্থাৎ যাঁরা হারুণের প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিলেন তারা দেশে ফিরে সম্রাটকে সার্লেমানের ইন্দ্রজালের কথা জানালেন ও বললেন সার্লেমান নিশ্চয়ই কোনো অলৌকিক শক্তি রাখেন ও সেজন্য তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা বোধ করি ঠিক হবে না। শুনে সম্রাটও আদেশ দিলেন 'যুদ্ধ বন্ধ রাখো'। সংবাদটা যখন সার্লেমানের কাছে পৌঁছল, তিনি শুনে অট্টহাস্য করে উঠলেন ও অমাত্যবর্গকে বললেন, 'তাহলে একটা ভাঁওতার জোরেই যুদ্ধ বন্ধ রাখা সম্ভব হল, কি বল?'

ঘটনাটা ঘটেছিল অষ্টম শতাব্দীতে। তখন বিজ্ঞানের প্রভাব ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সেজন্য সার্লেমানের নিকট অ্যাস্‌বেস্‌টসের ব্যবহারের কথা পৌঁছেছিল, কিন্তু হারুণের কাছে পৌঁছয়নি। তারপর ক্রমশঃ দেখা দেয় বিজ্ঞানের প্রসার। তখন মানুষকে পেয়ে বসে আবিষ্কারের নেশা। সারা পৃথিবীতে কোথায় কোন দ্রব্যের আশ্চর্যরকম গুণ আছে, তার খোঁজ তাঁরা করতে থাকেন। এর ফলে অ্যাস্‌বেস্‌টসের ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে চলে।

অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ পাওয়া যায় ক্যানাডা, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র, সাইপ্রাশ ও রোডেসিয়াতে। দ্রব্যটি আসলে কতকগুলি তন্তুর সমষ্টি। তবে ঐ তন্তু এত মসৃণ যে পাক দিয়ে এ থেকে সুতা তৈরি করা যায় না,—সঙ্গে খানিকটা পরিমাণে তুলা মেশালে তবেই তা থেকে সুতা তৈরি করা সম্ভব। পরে ঐ সুতা তাঁতে ফেলে কাপড় তৈরি করা হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে লণ্ডন সহরে অ্যাস্‌বেস্‌টসের একটি রুমাল তৈরি করা হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাশিয়াতে একটি কাপড়ের কারখানা তৈরি করা হয়। ঐ কারখানায় অ্যাস্‌বেস্‌টসের কাপড়, মোজা ও দস্তানা তৈরি হয়। ঐ সময়ে ক্যানাডাতে অ্যাসবেস্‌টসের তৈরি একটি ম্যনিব্যাগ দেখা গেছে।

আজ বিংশ শতাব্দীতে অ্যাস্‌বেস্‌টসের ব্যবহার নানা দিকে। একদিকে যেমন সুতা বা কাপড় তৈরি হচ্ছে, অপরদিকে যে সব যন্ত্রপাতিতে আগুনের ব্যবহার হয় যেখানে অ্যাস্‌বেস্‌টসের ব্যবহার হচ্ছে। কারণ দ্রব্যটি ১৮০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তাপেও পুড়ে যায় না। তোমরা জান চাঁদে দিনে যেমনি গরম, রাতে তেমনি ঠাণ্ডা। যে সব মানুষ চাঁদে যাবে তাদের অ্যাস্‌বেস্‌টসের বর্ম পরলে শরীর গরমে পুড়ে যাবে না। নিচে কাঁচের তৈরি সার্ট, উপরে অ্যাস্‌বেস্‌টসের বর্ম। ব্যাস্‌, আর চাই কি? এর দ্বারা দিব্যি আরামে মানুষ চাঁদের মাটির উপর দিয়ে হাঁটাচলা করতে পারবে। কি বল?

(সমুদ্রের তলদেশ সম্বন্ধে জানবার জন্য স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ পাড়ি দিয়েছিল, তারপরে আর ফিরে আসেনি। এই অভিযানের নেতা ছিলেন মহাপণ্ডিত ডঃ ম্যারাকট ও জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপটেন হাওসি। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত প্রাণিবিদ মিঃ সাইরাস হেডলি, ইঞ্জিনিয়ার বিল স্ক্যানল্যান ও আরো ২৩ জন।

৫ই জানুয়ারি আরাবেলা নোউল্‌স্ নামক জাহাজ হাল্কা গ্যাসে ভরা এবং বিশেষ উপাদানে তৈরি একটি ঝকঝকে গোলকের ভিতর হেডলির চিঠিতে এক অত্যাশ্চর্য বিবরণ জানতে পারা যায়।

জানা যায় যে এক ঝুলন্ত খাঁচার মতন যন্ত্রের সাহায্যে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তলায় এক গভীর খাদের ধারে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে এঁরা গভীর খাদের মধ্যে পড়ে যান এবং এক আশ্চর্য নগরীর সন্ধান পান।

সমুদ্রগর্ভে বিশাল এক 'আশ্রয় সদনে' কৃত্রিম বাতাসের সাহায্যে জীবনধারণ করে উন্নত বিজ্ঞান সম্পন্ন এক জাতি—তাদের কাছে আশ্রয় পাওয়া গেল। এরা প্রাচীন আটলান্টিসবাসীদের বংশধর।

মাণ্ডা, স্কার্পা, তাঁর মেয়ে সোনা ও বহু মেয়ে পুরুষের সঙ্গে পরিচয় হল। এরা বেশ হাসিখুশি মানুষ। এরা চলচ্চিত্রের মতন পর্দায় চিন্তার প্রতিচ্ছবির সাহায্যে আগন্তুকদের কাহিনী শুনে নিল।

ডুবুরির পোষাক পরে, সমুদ্রতল দিয়ে হেঁটে মাণ্ডা এবং আরো পাঁচজন আগন্তুকদের নিয়ে গিয়ে তাঁদের প্রধান শক্তির উৎস এক বিশাল কয়লার খনি, প্রাচীনযুগের ডুবে যাওয়া নগরী এবং আরো অনেক বিচিত্র দৃশ্য দেখালেন। আবার চলচ্চিত্রের পর্দায় নিজেদের ইতিহাস দেখালেন। বাইরের দুনিয়ায় সংবাদ পাঠাবার জন্য ম্যারাকট আটলান্টিসের রসায়নবিদদের আবিষ্কৃত অতি হালকা লাঘবজান গ্যাসের সাহায্যে কাঁচগোলকের মধ্যে করে নিজেদের অভিজ্ঞতার আদ্যোপান্ত বিবরণ লিখে ভাসিয়ে দেন।)

(এগারো)

কাঁচ-গোলকের বার্তা ইউরোপে এসে পৌঁছবামাত্রই ডাঃ ম্যারাকট ও তাঁর সঙ্গীদের উদ্ধারের জন্য একটি অভিযান কোনও সোরগোল না করে সুরু হয়ে যায়। মিঃ ফেভারজার বদান্যতার সঙ্গে 'ম্যারিয়ন' নামে তাঁর বিখ্যাত শখের জাহাজখানি এই অভিযানে ব্যবহার করবার জন্য দেন এবং নিজেও অভিযানে যোগ দেন। 'ম্যারিয়ন' জুন মাসে শেরবুর্গ হতে যাত্রা করে এবং সাউথ-হ্যাম্পটনে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি মিঃ কী অজ্‌বার্ণ ও একজন চলচ্চিত্র অপারেটরকে তুলে নিয়ে আফ্রিকার দিকে চলে যায়। মিঃ হেডলের লিপিতে যে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা দেওয়া ছিল পয়লা জুলাই 'ম্যারিয়ন' সমুদ্রের সেই অঞ্চলে গিয়ে উপস্থিত হয়।

গভীর সমুদ্রে জল মাপার জন্য যে পিয়ানো-তারের ওলন ব্যবহার করা হয় জাহাজ থেকে তা নামিয়ে দিয়ে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ওলন-তারের শেষে ভারী সীসা ছাড়া একটি বোতলও ছিল, তার ভিতর একটি বার্তা ভরে দেওয়া হয়। বার্তাটি এই :

> 'মানব-জগৎ আপনাদের লিপিখানি পেয়েছে, আমরা আপনাদের সাহায্যার্থে উপস্থিত। আমাদের এই বার্তাটি আমরা আপনাদের বেতার ট্র্যান্স্‌মিটার দ্বারাও পাঠাচ্ছি, হয়ত আপনারা পাবেন। আমরা ধীরে ধীরে যেতে থাকব। আপনারা বোতলটি খুলে নিয়ে অনুগ্রহ করে তাতে আপনাদের বার্তা ভরে দিবেন। আমরা আপনাদের নির্দেশমত কাজ করব।'

দুই দিন ধরে 'ম্যারিয়ন' সেইখানে আস্তে আস্তে টহল দিতে থাকল কিন্তু কোনও ফল দেখা গেল না। তৃতীয় দিনে এত অতি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। জাহাজ হ'তে কয়েক শ গজ দূরে একটি ছোট অতিশয় উজ্জ্বল গোলক জল হ'তে লাফিয়ে শূন্যে উঠল। দেখা গেল, 'আরাবেলা নোউল্‌স্'-এর লগ-বুকে যেরকম কাঁচ-গোলকের কথা আছে এটিও তেমনই একটি। সেটি ভাঙতে কিছু বেগ পেতে হল। ভিতরে এই বার্তাটি পাওয়া গেল :

> 'বন্ধুগণ, ধন্যবাদ। আমরা আপনাদের অসামান্য সহযোগিতা ও উদ্যমের বহু প্রশংসা করি। আপনাদের বেতার-বার্তা আমরা অনায়াসেই গ্রহণ করতে পেরেছি। কিন্তু আপনাদের ওলন-তারটি আমরা ধরতে পারিনি। স্রোতে সেটি উঁচু হয়ে আছে, তাছাড়া এত জোরে চলছে যে জলের বাধা ঠেলে আমরা কেউই তত জোরে ছুটতে পারিনি। আমরা মনে করি আগামী কাল সকাল ছয়টার সময় আমাদের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাটি করব। আমাদের গণনা অনুসারে সেদিন মঙ্গলবার, ৫ই জুলাই। আমরা একই সঙ্গে না উঠে এক একজন করে উপরে উঠব। তাহলে একজনের সুবিধা অসুবিধার কথা আপনারা বেতারে জানিয়ে অন্যদের সাবধান করে দিতে পারবেন। পুনশ্চ আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।' 'ম্যারাকট্। হেডলে। স্ক্যান্‌ল্যান্।

মিঃ কী অজবার্ণ এইবার বিবরণের সূত্রটি তুলে নিচ্ছেন। এটা তিনি বেতারে বলেন এবং

কেপ ছ ভার্দে হ'তে ইউরোপ ও আমেরিকায় 'রিলে' করা হয়।

'চমৎকার সকাল বেলাটি। নীলকান্ত মণির মত গাঢ় নীল সমুদ্র পুকুরের মত স্থির। উপরে ঘন নীল আকাশের বিরাট খিলান। 'ম্যারিয়নের' মাল্লারা আজ সকাল সকাল উঠে পড়েছিলেন, অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করছিলেন—কে জানে কি হয়! ঘড়ির কাঁটা যখন ছটার দিকে এগিয়ে এল তখন আমাদের প্রত্যাশা উৎকণ্ঠায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জাহাজের সিগনাল-মাস্টে একজনকে রাখা হয়েছিল নজর রাখবার জন্য। ছটা বাজতে যখন আর পাঁচ মিনিট আছে তার চীৎকার শুনতে পেলাম। চেয়ে দেখি সে জাহাজের সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে কি যেন দেখাচ্ছে। আমি কোনোমতে ডেকের উপরে ঝোলানো একটা নৌকায় উঠে বসলাম। সেখান থেকে বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। দেখতে পেলাম নিথর জলের ভিতর দিয়ে যেন রূপার একটী বড় বুদ্‌বুদ সমুদ্রের গভীরতার ভিতর থেকে অতি দ্রুতবেগে উপরে উঠে আসছে। জাহাজ থেকে প্রায় দুশ গজ দূরে সেটা জল থেকে লাফিয়ে বেরুল আর সোজা আকাশে উঠে গেল। দেখলাম সেটি একটি ঝকঝকে উজ্জ্বল গোলক, ফুট তিনেক হবে তার ব্যাস। অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে সেটা হাওয়ায় ভেসে চলে গেল—ঠিক খেলনার বেলুনের মত। সে এক অপরূপ দৃশ্য। কিন্তু আমাদের মন আশঙ্কায় ভরে গেল এই ভেবে যে হয়ত গোলকটি যাকে নিয়ে উপরে উঠছিল বাঁধন খুলে গিয়ে তিনি পথেই থেকে গেলেন। তখনই বেতার পাঠানো হল:

'আপনাদের দূতটি জাহাজের কাছেই এসে দেখা দিয়েছে। সঙ্গে কিছু ছিল না, সেটি উড়ে গেছে।'

'সঙ্গে সঙ্গে একটা নৌকাও নামিয়ে দেওয়া হল যাতে সব কিছুর জন্যেই প্রস্তুত থাকা যায়।

'ছটা বাজার ঠিক পরেই আমাদের চৌকিদার আবার আওয়াজ দিলে আর তার পর মুহূর্তেই দেখলাম সেই রকম আর একটি রূপালী গোলক গভীর জলের ভিতর থেকে উঠে আসছে—আগেরটির চাইতে অনেক আস্তে। উপরে এসে সেটা শূন্যে ভাসতে লাগল, কিন্তু তার বোঝাটা জলের উপরেই রইল। দেখা গেল মাছের চামড়ার তৈরী থলিতে ভরা বই কাগজপত্র ও নানারকম জিনিসের একটা প্রকাণ্ড বোঁচকা। সেটাকে ডেকের উপর তুলে আনা হল, ওদিকে বেতারে প্রাপ্তিসংবাদ দেওয়া হল। তারপর শুরু হল আরও উদগ্রীব প্রতাক্ষা।

'গেল আবার কিছুক্ষণ। তারপর আবার সেই রূপালী বুদ্‌বুদ, নিথর জলে ভাঙন লাগার চাঞ্চল্য। কিন্তু এবার ঝকঝকে গোলকটা অনেক উঁচু লাফিয়ে উঠল, আর আমরা অবাক্ হয়ে দেখলাম তার নীচে ঝুলছে একটি তন্বী নারীমূর্তি! একটুক্ষণ মাত্র, তার গোলকটা আবার নেমে পড়ল। মহিলাটিকে নৌকা করে' জাহাজের কাছে নিয়ে আসা হল। দেখা গেল কাঁচের গোলাটার উপর দিকটাতে চামড়ার একটা ছোট বেল্ট, তার থেকে লম্বা লম্বা স্ট্র্যাপ এসে তাঁর পাতলা কোমরটিকে ঘিরে একটি চওড়া বেল্টে আটকানো। তাঁর উর্ধ্বাঙ্গ একটা অদ্ভুত লম্বাটে কাঁচের ডুমে ঢাকা—আমি এটাকে কাঁচ বলছি কিন্তু এটাও সেই গোলকের মত শক্ত হালকা স্বচ্ছ জিনিসেই তৈরী। ডুমটির গায়ের ভিতর দিয়ে যেন অনেকগুলি রূপালী শিরা চলে গেছে। সেই কাঁচের ঢাকনিটা কাঁধে আর

কোমরে ইলাস্টিক্ দিয়ে এঁটে লাগানো, সেইজন্য ভিতরে মোটেই জল ঢোকে না। আর তার ভিতরে বায়ুশোধনের জন্য এক অভিনব হালকা যন্ত্র, যেরকম যন্ত্রের কথা হেডলের লিপিতে আছে। এই ডুমটি খুলতে ও মহিলাটিকে ডেকের উপর তুলতে কিছু বেগ পেতে হল। তিনি গভীরভাবে অজ্ঞান হয়েছিলেন। মনে হল জলের ভিতর দিয়ে অতিশয় দ্রুত বেগে উঠে আসা আর হঠাৎ বাতাসের চাপ কমে যাওয়াই তার কারণ। তবে তাঁর নিঃশ্বাস পড়ছিল সমান তালেই, তাই আশা হল শীঘ্রই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। বাতাসের চাপ কমে যাওয়ার কথা বললাম এইজন্য যে তাঁর কাঁচের ডুমটির ভিতরকার বাতাস বাইরের বাতাসের চাইতে অনেক বেশী ঘন। ডুবুরিরা জলের তলায় কিছুদূর অবধি নামবার পর এত বেশী চাপ অনুভব করে যে তার নীচে আর নামে না। এই কাঁচাবরণের ভিতরকার বাতাসের চাপ যেন ঠিক সেইরকম। খুব সম্ভব ইনিই সেই আটলান্টিয় নারী যাঁর কথা হেডলের লিপিতে আছে। তিনি বাস্তবিকই সুন্দরী। রং যদিও ঈষৎ শ্যাম, তাঁর মুখের গড়ন অতি চমৎকার আর সেই মুখে এমন কিছু আছে যাতে তাঁকে সমীহ করতে হয়। কুচকুচে কালো লম্বা চুল আর টানাটানা সুন্দর দুটি চোখ। সেই চোখের অপূর্ব চাউনি মেলে তিনি চারিদিকে চাইলেন। তাঁর কালো চুলে আর মাখন রঙের পোষাকে রামধনু রঙের ঝিনুকের চুমকি বসানো। অতল সিন্ধুর কোনো জলকন্যার এর চাইতে পরিপূর্ণ রূপ কল্পনা করা যায় না, সাগরের চিরন্তন রহস্যের এ যেন মূর্তিমতা মোহিনী মায়া।

ক্রমে তাঁর সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এল। হঠাৎ তিনি হরিণীর মত লঘুগতিতে ছুটে গেলেন ডেকের ধারে, ডাকতে লাগলেন 'সাইরাস্! সাইরাস্!'

'সমুদ্রের তলায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের আমরা ততক্ষণে বেতারে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে মহিলাটি নিরাপদে এসে পৌঁছেছেন। এবার তাঁরাও একজনে পর একজন উপরে এসে পৌঁছালেন। জল থেকে ত্রিশ চল্লিশ ফুট লাফিয়ে ওঠেন আর আমরা তাঁদের তুলে নিয়ে আসি। তিনজনেই অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। আর স্ক্যান্‌ল্যানের নাক-কান দিয়ে রক্ত পড়ছিল। যা হোক ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সকলে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। একদল হাসতে হাসতে স্ক্যানল্যানকে নিয়ে চলে গেল জাহাজের পানশালার দিকে। তাদের ফুর্তির হররা এখানে থেকেও শোনা যাচ্ছে আর তাতে এই বেতার ভাষণটির যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে! ডাঃ ম্যারাকট গিয়ে কাগজ-পত্রের বোঁচকাটা অধিকার করলেন আর তার ভিতর থেকে আগাগোড়া বীজগণিতের অঙ্ক-কষা একখানা কাগজ টেনে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে অদৃশ্য হলেন। আর সাইরাস হেডলে পৃথিবীর অচেনা তাঁর সেই সখীর পাশে ছুটে গেলেন।

'আশাকরি আমাদের কম জোর বেতার সত্ত্বেও শুনতে আপনাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে না। আজ এই বলে শেষ করি যে সকলেই যেমনটি আশা করছেন—এই অত্যাশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চারের কথা স্বয়ং অ্যাডভেঞ্চারীদের মুখ থেকেই আপনারা আরো খুঁটিয়ে শুনতে পাবেন।' ক্রমশঃ

---

* ম্যারাকট ডীপ সুরু হয়েছিল ১৩৭৫ এর পৌষ মাসে বা ১৯৬৯ এর জানুয়ারি থেকে।

* পুরাতন সব কয়টি সংখ্যাই এখনও পাওয়া যাচ্ছে।

সন্ধ্যা যখন হয়

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ১২২, গ্রাঃ নং ১৬১৭

উড়ে চলে যায় হাঁসেরা কত—
ছেঁড়া মেঘ ভাসে তারিমত,
আবীর ছড়িয়ে পশ্চিমে
দিবাকর নামে পাটে,
সন্ধ্যা নামছে ধীরে
পৃথিবীর এই
চেনা-অচেনা
মাঠে ঘাটে,
পাখিরা
বুঝি
বা
ফেরে
বাসায়,
তবু একা
কাকটা যেন
ডাকে—হতাশায়।
কিযে বলতে চায়
কি যে বুঝি না হায়!
কেবলি চায় ফিরে ফিরে,
ঝোপ ঝাড়েতে ফুটতে থাকে
একটি দুটি ফুল ধীরে ধীরে॥
(একাদশ-একছন্দ)

মেঘলা দিনে

মৃত্তিকা মিত্র—বয়স ১২, গ্রাহক সংখ্যা ২৩০৯

মেঘলা দিনে ঝমঝমিয়ে,
সারা আকাশ গমগমিয়ে,
বৃষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
মেঘের থেকে ঝাপুর ঝুপুর।
গাছের পাতা নড়িয়ে দিয়ে,
মাঠ ঘাট সব ধুইয়ে নিয়ে,
বিদ্যুৎ সে চিড়চিড়িয়ে
চলে আকাশ পানে ধেয়ে।
মেঘে ভরা বাদল দিনে
কাজের কথা আর ভাবিনে,

পুতুলের বিয়ে

বিপাশা দত্ত

গ্রাঃ নং ৮৯০—বয়স ৬½

কালীপূজা

শম্পা চৌধুরী

গ্রাঃ নং ১৭০৪—বয়স ৬
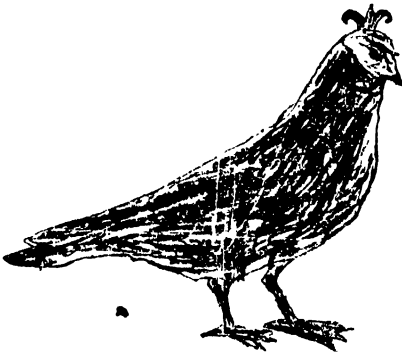
ময়না (বুনো)

মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রাহক সংখ্যা ১৪০১—বয়স ৭ বৎসর

পাখি
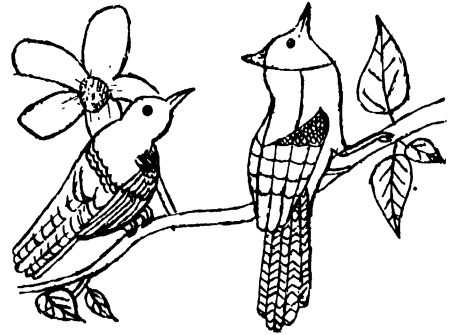
নীতিশরঞ্জন গুহ

গ্রাঃ সংখ্যা ১৬০৩—বয়স ১১

হিমাদ্রি চৌধুরী ৮৯৮, বয়স ১৩২

মাননীয় সম্পাদক মশাই,

প্রথমেই আপনাকে শুভ নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেখতে দেখতে আরও একটি বছর কেটে গেল—এল ১৩৭৬। একটি বছর যখন শেষ হয়ে যায়, ক্যালেণ্ডারের শেষ পাতাটি ছিঁড়ে ফেলি তখন মনে স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন জাগে—'কি পেলাম?' সত্যিই কি পেলাম বিগত ১৩৭৫ এর কাছে? ১৩৭৫এর প্রথমার্ধেই যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কৃতীসন্তান মানবদরদী সেনেটর রবার্ট কেনেডির জীবনের ঘটেছে করুণ পরিসমাপ্তি তখন অশ্রুসিক্ত নেত্রে বিশ্ববাসী ধিক্কার জানিয়েছে ১৩৭৫কে। ১৩৭৫ মুখ বুজে এগিয়ে চলেছে আপন পথে, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে। আবার পৃথিবীতে শোকের ছায়া নেমে এল—মারা গেলেন আকস্মিকভাবে প্রথম নভোচারী ইউরি আলেক্সিভিচ গাগারিন ও সতীর্থ ভাদিমির সেরিওগিন। আমাদের দেশের, সঙ্গীত জগতের একচ্ছত্র অধিপতি বড়েগোলাম আলিখান, প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য লোকান্তরিত হয়েছেন এই ১৩৭৫-এই। প্রকৃতির রোষে এই চলে যাওয়া বছরটিতেই উত্তরবঙ্গ হয়েছে বিধ্বস্ত, অগণিত মানুষ নিহত, নিরাশ্রয়। দুঃখের মধ্যেও ১৩৭৫ আমাদের মনে জাগিয়েছে নতুন আশা, অদম্য উৎসাহ ও ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন। চন্দ্র অভিযানের ক্ষেত্রে মানুষ এক অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে ১৩৭৫-এ ভারতের ইতিহাসে নতুন গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের যোজনা করেছেন বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খোরানা নোবেল পুরস্কার পেয়ে সর্বশেষে অসীম ধৈর্য আর সংগ্রামী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে বাঙালীর গর্ব ডিউক-পিনাকী অর্জন করেছেন অনন্য সম্মান। ১৩৭৫ দিয়েছে দুঃখ, দিয়েছে সুখ—এক কথায় দুই-ই।

খুদে গল্প

বন্দন হালদার—১৭০৬, বয়স ১৬

জেনি খুব দুষ্টু আর লোভী মেয়ে। একদিন কয়েকটা মিষ্টি চুরি গেল।

'জেনি তুমি কি মিষ্টিগুলো খেয়েছ?' তার মা শুধোন।

'আমি ওগুলোর একটা খাইনি মা,' সে বলল।

মা বললেন, 'সেকি করে হয়? আমি ঠিক ছ'টা মিষ্টি টেবিলে রেখে গেছি আর এখন একটা মাত্র পড়ে আছে।'

'হ্যাঁ মা! ঐ একটাই আমি খাইনি।'

আজব কথা

মিত্রা রায়চৌধুরী—গ্রাঃ নং ১৪২৫ বয়স ১৩

আমার সন্দেশের বন্ধুরা, আমি আজ তোমাদের এক মজার কথা শোনাব। যাদের কথা শোনাচ্ছি তারা হচ্ছে আমাদের তুলনায় অনেক ছোট প্রাণী। এরা হচ্ছে পিঁপড়ে। ছোট বলে এদের তুচ্ছ কর না, এদের বুদ্ধির কথা শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে।

ধর, কয়েকটি পিঁপড়ে দেখল একজায়গায় খানিকটা মিষ্টি আছে। কিন্তু মিষ্টির চারিধারে জল দেওয়া আছে যাতে কোন পিঁপড়ে ওটা খেয়ে ফেলতে না পারে। তখন পিঁপড়েরা ওদের বাড়িতে খবর পাঠায়—আর সেখান থেকে শ'য়ে শ'য়ে পিঁপড়ে আসতে থাকে। তখন কতগুলি পিঁপড়ে আত্মহত্যা করে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন জলের উপর দিয়ে পাত্র এর শুকনো জায়গার মধ্যে একটি সেতু হয়ে যায়। এই সেতুর উপর দিয়ে পিঁপড়েগুলো মিষ্টির কাছে চলে যায়।

তোমরা শুনলে অবাক হবে যে আমরা যেমন চাষ করি বা গরু পুষি, পিঁপড়েরাও তেমনি করে। অনেক সময় দেখে থাকবে যে, বাঁশ ইত্যাদির গায়ে ছোট ছোট ব্যাঙের ছাতা হয়েছে। এইগুলোর চাষ ঐ পিঁপড়েরাই করে—আর এই ফসল ওরাই খায়। পিঁপড়ের থেকেও ছোট একজাতীয় পোকা আছে। পিঁপড়েরা এদের ধরে নিয়ে আসে এবং এদের দেহ নিঃসৃত এক'রকম সাদা পদার্থ খায়।

আর একথাটা বোধহয় তোমরা জানই যে, যখন দুটো পিঁপড়ের দেখা হয়, তখন তারা শুঁড়ে শুঁড়ে ঠেকিয়ে পরস্পরকে নমস্কার জানায়। কিম্বা আলাপ করে।

আমরা বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ বলে গর্ব করি, কিন্তু, বলতো, যদি সামাজিকতা, অ্যাত্মত্যাগ, বুদ্ধি সবকিছু দিয়ে একটি প্রতিযোগিতা হয়, তবে কে জিতবে—মানুষ না পিঁপড়ে?

দার্জিলিং

ভাস্করপ্রসাদ সেন—গ্রাহক নং ২৩২০, বয়স ১২

অনেকদিন আগে থেকে আমরা পুজার ছুটিতে দার্জিলিং যাব ভাবছিলাম। গত বছর পুজার ছুটিতে দার্জিলিং যাওয়া ঠিক হল। আমি তারপর থেকে দিন গুণতে থাকি। আরও দিন এগিয়ে এলে ঘণ্টা গুণতে থাকি। এইভাবে আমাদের নির্দিষ্ট দিন এগিয়ে এল। আমরা ফরাক্কা থেকে লঞ্চে করে খেজুরিয়া ঘাটে গেলাম।

খেজুরিয়া থেকে ট্রেণে করে আমরা নিউজলপাইগুড়ি গেলাম। তারপর দিন ছ'টার সময়ে ছোট ট্রেণে চাপলাম। এত ছোট ট্রেণে আমায় এই প্রথম চড়া। খুব আস্তে আস্তে পাহাড়ের গা দিয়ে এঁকে বেঁকে চলতে লাগল। মাঝে মাঝে আছে ঝরণা। পাহাড়ের গায়ে মাত্র একটা লাইন। মাঝে মাঝে আছে সাইডিং লুপ ও রিভার্স। আমাদের ট্রেণটাকে একবার সাইডিংয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর ১টার সময়ে ঘুম স্টেশনে এল। পৃথিবীতে এই স্টেশনটি সব চেয়ে উঁচুতে অবস্থিত। ঘুম পর্যন্ত ট্রেণ উঠল। তারপর একটু নেমে এসে দার্জিলিং পৌছায়। আমি এই প্রথম দার্জিলিংএ এলাম।

পরদিন থেকে আমরা এখানে দর্শনীয় স্থান দেখতে আরম্ভ করলাম। প্রথম দিন দুপুর বেলায় আমরা ম্যালে গেলাম। কাছেই একটা হোটেলে আমরা খেয়ে নিলাম। তারপর বাজারে গিয়ে আমরা আমাদের বাসস্থানে ফিরে গেলাম। ৪ তারিখে আমরা বোটানিকাল গার্ডেনে গেলাম। তারপর কিছুক্ষণ বোটানিকাল গার্ডেনে ঘুরলাম। এই বাগানটি আমার খুব ভালো লাগল। তারপর আমরা একটা হোটেলে খেতে গেলাম। খাওয়ার কিছু পরে আমরা ম্যাল হয়ে আমাদের বাসস্থানে ফিরে এলাম। কিন্তু ৫ তারিখে আমরা আর বাসস্থানের বাহিরে যেতে পারলাম না। সে দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি

হ'ল। কেবল জানলার ধারে বসে রইলাম, যদি বৃষ্টি কমে। বৃষ্টি থেমে গেলে হয়তো বাড়িটার কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসা যাবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হল না। বৃষ্টিও থামল না। ৬ তারিখে আমরা জলাপাহাড়ে গেলাম। এটাই দার্জিলিংয়ের সব চাইতে উচ্চ স্থান। এখানে একটি বড় সেনাবাস আছে। ৭ তারিখে আমরা Tiger Hill, Senchal Lake, Keventer, Ghoom Monastery দেখলাম। Tiger Hillএ সূর্য-উদয় দেখবার জন্য বহু লোক এইস্থানে আসে। এখান থেকে কয়েকটি বিখ্যাত পাহাড় দেখা যায় যেমন—লাওৎসে, এভারেস্ট, থ্রি সিষ্টার্স, মাকালু এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি দেখা যায়। তারপর আমরা গেলাম Senchal Lake ; এই লেক থেকে দার্জিলিং শহরের পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। এখানে নাকি ১০৮টা ঝরণা এসে মিশেছে। ১০ তারিখে আমরা একটা মেলা দেখতে গেলাম। এটা ভ্রমণ কারিদের আনন্দ দানের জন্যই। তাছাড়া এখানে একটা পর্বত আরোহণের জন্য যা দরকার হয় তার দোকান আছে। এই জামাগুলি সাধারণ জামা অপেক্ষা অন্যরকম। ১২ তারিখে আমরা ঘুমে গেলাম এবং এদিক ওদিক ঘুরে দার্জিলিংএ ফিরে এলাম। ১৩ তারিখে আমরা Mountaineering instituteএ গেলাম। এর কাছে একটি চিড়িয়াখানা আছে। ১৪ তারিখে আমরা বাতাসিয়া লুপ দেখলাম।

তারপর ফিরে আসার সময় হল। ১৫ তারিখে দুপুর বেলায় আমরা বাসে করে নিউজলপাইগুড়িতে এলাম।

নূতন ধাঁধা

১

বাণী সরকার, বয়স—১১, গ্রাহক নং—২১৭৫

তিন অক্ষরের এমন একটি জিনিসের নাম কর যেটি প্রতি ঘরে প্রয়োজনীয়, মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে বিবাহ, অন্নপ্রাশন বা কোন বড় অনুষ্ঠানে গ্রামাঞ্চলে জলসংরক্ষণ করা হয়। প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে তার মধ্য দিয়ে ময়লা বের হয়। বলত আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস এটি কি ?

২
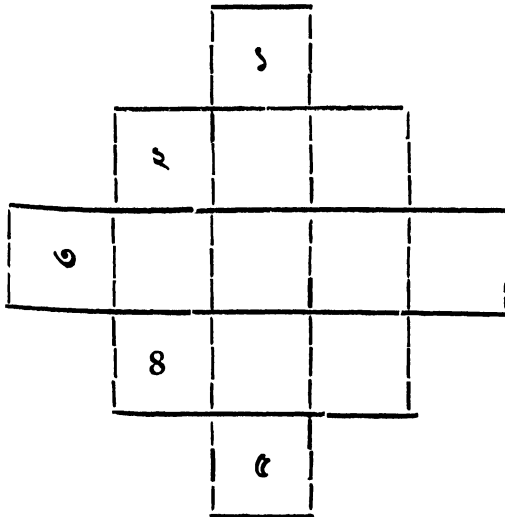
ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

গ্রাহক সংখ্যা ২০৮৪,—বয়স ১৫ বছর।

১—পাবে তারে খেলার মাঝে।

২—লিখতে চাও ? লাগবে কাজে।

৩—যাদুকরের বুলি।

৪—শান্ত করে চাষীর মন।

৫—কিছুর আগে খোঁজ ভাইবোন।

(যদি উপরের খোপগুলিতে ঠিক ঠিক শব্দ বসাতে পার তাহলে দেখবে যে উপর থেকে নিচে আর পাশাপাশি পড়লে ঠিক একই দাঁড়ায়।)

৩

সুভাশীষ ধর গ্রাহক সংখ্যা ২২০২—বয়স ১১॥ বছর

এমন একটি জিনিস যা স্বর্গেও নাই, মর্তেও নাই, কিন্তু প্রথম দুই অক্ষর আর শেষ দুই অক্ষর সবই গাছের মধ্যে পাবে।

পুস্তক পরিচয়

সুবীর চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞানের আলো জ্বাললো যারা : শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি: ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭ : দাম—তিন টাকা।

বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে আমাদের দেশে। কিন্তু বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বগুলি সহজে ব্যক্ত করার কাজটি মোটেই সহজসাধ্য নয়। এবং বিজ্ঞানকে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী করে লেখা আরও কঠিন।

মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ-র এই নতুন বইটি পড়ে রীতিমত আশ্চর্য হলাম। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ও আবিষ্কারকদের জীবনী তিনি গল্পচ্ছলে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

জীবাণুর রূপকথা, অনাক্রম্যতা ও টীকা, সিরাম আবিষ্কারের গোড়ার কথা, রোগ প্রতিরোধে শাসক বস্তুর ব্যবহার, ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী, অ্যানাসথেসিয়া ইত্যাদি আবিষ্কার ও ডা: কখ্, লুই আস্তর, স্যার রোনাল্ড রস, এডওয়ার্ড জেনার, অ্যাণ্টনি ভ্যান লিভেনহক ইত্যাদি মনীষীদের কঠোর পরিশ্রমের কাহিনী ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সুন্দর ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এই বই কিশোর কিশোরীদের যথেষ্ট প্রেরণা দেবে ও চরিত্র গঠনে সহায়তা করবে। প্রতিটি লাইব্রেরী ও স্কুলের পাঠাগারে এই পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিশোর কিশোরী ভাই বোনেদের ব্যক্তিগত সংগ্রহেও 'জ্ঞানের আলো জ্বালল যারা' একটি মূল্যবান সংযোজন হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

ডা: গুহ বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞানের প্রচুর বই লিখেছেন। তাঁর 'আকাশ ও পৃথিবী' নামক পুস্তকটি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছে। তাঁর অন্যান্য বইগুলির মত বর্তমান বইটি পাঠকমহলে সমাদৃত হলে খুশি হব।

বইটিতে সামান্য কয়েকটি ছাপার ভুল ছাড়া কোন ত্রুটি চোখে পড়ে নি। তবে প্রচ্ছদপটটি আরও আকর্ষণীয় হতে পারত।

ছড়া

ইজাজ হোসেন

নন্দবাবু দিন রাত্তির হাসেন হি-হি
পথের মাঝে কেলাব ঘরে,
সর্দি, কাশি, বিষম জ্বরে,
ঠোঁটে সদা মাখেন হাসির শব্দ মিহি।

কেউ বা যদি জিগেস করে, হাস্‌ছ বড় ?
অমনি পেটে হাত বুলিয়ে,
বলেন, আজব কি ঝুলি এ,
এত ভরছি যাচ্ছে কোথা হিসেব কর !

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

লালবিলের ধারে

জীবন সর্দার

লালবিলের ধারে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন ভোর হয় হয়। বিলের উত্তর-পুব কোণে, ঝোপের ধারে সাইকেলটাকে রেখে বাঁধের উপর গিয়ে দাঁড়ালাম।

ফাল্গুনের সকাল। একটু শীত ছিল। সূর্য উঠছে, তার আলো পড়েছে বিলের জলে। বিলের জল লালচে। কেননা, তার তলার মাটি, চারপাশের মাটি লাল। বিলের পুবে সরকারী বন—কাঁটাতারে ঘেরা। বনের গাছ বিলের ধার অবধি নেমে এসেছে কোথাও। জলের ধারে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে অন্যবন থেকে ধরে এনে ছেড়ে দেওয়া চিতল হরিণ। শান্ত হাওয়ায় গাছের পাতা দুলছে। ছোট ছোট ঢেউ উঠছে বিলের জলে। ছোট ঢেউয়ের মাথায় ভাসছে কাঠের তৈরী ছোট হাঁস। দূর থেকে বোঝা যায় না ওগুলো নকল হাঁস। বনরক্ষক বনে ছেড়েছেন হরিণ, জলে ভাসিয়েছেন কাঠের হাঁস। উনি জানেন নকল হাঁস দেখে আসল হাঁস হয়তো নেবে আসবে জলে।

বাঁধের উপর থেকে নেবে তারের বেড়ার পাশ ধরে যতটা জলের কাছে যাওয়া যায় গেলাম। সূর্য ঠিক পেছনে না, একটু বাঁ পাশে রইল। মাথার উপর পেলাম একটি সোনাঝুরি গাছের ছায়া। তারের বেড়ার ধারের শালের খুঁটিতে ভর করে দূরবীণ চোখে রেখে নজর ফেললাম জলে—

সকাল ছ'টা বেজে দশ একটা হাঁসও এলোনা। দূরবীণ নাবিয়ে আরাম করবার জন্য একটা জায়গা খুঁজছি ঠিক সেই সময় যা দেখতে চাইছিলাম তাই দেখতে পেলাম।

একটি একটি করে ছ'টি তারপর একসাথে পাঁচটা হাঁস ঝপাঝপ্ উত্তর-পশ্চিম কোন দিয়ে উড়ে এসে জলে পড়ল। সেদিকে আমার নজর ছিল না। আমার নজর ছিল সোজা পশ্চিমে। হাঁস দেখে উত্তেজনায় আমি দূরবীণ চোখে তুলতে ভুলে গেলাম। লম্বা গলা লম্বা লেজ শাদাপেট কালোপিঠ এগুলো কি হাঁস?—নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে আনমনে দূরবীণ চোখে দিতেই, কী আশ্চর্য! 'দিঘর'!

ছেলে দিঘর আর মেয়ে দিঘর মিলে মোট এগারটি আছে ঝাঁকে, গুণে দেখলাম। ছেলেদিঘরদের সহজেই চিনতে পারলাম। ওদের সুচলো লেজ, হলদে বেগুনী লম্বা মাথা। শাদা একটি রেখা চোখের পেছন থেকে গাল বেয়ে কালো ঘাড়ের পাশ দিয়ে বুকে এসে মিশেছে। গলা, বুক শাদা, পেটও শাদা। পিঠে শাদা-কালো রেখার ঢেউ আঁকা যেন। হলদেটে লেজের মাঝের পালকগুলো কালো। মেয়ে-দিঘরদের সাথে ছেলেদিঘরদের খুব সামান্য মিল। যদি এ কথা আগে না জানতুম তবে মনে হতো মেয়েদিঘর অন্য কোন জাতের হাঁস। ওদের ছেলেদিঘরের ডানার মত অত নকশা আঁকা নয়। গায়ের

রং ফ্যাকাশে হলুদ, তাতে ফ্যাকাশে ডোরা কোথাও ছিট্‌ ছিট্‌। আমি পাখিগুলোকে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করার একটু পরেই আর এক ঝাঁক দিঘর এসে নাবল। এবার নয়টি। নতুন আর পুরনো ঝাঁক এমন করে অল্প সময়ে মিশে গেল, বোঝাই গেল না আলাদা দুই ঝাঁক। খুব নির্বিকার নির্ভাবনায় ভাসছে কুড়িটি দিঘর।

তালগাছের গলায় উপর এসে বসল একটি চিল। ওটি এসে বসার সাথে সাথেই কোথা থেকে উড়ে এসে তাড়া দিল তাকে একটি টিট্টিভ। টি-টি-হট্ট, টি-টি-হট্ট শব্দে কান ঝালাপালা করে দিল টিট্টিভ পাখিটা। তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেল চিল। তার জায়গায় গিয়ে বসল টিট্টিভটি। ওখানে ওর কি সম্পদ বুঝলাম না। একটু বাদেই আবার নেবে এলো জলের ধারে। হরিণগুলো যেখানে ছিল সেখানে এসে একবার ডাক দিল টি-টি হট্টু। হরিণগুলো জলের ধার ছেড়ে বনের ভেতর চলে গেল। ঠিক তখনই, পশ্চিম আকাশ থেকে এসে বাঁধের উপর দিয়ে ঝিলমিল করে দুই সার হাঁস লাল বিলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

দুরবীণ আমার তাক করা ছিল। দিঘর নয়, ওগুলো চকাচকী। একবার তাকিয়েই বুঝলুম। দিঘর মাপে লেজ বাদ দিয়ে পাতিকাকের সমান হবে আর চকাচকী মানে পাতিকাকের প্রায় দ্বিগুণ। জলে বসার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের গায়ের লালচে বাদামী রং স্পষ্ট দেখতে পেলুম। মাথার রং ফ্যাকাশে হলুদ। ঠোঁট কালো। চকার গলার কাছে কালো রেখা।

চকীর মাথার রং চকার মাথার চেয়েও শাদা গলায় কালো রেখা নেই। চকাচকী নাৰার পর থেকেই বিলে একটু চঞ্চলতা দেখা দিল। চকাচকীরা গুণতিতে দিঘরদের ছাড়িয়ে গেল। আঠারটি চকা এগারটি চকী। ছোট ছোট ঝাঁকে এসে বিলের উত্তর পশ্চিম দিকটা দখল করে নিল চকাচকীরা।

দিঘররা যখন এসেছিল শব্দ হয়েছিল একটু। চকাচকীরা এলো নিঃশব্দে। দুইজাতের এতগুলো হাঁস একসাথে আছে কোন ডাকাডাকি চেঁচামেচি নেই। যারা জলে ভাসছে কাঠের হাঁসের মত ভাসছে —বসেই আছে একপা তুলে পিঠে ঠোঁট গুঁজে। আমি ভেবেছিলাম ওরা জলে খেলবে ডুবরে ভাসবে। কিছুই হ'লনা। আমি এমনও ভেবেছিলাম শ'য়ে শ'য়ে হাঁস আকাশ ছেয়ে এসে এখানে নামবে তাও হলো না। ঘণ্টা দুই আরো চুপচাপ বসে থেকে চুপিচুপি জলের দিকে এগোলাম। আমার চলাফেরা চকাচকীর চোখে ধরা পড়ে গেল। র-র-র রবে একসাথে সবাই উঠে গেল আকাশে। কিছু নাবল ফের লাল বিলের মাঝে, কিছু উড়ে গেল দক্ষিণে—খোলামেলা আরেকটা জলায়।

বাঁধের উপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে অনেক ঘুরে দক্ষিণের বিলটায় এসে দেখি সেখানেও অনেক হাঁস জমেছে। ওদের আর বিরক্ত না করে ফিরে এলাম এনডরু গ্রামে। সেখানে দুপুর কাটিয়ে বিকেলে লালবিলের পশ্চিমে বাঁধের উপর এসে দেখি হাঁসের সংখ্যা কমে গেছে সেখানে, দক্ষিণের বিলে বেড়েছে। সারাদিন নিরিবিলিতে সুখে কাটিয়ে সন্ধ্যায় উড়ে চললো কোথায় কে জানে! দিঘররা উড়লো তীরের মত সার বেঁধে। চকাচকী জলের উপর একপাক ঘুরে উঠে গেল অনেক উঁচুতে। যে পথে ওরা উধাও হলো আমি তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। শুধু তাকিয়ে রইলাম।

প্রকৃতি-পড়ুয়াদের দিনলিপি থেকে ঃ

মাঠ থেকে ঘাসের বীজ খুঁজে এনে, গোল চ্যাপটা পাত্রের ভেতর মাটি রেখে বুনে দিয়ে, জুলাই মাসে একুশ দিন ধরে লক্ষ্য করে কি দেখেছে লিখে জানিয়েছে—প্রকৃতি পড়ুয়া।

উজ্জ্বলকুমার চক্রবর্তী আর উৎপলকুমার চক্রবর্তী ঃ

৭।৭।৬৯। আজ চার রকমের ঘাসের বীজ, সংগ্রহ করলাম। একটি দূর্বাঘাস অন্যটির নাম দিলাম 'দীর্ঘপত্র'। বাকি দুটোতেই ফুল ফোটে। একটির ফুল ছোট কাশফুলের মত—রং শাদা। ফুলের গায়ে হলদে হলদে রেণুর মত লেগে থাকে। আরেক রকম ঘাসের এক থেকে দেড়ফুট উঁচু ডাঁটিতে তিন বা তার বেশি সরু সরু ডাঁটি বেরোয়। দুপাশে থাকে আটাশ বা তার বেশি প্রায় গোলাকার বীজগুলি।

১৩।৭।৬৯। সাতই জুলাই যে ঘাসের বীজ বুনেছিলাম আজ দেখলাম তাতে ঘাসের পাতা বেরিয়েছে। খুব ছোট ছোট দুটো ঘাস। আতস কাঁচ দিয়ে পরীক্ষা করে মনে হল দুটি দু জাতের।

১৪।৭।৬৯। দুটির বাড়বার গতি দুরকমের। একটি দেড় সেঃ মিঃ লম্বা হয়েছে সেটির পাতা কলিতেই বেরিয়েছিল। একটি হয়েছে দু' সেঃ মিঃ দু'টি একেবারেই ভিন্নপ্রজাতির। যে দু' সেঃ মিঃ বেড়েছিল সেটি আজ সন্ধ্যায় মেপে দেখলাম বেড়ে হয়েছে—পাঁচ সেঃ মিঃ। দেখা যাচ্ছে এ জাতীয় ঘাস খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। আর যেটি দেড় সেঃ মিঃ ছিল সেটি বেড়ে হয়েছে আড়াই সেঃ মিঃ।

১৫।৭।৬৯। একটা ঘাসের দু'পাশে পাতা বেরিয়ে দুদিকে চলে গেছে। উপরের পাতাটা চার সেঃ মিঃ নীচের পাতাটি সাড়ে ছয় সেঃ মিঃ হয়েছে আজ। আরেকটা ঘাস সম্ভবতঃ দূর্বা জাতীয়। সেটারও দুপাশে ছোট্ট দুটো পাতা বেরিয়েছে।

১৬।৭।৬৯। যে ঘাসটা চিরে দুপাশে দুটি পাতা বেরিয়েছে, আজ দেখি পাতা দুটোর মাঝখান দিয়ে খুব ছোট একটা পাতার মত দেখা যাচ্ছে। ঘাসটির গোড়া দিকটা হয়েছে খয়েরী, পাতার জোড়ের রং শাদা। দূর্বা বলে যেটা মনে হচ্ছে তার দুপাশেই আগে পিছে পাতা দেখা দিয়েছে।

২৭।৭।৬৯। এ পর্যন্ত প্রায় সাতরকম ঘাস পেয়েছি দেখতে। এদের প্রত্যেকের গড়ন ধরণ আলাদা। কোনটার পাতাগুলো ছিঁড়ে টান করে ধরলে অনেকটা বাঁশের পাতার মত দেখায়—যেমন দূর্বা ঘাস। আবার কিছু ঘাসের পাতার ধরণ রজনীগন্ধা জাতীয় গাছের পাতার মত। কোন কোন ঘাসের পাতা বেশ লম্বা হয় কোন কোন ঘাসের পাতা লম্বা হয়না। সব ঘাসের কাণ্ড বা ডাঁটা থেকে একই রকম ভাবে পাতা গজায় না। যে ঘাসগুলোয় বাঁশের মত গাঁট হয় তাদের পাতা গাঁটে গাঁটে গজায়। কিছু ঘাসের ফুলও হয়। ঘাসের ফুলের সাথে সাধারণ ফুলের তফাৎ দেখেছি।

সব ঘাসের বাড়ার গতি এক নয়। কোনটা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে কোনটা বা খুব আস্তে। ঘাসের পাতা দেখলাম প্রথম অবস্থায় খুব বাড়ে, তারপর একটা ঠিক মাপে পৌঁছে আর বাড়েনা। একজাতীয় ঘাসের গোড়া খুঁড়ে আদা জাতীয় জিনিস পেয়েছি—যাকে বলে 'মোথা'। একটি 'মোথার' সাথে অনেক 'মোথার' যোগ রয়েছে প্রতি মোথা থেকেই নতুন ঘাস গজায়।

প্রকৃতি-পড়ুয়ার পাঠশালা : প্রতি মাসের প্রথম রোববার : সন্দেশ কার্যালয়ে : বিকেল চারটেয় : কলকাতার পড়ুয়ারা হাজির হ'তে ভুলোনা

কবিতা-স্যার

অজেয় রায়

গ্রীষ্মের ছুটির পর স্কুল খুলেছে।

একাদশ শ্রেণীতে বাংলা কবিতার ক্লাসে একজন নতুন শিক্ষকের আবির্ভাব হল।

ফর্সা লম্বা দোহারা চেহারা। মাথায় ঘন কোঁকড়া চুল। চোখে হালকা রঙের চশমা। ধারাল মুখের গড়ন। পরনে চুড়িদার পাঞ্জাবী ও ধুতি। পায়ে চপ্পল।

প্রথম নজরে জরিপ করে নিয়েই ক্লাসের মস্তান ছাত্র হীরালাল মন্তব্য করল—দেখছিস, কেমন কবি কবি টাইপ? নতুন স্যার নিশ্চয়ই কবিতা লেখেন। কবিতা-স্যারের পাঞ্জাবীর ঝুলখানা মার্ক কর।

ব্যস্, চালু হয়ে গেল নামটা।

নামটা ক্লাস ইলেভেন থেকে ক্রমশঃ সারা স্কুলে ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেক ক্লাসের ছাত্রদের কাছে তিনি হয়ে গেলেন—কবিতা-স্যার। একটা প্রধান কারণ অবশ্য তাঁর পোষাক। সর্বদা তাঁর ধুতি-পাঞ্জাবী সুশোভিত মূর্তি।

টিচার মহলেও অনেকেই জেনে গেলেন নামটা। তবে স্বয়ং কবিতা-স্যারের কাণে নামটা পৌঁছেছে কিনা মালুম হল না। পৌছলেও না জানার ভান করে তিনি বেমালুম হজম করে গেলেন বিশেষণটা।

কবিতা-স্যারের পরিচয় সংগ্রহে লেগে গেল হীরালালের দল। স্কুলে কোন নতুন শিক্ষক এলেই ছাত্ররা তাঁর পূর্বইতিহাস জানার চেষ্টা করে থাকে। খুব বেশী নয় তবে কিছু কিছু তথ্য জোগাড় হল।

কবিতা-স্যার নাকি সদ্য আসাম থেকে এসেছেন। সেখানেও এক স্কুলে পড়াতেন। বাবা মারা

যাওয়ার পর মাকে নিয়ে কলকাতা চলে এসেছেন। এই স্কুলের হেডমাস্টার মশায়ের সাথে তাঁর আগে থেকে চেনা ছিল। তিনিই প্রিয়তোষবাবুকে মগরা-হাইস্কুলে কাজ দিয়েছেন।

আপাততঃ প্রিয়তোষবাবু কলকাতায় বাসা ভাড়া নিয়ে আছেন। সেখান থেকে প্রত্যহ মগরায় স্কুল করতে আসেন।

সবাই লক্ষ্য করল, সপ্তাহে তিন দিন তিনি কিছু আগে, দুপুর তিনটে নাগাত কলকাতা ফিরে যান। বোধহয় হেডমাস্টার মশাইকে বলে কয়ে ব্যবস্থা করে নিয়েছেন—পর পর ক্লাসগুলো সেরে নিয়ে তিনটে পাঁচের ট্রেন ধরেন। মগরা থেকে কলকাতা ইলেকট্রিক টেনে মাত্র একঘণ্টার জার্নি।

টিচারদের কয়েকজন প্রশ্ন করেছিলেন—কি মশাই আগে-ভাগে পালান কোথা? কিছু শেখেন-টেখেন নাকি?

পরিষ্কার কোন উত্তর পাওয়া যায় নি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে ঐ রকম আর কি। একটা কাজে যেতে হয়। মানে, পরে বলবখন।······

ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আসল উত্তরটা তিনি এড়িয়ে যান।

ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে গবেষণা হল। কেউ বলল—টাইপ শেখেন। কেউ বলল—ল' পড়েন। শিক্ষকদের বেশার ভাগের ধারণা—টিউশনি।

হীরেরা আর একটা খবর জোগাড় করল। ক্লাস টেনের রামনাথ ওরফে রামু হচ্ছে সম্পর্কে প্রিয়তোষবাবুর ভাগনে। কবিতা-স্যারের আরও কিঞ্চিৎ হাঁড়ির খবর জোগাড়ের আশায় তারা রামুকে পাকড়ালো।

রামু কিন্তু তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নতুন খবর দিতে পারল না।

—কবে সেই ছোটবেলায় দেখেছি প্রিয়মামাকে, তারপর এই এদ্দিন পরে এলেন। কলকাতা আসতেন কালে ভদ্রে। তাছাড়া তেমন যোগটোগ ছিল না আমাদের সঙ্গে।

—হ্যাঁরে উনি কবিতা-টবিতা লেখেন নাকি?

—অতশত আমি জানি না। কখন শুনিনি তো। তবে প্রিয়মামারা থাকে শ্যামবাজারে, আমরা ব্যাণ্ডেলে। যাই-টাই না বড় একটা। উনি কি করেন না করেন, কবিতা লেখেন কিনা আমি বলতে পারব না।

কবিদের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে হীরালালদের স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল। অবশ্য স্কুলের সেকেণ্ড-পণ্ডিত মশাই কবি ব্যক্তি। সরস্বতীপুজোর কার্ডে প্রতি বছর একটি করে বাণী বন্দনা, কোন বিশিষ্ট-অতিথির আগমন উপলক্ষ্যে আহ্বানবাণী বা কেউ মারা গেলে শোক ভারাক্রান্ত ছন্দ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু অমন মুষকো-কালো বাজখাঁই ব্যক্তিকে কবি বলে ভাবতে কেমন জানি অস্বোয়াস্তি লাগে। কবি বলতে যেমন ছিরিছাঁদ কল্পনা ক্ষেত্রে ভেসে ওঠে কবিতা স্যারের সঙ্গে তার ভারি মিল।

কবিতা-স্যারকে নিয়ে প্রথমটায় ছাত্র মহলে গুঞ্জন ও হাসি ঠাট্টা সৃষ্টি হলেও দেখা গেল কিছু

দিনের মধ্যেই তিনি ছাত্রদের মন জয় করে নিয়েছেন। সবাই তাঁকে বেশ পছন্দ করতে আরম্ভ করেছে। খুব যত্ন নিয়ে পড়ান। চমৎকার বোঝান। ঠাণ্ডা মেজাজ। কণ্ঠস্বরটি মিষ্টি। ক্লাসে পৃথিবীর কবি-সাহিত্যিকদের জীবনের কত বিচিত্র গল্প বলেন। কদিনের মধ্যেই তিনি দিব্বি ক্লাস ম্যানেজ করে ফেললেন। শুধু ক্লাস ইলেভেনের হীরেই বাগ মানল না।

আড্ডায় কবিতা-স্যারের প্রসঙ্গ উঠলেই সে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে—ওনার তো দিনরাত ঐ এক সাহিত্য আলোচনা। দুর দুর, যত সব মেয়েলি ব্যাপার। ছুটো খেলার গল্প করলে না হয় বুঝতাম।

ভানু একদিন মৃদু আপত্তি জানায়। সে ভিতরে ভিতরে কবিতা-স্যারের ভক্ত হয়ে উঠেছিল। যাই বলিস, কবিতা-স্যার কিন্তু মোটেই মেয়েলি নন। আর কি ফাইন জমিয়ে বলেন গপ্পোগুলো।

হীরালাল মুখ ভেংচে বলে—হুঁঃ, মেয়েলি নয়। তবে তো স্মাট। যানা তুইও অমন ধুতি ফরফরিয়ে স্মাট হগে যা।

ভানু রেগে বলে, তোর কাছে তো জগুদা ছাড়া ছুনিয়া শুদ্ধ ক্যাবলা।

হীরে বলল—আলবাৎ। দেখা দিকি এ তল্লাটে অমন একখানা স্মাটলোক।

জগুদা হচ্ছে হীরের গুরু—আদর্শ। জগুদা ফুটবল প্লেয়ার। ভাল খেলার চেয়ে মারকুটে প্লেয়ার বলেই তার নাম ডাক। শক্ত সমর্থ বটে কিন্তু অতি চোয়াড়ে চেহারা। মাথায় কদম ছাঁট চুল। পরনে সরু প্যান্ট। আস্তিনের হাতা কাঁধ অবধি গুটোন। মেজাজ তার অষ্টপ্রহর তেড়িয়া হয়ে আছে।

হীরালালের মতে ঐ হচ্ছে খাঁটি পুরুষ সিংহ। হীরালালও ভাল ফুটবল খেলোয়াড় হতে চায়। জগুদাকে সে তাই পায়ে পায়ে নকল করে।

জগুদার বিরুদ্ধে কিছু বললেই হীরালাল খাপ্পা হয়ে উঠবে। তাই অপ্রিয় সত্যকথাগুলি না বলে ভানু চুপ করে গেল।

একদিন কথায় কথায় হীরালাল প্রিয়তোষবাবুর মুখের ওপরই বলে বসল—আমার স্যার কবিতা-টবিতা আসে না।

প্রিয়তোষবাবু একটু থমকে গিয়ে বললেন—কেন ?

—না স্যার, আমি প্লেয়ার হব, ফুটবল প্লেয়ার।

—বেশ বেশ, তুমি বুঝি খেল ?

—হ্যাঁ স্যার। আমি স্কুল টিমের ক্যাপ্টেন, সেণ্টার ফরওয়ার্ড।

—খুব ভাল কথা কিন্তু কবিতা কি দোষ করল ?

—দেখুন স্যার, বেশী কবিতা টবিতা পড়লে স্পিরিট কমে যাবে।

—এ্যাঁ কি কমে যাবে ? স্পিরিট ? কবিতা-স্যার আঁৎকে উঠলেন। কে বললে ?

—স্যার জগুদা বলেচে।

—জগুদা কে ?

—মগরা স্পোর্টিং-এর ক্যাপ্টেন। একবার ডিস্ট্রিক্টএর হয়ে খেলেচে। কলকাতায় সেকেণ্ড ডিভিসন টিমে খেলে। জগুদাকে চেনেন না স্যার ?

স্বনামধন্য জগুদার মতামত শুনে কবিতা স্যার একটু চুপ করে রইলেন, তারপর মাথা নেড়ে বললেন—নানা তা কেন হবে ? কবিতা পড়লে খেলা খারাপ হয়ে যাবে কেন ?

হীরের কাছে জগুদার বাণী বেদবাক্য। জগুদার উপদেশের প্রতিবাদ করতে দেখে সে আরও জোরাল গলায় বলে—স্যার জগুদা বলেচে—খবরদার বেশী সাহিত্য-ফাহিত্য পড়বিনে, কাব্যি টাব্যি ধরবি নে। ও রোগে ধরেছে কি, দেখবি দু'দিনে চোখে চশমা উঠবে, পিঠ কুঁজো হয়ে যাবে, খেলার মাঠে দম পাবি না।

কবিতা স্যার খানিকক্ষণ হীরালালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর বললেন—কিন্তু বাংলায় পাশ করতে হবে। কবিতায় ষাট নম্বর আছে মনে আছে তো ? বোঝা গেল তিনি জগুদা প্রসঙ্গ এড়াতে চান।

—সে স্যার হয়ে যাবে। নোটবই আছে, পরীক্ষার আগে মুখস্থ করে মেরে দেব।

প্রিয়তোষবাবু আর কথা না বাড়িয়ে পড়াতে শুরু করলেন।

স্কুলে প্রতি বছর একটা খেলা হয়—ছাত্র বনাম শিক্ষক।

দু'পক্ষই এ খেলায় মহা উৎসাহী কারণ শিক্ষকরা জিতলে পরদিন স্কুল ছুটি পাওরা যায় এবং প্রতিবছর শিক্ষকরা যে জিতবেন এটা অবধারিত সত্য। এবারও সেই ম্যাচের তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

আগামী বৃহস্পতিবার খেলা। তাহলে শুক্রবার ছুটি, শনিবার তো হাফ-হলিডে আবার পরদিন রোববার। তিনটে দিন তোফা কাটবে।

তিনদিন কেন চারদিনই বলা যায়—কারণ ম্যাচের দিন টিফিনের পর ছুটি হয়ে যায়। সারা স্কুল জুড়ে চলে ম্যাচের জল্পনা-কল্পনা।

বেচারা ছাত্ররা জানে তাদের হারতেই হবে নইলে ছুটি চাওয়া যাবে না। তারা তাই পাঁয়তাড়া ভাঁজে টিচারদের কতটা নাস্তানাবুদ করা যায়। কে কত ড্রিবলিং দেখাবে, টেকনিক মারবে—

টিচাররুমও সরগরম। এ বছর নন্দ মল্লিক ও বরেন দাস নামে দুজন সদ্য গ্রাজুয়েট স্কুলে জয়েন করেছেন। দু'জনেই ফুটবল খেলেন। এখনও রেগুলার প্র্যাক্‌টিস্ আছে। নন্দবাবু এবং বরেনবাবু খুব সিরিয়াসলি টিম বানাতে লেগে যান। তারা অন্যদের উৎসাহ দিয়ে বলেন আপনারা কোন রকমে ডিফেন্সটা ম্যানেজ করে দিন আমরা এ্যাটাক্ কাকে বলে দেখাচ্ছি। এবার আবার ছেলেখেলা নয় রীতিমত ঘাম ছুটিয়ে দেব স্টুডেন্টদের।

কিন্তু টিচারদের মধ্য থেকে এগারো জনকে মাঠে নামানো মুস্কিল। উৎসাহ কারও কমতি নেই

কিন্তু বেশীর ভাগই খেলতে নারাজ। বুড়ো বয়সে চোট লাগলে কতদিন ভোগাবে কে জানে। অনেক ধরাধরি কষাকষির পর মোট'মুটি একটা টিম খাড়া হল।

নন্দ ও বরেনবাবু প্রিয়তোষবাবুকে ধরেছিলেন—আপনাকে খেলতে হবে।

শুনেই প্রিয়তোষবাবু হাতজোড় করলেন—প্লীস, মাপ করবেন। আমি দর্শক মানে সাপোর্টার! চেঁচাবো, হাততালি দেবো, ছাতা ছুঁড়বো—কিন্তু খেলতে বলবেন না।

—কেন, আপনি ফুটবল খেলেন নি কোনদিন?

—হ্যাঁ, মানে তা খেলেছি। কি ন-তু—না না আমায় বাদ।

—খেলেছেন তো এককালে? ব্যস্. তবে নেমে পড়ুন, কিন্তু ঘাবড়াবেন না। আরে মশাই এত বুড়ো বুড়ো মাস্টাররা খেলতে নামছে আর আপনার এই বয়সে এত ভয় কিসের?

প্রিয়তোষবাবু বেজায় অনুনয় বিনয় জুড়ে দিলেন—প্লীস্ প্লীস্। শেষে বিরক্ত হয়ে নন্দবাবুরা বললেন—বেশ তবে দর্শকই থাকুন, দেখবেন সেদিন যেন আবার তিনটের সময় পালাবেন না। গোপনে তাঁরা চোখাচোখি করলেন—মুখে বিদ্রূপ। ভাবখানা—ছেলেরা মিথ্যে বলে না, একেবারে কবিতা-মার্কা। দেখ, খেলার নামে যেন মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম।

প্রিয়তোষবাবুর অতশত খেয়াল নেই। সানন্দে একগাল হেসে বললেন—সেকি পালাব কেন? দেখুন শুধু প্লেয়ার থাকলেই তো চলে না সাপোর্টারও চাই!

বৃহস্পতিবার ম্যাচের দিন। বাংলা কবিতার ক্লাসে ঢুকতেই হীরালাল প্রশ্ন করল—স্যার, আপনি খেলছেন?

—না।

অপদার্থ কবিতা-স্যারের প্রতি অধিক মনোযোগ না দিয়ে হীরে সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে গল্পে মেতে গেল। উত্তেজনার বশে সে একেবারে শিক্ষকের দিকে পেছন ফিরে বসল।

—হীরালাল, ঠিক হয়ে বস। প্রিয়তোষবাবু দৃঢ়স্বরে আদেশ করলেন।

—বসছি স্যার। মুখে বললেও তার ঠিক হয়ে বসার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। পুরোদমে আড্ডা চলছে।

—হীরালাল!! ক্লাসে যেন বাজ পড়ল।

কবিতা-স্যারের গলা দিয়ে যে এত জোর ধমক বেরুতে পারে কেউ কখনো কল্পনা করে নি।

হীরালাল চমকে ফিরে বসল।

—আর একটি কথা বলেছো কি তোমায় ক্লাস থেকে বের করে দেব, বুঝেছো? রাগে প্রিয়তোষবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বই খুললেন।

হীরালাল যথেষ্ট ঘাবড়ে গিয়েছিল। বাকি সময়টা সে চুপ করে বসে রইল।

ক্লাস শেষ হতে আরম্ভ হল হীরালালের তড়পানি। সে কবিতা-স্যারের শ্রাদ্ধ করে ছাড়ল।··· ভিতু কোথাকার। ফুটবল খেলতে ভয় পায় আবার মেজাজ দেখাচ্ছে। আজ মাঠে নামলে আমি

ওনার ঠ্যাং খুলে নিতাম, দেখতিস।…

ঠিক বিকেল চারটেয় টিচার ভারসাস্ স্টুডেন্টস্ ম্যাচ আরম্ভ হল।

খেলা ভীষণ জমে গেল।

ডিফেন্সে ভূপেনবাবু একখানা দেখবার মত ফিগার। অটল পর্বতের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছেন। একদা তিনি এ অঞ্চলে নামজাদা ফুলব্যাক ছিলেন। এখন বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই, ভুঁড়ি হয়ে গেছে। উনি আর তাই বলের পিছনে ছোটেন না—বল ওনার কাছে গড়িয়ে এলে ভোস্ ভোস্ করে তেড়ে গিয়ে পা চালান। আর সেই ভীম পদাঘাতের সামনে পড়লে মানুষ বা বল কারো রক্ষা নেই! তখন ছেলেরা বল ছেড়ে সরে যায়।

নন্দবাবু ও বরেনবাবু খুব খেটে খেলছেন। তারা ছাত্রদের গোলে গোটাকয়েক জোরাল শটও মারলেন।

কিন্তু মিনিট কুড়ি কাটার পরই অধিকাংশ শিক্ষক বেদম হাঁপিয়ে পড়লেন। তখন শুরু হল হীরালাল এণ্ড কোর কেদরানি। মনের সুখে তারা মাষ্টারদের নাচাতে লাগল।

যতই নাচাকনা কেন গোল খেল ছাত্ররাই। নন্দবাবুর একটা দূর পাল্লার ফ্রি-কিক আটকাতে ছাত্র গোলকিপার খুব কায়দা মাফিক ডাইভ মারল কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক 'লেটে'। বল আস্তে আস্তে গড়িয়ে গোলে ঢুকে গেল আর গোলকি মাটিতে শুয়ে পরম নিশ্চিন্তে সেই দৃশ্য দেখল। গোল হয়ে যাবার পর সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে জিভটিভ কেটে, মাথা চুলকিয়ে একাকার, যেন কতই লজ্জিত।

ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক ঠেকলেও গোল-ইজ গোল। গো-ও ও ল—ছাত্র ও শিক্ষক—সমবেত দর্শকবৃন্দ আকাশ ফাটান চিৎকার ছাড়ল।

হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটল। হাফ টাইমের ঠিক আগে।

বল ধরতে গিয়ে শিক্ষকদের গোলকিপার নরেনবাবুর ডানহাতের মধ্যম আঙ্গুল গেল মচকে। যন্ত্রণায় তিনি হাত চেপে বসে পড়লেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মাঠের বাইরে নিয়ে আসা হল। আঙ্গুলে লাগানো হল বরফ, জলপটি—আঙ্গুলটা ফুলে উঠেছে। নিজে খেলতে না পারলেও দেখা গেল শুশ্রূষার কাজে প্রিয়তোষবাবু দক্ষ। তিনিই যত্ন করে জলপটি বেঁধে দিলেন।

ইতিমধ্যে খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। বেগতিক দেখে রেফারী হাফ টাইম ঘোষণা করে দিলেন।

এখন গোলকিপার কে হবেন? নরেনবাবুর দুর্দশা দেখে কেউ আর এগুতে চান না। নন্দবাবুর অবশ্য গোলে দাঁড়াতে ভয় নেই কিন্তু তাঁদের হচ্ছে খেলা দেখানো। বাকি সময়টা বোকার মত তেকাঠি আগলে দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ। কোনদিন তাঁরা গোলে খেলেন নি সুতরাং গোলকি হিসেবে খেলা দেখাবারও কোন ভরসা নেই।

ওঁরা যুক্তি দেখান—'আমরা কেউ পিছিয়ে এলে ফরওার্ড লাইন ভীষণ উইক হয়ে পড়বে।

আপনারা কেউ কাইগুলি কাজ চালিয়ে দিন।—সেকেণ্ড পণ্ডিতমশাই আপনি নামুন না। শুনেই সেকেণ্ড পণ্ডিত টুক করে ভীড়ের মাঝে অদৃশ্য হলেন।

টানাপোড়েন চলতে থাকে। রেফারী অধৈর্য হয়ে ওঠেন।—কি মশাই তাড়াতাড়ি করুন। কুড়ি মিনিট কেটে গেল যে।

খেলা প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। নয়তো শিক্ষকদের দশজনেই খেলতে হবে, মানে গোলকিপার ছাড়া। সেটাই বা কি করে সম্ভব!

নন্দবাবু প্রিয়তোষবাবুকে ধরলেন—তাহলে আপনি নামুন।

প্রিয়তোষবাবু কাতর চোখে হাত জোড় করেন।

হঠাৎ হেডমাস্টার মশাই এগিয়ে আসেন—প্রিয়তোষ তুমিই তবে গোলকিপিং কর।

—না না, সে কি? আমি তো বলেই রেখেছি—আপনি তো জানেন আমার ডিফিকাল্টি।

—হুঁ জানি। কিন্তু এটা এমার্জেন্সি, এখন ওসব পুরনো সর্ত বরবাদ। তোমায় খেলতে হবে।

প্রিয়তোষবাবু মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হেডমাস্টার মশাই চটে গেলেন।

—বটে তুমি ইয়ংম্যান হয়ে জেদ করে খেলবে না আর বুড়োগুলো মাঠে নেমে আঙুল ভাঙবে। বেশ তবে আমিই খেলব। ওহে জার্সিটা নিয়ে এসতো—

—হেডমাস্টার মশাইএর ডাকে প্রিয়তোষবাবুর চেতনা হয়। লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে বলেন—এঁ্যা আপনি! না না আমি খেলছি, আপনি রাগ করবেন না! আমি এখুনি ড্রেস করে আসছি।

নন্দবাবু ভাবেন, এমন ভিতু আনাড়িকে জোর করে গোলে দাঁড় করানো উচিত হবে কিনা কে জানে। আবার যদি একটা একসিডেণ্ট হয়। তিনি বললেন—আপনি ইচ্ছে করলে অন্য পজিশনেও খেলতে পারেন। আমিই বরং গোলি হচ্ছি।

হেডমাস্টার মশাই বাধা দেন—না ওই খেলবে, ঠিক আছে।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল।

হীরে শুনেই বলল, দাঁড়া এইবার রগড় দেখাচ্ছি। যদি কিকের চোটে স্যারকে সটাং গোলে ঢুকিয়ে দিতে না পারি তো আমার নাম নেই।

অন্য ছাত্ররা আপত্তি জানায়।—এই হীরে কি হচ্ছে। এখন মাথা গরম করিস নি। তাছাড়া জানিসতো টিচাররা না জিতলে হেডস্যার হয়তো ছুটিই দেবেন না।

—দেবে না তো দেবে না, বয়ে গেল। ক্লাসে ধমকাবার শোধ আমি তুলব। এত গোল করব যে তিনদিন আর কবিতা স্যারকে বাড়িতে ভাত খেতে হবে না। অবশ্য তার আগেই যদি না হাস-পাতালে যায়।

গোঁয়ার গোবিন্দ হীরালালকে প্রতিবাদ করার সাহস অন্য ছেলেদের নেই। তারা ক্ষুণ্ণ মনে চুপ করে থাকে। খেলাটা বুঝি মাটি হল—

ড্রেস করে বেরিয়ে আসার পর প্রিয়তোষবাবুকে দেখে সবাই একবাক্যে স্বীকার করল—খাসা মানিয়েছে। ফর্সা লম্বা ছিপছিপে চেহারায় সবুজরঙের ফুলহাতা জার্সি ও সাদা হাফপ্যান্ট। পায় এক জোড়া বুটও পরেছেন ছেলেদের থেকে চেয়ে। সঙ্গে লাল হোস্। চশমা নেই। ওটা রিডিং গ্লাস, বল দেখতে দরকার হবে না। মুখে লাজুক হাসি।—

হেডমাস্টারমশাই তাঁর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন—এই তো গ্র্যাণ্ড। উইস্ ইউ গুডলাক্ প্রিয়তোষ।

—খেলা আরম্ভ হতেই হীরের পা থেকে একটা কিক বুলেটের মত বারপোস্টের সমান্য ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রিয়তোষবাবু বলের দিকে হাত বাড়িয়েই চট করে টেনে নিলেন তারপর হীরের পানে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

শিক্ষকদের ক্যাপ্টেন ভূগোল স্যার ননীবাবু মনে মনে ভাবলেন—হীরেটার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। একি বদ রসিকতা! বারণ করে দিতে হবে এত জোরে যেন না মারে।

কিন্তু বারণ করার আগেই আর একটি সমান ওজনের কিক ছুটলো হীরের পা থেকে। বলটার লক্ষ্য সোজা গোলকিপার—

প্রিয়তোষবাবু একটু লাফিয়ে উঠে দু'হাতের গ্রিপের মধ্যে ধরে বলটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন, তারপর লম্বা কিকে সেটাকে হাফগ্রাউণ্ড পার করে দিলেন।

মাঠ শুদ্ধু লোক তারিফ করল—চমৎকার। একেবারে পাকা গোলকিপারের মত ধরেছে।

কিন্তু 'মত' নয় সত্যিই যে তিনি একজন পাকা গোলকিপার মিনিট দশেকের মধ্যে তা কারোর আর বুঝতে বাকি রইল না।

দশ মিনিটের মধ্যে হীরালাল গোল নিশানা করে অন্ততঃ কুড়িটা শট্ ঝাড়ল—কাছ থেকে, দূর থেকে, আস্তে, জোরে।

প্রিয়তোষবাবু অবলীলাক্রমে প্রতিটি বল আটকালেন। কোনটা পাঞ্চ করে বারের ওপর দিয়ে তুলে দিলেন। কোনটি ডাইভ দিয়ে বের করে দিলেন। কোনটা দাঁড়িয়ে বা বসে পড়ে ধরলেন। একবারও ফসকাল না।

ব্যাপার দেখে দর্শক মায় প্লেয়ারদের চক্ষু ছানাবড়া। ঘন ঘন হাততালি ও উৎসাহব্যঞ্জক ধ্বনিতে মাঠ সরগরম হয়ে উঠল।

এদিকে হীরালাল ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল। অন্য ছেলেরা তাকে যথাসাধ্য অসহযোগিতা করছে। কবিতা স্যারের অভিনব মূর্তি দেখে তারা মুগ্ধ। হীরের আদেশ মত তাকে—বল পাশ করে দিয়ে তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। নিজেরা গোল করা বা হীরালালকে পাশ করার অতিরিক্ত দৌড়দৌড়ি করতে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

প্রিয়তোষবাবুর এই অলৌকিক কর্ম দেখে অন্য শিক্ষকরা ক্লান্তি ভুলে নতুন উদ্যমে খেলা শুরু

করলেন। নন্দবাবু পেছিয়ে এসে ব্যাকে দাঁড়ালেন, হীরালাল যেন পেনাল্টি বক্সের ভিতর ঢুকতে না পায়।.........

রেফারীর বাঁশী বাজল। খেলা শেষ। শিক্ষকরা এক গোলে জয়লাভ করলেন।

প্রিয়তোষবাবুকে পুরোভাগে রেখে শিক্ষকদল বিজয়োল্লাসে স্কুলের দিকে এগিয়ে চললেন। হ্যাণ্ড-শেক করতে করতে প্রিয়তোষবাবুর কবজি ব্যথা হয়ে গেল।

আরে ওকে! ভিড় ঠেলে এগিয়ে কবিতা-স্যারের সামনে এসে দাঁড়াল। জগুদা! জগুদা ডানহাতখানা বাড়িয়ে দিল কবিতা-স্যারের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করতে।

ব্যপারখানা ভাল করে বোঝবার জন্য হীরে কবিতা-স্যারের কাছাকাছি গিয়ে আড়ালে দাঁড়াল। শুনল জগুদা বলছে—

—কনগ্রাচুলেশন প্রিয়দা। মারভেলাস্ খেলেছেন। কয়েকখানা যা ডাইভ দেখালেন অনেক কাল মনে থাকবে। আপনি আবার সেদিন বিনয় করে বলছিলেন—মাঠে নামতে ভরসা হচ্ছে না এখনও।

কবিতা-স্যার স্মিত হেসে বললেন—ধন্যবাদ জগবন্ধু। সত্যি ভাই এখনও তেমন কন্‌ফিডেনস্ পাচ্ছিনা। এই খেলা আর লীগ ম্যাচ কি আর এক জিনিস।

জগুদা বলল—প্রিয়দা, আপনি কিন্তু এবার কট্। আমি আমার প্রমিস্ রেখেছি, কাউকে বলিনি আপনার কথা।—

জগুদা কবিতা-স্যারের সঙ্গে আর একদফা করমর্দন করে বিদায় নিল।

হীরের বুদ্ধিশুদ্ধি সব তালগোল পাকিয়ে যাবার উপক্রম। কে এই কবিতা-স্যার? কি কথা কাউকে জানায় নি জগুদা? জগুদার সঙ্গে ওঁর আলাপ হলই বা কি করে?......

খবরগুলো মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। হেডমাস্টারমশাই নাকি স্বয়ং বলেছেন—

প্রিয়তোষবাবু আসামের নামকরা প্লেয়ার। আগের বছর আসাম একাদশের গোলকিপার খেলেছেন। এ বছর তিনি কলিকাতায় এরিয়ান ক্লাবে খেলবেন। দু-একটা আরও বড় ক্লাব থেকেও নাকি তাঁর ডাক এসেছিল। অবশ্য এখনও ফার্স্ট ডিভিসন লীগ ম্যাচ খেলতে আরম্ভ করেন নি। বাবার মৃত্যু, কলকাতা আসা ইত্যাদি কারণে সীজনের গোড়া থেকে যথারীতি প্র্যাকটিস করতে পারেন নি। তবে এখানে এসে আবার প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই নিয়মিত ভাবে এরিয়ানের গোলরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এই কারণেই নাকি তিনি সপ্তাহে তিনদিন স্কুল থেকে আগে চলে যান। তিনটে পাঁচের ট্রেন ধরে হাওড়া—সেখান থেকে সোজা গ্রাউণ্ডে যান প্র্যাকটিস করতে।

এমন দারুণ খবরটা এতদিন চেপে রেখেছিলেন কেন মাস্টারমশাই? সবার মুখেই এই এক প্রশ্ন।

—কারণ আছে। হেডমাস্টারমশাই বললেন। তবে উত্তরটা বাপু আমার কাছে জানতে চেও না—

টিচার্স রুমে ঢুকে হীরালাল সটান হুমড়ি খেয়ে পড়ল —প্রিয়তোষবাবুর পায়ের উপর। প্রিয়তোষবাবু ততক্ষণে ধুতি পাঞ্জাবী পরে আবার যথারীতি কবিতা স্যার বনে গেছেন।

—স্যার আমায় ক্ষমা করবেন। আমি জানতাম না। আমার অন্যায় হয়েছে—হীরের গলাটা কেমন ধরে আসে।

—আরে আরে, একি কাণ্ড। হীরালালকে দু'হাতে তুলে তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

—কি ভাবছো এখনও বুঝি চটে আছি? মোটেই না। ক্লাসের ঘটনা মাঠে মনে রাখব কেন? রাগ পুষে রাখা কি স্পোর্টস্‌ম্যানের উচিত? তুমিই বল? শোন একটা কথা বলে রাখি। তোমায় কিন্তু আমি সত্যি লাইক করি। ডানপিটে প্লেয়ার ছেলেই আমার পছন্দ, তবে কবিতা পড়লে খেলা খারাপ হয়ে যাবে, একথা বাপু আমি মানতে রাজী নই। যাক্ এবার থেকে কবিতা-স্যারের উপর অভক্তি একটু ঘুচল তো? আরে আরে পালাচ্ছো কোথা? নামটা জেনে ফেলেছি বলে? খাসা নাম, নামের আবিষ্কর্তাটি কে? তুমি নাকি? আমি কিন্তু কবিতা লিখতে পারি না! তারপর এখন কার শিষ্য হবে? কবিতা-স্যারের না জগুদার? হাঃ হাঃ হাঃ—

হীরালাল রামুকে খুঁজে বের করল। তার হাতখানা দৃঢ় মুষ্ঠিতে চেপে ধরে বলল—এ্যাই বেটা কেন বলিস নি তোর মামা এত ভাল প্লেয়ার? তুই নিশ্চয়ই জানতিস্!

রামু আমতা আমতা করে বলে—

আমি কি করব। প্রিয়মামাই তো বার বার করে আমায় সাবধান করে দিয়েছিল—খবরদার কাউকে বলবিনে, আমি খেলি। তাহলে ছেলেগুলো আমায় জ্বালিয়ে খাবে। ক্লাসে কেবল খেলার গল্প করতে চাইবে। পড়ানোয় ডিসটার্ব হবে—!

॥ দু'কলম ॥

[ছড়া]

অতীন মজুমদার

(১)

আচ্ছা বিপদ! সবাই উপদেষ্টা,
তাই উপদেশ পালন করার নেইক কারুর চেষ্টা।
—দুধ পুকুরে ঢাল্‌বে কে দুধ?
—জল জমে যায় শেষটা!

(২)

কানার নামটা পদ্মলোচন, চোরের সাধুচরণ,
মিথ্যে-মেকীই দেয় যে মনে ধোঁকা
ঘোর কলিকাল! সবাই বলে বোকা!

আসলেরও' ঢুকেই গেছে পাট,
বইয়ের এখন কদর কোথায়,
সবাই দেখে মলাট!

সাক্ষী ছিল

ময়ূখ চৌধুরী

দুর্গম অরণ্য ; শ্বাপদ-সংকুল। এই পথে মানুষ-জন সচরাচর চলাচল করে না। তবে, কখনও কখনও দু'একটি দুঃসাহসী পথিকের আবির্ভাব হয় বনের পথে — সেদিন রাতে বনভূমির বুকে পদার্পণ করেছিল একটি দুঃসাহসী মানুষ…

ওঃ! বাঘিনী!... আচ্ছা কাঁধের বোঝা আমি এই মাটিতে নামিয়ে রাখলুম — এইবার এস! আমার নাম ভিখু সর্দার — সহজে ছাড়ছি না ...
আর্‌র্‌!

হাতে কুড়ুল থাকলে ভিখু বাঘ-ভালুকের পরোয়া করে না ...

কি হল? বাঘিনী হঠাৎ পিছন ফিরে কি দেখছে? আমাকে রুখে দাঁড়াতে দেখে ভয় পেল নাকি? —

নেকড়ে! অনেকগুলো নেকড়ের চিৎকার!
রঘ্‌!
ও উ-উ-উ-ও-ও-ও-ও!...

ও-উ-ও-ও-ও!...
বাঘিনী হঠাৎ ছুটে এল, কিন্তু তার লক্ষ্যবস্তু ভিখু নয় — ভিখুর থলে! খুব সাবধানে ধীরে ধীরে ভিখু পিছিয়ে গেল। বাঘিনীকে সে ভয় করেনা, কিন্তু পিছনে ছুটে আসছে সাক্ষাৎ মৃত্যু — নেকড়ের দল!
নেকড়ের চিৎকার এগিয়ে আসছে!

নেকড়েগুলো এখনই এসে পড়বে। তাড়াতাড়ি গাছে উঠে প্রাণ বাঁচাই … বাঘিনীকে ভয় করি না, কিন্তু নেকড়ের দলের সামনে পড়লে রক্ষা নেই।

বাঘিনীর ধারালো দাঁতের আঘাতে ছিঁড়ে গেল থলে — ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা বাঘের বাচ্চা, থাবা আর মুখ দড়ি দিয়ে বাঁধা!

উ-ও-ও-ও-ও-ও…

ও-ও-ও-উ-উ-উ-উ উ!
বনের আড়াল থেকে খোলা মাঠের উপর আত্মপ্রকাশ করল একদল হিংস্র নেকড়ে!

গাছের উপর থেকে লড়াই দেখছে ভিখু —
বাঘিনী মরিয়া হয়ে লড়ছে … দুটো নেকড়ে মারা পড়ল … কিন্তু এতগুলি নেকড়ের সঙ্গে একা বাঘিনী সামাল দিতে পারবে না …
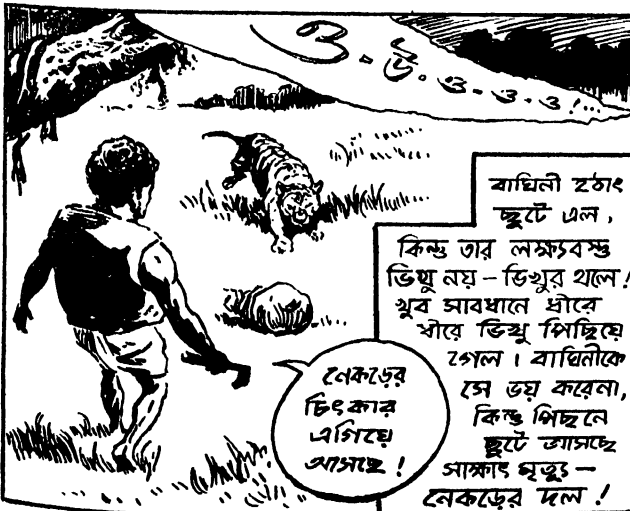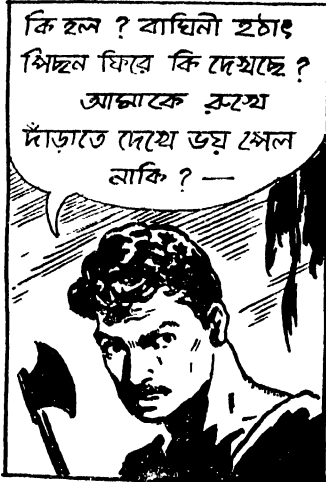
অনেকগুলো শত্রু নিপাত করে বাঘিনী মৃত্যুবরণ করল। অবশিষ্ট তিনটে নেকড়ের মধ্যে হঠাৎ একটি পশুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল অসহায় বাচ্চাটির দিকে…
গররর!
ভিক্ষু গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল…
খ্যাঁক!
আয়! আয়! তোরাও আয়!… বাঘিনী তো দলের বেশীর ভাগই সাবাড় করে দিয়েছে— আমি কি তিনটেকে শেষ করে দিতে পারব না?
একটি বুদ্ধিমান নেকড়ে বুঝল বাঘিনীর থাবার চাইতে ভিক্ষুর কুড়ুল কিছুমাত্র কম মারাত্মক নয়।
নির্জন বনভূমির বুকে শ্বাপদ ও দ্বিপদের মৃত্যুপণ লড়াই উপভোগ করার জন্য কোনও দর্শক সেখানে উপস্থিত ছিল না — রাতের আকাশে এই ভয়ংকর ঘটনার একমাত্র সাক্ষী ছিল চাঁদ!
বাচ্চাটাকে ঘাড়ে নিয়ে এখন গাঁয়ের দিকে হাঁটতে হবে। কাল সকালে ডাক-বাংলোর সাহেবের কাছে বাঘের বাচ্চা পোঁছে দিলেই
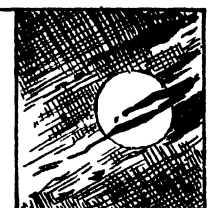
ক্রিকেট মাঠে প্রায়ই এমন সব ঘটনা ঘটে যার তুলনা মেলা ভার। দারুণ মজার সেই সব ঘটনার কথা তাই কেউ ভোলেন না। ক্রিকেটরসিকদের মনে সেই সব ঘটনা চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকে। কেউ কোনদিন তাই ভুলতে পারেন না ডেনিস কম্পটনের সেই ফুটবলের মতো কিক করে বিজয় মারচেণ্টকে আউট করার কথা কিম্বা তাঁর নিজেরই সেই অদ্ভুৎভাবে আউট হয়ে যাবার ঘটনার কথা। অথবা ট্রেভার বেইলির বোকা বনে আউট হয়ে যাওয়া, শুধু মাত্র প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের অসুবিধে সৃষ্টি করে ফেলার জন্যে ইংলণ্ডের অধিনায়ক লেন হাটনের আউট হবার কথা কিম্বা কেনিয়ন সাহেবের মাথার টুপি খুলে উইকেটের ওপর পড়ে যাওয়ায় আউট হয়ে যাবার মতো মজার ঘটনার কথা কেউ কোনদিনই ভোলেন না।

মজার খেলা ক্রিকেটের কয়েকটি দারুণ মজার ঘটনার কথাই এখন আমরা বলবো।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। ভারত সেবার গেছে ইংলণ্ড সফরে। ওভাল টেস্টে সেদিন তখন ব্যাটিং করছিলেন ভারতের নাম করা ব্যাটসম্যান বিজয় মারচেণ্ট। খুব সুন্দর ভাবে খেলছিলেন তিনি। তাঁর দর্শনীয় মারের চমকে মাঠের পরিবেশই গিয়েছিল পাল্টে। রান উঠছিলো খুব তাড়াতাড়ি দেখতে দেখতে এক সময় সেঞ্চুরিও করে ফেললেন মারচেণ্ট। ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা হাজার করেও পারছিলেন না তাঁকে আউট করতে।

ইংলণ্ডের নাম করা ব্যাটসম্যান ডেনিস কম্পটন তখন ফিল্ডিং করছিলেন শর্ট লেগে। শুধু মাত্র ক্রিকেট নয় ফুটবল খেলাতেও কম্পটনের তখন খুব নাম। ফুটবল খেলাতেও তিনি করেছেন নিজেদের জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব। এক সময় এই শহর কলকাতাতেই কম্পটন কাটিয়ে গেছেন বেশ কয়েক বছর। সেই সময় তাঁকে যাঁরা ময়দানে ফুটবল আর ইডেনে ক্রিকেট খেলতে দেখেছেন, তাঁদের অনেকেই আজো ভেবে পান না যে ফুটবল না ক্রিকেট কোনটা কম্পটন ভালো খেলতেন।

সেই কম্পটন তখন শর্ট লেগে ফিল্ডিং করছিলেন আর ভাবছিলেন যে কি করে মারচেণ্টকে আউট করা যায়। অথচ মারচেণ্টকে তাড়াতাড়ি আউট করতে না পারলে ইংলণ্ডের ভীষণ বিপদ। কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারছিলেন না কম্পটন।

১২৮ রান করার পর একটা বল লেগের দিকে ঘুরিয়ে মেরে রান নিতে শুরু করলেন মারচেণ্ট। কম্পটন ফিল্ডিং করছিলেন শর্ট লেগে। তিনি ছুটলেন বলটার পেছনে। মারচেণ্ট তখন একটা রান নিতে শুরু করেছেন। বলের কাছে পৌঁছে কম্পটন বুঝলেন যে হাতে তুলে সেই বল উইকেটে ছুঁড়ে মেরে মারচেণ্টকে কিছুতেই আউট করা যাবে না। তখনই কম্পটনের মাথায় খেলে গেলো একটা সাজ্যাতিক বুদ্ধি। কম্পটন করলেন কি—উইকেট লক্ষ্য করে ফুটবলের মতো সেই ক্রিকেট বলটায় করলেন এক কিক। মুহূর্তের মধ্যে বলটা গিয়ে ভেঙ্গে দিল উইকেট। হতভম্ব মারচেণ্ট বোকা বনে গিয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলেন উইকেটের দিকে। তারপর প্রশংসার চোখে কম্পটনের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন মাঠ ছেড়ে!

প্রথমে ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারে নি। তারপরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল সারা মাঠ। হাততালি আর থামে না। এমন অভিনব রান আউট আর যে কেউ কখনো দেখে নি। ক্রিকেট ইতিহাসের এ এক নতুন নজীর।

মারচেণ্টকে যেমন বোকা বানিয়ে আউট করে দিয়েছিলেন কম্পটন, তেমনি নিজেও একবার অনেকটা ঐ রকম ভাবে আউট হয়ে গিয়েছিলেন।

সেদিন লর্ডস মাঠে সারের বিরুদ্ধে খেলছিলেন কম্পটন। খুব সুন্দর ভাবে ব্যাটিং করছিলেন তিনি। মারের পর মার, রানের পর রান—সারা মাঠে ফিল্ডারদের ছুটোছুটির অন্ত নেই। উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে উইকেটরক্ষক আর্থার ম্যাকেণ্টায়ার সুযোগ খুঁজছিলেন কম্পটনকে আউট করার। ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগে বেশ ভয়ে ভয়েই দাঁড়িয়েছিলেন এরিক বেডসার। কম্পটন যেভাবে লেগের দিকে ঘুরিয়ে বল মারছেন তাতে যে কোন মুহূর্তেই বেডসার বলের আঘাতে আহত হয়ে পড়তে পারেন!

ঠিক তখনই একটা লাফানো বল পেয়ে কম্পটন কষে হুক করলেন। ভীষণ জোরে মেরেছেন কম্পটন—নির্ঘাৎ বাউণ্ডারী। বলটা কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগে এরিক বেডসারের পায়ের বুটে লেগে ছিটকে গিয়ে পড়ল উইকেট রক্ষক আর্থার ম্যাকেণ্টায়ারের হাতের গ্লাভসের মধ্যে। প্রথম হতভম্ভ হয়ে গেলেও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই 'হাউজ দ্যাট' বলে চিৎকার করে উঠলেন আর্থার। আম্পায়ারও আউটের নির্দেশ দিতে দেরী করলেন না এক মুহূর্তও। কম্পটন তখন থ। ঠিক ঐ ভাবে যে তিনি কট আউট হবেন তিনি তা বোধহয় কোনদিন ভাবতেও পারেন নি।

'আউট অফ হিজ গ্রাউণ্ড' নিয়ম অনুসারে ইংলণ্ডের ট্রেভার বেইলী একবার আউট হয়ে গিয়েছিলেন ভারী অদ্ভুৎভাবে। এ সেই ১৯৫৩ সালের কথা। সেবার লীডস মাঠে টেস্ট খেলা হচ্ছিলো অস্ট্রেলিয়ার সংগে ইংলণ্ডের। একটা বল মারার পর রান না নিয়ে বেইলী দাঁড়িয়ে দেখছিলেন—বলটা কোথায় যায়। পপিং ক্রীজের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে বেইলীর ব্যাটটা ছিলো ক্রীজের প্রায় এক ফুট মধ্যে। কিন্তু বলটা দেখতে বেইলী এতোই ব্যস্ত ছিলেন যে ক্রীজের মধ্যে তাঁর ব্যাটটা যে মাটি ছুঁয়ে নেই সেদিকে এতোটুকুও লক্ষ্য ছিলো না তাঁর। ব্যাপারটা কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার উইকেট রক্ষকের

নজর এড়ায় নি। ফলে বলটা হাতে পেয়েই তিনি উইকেট ভেঙ্গে দিলেন আর বেইলীও অসহায়ের মতো আউট হয়ে গেলেন ক্রিকেট খেলার আইনকানুনের ৩২ নম্বর আইন আউট অফ হিজ্ গ্রাউণ্ড' নিয়ম অনুসারে।

ক্রিকেট খেলার আইনকানুনের ৪০ নম্বর নিয়মটি হলো অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্যে আউট অর্থাৎ অবস্ট্রাকটিং দি ফিল্ড। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় আজ পর্যন্ত এই নিয়ম অনুসারে একজন খেলোয়াড়ই আউট হয়েছেন। আর তিনিই হলেন ইংলণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান লেন হাটন।

ঘটনাটা ঘটে ১৯৫১ সালে ওভাল মাঠে ইংলণ্ডের সংগে সাউথ আফ্রিকার পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ খেলার সময়। একটা বল হাটন সাহেবের ব্যাটে লেগে উঠে গেল মাথার ওপরে—ঠিক উইকেটের ওপরে। পড়তে দিলে বলটা নির্ঘাৎ ঐ উইকেটের ওরই পড়বে। তাই হাটন গেলেন তাঁর উইকেট বাঁচাতে। ওদিকে আবার সাউথ আফ্রিকার এনডেন ছুটে এলেন ক্যাচটা লোফার জন্যে। ওদিকে হাটনও তাঁর উইকেট সামলাতে ব্যস্ত। ফলে তিনি এনডেনের ক্যাচ লোফায় বাধার সৃষ্টি করলেন। তাই ক্যাচ লোফা আর হল না। ক্যাচটা লুফতে না পেরে এনডেন আর সাউথ আফ্রিকার আর কয়েকজন খেলোয়াড় 'অসুবিধা সৃষ্টির জন্যে আউট' নিয়ম অনুসারে আবেদন জানালেন। আম্পায়ারকেও তাই বাধ্য হয়েই আউটের নির্দেশ দিতে হলো।

টুপিটা গিয়ে পড়ল একেবারে উইকেটের ওপর!

খেলতে গিয়ে উইকেট ভেঙ্গে ফেললে ব্যাটসম্যান 'হিট উইকেট' নিয়ম অনুসারে আউট হয়ে যান। উইকেট যেভাবেই ভাঙ্গুক না কেন ব্যাটসম্যান 'হিট উইকেট' হবেন—তা সে ব্যাটসম্যানের শরীরে লেগে

কিম্বা অন্য যে কোন ভাবেই হোক না কেন।

ইংলণ্ডের ডন কেনিয়ান একবার এইভাবে আউট হয়ে গিয়েছিলেন। এ সেই ১৯৪৯ সালের কথা। নটিংহামশায়ারের সংগে খেলা হচ্ছিলো উরচেস্টার দলের। উরচেস্টার দলের কেনিয়ন সাহেব ভালো ব্যাটসম্যান আর সেদিন ব্যাটিংও করছিলেন খুব সুন্দরভাবে। সেই সময় লেগ স্টাম্পের বাইরে একটা বল পেয়ে কষে হুক করলেন ডন কেনিয়ন। খুব জোরে মেরেছিলেন কেনিয়ন। মারার পর সমস্ত শরীরটা তাঁর এক পাক ঘুরে গেল আর সংগে সংগে তাঁর মাথা থেকে খুলে পড়ে গেলো মাথার কাউন্টি ক্যাপটা। আর টুপিটা গিয়ে পড়লো একেবারে উইকেটের ওপরে। ফলে স্টাম্পের মাথা থেকে বেল দু'টো ছিটকে পড়লো মাটির ওপরে। ভেঙ্গে গেল উইকেট। ফলে আউট হয়ে গেলেন উরচেস্টার দলের নামকরা ব্যাটসম্যান ডন কেনিয়ন। আউট হয়ে গেলেন বড় বিশ্রীভাবে অসহায়ের মতো হিট উইকেট হয়ে।

এরকম সব দারুণ মজার আর ভারী অদ্ভুৎভাবে আউট হয়ে যাবার ঘটনা ক্রিকেট মাঠে প্রায়ই না ঘটলেও মাঝে মাঝে ঘটে। তাই সেই সব ঘটনার কথা আমরা কেউই ভুলে যাই না। মনে করে রাখি। আর সময়ে অসময়ে খেলার মাঠে, গল্পের আসরে কিম্বা জমাটি আড্ডায় এইসব অদ্ভুৎ যতো আউটের ঘটনার কথা বলে আনন্দ-হাসি-গানে ভরিয়ে তুলি সকলে মন। ক্রীড়া রসিকদের কাছে এইসব ঘটনার দাম যে সত্যিই অনেক···।

ইচ্ছের ফুল

সুচেতা ভট্টাচার্য

আমার মনের ইচ্ছেরা আজ ফুল হয়েছে ফুটে।
মনের ভেতর থেকে তারা বাইরে এলো ছুটে।
তোমরা এলে ফুল ফুটেছে বাগান আলো করা,
কেউ কি জানো এ সব আমার ইচ্ছে দিয়ে গড়া ?

বাগান জুড়ে ফুল ফুটেছে কতো যে তার রঙ !
মুখ লুকিয়ে মুখ বাড়িয়ে কতো যে তার ঢঙ।
তোমরা খুসি। ফুলের মেলা কি সুখ দু-চোখ ভরে !
জানলে না কেউ এইখানে কার ইচ্ছে খেলা করে।

নতুন ধাঁধা

(১)

গভীর নিশীথে পাবে, পাবে না সকালে,
নববরষায় আছে, নাই শীতকালে,
জনপদে আছে, তবু শহরেতে নাই।
বলত কি নাম তার, হে পাঠক ভাই?

(২)

কোথা থেকে পাই জ্ঞান বিস্তর?
কোন ব্যক্তি হয় প্রবঞ্চনা-পর?
ক্ষুধার্তের কাছে কাম্য কি জিনিস?
কোথায় জমিয়ে বসে মজলিস?
উত্তর আছে সকলেরই জানা।
একটি কথায় ——————

(শূন্যস্থানে এমন একটি কথা বসাও যাতে প্রথম চার লাইনের চারটি প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যায়। মিল-ছন্দ ঠিক রেখো কিন্তু)

(৩)

একটা লাল, একটা নীল আর একটা সবুজ বাটিতে তিনটে লাল, তিনটে নীল আর তিনটে সবুজ বল রাখা হয়েছে।

প্রত্যেক বাটিতেই তিনটে করে বল আছে তবে কোন বাটিতে কি কি রঙের বল আছে তা সঠিক জানা নেই।

শুধু জানা আছে যে—(ক) সবুজ বাটিতে সবুজ বল নেই (খ) আর প্রত্যেক বাটিতেই একটা নীল বল আছে।

দূর থেকে নির্দেশ দিয়ে, অপর কারোর দ্বারা এক এক করে বল তোলালে সব চেয়ে কম দানে কিভাবে নিশ্চিত তিন রঙের বল পেতে পারবে? কয় দান লাগবে?

শ্রাবণ মাসের ধাঁধাঁর উত্তর

(১) সন্দেশ।

(২) ৩ মাইল!

(৩) ডায়রিটা এখন ক্ষান্তিমাসীর কাছে আছে।

যদি মাসীদের নামগুলি কিছুটা দূরে দূরে এক একটা ঘর কেটে বসিয়ে তারপর কে কাকে দিয়েছে বা কার কাছ থেকে পেয়েছে সব 'তীর' চিহ্ন দিয়ে দেখাও, তাহলেই বুঝতে পারবে যে এক মান্ত আর ক্ষান্তি ছাড়া অন্য সবাই যতবার ডায়রি পেয়েছে, ততবার ফেরত দিয়েছে, সুতরাং তাদের কাছে এখন ডায়রিটা থাকতেই পারে না।

মান্ত মাসীর কাছে ডায়রি এসেছে দুবার, কিন্তু সে পাঠিয়েছে তিনবার, আর ক্ষান্তি মাসীর কাছে সেটা এসেছে দুবার কিন্তু সে পাঠিয়েছে মাত্র একবার।

সুতরাং মান্ত মাসী নিশ্চয় ডায়রিটা প্রথমে পেয়েছিল আর ক্ষান্তিমাসী পেয়েছে সবচেয়ে শেষে, মানে সেটা এখনও তার কাছেই আছে।

আষাঢ় মাসের ধাঁধাঁর উত্তর দাতাদের নাম—

আষাঢ় মাসে কেবলমাত্র তিনটি গ্রাহক প্রথম ধাঁধাটির উত্তর দিতে পেরেছিল। তাদের অভিনন্দন জানাই, কারণ ধাঁধাটি সত্যিই একটু বেশি কঠিন হয়ে গিয়েছিল। এরা তিনজনেই জ্যৈষ্ঠ মাসের সব উত্তরও ঠিক দিয়েছিল।

যাদের দুটি উত্তর ঠিক ঃ—

১৪৮১ উত্তমকুমার বটব্যাল, ২১৭০ অম্লান ভট্টাচার্য, ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায়।

যাদের একটি উত্তরই ঠিক ঃ—

১ দীপংকর বসু, ১১৫ অর্পিতা, কিশলয় ও কিশোর চক্রবর্তী, ১৭৫ অনীতা রায়, ১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ২৯৫ শম্পা ও শর্মিলা দত্ত, ৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ৮৩৮ সুপ্রতীক বাগচী, ৮৯৪ তপন ঘোষ, ১২২৪ সমীর সাহা, ১২৩২ নন্দিনী দত্ত মজুমদার, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৪২৫ মিত্রা রায় চৌধুরী, ১৬১৫ পথিকৃৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬০৩ নিশীথরঞ্জন, নীতীশরঞ্জন, সমীর ও মিতালী গুহ, ১৮২৭ অণুতোষ ও অশোক চট্টোপাধ্যায়, ১৮৯৪ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২০২৯ শুভ্রা বিশ্বাস, ২০৭২ মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১৪২ স্বর্ণাভ ব্যানার্জী, ২২১৫ শুভা মজুমদার, ২২৩৯ অনীতা ও প্রণব চট্টোপাধ্যায়, ২২৯৪ সুনন্দন চক্রবর্তী, ২৩৯৬ চিন্ময় ভট্টাচার্য ২৪৪১ দেবোপম চক্রবর্তী, ২৪৫১ দোলা চৌধুরী, ২৪৫৬ অর্ধেন্দু ও মমতা কর্মকার, ২৪৬৭ মহাশ্বেতা ও অমিত বিক্রম ঘোষ, ২৪৮৪ পার্থবন্ধু গুহ, ২৫৪৪ সান্ত্বনা রায় চৌধুরী, ২৫৪৫ বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত, ২৫৪৭ প্রসেনজিৎ ও মৈত্রেয়ী বসু, ২৬৩১ সুতপা ও অমিতাভ বিশ্বাস, ২৬৭৬ শুদ্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, ২৭৬৩ সব্যসাচী বসু, ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত।

শ্রাবণ মাসের ধাঁধার উত্তর দাতাদের নাম ঃ—

সব কয়টি ঠিক ঃ—

১ দীপংকর বসু, ১৭৫ অনীতা রায়, ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ২৯৫ শম্পা ও শর্মিলা দত্ত, ৩৪০ পূরবী চক্রবর্তী, ৮৮৯ প্রেমেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, ৮৯৪ তপন ঘোষ, ৮৯৮ হিমাদ্রি ও দোলনচাঁপা চৌধুরী, ১২৯২ সুজাতা ও সুবীর ঘোষ, ১৩৪২ অভিজিৎ ভটাচার্য, ১৫৮৩ অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ১৬০৩ নীতীশ, নীশিথ, সমীর ও মিতালী গুহ, ১৮১২ অমিতাভ

ও শুভব্রত মুখার্জী, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২০৯৩ দেবাশিস দত্ত, ২২১৫ শুভা মজুমদার, ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায়, ২২৯৭ প্রদীপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪২২ অতীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, ২৪৫৪ তপন বিকাশ সাহা, চাঁচল রাজ হিন্দু হোস্টেল, ২৪৬৬ অর্ধেন্দু ও মমতাময়ী কর্মকার, ২৪৯৬ স্মরজিৎ দে, ২৫৪৭ প্রসেনজিৎ ও মৈত্রেয়ী বোস, ২৫৬২ সিদ্ধার্থ রায়, ২৬২৯ চিত্রাঙ্গদা বসু. ২৭৬৩ সব্যসাচী ও শর্মিলা বসু, ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত।

একটি নাম ধামহীন উত্তর—(সঙ্গে আষাঢ় মাসের তৃতীয় ধাঁধার উত্তর আছে! দাদুর ডায়রিটা কোন মাসীর পরে কে পেলেন বেশ সুন্দর করে, তীর দিয়ে দিয়ে; এক দুই লিখে দেখানো আছে!) কে তুমি?

দুটো উত্তর ঠিক

১১৫ অর্পিতা, কিশোর ও কিশলয় নন্দী, ১২৪ দীপঙ্কর ও রুমা মজুমদার, ৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ' ৩৯৩ নন্দিতা, বন্দনা, দেবাশীষ ও জ্যোতির্ময় বরাট, ৩৯৭ ভারতী বসু, ৫৭৬ মণিদীপা চৌধুরী, ৬১৪ দেবাশীষ ও স্নেহাশীষ হালদার, ৭৫৩ গৌতম মুখার্জী, ১২৩২ নন্দিনী দত্ত মজুমদার, ১৪২৫ মিত্রা রায় চৌধুরী, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৪৮১ উত্তমকুমার বটব্যাল, ১৫৪৫ অরুণ প্রকাশ ভট্টাচার্য, ১৬৫৫ শৃণ্বন্তী পাল, ১৭০৫ কৃষ্ণকলি ও চন্দ্রাবলী বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮০৫ দেবাশিষ রক্ষিত, ১৮৬৩ সোনালী লাহিড়ী, ১৮৯৪ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ১৯৬২ প্রদীপ পারেখ, ২০২৩ উৎপল কুমার চক্রবর্তী, ২০২৮ সুব্রত ঘটক, ২০২৯ শুভ্রা বিশ্বাস, ২০৬৬ মিলিন্দ চক্রবর্তী, ২১৪২ স্বর্ণাভ ব্যানার্জী, ২১৫২ সুরজিৎ, অনুপ ও শিপ্রা কর পুরকায়স্থ, ২১৫৯ স্বাহা বাগচী, ২১৭০ অম্লান ভট্টাচার্য, ২২৩৯ অনীতা চট্টোপাধ্যায়, ২৩৮০ মুকুল দাস, ২৩৯৬ চিন্ময় ভট্টাচার্য, ২৪৪১ দেবোপম চক্রবর্তী, ২৫২২ শুক্লা কাহালী, ২৫৪৪ সান্ত্বনা রায়চৌধুরী, ২৫৪৫ বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত, ২৫৬৩ হেদায়েতুল্লা, ২৬১২ চৈতালি সান্যাল, ২৭৬১ ঋতা, মিতা ও ইন্দ্রানী সেনগুপ্ত, ২৭৭৭ তপনকুমার ও সুব্রত চক্রবর্তী।

যাদের একটি উত্তর ঠিক হয়েছে—

২২৬ জয়ন্ত ও প্রবালকুমার নন্দীরায়, ২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ১৯০২ অভিজিৎ চৌধুরী, ২০৭২ মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩৯৩ আমির উদ্দীন চৌধুরী, ২৪৫১ দোলা চৌধুরী, ২৬২৮ রঞ্জন ব্যানার্জি, ২৬৫৩ অসিতনাথ ভট্টাচার্য, ২৬৭৬ শুদ্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, ২৬৮১ কৃশাণু ঘোষ, ২৭৩৫ উৎপল ও সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য, ২৭৪০ সোনালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭৮২ সুপ্রভাত ও সুমিতা মৈত্র, ২৮৩৭ অর্পিতা রায় চৌধুরী।

আষাঢ় মাসের তৃতীয় ধাঁধার সঠিক উত্তর দাতাদের নাম :—

১ দীপংকর বসু, ২৯৫ শম্পা ও শর্মিলা দত্ত, ৮৯৪ তপন ঘোষ, ১২৩২ নন্দিনী দত্ত মজুমদার, ১৬১৫ পথিকৃৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৯৪ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২১৭০ অম্লান ভট্টাচার্য. ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায়, ২৩৫২ রঞ্জিনী রায় চৌধুরী, ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত।

ধাঁধা প্রতিযোগিতার বিষয়ে—

ধাঁধার উত্তর দিতে প্রধানতঃ সহজবুদ্ধির প্রয়োজন হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিচারশক্তি পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, ভাষাজ্ঞান, সংখ্যাজ্ঞান ইত্যাদি দরকার হয়। কোন কোন ধাঁধায় খোপ কেটে নিলে বা এঁকে নিলে উত্তর বার করতে সুবিধা হয়।

কিন্তু, অনেক সময়ে তোমরা ধাঁধার সর্তগুলি ভাল করে লক্ষ্য করছ না বলে, উত্তর ঠিক হতে হতে একটুর জন্য ভুল হয়ে যাচ্ছে। এবার থেকে সবাই আরো মন দিয়ে ধাঁধার উত্তর বার কর—কেমন?

কয়েকটি উদাহরণ দিই—(১) জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় ধাঁধার উত্তরে গ্রাঃ নং ১৯৯৪ মালা রায় 'কুল' লেখনি,

কারণ জানিয়েছ, 'গরমকালে কুল হয় না।' কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে, গরমকাল ছিল না (ছিল কেবল গল্পের মধ্যে)—প্রশ্ন ছিল **'গল্পের মধ্যে কটা ফলের নাম লুকোন আছে?'**

(২) আষাঢ় মাসের প্রথম ধাঁধার বিষয়ে ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত লিখেছ যে **ছয়টি শূন্যস্থান পূর্ণ করতে পার নি** বলে উত্তর দিতে পার নি।

কিন্তু—প্রশ্ন কি ছিল লক্ষ্য কর—**'মিল ছন্দ ঠিক রেখে শেষ ছত্রে সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও'**—কোন বিশেষ সংখ্যক শূন্যস্থানের কথা বলা হয় নি।

(২) আষাঢ় মাসের তৃতীয় ধাঁধা সঠিক ছাপা হবার পরেও বেশি উত্তর পাই নি। তাছাড়া কেউ কেউ শুধু লিখেছ কোন কোন থলিতে কি কি বল আর কি কি লেবেল থাকা সম্ভব। কিন্তু সেটা তোমরা আন্দাজে বার করেছ, না যুক্তি দিয়ে বার করেছ তা বুঝবার কোন উপায় নাই!

এখানে প্রশ্ন কিন্তু তা ছিল না। চিনু কি ভাবে যুক্তি দিয়ে বল ও লেবেলের স্বরূপ বার করেছিল, এটাই হল জিজ্ঞাস্য। তোমাদেরই একজনের দেওয়া উত্তর ছাপিয়ে দিলাম। তাহলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

প্রথমেই মনে রেখো যে, চিনু জানে কটা থলি আছে, বল আছে, ও কটা লেবেল আছে এবং কি ভাবে বলগুলি থাকতে পারে।

অন্য সকলের মতন, এটাও সে জানে যে **কোন থলিতেই সঠিক লেবেল নেই**। প্রত্যেকে কেবল নিজের লেবেল দেখতে পাচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ সে দেখল যে দিনু দুটো কালো বল বার করে (নিজের লেবেল দেখে) তৃতীয়টা আন্দাজে বলতে পারল।

তারপর বিনু একটা কালো একটা সাদা বার করে, লেবেল দেখে তৃতীয়টা বলল। কিন্তু মিনু দুটো সাদা বার করে লেবেল দেখেও তৃতীয়টা বলতে পারল না।

এই **তথ্যগুলির ভিত্তিতে** এবং নিজের লেবেল দেখে চিনুকে যুক্তির সাহায্যে বুঝতে হবে কার কাছে কি বল ছিল ও কি লেবেল ছিল। তাহলে সে তৃতীয় বলগুলি সহজেই বলে দিতে পারবে। এবারে ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায়ের উত্তর কি ছিল শোন।

আষাঢ় মাসের তৃতীয় ধাঁধার উত্তর

উদয়ন মুখোপাধ্যায়—গ্রাহক সংখ্যা ২২৫৭

(ক) চিনু নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করে এটা পেরেছিল। সে ভাবল:—দিনু তুলল দুটো কালো এবং সে বলল তৃতীয় বলটা কি সে বুঝে গেছে। অতএব দিনুর থলির লেবেল থাকতে পারে তিনটি কালো বা দুই কালো ও ১ সাদা। এবং তার বল থাকতে পারে তিনটি কালো বা দু'টি কালো ও ১ সাদা। যে লেবেলটি থাকবে তার উল্টো বলগুলিই থলিতে থাকবে। (১) প্রথমে মনে করি দিনুর লেবেল রয়েছে ৩ কালো। অতএব তার কাছে ২ কালো ১ সাদা থাকবে।

এরপর বিনু ১ কালো ও ১ সাদা তুলে বলল তৃতীয় বলটা কি সে তা বুঝেছে। অতএব তার কাছে এ ক্ষেত্রে ২ সাদা ১ কালোই থাকবে।

কারণ—সে ১ সাদা ১ কালো যখন তুলেছে তখন ২ সাদা ১ কালো থলিতে বল থাকবে নয়ত ২ কালো

১ সাদা থাকবে। থলির লেবেলও থাকতে হবে ২ সাদা ১ কালো নয়ত ২ কালো ১ সাদা। দিনুর ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে তার কাছে আছে ২ কালো ১ সাদা।

অতএব এর কাছে ২ সাদা ১ কালো থাকবে।

অতএব লেবেল থাকবে অপরটি, অর্থাৎ ২ কালো ১ সাদা। এরপর মিনু দুটো সাদা বল তুলে বলল সে তৃতীয় বলটা কি তা বুঝতে পারেনি। তার থলিতে থাকা সম্ভব ২ সাদা ১ কালো বা ৩ সাদা। ইতি-মধ্যে ২ সাদা ১ কালো বিনুর হয়ে গেছে।

অতএব মিনুর কাছে শুধুমাত্র ৩ সাদা থাকা সম্ভব। কিন্তু তার লেবেলে ৩ সাদা বা ২ সাদা ১ কালো কিছুই থাকা সম্ভব নয়।

কারণ এর মধ্যে যে কোন একটি থাকলেই সে তৃতীয় বলটি কি বলে দিতে পারত। এক্ষেত্রে সে তা পারেনি। মিনুর কাছে বাকী যে দুটি লেবেল থাকা সম্ভব সেগুলি দিনু ও মিনুর লেবেলে ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মিনুর কাছে উপযুক্ত লেবেল নেই। তাহলে হিসাব ভুল হয়ে যাচ্ছে। অতএব প্রথমে দিনুর বলগুলি ২ কালো ১ সাদা ধরা ও লেবেল ৩ কালো ধরা ভুল হয়েছে।

(২) সুতরাং এবারে দিনুর লেবেল এবং বল ধরতে হবে আগে যা ধরা হয়েছিল তার উল্টো, অর্থাৎ দিনুর লেবেল ২ কালো ১ সাদা এবং বল ৩ কালো। বিনুর কাছে থাকবে ২ কালো ১ সাদা বা ২ সাদা ১ কালো। সে যখন তৃতীয় বলটা কি বুঝেছে তখন ঐ দুটোর মধ্যেই ১টি লেবেল থাকবে। ২ কালো ১ সাদা লেবেল দিনুর আছে। সুতরাং ২ সাদা ১ কালো বিনুর লেবেল থাকবে। এবং বল লাকবে তার উল্টোটি, অর্থাৎ ২ কালো ১ সাদা। এরপর মিনুর ৩ সাদা বা ২ সাদা ১ কালো থাকবে। সে তৃতীয় বল বুঝতে পারলে লেবেল হত ৩ সাদা। ২ সাদা ১ কালো হত না কারণ তা আগেই বিনুর লেবেল ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ৩ সাদা লেবেল থাকলেও সে তৃতীয় বল বুঝে যেত।

অতএব অবশিষ্ট লেবেল ৩ কালো থাকবে। তার বল থাকার সম্ভাবনাও দুটি। ৩ সাদা বা ২ সাদা ১ কালো। প্রথমে মনে করি বল রয়েছে ২ সাদা ১ কালো এবং লেবেল আগেই লিখেছি ৩ কালো। তখন চিনুর বাকী থাকে ৩টি সাদা বল। এবং লেবেল ও বাকী থাকে ৩ সাদা। লেবেল ও থলির বল এক হতে পারে না। অতএব মিনুর ২ সাদা ১ কালো বল ধরাই ভুল হয়েছিল। অর্থাৎ আসল বল হবে ৩ সাদা। এবং লেবেল হবে ৩ কালো। লেবেল ৩ কালো হবে কেন তা আগেই বলা হয়েছে। এরপর চিনুর কাছে ২ সাদা ১ কালোই অবশিষ্ট থাকে এবং লেবেলও থাকে ৩ সাদা।

∴ চিনুর বল ও লেবেল যথাক্রমে ২ সাদা ১ কালো ও ৩ সাদা।

∴ দিনুর বল ৩ কালো ও লেবেল ২ কালো ১ সাদা।

∴ বিনুর বল ২ কালো ১ সাদা ও লেবেল ২ সাদা ১ কালো।

এবং মিনুর বল ৩ সাদা ও লেবেল ৩ কালো।

(খ) দিনুর থলিতে তৃতীয় বলটা ছিল কালো রঙের।

বিনুর থলিতে তৃতীয় বলটা ছিল কালো রঙের।

মিনুর থলিতে তৃতীয় বলটা ছিল সাদা রঙের।

চিনুর থলিতে ২ সাদা ১ কালো বল ছিল।

এবার চিঠিপত্রের উত্তর দেবার আগে সাধারণ ভাবে কয়েকটা কথা না বলে পারছি না। পুজোর সময় নিশ্চয় সকলে যথেষ্ট আমোদ-আহ্লাদ করেছ, অনেক উপহার ও আশীর্বাদও পেয়েছ। সেই সঙ্গে আমাদের স্নেহ ও আশীর্বাদ এবং কিঞ্চিৎ পরামর্শও নিও।

প্রথম কথা হল পত্রিকা পেয়ে প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা অবধি একবার পড়ে দেখো। অনেক জানবার ও উপভোগ করবার জিনিস পাবে। আমাদের উপরেও খানিকটা সহানুভূতি হবে। এত কথা লেখার কারণ যে এবার স্পষ্ট টের পেয়েছি যে তোমাদের মধ্যে অনেকেই সব পাতা পড় না। তার ফলে মিছিমিছি আমাদের উপর রেগেমেগে নিজেরা চিঠি লেখ, বা অভিভাবকদের দিয়ে লেখাও। আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় তোমাদের জানানো হয়েছিল যে ভাদ্র-আশ্বিন দুইটি সংখ্যা মিলে চারগুণ আকার নিয়ে, মহালয়ার আগেই পূজা সংখ্যা হয়ে বেরুবে। তাই বেরিয়েছে।

অথচ রাশি রাশি চিঠি পেয়েছি, 'কেন ভাদ্র সংখ্যা পাই নি!!' তার মধ্যে কিছু চিঠি বেশ রাগত ভাবের। তবে এত দিনে পূজা সংখ্যা পেয়ে, সমস্ত ব্যাপার অবগত হয়ে, হয় তো মন-মেজাজ ভালো হয়েছে।

এ বিষয়ে আরেকটা কথা হল যে প্রতি মাসে, যথা সময়ে, প্রত্যেককে পত্রিকা পাঠানো হয়, under certificate of posting। তবু ডাকে কিছু হারায়। এই হারানোর জন্যে আমরা দায়ী না হলেও, দিন দশেকের মধ্যে জানালে, আমরা সর্বদা আরেক কপি পত্রিকা পাঠিয়ে দিই। কেবল পূজা সংখ্যা হারালে আর দেওয়া সম্ভব হয় না এটাও তোমরা ভালো করেই জানো। তোমরা পত্রিকা না পেলে আমাদের দুঃখ হয়, আনন্দ হয় না। তোমরা আমাদের উপর রাগ করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

এবার চিঠির উত্তরে আসা যাক।

(১) জ্যোতির্ময় মজুমদার, ৯৮৩, বয়স ১৭

তোমার চিঠির উত্তর সবার আগে দিচ্ছি, কারণ এই তোমার শেষ চিঠি। ১৭ পূর্ণ হয়ে গেলে আর চিঠি-পত্রের, প্রতিযোগিতার, বা হাত পাকাবার আসরে যোগ দেওয়া যায় না। কিন্তু সম্পাদকদের সর্বদা চিঠি লেখা যায় ও লেখা পাঠানো যায়। ভালো হলে সেগুলো সাধারণ বিভাগে ছাপতে পারি। আশা করি তুমিও যোগাযোগ রাখবে।

দেখ, বয়সটা যেমন বাড়তে থাকবে, বুদ্ধিটাকেও যদি তেমনি পাকিয়ে ফেলতে থাক, দেখবে কি মজা হবে। ঐ যে অরু-মিতুদের গল্প সম্বন্ধে ১৫০টি শব্দ দিয়ে বিশদ আলোচনা করেছ, ওটা নিতান্ত কাঁচা মন্তব্য হয়েছে। গল্পটি মোটেই দুঃখবাদী নয়, বোকাও নয়। কি করে দুঃখকে জয় করে প্রতিকূল অবস্থার উপরে চড়তে হয়, তার গল্প। তবে হ্যাঁ, যদি বল যে ভাল লোকেরা চেষ্টা করে কিভাবে সাফল্য লাভ করে, তার গল্প 'সেন্টিমেণ্টাল' আর দুষ্টু লোকরা কিভাবে বাদশাহী আংটি হাতাবার কূট ষড়যন্ত্র করে, কিম্বা বিল্লিসহ মোটর গাড়ি হাওয়া করে দেয়, শুধু তার গল্পই খুব পাকা বুদ্ধির পরিচয় দেয়, তাহলে সন্দেশের সম্পাদকদের কিছু বলবার থাকে না। যার যেমন রুচি, সে তাই বুঝে ভালো-মন্দ বলে। সত্যিকার ভালো মন্দ ভেদ করা খুব শক্ত, আশা করি এটা জান?

(২) জুলু সেন, ২৫১৯, বয়স ১৬

তোমার চিঠি খুব ভাল হয়েছে। এইভাবে যদি আমাদের পত্রিকায় ছাপা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ধাঁধা ইত্যাদি সম্বন্ধে তোমাদের মতামত জানাও, আমরা খুব খুশি হব। পূজা সংখ্যা কেমন লাগে জানিও।

(৩) অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ১৯২, বয়স ১৬ ও ১৩

সন্দেশের মলাট এঁকে দেন তোমাদের সম্পাদক মশাই, সত্যজিৎ রায়। অনেক আগে ১৯১৩ সালে যখন প্রথম সন্দেশ বেরোয়, তার মলাট এঁকে দিতেন তখনকার সম্পাদক, সন্দেশের প্রতিষ্ঠাতা ও সত্যজিতের ঠাকুরদাদা, ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। তারপরের সম্পাদক ৺সুকুমার রায়, সত্যজিতের বাবাও চমৎকার ছবি আঁকতেন। এইসব মলাটগুলো কেউ যদি সংগ্রহ করে রাখত, তার চমৎকার একটা অ্যাল্‌বাম হয়ে যেত। এখন থেকে রাখ না কেন?

(৪) মহাশ্বেতা ঘোষ, ২৪৬৭, বয়স ১৪

অমিতবিক্রমের বয়স না দিলে তাকে কি করে চিঠি লিখি। বিজ্ঞানের আসরে সোজাসুজি চিঠি লিখো, আমাদের আপিসে। উপরে লিখো, 'বিজ্ঞানের' আসর'। মহাশ্বেতা পত্রবন্ধু চায়। শখ:— ডাক-টিকিট সংগ্রহ, গান, গল্পের বই পড়া।

(৫) মণিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩৪৮, বয়স ১৩

আমাদের পত্রিকা তো আমাদের সকলেরি ভালো লাগা স্বাভাবিক। তবে ভালো-মন্দ বিচার হারিও না। পূজা সংখ্যায় কি ভালো লাগল, কি লাগল না এবং কেন, সব লিখো।

(৬) পার্থবন্ধু গুহ, ২৪৮৪, বয়স ১৫

গ্রাহকদের লেখা গল্প হাত-পাকাবার আসরেই মানায়। বড় লেখা দিও না; জায়গায় কুলোয় না। কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখো। ১৭ বছর পূর্ণ হলে সাধারণ বিভাগের জন্য লিখো। ভালো হলে ছাপব।

(৭) অনসূয়া বসু, ১৯৯৭, বয়স ১২

তোমার জন্মদিন ৪ঠা জুলাই শুনে খুসি হলাম। আমাদের স্নেহাশীর্বাদ নিও। আশা করি

জান যে সেদিনটা হল অ্যামেরিকার স্বাধীনতা দিবস। ওখানে দেশ জুড়ে সেদিন আনন্দোৎসব হয়। আমার তো দিল্লী খুব ভালো লাগে। কত দেখবার জিনিস আছে, ঐতিহাসিক বাড়িঘর মিনার মসজিদ মায় গুড়িয়া-মাকান, অর্থাৎ পুতুলদের যাদুঘর।

(৮) তপন বিকাশ সাহা, ২৪৫৪, বয়স ১২

নিশ্চয় হাত পাকাবার আসরে লেখা পাঠাবে। ভালো হলেই আমরা ছাপি। ভালো না হলে কি করে ছাপি বল? লেখা পেলে তবে বলা যায় কেমন হল। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে কালি দিয়ে লিখো। খুব বেশি বড় লেখা দিও না। সর্বদা গ্রাহক সংখ্যা ও বয়স দিও।

পত্রবন্ধু চাই। শখ :—ছবি আঁকা, বই পড়া, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি তৈরি।

(৯) পূরবী চক্রবর্তী, ৩৪০, বয়স ১৫

গুপী গাইনের সব গানের কথা সিনেমার বইতে পাবে, আমাদের পত্রিকাতে কি আর অত কুলোয়?

(১০) শুভ্রা বিশ্বাস, ২০২৯, বয়স ১৪

তোমার শুভেচ্ছা পেয়ে আমরা সকলে খুসি। হাতপাকাবার আসরে লেখা পাঠিও, কেমন?

(১১) সুগত হাজরা, ২৩৭৪, বয়স ১২

গ্রাহক কার্ড পেয়েছ কি? না পেয়ে থাকলে ডাকে হারিয়েছে। পত্রপাঠ জানিও। লেখা ছেড়ো না, বরাবর লিখে যেও। ভালো হলেই ছাপা হবে। খেয়াল রেখো ছাপা হয় কি না।

(১২) অঞ্জন ভট্টাচার্য, ২৩৬১, বয়স ১২

ভালো চিঠি লিখেছ। বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তরের আসরে তোমরা কিন্তু বেশি ভালো প্রশ্ন পাঠাচ্ছ না। প্রশ্ন ভালো না হলে, উত্তর-ই বা কি করে বেশি ভালো হবে।

নববর্ষ সংখ্যা ভালো লেগেছিল খুব ভালো কথা, যদিও ম্যারাকট ডীপ মোটেই প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নয়, কন্যান ডয়লের গল্প, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মোহন জোয়ার্দার বাংলায় অনুবাদ করেছেন। উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপালে কি হয় জানতে হলে, হ-য-ব র-ল পড়বে।

পত্রবন্ধু চাই। শখ :—ডাকটিকিট সংগ্রহ, গল্প-কবিতা লেখা, বই পড়া, খেলাধুলা।

(১৩) মিত্রা রায় চৌধুরী, ১৪২৫, বয়স ১৩

সত্যিই, সুখলতা রাওকে হারিয়ে সমস্ত বাঙ্গালী ছেলেমেয়ে শোকাচ্ছন্ন হয়েছে। তুমি সন্দেশ কার্যালয়ে বই কিনতে যে বাড়িতে গিয়েছিলে, সেটি হল সুখলতা রাওয়ের মেজবোন পুণ্যলতা চক্রবর্তীর। তিনি ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর মেজ মেয়ে, 'ছেলেবেলার দিনগুলি'র রচয়িতা ও আমাদের পত্রিকার অক্লান্ত কর্মী শ্রীমতী নলিনী দাশের মা। উপরন্তু সম্পাদিকার জ্যেঠতুতো দিদি ও সম্পাদকের আপন পিসি। এবার খুসি হলে তো?

পত্রবন্ধু চাই। শখ :—ডাকটিকিট সংগ্রহ, গান, ছবি আঁকা।

(১৪) সুকান্ত সিংহ, ২৭২৫, বয়স ১২।

না, না, গ্রাহক যে কোনো বয়সের লোক হতে পারে। তবে ১৭ পেরুলে চিঠিপত্রের,

প্রতিযোগিতার, হাতপাকাবার ইত্যাদি আসরে যোগ দিতে পারবে না। গল্প ছবি গ্রাহকরা পাঠালে হাতপাকাবার আসরের জন্য বিবেচ্য হবে। বাইরের লোকের লেখা খুব ভালো হলে সাধারণ বিভাগে যেতে পারে। ১৭ বছরের বেশি বয়স্ক গ্রাহকদেরো তাই। যেমন ভালো ভালো গল্প জোগাড় করতে পারি, তেমনি ছাপি ভাই।

(১৫) শ্রীলতা চৌধুরী, গ্রাহক নং ১৩৩৬, বয়স ১৪ বছর ৮ মাস।

তোমার দিদি স্বাগতা চৌধুরী, সন্দেশের পুরোন গ্রাহিকা, এবার ১৯৬৯এর বি-এ পরীক্ষায় অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে জেনে খুবই আনন্দিত হলাম।

গ্রাহক-গ্রাহিকারা, তোমরা সকলেই স্বাগতার কৃতিত্বের খবরে আনন্দিত হয়েছ নিশ্চয়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যারা যথাসময়ে শারদায়া সন্দেশ হাতে নেবে বলে জানিয়েছিলে তাদের সংখ্যাগুলি ডাকে পাঠান হয়নি।

কেউ কেউ এখনও নাওনি—তাড়াতাড়ি এসে নিয়ে যেও।

যারা যথাসময়ে রেজিঃ ডাকে সন্দেশ পাঠাবার জন্য '৭৫ পাঠিয়েছিলে তাদের সন্দেশ রেজিঃ ডাকে পাঠান হয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ, সাধারণ ডাকে সন্দেশ পাঠান হয়ে যাবার পরে '৭৫ পাঠিয়েছ। তাদের নামে সেই পয়সা জমা রইল—চাঁদা দেবার সময়ে মনে রেখো।

বাকি সমস্ত গ্রাহকের সন্দেশ under certificate of posting পাঠান হয়েছে, ৪ঠা/৫ই অক্টোবরে তবু কারো কারো সন্দেশ হারিয়েছে জেনে আমরা খুব দুঃখিত হয়েছি। দুর্ভাগ্যক্রমে যাদের সন্দেশ ডাকে হারিয়েছে, তাদের আর এক কপি বিনামূল্যে দেওয়া ত আর সম্ভব নয়। কিন্তু তারা সন্দেশ কার্যালয় অথবা নিউস্ক্রিপ্টের দোকান, এ-১৪, কলেজ স্ট্রিট থেকে সংখ্যাটি শতকরা ২৫% কমিশন বাদ দিয়ে ৩'৭৫এর বইটি ২'৮০ দামে পাবে।

তবে এই বইটি আর সাধারণ ডাকে পাঠান হবে না। ২'৮০ + '৭৫ পাঠালে রেজিঃ ডাকে অথবা লোক পাঠালে তার হাতে দেওয়া হবে।

ক্রীড়াজগৎ

অজয় হোম

তোমরা যখন এই 'সন্দেশ' হাতে পাবে তখন ভারতের ক্রীড়াজগতে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। যেমন জাতীয়, ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন বোম্বাই প্রথম ইনিংসের জোরে ইরানি ট্রফি লাভ করে। বৃষ্টির জন্যে খেলাটা পুরোপুরি হতে পারে নি। অবশিষ্ট দলে পতৌদির অধিনায়কত্বে বাংলাদেশের অম্বর রায় ও সুব্রত গুহ খেলেন। নিউজিল্যাণ্ড দলের সফর শেষ বা শেষের মুখে। অস্ট্রেলিয়া এসে পড়ল বলে। দলীপ ট্রফি কবে খতম. রঞ্জিট্রফির খেলা ফাঁকে ফাঁকে চলছে

ফুটবল

শেষ হবে কটকে জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতা। যেখানে বাংলা অতি সহজে পূর্বাঞ্চলীয় ফাইনালে ত্রিপুরাকে ৩-০ গোলে হারায়। শেষ হবে জাতীয় ফুটবল বা সন্তোষ ট্রফির খেলা আমাদের নওগাঁয়।

আই এফ এ লীগও হয়তো শেষ হবে, কারণ সুপার লীগ শেষ হয়েছিল! এক বছর অসমাপ্ত থাকার পর ১৯৬৯ সালের ফুটবল লীগের উপর যবনিকা পড়ে। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গোলশূন্যভাবে শেষ করে মোহনবাগান চ্যাম্পিয়নশিপ পায় তিন বছর পরে। এবার নিয়ে মোহনবাগান ১৪ বার লীগ জয় করল। এই কৃতিত্ব আর কোনো দলের নেই। জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। মোহন-বাগান লীগে রানার্স হয়েছে ৮ বার।

ভারতের ফুটবলের বর্তমানে কী যে হাল তার পরিচয় পাওয়া যায় দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আগত

ইয়াংগজি ফুটবল ক্লাব দিল্লীতে একটি প্রদর্শনী খেলায় কেবল কলকাতার নয় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠদল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ৪-০ গোলে হারানোতে। তাও ৮০ মিনিটের খেলার ১৫ মিনিট বাদ যায় আলো আর বৃষ্টির জন্যে। ইয়াংগ্জি অর্থাৎ সূর্যকিরণ ৪-২-৪ পদ্ধতিতে খেলল। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনলাম, সে খেলা দেখলে নাকি চক্ষু জুড়িয়ে যায়। কী নিষ্ঠা কী অনুশীলন! একজনকেও দেখা গেল না যে কোনও সময়ে বেজায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, প্রতিটি খেলোয়াড় বলের কানে কানে কথা বলছে, আর বল দ্বিধাহীনভাবে সেই হুকুম তামিল করছে। ওদের কাছে আমাদের অবস্থা হল মাতৃহারা শিশুর মতন। তাও তথাকথিত শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গল দলে সাত আটজন ভারতের জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন অভিজ্ঞাত থঙ্গরাজকে ৬৫ মিনিটের মধ্যে চারবার বোকা বানিয়ে দিল। থঙ্গরাজ ধরতেই পারল না কোথা দিয়ে কী ভাবে কী হল। অন্যে পরে কা কথা।

অথচ, এশিয়ার মেলবোর্ণ অলিম্পিকে আমাদের স্থান হয়েছিল চতুর্থ! দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়েছিলাম জাকার্তায়। অবশ্য সে সময় স্বর্গগত রহিম ছিলেন আমাদের কোচ। তিনি দ্বিতীয়ার্ধে অপূর্ব কৌশল অবলম্বন করিয়েছিলেন।

জাপানে ডাটমের ক্রামের এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ইয়ং শিক কিম এই দুই কোচ দু'দেশের খেলার ধারা পরিবর্তন করে নূতন জীবন দিয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়া ১৯৫৪ সালে ওয়ার্ল্ড কাপে হাঙ্গেরির কাছে ৯-০ গোলে হারে। তারপর থেকে এই ৬০ বছরের বৃদ্ধ কোচ কিম খেলার ধারা আমূল পরিবর্তন করে 'মডার্ন ফুটবল' যে কি তাই শিখিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়াকে। বর্তমানে ব্রহ্মদেশেও অদ্ভুত উন্নতি করেছে। শুধু আমরাই পিছিয়ে আছি। রহিমের বদলি হবার উপযুক্ত কোচ এখনও আমাদের কেউ জুটল না। কিমের মতো কোচ কবে যে জুটবে তাও জানি নে।

ভারতের ফুটবলের মান বাড়াতে গেলে আমাদের একটু জাতীয় খেলা কমিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা অন্যতম কর্তব্য বলেই মনে করি।

সাঁতার

ভারতের দূরপাল্লার সাতারে এবরও দুবারের পক প্রণালী জয়ী ইস্টার্ণ রেলের বৈদ্যনাথ নাথ মুর্শিদাবাদে ৭২ কিলোমিটার গঙ্গায় বুকে সাঁতার প্রতিযোগিতায় পরপর তিনবার প্রথমস্থান লাভের গৌরব অর্জন করেন। সময় লেগেছে ৯ ঘণ্টা ৮ মিনিট ২ সেকেণ্ড! দ্বিতীয় হন লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিক ৯ ঘণ্টা ২২ মিনিট ৫২ সেকেণ্ডে এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন ত্রিপুরার রতিরঞ্জন ধর।

ক্যাঁচকলা

গীতা বন্দোপাধ্যায়

আজকাল গল্প বলা কিন্তু খুব শক্ত।

পুতুলকে সেবার খুব গুছিয়ে গল্প বলতে বসেছিলাম। অনেকটা বলেওছিলাম। ও তো হেসেই বাঁচে না। অত্যন্ত ডেঁপোর মত বলে উঠল--

'মামণি, বানিয়ে বানিয়ে আর কতদিন চালাবে?'

'মানে?'

'ঐ হল! বুঝে নাও।'

ভাবলাম বার তেরো বছরের মেয়ে। বোধহয় সিনেমা দেখে দেখে মাথা বিগড়ে গেছে। চুপ করে ভাবছি ওকে একটু জ্ঞানের আলো দেবো কিনা, ও আমাকে উলটে দিব্যজ্ঞান দিয়ে দিল—

'এরকম গল্প শোনার চেয়ে সিনেমা দেখা ঢের ভাল। ওতে চক্ষু, কর্ণ—সব একসঙ্গে বিনা পরিশ্রমে গল্প শোনে। দু'একটা গল্প সিনেমায় বেচো। সাবধান! গল্প পড়া একদম উঠে যাচ্ছে কিন্তু।'

শুনে তো আমার হয়ে এল। গল্প শোনা বা পড়া উঠে যাবে? বুকের মধ্যেটা গুর্ গুর্ করতে লাগল। খুব একটা বড় গোছের মিছিল দেখলে যেমন হয়। ভাবলাম, টাবুকে বলে দেখি গল্পটা। ওতো অতটা পাকামী শেখেনি। বয়েসও সবে বছর আষ্টেক।

অনেক তোয়াজ করে ফোচকা খাইয়ে, কেনো বিষয়ে উপদেশ না দিয়ে, ভীতু ভীতু মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে বললাম—

'একটা গল্প শুনবি?'

'কিসের গল্প?'

ঘাবড়ে গিয়ে বলে ফেললাম—'এই ধর্ রামলক্ষ্মণ টক্ষণ কিম্ব—

'কিম্বা কি?'

'চাঁদে যাওয়ার গল্প।'

'চাঁদের বিষয় আমি জানি। ও তো রকেটে করে যেতে হয়। দুঃখের বিষয় চাঁদে প্রাণী নেই। আর বিচ্ছিরি নোংরা। ঐসব খরগোশ টরগোশের গল্পও অত্যন্ত বোগাস, বানানো। আর যদি মহাকাশের কথা বল—সে সবও জানি।'

'তবে রামলক্ষ্মণ—।'

'স্কুলে রামলক্ষণের কমিক পড়েছি।'

'কমিক!'

'যাকে বাংলায় বলে চিত্রে রামায়ণ। বড্ড সেকেলে। আমাদের টিচার বলেছেন এমন কী কমিকের ছবিগুলো পর্যন্ত বেজায় সস্তায় ছাপানো।'

না। আর না।.. সরে পড়াই ভাল।

নিজের ছেলেমেয়েরাই যখন গল্প শুনতে চায় না তখন আর গল্প গল্প করে মরি কেন? গল্প লেখা ছেড়েই দেব, না কি আরও ছোটখাট কারুকে একবার শেষবারের মত শোনাবার চেষ্টা করব? খুব সাবধানে দু'একটা চার পাঁচ বছরের ছেলেমেয়েকে গল্প বলার চেষ্টা করলাম।

একজন খানিকটা শুনে আধো আধো গলায় বলে উঠল—'এমা—বয়ওকারে বো—কা বানান কী রে?'

আমি আর বয়ওকারে, কয় আকারে কা পর্যন্ত পৌঁছতে না দিয়ে সরে পড়লাম।

হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে—ওমা এযে একেবারে কালিমন্দিরে পৌঁছে গেছি। এক জায়গায় খুব ভীড় দেখে থামলাম। ভীড়টা দারুণ সরগরম। সকলে একসঙ্গে কথা বলছে। একটু ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপার জানতে চাইলাম। চার পাঁচজনে মিলে একসঙ্গে কারণটা বলতে আরম্ভ করার কারণটা আর বোঝা হল না। সকলেই বেশ গল্পের ঢঙে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইছিলেন বলেই দেখলাম জিনিসটা এমন তালগোল পাকিয়ে গেল। না, গল্প করে কথা বলার একটা গোড়ায় গলদ অবশ্যই আছে। না বাবা, গল্প লেখা আমি ছেড়েই দেব।

তবু পুরনো অব্যেস যাবে কোথায়? ভীড়টা ঠেলে একটু ভেতর দিকে যেতেই দেখলাম একটি বছর চারেকের ছেলে মন্দিরের সিঁড়িতে বসে নির্বিকার ভাবে যে যা দিচ্ছে খাচ্ছে আর ছোট ছোট উত্তর দিচ্ছে। আমি বেশ একটু এগিয়ে গেলাম। একজন জিজ্ঞেস করছে শুনলাম—

'তুমি হারিয়ে গিয়েছ?'

'না তো। আমি কি বোকা?'

'তোমার বাবা মা আছে?'

'হুঁ।'

'তারা কই?'

'আছে।'

'এইখানে।'

'পুলিশে খবর দাও হে। বাচ্ছাটা হারিয়েছে মনে হয়।'

'বলছি হারাইনি।'

'এতো দেখি মহা ট্যাটা!'

'কাঁচকলা খাও।'

বলে বাচ্চাটা একহাতের বুড়ো আঙুল তুলে ঠোঁট উল্টে ভ্যাঙচাতে লাগল। অন্যহাতে ও একটা কার দেওয়া পাকা কলা খাচ্ছিল।

এসো তো এদিকে। দেখো এই ভীড়ের মধ্যে তোমার মা বা বাবাকে পাও কিনা। নয়তো থানা পুলিশ করতে হবে।'

ছেলেটি দু'হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোকের কোলে উঠল।

'নাম কি?'

'বাবু।'

'বাবুরাম?'

'শুধু বাবু।'

'একই হল। বাবুও যা বাবুরামও তাই।'

'ক্যাঁচকলা! গয় আকারে গা—ধয় আকারে—' বলেই ও থেমে গিয়ে আমার ভয় খাওয়া চোখের দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসে বলল—'ধয় আকারে ধা।—ঐ তো আমার মা!'

বলে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে লাফালাফি জুড়ে দিল। কিন্তু আমার বাবু বলে ছেলে কোনো কালেই নেই। এ বয়েসের ছেলেই নেই! আমি সত্যিকারের একটা গয় আকারে ধয় আকারে বনে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিতেই বাবু কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কানের কাছে মুখ এনে কেউ শুনতে না পায় এমন করে বলল—'বল না যেন।'

যে ভদ্রলোকের কোল থেকে এল, তিনি যেন একটু দুঃখিতই হলেন। বললেন—

'আপনার একটু সাবধান হওয়া উচিত। বাচ্চাটা তখন থেকে একা। চুরি হয়ে যেতে পারত। কত কি হতে পারত। ছি ছি।' আমি একেবারে বেকুব।

ভীড়ের চেহারা ইতিমধ্যেই পাতলা। সকলেই অন্য জায়গায় মজা খুঁজতে চলে গেল। নানারকম মন্তব্য শোনাতে লাগল। সবই আমার দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কে।

এদিকে আমি পড়লাম বিপদে। পরের ছেলে। করিটা কি একে নিয়ে! থানায় যাব? না 'ক বাড়ি নিয়ে গিয়ে থানায় খবর দেব। এতক্ষণ ধরে খেয়েছে যা, তাতে কিছুকাল ওর না খেয়ে থাকলেও চলবে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পথ মত ঠিক করে নিয়ে বাবুকে বললাম—

'চল বাড়ি যাই।'

'চল মা!'

বুকটা ধড়াস করে উঠল। একে তো বাড়িতে পুস্যির সংখ্যা নেই নেই করে জনা আষ্টেক। তদুপরি আবার 'মা মা!'

'বাবু, তোর মা কোথায় রে?'

'এই তো তুমি।'

'আমি? তা ভাল কথা। কিন্তু অন্য কেউ এসে যদি বলে আমরা তোর বাবা মা? তবে

'ইস্, কঁ্যাচকলা ! এক নম্বর ! আমার বাবা মা নেই, নেই—দুই নম্বর ! ভূতের রাজা দিল বর—জবর জবর তিনবর—তুমি—তিন নম্বর।'

'একি রে বাবা, গল্প বলছিস নাকি ?'

'উঁহু। আমার বাবা মা মরে গেছে—সেই কবে। একজন পাড়ার মাসীর কাছে ছিলাম। মাসী খুব গরীব। নিজেই খেতে পায় না। মাসী বলল, সিঁড়িতে বসে থাক্—ভূতের রাজা বর দেবে, না পাবি। তাই তো বসে ছিলাম। তারপর তুমি এলে। না কি, বল মা ?'

ভালই হল। বাড়ি গিয়ে একে যত গল্প জানি শোনাতে হবে। বড় হয়ে গেলেই তো আর শুনবে না।

বললাম—

'ভূত বিশ্বাস করিস্ ?'

'যাঃ, কি বুদ্ধি !'

'তবে যে বললি ভূতের রাজার জবর জবর বর হলাম আমি।'

'ওতো মিলোবার জন্যে। আমি সব মিলোবার মত করে বলি। খুব মজা হয়। জিভে সুড়সুড়ি লাগে।'

বাড়ি আসতেই সবাই অবাক ! একি ! একটা জলজ্যান্ত ছেলে ! সবাই দারুণ ভড়কে গেল এক বাবু পুতু আর টাবু ছাড়া। কিন্তু বাবুকে দেখে বাড়ির একটা লোকের বিশ্বাস হল না যে সে এ বাড়িরই ছেলে নয়, আজই এসেছে, কেন না ওর গালে জড়ুল আছে। আর নাকে মেচেতা।'

টাবু লাফিয়ে উঠে চলে গেল—খুব খেতে পারে রে। ও মা মণির দুঃখু ঘোচাবে। হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল মামণির সব গল্প শুনবে।'

এক মুখ খাবারের মধ্যের থেকে বাবুর গলার আওয়াজ এল—'কঁ্যাচকলা !'

তুমিই বলে যাও

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পড়তে যখন ইচ্ছে হয় না
তখন ছবি আঁকি,
এই দেখ না এঁকে ফেললাম
কেমন মজার পাখি !
পাখি এখন বসবে কোথায় ?—
আঁকা হলো গাছ,

আর কি কি চাই ? নদী—নৌকো—
নদীর জলে মাছ ?
বাড়ি গাড়ি কে কে নেবে,
এঁকে দিলাম তাও,
ছবি আঁকা কেমন হল
তুমিই বলে যাও।

ডিমের ডালনা
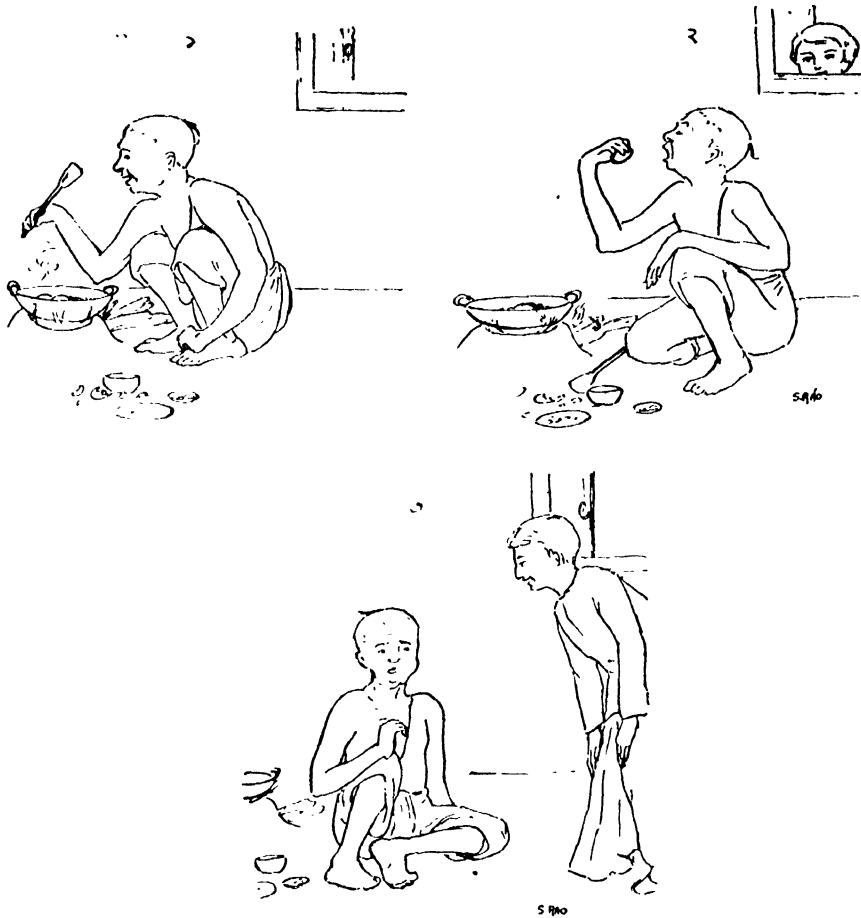
'ডিম রেঁধেছি খাসা, গন্ধে লাগে তাক !
লাল ঝরে যে জিভে ! চেখেই দেখা যাক !!'
'ডেকে হলাম সারা, জবাব কেন নাই ?
দাঁতের বুঝি ব্যথা ? গাল ফুলেছে তাই ?'

লেখা ও ছবি—সুখলতা রাও

নবম বর্ষ—অষ্টম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৭৬/ডিসেম্বর ১৯৬৯

কি এমন শক্ত ?

প্রভাকর মাঝি

'বাবলু, অনেকে বলে, তুমি বড়ো বিচ্ছু,
করতে চাও না লেখাপড়া নাকি কিচ্ছু ?
তবে টেকো জ্যোতিষীর কথাই কি ফলবে ?
কি অত লিখছো মন দিয়ে, তুমি বলবে ?
হিলহিলে, মোটা নানা পুঁথি ডাঁই করলে,
নাকি কোনো সিরিয়াস গবেষণা ধরলে ?'
'কে, কাকু! নতুন স্যর সঞ্জীব সেন যে,
মাথার ভাবনা কাল উস্কে দিলেন যে।
বললেন—কাজ করো, কাজ, মনে রাখবে,
যাতে করে ইতিহাসে নাম লেখা থাকবে।
পড়া নয়—ইতিহাস হতে হবে সবকে—
থামিয়ে দিলেন ক্লাসটার কলরবকে।
সে থেকে মগজ করি ত্যক্তবিরক্ত,
এখন বুঝছি সোজা—কি এমন শক্ত ?
অঙ্ক ভূগোল রেখে গদ্য ও পদ্য,
ইতিহাস নিয়ে কাকু, পড়েছি যে সদ্য।
বড়ো আলমারি থেকে ইংরাজী বাংলা
ইতিহাস বই নিয়ে দিচ্ছি যে হামলা।
ছোড়দির বড়দির যেখানে যা পাচ্ছি,—
বড়ে বড়ো করে দ্যাখো, নাম লিখে যাচ্ছি।'

(পাকিস্তান থেকে এসে অরুমিতুরা সোনাপোতায় ছিল। বাবা কলকাতায় মেসে থাকতেন, হঠাৎ দুর্ঘটনায় মারা যান। ওরা সোনাপোতা ছেড়ে সিঁথির ছোট্ট বাড়িতে এল। মিতু স্কুলে ভর্তি হল। মাও সেখানে সেলাই শেখাবেন। ক্রমে গ্রামের ছেলে অরু ক্লাসের সব চেয়ে মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত হল। বিজ্ঞানের ক্লাস অরুর সব চেয়ে ভাল লাগে। সে স্বপ্ন দেখে যে বড় হয়ে বৈজ্ঞানিক হবে। সে ব্যায়াম করে, নিজের শরীর ভাল করবার চেষ্টা করে। তিনটে লেটার নিয়ে হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা পাশ করল অরু। ফিজিক্স অনার্স নিয়ে কলেজে ভর্তি হল। কিন্তু, মার পক্ষে আর বেশিদিন কাজ করা সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে সে পড়া ছেড়ে দিয়ে একটা চাকরি নিল। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে, কিন্তু আপাততঃ বোম্বাই চলে যেতে হবে।)

একুশ

সেদিনটা এসে গেল। আগের দিন মা অরুর জন্যে কত কি রান্না করলেন।

অরু খেতে বসে হাসতে হাসতে বলছিল, 'ফাঁসির খাওয়া খাওয়াচ্ছ নাকি মা? যদি আর না ফিরি?'

মা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেন, 'বালাই ষাট! ওকথা বলে!'

মার দিকে তাকিয়ে অরু লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। ছি ছি, এসময় তার মুখ দিয়ে ওরকম কথা বেরোনো মোটেই উচিত হয়নি। মা এমনিতেই ভেঙে পড়েছেন।

সন্ধ্যেবেলা ট্রেন। হাওড়া ষ্টেসনে মিতু গিয়েছিল মাকে সংগে নিয়ে। গিয়েছিল অন্তদা আর দীপুদা। তাছাড়া আরেকজন। সে রজত। অন্তদার চেষ্টায় সে এখন একটা কাজে ঢুকেছে। প্রাইভেটে পরীক্ষা দেওয়ারও চেষ্টা করছে। অন্তদা বলে, ওরকম বিনয়ী ছেলে দেখাই যায় না।

মামা আসতে পারেন নি। তিনি রোগী দেখতেই ব্যস্ত থাকেন! তবুও সকালে বাড়ি এসে বলে গিয়েছিলেন, 'খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে সাবধান থাকবি অরু। এ সময় ওখানে খুব অসুখ করছে।' মামা একটা অসুখের নাম করেছিলেন। রোগটা যে পেটের সেটা মিতু বুঝতে পেরেছিল মার কথায়। মামার কথা শুনে মা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, 'ও যে আমার রান্না ছাড়া কখনো কিছু খায়নি দাদা। ওর স্বাস্থ্য কি টিকবে ওখানে?'

মামা কিছু বলার আগেই অন্তুদা বলেছিল, 'মাসীমা, আমার কাছে অরু যা আসন শিখেছে তাতেও যদি পেটের রোগ হয়, তবে আমি আসব আর আপনি নিজের হাতে আমার কান মলে দেবেন।'

গাড়ি ছাড়বে কিছুক্ষণ পরে। অরু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মা কাঁদছেন। মিতু ভাবে, মার জীবনটাতে শুধু কান্না।

এসময় দীপুদা কথাবার্তায় আবহাওয়াকে কিছুটা হাল্কা করে রেখেছে। দীপুদা বলে, 'বোম্বেটা ঘুরে আসিস অরু। আমার কয়েকজন বন্ধু আছে ওখানে সিনেমা লাইনে। আমিও যাব। গিয়ে থাকব নটরাজ হোটেলে। বোম্বের সব চাইতে কস্টলি হোটেল।'

অন্তুদা বলে, 'অরু, নিজের মেরুদণ্ডটা চিরকাল সোজা রাখবি। এই আমার দেশ, যেখানে বড়লোকের অকালকুষ্মাণ্ড ছেলে হাজার হাজার টাকা উড়িয়ে বছরের পর বছর ফেল করে উচ্চশিক্ষা শিখছে বিদেশে। আর সত্যিকারের মেধাবী ছেলেকে পড়াশোনা ছেড়েছুড়ে দিয়ে চাকুরী নিতে হচ্ছে। কি বিচিত্র এই দেশ!' দূরের দিকে তাকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অন্তুদা।

মিতু মার কাছে শুনেছিল অন্তুদার বাবা পুলিশের গুলিতে মারা যান বিয়াল্লিশের আন্দোলনে।

অরু মাকে প্রণাম করল, অন্তুদাকেও প্রণাম করল। দীপুদাকে প্রণাম করতে যেতেই দীপুদা বাধা দিয়ে বলল, 'উঁহু, অর্ হেভোয়া।'

অরু বলে, 'সেটা আবার কি বস্তু দীপুদা?'

—'আবার দেখা হবে—ফরাসী ভাষায়।' দীপুদা বলে।

অরু হেসে রজতের দিকে তাকিয়ে বলে, 'অর্' হেভোয়া রজতদা।' এই আবহাওয়াতেও সকলে হেসে উঠল।

মিতু ছোটদাকে প্রণাম করল। ভাবল, আজ আর ছোটদা গাড়িতে উঠে বকবক করবে না ছোটবোনের সংগে। দুদিন ধরে চুপ করে থাকবে।

অরু বলে, 'মিতু সাবধানে থাকবি মন দিয়ে পড়াশোনা করিস। দু'বছর পরে যদি বাংলাদেশে আসতে পারি তখন তো তুই কলেজে যাচ্ছিস। আমি তো কলেজের মুখই ভালোভাবে দেখলাম না বললে চলে। তখন যেন আবার মূর্খ ছোটদাকে ঘেন্না করিস না।'

মিতু ছোটদার বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বলে, 'ছোটদা, যেদিন মিতু তোকে মূর্খ বলে ঘেন্না করবে, সেদিন তার গলা টিপে মেরে ফেলিস।'

অরু বলে, 'এই ত্থাখো, ধাড়ি মেয়ে কাঁদে। ঐ ত্থাখ, সকলে তাকাচ্ছে।'

এক সময় অরুকে নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। মিতু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত শুনল গাড়ির শব্দ—হুস্ হুস্ হুস্ হুস্।

হঠাৎ মনে হলো, এ গাড়ির শব্দ নয়—তার মার নিঃশ্বাসের শব্দ।

তারা নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল।

বাইশ

একদিন দুদিন করে কয়েকমাস কেটে যায়। মা স্কুলে যান, মিতুও যায়। তারপর বাড়ি এসে বাড়ির কাজ করে। সকাল সন্ধ্যে পড়তে বসে। সবই আগের মতো চলে। তবুও সব যেন কেমন খাপছাড়া লাগে।

প্রথম প্রথম মিতু পড়ার থেকে ওঠার সময় পেছনটা দেখে নিয়ে সাবধানে উঠত। বেণীটা চেয়ারের সংগে

বাঁধা নেই তো? সংগে সগে মনে পড়ে যায় ছোটদা তো নেই। এখন থেকে সে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। মিতুর খাতাতে কেউ আর তার ছবি এঁকে রাখবে না।

যখন একটা শক্ত অংক কিছুতেই মাথায় ঢোকে না, তখন যে তাড়াতাড়ি সেটা নিয়ে ছোটদার পড়ার জায়গার কাছে গিয়েই আবার ফিরে আসত। মনে পড়ে যেত ছোটদা নেই। ছোটদা কত সহজে অংক বুঝিয়ে দিত।

একদিন ছোটদা তাকে বীজগণিত শেখাতে বলল, 'বল্ তো মিতু, একটা চিড়িয়াখানায় পশুপাখি মিলিয়ে ৩০টা মাথা আর ১১২টা পা আছে। কটা পশু আর কটা পাখি চিড়িয়াখায় আছে?'

মিতু ধাঁধার ওস্তাদ। কিন্তু এটা তার কাছেও বেশ কঠিন লাগল।

অরু, বলল, দূর বোকা, ত্যাখ্ অংক করে কত তাড়াতাড়ি এটা করে দিচ্ছি।' ছোটদা খুব সহজে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

মারও প্রথম প্রথম এরকম ভুল হতো। সন্ধ্যেবেলা মিতুকে খেতে ডাকতে গিয়ে রান্নাঘর থেকে ডাকেন, 'অরুমিতু খেতে আয়।'

সংগে সংগে মনে পড়ে যায় যে অরু নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে ভাবেন অরুটা এখন যে কি খাচ্ছে দাচ্ছে কে জানে! ওর যেরকম ভোলা মন হয়ত না ডাকলে খেতেই ভুলে যাবে। ওরা কি অত ডেকে ডেকে খাওয়াবে? খবরের কাগজে পড়তেন বোম্বাই এ পেটের রোগে কত লোক মারা গিয়েছে মাত্র কয়েক মাসে। পড়ে কদিন ঘুম ছিল না। অরুর চিঠি পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন! অরু লিখেছিল, 'তুমি অনর্থক চিন্তা করো না মা। আমার খাওয়া দাওয়া ভালোই হচ্ছে। গ্যাস্ট্রিক রোগটা বোম্বাই সহরে হয়েছে। এটা সেখান থেকে একশো মাইল দূরে।

আমের সময় আম কাটতে কাটতে মার হাত থেমে যায়। ভাবেন, অরু কি ওখানে আম খাচ্ছে? মিতুকে জিজ্ঞেস্ করেন, 'হ্যাঁরে ওখানে তো বোম্বাই আম অনেক পাওয়া যায়—না?'

মিতু হেসে বলে, 'হ্যাঁ বোম্বাই আম শুধু কেন, বোম্বাই নারকেল পাওয়া যায়।'

মা অবাক হন, 'বোম্বাই নারকেল?'

মিতু পেছন গেকে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'জানো না? যে নারকেল গাছ থেকে মাটিতে না পড়ে সোজা ওপর দিকে উঠে যায়।'

মা বলেন, 'তোর সবটাতে ঠাট্টা! হাত্ ছাড়্, হাত কেটে যাবে।'

মা আশা করেছিলেন পুজোর সময় হয়ত অরু আসবে। কিন্তু পুজোর আগে অরুর চিঠি পেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন।

অরু লিখেছে, 'আমার খুব খারাপ লাগছে মা। কিন্তু জানোই তো এখন জরুরী অবস্থা। খুব গুরুতর কারণ ছাড়া ছুটি মঞ্জুরই করছে না। তাছাড়া এখন ছুটি নিলে রেকর্ডও খারাপ হবে। তবুও পুজোর সময় তোমার কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করছে।'

মিতুকেও লিখেছে সে কথা। 'এখানেও বাঙালীরা দুর্গাপুজো করো মিতু। তবুও পুজোর সময় বাড়ি বাড়ি মন করে। থাক্ গে, মন খারাপ করিস না আগামী পুজোয় আমি ছুটি নিয়ে কলকাতায় যাবোই যাবো।

এখানে দিন একরকম কাটছে। সব প্রদেশের বন্ধু আছে। দিনরাত হৈ হৈ করছে। আর জানিস, আমি কাজের পরেও ইলেকট্রিসিটি নিয়ে একটু চর্চা করি। গবেষণাও বলতে পারিস। তাছাড়া ট্রেনিংএর পড়াও পড়তে হয়। কিন্তু ওদের তো তা সহ্য হবে না। যাহোক, বুঝিয়ে টুজিয়ে ওদের একটু শান্ত করেছি।'

মিতু চিঠি পড়ে ভাবে, ছোটদা পড়াশোনাই করতে পারল না। কি গবেষণাই বা করবে? ছোটদাই তো বলেছিল, এম এস-সি, পাশ না করলে গবেষণার কোনো মূল্যই নেই।

মিতু চিঠিতে তার ও মার সব কথা লেখে। বোম্বাই নারকেলের কথাও বাদ দেয় না।

'মনে পড়ে বোম্বাই নারকেলের কথা ছোটদাই তাকে একদিন বলেছিল। সে বিশ্বাস করেছিল। তাই দেখে অরু তার চুল টেনে দিয়ে বলেছিল, তুই একটা গাধা। নারকেল কি বাতাসের চেয়ে হাল্কা যে আকাশে উড়বে?'

মিতু বলেছিল, 'তবে এরোপ্লেন আকাশে ওড়ে কেন?'

অরু বক্তৃতা সুরু করে। মিতু সব শুনে তাকে বলে, 'আচ্ছা ছোটদা, তুই তো চুপচাপ জলের ওপর চিৎ হয়ে ভেসে থাকতে পারিস। সাঁতার না জানলে ডুবে যেতিস। তবে কি তুই বলতে চাস, সাঁতার শেখার পরে তুই জলের চেয়ে হাল্কা হয়ে গেছিস?'

বোনের প্রশ্নে অরু চুপ হয়ে যায়। সত্যিই তো! এমন কেন হয়? একথা কোনোদিন সে ভাবে নি। সে দিন রাত্রে অরুর ঘুম চলে গিয়েছিল।

পরদিন নিশীথবাবুকে জিজ্ঞেস করতে তিনি হেসে বলেছিলেন, 'বিজ্ঞানের অনেক নিয়ম অনেক দিক দিয়ে কাজ করে অরূপ। প্রকৃতিকে সব কিছুই মেনে চলতে হয়। এক নিয়ম মানতে গিয়ে ছুঁচকে জলে ভাসতে হয়, যা তোমার নিয়মে অসম্ভব। এই দ্যাখো—'

তিনি একটা জলের পাত্রে একটুকরো কাগজ ভাসিয়ে তার ওপরে একটা ছুঁচ রাখলেন। কাগজটা জলে ভিজে আস্তে আস্তে ডুবে গেল। ছুঁচটা ভাসতে লাগল।

নিশীথবাবু বললেন, 'সুতরাং—জানবে যে নিয়ম একে ডুবতে বলছে তার চেয়েও জোরদার কোনো নিয়ম একে ভাসিয়ে রেখেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সত্যিই নিয়মের রাজত্ব।'

পুজোর কটা দিন কেটে গেল। বিজয়া এল। মিতু এই কদিন কোথাও বেরোয় নি। মা কতবার বলেছেন।

সকালে মা ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। পড়তে পড়তে বলে উঠলেন, 'ইস্!'

মিতু বলল, 'কি হলো মা, ছারপোকা কামড়ালো নাকি?'

মিতু অবশ্য জানে মা কাগজ পড়তে পড়তে কতবার ওরকম করেন। কোথায় বন্যা হয়েছে, কোথায় দুর্ঘটনা হয়েছে, সব খবর পড়তে পড়তেই মা মুখ দিয়ে এরকম শব্দ করবেন।

মা বললেন, 'আহারে, ছেলেটা! ছ'সাত বছর ধরে হাসপাতালে থেকে কাল মারা গেল। দ্যাখ্, ছবিও দিয়েছে। হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তার নার্স নাকি চোখের জল ফেলেছে চন্দন মিত্র মারা গেলে।'

মিতু চিৎকার করে বলে ওঠে, 'কে? কি নাম বললে?'

মার হাত থেকে খবরের কাগজ কেড়ে নিয়ে সে পড়ে,—না, কোন সন্দেহই নেই। ঐ তো, ঠিক দূর্বার মতো মুখ।

মারও সব কথা মনে পড়ে যায়। মিতু তাঁকে বলেছিল চন্দনের কথা।

কাগজের অক্ষরগুলো মিতুর চোখের সামনে নাচতে থাকে। তারই মধ্যে মিতু পড়ে যায়—'হাসপাতালে থাকতে থাকতে হাসপাতালটাই চন্দনের কাছে বাড়ি হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তাররা কেউ তার কাকু, কেউ মামু। নার্সরা দিদিমনি। অবসর সময়ে সে যা খেলত তাও অন্য রকমের খেলা। সে তার কাল্পনিক রোগীকে ইনজেকসন দিত, অপারেশন করত।'

বাইরে ঢাকের আওয়াজ ছাপিয়ে মিতুর কানে বাজে একটা গলার স্বর—'চন্দন না বাঁচলে আমিও বাঁচব না রে মিতা।' মিতুর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে।

বাস রাস্তায় যাওয়ার পথে একটা সাইনবোর্ড মিতুর চোখে পড়ে। তাতে লেখা আছে, 'আপনার রক্ত দান করে একটি অমূল্য জীবন বাঁচান।' একটা ছবিও আছে। একজন লোক শুয়ে আছে। তার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মুখবাঁধা একজন ডাক্তার তার হাতে নল লাগিয়ে রক্ত বের করে নিচ্ছে।

'শয়তানের অট্টহাসি' নামে একটা বই মিতু পড়েছিল। তার মলাটে একটা খুনীর ছবি ছিল। ডাক্তারের ছবি দেখে মিতুর সেই ছবির কথা মনে পড়ে যেত। মিতু ভয়ে ওদিকে তাকাতো না।

আজ মামামামীকে বিজয়ার প্রণাম করতে যাওয়ার সময় ছবিটার দিকে ভালো করে তাকালো মিতু। হঠাৎ মনে হলো, ছবিটার পাশেই একটা ফর্সা কচিমুখ ভেসে উঠল। মুখবাঁধা ডাক্তারটার চোখদুটোও যেন হাসছে। এখন আর তাকে খুনী-খুনী লাগছে না। ঠিক যেন মামা মিতুকে দেখে তার গাল টিপে দিয়ে বলছেন, 'কিস্যু ভয় নেই, কালই জ্বর ছেড়ে যাবে।' তবুও সেই হাসি-হাসি ভাব ছাপিয়ে, চোখ দুটোর মধ্যে যেন একটা 'বাবা-বাবা' উৎকণ্ঠার ছোঁয়া। মিতুর মনে হয়।

বিজয়ার চিঠির শেষে অরুকে লিখল, 'আচ্ছা ছোটদা, কাগজে পড়লাম বোম্বাইএ একটা কুকুরের শরীর থেকে হৃদপিণ্ড বদলিয়ে আরেকটা হৃদপিণ্ড লাগানো হয়েছে। এত হচ্ছে, কিন্তু কারো শরীরে রক্ত যদি এমনিতে না তৈরী হয়, কিছুতেই কি রক্ত তৈরী করা যাবে না? তাকে মরতেই হবে? তুই যদি ডাক্তার হতিস ছোটদা, তবে এই রোগের চিকিৎসা নিশ্চয় আবিষ্কার করতিস।'

তেইশ

মহারাষ্ট্রের একটি পার্বত্য সহর।

অরু তার ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবে আজ প্রায় দেড় বছর সে চলে এসেছে মা-মিতুদের ছেড়ে। এর মধ্যে ভেবেছিল একবার কলকাতায় ঘুরে আসবে। কিন্তু কাজ আর পড়ার চাপে সময় করে উঠতে পারল না। আরো হয়ত ছ' সাতমাস থাকতে হবে। সে জানালা দিয়ে দূরের ছোট ছোট পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। এই পাহাড়গুলোর মধ্যে দিয়েই হয়ত একদিন ছত্রপতি শিবাজী তার সৈন্যদল নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছিলেন। পত্‌পত্‌ করে উড়ছিল তাঁর গৈরিক পতাকা। কল্পনা করতে অরুর গা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। কয়েক মাইল দূরেই শিবাজীর জন্মস্থান।

ছোটবেলায় মিতুকে ঘুম পাড়ানোর সময় মা সুর করে গাইতেন—মিতু ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো বর্গী এলো দেশে। ছোট্ট অরু বোনকে আদর করতে করতে মাকে জিজ্ঞেস করত, 'মা, বর্গী কি?' মা বলতেন শিবাজীর কথা। অরু মনশ্চক্ষে দেখত এক অশ্বারূঢ় বীরের ছবি।

কলকাতায় থাকতে একবার অন্তুদার সংগে একটা গলি দিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ অন্তুদা বলে, জানিস অরু এই গলিটার নাম কি? মারাঠা ডিচ লেন। বর্গী আক্রমণ রোধ করবার জন্যে একসময় এখানে পরিখা কাটা হয়েছিল।'

অরুর সামনে ভেসে উঠল সেই ছবি যা তার ইতিহাস বইএ বারবার দেখেছে। কানে বাজলো মার সুর করে গাওয়া ছড়া—বর্গী এলো দেশে।

অন্তুদার কথায় অরু বাস্তব জগতে ফিরে এল। অন্তুদা বলল, 'আমার এক বন্ধুর সংগে দেখা করে আসব। তুই যাবি নাকি অরু?'

অরু জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

অন্তুদা বলে, 'এই কাছেই! নন্দলাল বোস লেনে।'

রাস্তার নাম শুনে অরু চমকে ওঠে। অন্তুদাকে কোনোমতে বলে, 'না, অন্তুদা, আজ বাড়ি যাই।'

চুপ করে জানালার কাছে বসলেই সব কথা অরুর মাথার মধ্যে এসে ঘুরপাক খায়।

দীপুদা এর মধ্যে বোম্বাইএ আসেনি। ওর নটরাজ হোটেলটা বাইরে থেকে দেখে এসেছিল অরু। মেরিন ড্রাইভে; অর্ধচন্দ্রাকার সমুদ্রের ধারে সুন্দর জায়গা। সারি সারি অট্টালিকা। রাত্রে আলো জ্বললে আরো সুন্দর লাগে। তখন ওকে বলে—রানীর হার।

অরু টেবিলের কাছে এসে চেয়ারটায় বসে। ড্রয়ারটা খুলতেই বেরিয়ে এল একটা ছবি। অরু মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে প্রশংসাপত্র নিচ্ছে। মারাঠী বন্ধু গোডিলকর তুলেছিল ছবিটা। ছবিটা কাগজেও বেরিয়েছিল।

অরু নিজেও ভাবতে পারে নি তার কথা এভাবে কাগজে উঠে যাবে। এমন কি কলকাতার বাংলা কাগজেও উঠেছিল। সে জানত না। মিতুই ডাকে পাঠিয়েছিল কাগজটা, খবরটাকে লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে। শিরোনামায় লেখা—'বাঙালী তরুণের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।' রেলের দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য সে যে পরিকল্পনা করেছে—লাইন ভাঙা থাকলে বা সামনে অন্য কোনো ট্রেন থাকলে গাড়ী আপনা আপনিই যাতে থেমে যায় তার জন্য যে নক্সা করেছে তার কথা সংক্ষেপে খবরে দিয়েছে। সরকার পরিকল্পনাটির বিষয়ে ভাবছেন বলে জানিয়েছেন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তার সংগে দেখা করে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন।

তবে অরুর কাছে সব কিছুর থেকে দামী পাশের খামটি। তার কৃতকার্যের খবরে মা আর মিতু একসংগে যে চিঠি দিয়েছিল সেটা সে যত্ন করে রেখেছে।

চিঠিটা খুলে আরেকবার পড়তে যাবে এমন সময় হৈ হৈ করে তার ঘরের সামনে এসে হাজির হলো—ম্যাথু, শ্রীনিবাসন, ভাটিয়া, মহান্তি, দেশাই, অনুপম রায়—ওরা সব।

অরু হেসে বলল, 'বাঃ। পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা সকলেই দেখছি হাজির। ব্যাপারটা কি?'

অনুপম বলে, 'অ—অ—অ—'

ভাটিয়া তাকে থামিয়ে দিল। অনুপম অমনিতেই তোৎলা, উত্তেজিত হলে তো কথাই নেই।

এখানে এসে প্রথম দিকেই অরু অনুপমের কাছে একদিন গিয়েছিল একটা বই আনতে। অনুপমরা তাস খেলছিল। তাকে দেখেই খেলতে ডাকল। অরু বলল, এখনো তাস ভালো ভাবে চেনে না—লাল পান, কালো পান, থান ইঁট এইভাবে চেনে। বইটার কথা তুলতেই অনুপম বলেছিল—'ই—ইল্লে প্‌-প্‌-পোড়া।'

শুনে অরু রেগে গিয়েছিল। ভেবেছিল মুখপোড়া-জাতীয় কিছু গালি দিচ্ছে অনুপম। মেদিনীপুরের নীহার মাইতি বলল, 'ওর মানে হচ্ছে—কিছু হবে না, চলে না। তামিল ভাষায়। তবে অনুপমের কাছে ওর কোনো মানে নেই। ব্রে খেলার সময় কাউকে বিবি খাওয়াতে পারলেও ও ইল্লে পোড়া বলে লাফিয়ে ওঠে।

যাই হোক, অনুপমকে থামিয়ে ভাটিয়া ইংরাজীতে বলল, 'সুসংবাদ আছে বাসু। তুমি পরের মাসেই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছ। ওখানেই চাকরী হলো। এবার খাওয়াও।'

সংবাদটা পেয়ে অরু কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সে বলল, 'নিশ্চয় খাওয়াব। অর্ডার আসুক।'

অর্ডার আসল। অরু মাকে মিতুকে চিঠি লিখল। তবে কোন দিনটাতে রওনা হবে তা লিখল না। সে আচমকা মা মিতুকে অবাক করে দিতে চায়। চিঠি পেয়ে মা আর মিতুর আনন্দের রূপটা মনে মনে কল্পনা করতে

পারল অরু।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে খামের চিঠিটা আবার খুলল অরু। মার চিঠিভরা শুধু আশীর্বাদ, ভগবানের কথা, বাবা বেঁচে থাকলে আজ কত সুখী হতেন সে সব কথা। অরু চিঠিটা মাথায় ঠেকালো।

এর পরে মিতুর চিঠি খুলে পড়তে লাগল। মস্ত লম্বা চিঠি। পড়তে পড়তে মিতুর মুখটা সামনে ভেসে উঠল। লিখেছে—'কি রে ছোটদা, টমাস এডিসন এ যুগেও তাহলে জন্মায়। তোর খবরে যে কি আনন্দ হয়েছে কি বলব। কদিন ধরে শুধু লাফাচ্ছি। আর মার কথা কি বলব। মার ঐ এক কাজ—কান্না, আর ঠাকুরের পায়ে মাথা ঠোকা। আমি তো রেগে গিয়েছি। এবার আমি ফার্স্ট হলে মা যখন কাঁদছিল, আমি বলেছিলাম—আমি ফার্স্ট হলেও কাঁদবে, ফেল হলেও কাঁদবে। তবে আর কষ্ট করে ফার্স্ট হই কেন? এবার থেকে ফেল করব। মা হেসে আমার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিল, 'ওরে যখন মা হবি, তখন বুঝবি। এ দুঃখের কান্না না রে! এ কান্না যেন চিরকাল কাঁদতে পারি। আসলে আমার মনে হয় কি জানিস ছোটদা, আনন্দ হলে মার বাবার কথা, বড়দার কথা মনে পড়ে—তাই কাঁদে!'

আরো অনেক কথা লিখেছে মিতু। পাড়ার কথা, স্কুলের, কথা, এমন কি তাদের বেড়াল কাবলী গাড়ীর ধাক্কা লেগে পা খুঁড়িয়ে চলছে মিতু তার পায়ের কি রকম শুশ্রূষা করছে—সে কথাও লিখেছে। লিখেছে, 'তুই ফিরে এলে ওকে একবার বেলগাছিয়ায় নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আনিস ছোটদা।'

কলকাতা যাওয়ার দিন এসে গেল। ভাটিয়া, ম্যাথু সকলে মিলে তার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে দিল। বাক্সটা খুলে আরেকবার দেখে নিল অরু। বোম্বাই থেকে মিতুর জন্যে সাড়ী কিনেছে। একটা ছোট ছাতা। মার জন্যে কিনেছে বিছানার চাদর। বেশী কিছু কিনলে মা সন্দেহ করবেন, অরু বোধ হয় কিছু না খেয়ে টাকা জমিয়ে জিনিস কিনেছে।

কলকাতা মেল কল্যাণ ছাড়ল।

অরু জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। আকাশে, পাহাড়ে, মাঠের মধ্যে যেন অনেকগুলো মুখ ভেসে উঠছে একের পর এক। অনুপম, ভাটিয়া ওদের ছবি মিলিয়ে যেতেই আরো অনেক মুখ এসে অরুর চোখের সামনে হাজির হচ্ছে। তাদের গলার স্বরও শুনতে পাচ্ছে অরু।

—'অরূপ, সত্যিকারের বিজ্ঞানী হও। বিজ্ঞানকে জানার চেষ্টা করো।'

—'যে যা চায় তাই কি হতে পারে অরূপ? আমি ঐ ঠেলাগাড়ীই হব।'

—'সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান আর ভালো লাগে না অরু।'

—'তোমরা মানুষ হলেই আমার গর্ব।'

—'অরু, নিজের মেরুদণ্ডটা চিরকাল সোজা রাখবি।'

মহারাষ্ট্র ছেড়ে মধ্যপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে। দূরে দেখা গেল কোন এক দৈত্য লোহার চোয়াল উঁচিয়ে আছে রাতের আকাশে।

তার পাশে ঐ যে তারাটা জ্বলজ্বল করছে। ওটা কি? ধ্রুবতারা?

অরুর কানে বেজে উঠল মিতুর গলার গান—নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা। মনে এলো সেই ছোটবেলায় বাবার কাছে শোনা মালকোশের সুর—

আকাশে পাখী কহিছে গাহি,
মরণ নাহি, মরণ নাহি,

প্রেমের সুরে ভরা এ ভুবন
ব্যথা বেদন ভুলিল রে।
ফিরে চলো আপন ঘরে।

বাইরে গাড়ীর অবিশ্রান্ত শব্দ বেজে চলে—ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্।

—শেষ—

* অরুমিতুদের কথা আরম্ভ হয়েছিল বৈশাখ ১৩৭৬এ (মে ১৯৬৯)
* পুরোন সব কয়টি সংখ্যাই এখনও পাওয়া যেতে পারে।

কোকিল পাখি

চুনী দাশ

কোকিল পাখি
বলবি নাকি
কোথায় পেলি গান ?
কে দিলে তোর
কণ্ঠে মধু
মন মাতানো তান ?
তোর গানে ভাই
ফুল ফোটে তাই
আমের মুকুল ফোটে,
তোরই ছন্দে
মধুর গন্ধে
মৌমাছি সব জোটে
কোকিল পাখি
বলবি নাকি
হঠাৎ কোথা যাস্ ?
আবার এলে
যাস্‌নে চলে
থাকিস্ বারোমাস॥

সোনাই, সোনাভাই আর ঝুমকিসোনা

নিখিল বসু

ঠিক দুপুর বেলা। অচিনপুরের সাত মহলা প্রাসাদ নিঝুম নিশিরাতের মতই। সোনার পালঙ্কে মখমল শয্যায় রাজা রাণী সবাই ঘুমিয়ে। মন্ত্রী সেনাপতি ঝি চাকরগুলোও ঘুমোচ্ছে পড়ে। রাজকন্যা সোনাই পা টিপে টিপে উঠছে। সামনে সুন্দর কারুকার্য করা সোনার ছোট পালঙ্ক। সোনাভাই সেখানে দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

'সোনাভাই সোনাভাই'

কানের ওপর কার আলতো ঠোঁটের ছোঁয়া পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে বসে সোনাভাই।

'দিদিভাই, তুই!'

'চটপট ওঠ,' পাকা গিন্নীর সুরে বলে সোনাই, 'জানিস্ কুঞ্জবাগানে না কত্তো গাছে কত্তো পাকা কুল ধরে রয়েছে। মিষ্টি যেন চিনি! যাবি?'

'কিন্তু দিদিভাই—মামণি যদি শোনে—'

'ইস্ ঠোঁট উলটে সব উড়িয়ে দেয় সোনাই, 'জানতে পারলে তো! আমরা এই যাব আর এই

আসব। আয় আমার সঙ্গে, বিরাট সিংহ দরজায় গোঁফওয়ালা দারোয়ানটাও ঘুমে ঢুলছে। নাক ডাকছে সিংহের ডাকের মতই। মুচকি হেসে দিব্যি সাহসীর মত সোনাই ওর গোঁফটাকে নেড়ে দিল। তারপর রাজপথে পা দিয়েই অবাক। পেছন পেছন কেউ যেন পা টিপে টিপে আসছে না! ওমা, এ যে দেখি সেই সাধের ঝুমকিটা। সাদা গা, পশমের মত নরম গরম বেড়ালটা। সোনাই আঙুল তুলে ওকে শাসন করে, 'চোরের মত চুপি চুপি যাওয়া হচ্ছে আমাদের পেছন পেছন। তা বেশ, এসো। কিন্তু খবরদার কুল খেয়ে তারপর বাড়িতে ফিরে নালিশ করা চলবে না।'

ঝুমকি একবার ম্যাও ম্যাও করে ডাকে। লেজ নাড়িয়ে সায় দেয়।

রাজ্যের একেবারে শেষ সীমায় শুরু হয়েছে কুঞ্জবন। কত আম জাম জামরুল কুলগাছ গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে। ওপাশে শাল শিমূল দেবদারু আর কনকচাঁপার গাছ। গাছের ডালে হলুদ রঙের পাখিরা কিচির মিচির করছে। বাতাসে চাঁপা ফুলের গন্ধ।

এপাশ ওপাশ চারপাশ দেখে ছটফট করে ওঠে সোনাভাই। কুঞ্জবনে গাছগুলো ঠিকই আছে, একটাতেও টোপাকুল নেই। এত সব কুল পেড়ে নিল কে? সোনাই-এর আপেল রাঙা মুখও হতাশায় শুকনো হয়ে উঠেছে।

'চল্ আমরা এগোই। প্রাসাদ থেকে যখন বেরিয়েছি অত সহজে ফিরছি না।'

গভীর বনের ভেতর ওরা ঢুকছে। গাছের পাতায় আর নীল আকাশটাকে দেখা যায় না। পেছনে লেজ নেড়ে ঝুমকিটাও আসছে! কত গাছ আর বুনো জন্তুরা পেরিয়ে গেল ওদের সামনে দিয়ে।

ডোরাকাটা বাঘ বলল, 'কে যায়? অচিনপুরের রাজপুত্তুর আর রাজকন্যা না?'

শুঁড় দিয়ে সেলাম ঠুকে হাতি বলল, 'টোপাকুল ত আছে তবে আরও অনেক দূরে। তোমরা এগিয়ে যাও সোজা উত্তরের দিকে'—

বনের একেবারে শেষ সীমায় এসে অবাক দুজনে। এখানে এত সুন্দর প্রাসাদটা বানাল কে? শ্বেতপাথরে তৈরী, ঝলমল করছে সূর্যের সোনা আলোয়। একপাশে দুধ ঢালা সরোবর আর একপাশে বিরাট বাগান। বাগানে সারি সারি কুলগাছ। পাকা পাকা কুলে ভরে রয়েছে। কিন্তু হাত বাড়িয়ে নাগাল পাওয়া যায় না। সোনাই বলল, 'তুই দাঁড়া, আমি ঢিল মেরে পাড়ি'।

সবে একটা ঢিল মেরেছে অমনি প্রাসাদ থেকে গমগম আওয়াজ বেরোতে লাগল—'কে রে আমার বাগানে?'

দুজনে চেয়ে দেখে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে হোঁতকা মোটা দাঁত উঁচু একটা রাক্ষস। কপালে সিঁদুরের টিপ, গলায় মানুষের মাথার খুলি দিয়ে তৈরী মালা। ওদের দেখেই হিহি করে হাসিতে ফেটে পড়ল। সোনাই ভয়ে ভয়ে বলল, 'তুমি হাসছ যে!'

রাক্ষস বলল, 'হাসব না! এত দিন পরে মানুষের গন্ধ পাচ্ছি। ইস্ জিব দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কচি পাঁঠার মাংস খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরেছে। কচি মানুষের মাংস যে কতদিন খাই নি। তোফা হবে, আজ এই ছোটোটাকেই সাবাড় করব।'

বলেই বুক চাপড়ে চাপড়ে গান শুরু করে রাক্ষসটা—

'কড়মড়িয়ে হাড় চিবাবো
রক্ত খাব চেটে
ইয়ে লা লা লা লা লা লা
খেটে খেটে খেটে।'

মনের আনন্দে ধেই ধেই করে নাচে। বুক চাপড়ে চাপড়ে ধা ধিন ধিন ধা বাজায়।

সোনাই-এর ছু চোখে জল—'ও রাক্ষস ভাই, তুমি আমাদের ছেড়ে দাও।'

কিন্তু হাতের মুঠোয় মানুষ পেয়ে ছাড়ে কোন রাক্ষস ?

সোনাই চোখের জল মুছে বলল, 'বেশ, খাবে যদি তবে আমাকেই খাও। কিন্তু আমার সোনা-ভাইকে খেও না। ওর জন্য মা ভীষণ কাঁদবে।'

রাক্ষস বলল, 'তাই সই, তোর মাংসও কচি কচি আছে এখনও। মন্দ হবে না, কি বলিস ?'

সবাই দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। কারুর মুখে কথা নেই। ঝুমকিটারও লেজ গোঁফ আর নড়ে না। সোনাই-এর চোখ গিয়ে পড়েছে বাগানের কুলগাছটার দিকে। মিষ্টি মিষ্টি রাশি রাশি টোপাকুল ধরে রয়েছে সেখানে। কম রাস্তা হাঁটতে হয় নি আজ। ক্ষিদে পেয়েছে ভীষণ। রাক্ষসটার পাল্লায় পড়ে ক্ষিদের কথা বেমালুম ভুলে ছিল। পাকা পাকা কুলগুলো দেখবার সঙ্গে সঙ্গে পেটে আবার ক্ষিদেটা চনচন করে উঠল।

রাক্ষস বলল, 'কি রে অমন ছটফট করছিস যে! ভয় করছে বুঝি ?'

সোনাই ঢোক গিলে বলল, 'না, আমার ভী-ষ-ণ ক্ষিদে পেয়েছে। কিছু না খেলে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।'

রাক্ষসটা বিকট সুরে হা হা করে হেসে উঠল। হাসির চোটে পায়ের নিচের মাটিটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

'ছাখো দিকিন মজা, আমার পেয়েছে ক্ষিদে তাই তোকে খাব চিবিয়ে চিবিয়ে। তোরও আবার সময় বুঝে ক্ষিদে পেল ?'

সোনাই বলল, 'কি করি বল, ক্ষিদেটা যে মানা করলেও শুনছে না।'

রাক্ষস বলল, 'তা অবশ্য ঠিক। আমারও যখন ক্ষিদে পায় রাগে অন্ধ হয়ে যাই। সামনে যা পাই খাওয়া শুরু করি। বাঘ ভালুকের হাড়গোড়, হরিণের শিংও বাদ দেই না। তোকে কি খাওয়াই বল্ তো ? আমার ঘরে ছুটো মরা হাতি, তিনটে ঘোড়া আর এগারোটা বাঘ আছে—ও আমার এক বেলার খাবার, ও সবের মাংস কি আর তোদের ভাল লাগবে !'

সোনাই বলল, 'উঁহু, বরং দেখলেই বমি হবে। তবে বাবা মাঝে মাঝেই হরিণ শিকার করে আনে। হরিণের মাংস মসলা দিয়ে রান্না করে খেতে মন্দ লাগে না।'

রাক্ষস বলল, 'ইস্ আবদার ছাখো, তোর জন্যে আমি এখন আবার হরিণ খুঁজতে বেরোই ! তবে

হ্যাঁ'—রাক্ষসের মাথায় ফন্দী এল এতক্ষণে, 'কুল খাবি, পাকা টোপাকুল ?'

কুল ? জিব দিয়ে প্রায় জল গড়িয়ে এল সোনাই-এর। আনন্দে চোখদুটো ছলছল করে উঠল। ভুলে গেল একটু পরেই রাক্ষসের পেটে যেতে হবে। দু হাতে তালি দিয়ে ফিকফিক করে হেসে উঠল।

'ইস্ তাহলে কি মজাই হবে। দাও না পেড়ে, সোনাভাই-ও খাবে।'

এদিকে কিন্তু কথাটা বলেই চিন্তায় পড়েছে রাক্ষস। দেহটা তো আর তার কম ভারি নয়। পুরো সাড়ে চল্লিশ মন ওজন। কুল গাছটা তো ঐ টুকুন! তার দেহের ভার অত ছোট গাছ সইতে পারবে না। কুল পাড়তে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেই চিৎপাত হয়ে পড়বে। কিন্তু সে অক্ষমতা তো বাচ্চাদুটোর কাছে প্রকাশ করা যায় না। আচ্ছা, তবে ওদের আমার আরও একটা ক্ষমতা দেখাই। মনে মনে ভাবছে রাক্ষসটা।

'এই তোরা সব চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। ঘাবড়ে যাস্ না আমার কাণ্ড দেখে।'

বলতে বলতেই চোখের সামনে অত বড় রাক্ষসটা একটা ছোট্ট ইঁদুর হয়ে গেল। দেখতে না দেখ্‌তেই তরতর করে উঠে বসেছে গাছের মগডালে। পাকা পাকা টোপাকুল থরে থরে ধরে রয়েছে সেখানে। সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে ইঁদুরটা। সরু গোঁফ নেড়ে চেড়ে বলছে, 'দেখছিস্ তো রাক্ষসদের কেরামতিটা ? চোখের পলকে আমরা হাতি ঘোড়া বাঘ, রাজা মহারাজা স-ব হতে পারি। তোরা পারবি ?'

সব ব্যাপার দেখে তো সোনাভাই-এর দু চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠেছে। সোনাইও তাজ্জব। রাক্ষসটার বুদ্ধিও আছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে সরু গাছের ডালে গিয়ে দাঁত দিয়ে কুটকুট করে বোঁটা ছিঁড়ে কুলগুলো নিচে ফেলে দিচ্ছে। মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছে অজস্র পাকা কুল। বর্ষার জলকণার মতই।

'নে নে কত খাবি খেয়ে নে। তারপর তোকে খাব।'

গাছতলাটা কুলে কুলে ভরা। আনন্দে হাততালি দিয়ে কুড়োচ্ছে সোনাই আর সোনাভাই। সোনাই-এর সোনার জরির কাজ করা শাড়ির আঁচলটা কুলে ভরে এল। রাক্ষস গাছের ওপর থেকে বলল, 'হয়েছে, এবার লাফ দেব নিচে।'

সোনাই বলল, 'রাক্ষস ভাই, অত উঁচু থেকে লাফ দিতে তোমার ভয় করবে না ?'

রাক্ষস বলল, 'কেন, আমি তো এখন আর হোঁদল কুতকুত সাড়ে চল্লিশ মন ওজনের রাক্ষস নই। দিব্যি হালকা ছোট্ট ইঁদুর। চোখ বুজে হাওয়ায় ভেসে লাফ দেবো। তোরা সাবধান।'

বলতে বলতেই চোখের পলকে হাওয়ায় ভেসে নিচে লাফ দিয়েছে রাক্ষসটা। আর এদিকে হয়েছে আরও একটা কাণ্ড। তুলতুলে পশমের মত ঝুমকিটা এতক্ষণ চুপচাপ ওৎ পেতেই ছিল। চোখ বুজে রাক্ষসটা লাফ দেওয়ার আগেই সোজা দাঁড়িয়েছে গাছের নিচে। মুখ হাঁ করে রয়েছে। আর রাক্ষস পড়বি তো পড় ঝুমকির মুখেই। ইঁদুর-রূপী-রাক্ষসটা ঝুমকির গলা দিয়ে সটান পেটের ভেতর।

রাজকন্যাকে খাওয়ার সাধ চিরদিনের মত মিটল রাক্ষসের।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠছে সোনাই আর সোনাভাই-ও। আনন্দে ঝুমকিটাকে বুকে তুলে নিয়েছে। তুলতুলে পশমের মতো নরম দুই গালে নিজের ঠোঁট ছুঁইয়ে আদর করছে। আর চাই না কুঞ্জবাগানে আসতে। ভাগ্যিস ঝুমকি সোনা এসেছিল। নয়ত এক্ষুণি কিম্ভূত কিমাকার রাক্ষসটার পেটে যেতে হত। বাড়িতে ফিরেই আগে ঝুমকির গলায় সোনার ঝুমুর কিনে বেঁধে দেব। কোঁচড় ভরা টোপাকুল নিয়ে রাজকন্যা সোনাই আর সোনাভাই বাড়ির পথে চলল।

বিকেলের সূর্য তখন পৃথিবীটায় আবীরের রঙ ছড়াচ্ছে।

ওদের পেছন পেছন ঝুমকিটাও লেজ নেড়ে হেলেদুলে আসছিল।

নেই-রাজ্য

সাগরশংকর সেনগুপ্ত

সকাল হ্রদের সাকিন আমায় বলতে পার কেউ?
বৈকালেরি উল্টো দিকে দিচ্ছে কি তা ঢেউ?
করলা, সেই ছোট্ট নদী জলপায়েরি মাঝে,
উচ্ছে নদী কোন্ দিকে বয় পাচ্ছি না ঠিক তা যে।
অজয় নদী পাচ্ছি মালুম, জয় নদীটি কই?
ব্রহ্মজায়া নেই কি কোথা? খুঁজতে সারা হই।
পদ্মা আছে, নেই গোলাপী? দেখছি বালাসন,
বৃদ্ধাসনের নেই যে দেখা, খট্‌কাতে রয় মন।
মেঘনা আছে, রোদনা কোথায়? বুঝতে নাহি পারি,
সিন্ধু আছে, কোথায় মরু? আজব লাগে ভারী।
স্পষ্ট অতি চন্দ্রভাগা, সূর্যভাগা নেই?
একক্রু কই? মরছি ঘুরে সেই সে ধাঁধাতেই।
বলতে পার তোমরা আমায়, এসব কোথা পাই?
বললেটা কি? সত্যি নাকি? তিনভুবনে নাই!!

হরতাল

কল্লোল চট্টোপাধ্যায়

আষাঢ় মাস, সারাদিন টিপ্‌টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, লিপি, কেয়া, ডাবলু, ফন্টু দাদুকে ঘিরে বলছে, একটা গল্প বলনা দাদু !' দাদু জিজ্ঞেস করলেন, কিসের গল্প শুনবি ··ভূত, দৈত্য, পরী না কি··· দাদুর কথা শেষ হতে না হতেই সবাই বলে ওঠে ওসব অনেক শুনেছি, আজকে ত হরতাল। তুমি আমাদের হরতালের গল্প বল। দাদু তাঁর টাকটা একটু চুলকে নিয়ে বলতে লাগলেন ;

'অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক রাজার গল্প শোনার খুব শখ ছিল তিনি রোজ রাজসভায় বসে গল্প শুনতেন। রাজার একজন লোক ছিল, সে রাজাকে সব সময় গল্প শোনাত। লোকটা কিন্তু একদম লেখা পড়া জানত না। সবাই তাকে ক্যাবলা বলে ডাকত, রাজসভায় অন্য কেউ গল্প বলত না !

কেন দাদু কেন ?– লিপি জিজ্ঞেস করে।

বলছি, বলছি, সব বলছি, রাজার হুকুম ছিল কেউ যদি গল্প বলতে বলতে থেমে যায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে শূলে চাপিয়ে দেওয়া হবে, তাই বুদ্ধিমান লোকেরা গল্প বলতে আসত না। তারা ভাবত বুদ্ধি খরচ করে গল্প তারা বলবে ? একশো, দুশো...তারপর ? ব্যস সব বুদ্ধি ফুরিয়ে যাবে। তখন ত তাদের মরতে হবে।

ক্যাবলা ছিল একদম বোকা। একটুও তার বুদ্ধি ছিল না, সে রোজ রাজসভায় রাজার পাশে দাঁড়িয়ে বোকচন্দরের মতো বকর বকর করত। সভা শুদ্ধ লোক ক্যাবলার গল্প শুনে হাসত। রাজাও হাসতেন।

রোজকার মত সেদিন রাজসভা বসেছে। রাজ্যের প্রজারা তাদের সুখ দুঃখের কথা রাজাকে জানিয়েছে। এমন সময় 'ক্যাব্‌লা' বলে ডাকলেন রাজামশাই। ডাক শুনেই ক্যাবলা 'হুজুর' বলে ছুটে এল। বিরাট এক পেন্নাম করে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। রাজা বল্‌লেন 'ক্যাব্‌লা গল্প বল।' ক্যাবলা বলতে লাগল :

দেবাদিদেব মহাদেব যুগ যুগ ধরে তপস্যা করে চলেছেন। তপস্যা করছেন বিরাট এক বটগাছের তলায়। সেই বটগাছটার মধ্যে দিয়ে খুব লম্বা এক তালগাছ আকাশ ফুঁড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যুগ যুগ ধরে বটগাছটা আর তালগাছটা মহাদেবকে ঝড়-জলে আশ্রয় দিয়ে আছে বলে ব্রহ্মা গাছ দুটোর ওপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। সেইজন্যে গাছদুটোও অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিল।

একদিন এক মজার ঘটনা ঘটল। তালগাছের বহুদিনের বন্ধু এক কাক ছিল। অনেক দিন পরে সে তার ছানাপোনাকে নিয়ে তালের বাড়িতে বেড়াতে এল। অনেকদিন পরে দেখা হল দু'বন্ধুর। তালের আর আনন্দ ধরে না। সারাদিন তারা গল্পগুজব করেছে। এদিকে কাকের ছোট ছেলেটা

এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে একেবারে মহাদেবের জটার মধ্যে ফুরুৎ করে ঢুকে পড়ল। যেই না ঢোকা অমনি মহাদের তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। কাকের বাচ্চাটা ভয়ে কেঁদে ফেল্ল। সে তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে জটায় আরও জড়িয়ে পড়ল। মহাদেব তখন টান মেরে বাচ্চাটাকে মেরে ফেল্লেন।

বটগাছের ডালে বসে একটা চড়াই পাখি এই ভীষণ দৃশ্য দেখেছিল। সে কাঁদতে কাঁদতে তালের বাড়িতে সেই ভয়ানক দুঃসংবাদটা দিল। সব শুনে কাক হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। এর একটা প্রতিকারের জন্যে সে তালের হাতে পায়ে ধরাধরি করতে লাগল।

তাল বেচারা কি করে, অনেক ভেবে চিন্তে সে দড়াম করে একেবারে মহাদেবের ঘাড়ে পড়ল। আচমকা আঘাত খেয়ে মহাদেব দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটতে লাগলেন। একে তো সতীর দেহ বয়ে বয়ে গা-গতরে ভীষণ ব্যথা। তার ওপরে আবার তালের আঘাত একা এত যন্ত্রণা সহ্য করবেন কি করে?

তারপর কি হল দাদু?—চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করে কেয়া। দাদু বলতে থাকেন, মহাদেবকে এদিক ওদিক দৌড়-দৌড়ি করতে দেখে বিশ্বশুদ্ধ লোক তো অবাক্! একি হল? মহাদেব ছুটছেন ত ছুটছেন, তাঁর ছোটা আর থামে না। গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ। যতই হোক মহাদেব আমাদের দেবতা। শাপ দিলে আর রক্ষে নেই। পৃথিবীটা তা হলে একেবারে রসাতলে যাবে।

একটা পুষ্পক রথ আকাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মহাদেবের উড়ন্ত জটাতে পাক খেয়ে সেটা পড়ল একেবারে মাটিতে, লোকগুলো সব বেঘোরে মারা পড়ল। তারপর সব যানবাহন বন্ধ, পশুপাখিরা চুপচাপ। কি হয় কি হয় এমন একটা ভাব।

তাল কিন্তু মহাদেবকে ছাড়েনি। সে গড়িয়ে গড়িয়ে মহাদেবের পিছু পিছু ছুটে চলেছে। কেউ তাকে থামাতে পারছে না, সারা রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা অচল। রাজা পড়লেন মহা ভাবনায় এরকম চললে তো রাজ্য-পাট ডকে উঠে যাবে, তিনি নগররক্ষীকে আদেশ দিলেন, বাণ মেরে তালের তিনটে মাথা তিনদিকে করে দাও, যেই না রাজার আদেশ পাওয়া সঙ্গে সঙ্গে নগররক্ষী বাণ মেরে তালের মাথা ফাটিয়ে দিল। তালটা ছট্‌ফট্ করতে করতে মারা পড়ল, দোকান-পাট, কোর্ট-কাচারি খুলল, গাড়ি ঘোড়া চলতে লাগল। রাজ্যের অবস্থা স্বাভাবিক হল।

দাদু থামলেন, ফন্টু, ডাবলু জিজ্ঞেস করলো তারপর কি হল? দাদু বল্লেন মহাদেব আবার তপস্যায় বসলেন। বলে ক্যাবলা গল্প শেষ করল, সবাই গল্প শুনে চলে গেল, রাজাও খুসি হলেন।

লিপি প্রশ্ন করল—দাদু তুমি কি চালাক, হরতালের গল্প কোথায় বললে? দাদু বল্লেন ওইতো, মহাদেবের আর এক নাম হর, হরের পিঠে তাল পড়েই হয়েছিল হরতাল।

পায়াভারি

সঞ্জয় রায়

হেড অফিসের বড়বাবু সবাই তাঁকে চিনি,
সেই যে সেবার গোঁফ হারিয়ে ভির্মি গেলেন যিনি।
আবোল-তাবোল ছন্দে যাঁহার কীর্তি লিখে খাতায়,
অমর হয়ে আছেন কবি ছড়া-ছবির পাতায়।
হঠাৎ দেখি সেদিন তিনি ত্রয়োদশীর ভোরে—
এক-পা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন আমড়াতলার মোড়ে।

মাথায় ছাতা, হাতে খাতা, কানে কলম গোঁজা ;
উর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে আছেন চক্ষুদুটি বোজা।
দেখতে তাঁকে বিরাট রকম ভিড় করেছে সবাই,
খগেন নগেন জগমোহন গঙ্গারামের ক'-ভাই।
আত্মানাথের মেসো এবং চণ্ডীদাসের খুড়ো,
গোষ্ঠমামা, পাগলা জগাই, ভীষ্মলোচন বুড়ো।

যে যেখানে ছিল তারা সব এসেছে ছুটে।
দেখতে যারা পাচ্ছেনাকো দেখছে গাছে উঠে।
কি হয়েছে বড়বাবুর যাচ্ছেনা ঠিক বোঝা ;
কেউ ছুটেছেন হাসপাতালে কেউ এনেছেন রোজা।
হরেকরকম গবেষণা চলছে তাঁকে ঘিরে,
কেউ চেঁচিয়ে ফাটান গলা, কেউবা কহেন ধীরে—

'ব্যস্ত হবার নেই কিছু ভাই, জানি ওনার ধাত—
তেরোদশীর গেরোর ফেরে ঠিক বেড়েছে বাত!'
মুচকি হেসে বলেন কেশে আরেক মহাশয়—
'কী যে বলেন দাদা—হেঁ হেঁ—ওসব কিছু নয়।
বলছি শুনুন, ইচ্ছে হ'লে রাখতে পারেন লিখে—
'এক-পা তোলায়' নাম দিয়েছেন এবার অলিম্পিকে!'
'থামুন থামুন, বাজে কথা',—আরেক অভিমত—
'ত্রিকালজয়ী মহাপুরুষ,—জাতির ভবিষ্যত

ভাবেন কেবল যোগসাধনায় মগ্ন হয়ে উনি।
সিদ্ধযোগী 'এক-পা-বাবা', মস্ত বড় গুণী।'
'যোগী না ছাই,' 'রাখছি বাজি—পাগল নাতো খুনে—'
চোখ নামালেন বড়বাবু এসব কথা শুনে।

নাড়িয়ে মাথা উঁচিয়ে ছাতা বলেন তোদের ধিক্,—
একটা লোকেও বুঝলিনে হায় ব্যাপারখানা ঠিক।
মাথায় তোদের গোবরপোরা বলি কি আর সাধে?
বুঝতে হলে বুদ্ধি লাগে, রাধে কৃষ্ণ রাধে!
ইচ্ছে করে খাঁচায় ভরে পাঠাই তোদের রাঁচী।
মন দিয়ে শোন্, একপা তুলে দাঁড়িয়ে কেন আছি।

অনেক বছর আগের কথা, চাকরী নতুন পেয়ে--
আড়াই টাকা জমিয়েছিলাম একটি বেলা খেয়ে।
চীনে বাড়ির সস্তা জুতো তাই দিয়ে একজোড়া
নিয়ে এলাম কিনে সেবার—লাল কাগজে মোড়া।
বললে সবাই ভালই পেলে, টিকবে অনেক কাল ই।
সারিয়ে নিও সময়মত, লাগিও রোজ-ই কালি!

লাগিয়ে পালিশ তাপ্পি-তালি তিরিশ বছর ধরে
দিলাম পায়ে। আজকে হঠাৎ দেখছি হিসেব করে—
মাইনেগুলো সবই গেছে জুতো-সারাই খাতে।
এ্যাদ্দিনেতেও জমেনি তাই একটি টাকাও হাতে।
সারাই-সেলাই পালিশ-তালি এবং পেরেক ঠোকা,
নেই কোন ভুল এই খাতাতে সব রয়েছে টোকা।

দেখ্ না এটা নিজের চোখেই। হিসেব আমার পাকা।
জুতো-জোড়ার দাম হয়েছে একশো উনিশ টাকা।
উঠুক পেরেক, লাগুক তালি, ছিঁড়ুক সেলাই সুতো;
কেমন করে চলবো পরে এমন দামী জুতো?
চললে আবার ছিঁড়বে শেষে, লাগবে ধুলো-কাদা।
তাই রেখেছি উর্ধ্বে তুলে। বুঝলি এবার হাঁদা?

(সমুদ্রের তলদেশ সম্বন্ধে জানবার জন্য স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ পাড়ি দিয়েছিল, তারপরে আর ফিরে আসেনি। এই অভিযানের নেতা ছিলেন মহাপণ্ডিত ডঃ ম্যারাকট ও জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপটেন হাওসি। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত প্রাণিবিদ মিঃ সাইরাস হেডলি, ইঞ্জিনিয়ার বিল স্ক্যানল্যান ও আরো ২৩ জন।

এক ঝুলন্ত খাঁচার মতন যন্ত্রের সাহায্যে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তলায় এক গভীর খাদের ধারে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে এঁরা গভীর খাদের মধ্যে পড়ে যান ও এক আশ্চর্য নগরীর সন্ধান পান। সমুদ্রগর্ভে বিশাল এক 'আশ্রয় সদনে' কৃত্রিম বাতাসের সাহায্যে জীবনধারণ করে উন্নত বিজ্ঞান সম্পন্ন এক জাতি—তাদের কাছে আশ্রয় পাওয়া গেল। এরা প্রাচীন আটলান্টিসবাসীদের বংশধর।

মাণ্ডা, স্কার্পা, তাঁর মেয়ে সোনা ও বহু মেয়ে পুরুষদের সঙ্গে পরিচয় হল। এরা বেশ হাসিখুশি মানুষ। এরা চলচ্চিত্রের মতন পর্দায় চিন্তার প্রতিচ্ছবির সাহায্যে আগন্তুকদের কাহিনী শুনে নিল।

বাইরের দুনিয়ায় সংবাদ পাঠাবার জন্য ম্যারাকট আটলান্টিসের রসায়নবিদদের আবিষ্কৃত অতি হালকা লাঘবজান গ্যাসের সাহায্যে কাঁচগোলকের মধ্যে করে নিজেদের অভিজ্ঞতার আদ্যোপান্ত বিবরণ লিখে ভাসিয়ে দিলেন।

কাঁচগোলকের বার্তা ইউরোপে এসে পৌঁছবামাত্র তাঁদের উদ্ধারের জন্য একটি অভিযান বেরোয়। কয়েকটি কাঁচগোলকের সাহায্যে তাঁরা অনায়াসে ভেসে উঠে উদ্ধারকারী 'ম্যারিয়ন' জাহাজে আশ্রয় পান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন 'জলকুমারী' সোনা।)

(বারো)

"আটলান্টিক মহাসাগরের তলায় অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করে' ফিরে আসবার পর অনেকেই আমাদের কাছে পত্র লিখেছেন—আমাকে (অর্থাৎ অক্সফোর্ডের রোড্‌স্ স্কলার সাইরাস্ হেড্‌লেকে) প্রফেসর ম্যারাকটকে,

এমন কি বিল্ স্ক্যান্‌ল্যান্‌কেও। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের ২০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি জায়গায় আমরা সমুদ্রের ভিতর নামি এবং তার ফলে কেবল যে গভীর সমুদ্রের প্রাণী ও জলের চাপ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বদলেছে তাই নয়, এও সাব্যস্ত হয়েছে যে একটি পুরাতন সভ্যতা অসম্ভব রকম কঠিন অবস্থার মধ্যেও আজ পর্যন্ত টিকে আছে। সমুদ্রের তলা থেকে পাঠানো আমার বিবরণীতে যা যা লিখেছি তা যদিও ভাসা ভাসা ধরনের তবু প্রায় সব কথাই তাতে আছে। কোনো কোনো বিষয় অবশ্য তাতে লেখা হয়নি। তার মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য প্রভু ঘোরদর্শনের কথা। সে কথা এতই অবিশ্বাস্য রকমের অদ্ভুত যে আমাদের মনে হয়েছিল যে তখনকার মত সে সব কথা না জানানোই ভাল। তবে এখন, যখন বিজ্ঞানীরা আমাদের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেছেন আর সমাজ গ্রহণ করেছে আমার আটলান্টিয় বধূকে, তখন সে কাহিনী হয়ত সাহস করে' সকলের কাছে বলা যেতে পারে। সত্যিই ডাঃ ম্যারাকটের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের দরুণ আমরা সেখানে এমন কীর্তি রেখে আসতে পেরেছি যাতে আমাদের কথা তাদের ইতিহাসে কোনও দেবতার আবির্ভাব বলেই হয়ত লেখা থাকবে। আমরা যে চলে' আসব সে কথা তারা জানত না, জানলে খুব সম্ভব আসতে দিত না। হয়ত এর মধ্যেই সেখানে লোকের মুখে মুখে একটা কিংবদন্তী দাঁড়িয়ে গেছে যে আমরা স্বর্গ থেকে গিয়েছিলাম আবার স্বর্গেই ফিরে এসেছি, সঙ্গে করে' নিয়ে এসেছি তাদের সব চাইতে মধুর, সব চাইতে সুন্দর ফুলটি।

'যাই হোক্, প্রভু ঘোরদর্শনের কাহিনী বলবার আগে আরো কতকগুলি অদ্ভুত ব্যাপারের কথা বলব। সত্যিই এক এক সময় মনে হয় ম্যারাকট ডীপে আরো কিছুদিন থাকলে হত, বহু রহস্য ছিল সেখানে।

'একদিন হঠাৎ সতর্কতার সাড়া পড়ে গেল আর আমরা সবাই অক্সিজেনের মুখোস পরে' সমুদ্রতলে ছুটে গেলাম। আমাদের আশে পাশে অন্য সকলের মুখে আতঙ্কের ছাপ এত স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল যে আমাদের বুঝতে বাকি রইল না যে কোনো সাংঘাতিক বিপদ্ উপস্থিত হয়েছে। কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলাম কয়লার খনির সেই গ্রীক শ্রমিকেরা পড়ি মরি করে' ছুটতে ছুটতে আমাদের উপনিবেশের দরজার দিকে চলেছে। বুঝলাম যে আমরা যারা বাইরে এসেছি তাদের কাজ হচ্ছে এদের যত শীঘ্র সম্ভব ভিতরে নিয়ে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত সবাইকে যখন ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল তখন একবার চারদিকে তাকিয়ে ভয়ের কারণটা কি বোঝবার চেষ্টা করলাম। দূরে কেবল এক জোড়া সবুজ সবুজ ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। প্রত্যেকটারই মাঝখানটা উজ্জ্বল আর ধারগুলি ভাঙা ভাঙা, অস্পষ্ট, যেন দুই টুকরো মেঘ। মেঘের মতই সে দুটো আমাদের দিকে ভেসে আসছিল। তখনও সে দুটো প্রায় আধ মাইল দূরে, কিন্তু আমাদের সঙ্গীরা মহা আতঙ্কে আমাদের নিয়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে ঢুকলেন। দরজার মাথার উপর স্বচ্ছ স্ফটিকের একটা দশ ফুট লম্বা আর দুই ফুট চওড়া মস্ত চাঁই রয়েছে। বাইরের দিকে আলো ফেলার ব্যবস্থাও আছে। উপরে উঠবার সিঁড়ি ছিল। আমরা কয়েকজন তাই বেয়ে উঠে স্ফটিকের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। দেখলাম সেই অদ্ভুত ঝিকমিকে সবুজ আলোর কুণ্ডলী দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তার পর তাদের একটি সেই স্ফটিকের জানালা বরাবর উঁচুতে উঠতে লাগল। মনে হল যেন একটা আলোর শিখা কাঁপতে কাঁপতে উপরে উঠে আসছে। তখনি আমাদের সঙ্গীদের একজন আমাকে টেনে দৃষ্টি-রেখার নীচে নামিয়ে দিল, কিন্তু আমার মাথার কয়েক গাছি চুল হয়ত তখনও জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, সেই কয়গাছি চুল আজ পর্যন্ত শুকনো রং-চটা গোছের হয়ে আছে। ভয়ের নানান সুরে বলা 'প্র্যাক্সা' কথাটার থেকে বুঝলাম যে সেইটাই সেই অদ্ভুত জীবের নাম। একমাত্র লোক যিনি এই ব্যাপারে পেলেন আনন্দের খোরাক তিনি প্রফেসর ম্যারাকট্। একখানি ছোট জাল আর একটি কাচের পাত্র নিয়ে তিনি তখনই বেরিয়ে পড়েন আর কি! অনেক কষ্টে তাঁকে এই পাগলামি থেকে নিরস্ত করা গেল। তাঁর

মন্তব্য : ‘এ একটি নূতন প্রাণিপর্যায়, এর কতক অংশ জৈব আর কতক গ্যাসীয়, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় তার বুদ্ধি বৃত্তি আছে।’ স্ক্যানল্যানের মন্তব্য ঠিক একটা বৈজ্ঞানিক মত নয়, সে বললে, এটা জাহান্নমের আজব খেয়াল।’

‘এর দুই দিন পরে একবার সমুদ্রতলে বেড়াতে বেরিয়ে আমরা একজন কয়লা-শ্রমিকের মৃতদেহ পড়ে’ থাকতে দেখলাম। বেচারা পালাতে পারেনি, ফলে সেই প্রাণী দুটির পাল্লায় পড়েছিল। দেখলাম তার কাচ-গোলকটি ভেঙ্গে গেছে। এতেই বোঝা গেল সেই বায়বীয় জীবের দেহে কিরকম শক্তি। লোকটির চোখ দুটি কেবল তারা উপড়ে নিয়েছিল, শরীরের আর কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই।

‘ফেরবার পরে ম্যারাকট বললেন, ‘বড় খোশ-খোরাকী জীব! নিউজিল্যাণ্ডে এক জাতের শিকারী টিয়া আছে তারা ভেড়ার ছানা শিকার করে কেবল তার পেটের ভিতরে একটা বিশেষ জায়গার চর্বিটুকু খাওয়ার জন্য। তেমনি এই জীব মানুষ মারে কেবল চোখদুটির জন্য!’

‘আর একটি অদ্ভুত জন্তুর কথা বলি। অনেক সময় আমরা দেখতাম সমুদ্রতলের নরম পাঁকে কিসে যেন লম্বা দাগ কেটে গেছে, যেন একটা পিপে গড়িয়ে গড়িয়ে গেছে। সেটা কি হতে পারে জিজ্ঞাসা করাতে আমাদের আটলান্টিয় বন্ধুরা জিবে আর টাকরায় ঠেকিয়ে যে আওয়াজ আমাদের শোনালেন ক্রিক্স্‌চক্ বললে হয়ত তার কতকটা কাছাকাছি আসে। তার চেহারাটা মোটামুটি কিরকম তাও জানতে পারলাম তাঁদের সেই আশ্চর্য চিন্তা প্রতিফলকের কল্যাণে। প্রফেসর সেটাকে কেবল এক জাতের খোলকহীন সমুদ্রের শামুকের এক বিরাট্ সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলেন না। একটা অতিকায় শুঁয়ো পোকার মত তার চেহারা, সমস্ত শরীরটা মোটা কর্কশ শুঁয়োর মত লোমে ঢাকা, কিন্তু চোখ দুটি দু খানি লম্বা বোঁটার আগায় বসানো। আমাদের বন্ধুদের ভাবে বুঝলাম সেটা একটা অতি ভয়ঙ্কর জানোয়ার।

‘কিন্তু প্রফেসর ম্যারাকট্‌কে যে জানে তার হয়ত বুঝতে বাকি নেই যে এতে তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহলকেই আরো উসকে দেওয়া হল। এই অজানা উদ্ভট প্রাণীটি ঠিক কোন প্রজাতি ও উপ-প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সেটা স্থির করতে না পারা অবধি তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না। আবার যখন একদিন সাগর তলে আমরা সেই জন্তুর স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পেলাম তখন তাঁকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না, যে আগ্নেয়শিলার ঢিবি আর আগাছার জঙ্গলের ভিতর থেকে চিহ্নটা বেরিয়েছিল বলে’ মনে হল সোজা সেই দিকে চলতে শুরু করলেন। সেদিককার এবড়ো খেবড়ো জমিতে অবশ্য আর সে চিহ্ন আমরা দেখতে পেলাম না, তবে স্বাভাবিক পালার মত একটা খদ দেখতে পেলাম যেটা মনে হল সেই কিম্ভূত জনোয়ারের বাসায় গিয়ে উঠেছে। আমাদের তিনজনেরই হাতে আটলান্টিয়দের সেই বল্লম ছিল, কিন্তু অজানা বিপদের সঙ্গে যুঝবার পক্ষে সেগুলো যে খুব কাজের হবে তা আমার মনে হচ্ছিল না। যাই হোক প্রফেসরকে তো আর একা যেতে দিতে পারি না, কাজেই তাঁর পিছন পিছন যাওয়া ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর ছিল না।

‘সেই আগাছার জঙ্গলের মধ্যে কত রকমের ছোট ছোট জীব, তাদের কত রকমের রঙ। সেগুলি দেখতে যত সুন্দর বিজ্ঞানীদের দেওয়া তাদের নামগুলোও ততই দাঁতভাঙ্গা! চড়াই ভেঙ্গে আমরা উপরে উঠছিলাম আস্তে আস্তে। হঠাৎ দর্শন পেয়ে গেলাম আমরা যাকে খুঁজছিলাম তার। সে চেহারা দেখে মনে যে খুব ভরসা পেলাম তা নয়।

‘আগ্নেয় শিলার মধ্যে একটা ফাটলের ভিতর থেকে তার শরীরটা অর্ধেক বেরিয়ে রয়েছে। প্রায় ফুট পাঁচেক লোমশ দেহ আমাদের নজরে পড়ল। তার চোখ দুটি এক একটি পিরিচের মত বড়, হলদে রঙের কোনো দামী পাথরের মত জল জল করছে। আমাদের আওয়াজ পেয়ে সেই চোখ দুটো তাদের লম্বা লম্বা দুই বোঁটার

উপর আস্তে আস্তে আমাদের দিকে ফিরল। তার পর জন্তুটা ঠিক শুঁয়ো পোকার মত ভঙ্গীতে শরীরটাকে ঢেউ খেলিয়ে আস্তে আস্তে তার গর্ত থেকে বেরুতে লাগল। আমাদের ভাল করে' দেখবার জন্য একবার মাথাটা প্রায় ফুট চারেক উঁচুতে তুললে, তখন লক্ষ্য করলাম তার গলার দুই পাশে টেনিস্ জুতোর তলার মত ঢেউ-তোলা দুটি জিনিস লাগানো। সেটা যে কি হতে পারে ভেবে পেলাম না। তখন জানতাম না যে একটু পরেই হাতে নাতে সেটা জানতে হবে!

"ডাঃ ম্যারাকট ততক্ষণে তাঁর বল্লমটি বাগিয়ে ধরে টান হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর মুখের ভাবে অতিশয় দৃঢ় সংকল্প সুপ্রকাশ। স্পষ্টই বুঝলাম প্রাণিবৃত্তান্তের একটি দুর্লভ নমুনা দেখতে পেয়ে তাঁর মন থেকে সমস্ত ভয় মুছে গেছে। স্ক্যান্‌ল্যান্ আর আমি আর কি করব, দুজনে তাঁর দুপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। জন্তুটা কিছুক্ষণ আমাদের দিকে সেইভাবে চেয়ে থেকে তারপর পাহাড়ের ঢালু বেয়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে আসতে সুরু করল, মাঝে মাঝে সেই দুটি বিরাট চোখ তুলে দেখে নিচ্ছিল আমরা কি করছি। সেটা এত আস্তে আস্তে আসছিল যে আমাদের মনে হল যখন ইচ্ছা আমরা তাকে পিছনে ফেলে দৌড় মারতে পারি। কিন্তু আমরা যে মৃত্যুর অতি নিকটে দাঁড়িয়ে আছি তা যদি তখন জানতাম।

আমাদের কাছ থেকে সেটা যখন আরও ষাট গজ খানিক দূরে আছে এমন সময় একটা বড় জাতের মাছ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আস্তে সাঁতরে সেই জন্তু আর আমাদের মাঝামাঝি এসে হাজির হল। তারপর হঠাৎ জল তোলপাড় করে এক লাফ মারলে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের সারা শরীরে একটা তীব্র যন্ত্রণা বোধ করলাম। সমস্ত শরীর ঝমঝম করে উঠল, হাঁটু দুটো যেন ভেঙ্গে পড়ার মতো হল। চেয়ে দেখি মাছটা উলটে গিয়ে আস্তে আস্তে নীচে এসে পড়ল, তার মধ্যে আর জীবনের লক্ষণ নেই। বৃদ্ধ ম্যারাকট যেমন অসমসাহসিক তেমনি আবার সতর্কও বটে। তিনি নিমেষের মধ্যে বুঝে নিলেন ব্যাপারখানা কি। আমরা যে জীবের মোহড়া নিয়েছি সে আপন খাদ্য শিকার করে বিদ্যুতের ঢেউ হেনে! আমাদের বল্লম কামানের সামনেও যা এর সামনেও তাই। যদি দৈবাৎ মাছটা মাঝে পড়ে জন্তুটার বিদ্যুৎ বাণ নিজের উপর টেনে না নিত তাহলে এতক্ষণ আমাদের ঐ মাছের দশাই হত। আমরা পড়ি মরি করে দৌড়াতে লাগলাম আর দৌড়াতে দৌড়াতে এই সংকল্প করলাম যে অতঃপর এই অতিকায় সমুদ্রকীটটিকে কঠোর নিঃসঙ্গতার মধ্যে ফেলে রাখা হবে।

এইসব হল সমুদ্রের অতি গভীর অঞ্চলের বড় বড় বিপদের কয়েকটি। আরও একটি হচ্ছে একরকম ছোট মাছ, প্রফেসর যার নাম দিয়েছেন ঔদক হিংস্রক। মাছগুলি লাল রঙের, হেরিং মাছের চেয়ে খুব বেশী বড় হবে না। মুখটা বড় আর তাতে সাংঘাতিক দুই সারি দাঁত। এমনিতে সেগুলি নিরীহ, কিন্তু কোথাও সামান্য রক্তপাত হলেই—সে যত সামান্যই হোক—অমনি তারা এসে জোটে। তখন আর কোনো উপায় নেই, ঝাঁকে ঝাঁকে সেই মাছ এসে তাকে চক্ষের পলকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে। আমরা কয়লার খনিতে একবার এইরকম এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছিলাম। একজন শ্রমিকের হাত কি করে একটু কেটে গিয়েছিল, অমনি চারিদিক থেকে হাজার হাজার মাছ তার উপরে এসে পড়ল। সে নিজে আর তার সঙ্গীরা তাদের হাতের গাঁইতি আর কোদাল দিয়ে সেগুলোকে মেরে তাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথা! দেখতে দেখতে বেচারার কাচের পোষাকের বাইরের শরীরটা সেই মাছ কিলবিল জলের মধ্যে যেন মিলিয়ে গেল, শুধু সাদা সাদা হাড়গুলো বেরিয়ে রইল।

ক্রমশঃ

---

* ম্যারাকট ডীপ সুরু হয়েছিল পৌষ ১৩৭৫এ (জানুয়ারী ১৯৬৯)

* পুরোন সংখ্যাগুলি সবই পাওয়া যায়।

সব ঝুট্ হ্যায়

অচিন্ত্য চক্রবর্তী

সদা কর্মব্যস্ত প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর স্বভাবে একটি ছেলেমানুষি লুকিয়ে ছিল। অন্তরঙ্গদের কাছেই ওঁর এই রূপটি প্রকাশ হয়ে পড়ত। এ সম্পর্কে আজ একটি ঘটনা বলছি—সাংবাদিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে।

সেটা ছিল ডিসেম্বর মাস। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে উনি গিয়েছিলেন ইন্দোরে। সম্মেলন সমাপ্তির পর হঠাৎ স্থির করলেন একদিনের জন্য, রাজনৈতিক কোলাহল থেকে দূরে থাকবেন এবং লোকালয়ের বাইরে একান্তে অবসর বিনোদন করবেন।

'যথেষ্ট গোপনীয়তা' সত্ত্বেও জানা গেল, ইন্দোর থেকে কয়েক মাইল দূরে মানডুর আশেপাশে বেড়াতে যাবেন। সঙ্গে যাবে ওঁর দুই দৌহিত্র—রাজীব ও সঞ্জীব।

ঐ অঞ্চলটি বেড়ানোর পক্ষে সত্যিই চমৎকার। ইতিহাসের বৃত্তান্ত ও নানান কিংবদন্তীতে একে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

মানডুতে পৌঁছনর পর, অভ্যর্থনা পর্ব শেষ হলে, জনৈক প্রবীন গাইড (পরিদর্শক) ভার নিলেন দর্শনীয় সব কিছু পণ্ডিতজীকে দেখানোর। খাঁ সাহেব নামে পরিচিত, শুভ্রকেশ এই ভদ্রলোকটি তাঁর বিচিত্র পোষাক দেখিয়ে এবং বচনচাতুর্যে সহজেই জমিয়ে ফেললেন।

হিন্দু-মুসলমান রাজা-রাণীর নানান কীর্তির স্মৃতিবিজড়িত পুরণো রাজপ্রাসাদ, দুর্গ, সরোবর ইত্যাদি ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন। সাবলীল ভঙ্গীতে কখনও মারাঠী ছড়া, কখনও সংস্কৃত শ্লোক অথবা ফারসী বয়েৎ আবৃত্তি করে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করলেন যে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিত অনেকেই যেন অতীতের দিনগুলিতে ফিরে গেলেন! পণ্ডিত নেহরু সসম্ভ্রমে খাঁ সাহেবের কথা শুনছিলেন। মনে হল বেশ উপভোগ করছেন। মাঝে মাঝে দু একটা কৌতূহলী প্রশ্ন করছিলেন।

ঘুরতে ঘুরতে তিনটি পাহাড়ের প্রায় সংযোগস্থলে একটি জায়গায় এসে দেখালেন একটা echo point.

এখান থেকে দাঁড়িয়ে সামনের পাহাড়ের দিকে চেয়ে আওয়াজ করলেই অল্পক্ষণের মধ্যে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

খাঁ সাহেব বললেন,

'রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দিষ্টা এক রাণী আজও পাহাড়ের কোলে রয়েছেন। ওঁর চোখে ঘুম নেই। রাত্রে কখনো কখনো বীণার সুরের সঙ্গে তাঁর মধুর কণ্ঠসঙ্গীত ভেসে আসে।'

উনি জানালেন যে কারও মনে প্রশ্ন জাগলে—এই echo point'এ দাঁড়িয়ে রাণী-মার উদ্দেশ্যে বললেই তিনি সঠিক উত্তর দিয়ে দেবেন! মুহূর্তের মধ্যেই যে জবাব পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কোনো

সন্দেহ নেই।

ইতিপূর্বে খাঁ সাহেব নাকি ওয়াভেল, মাউন্টব্যাটেন ইত্যাদি বড়লাট এবং অনেক রাজামহারাজাকে ওখানে এনেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই রাণী-মার কাছ থেকে সঠিক উত্তর পেয়ে খুসি হয়ে গেছেন।

জওহরলালকে উনি অনুরোধ করে বললেন, 'পণ্ডিতজী, আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে বিনা সঙ্কোচে প্রশ্ন করতে পারেন।'

একটু ইতস্ততঃ করে নেহরু সামনের পাহাড়ের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন:

—'কেয়া, রাজীব অউর্ সন্‌জীব আচ্ছা লেড়কা হ্যায়?'

একটু পরেই পরিষ্কার শোনা গেল:

—'আচ্ছা লেড়কা হ্যায়।'

বেশ খুসি হয়ে খাঁ সাহেব পণ্ডিতজীকে বললেন, 'দেখলেন ত স্যার। কেমন সাফ জবাব। আরও কিছু জানতে চাইলে প্রশ্ন করতে পারেন।'

'কেয়া, খাঁ সাহেব সাচ্চা আদমি হ্যঁায়?,

'মুহূর্তের মধ্যে আওয়াজ হল,

'সাচ্চা আদমী হ্যঁায়।'

আরও উৎসাহ নিয়ে এবারে খাঁ সাহেব জওহরলালকে বললেন যে তৃতীয় প্রশ্নের জবাব সব চেয়ে মূল্যবান।

তখন নেহরুজী বেশ জোরে—যাতে সবাই শুনতে পায় এমনভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,

—'কেয়া, গাইড সাহব যো কুছ্ বোল রহেঁ হ্যঁায়, সব ঝুট্ হ্যায়?'

প্রতিধ্বনি হল: 'সব ঝুট্ হ্যায়।' জবাব শুনে খাঁ যেন চুপসে গেলেন—। মুখে কোন কথা নেই। পণ্ডিতজীর চোখে দুষ্টুমীভরা হাসি।

পুস্তক পরিচয়

কল্যাণী কার্লেকার

হাসির ঘণ্ট—যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রকাশক—মনীষা গ্রন্থালয়, ৪।৩বি বংকিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতা ১২। দাম ২·৫০ পঃ

ছড়ার বই। গ্রন্থকার ভূমিকা করেছেন 'বেঁচে থাকবার এই জটিল সংগ্রামের মধ্যে' 'এই উদ্ভট রসের ধারায়' মনটা ভিজিয়ে নেন। তাঁর রস কখন উদ্ভট, কখন অদ্ভুত, কখন হাসিঠাট্টায় ভরা। ছন্দ সাজে, নির্ভুলভাবে বয়ে চলেছে, মিল আর অনুপ্রাসে ছড়ার আওয়াজ নেচে উঠছে। অনেকগুলো ছড়ায় এই ক্ষেত্রে পুরনো লেখকদের ভাব ও ভাষার ছাপ পাওয়া যাচ্ছে, আর কয়েকটা নোতুন সার্থক সৃষ্টিও আছে।

ছেলেপিলেরা আবৃত্তি করে খুশি হবে।

কলানবগ্রাম

মিঠু মুখার্জী

গ্রাঃ সং ২১২১, বয়স ৮½ বছর

আমরা ২৮শে মার্চ বাসে করে কলানবগ্রাম গিয়েছিলাম, আমাদের বাস গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়ে ছুটে চলল। পথে যেতে একটা পুলিস লাইন দেখলাম। পুলিস লাইনে অনেক পুলিস থাকে। যখন আমরা কলানবগ্রামের কাছে এসে পড়লাম, তখন দেখলাম—পথের দুধারে হাট বসেছে। হাটে কুমড়ো আর বাঁধাকপি বেশি ছিল। তারপর আর একটু দুর যেতেই আমরা কলানবগ্রামে পৌঁছে গেলাম, কলানবগ্রামের একটা আশ্রমে একটু বিশ্রাম করেই কলানবগ্রামের দৃশ্য দেখতে বেরোলাম। আমরা পরপর বুনিয়াদিস্কুল দেখলাম। কারুকর্মশালায় ছেলেরা কাঠের খেলনা বানাচ্ছিল। কলাভবনে ছোট ছেলে-মেয়েদের আঁকা সুন্দর ছবি ও মূর্তি আছে। যাদুঘরে গিয়ে দেখলাম—সেখানে নানারকম মরা সাপ, সাপের ডিম, বিছে, নানারকম মাছ, মুরগির ডিম, ছাগলছানা, নানারকম পোকা পাখির বাসা, কাঠবিড়ালের বাসা, কাঠের টুকরো ও ধান রয়েছে। সেখান থেকে আমরা আবার আশ্রমে ফিরে এলাম। পথে বাঁদরনাচ দেখলাম। তারপর ওখানেই সিমচচ্চড়ি, ডাল, আলুরদম, আলুভাজা মাছ ও দুধভাত খেয়ে বিশ্রাম করে বিকেল ৩টার বাসে আবার বর্ধমানে ফিরে এলাম।

"লটারী"

অনামী রায়

বয়স ১১, গ্রাঃ সং—২১৯৪

এক ভদ্রলোক একবার লটারীর টিকিট কিনেছিলেন। তিনি ছিলেন হার্টের রুগি। ডাক্তার বলেছিলেন তাঁকে এমন কোন সংবাদ না দেওয়া হয় যাতে তাঁর উত্তেজনা হয়। এই রকম সংবাদে হার্টফেলের আশংকা আছে।

এখন সেই ভদ্রলোকের নামে লটারিতে দুইলাখ টাকা উঠেছে। ভদ্রলোকের ছেলেরা গিয়ে ডাক্তারকে সব কথা বলে এনেছে। কারণ এখন বাবাকে এই কথা বললে তিনি হার্টফেল করবেন।

ডাক্তার বললেন সংবাদ আমি দিয়ে দেব তবে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। ডাক্তার ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে একথা সেকথা বলবার পর বললেন—'আচ্ছা আপনি যদি লটারীর টাকাটা পান তাহলে টাকাটা দিয়ে কী করবেন?' ভদ্রলোক বললেন—'আরে দূর্, আমি লটারীর টাকা কোত্থেকে পাবো!' ডাক্তার—'যদি পান তাহলে কী করবেন।' ভদ্রলোক—'আরে দূর্, আমি পাবো না।'

ডাক্তারও নাছোড়বান্দা, রুগি যত না-না করেন ডাক্তার তত চেপে ধরেন। শেষে আর না পেরে ভদ্রলোক বললেন—'যদি পাই তাহলে আপনাকে সব টাকা দিয়ে দেব।'

ডাক্তার এমনি এমনিই দুই লাখ টাকা পেয়ে যাবেন, শুনে ডাক্তার নিজেই তখনই হার্টফেল্ করলেন!

মহাবালেশ্বরে কয়েকদিন

বন্দনা মজুমদার

বয়স—১২, গ্রাহক নং—২১৯০

১৯৬৭ সালের গরমের ছুটিতে আমরা মহাবালেশ্বর যাব বলে ঠিক করলাম।

৫ই জুন ভোর ৬টার সময় আমরা লাক্সারী বাসে করে বোম্বে থেকে মহাবালেশ্বর রওনা হলাম। প্রথম প্রথম খুব ঘুম পাচ্ছিল, কিন্তু তারপর বাস যখন খোলা রাস্তার ওপর দিয়ে চলতে লাগল তখন উৎসাহে উঠে বসলাম।

এরপরে আমাদের বাস তিন চারটে বাস স্টেশনে থামল, প্রায় এক ঘণ্টা যাবার পর কি রকম ঠাণ্ডা লাগতে লাগল, জানলা দিয়ে দেখলাম বাস খাড়া পাহাড়ের ওপর দিয়ে উঠছে। দুধারে সিলভার ওকের সারি, তার মাঝখান দিয়ে আমাদের বাস আস্তে আস্তে চলতে লাগল। দূরে দেখতে পেলাম পাহাড়ের ওপর ছোট ছোট ঘরবাড়ি।

বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ আমরা মহারাষ্ট্রের শৈলাবাসের রানী মহাবালেশ্বরে পৌঁছুলাম।

স্টেশনে খুব বেশি ভিড় ছিল না, কারণ আমরা যে সময়ে গিয়েছিলাম সে সময়ে ওখানে বেশি টুরিস্ট আসে না। পুজোর সময়েই বেশি ভিড় হয়। বাস স্টেশনটা খুব ছোটখাটো, আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওখানকার 'হলিডে হোমে' গেলাম, সেখানে ছোট কিন্তু সুন্দর একটা কটেজ নিলাম।

তারপরে ওখানকার কেন্টিনে খেয়ে নিয়ে আমরা হলিডে হোমের চারিধারটা দেখতে বেরোলাম। হলিডে হোমটা বিরাট বড়। পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে বেয়ে আমরা একটা বড় প্রাসাদ দেখতে পেলাম। আগে লাটসাহেবের বাড়ি ছিল।

বিকেলের দিকে আমরা এক মাইল দূরে বাজারে গেলাম। 'হলিডে হোম' থেকে সকাল ও সন্ধ্যেবেলা একটা বাস যায়। তখন বাসের সময় নয় বলে আমরা হেঁটেই গেলাম। পাহাড়ী রাস্তায়

হাঁটতে খুব ভালো লাগছিল। বাস স্টেশনের পরেই শুরু হয়েছে বাজার। খুব ছোট বাজার, তবে বেশ বড় বড় দোকান রয়েছে। ফলের মধ্যে বেশির ভাগ র‍্যাস্পবেরি-ই দেখা যাচ্ছিল।

ওখানে বেশ ভালো ভালো রেস্তোরাঁ ও হোটেল আছে।

তারপরের দিন সকালবেলা আমরা বাজারে গেলাম। সেখানে গিয়ে খবর পেলাম সাড়ে নটার সময় একটা বাস মহাবালেশ্বরের বিশেষ কয়েকটা জায়গা দেখায়। শুনলাম এখানে নাকি অনেক পয়েন্ট আছে, পয়েন্ট মানে পাহাড়ের ওপরে একটা উঁচু জায়গা।

প্রথমে আমরা গেলাম লাডউইক (Ladwick) পয়েন্ট। অনেক কষ্টের পরে খাড়াই এবং এবড়ো খেবড়ো রাস্তা পেরিয়ে, আমরা ওপরে উঠলাম। সেখানে একটা স্তম্ভ দেখে আমরা কিছু দূরে (Elephant head) হাতীর মাথা বলে একটা পয়েন্টে গেলাম। এরপরে আমরা গেলাম (Wilson) উইলসন নামে আর একটি পয়েন্ট।

এটা সবচেয়ে উঁচু পয়েন্ট ৪৭১০ এখান থেকে নিচে তাকালে রাস্তাগুলো অত্যন্ত ছোট আর আঁকাবাকা লাগে। এরপরে কেটস্ Kates পয়েন্ট দেখে, আমরা গেলাম পুরনো মহাবালেশ্বরে।

প্রথমেই আমরা গেলাম মহাবলীর মন্দিরে, মহাবলীর নামেই এ জায়গার নামকরণ হয় মহা-বালেশ্বর। এখানেই কৃষ্ণা, কোয়না ও আরো তিনটি নদীর উৎস, মন্দির প্রাঙ্গণে একটা বরাহের মুখ দিয়ে সারাক্ষণ এই পাঁচটি নদীর মেশানো জল পড়ে।

এখান থেকে আর্থার সীট (Arthur Seat) নামে একটা পয়েন্ট হয়ে, আমরা বাসে করে ফিরে এলাম। সেদিন বিকেলবেলা আমরা বম্বে পয়েন্টে গেলাম, এখান থেকে সূর্যাস্ত খুব সুন্দর দেখা যায়।

পরদিন দুপুরবেলা আমরা বাসে করে প্রতাপগড় দুর্গে গেলাম, এই সেই ইতিহাস বিখ্যাত দুর্ভেদ্য প্রতাপগড়! এখানে শিবাজীর সঙ্গে আফজল খাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। আফজল খাঁ যখন শিবাজীকে আক্রমণ করেন তখন শিবাজী আফজল খাঁকে এই দুর্গের নীচে বাঘনখ দিয়ে হত্যা করেন।

অনেক উঁচুতে উঠে প্রথমে চোখে পড়ল হনুমানজীর মন্দির, আর তার কিছু ওপরে ভবানীর মন্দির। সবার ওপরে একটা সুন্দর উদ্যানের ভেতরে একটা গোল চত্বরের ওপরে শিবাজীর ঘোড়ায় চড়া একটা মূর্তি। তার ওপরে গেলে জুতো খুলতে হয়।

পরদিন সকালে আমরা গেলাম মহাবালেশ্বর থেকে বারো মাইল দূরে পাঁচগানী নামে একটা জায়গায়।

এখানে খুব ভালো ভালো স্কুল আর কনভেন্ট আছে। পুরো শহরটা ঘুরে এবং কয়েকটা পয়েন্ট দেখে আমরা মহাবালেশ্বরে ফিরে এলাম।

সেদিন বিকেলে আমরা ইয়ানা বলে একটা লেকে গেলাম আর বোটে করে সারা লেক ঘুরলাম। ঘোড়ায় চড়লাম; গরম ভুট্টার দানা আর পকৌড়া খেতে খেতে আমরা প্রতাপ সিং পার্কে গেলাম। এটা ভারি সুন্দর, ঠিক ইয়ানা লেকের ওপরে। এখানে নানা রকমের গাছপালা ও ছোটদের খেলার

ব্যবস্থা আছে। তারপরে আমরা হলিডে হোমে ফিরে এলাম।

পরদিন সকাল সাড়ে দশটার সময় আমরা বাসে করে মহাবালেশ্বরকে বিদায় জানিয়ে পুনার দিকে রওনা দিলাম।

সন্দেশ

অঞ্জন ভট্টাচার্য গ্রাহক নং—২৩৬১, বয়স—১২

নাঃ···আর তো পারা যায় না। ইংরেজী মাসের চার তারিখ হয়ে গেল, তবু-ও সন্দেশ মহাশয়ের শুভাগমন ঘটল না। কি কাণ্ড বল তো। যদি ও সন্দেশে লেখা থাকে যে দশ-বারো তারিখ পর্যন্ত সন্দেশ আসার সম্ভাবনা থাকে। তবু-ও···

শেষ পর্যন্ত ঠিক করে ফেললাম, নাঃ, আর নয়। আজ বিকেলে সন্দেশ কার্যালয়ে যাবই। নেপোর বই আর ম্যারাকট্ ডীপ গতমাসে এমন পরিস্থিতিতে শেষ হয়েছে, যে এর পরে কি হল তা ভাবতে ভাবতে রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না।

এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমোতে ঘুমোতে এক মজার স্বপ্ন দেখলাম।···

আমাদের ঘরটা হয়ে গেছে একটা নদী। আর আমি সেই নদীতে সাঁতার কাটছি। ওপরে তাকিয়ে দেখলাম, ওমা! একি? একটু আগে যেখানে ছাদ ছিল, সেখানে এখন আকাশ। আকাশে পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে আর সূর্যিমামা আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে।

এমন সময় ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি একটা নৌকো আমার দিকে আসছে। নৌকোয় আছে চার ভাই আর এক বোন। দু'ভাই হাল ধরেছে, দু'ভাই দাঁড় বাইছে আর বোন বসে বসে গল্পের বই পড়ছে। নৌকো আরো কাছে এসে পড়ল।

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'থামাও, নৌকো থামাও।'

উত্তরে তারা আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসল।

'কি হল? থামাচ্ছ না কেন?'

'উঠেই পড়না,' বড় ভাই উত্তর দিল।

'কি করে উঠব?'

'কেন, লাফিয়ে?'

লাফিয়ে নৌকোয় উঠতে গেলাম। কিন্তু পারলাম না। জলের মধ্যে পড়ে গেলাম। তলিয়ে যেতে লাগলাম গভীরে। সভয়ে চীৎকার করে উঠলাম! আর··

আর? আর ঘুমটা-ও ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি কখন মা বিছানায় আমার পাশে নতুন সন্দেশটা রেখে গেছেন। অবাক হয়ে দেখলাম, সন্দেশের মলাটের সঙ্গে আমার স্বপ্নে দেখা দৃশ্য হুবহু মিলে যাচ্ছে।

শূন্য গৃহের প্রহরী

অমিতা বসু—গ্রা: নং ১৮১৩ বয়স ১২ বছর

মানুষের চলার পথে অনেক বন্ধুই এসে জোটে। কিন্তু সবাই কি সত্যিকারের বন্ধু? না বেশির ভাগই তো সুসময়ের বন্ধু। কদাচিৎ দুই একজন প্রকৃত বন্ধুর সন্ধান মেলে, সুখে, দুঃখে যারা সবসময়েই পাশে থাকে। মানুষের কথা বাদ দিয়ে যদি পশুজগতের দিকে তাকানো যায় তবে মানুষের প্রকৃত বন্ধু হিসাবে সম্ভবতঃ কুকুরের দাবী সবার আগে। অনেক ঘটনা এই সত্য প্রমাণ করেছে। সে ঘটনার, কথা আজ লিখতে বসেছি তাও অনুরূপ একটি সত্য ঘটনা।

মেদিনীপুরের বন্যা মানুষের জীবনযাত্রার উপর যে বিপর্যয় এনে দিয়েছে তা অবর্ণনীয়। অসতর্ক কত মানুষ যে গৃহহারা, কত মানুষ সে বন্যার জলে ভেসে গেছে তার ঠিক নেই। বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অনেক জায়গায় মানুষকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে গাছে, ভেসে যাওয়া ঘরের চালে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাদের আসবাবপত্র, গৃহপালিত পশু বন্যার জলে ভেসে গেছে। উঃ, যারা কোন রকমে নিজেদের বাঁচাতে পেরেছে তাদের কি দুর্দশা! খাবার নেই, পরণের বস্ত্র নেই এমন কি পানীয় জলের একান্ত অভাব। চারিদিকে জল আর জল কিন্তু পানীয় জল এক ফোঁটাও নেই। ধনী নির্ধনের আজ এক অবস্থা। সবাই সাহায্যপ্রার্থী, 'রিলিফের' জন্য সবাই উন্মুখ।

দুচার দিনে অবশ্য চারিদিক থেকে সাহায্য এসে পড়ল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ছোট বড় অনেক প্রতিষ্ঠান সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল। ফলে অনেক পরিবার রক্ষা পেল।

এমনিভাবে রক্ষা পেয়ে গেল ময়নাগ্রামের চন্দ্রশেখর ও তার ছোট পরিবারটি। স্ত্রী তিনটি ছেলেমেয়ে, ও এক বিধবা বুড়ি পিসি, এই নিয়ে ছিল তার সচ্ছল সংসার। পৈতৃক একতলাবাড়ি ও কিছু জমিজমা ছিল, আর ছিল বাড়ি থেকে একটু দূরে একটি মুদিখানা দোকান। গ্রামের মধ্যে ঐ একটিমাত্র ছিল দোকান। তাই তার দোকানটি বেশ ভালোই চলত। তার সংসারে আরেকজন ছিল। সে তার পোষা কুকুর পপি। পপি তার সত্যিকারের বন্ধু ছিল। দিনরাত সে চন্দ্রশেখরের বাড়ি পাহারা দিত। রাত্রে যখন চন্দ্রশেখর সারাদিনের কেনাবেচার পয়সা নিয়ে বাড়ি ফিরত, তখন পপি দেহরক্ষীর মত তার সঙ্গে সঙ্গে আসত।

বেশ চলছিলো। কিন্তু ভয়ঙ্কর সর্বগ্রাসী বন্যা হঠাৎ সব ওলটপালট করে দিল। সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কোনক্রমে বাড়ির ছাদে উঠে আশ্রয় নিয়ে সকলে প্রাণ বাঁচাল। পপি সবসময়েই তাদের সঙ্গে ছিল। এই বিপদের উপরে আবার আর এক বিপদ এল। চন্দ্রশেখরের ছোট মেয়েটি ছাদের কিনারা থেকে কিভাবে হঠাৎ এক সময়ে জলে পড়ে ভেসে যাচ্ছিল। পপি দেখতে পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার জামাকাপড় ধরল তারপর সাঁতার দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে এল।

এইভাবে দিনচারেক অনাহার, অনিদ্রা ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়া কাটানোর পর একদিন রিলিফের নৌকা এসে পৌঁছাল। ঐ নৌকায় তাদের গ্রামের আরও কয়েকজন ছিল। রিলিফের লোকেরা

চন্দ্রশেখরদের নৌকায় তুলে নিল। কিন্তু ঐ নৌকায় পপির স্থান হল না। চন্দ্রশেখর অনেক করে বলল। কিন্তু রিলিফের লোকেরা জানাল যে, যে নৌকা মানুষ উদ্ধারের জন্য সেখানে কুকুরকে কিভাবে নেওয়া যাবে? নিরুপায় চন্দ্রশেখরকে পপিকে ছেড়েই উঠতে হল। নৌকা ছেড়ে দিল। পপি ভেবেছিল তাকেও বুঝি সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যখন নৌকা ছেড়ে দিল তখন সে সেইদিকে করুণচোখে তাকিয়ে রইল। চন্দ্রশেখরও তার অনেক দিনের বন্ধু পপির দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু বেশিক্ষণ পারল না, তার চোখও ঝাপসা হয়ে এল।

এরপর এখানে ওখানে ঘুরে অনেক কষ্টের মধ্য দিয়া অবশেষে তারা ২৪ পরগণা জেলার কোন একগ্রামে তাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিল। চন্দ্রশেখর কিছু টাকা আনতে পেরেছিল। তার থেকে কিছু দিয়ে সে ঐ গ্রামে একটু জমি কিনে টিনের চালের ছোট একটা বাড়ি তুলল। তারপর তার আত্মীয়ের চেষ্টায় সে ঐ গ্রামে একটা মুদি দোকানও খুলল। এই লাইনে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তাই এটাই ছিল তার সহজতম আয়ের পথ। সে ছিল পরিশ্রমী। পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় দিয়ে সে কিছুদিনের মধ্যে তার অবস্থা বেশ গুছিয়ে ফেলল।

মোটামুটি সব কিছুই হল। কিন্তু তবুও চন্দ্রশেখর মাঝে মাঝে কার কথা ভেবে উদাস হয়ে পড়ে। চোখও তার হয়ে উঠে সজল। তবে সে কি এখনও তার পপির কথা ভোলে নি?

কিন্তু পপির খবর পেতে হলে ফিরে যেতে হবে মেদিনীপুরের সেই পুরনো ময়নাগ্রামে। চন্দ্রশেখররা চলে গেল। পপি বুঝি ভাবল তার প্রভুরা আবার ফিরে আসবে। আবার বাড়ি হয়ে উঠবে সরগরম। আবার সে আগের মতন বাড়ি পাহারা দেবে। কিন্তু যতদিন তার প্রভু ফিরে না আসে—ততদিনও তো তার কাজে অবহেলা করা চলবে না। তাই সে প্রভুর প্রতীক্ষায় বাড়ির সামনে রোয়াকে বসে রইল। ততদিনে আস্তে আস্তে বন্যার জল নামতে শুরু করেছে। চারিধারের বীভৎস দৃশ্য ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। দুর্গন্ধে কোথাও টেকা দায়। এই অবস্থার মধ্যেও পপি তার পুরানো জায়গা থেকে একচুলও নড়ল না। বোধহয় পুরানো দিনের কথা ভেবে তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ত। অনিদ্রায় সে ক্রমশঃ ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ল, ক্রমে তার চেতনাও লোপ পেল। তারপর এক সময় কখন সে তার শেষ নিঃশ্বাস পড়ল কেউ তা জানল না। তার মৃতদেহটা ঐভাবেই রোয়াকে পড়ে রইল বুঝি কোনদিন তার ফিরে আসা প্রভুকে এই কথাই বোঝাবার জন্য যে, সে কাজের ভার তাকে দেওয়া হয়েছিল তা সে কেবলমাত্র জীবিতকালেই নয়, মৃত্যুর পরও পালন করে যাচ্ছে।

(প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর চিত্র অবলম্বনে রচিত)।

গুলের গতি

সুব্রত ঘটক

গ্রাহক নং—২০২৮ বয়স—১৩

বিভিন্ন দেশ থেকে তিনজন বন্ধু এসে একটি বন্দরে মিলিত হ'ল। অনেক একথা-সেকথার পর কথা উঠল ট্রেনের গতি সম্বন্ধে। ঠিক হ'ল প্রত্যেকেই তাদের আপন আপন দেশের ট্রেনের গতির একটা

করে নমুনা দেবে। তিন বন্ধুই মিথ্যে কথা বলতে ওস্তাদ। শুরু করল প্রথমজন। বললে—'আমাদের দেশের ট্রেনের গতির নমুনা শুনলে হাঁ হয়ে যাবে। তবে বলি শোন—একদিন আমি ট্রেনে করে এক জায়গায় যাচ্ছি। পথে একটা স্টেশন থেকে ডিম সিদ্ধ কিনলাম। ডিমে একটা কামড় বসিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি পুরো স্টেশনটাই পাল্‌টে গেছে। এমন কি স্টেশনের নামটাও আলাদা। অনেকক্ষণ চিন্তা করে বুঝলাম যে ডিমে কামড় বসাতে আমার যেটুকু সময় লেগেছে, সেই সময়েই ট্রেনটা পরের স্টেশনে হাজির। তাহলেই বোঝ আমাদের দেশের ট্রেনের স্পীড্‌ কতখানি।'

প্রথম ব্যক্তি থামল। এবার শুরু করল দ্বিতীয় ব্যক্তি। বলল—'একদিনে আমি বুয়েন্‌স এয়াস´ থেকে ভ্যালপারাইজো যাচ্ছি। ষ্টেশনে ছোট ভাইকে আদর করছি। হঠাৎ দেখি আমার হাতটা একটা লোকের গালে গিয়ে লাগল। ষ্টেশনের নামটা দেখলাম আলাদা। বুঝলাম বুয়েনস এয়াসে´ যে হাত দিয়ে ভাইকে আদর করছিলাম সে হাতটা সরাবার আগেই ট্রেনটি পরের ষ্টেশনে পৌঁছে গেছে। ফলে হতভাগ্য লোকটিকে লাভ করতে হ'ল একটি দারুণ চপেটাঘাত।'

তৃতীয় ব্যক্তি এতক্ষণ চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। এবার তার পালা। গম্ভীর গলায় সে বলল, একদিন আমি লাইনের ধারে বসে আছি। এমন সময় একটা কি যেন লাইনের ওপর দিয়ে ছুটে গেল। প্রথমটা বুঝতে পারিনি। মিনিট পনেরো পরে দেখি একটা ট্রেনের ছায়া কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল। এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। ট্রেনটির গতি এত বেশি যে তার সঙ্গে তাল রাখা তার ছায়াটির পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই সে পিছিয়ে পড়েছিল।

বড় হয়ে কি হব

সুপ্রতীক বাগচী গ্রাঃ নং ৮৩৮—বয়স ১২½

সকলে শুধায় যবে—
'বড় হয়ে কিবা হবে?'
বলিতে পারি না ঠিক কিছু।
মাথাটি করিয়া থাকি নিচু।
যাই যবে নদী তীরে,
নৌকা কত দেখি নীরে,
মনে হয় মাঝি যদি হই
সারাদিন তরী পার বাই।
যবে দেখি রেলগাড়ি
চলিতেছে ধোঁয়া ছাড়ি—

চালক হইতে সাধ মনে,
যাই চলে সুদূরের বনে।
কখনো বা দেখি জেলে,
মাছ ধরে জাল ফেলে—
জল, ঝড়, রৌদ্রে প্রখর,
ইচ্ছা হয় হইতে ধীবর।
যোগী যবে শান্ত মনে
করে জপ তপোবনে
মনে ভাবি সাধুবেশ ধরে
যাব সংসার ত্যাগ করে।

'বন্দী টিয়া'

মিতা মুখোপাধ্যায়—বয়স ১৩, গ্রাহক সংখ্যা ২০৩০

লোহার খাঁচায় বন্দী টিয়া ভাবে,
এমন সুদিন হবে তাহার কবে ?
নীল আকাশে সবুজ ডানা মেলে'
উড়ে যাবে সকল বাধা ঠেলে।
ছোট্ট টিয়া ভবে আপন মনে,
ফিরবে কবে চির সবুজ বনে,
যেথায় তাহার মা ও বাবা আছে,
আরও আছে সবুজ গাছে গাছে।
সেইখানেতে সবার সাথে মেলা
ছোট টিয়া করবে অনেক খেলা।

সে এক সামান্য কর্মী

বাসব চট্টোপাধ্যায় গ্রাঃ নং ১৯০৭—বয়স ১৩

পাঁচীলের ওপর আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ডেঁয়োরাজ্যের এক সামান্য শ্রমিক। ঘুরে বেড়াচ্ছিল বললে ঠিক বলা হবে না—একে ঠিক পাহারা দেওয়াও বলা চলে না—চিন্তা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে যেন কি পর্যবেক্ষণ করছিল। মনে তার ভীষণ আশঙ্কা, আকাশে বাতাসে তার রাজ্যের কি যেন এক অমঙ্গল ঘোষিত হচ্ছে। তার মনে তাই আর সুখ নেই।

কিন্তু হঠাৎ—একি ? কোথায় যেন গুরু গুরু শোনা গেল না ? টুকুদের উঠোনের যেখানটায় সূর্য না ডোবা পর্যন্ত রোদে ফেটে যেতে থাকে সেখানে যেন কিসের কালো ছায়া পড়েছে। ঈশান কোনটি কালোয় কালো বইতে শুরু করেছে ঠাণ্ডা বাতাস তাতে আবার বৃষ্টির গন্ধ মাখা। ঠাণ্ডা বাতাসে অবশ্য শরীর জুড়িয়ে গেল। কিন্তু তার তো বুক ভরে নিশ্বাসটুকু নেবার সময়ও যে নেই। দৌড়ে ফিরে চলল সে তার গর্তে। সামলাতে হবে তার বিশাল রাজ্য আসন্ন কালবোশেখীর করাল কবল থেকে। রাজ্যটি বিশাল কিন্তু অলস রাজা—নিস্কর্মা রাণী—শুধুমাত্র ডিম পাড়া ছাড়া অন্য কোন কাজ পারে না, জানে না। শত শত অসহায় বাচ্চা, পুতলী, অজস্র ডিম, সঞ্চিত খাদ্য—আর হাজার হাজার বীর কর্মী কর্তব্যনিষ্ঠ পিঁপড়ে ভাই।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল রাজ্যে। মুহূর্তে সমস্ত রাজ্যের সব কিছু গুছিয়ে দিয়ে চলল ডিম মুখে কর্মীরা। ক্ষুদে ক্ষুদে ছটি পায় তাদের অসীম ব্যস্ততা—বৃষ্টি নামার আগেই নিরাপদ জায়গায় পৌছতে হবে যেখানে বিন্দুমাত্রও জল ঢোকে না।

হৈ হৈ করে এসে পড়ল ঝড়, শিলা বৃষ্টি হতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মীরা সমস্ত রাজ্যটি মাথায় করে নিরাপদে ভাঁড়ার ঘরের ফাটলে ঢুকে পড়েছে। এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সেই সামান্য অসামান্য কর্মীটি।

ধাঁধা

১

দেবাশীষ রক্ষিত

গ্রাহক নং ১৭০৫—বয়স ১১ বছর ৫ মাস

চার অক্ষরে এমন একটি বৈজ্ঞানিকের নাম কর যার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষর নিয়ে একটি জন্তুর নাম হয়। আবার তৃতীয় ও চতুর্থ অক্ষর নিয়ে একটা ওজন হয়।

২

উত্তমকুমার বটব্যাল—গ্রাঃ সং ১৪৮১—বয়স ১২ বছর

কাঁটা ভরা সারা গা, নয় তবু তরু।
পেটখানা কাটো যদি হয়ে যায় সরু।

ধাঁধার উত্তর

১

বাণী সরকার

গ্রাহক সংখ্যা ২১৭৫—বয়স ১১ বছর

জানালা।

২

ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

গ্রাহক সংখ্যা—২০৮৪, বয়স ১৫ বছর

		লা		
	কা	গ	জ	
লা	গ	ভে	ল	কি
	জ	ল	দ	
		কি		

৩

শুভাশীষ ধর

গ্রাহক সংখ্যা ২২০২—বয়স ১১½ বছর

পাতাল।

(উত্তর দেবার শেষ দিন ২০শে ডিসেম্বর)

(১)

খোকা আর রাজা চুপি চুপি কপিলা নদীর ধারে শালবনে বেড়াতে চলল। ওরা ঠিক করল যে সময় না হলে, যদি বা জঙ্গল পর্যন্ত যায়, নদী পার হয়ে ওপারে যাবে না।

খোকা কম সাহসী না, তবে খুব কষ্টসহিষ্ণু নয় সে, সহজেই হাঁপায়। রাজা কিন্তু বেদম ডানপিটে, পাঁচীল ডিঙোন, গাছে চড়া ইত্যাদি কাজে রীতিমত ওস্তাদ! তাছাড়া, হাঁ, সত্যিই সে খুব সাহসী।

নদীর ধারে কেবলই পাথর, কালো কালো, আর খোঁচা-খোঁচা, তকতকে সাদা বালি আর, তারপর টলটলে পরিষ্কার জল। জলে আবার কত মাছ। রাঙা হয়ে আছে সমস্ত বন পলাশ, চাঁপা, পিয়াল, শাল আর অশোক ফুলে।

(উপরের গল্পটার মধ্যে কি কি পাখির নাম লুকোন আছে বার কর ত।)

(২)

কলেজের ছেলেদের বড় একটা দল, মস্ত বাস রিজার্ভ করে চলেছে বনভোজন করতে।

কলকাতা ছেড়ে কয়েক মাইল যাবার পরে দেখা গেল যে রাস্তাটা একটা রেললাইনের তলা দিয়ে গেছে। অবশ্য এই রাস্তা দিয়ে সাধারণ গাড়ি-ঘোড়া আর ছোট ছোট বাস হরদম চলাচল করে। কিন্তু, এত বড় বাসটা রেল ব্রিজের তলা দিয়ে পার হতে পারবে কি? সন্দেহ!

ছেলেরা তাড়াতাড়ি গজ-ফিতে নিয়ে বাসের উচ্চতা আর রেলব্রিজের তলাকার উচ্চতা মেপে দেখে বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ, বেরিয়ে যাবে কোন মতে!

ড্রাইভার তাদের নির্দেশ মতন বাস চালিয়ে দিল, কিন্তু, হায় হায়! মাঝপথে গিয়ে খুব সামান্য একটুর জন্য পার হওয়া গেল না, বাসের ছাদটা ব্রিজের তলায় এমনই আটকে গেল যে বাসটা না পারে এগোতে আবার না পারে পেছোতে!

দেখতে দেখতে সামনের গ্রাম থেকে, রাস্তা থেকে, রাস্তার ধারের পেট্রল পাম্প আর দোকান থেকে বহু লোক এসে জড় হল আর নানারকম উপদেশ-নির্দেশ দিতে লাগল!

কেউ বলল—বাসের ছাদটা কেটে ফেল।

কেউ বা বলল—শাবল গাঁইতি দিয়ে ব্রিজের তলাটা কিছুটা না ভেঙ্গে ফেললে বাস বার করবার উপায় নাই।

কিন্তু, এসব করতে যে শুধু অনেক খরচ আর সময় লাগবে তাই নয়, বিনা অনুমতিতে বাস বা ব্রিজ কিছুই ভাঙ্গা চলবে না! ছেলেরা বাস থেকে নেমে কত ঠেলাঠেলি করল, কিন্তু বাস তেমনি অনড়!

হঠাৎ ছেলেদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন চমৎকার একটা বুদ্ধি দিল আর সেই অনুসারে কাজ করবার ফলে বাসের ছাদ বা ব্রিজের তলা কিছুই না ভেঙ্গে, বিনা খরচে আর অল্প সময়ের মধ্যে ব্রিজের তলা দিয়ে বাসটাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল আর ছেলেরা আবার তাদের গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলল।

বল ত ছেলেটি কি বুদ্ধি দিয়েছিল?

(৩)

বসুমহাশয়, তাঁর স্ত্রী, ছেলে, বোন ও শ্বশুরকে সকলেই শ্রদ্ধা করে কারণ এঁদের মধ্যে একজন হলেন বিখ্যাত অধ্যাপক, একজন নামকরা গাইয়ে, একজন নিপুণ চিত্রকর, একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং অপরজন সুদক্ষ চিকিৎসক।

এঁরা কে যে কি তা অবশ্য আমি সঠিক জানি না, কেবল এইটুকু জানি যে—

(ক) অধ্যাপক ও গাইয়ের মধ্যে কোন রক্তের সম্বন্ধ নেই।

(খ) চিত্রকর মহিলাটি অন্য মহিলার চেয়ে বয়সে বড় কিন্তু অধ্যাপকের চেয়ে ছোট।

(গ) সাহিত্যিক তাঁর কলেজ জীবনে বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন, তিনি ডাক্তারের চেয়ে বয়সে বড়।

বল ত কার কি পেশা?

কার্তিক মাসের ধাঁধার উত্তর:—

(উত্তরদাতাদের নাম আগামী মাসে প্রকাশিত হবে।)

(১) ন। (২) বৈঠকখানা।

(৩) (ক) ১। প্রথমে লাল বাটির থেকে একটা বল নাও। বলটা যদি নীল হয় ২। আবার

লাল বাটির বল নাও। এবার যদি বলটা লাল হয় তাহলে ৩। আবার লাল বাটির বল নিলেই তিন দানের মধ্যে তিনটে বল পেয়ে যাবে।

(খ). ১। লালবাটির প্রথম বলটা নীল আর ২। দ্বিতীয় বলটা সবুজ হলে ৩। সবুজ বাটির বল নাও, সেটা লাল হলে আবার তিনদানের মধ্যে তিন রঙ পেলে।

(গ) ১। লালবাটির প্রথম বলটা নীল আর ২। দ্বিতীয় বলটা সবুজ হলে এবং ৩। সবুজ বাটির প্রথম বলটাও নীল হলে ৪। আবার সবুজ বাটি থেকে তুললেই লাল বল পাবে।

(ঘ) ১। লালবাটির প্রথম বলটা লাল হলে সেই বাটিতেই আবার নেবে, ২। সেটা সবুজ হলে ৩। তৃতীয়টা নীল হবেই।

(ঙ) ১। লালবাটির প্রথম বলটা সবুজ হলে, ২। সবুজ বাটির বল নেবে, সেটা নীল হলে আবার ৩। সবুজ বাটির নেবে সেটা লাল হবেই।

(চ) ১। লাল বাটির প্রথম বলটা সবুজ হলে এবং ২। সবুজ বাটির বল নেবে, সেটা লাল হলে ৩। আবার সবুজ বাটির বল নেবে, সেটাও লাল হলে ৪। আবার নিলে নীল হবেই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কোন অবস্থাতেই চারদানের বেশি লাগছে না।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

* বহুসংখ্যক গ্রাহকের শারদীয়া সংখ্যা ডাকে হারিয়েছে জেনে আমরা খুবই দুঃখিত।
* যদি কিছু সংখ্যা অতিরিক্ত থাকে তাহলে চৈত্রমাসে তাদের আর এক কপি করে দিতে চেষ্টা করব।
* কিন্তু সেগুলি সাধারণ ডাকে পাঠান হবে না। হাতে নেওয়া যাবে বা ডাকখরচ ১৲ দিলে রেজিঃ ডাকে যাবে।
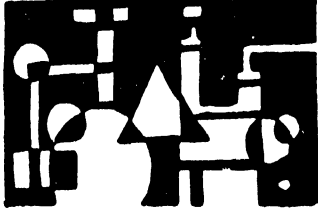
বিজ্ঞান প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার ফলাফল

অমিতানন্দ দাশ

পুজো সংখ্যার এই প্রতিযোগিতায় কেউ কেউ তো দিস্তা দিস্তা উত্তর পাঠিয়েছো। তবে কেউই সম্পূর্ণ সঠিক উত্তর দিতে পারো নি। প্রতিযোগিতার ফলাফল :—

প্রথম (৮টি ঠিক এবং একটি প্রায় ঠিক উত্তর) : ২৭৭৯ অঞ্জন সরকার (বয়স ১১)
১২৩২ নন্দিনী দত্ত মজুমদার।

দ্বিতীয় (৭টি ঠিক এবং একটি প্রায় ঠিক উত্তর) : ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত।

তৃতীয় (৭টি ঠিক উত্তর) : ৩২১ অজন্তা ঘোষ (বয়স-১২)
৮৯৪ তপন ঘোষ।

এছাড়া প্রত্যেক প্রশ্নের সবচেয়ে ভালো উত্তরও নীচে ছাপা হলো। অবশ্য সকলের বোঝার সুবিধার জন্য অনেক জায়গায় ভাষাটা একটু পরিবর্তন করা হয়েছে।

(১) দিনের বেলায় চন্দ্রগ্রহণ হতে পারে কি ?

এই প্রশ্নের একমাত্র সঠিক উত্তর দিয়েছো অজন্তা ঘোষ। বলতে কি প্রশ্নটা একটু ঠকানো ধরনের—চট করে যে উত্তরটা মনে আসে সেটা এতোই সহজ যে প্রশ্নে যে আরেকটা প্যাঁচ আছে সেটা সহজে খেয়াল হয় না।

উত্তর (অজন্তা ঘোষ)—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রতিসরণের জন্য সাধারণ হিসাবে যখন সূর্য অস্ত যাবার কথা তার কিছুক্ষণ বাদে সূর্য ডোবে। সেই রকমেই প্রতিসরণের জন্য চাঁদ সাধারণ হিসাবে যখন উঠবার কথা তার কিছুক্ষণ আগেই চাঁদকে দেখা যায়। কাজেই সূর্য ডুববার ঠিক আগের মুহূর্তে যদি চাঁদ ওঠে এবং ঠিক তখনই চন্দ্রগ্রহণ হয় তাহলে দিনের বেলায় চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে।

(২) রকেটের ডানা থাকে না কেন ? (সবচেয়ে ভালো উত্তর : অঞ্জন সরকার)

উত্তর—রকেটে জ্বালানীর দহনের ফলে প্রচণ্ড চাপযুক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুযায়ী সেই চাপের প্রতিক্রিয়া বলের সাহায্যেই বোমযানটি মহাশূন্যে ধাবমান হয়। সেখানে কোনো বায়ু নেই বলে ডানা, প্রপেলার ও জেট এঞ্জিন কার্যকরী হয় না। তাই রকেটে ডানা থাকে না।

(৩) বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়ে কি করে ?

তোমাদের অনেকেরই দেখলাম শিল পড়া এবং বরফ পড়ার মধ্যে পার্থক্যটা জানা নেই—নিশ্চয়ই বরফ পড়া কখনো দেখোনি বলে! আকাশ থেকে পড়া বরফের কণাগুলি খুব ছোট ছোট হয়, আলাদা

করে একটি কণাকে চোখে তো প্রায় দেখাই যায় না—এক একটা বৃষ্টির (বরং ইল্‌শেগুঁড়ির) ফোঁটা জমে গেলে যা হয় তাই আর কি। শিল হচ্ছে একটা জমাট বরফের চাঁই, ইংরেজীতে যাকে বলে ice আর আকাশ থেকে যে বরফ পড়ে তা হলো snow—এর মধ্যে অনেক হাওয়া, ফাঁক থাকে। মানে ice যদি বেলে পাথর হয় তবে snow হলো বালি আর কি। আবার মজা কি জানো, ঠাণ্ডা দেশে যেখানে বরফ পড়ে সে দেশে কিন্তু শিলাবৃষ্টি হয় না বললেই চলে। কারণ কালবৈশাখী জাতীয় ঝড় হলে তবেই শিলাবৃষ্টি হয়, এবং এরকম ঝড় গরমের দেশেই বেশী হয়।

উত্তর (তপন ঘোষ)—বৃষ্টির সময়ে কখনো কখনো প্রবল ঊর্ধ্বমুখী বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয়। তখন মেঘস্থ নিম্নমুখী বৃষ্টির জলকণাগুলি ইহার প্রভাবে আবার উপরে উঠিয়া যায়। এইভাবে ক্রমশঃ জলকণাগুলি শীতল থেকে শীতলতর স্তরে প্রবেশ করে এবং তাহাদের তাপমাত্রা যখন—২০° সেন্টিগ্রেড হয় তখন তারা জমিয়া যায়। পার্শ্ববর্তী জলকণাগুলিও এদের উপর এসে জমা হলে এগুলি আয়তনে দ্রুত বাড়িতে থাকে। তখন আর ঊর্ধ্বমুখী বায়ুপ্রবাহ ইহাদের ধরিয়া রাখিতে পারে না, একটি গোলাকার বরফের পিণ্ডের মতো হয়ে এগুলি পৃথিবীর আকর্ষণে নীচে নামিতে শুরু করে। এইভাবে বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়ে।

(৪) পাখী ডিমে তা দেয় কেন?

উত্তর (সুতপা বিশ্বাস, ২৬৩১)—ডিম একটি বিশেষ তাপমাত্রায় বিকশিত হয় এবং পূর্ণ বিকাশের পরই তাহা হইতে শাবক বাহির হয়। মানুষের শরীরের মধ্যে শিশু শরীরের তাপমাত্রাতেই পূর্ণ বিকাশ লাভ করার সুযোগ পায়। কিন্তু পাখীর ডিম আগেই শরীর হইতে বাহির হইয়া আসে বলিয়া তাহার পূর্ণ বিকাশের জন্য পাখী তাহাতে তা দেয়।

(৫) আমরা কিছুটা দূর থেকে কোনো জিনিসের গন্ধ পাই কি করে?

উত্তর (অজন্তা ঘোষ)—যখন কোনো গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্য কিছু দূরে থাকে তখন সেটা থেকে নিষ্কৃত গন্ধকণা বাতাসের সঙ্গে মিশে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যখন সেই গন্ধকণা আমাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে ও ঘ্রাণ স্নায়ুতে আঘাত করে তখন মস্তিষ্কে সেই দ্রব্যের গন্ধের অনুভূতি জন্মায়। এর ফলে গন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্যটি কিছুদূরে থাকতেই আমরা তার গন্ধ পাই।

(৬) টিউবওয়েলে যে জল ওঠে তা মাটির নীচে কিভাবে থাকে?

উত্তর (নন্দিনী দত্ত মজুমদার)—একটা ভেজা তুলোর মধ্যে জল যে অবস্থায় থাকে মাটির নীচে বালু বা মাটির মধ্যেও জল সেইভাবে মিশে থাকে। যখন কোনও যায়গায় টিউবওয়েল বসানো হয় তখন সে জল টিউবওয়েলের নলের মধ্যে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জমা হতে থাকে। একটা জায়গার উচ্চতা, বৃষ্টিপাত ও মাটির ধরণ বুঝে একটা নির্দিষ্ট গভীরতা পর্য্যন্ত এই জল নল ভর্তি করে থাকে। এর পর টিউবওয়েল পাম্প করার ফলে সেই জল উপরে উঠে আসে। নল খালি হলে জল আবার ক্রমশঃ তাকে ভর্তি করে ফেলে।

(৭) একটি থার্মোমিটার যদি রোদে থাকে, আর আরেকটি থাকে ইঁটের ঘরে—তবে এগুলি যে তাপমাত্রা দেখাবে তা কি খবরের কাগজে দেওয়া দৈনিক তাপমাত্রার সমান হবে? না হলে কি হবে? কেন?

উত্তর (তপতী দাশগুপ্ত)—যে থার্মোমিটার রোদে আছে তার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আসল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থেকে বেশী হবে, কিন্তু সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আসল সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সমান হয়ে। কারণ দৈনিক কাগজে যে তাপমাত্রা দেওয়া থাকে তা ছায়ায় উন্মুক্ত বায়ুর তাপমাত্রা। কিন্তু শুধুমাত্র রোদে থাকাকালীন সময়েই দুই তাপমাত্রার তফাৎ হবে, কাজেই রোদের তেজ কম হলে বা মেঘ হলে রোদে থাকা থার্মোমিটারের তাপমাত্রা প্রায় হাওয়া আপিসের থার্মোমিটারের তাপমাত্রার সমানই হবে।

আর যে থার্মোমিটার ঘরে থাকছে তার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আসলের থেকে কম আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আসলের থেকে বেশী হবে। কারণ ইঁটের ঘরের আপেক্ষিক তাপ বেশী বলে এর তাপ বাড়তে বা কমতে সময় লাগে, আর সেই জন্যই দিনের বেলায় ইঁটের ঘরের বায়ুর তাপমাত্রা ঘরের বাইরের ছায়ার তাপমাত্রার চেয়ে কম, কিন্তু আবার রাত্রে ঘরের তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রার চেয়ে বেশী।

(৮) মোমবাতির শিখায় কোনো জিনিস ধরলে তাতে কালি পড়ে কেন?

উত্তর (তপতী দাশগুপ্ত)—মোমবাতি অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বনের একটি যৌগিক পদার্থ। যখন মোমবাতি জ্বলে তখন মোমবাতির কার্বনের একাংশ পুড়ে যায় ও অবশিষ্ট কার্বন ছোট ছোট কণা আকারে হাওয়ায় ভেসে ওঠে। কোনো বস্তু মোমবাতির শিখায় ধরলে এই কার্বন কালিরূপে তাতে জমা হয়।

(৯) টিউবলাইটের আলোতে কোনো জিনিস নড়লে তাকে কি রকম দেখায়? কেন?

অনেকেই বোধ হয় টিউবলাইটের আলোতে কোনো জিনিস নড়লে যে সাধারণ বাল্বের আলোয় নড়ার থেকে অন্যরকম দেখায় তাই খেয়াল কর নি। মূল কথা হচ্ছে যে বাল্ব এবং টিউবলাইটের কর্ম-প্রণালীই আলাদা—বাল্ব গরম হয় কিন্তু টিউবলাইট গরম হয় না। বাল্ব নিবোবার সময় দেখেছো নিশ্চয়ই সুইচ অফ করার প্রায় এক সেকেণ্ড বাদে পুরো অন্ধকার হয়, এর কারণ হচ্ছে যে বাল্বের তার গরম হবার ফলেই আলো দেয় আর যখন কারেন্ট নেই তখনও তারটি ঠাণ্ডা হতে কিছুক্ষণ সময় নেয়। কাজেই যখন একটি বাল্ব এ সি সাপ্লাই ভোল্টেজে চলে তখন যদিও মাঝে মাঝে বাল্বের মধ্যে দিয়ে কোনোই কারেন্ট থাকে না তবুও তারটি গরম থাকার ফলে আমরা বেশ কিছুটা আলো পাই। কিন্তু টিউবলাইট দেখেছো নিশ্চয়ই সুইচ অফ করলে চট করে নিবে যায়, বাল্বের মতো আস্তে আস্তে নয়। এর কারণ টিউবলাইটের ভিতরকার পারার বাষ্প আলো দেয় গরম হয়ে নয়, কারেন্ট যাবার ফলে একটি জটিল ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়া ঘটার ফলে।

উত্তর (নন্দিনী দত্ত মজুমদার)—এ সি সাপ্লাই ভোল্টেজ ক্রমাগত বাড়ে কমে—সর্বাধিক, তারপর শূন্য, তারপর আবার সর্বাধিক ঋণাত্মক ভোল্টেজ পাওয়া যায়। টিউবলাইট সবচেয়ে বেশী আলো দেয়

যখন সর্বাধিক ভোল্টেজ থাকে তখন, আর যখন শূন্যতে থাকে তখন কোনো আলো দেয় না। সাধারণ ভারতীয় এ সি ভোল্টেজের স্পন্দন সংখ্যা পঞ্চাশ বা ভোল্টেজ সেকেণ্ডে প্রায় পঞ্চাশবার এরকম ওঠা-নামা করে। এর ফলে টিউবলাইটের সামনে একটা আঙ্গুল জোরে নাড়লে কারেন্ট যখন শূন্য থাকে তখন আঙ্গুল দেখা যায় না। যখন ভোল্টেজ সর্বাধিক থাকে তখন আঙ্গুলকে খুব উজ্জ্বলভাবে দেখা যায়। এই জন্য একটি আঙ্গুলকেই মনে হয় অনেকগুলি আঙ্গুল।

(১০) ইলেকট্রিক কলিং বেল বাজলে তার কাছে কোনো রেডিও থাকলে তাতে আওয়াজ হয় কেন?

উত্তর (নন্দিনী দত্ত মজুমদার)—যদি রেডিও এবং বেল একই সার্কিটে থাকে তাহলে বেল বাজলে রেডিওর সাপ্লাই ভোল্টেজ ওঠানামা করবে যার ফলে রেডিওতে ঘর ঘর শব্দ হবে। এছাড়াও কলিং বেল বাজালে স্পার্কের ফলে কতকগুলি রেডিও তরঙ্গের সৃষ্টি হয় যা কাছাকাছি কোনো রেডিও থাকলে তার এরিয়ালে ধরা পড়ে গোলমালের সৃষ্টি করে। মেইন্‌স্ (২২০ ভোল্ট) রেডিও হলে এবং মেইন্‌স্ থেকে চালিত ইলেকট্রিক বেল বাজলে এই দুই ভাবেই রেডিওতে শব্দ হয়। কিন্তু যদি রেডিও ও বেল আলাদা সার্কিটে থাকে—যথা রেডিওটি ট্রানজিস্টার সেট হলে বা বেলটি ব্যাটারীচালিত হলে—শুধু দ্বিতীয় ভাবে শব্দ হবে। তখন রেডিওতে শব্দ হবে, কিন্তু কম।

(১) দোলন চাঁপা চৌধুরী, ৮৯৮, বয়স ?

তোমার কার্ড পেয়ে খুব ভালো লাগল। তুমিও আমাদের স্নেহাশীর্বাদ নিও।

(২) মিত্রা রায়চৌধুরী, ১৪২৫, বয়স ১০

নিজের হাতে আঁকা ছবি পাঠিয়েছ, তার মতো কি আর কোনো উপহার হয়? তোমাকে স্নেহাশীর্বাদ জানাচ্ছি।

(৩) অনীতা চট্টোপাধ্যায়, ২২৩৯, বয়স ১৩

ভাই, লেখা ভালো হলেই আমরা ছাপাই। তবে, অনেক সময় স্থানাভাবে একটু দেরি হয়। লিখলেই ছাপা হবে, এটা কিন্তু আশা করা উচিত নয়। মর্মাহত কেন হবে? লেখা ছেড়ো না। লিখতে লিখতে দেখবে কত ভালো লেখা কলম থেকে বেরুচ্ছে। যে বিভাগে চিঠি লিখবে, নাম ঠিকানার উপরে এক কোণে সেই বিভাগের নাম লিখে দিও, যথা প্রকৃতি পড়ুয়া, বা হাত পাকাবার আসর ইত্যাদি।

(৪) অভিজিৎ চৌধুরী, ১৯০২, বয়স ১২

ভারত ও পাকিস্তান ছাড়া তো অনেক জায়গা থেকে বাংলায় খবর বলা হয়, যেমন ভয়স অফ অ্যামেরিকা, বি-বি সি ইত্যাদি। সন্দেশের যে সব গ্রাহকের বয়স ১৭র বেশি নয়, তাদের লেখা একটু ভালো হলেই, হাতপাকাবার আসরে ছাপা হয়। বাইরের লোকের লেখা খুব ভালো হলে আমরা সর্বদা ছাপি। বেশির ভাগ নাম করা লেখক-ই তো বুড়োর দলে অর্থাৎ ১৭র বেশি বয়স, ক'জনই বা গ্রাহক।

(৫) অপরাজিতা বসু, ১৮১৩, বয়স ১৩

কলকাতায় পূজো কাটানোর তো একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। এ বছর কয়েকজন বিদেশী ভ্রমণকারীর এরোপ্লেন রেজার্ভেশনে কি যেন গোলমাল হওয়াতে, তাঁরা পূজোটা কলকাতায় কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের দুর্গাপূজা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। দেখে তো তাঁরা একেবারে মুগ্ধ। লঞ্চে করে মাঝগঙ্গা থেকে বিজয়া দশমীর দিন ভাসান দেখে তাঁদের মুখে আর কথা সরে না। এ জিনিস যে কোথাও আজকালকার দিনেও হতে পারে, এটা তাঁদের কল্পনার বাইরে ছিল। বাস্তবিক কলকাতার পূজো একটা দেখবার জিনিস। আশা করি তুমিও সে-সব উপভোগ করেছ।

তুমি একদিন ভারতের গোরব হয়ে বিশ্ববাসীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাও, সে খুব ভালো

কথা। কিন্তু তার আগে ভারতের সেবিকা হয়ে, নিজের দেশের লোকের কাছে এগিয়ে এসো, এই আশীর্বাদ করি।

পূজা সংখ্যা ভালো লেগেছে শুনে খুসি হলাম।

(৬) অলকানন্দা চট্টোপাধ্যায়, ১৪৫৮, বয়স ১৪

তুমিও আমাদের স্নেহাশীর্বাদ নিও। তোমার আগের কোনো চিঠির উত্তর পাওনি বলে আমরা সত্যি দুঃখিত। তবে সব চিঠি উত্তর দেবার জায়গা বা সময় থাকে না, এটা তো বোঝ, কাজেই কিছু বাদ পড়ে। তোমাদের সম্পাদক মহাশয়ই যে চিত্র পরিচালক সে বিষয়ে কি তোমার মনে কোনো সংশয় আছে নাকি? তিনি আর নিজে কি করে, 'আমি-ই সে, আমি-ই সে' বলেন বল? তবে ফিল্ম তৈরি সম্পর্কে অনেকবার সন্দেশে লিখেছেন, তাই থেকেই নিশ্চয়-ই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ।

(৭) নন্দিতা সুমন্ত্র ও সুমিত, সেনগুপ্ত, ২৩৭৯, বয়স ১২, ১১, ৭

এতদিনে নিশ্চয় গ্রাহক কার্ডটি পেয়েছ? অনেকদিন হল পাঠানো হয়েছে। সবাইকেই গ্রাহক কার্ড দেওয়া হয়। যত্ন করে রেখো। পত্রবন্ধুকে চিঠি লিখতে হলে, আমাদের আপিসের ঠিকানায় লিখো, আমরা পাঠিয়ে দেব। কোণায় লিখো পত্র-বন্ধু, আর যাকে লিখছ তার নাম ও গ্রাহক সংখ্যা দিও।

(৮) পার্থসারথি বসু, ২৭৮০ (এই হল তোমার গ্রাহক সংখ্যা) বয়স ৯,

নিজের নাম বানান ভালো করে শিখে রেখো, ভাই। গ্রাহক—কার্ড তো পাঠানো হয়েছে, এখনো পাওনি নাকি? তা হলে আমাদের আপিসে শ্রীমতী নলিনী দাশকে জানিও।

(৯) শীলা সাহা ২৭২৬, বয়স ১৬

এতদিনে গ্রাহক কার্ড নিশ্চয় পেয়ে গেছ। পত্রবন্ধু চাই—শখ :—বই পড়া, সাইকেল চড়া, সেলাই।

(১০) শর্মিলা বিশ্বাস, ১৮৭৮,

বয়স দাওনি কেন? এত দিনে নিশ্চয় কার্ড পেয়েছ?

(১১) প্রবীরকুমার সিংহ, ২৫৬৭, বয়স ১০

গ্রাহক কার্ড পেয়েছ তো? গুপী গাইনের গল্প অনেক বছর আগে ৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখেছিলেন। সেই গল্প একটু বদলিয়ে তাঁর নাতি সত্যজিৎ ফিল্ম করেছেন।

(১২) মণিশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, ২৩৪৮, বয়স ১৩

লিখবেই যখন, তখন এখন থেকেই বানান সম্বন্ধে সাবধান হও, কেমন? কার্ড পেয়েছ আশা করি।

(১৩) সুপর্ণ চৌধুরী, ১২০৯, বয়স ১১

এর পরেরবার নিজের হাতে চিঠি লিখো, কেমন?

(১৪) অমিত বাগচি, ২৬৭৪, বয়স ১৫½

তুমিও আমাদের স্নেহাশীর্বাদ জেনো। পূজা সংখ্যা ভালো লেগেছে বলে খুশি হলাম।

(১৫) হিমাদ্রি চৌধুরী, ৮৯৮, বয়স ১৪

তোমার চিঠি পেয়ে ভালো লাগল। মাঝে মাঝে আজকাল মনে একটু সন্দেহ জাগে যে পূজার বাইরের এত আড়ম্বরের মধ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধার জন্য যথেষ্ট জায়গা বাকি থাকে কি? তোমার চিঠি পড়ে মনে হল তাও থাকে বৈ-কি। তোমাদের সম্পাদক মহাশয়ের ফিল্ম তোমার ভালো লেগেছে খুব-ই ভালো কথা। বাদশাহী আংটির-ও ফিল্ম হবার কথা শোনা যাচ্ছে। ব্রানটালুসির গল্প কার্ত্তিক সংখ্যা থেকে বেরুচ্ছে লক্ষ্য করেছ বোধ হয়? পূজা সংখ্যায় বড়ই স্থানাভাব হয়েছিল।

(১৬) তপতী দাসগুপ্তা, ২৮১৬

কার্ড পেয়ে খুসি হলাম। দেখি শিবানী রায়চৌধুরীকে চিঠি লিখে, যদি সেখানকার অভিজ্ঞতার কথা লিখে পাঠান।

(১৭) ধ্যানচাঁদ বৈদ্য, ২৪৭০, বয়স ১৪

সে কি, পূজা সংখ্যায় নাটক নেই আবার কি কথা? ভালো করে আরেকবার দেখ তো। লেখা ভালো হলেই ছাপানো হয়। কার্ড পেয়েছ তো?

(১৮) মণিদীপা চৌধুরী ৫৭৬, বয়স ১২

পূজা সংখ্যা উপভোগ করেছ জেনে ভালো লাগল। হ্যাঁ, পুরণো সন্দেশের আলাদা সংখ্যাও কেনা যায়। সন্দেশের পাতায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাতে দেখো কি কি পাওয়া যাবে। 'রা-কা-যে-টে-না-পা' আপাততঃ পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ ঐ সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে। আবার ছাপা হলে, পাবে। তোমার বোনদের কার্ড পাঠাব। পত্রবন্ধু চাই; শখ:—বইপড়া ও গল্প লেখা, ডাকটিকিট ও দেশলাই বাক্সের ছবি সংগ্রহ, ছবি আঁকা।

(৯) ১৬৬৯ বাণী মুখাজা, বয়স ১৪ বছর—তোমার দাদা সন্দেশের গ্রাহক, অমিতাভ মুখার্জী সারা ভারতীয় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে ও N. S. T. S. S. Testএ দ্বিতীয় হয়েছে একথা তোমার চিঠিতে জেনে খুব সুখী হলাম। তাকে আমাদের অভিনন্দন জানিও।

তুমিও বড় হলে এইরকম ভাল করবে ত?

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

রাতের আকাশ

জীবন সর্দার

গত শরতের একমাস হিমালয়ের পথে পথে হেঁটেছিলাম। দিনের শেষে রাতের জন্য যেখানে থামতুম, সেখানে, মেঘ কাটলেই পাখিদেখা পোকাদের ডাকশোনা ফুলতোলা বা পাথরকুড়োনো বন্ধ রেখে তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতুম। আর কিছু দেখতে শুনতে ভালো লাগতো না।

চাঁদের আলো যখন থাকতো না, তখনই প্রায় কালো আকাশের গায় তারাগুলির যত দপদপানি। শুধু শুধু আর কতক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায়। এক সময়ে আনমনে আমি তারা গুনতে শুরু করে দিতুম।

তারা গুনছি কথাটা ভাবতেই হাসি পায়। সত্যি বলছি, আমি দু'একজন লোকের কথা পড়েছি যাঁরা খালি চোখেই তারা গুনতেন। খালি চোখে দেখে তারার একটি তালিকা বানিয়েছিলেন চীন দেশের জ্যোর্তিবিজ্ঞানী শি শেন। সে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। আর, শুধু ঝকমকে তারাগুলির তালিকা বানিয়েছিলেন গ্রীক জ্যোর্তিবিজ্ঞানী হিপারকাস্। তারাদেখা আর তারাগোনার কাজগুলি ওঁদের সারতে হয়েছিল খালিচোখেই—সেকথা মনে পড়ায় আরো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে থাকতাম রাতের আকাশের দিকে।

তখনই একদিন আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল—আসলে তারাগুলি কি? কেমন করে আটকে আছে আকাশের গায়? ছোটবেলার বইতে যতটুকু পড়েছিলাম তার বেশি কিছু আমার তখন জানা ছিল না। আমি যদিও পুরাকালের লোকদের মতো ভাবতুম না—আকাশটি কাঁচের আর তার গায়ে তারাগুলি আঁটা, তবুও, তারারা চাঁদের মতো ওঠেনা বাড়েনা কমেনা দেখে, তাদের রহস্য তাদের চলাফেরা আমি বুঝতে পারিনি বহুদিন। আসলে, খালি চোখে অনেক কিছুই ধরা পড়েনা বলে এই ধারণা আমার মনে জমাট বেঁধে ছিল।

খালি চোখে শুকতারা ছাড়া আর কোন গ্রহ আমি চিনতে পারিনি। শুকতারার উদয় অস্ত দেখে গ্রহদের চলাফেরায় আমার কোন সন্দেহ জাগেনি। কিন্তু একটি একটি তারার গতি বুঝব কি করে? তা' বুঝতে না পেরে তার দল খুঁজবার চেষ্টা করলাম। কিছু তারা মিটমিট করে আলো দেয়, কোনো কোনো তারার আলো ঝকমকে। লাল সবুজ হলুদ নীল শাদা সব রং এরই তারা চোখে পড়তো। মিটি মিটি নিবু নিবু তারাগুলো ছেড়ে দিয়ে ঝকমকে বড় তারাগুলো একটির সাথে আর একটি কাল্পনিক রেখা দিয়ে জুড়ে একটি ছবির আদল আনবার চেষ্টা করতুম। মাছ পাখি বা পশুদের আকার আমি রেখায় রেখায় তারা জুড়ে আঁকতে পারতুম না। কিন্তু হাতা বাটি ত্রিভুজ চতুর্ভুজ সহজেই হয়ে যেত। সবচেয়ে খুশি হয়েছিলাম সেদিন যেদিন উত্তরাকাশের সাতটি ঝকমকে তারা কাল্পনিক রেখায় জুড়ে হাতার মত আকার দেখেছিলাম। সপ্তর্ষি মণ্ডল আর ধ্রুবতারার কথা

ছোটবেলায় পড়েছিলাম, রাতের আকাশে কোনদিন খুঁজে দেখিনি তাদের। কল্পনার রেখায় গড়া তারার হাতাটিই যে সপ্তর্ষি বুঝতে পেরে নেচে উঠেছিলাম। ধ্রুবতারা তার জায়গায় ঠায় 'বসে' আছে মনে হয়। আকাশের সবখানের সব তারাগুলি বেদম বেগে তাদের কক্ষে ছুটছে। পৃথিবীতে বসে তাদের ছোটা দেখতে না পারলেও তাদের জায়গা বদল হলে বুঝতে পারা যাবেই। আমি ভাবছি, সপ্তর্ষি মণ্ডলের তারাগুলিও তো ছুটছে, একদিন, এখন যে যেখানে আছে সে আর সেখানে নাও থাকতে পারে। এখন কাল্পনিক রেখা দিয়ে জুড়লে তাদের দেখায় হাতার মতো, সেদিন দেখবে কেমন ?

তারা দেখতে দেখতে আমার নজর চলে যেত ছায়াপথের দিকে। আকাশগঙ্গা বলে কোথাও কোথাও। ধোঁয়াটে ফিকে আলোর একটি নদী আকাশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত বয়ে গেছে। তাতে না আছে জোয়ার ভাঁটা না আছে ঢেউ। আমি মোটেই খুশি হতাম না আকাশগঙ্গা দেখে। তার অর্থ বোঝা যায়না খালি চোখে। ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা সত্যি সত্যি নদী নয়। আলোর নদীও নয়। যতটা আমরা ভাবতে পারি তারচেয়ে আরও অনেক বেশি তারার দল, কোটি কোটি তারার দল নিয়ে ঐ আকাশগঙ্গা। আমাদের সূর্য তার গ্রহ আর যত তারা দেখতে পাই, সবাই ঐ ছায়াপথে আপন আপন কক্ষের 'পথিক'—এ কথা আমি বই পড়ে জেনেছি। তখনই আমার জানা হয়ে গেল তারাগুলি এক একটি মহাসূর্য কিংবা গ্যাসের অতিকায় অগ্নি গোলক। তারার ভেতর গ্যাসের অণু পরমাণুগুলো ফাটছে জ্বলছে। তাপ দিচ্ছে আলো ছড়াচ্ছে। একক তারা কোথাও নেই দল বেঁধে বা বিশেষ মণ্ডলে 'ধরা' দিয়ে তারা ঘুরছে।

আমার হিমালয়ে যে কটি রাতে আকাশ ছিল কালো তারারা ঝকমকে। মেঘ বা কুয়াশা দৃষ্টি আড়াল যখন করতে পারেনি তখুনি ছায়াপথের এমাথা থেকে ও মাথা বার বার দেখতুম। ফিকে আলোর ছায়াপথটি দু'এক জায়গায় ঘন হয়ে স্বচ্ছ চাঁদের মতো দেখাতো। যেন ফিকে রংএর জল জমাট বেঁধেছে। পরে শুনেছি ঐ খানেই লক্ষ তারার মেলা—বিজ্ঞানীদের ভাষায় যাকে বলে এনড্রোমিডা।

ছায়াপথ ছেড়ে আবার তারার দিকে মন দিতাম। ঝকমকে তারাগুলি দেখে ভাবতুম ওগুলো কাছের, আর দূরের তারাগুলি মিটমিট করে। যত জ্যোতি তত কাছে—তারার দূরত্ব মাপার আমার এই নিয়ম বাতিল করে দিয়েছি বিজ্ঞানীদের লেখা পড়ে। এমনও তারা আছে যা অনেক দূরে থেকেও ঝকমকে অথচ তার তুলনায় পৃথিবীর কাছের তারা অনেক মিটমিট আলো দিচ্ছে। যদি তারা দেখার যন্ত্র একটি কাছে থাকতো, আরও ভালো আরও বেশি কিছু দেখে পেতুম—রোজ রাতেই একথা ভেবেছি। আশ্চর্য, রোজই খালি চোখে নতুন কিছু কিছু দেখেছি।

চাঁদের উদয় অস্ত, তার বাড়াকমা রোজই নতুন ঠেকত আমার চোখে। সন্ধ্যায়, মাঝরাতে বা ভোররাতে তারাময় আকাশের পট একটু একটু বদলে যেত লক্ষ্য করেছি। কোনো তারা অস্ত যেত, নতুন কিছু দেখা দিত। এতসব দেখার মাঝে উল্কা দেখার চমক পেতাম সবচেয়ে বেশি। আকাশের একোণ থেকে ও কোণে কিংবা উপর থেকে নীচে সোজা উল্কা ছুটে যেত, হঠাৎ জ্বলে উঠে কিছুদূর উড়ে গিয়ে মিলে যেত তার আলো। হলুদ কিংবা শাদা, দুএকটি খুব শাদা হয়ে জ্বলে যেত। কোথা থেকে কত উঁচু থেকে ওরা আসে আর কোথায় চলে যায় বুঝতে পারতুম না।

ছোট বেলায় উল্কা দেখলে মুনি ঋষিদের নাম নিতাম। অজা বিপদের কবলে যেন না পড়ি। এখন ভাবি উল্কা দেখার ভয়ের কি! ওরা যে সব আকাশে ভাসা নানান গ্রহ উপগ্রহ থেকে ছিটকে আসা কণা, পৃথিবীর উপরের বাতাসে এসে ঘসা খেয়ে জ্বলে গিয়ে ছাই হয়ে যায় একথা তোমরাও জানো। আমি হিসেব

রাখতুম একরাতে কটি উল্কা দেখা হোলো, কোনদিক থেকে এসে তারা কোনদিকে গেল, কতক্ষণ আলো ছিল তাদের আর কি রংএর আলো।

আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘুমে চোখ বুজে আসার আগে তারার আলোয় অনেক ভাবনার সংকেত পেতাম। মনে হোতো পৃথিবীর দেশ দেশান্তরে যেমন জলহাওয়ার হেরফেরে গাছপালা আর প্রাণীর হেরফের তেমনি তারার আলোর রংএ এমন সংকেত হয়তো আছে—কেমন করে তৈরী তারাগুলি কি দিয়ে তৈরী। আলাদা রং মানে হয়তো আলাদা উপাদানে তৈরী, ভিন্ন ভিন্ন উত্তাপ তাতে। ভিন্ন দিকে গতি। অনেক মানুষ অনেক কিছু দেখেছে, কেউ কিছু না কিছু দেখেছে কিন্তু প্রকৃতি-পড়ুয়া না হলে সবকিছু কি দেখা যায়।

মন্ত্রী-রাজায়

অমিতশংকর দাশগুপ্ত

টুনটুনিটা টুনটুনাল
রাজা-রাণী গাল ফুলাল।
মন্ত্রীমশায় তাই না দেখে
পাগড়ীখানা খুলে রেখে
গেলেন ছুটে
কিনতে ঘুঁটে।
কিনতে ঘুঁটে গেলেন ছুটে মন্ত্রীমশায়,
সেই সুযোগে দ্বারী জানায়,
'ঝগড়া-ঝাঁটি করে কেবল মন্ত্রী-রাজায়।'

তাই না শুনে দিন দুপুরে টোপর মাথায়
কেবল লাফায়
রাজামশায়।
টোপর মাথায় রাজমশায় কেবল লাফায় দিন দুপুরে,
খাটের কোণে মুখটি ঢেকে কাঁদেন রাণী নাকী সুরে।
খবর পেয়ে কামান দেগে এলেন ছুটে মন্ত্রীমশায়,
সেই সুযোগে দ্বারীবেটা রাজসভাতে আবার জানায়,
'মন্ত্রী রাজায়
বগল বাজায়।'

ক্রীড়াজগৎ

অজয় হোম

এখন ক্রিকেটের মরসুম। সর্বত্র পুরোদমে চলছে। দুটি বিদেশী দল এবার ভারতে। কিন্তু একটা ফুটবল খেলার কথা ভুলতে পারছি না। মোহনবাগানের এরকম ভালো খেলা বহুকাল দেখি নি। সেটা হচ্ছে আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলা—

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগান কল্পনাতীতভাবে উন্নতি করে চলছিল সুপার লীগের শুরু থেকে। তার পূর্ণ বিকাশ হল ফাইনাল খেলায়। মোহনবাগানের কাছে ইস্টবেঙ্গলের অবস্থা হল ঠিক দিল্লিতে ইয়াংগজির বিরুদ্ধে যা হয়েছিল। মোহনবাগান ৪-২-৪ পদ্ধতির খেলা বেশ রপ্ত করেছে। ইস্টবেঙ্গল সমস্ত লীগের খেলা খেলল ৩-২-৫ প্রথায় কিন্তু ফাইনালে এসে ৪-২-৪। তা কি কখনও খেলা যায়? এর জন্যে চাই কোচিং ও পরিকল্পনা। এ দুটোই মোহনবাগান নিয়েছে কোচ শ্রীঅমল দত্তের কাছ থেকে। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম থঙ্গরাজের দোনামনা ভাব। গোলরক্ষকের মনে দোনামনাভাব উদয় হলে তার অবসর গ্রহণ করাই উচিত। ইস্টবেঙ্গলের হারের মূলে ছিল থঙ্গরাজ আর মোহনবাগানের জয়ের মূলে ছিল লেফট আউট প্রণব গাঙ্গুলীর ক্রীড়া দক্ষতা এবং শ্রীঅমল দত্তের কোচিং।

কলকাতার মাঠে লীগ-শীল্ড দুইই সুষ্ঠভাবে সমাপ্তির জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় পরিচালক সমিতি এবং রেফারিদের।

কলকাতায় ফুটবলের যবনিকা পড়লেও, জাতীয় ফুটবল জুনিয়র জাতীয় ফুটবল, মারডেকা প্রতিযোগিতা শেষ হলেও রোভার্স-ডুরাণ্ডকে কেন্দ্র করে আরও কিছুদিন আমাদের মনে ফুটবল জেগে থাকবে। আসামের নওগাঁ থেকে সম্প্রতি যেভাবে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ বাঙালি দল উন্নত কলাকৌশল এবং বিক্রমের মধ্যে বিজয়ীর সম্মান নিয়ে 'সন্তোষ ট্রফি' ঘরে এনেছে, তাতে বাংলার ফুটবল আবার বেঁচে উঠবে এ আশাই মনে জাগছে। বাংলার সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে ৬-১ গোলে জয় জাতীয় ফুটবল ফাইনালে বেশি গোলে জয়ের নতুন রেকর্ড।

ক্রিকেট

নিউজিল্যাণ্ড এসে চলে গেল পাকিস্তান সফরে। সেখানে রাবার জিতেছে। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ভারত ৬০ রানে জিতলেও দ্বিতীয় টেস্টে হেরেছিল ১৬৭ রানে। তৃতীয় টেস্টে জয়পরাজয় নিষ্পত্তি হয় নি। ভারত কোনও মতে জোর করে সময় চুরি করে মান ও রাবার বাঁচিয়েছিল বৃষ্টির আড়ালে। কাগজে-কলমে ড্র হলেও নিষ্পত্তিটা খেলোয়াড়ি মনোভাবের হয় নি। অগৌরবের কলঙ্ক এসে লেগেছে ভারতের গায়ে। দ্বিতীয় টেস্টে অম্বর রায়ের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছিল যেমন দর্শকরা তেমন হয়েছিল রেডিও ভাষ্যকারগণ এবং কর্মকর্তারা।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ভারত হেরেছে। সেটা খুব অগৌরবের নয়, কারণ অস্ট্রেলিয়া বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দল। সরকারী আইনে হয়তো তা নয় কিন্তু প্রতিটি দেশ তা স্বীকার করে নেবে। তাই অধিনায়ক বিল লরির 'আমি সব খেলাই জিততে চাই এবং সব খেলার জয়ের জন্যে আমি সম্ভবত সর্বশক্তি নিয়োগ করব' এই উক্তি দাম্ভিকতার নয় গম্ভীর আত্মবিশ্বাসের। এই আত্মবিশ্বাস অর্জন করা চারটিখানির কথা নয়। ভারতীয় খেলোয়াড়রা যদি এর জবাবে বলতে পারত 'সব খেলা জিততে তো দেবই না বরং আমরা তোমাদের একটা না একটা টেস্টে হারাবই' তবে সেটা হতো সুখের। ক্রিকেটে আত্মবিশ্বাস সাফল্যের এক বড়ো হাতিয়ার। তা অর্জন করতে কি আমরা পারব?

প্রথম টেস্টে খেলোয়াড়োচিত মনোভাব দেখিয়েছে বাংলার সুব্রত গুহ। দেশের স্বার্থে দলের স্বার্থে সে নিজের স্থান অপরকে অর্থাৎ বেঙ্কটরাঘবনকে ছেড়ে দিয়েছে। সুব্রত উচিত কাজই করেছিল। টেস্টের ইতিহাসে দল গঠন করার পর মাঠে এসে শেষ মুহূর্তে খেলোয়াড় পরিবর্তন এই প্রথম।

উচিত ছিল জন পনেরর নাম রাখা এবং মাঠে এসে অধিনায়কের দল গঠন করা। আশ্চর্য লাগে বোম্বাইবাসী বিজয় মার্চেন্টের মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যিনি এবার দলসংগঠনকারীদের চেয়ারম্যান এবং বাকি কজনও সবার টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা বোম্বাইয়ের মাঠ চেনেন না বা মাঠের অবস্থার খোঁজ রাখেন না। আগের দিনও তো দল বদলাতে পারতেন কিন্তু মাঠে এসে নামার মুখে সুব্রত গুহকে অনুরোধ করা কি রকম যেন বিসদৃশ ব্যাপার।

এই খেলায় পতৌদির অধিনায়কত্ব অনেকের পছন্দ হয় নি। ভারতের হারার একটি কারণ অধিনায়কের গলদের জন্যে। একটি উদাহরণ দিই। বোরদের বয়েস হয়েছে, চোখে কম দেখেন সেটা ঠিকই। বর্তমানে খেলেন অভিজ্ঞতার জোরে। যেভাবেই হোক পশ্চিমাঞ্চলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করে দলভুক্ত হয়েছেন।

তাঁকে ওয়ান ডাউন অর্থাৎ তৃতীয় স্থানে পাঠানোর কোনো যুক্তি নেই। ওখানে ওয়াদেকার খেলতে পারত আর সেটাই তার স্থান। ওয়াদেকার যেখানে খেলেছে সেই ষষ্ঠস্থানে বোরদে খেললে হয়তো ভারত তাঁর কাছ থেকে কিছু রান পেতে পারত।

ভারত টসে জিতে ২৭১-এর জায়গায় চারশ'র মত রাণ করতে পারলে এই খেলা যেত ভারতের অনুকূলে। তাও যখন পারল না তখন অমীমাংসিতভাবে খেলাটা অন্ততঃ শেষ করা উচিত ছিল। সেটা হল না কেন? কার দোষ?

প্রথম টেস্টে ব্যাটিং-এ অশোক মানকড়, পতৌদি ও ওয়াদেকার এবং বোলিং-এ প্রসন্ন ও বেদীর তুলনা হয় না।

দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হচ্ছে কানপুরে। দলসংগঠনকারীরা একেবারে চারজনকে বাদ দিয়ে চারজন নতুনকে নেওয়াতে খুবই সাহসের পরিচয় যেমন দিয়েছেন তেমন সামনে রেখেছেন দৃষ্টান্ত যে কোনো খেলোয়াড়ই অতীত দিনের খেলার সুবাদে মৌরসী নিয়ে আসে নি। এই রকম কড়া হলেই খেলোয়াড়রাও সচেতন হবে। বর্তমানে সেটা খুবই দরকার হয়ে পড়েছে।

তোমরা যতদিনে সন্দেশ পড়বে, ততদিনে তিনটি খেলার ফলাফল জেনে যাবে।

নোটন—'জানো দাদু, কাল ত বড়দিন। আজ রাতে নেলা আর টমি ওদের মোজাগুলো খাটে ঝুলিয়ে রাখবে আর স্যান্টা ক্লস এসে তাতে খেলনা, পুতুল, টফি-চকোলেট ভরে দিয়ে যাবে !'

ছোটন—'স্যান্টা কেন আমাদের বাড়ি আসে না দাদু ? আমাদের খেলনা দেয় না কেন ?'

দাদু—'কেন আসবে ? তোমরা ত তাকে ডাকো না, মোজা ঝুলিয়ে রাখনা ত ?'

সে রাতে নোটন-ছোটন তাদের মোজা ঝুলিয়ে রাখল, 'স্যান্টা আসবে ত ?'—ভাবতে ভাবতে তারা ঘুমিয়ে পড়ল। দুপুর রাতে চমকিয়ে উঠল—এসেছে ! এসেছে !! মিটমিটে আলোয় দেখল ঠিক যেমন বাইরে ছবি থাকে—লাল পোষাক, সাদা দাড়ি গোঁফ গোলগাল বুড়ো মোজার মধ্যে কি ভরছে !

অবাক হয়ে ওরা দেখছে, হঠাৎ 'হ্যাঁ—চ্চো ! হ্যাঁ—চ্চো ! ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ !'

আরে ! এ-হাঁচি যে খুব চেনা হাঁচি ! তড়াক করে উঠে দুজনে স্যান্টাকে ধরে ফেলল, একটানে উড়ে গেল লাল-টুপি আর সাদা দাড়ি গোঁফ, বেরিয়ে পড়ল দাদুর টাক মাথা আর ফোকলা মুখ ! তখন কেবল হা-হা-হা-হা-হা, হো-হো-হো-হো, হি-হি-হি-হি-হি ! মা বললেন—'দেখেছ, দাদু তোমাদের কত ভালবাসেন ! বুড়োমানুষ, এই শীতে কোথায় লেপমুড়ি দিয়ে আরামে ঘুমোবেন, তা-নয় তোমাদের খুশি করার জন্য এত কাণ্ড করেছেন ! আপনাকে এক কাপ গরম চা দেব বাবা ? ঠাণ্ডা লেগেছে নিশ্চয়—'

'ঠাণ্ডা নয় মা, ফ্যাঁচ ! ঐ তুলোর গোঁফের সুড়সুড়িতে—হ্যাঁচ্চো !!'

(পনের জন ভারতীয় স্কুলের ছেলেমেয়ে, প্রেসিডেন্ট ব্রোকেনসিলের নিমন্ত্রণে, টণ্টামোরা রাজ্যের স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দেবার জন্য প্লেনে করে আসছিল রাজধানী টাণ্টামোরায়।

ব্রাণ্টালুসি পর্বত ও ঘন জঙ্গলময় উপত্যকার উপর দিয়ে যাবার সময়ে প্লেনটি প্রবল ঝড়ের মধ্যে নিখোঁজ হয়ে যায়।

পাইলট ক্যাপ্টেন গাব্বা কণ্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে রেডিওর সাহায্যে যোগাযোগ করেছিলেন কিন্তু হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হয়ে যায়।

ক্রমে বিশ্বের সকলেই এই দুর্ঘটনার সংবাদ জানতে পারল। প্রেসিডেন্ট ব্রোকেনসিল সাময়িকভাবে সব আনন্দ উৎসব বন্ধ করে দিলেন। ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই উদ্ধারকারী দল অনুসন্ধানের কাজ সুরু করল)

২.

সারা রাত তর্জে গর্জে ভোর রাতে হঠাৎ ঝড়ের বেগ কমে গেল। তখন রাত সাড়ে তিনটে হবে। পাহাড়ের কোলে তিনিকা গ্রামের লোকগুলো সব এতক্ষণ কোন মতে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে বসে ভগবানকে ডাকছিল। ঝড় থামতেই তারা লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট ব্রোকেনাসল।

—তোমরা তৈরি ?

সবাই বলল—হ্যাঁ।

কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল—স্কুলের হেডমাস্টার আরডন কই ? আরডন! সে না হলে তো কোন কাজই হবে না। এ পাহাড় ঐ জঙ্গল তো কেবল চেনে সেই। পিঠে হাভারস্যাক বেঁধে হাতে পাহাড়ি লাঠি নিয়ে আরডন এগিয়ে এলেন সামনে—আমি হাজির!

—মিডি। —হাজির।

—কিকু। —হাজির।

—হকো। —হাজির।

—সঙ্গে যারা যাবে তারা তৈরি ?

—হ্যাঁ !—একদল গ্রামের লোক এগিয়ে এলো।

আরডন বললেন—মিডি তুমি দশজন লোক সঙ্গে নিয়ে পূর্বের পাহাড়ি সিরদাঁড়া বেয়ে উঠবে। তোমার লক্ষ্য চকমীর তাক। সেখানে পৌঁছে—খুঁজবে প্লেন পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছে কি না। সঙ্গে রেডিও আছে ?

—আছে। উত্তর দিল মিডি।

—প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিস !

—আছে।

—পাহাড়ে চড়ার দড়ি দড়া।

—আছে।

—তাহলে রওনা হয়ে যাও। শুভকামনা রইল।

—ধন্যবাদ। মিডি তার দল নিয়ে গভীর অন্ধকারে পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল।

—কিকু— ! ডাকলেন আরডন !

—হাজির হুজুর, বলল—কিকু—। ও তির্নিকা গ্রামের ঝাড়ুদার।

—তুমি প্রথম সৈন্যদলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

—যেমন হুকুম হুজুর।

—তুমি যাবে উত্তরের হাঁটা পথ ধরে। পাহাড়কে বেড় দিয়ে নিচে নিচে। পাহাড়ের ওপারে গিয়ে সারা উত্তর জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খোঁজার দায়িত্ব কিন্তু তোমার। প্রতিটি সৈন্য তোমার হুকুম মেনে নেবে। মনে থাকে যেন তোমার ওপরে আমরা নির্ভর করছি সব চেয়ে বেশী।

—হুজুর আমি প্রাণ দেব মান দেব না। বলল কিকু।—কিন্তু একটা কথা বলতে চাই হুজুর।

প্রেসিডেণ্ট ব্যস্ত হয়ে বললেন—বল তুমি কি বলতে চাও।

মাটি অবধি ঝুঁকে পড়ে কিকু বলল—আপনারা সবাই কিন্তু হুজুর একটা কথা একদম ভুলে গেছেন।

—কি কথা ! জিজ্ঞাসা করলেন প্রেসিডেণ্ট।

—আজ্ঞে হুজুর—গ্রাটেনকোর কথা। মাজিনকোর জঙ্গলটা কিন্তু ঐ শয়তানের রাজত্ব।

চম্‌কে উঠলেন প্রেসিডেণ্ট। আরডন বললেন—আচ্ছা মিডিরা কি সঙ্গে বন্দুক নিয়ে গেছে ? তোমরা কি কেউ বলতে পার এ কথা ?

গ্রামের কেউই একথার কোন উত্তর দিল না। সবাই অন্ধকারে এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল।

তাইতো শয়তান গ্রাটেনকোর কথা তো কই কারও মনে ছিল না।—কি হবে তাহলে !

কিকু বলল—হুজুর—এই তো হপ্তা খানেক আগেই ও সয়তান টোপ্‌কীর শেষ পুলিস চৌকীতে হানা দিয়ে অস্ত্র শস্ত্র গোলাবারুদ লুটে নিয়ে গেছে। উড়ো জাহাজ পড়ার খবর কি ওর অজানা আছে। যদিও বা কেউ বাঁচে—ও তো ভোর হবার সাথে সাথেই সেখানে গিয়ে সবাইকে মেরে ফেলে—সব কিছু লুট করবে। দয়া মায়া কি ওর আছে। ও ডাকাত নয় হুজুর ও শয়তান। নিজেকে ঝাঁকানী দিয়ে সামলে নিলেন হেডমাস্টার আরডন।

বললেন—ও কথা আর এখন ভেবে তো লাভ নেই কিকু। তুমি দেরী না করে এগোও। যদি দেখ ও শয়তান আমাদের সবার মাথা হেঁট করে দিয়েছে। তবে তাকে তুমি ক্ষমা করে এসোনা কিকু।

—যা হুকুম হুজুর। বলল কিকু—এ কথা কি বলতে হবে। আমার ছোট ভাই কিফু মরেছে ওর ঠাণ্ডা গুলিতে। ওকে পেলে আমি টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে দেব হুজুর।

প্রেসিডেন্ট বললেন—সে তো পরের কথা কিকু। এখন তুমি এগোও।

বিরাট সেলাম ঠুকে এগিয়ে গেল কিকু দূরের ছোট ময়দানের দিকে। যেখানে সৈন্যদল এগোবার জন্য ছটফট করছে।

—হকো—ডাকলেন আরডন।

—আমিও হাজির স্যার—এগিয়ে এসে উত্তর দিল হকো—

—তুমি যাবে দক্ষিণের ঘোরা পথে পাহাড় বেড় দিয়ে। টিবলি নদীর গিরিখাদ ধরে। চকুমীর তাকের নিচে পৌছে মিডির সাথে রেডিও যোগাযোগ করবে। কোন খবর না পেলে সেখানে নদী পার হয়ে দক্ষিণের সারা জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজবে। তোমার লাগবে অন্তত বারদিন সময়। সঙ্গে নেবে কুড়ি জন সৈন্য। সে আন্দাজ রসদ সরঞ্জাম। তোমার দলের সাথে যোগাযোগ কর এক্ষুনি। প্রথম আলোর সাড়া জাগলেই তুমি বার হয়ে পড়বে! ঠিক আছে সব?

—ঠিক আছে স্যার। বলল হকো। হকো স্কুলের ছাত্র এবারেই ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা দেবে। হেডমাস্টার আরডনের পাহাড় চড়া দলের এক নম্বর ছেলে।

হকো প্রেসিডেন্টকে স্যালুউট করে পিঠের হ্যাভারস্যাক সামলে এগিয়ে গেল।

গোয়ালাদের বড় বউ গল্‌নো তখুনি হাঁফাতে হাঁফাতে চড়াই ভেঙ্গে উঠে এলো সেখানে। বিড় বিড় করে বকছে ও তখন আপন মনে। বয়স তো বুড়ির কম হল না। ও বলছে।—এমন কথা তো বাপু কেউ কোন দিন শোনে নি। বিপদ হলে আসবে না। আসব—নিশ্চই আসব। সবাই কত কাজ করছে। তা বাপু আমি বুড়ি তো আর পাহাড় চড়তে পারব না। আমি আমার মতন কাজ করব।—কইগো কোথায় গেলে তোমরা সব। পাহাড় চড়ার আগে এসো। এসে—আমার নিজের ঘরের গরুর দুধ গরম করে এনেছি—খেয়ে গায়ে জোর করে যাও। তবেই না পাহাড় চড়ে মার কোলের বাছাদের খুঁজে বার করতে পারবে। আয় বাবারা আয় দেরী করিস না।

প্রেসিডেন্ট নিজে এগিয়ে এলেন—বললেন। দাও বুড়ি মা তোমার গরুর দুধ আমি নিজের হাতে সবাইকে দেব।

—দে বাবা তাই দে। এতটা পথ ছুটে আসতেই আমার দম বার হয়ে গেছে একেবারে।

প্রেসিডেন্ট দুধের পাত্রটা হাতে তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

ক্রমে চারদিক ফর্সা হয়ে গেল। কাল অত ঝড় জল। আজ আকাশে তার চিহ্ন মাত্র নেই। না, এক টুকরো মেঘ পর্যন্ত নেই। আবহাওয়া আফিস খবর দিয়েছে আর ঝড়ের সম্ভাবনা নেই—

ইস্কুল ঘরে বসে হেডমাস্টার আরডন ছটফট করছিলেন। বাইরে আলোর আভাস পেতেই উঠে দাঁড়ালেন।

প্রেসিডেন্ট বললেন—এর পরে কি করতে হবে মাস্টার মশাই? আরডন চেচিয়ে ডাকলেন—হকো।'

কাছেই কোথাও হকো অপেক্ষা করে ছিল। বলল—আমি এখুনি রওনা দিচ্ছি স্যার।

—সাবধান—বললেন আরডন—নদী খাতে সন্ধ্যেবেলা হিংস্র জন্তুর ভয় আছে। মনে থাকে যেন কথাটা।

—থাকবে স্যার।

—আচ্ছা এগোও। হুকুম দিলেন আরডন।

—এর পরে? —ফের জিজ্ঞাসা করলেন প্রেসিডেণ্ট।

আরডন টেবিলের উপরে একটা ম্যাপ বিছালেন। —এখানে এসে দেখুন আপনি। ম্যাজিনকোর জঙ্গলের একটা মোটামুটি ম্যাপ আমি করে রেখেছি। ওর থেকেই বুঝতে পারবেন আমি কি করতে চলেছি—আর কি করব।

টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন প্রেসিডেণ্ট। সঙ্গে সঙ্গে এগোলেন্ সেনাবাহিনীর প্রধান। দুজনেই গভীর আগ্রহে ঝুঁকে পড়লেন ম্যাপের উপরে।
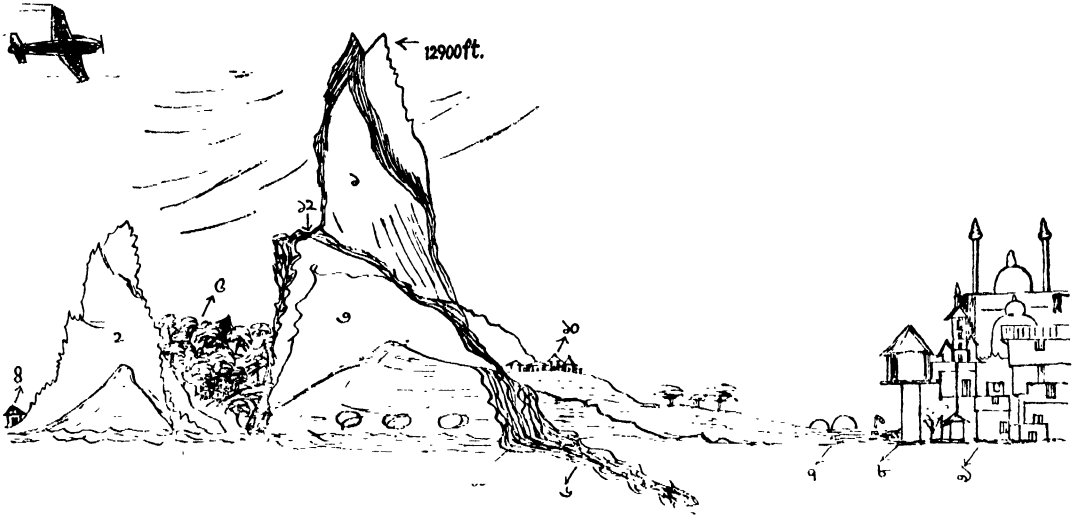
১. বড় ব্রাণ্টালুসি
২. ছোট ব্রাণ্টালুসি
৩. পূর্বের সিরদাঁড়া
৪. টোপকির শেষ পুলিশ চৌকি
৫. জঙ্গল মাজিনকো
৬. টিবল্লি নদী
৭. বিমান বন্দর
৮. রেডিও কন্‌ট্রোল
৯. সহর টাণ্টামোরা
১০. পাহাড়ি গ্রাম তির্নিকা
১১. ব্রাকা জলপ্রপাত
১২. চকমির ডাক

—হাওয়া অফিসের খবর মতন আর কন্ট্রোল টাওয়ারের শেষ যোগাযোগের কথা মনে রেখে আমি প্লেনের ধ্বংসস্তূপকে মোটামুটি এই জায়গায় পাব বলে মনে করি। ম্যাপের একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখালেন আরডন।

—তাহলে টিবল্লির মরা খাদকে আর মাজিনকোর গভীর জঙ্গলকে আমি একরকম বাদই দিচ্ছি। আমার মনে হয় সেখানে কোন কিছুই পাওয়া যাবে না।

একটু কেশে জেনারেল—আরশ্চেনো বললেন—কিন্তু আপনার ধারণা যদি গোড়াতেই ভুল হয় ?

—সে সম্ভাবনার কথা আমি ভুলিনি। তাই তো আমার সব থেকে বিশ্বস্ত ছাত্র হকোকে পাঠালাম ওপথে। আমার ভুল ও শুধরে নিতে পারবে। হেসে জেনারেল আরশ্চেনো প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন—প্রেসিডেন্ট আপনার শিক্ষাদফতর থেকে মাননীয় শিক্ষক মহাশয়কে বদলি করে আমার প্রতিরক্ষা দফতরে দেওয়া হোক! আমার সেনাবাহিনী যোগ্য লোকের হাতে পড়েছে।

—ধন্যবাদ। বললেন আরডন।—দক্ষিণ মাজিনকোর পথ দুর্গম জঙ্গলও গভীর। তাই হকোকে সময় দিয়েছি বার দিন। আমার ধারণা ঠিক হলে তার আগেই আমরা আমাদের কাজ শেষ করতে পারব।

—তারপর ?…প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন।

—ছোট ব্রাণ্টালুসির উত্তর দিকে ঘেঁসে এই জায়গাটা দেখুন। যতদূর খবর পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় এখানেই কোন একটা গুহায়—শয়তান গ্রাটেনকোর আস্তানা। কিন্তু তা বলে মনে করবেন না যেন উত্তর ম্যাজিনকোতেই কেবল তার রাজত্ব।—বললেন আরডন।

—ও শয়তানের রাজত্ব উত্তরে উত্তর মাজিনকো মালভূমির শেষ থেকে সুরু করে দক্ষিণে দক্ষিণ মাজিনকো মালভূমির শেষ পর্যন্ত। আর পূর্বে তিনিকাগ্রাম থেকে সুরু করে পশ্চিমে টোপকীর শেষ পুলিশ চোকি পর্যন্ত। এ সমস্ত অঞ্চলটাই ওর জানা। প্রতিটি গুড়ি পথ গুহা, খাদ ওর মুখস্থ। তাই বার বার চেষ্টা করেও পুলিশ বাহিনী আজও পর্যন্ত ওকে ধরতে পারেনি।

—হুঁ। মাথা নাড়লেন প্রেসিডেন্ট।—কে জানতো এমন দুর্ঘটনা ঘটবে।

আরডন বললেন—কিকুকে উত্তর পথে পাঠান হয়েছে এ ভেবে নয় যে সে গ্রটেনকোর সব থেকে বড় শত্রু। পাঠান হয়েছে কারণ ও অঞ্চলে মোটামুটি পথঘাট তারই জানা। আশা করি সে তার কাজ ঠিক মতনই করতে পারবে।

জেনারেল আরশ্চেনো বললেন—বেশ, তা নয় হল। কিন্তু আপনার প্রথম দল—তারা গেল কোথায় ?

—এই জায়গাটা দেখুন।—আরডন ম্যাপের ব্রাণ্টালুসির দক্ষিণের একটা চিহ্নের উপরে আঙ্গুল রাখলেন। এই হচ্ছে বিখ্যাত চকৃমির তাক। পাহাড়ের গায়ে বেশ খানিকটা সমতল জায়গা। এর পিছনেই বড় ব্রাণ্টালুসির সব থেকে উঁচু চূড়া। চকৃমির তাকে দাঁড়িয়ে এই গোটা অঞ্চলটি এমন কি দুটো পাহাড়ের গায়ের প্রতিটি খাঁজ ও তন্ন তন্ন করে দেখা চলে। আমার প্রথম দলকে নিয়ে মিডি গেছে ঐ তাকে।

হাতঘড়িটা দেখলেন আরডন। আমার মনে হয় আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তার কাছ থেকে আমরা খবর পাব।

—চমৎকার—বললেন প্রেসিডেন্ট ব্রকেনসিল।

—আরও কি কিছু করার বাকি আছে আমাদের ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বললেন আরডন।—চলুন আপনারা-হেলিক্যপটার তৈরী খবর পেয়েছি কুয়াশাও কেটে গিয়েছে। তিনটে হেলিক্যপটার উড়িয়ে জঙ্গলটাকে আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজব।

জেনারেল আরশ্চেনো বললেন—কিন্তু মিডির কাছ থেকে সঠিক খবর পেয়ে এগোলে হোতনা তাতে উদ্ধারের কাজটা তাড়াতাড়ি হোত।

—হাসলেন-আরডন। বলল—কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন জেনারেল—মাজিনকোর জঙ্গলের সব থেকে ছোট গাছটার বয়স হবে কম করে পাঁচশো বছর। উচ্চতাও কম করে ত্রিশ বত্রিশ ফুট। দিনের বেলায়ও সে

জঙ্গলের মধ্যে সূর্যের আলো ঢোকে না। এমন জঙ্গলের বুকে বিন্দুর মতন একটা প্লেনের ধ্বংসস্তূপকে খুঁজে বার করা কি অত সহজ হবে? মনে তো হয় না। মিডি হয়তো চকৃমির তাকে বসে বৃথাই ছটফট্ করবে।

—হুঁ। আবার ও মাথা নাড়লেন প্রেসিডেণ্ট ব্রকেন সিল—চল তাহলে আর দেরী করা নয়।

ঘর থেকে ওঁরা বার হবেন। এমন সময়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল হোলথ—।

—আরডন। আমরা মিডির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি। সে চকৃমির তাকে পৌছেচে।

—তাই নাকি। চমৎকার চমৎকার।—উৎসাহ উত্তেজনায় মাথা নাড়তে লাগলেন আরডন।—প্রেসিডেণ্ট আমার মনে হয় এখন তাহলে আগে মিডির সাথেই আলোচনা করে এগোন উচিত।—যেমন বলেছেন জেনারেল।

—নিশ্চয়ই। বললেন প্রেসিডেণ্ট।

ওরা হোলথ্‌এর পিছল পিছন আর একটা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। সেখানে তখন ছোট খাট একটা রেডিওর ফিল্ড অফিস বসে গেছে। চার পাঁচজন কানে হেডফোন লাগিয়ে চোঙ্গার সামনে বসে-হ্যালো, হ্যালো করছে আর প্রাণপণে সামনের রেডিও যন্ত্রের চাবি ঘোরাচ্ছে।

—আসুন এদিকে। হোলখ-একটা রেডিও যন্ত্রের কাছে ওদের সবাইকেই ডাকলেন।

প্রেসিডেণ্ট এগোলেন সেদিকে। কিন্তু আরবতন প্রায় ছুটে গিয়ে হেডফোন তুলে কানে ধরে বলল—

—হ্যালো—কে মিডি। সঙ্গে বন্দুক নিয়েছো ত তোমরা? গ্রাটেনকোর কথা বলে তোমাকে সাবধান করে দিতে আমি ভুলেই গেছি। যা দুঃশ্চিন্তায় সময় কাটছে আমার।

ওদিকে একথা শুনে মি'ড হাসল—বলল মিথ্যা ও সব কথা ভেবে আপনি ব্যস্ত হবেন না।—মিডি আপনার কাছে পাহাড় জঙ্গলে ঘোরার পাঠ বৃথাই নেয়নি। আমার ভুল অত সহজে হয় না।

—বাঁচালে। বললেন আরডন—শয়তানটা তো মানুষ নয়। যাক এখন ওদিকের কথা বল। তুমি কিছু দেখতে পেয়েছো? দাঁড়াও আগে ম্যাপ পাতি।

একথা বলেই আরডন সামনের টেবিলের পরে আবার ওঁর ম্যাপটা পেতে ফেললেন। ওদিকে মিডিও একটা পাথরের উপরে ওর ম্যাপটা বিছিয়ে নিল।

—নাও এবারে বল কি দেখতে পাচ্ছ। ভাল কথা। কোন খুঁটিনাটিও যেন বাদ না যায়।

—আচ্ছা সার তাই হবে। বলল—মিডি। বলে আরম্ভ করল—

—আমার সামনে আমি উত্তরের মালভুমির শেষ সীমা থেকে দক্ষিণের মালভুমির শেষ সীমা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছি সামনেই কুয়াশার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছোট ব্রাণ্টালুসি।

—আঃ। ধমকে উঠলেন আরডন। আসল কথা বল। কিছু কি দেখতে পাচ্ছ কোথাও? কোন মানুষের সাড়া?

—না স্যার। মিডি বলল। নীচে সারা মাজিনকোর জঙ্গল জুড়ে ঘন কুয়াশার চাদর বিছান রয়েছে। সূর্য বড় ব্রাণ্টালুসি পার হয়ে এখন এ পারে আসতে পারে নি ভাল করে। স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্চে না।

—হেলিক্যপ্টার ওড়ালে কি কিছু সুবিধা হবে?—জিজ্ঞাসা করলেন আরডন।

—না। স্পষ্ট উত্তর দিল মিডি।—আমার কাছ থেকে ফের কথা না শোনা পর্যন্তই আপনারা অপেক্ষা করুন। কুয়াশা কাটতে দেরী হবে বলে মনে হয় না।

—ওঃ। চেঁচিয়ে উঠলেন আরডন। এবারে বিরক্তিতে।

—বেশ তাই হবে। তবে থেকে থেকে কিছু অন্তরই তুমি যোগাযোগ করবে। মনে থাকে যেন।

—উত্তর এলো—আচ্ছা তাই হবে।

হেডফোন নামিয়ে রাখলেন আরডন। প্রেসিডেন্ট থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হল?

—ঘন কুয়াশায় সারা মাজিনকো ঢাকা।—আমাদের অপেক্ষা করতে হবে প্রেসিডেন্ট। উত্তর দিলেন আরডন।

—সর্বনাশ। বললেন জেনারল। —তার মানে তো গ্রাটেনকোকে সময় দেওয়া।

—উপায় নেই বললেন—আরডন। তার থেকে চলুন যাত্রা করার আগে এখন কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।

চিন্তিত ভাবে প্রেসিডেন্ট বললেন—বেশ, তবে তাই হোক।

* * *

—উঃ। খুব দূর থেকে যেন কার যন্ত্রণায় কাতর গলার আওয়াজ ভেসে এল। ওর মনে হল—যেন ভীষণ ঘুম থেকে একটু একটু করে জেগে উঠছে ও। আর জেগে উঠছে ঐ একখানা যন্ত্রণা কাতর আওয়াজটা শুনেই। নাঃ—হাত পা মাথা কিছুই নাড়ার ক্ষমতা নেই ওর এখন।—ঘুম ভেঙ্গেও যেন ভাঙ্গেনি।—যেন স্বপ্ন দেখছে ও জেগে।···আঃ। আঃ। উঃ হঠাৎ একটা চিন্তার চমক বয়ে গেল ওর মাথায়।—কি হয়েছে ওর নিজের! কে কাতরাচ্ছে অমন করে।···তবে কি!! কান পেতে ও শুনতে চেষ্টা করল। না প্লেন চলার এক ঘেঁয়ে চাপা গোঙ্গানীর শব্দ তো শোনা যাচ্ছে না।

বাতাসের বুকে ওঠা নাবার ঝাঁকানি তো নেই। নেই হঠাৎ চমকে ওঠা বিদ্যুতের ঝিলিক। চার দিকে শুধু জমাট অন্ধকার।

আস্তে আস্তে ভাল করে চোখ মেলে তাকাল রাণা মজুমদার।

—না প্লেন চলছে না। প্লেনের ভিতরের আলোগুলোও আর জ্বলছে না। গভীর অন্ধকারে সব কিছু অস্পষ্ট চারদিকে।

শুধু থেকে থেকে ঐ এক ঘেয়ে কাতর শব্দটা শোনা যাচ্ছে। উঃ উঃ আঃ।

দুর্ঘটনা ঘটেছে।—কোন সন্দেহ নেই। একটা ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটেছে যে। হঠাৎ খেয়াল হল ওর ও যেন কেমন অদ্ভুতভাবে এলোমেলো শুয়ে আছে উঁচু নিচু এব্‌ড়ো খেবড়ো কি সবের উপরে। কোমরের কাছে সিটের বেল্টটা শক্ত হয়ে এঁটে বসে কষ্ট দিচ্ছে। সেটা খুলে না ফেলতে পারলে আরাম নেই।

হাত নাড়তে চেষ্টা করল রাণা মজুমদার। না সমস্ত শরীর যেন অসাড় হয়ে গেছে।—তবে কি শরীরের কোথাও প্রচণ্ড আঘাত লেগে ওর দেহ পঙ্গু হয়ে গেছে? মনটা যেন কেমন করে উঠল। ওতো বেঁচে আছে! কিন্তু পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকার কষ্ট যে অনেক। না না কিছুই হয় নি ওর। বেল্টটা শুধু শরীরের মধ্যে চেপে বসার কষ্ট ছাড়া তো কোন কষ্ট বোধ ওর শরীরে নেই। ক্রমশঃ
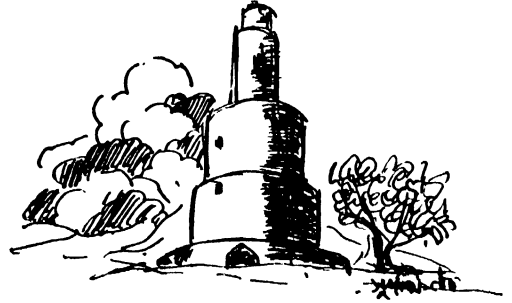
জল প্রপাত

মিত্রা রায় চৌধুরী—গ্রাঃ সং ১৪২৫ বয়স ১৩ বছর

পাণ্ডুয়ার মন্দির

সুদক্ষিণা কুণ্ডু
গ্রাঃ সং ১০৮৫, বয়স ১৩

মজার লোক

শাশ্বতী দত্ত—গ্রাঃ সং ৫৭—বয়স ১৫ বছর

খুকু ও বোন

সোনালী চৌধুরী—গ্রাঃ সং ১৭০৪, বয়স—১৪
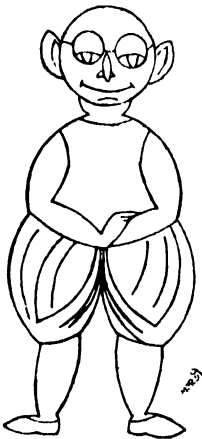
নবম বর্ষ—নবম সংখ্যা

পৌষ ১৩৭৬/জানুয়ারি ১৯৭০

পৌষপার্বণ

সুলতা সেনগুপ্ত

পৌষপার্বণ আজ পৌষপার্বণ !
হাসিখুশি মুখে এসো ভাই আর বোন।
ছেড়ে এলে লেখা-পড়া আজ নেই দোষ।
বন্ধু আনবে ডেকে দুই চারজন,
পৌষপার্বণ !

যখন তখন আজ পায় যদি খিদে
রয়েছে আসকে-পিঠে নেই অসুবিধে
আয়েশে পায়েশ নাও, খাও রসবড়া
শুনবেনা মাসি পিসি, পেট আছে ভরা।

পাটিসাপটাকে খাও ক্ষীর মেখে মেখে
সরুচাকলিটা দেখো কপি দিয়ে চেখে
মালপো, গোকুল পিঠে যেয়ো নাকো ফেলে-
কিচ্ছু শেখেনা খেতে একালের ছেলে !

চুষিটুকু চুষে খাও, উঠোনা উঠোনা—
রোদে বসে পুলিপিঠে করো চর্বণ
সুবোধেরা অনুরোধ রাখবে সবার
দিদিমার ঠাকুমার পৌষপার্বণ !

(পনের জন ভারতীয় স্কুলের ছেলেমেয়ে, প্রেসিডেন্ট ব্রোকেনসিলের নিমন্ত্রণে, টন্টামোরা রাজ্যের স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দেবার জন্য প্লেনে করে আসছিল রাজধানী টান্টামোরায়।

ব্রান্টালুসি পর্বত ও ঘন জঙ্গলময় উপত্যকার উপর দিয়ে যাবার সময়ে প্লেনটি প্রবল ঝড়ের মধ্যে নিখোঁজ হয়ে যায়।

সাময়িকভাবে সমস্ত আনন্দ উৎসব স্থগিত রাখা হল। পাহাড়ের কোলে তিনিকা গ্রাম থেকে, হেডমাস্টার আরডনের নির্দেশে মিডি, কিকু ও হকোর নেতৃত্বে তিনটি উদ্ধারকারী দল তিনদিক দিয়ে অনুসন্ধান সুরু করল।

কিন্তু মাজিনকোর গভীর জঙ্গল ঘন কুয়াশায় ঢাকা। তার উপরে আবার সেখানে শয়তান গ্রাটেনকোর উৎপাত।

ওদিকে স্কুলদলের দলপতি রাণা মজুমদার অন্ধকারের মধ্যে জ্ঞান হয়ে কার যেন যন্ত্রণাকাতর গলার আওয়াজ শুনতে পেল। তার নিজের সিটের বেল্টটা চেপে বসেছে কোমরে। তবে আর কোন কষ্ট নেই।)

(২)

ও ভয় পেয়েছে। এ ভয় ওকে জয় করতে হবে, ও না দলপতি এই দলের। হঠাৎ মনে হল ওর এমন করে ও এখন কেন সময় নষ্ট করছে। ওকে তো এখুনি উঠে দেখতে হবে কার কতটুকু কি চোট লেগেছে। ও না স্কাউট ক্যাম্পে ফার্স্ট এইড শিখেছে। না না নিজের ব্যথা কষ্ট এসবের কথা ভাবা তো দলপতির কাজ নয়। ওকে তো, ভাবতেই হবে সমস্ত দলের কথা। সমস্ত দলের ভাল মন্দই তো দলপতির ভাল মন্দ।

…উঃ উঃ আঃ!

কে অমন করে কাতরাচ্ছে! নিশ্চয়ই তার আঘাত লেগেছে খুব। তবু কেন এমন করে শুয়ে রয়েছে দলপতি রাণা মজুমদার! সমস্ত শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে নিজের হাত দুটোকে নাড়াল রাণা। —এইতো পেরেছে। ব্যাস।—কোমরের বাঁধনটা খুলে ফেলে পিছলে ভাঙ্গা সিটটা বেয়ে নিচে নেমে দাঁড়াল ও।—ধন্যবাদ ভগবান!

আমার কিছুই হয়নি। কিছুই না। তোমাকে শতকোটি ধন্যবাদ দেব যদি তুমি অন্য সবাইকেও, আমার মতন বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দাও!

উঃ উঃ।

বড় বড় চোখ করে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সামনের দিকে তাকাল রাণা। অন্ধকার চোখে সয়ে আসতেই দেখল—সমস্ত প্লেনের ভিতরটা যেন তাল গোল পাকিয়ে গেছে। ভাঙ্গা সিট, ছেঁড়া তার আর তোবড়ান এলুনিয়াম পাতের জটের মধ্যে ওর বন্ধু বান্ধবরা যেন কেমন জড়িয়ে গেছে। এমন ভীষণ অবস্থায় একা ও কি করবে। ভয় পেয়ে ও যেই একটু পিছতে যাবে কে যেন পিছন থেকে বলল—সাবধান। যেখানে আছ সেইখানেই থাক।—আনন্দে বুকের ভিতরটা নেচে উঠল রাণার এতে। গ্রাহামের গলা। বিলি গ্রাহাম তাহলে ভালই আছে।

—ক্যাপ্টেন, আশা করি তোমার কোন চোট লাগেনি। জিজ্ঞাসা করল বিলি গ্রাহাম।

—না লাগেনি। তোমার? পাল্টা জিজ্ঞাসা করল রাণা।

—না আমারও কিছুই হয়নি। তবে আমি আমার কোমরের বেল্টটা কিছুতেই খুলতে পারছি না —বলল বিলি গ্রাহাম—সাবধানে এগিয়ে এসে দেখতো আমাকে ছাড়াতে পার কিনা।—

—দাঁড়াও দেখছি।

কাঁপা হাত দুটোকে অনেক কষ্টে নিজের বসে এনে বিলির কোমরের বেল্ট খুলতে চেষ্টা করল রাণা।

—'বিলি' —বলল, রাণা— 'আমাদের প্রথম কাজই হবে সবাইকে খুঁজে বার করা আর উদ্ধার করা।

—নিশ্চয়ই। বলল বিলি।—আমাকে আগে আমার পায়ের উপরে দাঁড়াতে দাও ক্যাপ্টেন।

প্রাণপণ চেষ্টা করে বিলিকে বেল্টের বাঁধন থেকে মুক্তি দিল রাণা।

মাটিতে দাঁড়িয়েই বিলি বলল—ক্যাপ্টেন প্রথমেই চল দেখি কে অমন করে কাতরাচ্ছে।

—হ্যাঁ তাই চল বলল রাণা।

ওরা সামনের দোমড়ান মোচড়ান সিট আর ধাতু পাতগুলোকে পার হয়ে এগোতে যাবে যেই— অন্ধকারের মধ্যে থেকে আবার কে যেন বলে উঠল— ও কি করছ। এগিও না দাঁড়াও। দাঁড়াও

—টম কার্পেন্টার। উৎসাহে বলল বিলি। —কোথায় তুমি টম?

—ঠিক তোমাদের সামনের ভাঙ্গা সিটগুলোর নিচে।

—তোমাকে চোট লাগেনিতো। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল রাণা।

—না ক্যাপ্টেন। তবে আমার সাথে আছে গুরুদিৎ। ও কিন্তু অজ্ঞান। বুঝতে পারছি না ওর কিছু হয়েছে কিনা।

—এসো ক্যাপ্টেন আমরা সিটগুলো সরাই। ব্যস্ত হয়ে বিলি বলল

ধাতুটুকুরোর নিচ থেকে টম বলল—হ্যাঁ তাই কর কিন্তু একজনে। অন্যজন যাও দেখ কে অমন করে কাতরাচ্ছে। আমাদের চাইতে তার দরকার হয়ত অনেক বেশী।

—ঠিক বলেছ। রাণা বলল। তুমি থাক বিলি, আমি এগোচ্ছি।

ভাঙ্গা সিট আর দোমড়ান মোচড়ান ধাতুর পাতগুলো কোন মতে পার হয়ে এলো রাণা। অন্ধকার চোখে সয়ে গেলেও তেমন স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়াও ভয় হল ওর যদি না বুঝে ওর বন্ধুদের কারও উপরেই গিয়ে পড়ে শেষে। দুহাতে দুচোখ কচলে ও অন্ধকারটাকে আরও সয়ে নিতে চেষ্টা করল তারপর চাপা অথচ স্পষ্ট গলায় বলল— কে আছে এখানে। —কে?

—উঃ। উঃ। আঃ।

শব্দ শুনে আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে গেল রাণা। এটা প্লেনের প্রায় মাঝখানটা। পেছন দিকের চেয়ে এদিকটা ভেঙ্গেছে অনেক বেশী। দেখে মনে হল ওর যেন এক অজানা দৈত্য এক থাপ্পড়ে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে সামনেটা। সেই ভগ্ন স্তূপের মাঝখানে কেমন করে যেন শুয়ে আছে এয়ার হোস্টেস তহুক্কা। ওর পায়ের আওয়াজ শুনে ককিয়ে উঠল ও।

—কোথায় লেগেছে আপনার। নিচু হয়ে বসে রাণা জিজ্ঞাসা করল।

—পায়ে। দুটো পাই আমার আটকে গেছে ধাতুর জটের ভিতরে। উঃ। আমাকে বাঁচাও ভাই। এ যন্ত্রণা আর আমি সইতে পারছি না। ককিয়ে কেঁদে ফেলল তহুকা। আমার দুটো পাই বোধ হয় ভেঙ্গে গেছে।

—শান্ত হোন। শান্ত হোন—এখুনি আপনাকে আমি বার করে আনছি। বলল রাণা—

সেই অন্ধকারে প্রাণ পণ করেও সে লোহার জট ছাড়াতে পারল না রাণা। মাঝ থেকে দুহাতের পাতা কেটে ফাল ফাল হয়ে গেল। একটু পরেই বুঝতে পারল যে তহুক্কা অজ্ঞান হয়ে গেছে। তবু ভাল। অন্তত তাতে ওর যন্ত্রণা বোধ থাকবে না। কিন্তু বিলি করছে কি! ভাবল রাণা—ও আসছে না কেন?— একটু থামল রাণা। দু মিনিট বসে বসে হাঁপাল। পরক্ষণেই মনে হল ওর বসে থাকলে তো চলবে না। শুধু তহুক্কাই তো নয়। আরও তো অনেকে রয়েছে। তাদের খোঁজও তো করতে হবে। ভগবান যখন ওকে আর বিলিকে সুস্থ রেখেছেন তখন এ দায়িত্ব তো ওদেরই। আবার উঠে পড়ল ও। ভাবতে লাগল কি করে তহুক্কাকে বার করা যায়।

বাইরে হঠাৎ কেমন যেন আওয়াজ উঠল। একটু কান পেতে থেকে বুঝল ও। আবার বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছে। হঠাৎ ভাঙ্গা প্লেনের ভিতরেও কোথায় যেন টপ্ টপ্ টপ্ টপ্ করে জল পড়তে আরম্ভ করল। পরক্ষণেই হাড় কাঁপান ঠাণ্ডা হাওয়াও হু হু করে ঢুকতে লাগল ভিতরে। একটু নড়তেই পায়ের কাছে কি যেন নড়ে উঠল ওরা ঝুঁকে পড়ে দেখল কোথা থেকে যেন ভেঙ্গে পড়েছে একটা শাবলের মতন ধাতুর দণ্ড। দুহাতে সেটাই তুলে এগিয়ে গেল ও। ফাটলের মাঝখানে সেটা ঢুকিয়ে প্রাণপণে চাড় দিল। ভীষণ আওয়াজ করে ফাঁক হয়ে গেল ধাতুর জট। ঝুঁকে পড়ে আস্তে সে ধাতুর জট থেকে তহুকার পা দুটোকে বার করে আনল রাণা। একটা ভাঙ্গা সিটের গদি টেনে এনে রাখল ওর পায়ের নিচে। এখন ও এমনই থাক। এবার দেখতে হবে গুরুদিৎকে। টম কে। তারপরে অন্য সবাইকে। ধাতুর দণ্ডটা হাতে ধরে ও আবার সেই ভাঙ্গা সিটের পাহাড় টপকে চলে এল এপারে। ওকে দেখেই বিলি বলল—

—কি খবর ওদিকের ক্যাপ্টেন? কে কাতরাচ্ছে?

—তহুক্কা। এয়ার হোস্টেস। বোধ হয় ওর দুটো পাই ভেঙ্গে গেছে। সিন বোনের কাছে।

—হায় ভগবান। বলল বিলি। —এখানে এখন কোথায় ডাক্তার পাওয়া যাবে!

—সে কথা পরে। বলল রাণা। —আগে উদ্ধারের কাজ শেষ করতে হবে।

—সে তো নিশ্চয়ই। বলল বিলি। —এসো ক্যাপ্টেন হাত লাগাও এখানে।

অনেক কষ্টে ওরা দুজনে টেনে বার করল টম কার্পেন্টারকে।

—তোমার লাগেনিতো কোথাও? দেখ ভাল করে। বলল রাণা।

—সে দেখা পরে। আগে গুরুদিৎ। আবার তিনজনে কাজে লেগে পড়ল।

—রাত চারটে বাজে —বলল টম ওর হাতের ঘড়ি দেখে। দুর্ঘটনা ঘটার পর থেকে প্রায় ছয় সাত ঘণ্টা কেটে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সবাই আমাদের খোঁজে বার হয়ে পড়েছে।

—তা হোক তবুও আমাদের বসে থাকা চলবে না—বলল রাণা।

—হ্যাঁ কিন্তু, এমন অন্ধকারে কি করতে পারি আমরা? আগে আলো চাই। বলল টম।

—কিন্তু কোথায় পাব? জিজ্ঞাসা করল বিলি।

—বানাব। বলল টম! ছুরি আছে তোমার কাছে?

—ছিল, হারিয়ে গেছে।

—মুস্কিল হল। বলল টম। হঠাৎ রাণার হাতের দণ্ডটার দিকে তাকিয়ে বলল—ওটা দাও ক্যাপ্টেন আমাকে। আগে আমি এমারজেন্সি এস্‌কেপ ডোরটা ভেঙ্গে খুলি। বাইরের সাথে তাহলেই যোগাযোগ হবে।

দণ্ডটা এগিয়ে দিল রাণা। সেটা হাতে নিয়ে ওদের পাশ কাটিয়ে একটু এগিয়ে গেল টম। হাতড়ে হাতড়ে প্লেনের খোলসের একজায়গায় এসে প্রচণ্ড শব্দ করে সেই ডাণ্ডা দিয়ে ঠোকাঠুকি সুরু করে দিল।

একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ করে হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। দমকা একটা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে সবাইকে কাঁপিয়ে দিল। সেই খোলা দরজা দিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই বাইরে মাথা বার করে টম বলল—

—ভগবানই আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে ক্যাপ্টেন। নইলে এমন ভয়ানক ঘটনার পরেও কেউ উঠে দাঁড়াতে পারে?

—কিন্তু এখন আমরা করব কি? বিলি জিজ্ঞাসা করল।

—আমি নিচে নামব ক্যাপ্টেন। তোমরা ততক্ষণ যা পার কর। অন্তত গুরুদিৎকে ভুলো না।

—আলো একটা চাইই চাই। —এখুনি। এমার্জেন্সি ডোরটা বেয়ে উঠে ও লাফ দিয়ে পড়ল মাটিতে চেঁচিয়ে বলল—ভয় পেও না ক্যাপ্টেন। আমি ফিরব এখুনি।

ওরা দুজনে মুখ বুজে সেই ধাতুর ডাণ্ডাটা দিয়ে একটার পর একটা ধাতুর জট ছাড়িয়ে চলল। এক সময়ে বহু কষ্টে ধরাধরি করে গুরুদিতের অজ্ঞান দেহটাকে টেনে বার করল ধ্বংস স্তুপের ভিতর থেকে। ওর বুকের উপর কান পেতেই বিলি চেঁচিয়ে উঠল।

—বেঁচে আছে ক্যাপ্টেন। গুরুদিৎ বেঁচেই আছে।

ধরাধরি করে ওরা দুজনে গুরুদিৎকে এক পাশে শুইয়ে দিল। আঘাত যে কোথায় লেগেছে ওর বোঝা যাচ্ছে না—একেবারে বেহুঁস অজ্ঞান।

গুরুদিৎকে শুইয়ে দিয়ে ওরা উঠে দাঁড়িয়েছে—হঠাৎ প্লেনের অন্যদিক থেকে কে যেন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—আমি কোথায়। আমি কোথায়। উঃ আমার জল তেষ্টা পেয়েছে। কোথায় আমি বলনা?

এ গলা শুনেই রাণা বলল —রাধারাণী দাস। চল বিলি ওদিকে এখুনি। ও একটুতেই খুব ভয় পেয়ে যায়। এখুনি চল। শুনছ না ওর গলার স্বর।

ওরা প্লেনের শেষের দিকে এক কোণে ভয়ে জড়োসড়ো রাধারাণীকে বসে থাকতে দেখল। ওদের দেখতে পেয়েই রাধারাণী কাঁপা গলায় বলল—জল খাব।

এঃ তুমিতো দেখছি শীতে কাঁপছ।—বলল বিলি। চট করে নিজের কোটটা খুলে এগিয়ে ধরে বলল—এটা পরে ফেলতো বোন লক্ষীটি।

হাত বাড়িয়ে কোটটা নিল রাধারাণী। সেটা কোনমতে পরেই বলল।— জল খাব।—

রাণা বলল—জল এখন কোথায় পাবে বল। দেখছনা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে।—এখন ওসব কথা ভুলে গিয়ে অন্যদের খুঁজে বার করতে হবে।—জল পরে খাবে। রাণা যেন ধম্‌কে দিল। সে থমকে থমকে গেল

রাধারাণী। ওর কাঁপুনিও যেন একটু কমল। আস্তে আস্তে ও বলল—ওদিকের কোণে বসে আছে আমিনা। ওর খুব লেগেছে। রক্তও পড়ছে। ওকে দেখ।—আমি আর জল খেতে চাইব না।

—লক্ষ্মীটি। বলল রাণা। তারপর ওরা এগিয়ে গেল আমিনার দিকে। ভয়ে কেমন যেন জড়োসড়ো হয়ে গেছে আমিনা—কোথায় লেগেছে তোমার?—নিচু হয়ে ওর মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল—বিলি।

কেমন যেন অসহায় মুখ তুলে তাকাল আমিনা।

—টম আলো নিয়ে আসছেনা কেন?—বলল রাণা।—আলো না হলে সত্যিই তো কিছু বোঝা যাবেনা। বিলি বলল—তুমি ভয় পেওনা বোন। আমরা তো আছি। বল তোমার কোথায় লেগেছে? বল?

—ডান দিকের পায়ে আর হাতে। অনেক কষ্টে ব্যথার কান্না চেপে বলল আমিনা।

—কই দেখি? বিলি আর রাণা দুজনেই একসাথে বসে পড়ল ওর পাশে।

দেখল—সত্যি হাত আর পায়ের অনেক খানিকটা জায়গার মাংসই ভীষণ ভাবে ছিঁড়ে গিয়েছে।—ব্যাণ্ডেজ চাই। বলল—রাণা।—আর ওষুধ। ফাস্ট্ এইডের বাক্স কি কিছু থাকেনা প্লেনে?

এমন সময়ে এমার্জেন্সি দরজার কাছে যেন কিসের আওয়াজ শোনা গেল।

—টম ফিরেছে।—বলল বিলি।

বাইরে থেকে টম ডাকল—ক্যাপ্টেন্।

—হ্যাঁ, কি কি বল—? এগিয়ে গেল রাণা। বাইরে তখন বৃষ্টি থেমেছে।

—ভাল খবর আছে।—প্লেনটা দুটুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে গেছে। আমরা আছি পিছনের অংশে। সামনের অংশের সকলেই ভাল আছে।

—কিন্তু এখানে তো আমিনা, গুরুদিৎ আর তহ্‌কার খুব চোট লেগেছে। এখুনি কিছু করা দরকার।

—তবে আমি মুংলিকে ডেকে আনি এখুনি। ও ফার্স্ট এইড দিতে জানে। ও এদের দেখুক।

—হ্যাঁ কিন্তু ওষুধ পত্র। ব্যাণ্ডেজ?

—সব ঠিক হয়ে যাবে ক্যাপ্টেন। আলো নিয়ে আসছি আমি এখুনি। তোমরা ততক্ষণ ওদের দেখ। আবার চলে গেল টম।

বিলি বলল—শুনলে তো আমিনা?—আর ভয় পেওনা। এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে। ওরা আলো নিয়ে এই এলো বলে। সঙ্গে ওষুধ পত্র ব্যাণ্ডেজ সব থাকবে।

রাণা ততক্ষণে ওর গায়ের সার্টটা খুলে ফেলেছে বলল—এস বিলি এটা ছিঁড়ে আমরা কিছু ব্যাণ্ডেজ বানিয়ে আমিনার হাতে পায়ে বাঁধি।

কিন্তু তা করার আগেই আবার বাইরে টমের গলা শোনা গেল—ক্যাপ্টেন।

—হ্যাঁ কি বল?

আমরা এসে গেছি। জিনিস গুলো এগিয়ে এসে তুলে নাও উপরে।

দরজার কাছে এগিয়ে গেল বিলি আর রাণা। দেখল বাইরে দরজার কাছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে কজন। অন্ধকারে দেখে ওরা কাউকেই চিনতে পারল না।

—কি আছে দাও। বলল রাধা। দু তিনটে ট্র্যাভেলার্স ব্যাগ ভর্তি জিনিস টেনে উপরে তুলল ওরা। বিলি জিজ্ঞাসা করল—মুংলি এসেছে? হ্যাঁ। উত্তর দিল টম।—কিন্তু উঠবে কি করে?—হামিদুল আর কুণাল গেছে তার ব্যবস্থা করতে তাড়াতাড়ি ওদের আসতে বলেছি।

ওরা দুজনে ফিরল একটা মোটা গাছের ডাল টানতে টানতে। সেটাকে প্লেনের গায়ে লাগিয়ে দাঁড় করান হল মইএর মতন করে মুংলি বলল—এতেই হবে। ক্যাপ্টেন তুমি আমার হাতটা ধর।

হাত ধরে ওকে একরকম টেনেই ভিতরে তুলে নিল রাধা আর বিলি।

—আলো এনেছ? জিজ্ঞাসা করল বিলি।

হঁ্যা—বলল মুংলি। একটা ব্যাগের মধ্যে দুটো টর্চ আছে। কোথায় আমিনা?

—এসো এদিকে।

পর পর ডাল বেয়ে ভিতরে উঠে এল হামিদুল। কুণাল আহতদের এক এক করে সবাইকেই দেখল। দেখল মুংলি। তখন ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন পাকা ডাক্তার। তাড়াতাড়ি দেখা শেষ করেই ও আগে ওষুধ দিয়ে আমিনার আঘাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। কুণাল আর হামিদুল সাহায্য করল ওকে।

ব্যাগের ভিতর থেকেই বার হল দুটো বড় টর্চ। তার আলোতেই কাজ সারলো মুংলি। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হতেই—ওদিকে আবার শোনা গেল তন্বুক্কার গলার কাতর আওয়াজ। কিন্তু তাতে যেন তেমন কানই দিল না মুংলি—বলল—আমিনার শোবার ব্যবস্থা কর এখুনি।

বিলি আর হামিদুল—দুজনে তার ব্যবস্থায় লেগে গেল। একটা সিটকেই ওরা ঝেড়ে সাফ করল। আস্তে তার উপরে শুইয়ে দিল আমিনাকে।

—ওর গায়ে ঢাকা দাও। বলল মুংলি।

তাড়াতাড়ি হামিদুলও ওর কোটটাও খুলে ওকে ঢাকা দিল।

—এবারে ওকে কিছু খেতে দাও গম্ভীর ভাবে হুকুম দিল মুংলি। কুণাল ওর প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার করল এক মুঠো টফি আর লজেন্স। তাই এগিয়ে দিল আমিনার দিকে।—বলল—নাও খাও যত পার।

—আমার ভাবনা গুরুদিৎ কে নিয়ে! বলল মুংলি।—চল, এবারে আগে ওকে দেখি গিয়ে।

সবাই চলে আসছিল ওর পিছন পিছন। ধমকে উঠল মুংলি। বলল—কুণাল তুমি থাক আমিনার কাছে। সবাই চলে গেলে চলবে কেন।

গুরুদিৎকে যেমন শুইয়ে দিয়েছিল—ঠিক তেমনিই শুয়ে আছে ও। টর্চের আলোয় খুব ভাল করে ওকে পরীক্ষা করল মুংলি। তারপর হতাশ হয়ে মাথা নেড়ে বলল—না তো কোথাও কোন আঘাত লেগেছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

—তাহলে উপায়! ব্যস্ত হয়ে হামিদুল বলল।

—এক কাজ করা যাক।—অনেক ভেবে বলল মুংলি।

—কেউ একটা রুমাল ভিজিয়ে আনুক। চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে দেখা যাক। যদি ভয়ে কিম্বা ঝাঁকানির জন্য অজ্ঞান হয়ে থাকে তো তাতে কাজ দেবে। ছুটল হামিদুল আর টম তাদের রুমাল ভিজিয়ে আনতে। বার চার পাঁচ ভাল করে গুরুদিতের চোখে মুখে জলের ছিটে দেওয়া হল। চোখের পাতাও যেন নড়ল একটু ওর। উৎসাহে ওরা আবার ছুটিল বাইরে।—শেষ পর্যন্ত সত্যি গুরুদিৎ চোখ মেলে চাইল—ওদের সবাইকে ওর চারপাশে অমন ব্যগ্র হয়ে বসে থাকতে দেখে বলল—কি হয়েছে আমার? আমি কি অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। আমার কি চোট লেগেছে?

—না কিছু হয়নি তোমার—খুব শান্ত গলায় উত্তর দিল মুংলি।

—তুমি এখন ভাল আছ গুরুদিৎ। এখন কিছু টফি খেয়ে একটু বিশ্রাম কর শুয়েই। উঠোনা যেন। বুঝলে?

—আচ্ছা। বলল গুরুদিৎ হামিদুলের হাত থেকে টফি নিতে নিতে—

তনুকার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা সকলে। তনুকার জ্ঞান ততক্ষণ ফিরে এসেছে। আবার ওদের সবাইকে একসাথে দেখে একটু যেন খুশিই হল ও। তবুও যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। ওর পাশে বসে পড়ে ছুটো পাই ভাল করে পরীক্ষা করল মুংলি। তার পর ওর হুকুমে হামিদুল টম, বিলি আর রাণা এদিকে ওদিক ছুটো ছুটি সুরু করল। এটা আন। ওটা দাও এটা ধর। সব শেষে তনুকাকে সকলে ধরা ধরি করে এনে শুইয়ে দিলে একটু সমতল জায়গায়। ডাক্তারির চোটে ও তখন আবার অজ্ঞান, তবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা ছুটোকে ছড়িয়ে শুতে পারল তনুকা।

মুংলি বলল—এবারে তোমরা সবাই এক কাজ কর। গুরুদিৎ আর আমিনাকেও সাবধানে নিয়ে এস এখানে। ওরা এক সাথে থাকলে আমার পক্ষে দেখাশুনা করার সুবিধা। তাছাড়া এখানে জায়গাও অনেক।

—চল ক্যাপ্টেন আমরা তাই করি! বলল বিলি।

সব কাজ মিটল যখন তখন বাইরের জঙ্গলে পাখির ডাক সুরু হয়ে গেছে।

হামিদুল বলল—আমরা কি এখন একটু বসব ক্যাপ্টেন? না অন্য কোন কাজ আছে?

মুংলি বলল—না এখন কিছুক্ষণ কোন কাজ নয়! সবাই বস। অনেক কিছু আলোচনা করার আছে।

রাণা বলল—হ্যাঁ— কাজ আমাদের অনেক। তবে তার আগে কেমন করে তা করব আমরা, তা আলোচনা করে নেওয়াই ভাল।

—ঠিক তাই। বল টম:—চল এখান থেকে সরে গিয়ে আমরা একটু ওদিকে বসি।

—বেশ প্রথমে তাহলে আমরা আমাদের একজন দলপতি ঠিক করি।

—সে তো আছেই। সবাই এসে বসল—এক পাশে

—হ্যাঁ তাকেই আমরা সবাই মানব। ওরা বলল।

বেশ—রাণা বলল—তবে এসো তাহলে আমরা সব কাজ ভাগ করে নিই।—এক এক কাজ একজনে দায়িত্ব নিয়ে করবে।

মুংলি বলল আমি গার্ল গাইড থাকার সময়ে ফার্স্ট এইড শিখেছি। আমি সব আহতদের দেখাশুনা করব।

—বেশ তুমিই তাহলে আমাদের ডাক্তার। সাহায্য আসার সময় পর্যন্ত সবার ভার তোমার উপরে। বিশেষ করে ওদের তিনজনের।

—ঠিক আছে ক্যাপ্টেন।—গম্ভীরভাবে চলল মুংলি। কথার ফাঁকে তখনও ব্যাণ্ডেজ পাকিয়ে চলেছে।

মুংলি থামতেই—মাথা চুলকে টম বলল—তুমি তো জান ক্যাপ্টেন আমি N.C.C-র এয়ার উইংস্ এর লোক। তাছাড়া—ছেলেবেলা থেকে প্লেনের ব্যাপারে নেশা আমার। প্রায় সব প্লেনের সব কিছু আমি জানি বইএ পড়ে পড়ে। এখন এই এক্সিডেন্ট হওয়ার পর আমাদের কি করা উচিত তা বোধ ঠিকভাবে আমিই শুধু জানি।—আমার মনে হয় সাহায্য এসে পড়ার আগে পর্যন্ত সমস্ত উদ্ধার কাজটা আমার মত মতন হওয়া ভাল।

—নিশ্চয়ই। বলল—রাণা।—সে ব্যাপারে তো আমরা সবাই তোমার কথাই মেনে চলব।—সন্দেহ কি এতে!

হামিদুল বলল—আরও একটা কাজ বাকি রইল ক্যাপ্টেন। সাহায্য কখন আসে তারতো কোন ঠিক নেই। ততক্ষণ আমাদের খাওয়া দাওয়া তো চালাতে হবে প্লেনে যা আছে তাই দিয়েই। তাই এখুনি—সব কিছুর হিসাব নিয়ে—র‍্যাশন করে দিতে হবে। নইলে পরে বিপদ হবে।

—ঠিক বলেছ হামিদুল।—বলল রাণা।—তুমি নিলে তবে সে ভার। ও ব্যাপারে তুমি যা বলবে তাই সবাই মেনে নেবে।—তুমি আমাদের খাদ্য ভাণ্ডারী।

টম বলল—ভোর হলেই আমাদের একদলকে বার হয়ে পড়তে হবে দেখবার জন্য আমরা কোথায় আছি।

বিলি ব্যস্ত হয়ে বলল--সে ভার তবে আমি নিলাম ক্যাপ্টেন।—আমাকে এ কাজ করতে দেওয়া হোক।

বেশ তাই হবে। বলল রাণা—তবে খুব সাবধান। আমরা একটা গভীর জঙ্গলের উপর দিয়ে উড়ে আসছিলাম। যদি জঙ্গলেই পড়ে থাকি তো হিংস্র জন্তুর ভয় থাকতে পারে।

বিলি বলল—আমি খুব সাবধানে কাজ করব ক্যাপ্টেন।—তুমি ভেব না।

কুণাল এতক্ষণ চুপ করে দিল।—গম্ভীরভাবে বলল—তোমরা সবাই তো সব কাজ ভাগ করে নিলে। আমি তাহলে করব কি?—আমি কি শুধু বসেই থাকব?

মুংলি বলল—বা: তা কেন। তিন তিনটে এক্‌সিডেন্ট কেস কি আমি একলা সামলাতে পারব? তুমি থাকবে আমার এ্যাসিস্ট্যান্ট।—বুঝলে?

—আচ্ছা।—খুসি হয়ে বলল—কুণাল। আমি রাজি। এমন সময় ওদিক থেকে তহুক্কার গলা পাওয়া গেল।—শোন তোমরা।

ওরা সবাই উঠে পড়ল।

রাণা বলল—হামিদুল—বেশ ভোর হয়ে গেছে। তুমিই আগে তোমার কাজ সুরু করে দাও।—রুক্মিণী, শান্তা আর শকুন্তলা রইল তোমার সাথে।—মনে রেখ সবাই ক্লান্ত।—সবারই খিদে পেয়েছে তাছাড়া তিনজন আহত। আর তোমার উপরেই নির্ভর করছে বিলির তাড়াতাড়ি বার হওয়া।

—ঠিক আছে ক্যাপ্টেন আমি এখুনি কাজে লেগে পড়ছি, বলল হামিদুল।—বলে ও আর দাঁড়াল না—গাছের ডাল বেয়ে নেবে চলে গেল বাইরে।

—প্রথমে আমি তোমাদের ধন্যবাদ দেব। বলল তহুক্কা—কারণ এত বড় বিপদেও তোমরা ভয়ে মুষড়ে পড়নি তাই। তাছাড়া তোমরা আমার জন্য যা করেছ তার জন্যও। কিন্তু এস—সবার আগে আমরা সবাই ধন্যবাদ দিই ভগবানকে।

দু মিনিট ওরা চুপ করে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তহুক্কা ওদের ধর্মের অনুশাসন থেকে কিছু মুখস্থ বলল জোরে জোরে। ওরা নমস্কার করল ভগবানের উদ্দেশ্যে।

—একটা কথা কিন্তু তোমরা সবাই ভুলে গেছ।—বলল তহুক্কা।—তোমরা কি কেউ ককৃপিটের লোকগুলোর কথা ভেবেছ! লজ্জা পেয়ে রাণা যেন কি বলতে যাচ্ছিল। হাত তুলে ওকে থামিয়ে টম বলল—হ্যাঁ তাদের কথাও আমাদের মনে আছে।

—কোথায় তারা?

—তারা আর কেউ ফিরে আসবেনা আমাদের মাঝখানে—একথা শুনে যেন কেমন হয়ে গেল তহুক্কা। কোন মতে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে তার কান্না সামলাল।

কি হয়েছে তাদের?

আমাদের বাঁচাতে গিয়ে তারা প্রাণ দিয়েছে। বলল টম।

—খুলে বল আমাকে সব! কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তহুক্কা বলল—তুমি কি দেখেছ বল।

—বোধ হয় বাজ পড়েছিল প্লেনে। তাই প্লেনের কন্‌ট্রোল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন আর পাইলট তবুও প্লেনকে কোন খোলা জায়গায় নাবাবার চেষ্টাই বোধ হয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্লেনকে যেখানে নাবান—সে জায়গা এত ছোট যে প্লেনের প্রচণ্ড গতিবেগ থামাতে পারেন নি। দু টুকরো হয়ে যায় প্লেন

প্রথম গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে। সামনের অংশ গিয়ে আছড়ে পড়ে একটা পাহাড়ে ঢিপির গায়ে। কক পিট আর রেডিও অফিসারের ঘর চুরমার হয়ে গেছে। ওরা ওদের সিটেই বসে আছে। আমি দেখে এসেছি। কিন্তু আমাদের আর এখন কিছুই করার নেই।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল তনুকা। কাছে গিয়ে মুংলি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

রাণা বলল—এসো আমরা সবাই ওদের জন্যও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। আমরা যেন কোন দিনও ভুলে না যাই ওদের কথা।

কান্না-ভরা গলায় তনুকা আবার প্রার্থনার মন্ত্র বলল। বাইরে তখন বেশ ফর্সা হয়ে গেছে!

গুরুদিৎ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। বলল ডাক্তার দিদি আমি কি এখন উঠব? এখন তো আমি ভাল আছি।

—সত্যি ভাল আছ? জিজ্ঞাসা করল মুংলি।

—হ্যাঁ খুউব।

—বেশ তো তবে ওঠো।

হুকুম পেয়ে খুসিতে ভরে উঠল গুরুদিতের মুখ—তাড়াতাড়ি ও উঠে বসতে গেল। কিন্তু সমস্ত শরীরটাই শুধু বার কতক কেঁপে উঠল ওর। উঠতে পারল না ও, ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

—এ কি হয়েছে আমার ডাক্তার দিদি? একি হয়েছে আমার? ভয় পেয়ে অসহায়ের মতন গুরুদিৎ ওর হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল। দুহাতে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল মুংলি।

—ও কিছু না ভাই। ও কিছু না। তুমি আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর। দেখবে তবেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—ঠিক হবে তো? আমি আবার চলতে পারব তো ডাক্তার দিদি?

—নিশ্চয় ভাই। নিশ্চয়ই। আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল মুংলি।

—ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন—বাইরে কারা যেন ডাক দিল।

—কে?—এগিয়ে গেল রাণা।

—আমরা এসেছি। আমি, শকুন্তলা, শান্তা আর রুক্মিণী। হামিদুল পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের। আমরা এখন এখানে ডিউটি দেব। তোমরা যাবে বিশ্রাম করতে।

দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকাল রাণা। দেখল ওরা খালি হাতে আসেনি। সঙ্গে এনেছে নানান জিনিস পত্র। খাবার, বিছানা। এমন কি কতগুলো ম্যাগাজিন পর্যন্ত।

—তোমরা যাও। বলল মুংলি। আমার এখন যাওয়া চলবে না। কুণাল তুমিও যাও। তুমি কিন্তু ফিরবে তাড়াতাড়ি।

রাণা ব্যস্ত হয়ে বলল—তা কি করে হয়? তুমিও তো কম ক্লান্ত নও?

—এখন ডিউটি ফেলে যাওয়া ঠিক নয়। গম্ভীর ভাবে বলল—মুংলি।

তনুকা বলল—ঠিক কথাই তো বলেছে ও। তোমরা যাও ভাই। তোমাদের বিশ্রাম খুব দরকার।

কুণাল বলল—বেশ আমি এলে তুমি যাবে কিন্তু।

—আচ্ছা। বলল মুংলি।

দরজার কাছে আবার এগিয়ে গেল রাণা আর টম। একটা একটা করে জিনিসগুলোকে টেনে তুলল ভেতরে

ওরা। তারপর ঠেলে তুলল শকুন্তলা, শান্তা আর রুক্মিণীকে।

সাবধানে থেকো। বলল রাণা।

—কোন ভাবনা কোর না। বলল মুংলি। হাতে তখন ওর ধোঁয়া ওঠা গরম দুধের গ্লাস। গুরুদিতের মাথার কাছে গিয়ে বসল ও। শকুন্তলাকে ডেকে বলল—আমিনাকেও শিগ্‌গির এক গ্লাস গরম দুধ দাও আগে। তারপর রাধারানীকে।

ওরা সবাই এক এক করে গাছের ডাল বেয়ে নেবে এল নিচে। বাইরে তখনো জোলো আবহাওয়া—কুয়াশাও ঘন চারদিকে। নাবতেই কেমন যেন শীতের কাঁপুনি ধরল রাণার।

বিলি বলল—এ যে দেখছি জমে যাবার উপক্রম হল।

শিগ্‌গির চল টম।

টম বলল—আমিতো ভাবছিলাম আগের অংশে ঢোকার আগে প্লেনের চারপাশটা একবার ঘুরে দেখব।

—বাঃ, বেশ তোমার বুদ্ধি—আমাদের জমিয়ে মারতে চাও নাকি? বলল বিলি।

—হ্যাঁ সত্যি। হঠাই বাইরে বার হয়ে কাঁপুনিটা ধরেছে খুব বেশী। হেসে বলল রাণা—বেশ ক্যাপ্টেন তাহলে যে এদিকে এগিয়ে চলল টম। তার পিছনে ওরা সবাই।

কুণাল বলল—গাছগুলো কি বড় বড় দেখেছ ক্যাপ্টেন।

—হ্যাঁ, আকাশ দেখা যাচ্ছে না। বলল বিলি।

—তার মানে কিন্তু—আমরা যে কোথায় আছি ওপর থেকে দেখে কেউ জানতেও পারবে না। একটু ভেবে বলল রাণা।

—ঠিক হল না ক্যাপ্টেন—বলল টম।

—কেন?

—প্লেন যেখানে প্রথম মাটি ছুঁয়েছে, আকাশ থেকে সে জায়গাটাকে অতি সহজেই চেনা যাবে। সুতরাং আমরা যে কোথায় আছি এ সম্বন্ধে ওদের মোটামুটি ধারণা কুয়াশা কেটে গেলেই হবে। তবে কি তুমি কি বলতে চাও……রাণাকে কথাটা শেষ করতে দিল না টম—বলল।

—হ্যাঁ তুমি যা ভাবছ ক্যাপ্টেন ঠিক তাই।

বিকাল নাগাদই আমরা টাণ্টামোরা সহরে পৌঁছে যাব। তুমি দেখ।

—কি করে তা সম্ভব!

—কেন! হেলিকপ্টর উড়বে! হেসে বলল টম।

—তাই যেন হয় ভগবান। করুণভাবে বলল রাণা—তিনজন আহত রয়েছে আমাদের সঙ্গে।

কুয়াশার ভিতর দিয়ে হামিদুলের গলা শোনা গেল।

—ব্যাপার কি! তোমরা কি কুয়াশায় দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি? এদিকে কফি তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

—কফি! বিলি অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

—হ্যাঁ। সুধু কফি নয়। সঙ্গে অন্য কিছুও আছে।

আর করতে হল না। টম এর পিছন পিছন ওরা প্রায় দৌড়েই ঢুকল এসে প্লেনের সামনের অংশটাতে।

—কই কি আছে দাও শিগ্‌গির। ব্যস্ত হয়ে বলল বিলি। আমার যা খিদে পেয়েছে।

কাগজের গ্লাসে এক এক গ্লাস গরম কফি আর সঙ্গে স্ন্যাকস্ এগিয়ে ধরল হামিদুল।

—পেলে কোথায় এসব? গোগ্রাসে খেতে খেতে রাণা জিজ্ঞাসা করল।—উঃ তুমি আমাদের বাঁচালে ভাই।

—প্লেনে কি কিছুর অভাব আছে। হেসে বলল হামিদুল। তবে হ্যাঁ ধন্যবাদ দেবে তো দাও আমার এ্যাসিট্যান্ট-রাজা বাবুকে। ওই খুঁজে খুঁজে সব বার করেছে। ও না থাকলে কিছুই হত না।

ছোট্ট রাজা সোম এক কোণ থেকে এগিয়ে এসে একগাল হেসে বলল—বারে করব না বুঝি এসব। আমরা যে এখন সবাই সেই সুইস্ রবিনসনদের মতন দ্বীপে এসে উঠেছি। এখন সবাইকেই সব কাজ করতে হবে ঠিক ঠিক। নইলেই ভীষণ বিপদ। আচ্ছা হামিদুল দা এখানে কি জংলিরা আছে? বলম হাতে! সবাই হেসে উঠল প্রাণ খুলে। কফি শেষ করল বিলি।

তারপর উঠে আড়মোড়া ভাঙ্গল। ওর যাবার সময় হয়েছে। ওকে উঠতে দেখেই রাণা জিজ্ঞাসা করল—তুমি রেডি?

—হ্যাঁ ক্যাপ্টেন।

—বেশ এগোও। বলল রাণা। দেখবে কোথাও কাছে লোকালয় আছে কিনা।

—একটা, কথা। বাধা দিল টম। যাচ্ছ যাও কিন্তু সব সময়েই মনে রাখবে খুব বেশী দূরে যাওয়া উচিত হবে না। আর একলা যেও না!

—হামিদুল বলল—ক্যাপ্টেন। আমার নিজের ডিউটি তো আবার সেই দুপুরে। সে আমি ঠিক ফিরে এসে করব। এখন তোমার মত পেলে আমিও যাই।

বেশ তো যাও। বলল রাণা।

—আমিও যাব। গম্ভীরভাবে বলল রাজা সোম।

—তুমিও!

একটু চিন্তায় পড়ল রাণা। কারণ রাজাই এদের মধ্যে সব থেকে ছোট। বয়স মাত্র আট। কিন্তু রাণা কে একটুও ভাবতে দিল না রাজা। বলল—আমাকে যেতেই হবে ক্যাপ্টেন। দেখতে হবে কোথায় নেবেছি আমরা। এটা দ্বীপ না মহাদেশ।

আবার সবাই হেসে উঠল এক সাথে।

রাজা জিজ্ঞাসা করল : যাব ক্যাপ্টেন?

—কিন্তু যদি কোন বিপদ হয় পথে। ভাবনায় পড়ে রাণা বলল।—তুমি যে বড্ড ছোট।

—বারে আমিই বুঝি খালি ছোট। আর তোমরা সবাই বড়। যাও, যাব না আমি, যাও। রাগ করে ও আবার ভিতরের এক অন্ধকার কোণের দিকে চলে গেল।

—শোন শোন। ব্যস্ত হয়ে ডাকল রাণা।

—না যাব না আমি। রাগ করে উত্তর দিল রাজা।

—আচ্ছা। আচ্ছা। রাগ করতে হবে না তোমাকে।—তুমিও যাও ওদের সঙ্গে। হেসে বলল রাণা।

—ঠিক বলছ! ছুটে এল রাজা।

হ্যাঁ। কিন্তু এ দলের দলপতি বিলি মনে থাকে যেন। ওর কথা মানতে হবে সবাইকে।

—নিশ্চয়। এক সাথে হামিদুল আর রাজা বলে উঠল।

—তবে আর দেরী নয়। বার হয়ে পড় তোমরা।

—নিশ্চয়ই। এখুনি।

বিলির পিছন পিছন। হামিদুল আর রাজা এক এক করে বার হয়ে গেল বাইরে।

—কুণাল বলল—আমিও চলি ক্যাপ্টেন। আমি গিয়ে মুংলিকে পাঠিয়ে দেব।

—হ্যাঁ যাও। যাবার সময়ে সঙ্গে কিন্তু খাবার নিয়ে যাও। যদি ও আসতে না চায়।

—সেই ভাল ক্যাপ্টেন। বলল টম।

খাবারের প্যাকেট আর গরম কফির পট হাতে করে কুণাল চলে গেল। ও চলে যেতেই টম বলল—আমরা এখন কিন্তু দশ মিনিট বিশ্রাম করব ক্যাপ্টেন। তারপর খুঁজে দেখব—প্লেনের ভিতর থেকে আরও কিছু খাবার, ওষুধ, দরকারি জিনিস বার করতে পারি কি না।

—বেশ তাই হবে। উত্তর দিল রাণা।

প্লেনের কাছ থেকে কয়েক-পা এগিয়ে এসেই থমকে দাঁড়াল বিলি।—কি ভীষণ কুয়াশা দেখেছ হামিদুল!

—হ্যাঁ এ যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। উত্তর দিল হামিদুল।

—আমরা নিশ্চয়ই বেশ উঁচু জায়গায় আছি। একটা মালভূমি হতে পারে। দেখছ না কেমন ঠাণ্ডা। রাজা—আমার মনে হচ্ছে এ কুয়াশা সহজে কাটবে না।

—তাহলে উপায়? জিজ্ঞাসা করল হামিদুল।

—ফিরে গিয়ে তো শুধুই বসে থাকা—বলল বিলি।

—তার থেকে চল আস্তে আস্তে এগোই।

—হ্যাঁ সেই ভাল। হামিদুল বলল—যদি কাছে কোথাও লোকজন থাকে তো দেখা হয়েও যেতে পারে।

—চল তবে এসো—বলে রাজা তার বেল্ট থেকে স্কাউটের ছুরিটা খুলে হাতে নিল। ওটা দিয়ে আমি গাছের গায়ে দাগ দিয়ে এগোবো যাতে ফিরবার সময় পথ না হারাই।

—কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য থাকবে কি? প্রশ্ন করল বিলি।

—সবাই একটা করে মোটা দেখে গাছের ডাল তুলে নাও হাতে। বলল—হামিদুল।

তাই করল ওরা। কুয়াশার মধ্যে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। আসে পাশে কোন ছোট গাছের চিহ্ন নেই। দুপাশে যতদূর দেখা যাচ্ছে—মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। কুয়াশা ছাড়িয়ে তাদের মাথা যে আকাশের কতদূরে উঠে গেছে তা ওরা বুঝতেই পারল না সে গুঁড়ির উপরে দাগ দেবার প্রাণপণ চেষ্টায় রাজা হাঁপিয়ে উঠল। চারদিক নিঃস্তব্ধ তার মাঝে ওদের পায়ের শব্দই শুধু শোনা যেতে লাগল।

কোথাও কোন লোকজন নেই বলেই মনে হচ্ছে।

—আমরা কতদূর এলাম? জিজ্ঞাসা করল হামিদুল।

—চার পাঁচ কিলোমিটার হবে বোধ হয়। বলল বিলি।

—আর এগোনো কি ঠিক হবে? জিজ্ঞাসা করল হামিদুল।—টম কি বলেছে মনে আছে তো?

—আছে। এসো আমরা এবারে বাঁদিকে ফিরি। বলল বিলি। বাঁ দিকে দু-এক কিলোমিটার গিয়েই আজকের মতন আমরা ফিরব। বুঝলে।

নিঃশব্দে ওরা বাঁদিকে মুখ ফেরাল। একটু এগিয়ে এসেই লক্ষ্য করল জঙ্গলের রূপ যেন ক্রমে বদলে যাচ্ছে। সেই বিরাট বিরাট গাছগুলোর ভীড় বেশ কমে এসেছে। চারপাশে ছোট গাছের জঙ্গল কখন যেন শুরু

য়ে গেছে। ক্রমে ঝোপ ঝাড়ও দেখা দিতে লাগল। পায়ের নিচের রুক্ষ শুষ্ক মাটির বদলে দেখা দিল াতসেঁতে মাটি, সবুজ ঘাস আর জায়গায় জায়গায় শ্যাওলা।

—সাবধান। বলল বিলি। ঝোপ জঙ্গলে জন্তুর ভয় থাকতে পারে। আমরা কি আর এগোবো।

—না। বলল হামিদুল। আমার মনে হচ্ছে আমরা কোন জলার দিকে এগিয়ে চলেছি। দেখছ না াছপালাগুলো কেমন বদলে গেছে। কিন্তু জন্তু জানোয়ারের উপদ্রব?

—আবার জলের ধারেই তো মানুষও থাকতে পারে। গম্ভীর ভাবে মন্তব্য করল রাজা।

বিলি বলল—হ্যাঁ এ কথাও তো ঠিক!

—হামিদুল বলল—কিন্তু কোন অস্ত্র তো নেই আমাদের হাতে। যদি কোন বিপদ হয়। তবে?

—ভয় পাচ্ছ মিছি মিছি। মানুষ করবে কি! হেসে বলল রাজা।

—কি জানি সে মানুষগুলো তো একেবারে জংলীও হতে পারে।

—কি করবো তাহলে?

—ফেরা উচিত এখন। কুয়াশা কাটলে আবার আসব।

রাজা ব্যস্ত হয়ে বলল আমি একটা কথা বলতে পারি।

—বল। বলল বিলি।

—ফিরে না গিয়ে এসো এখানে দাঁড়িয়ে আমরা কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করি। জন্তু বা মানুষ যাই থাকুক না :কন কাছে তাদের সাড়া পাওয়া যাবে তাহলে।—যদি বিপদ দেখি পালাব ছুটে।

—বেশ। তাই কর। কিন্তু পিছন ফিরে দৌড়াবার জন্য রেডি থেকো।

সবাই ওরা হেসে উঠল—তারপর প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল ওদের জানা সবকটা ভাষাতেই। –

—কেউ কোথাও আছ? আমরা বড় বিপদে পড়েছি। সাহায্য চাই।

ওদের সাড়া পেয়ে ডানা ঝাপটে এদিক ওদিক থেকে গোটা কয় জংলী পাখি শুধু উড়ে চলে গেল। ওরা থামতেই চারিদিক আবার নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল। মানুষ বা জন্তু কোন কিছুরই সাড়া পাওয়া গেল না আর।

—চল এগোই। বলল রাজা খুসি হয়ে। কোথাও কোন ভয় নেই।

—তাই মনে হচ্ছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উত্তর দিল বিলি।

—আমার মন কিন্তু সায় দিচ্ছে না তবুও। বাধা দিয়ে বলল হামিদুল। ও হাতের গাছের ডালটাকে বাগিয়ে ধরে। দেখছ না চারিদিক কেমন থম থমে। কোন কিছুর সাড়া নেই কোথাও। এমন কি পাখিগুলোও ডাকছে না।

—ও তো আমাদের ভয়ে। হেসে বলল বিলি।

—তবে তো ওরা মানুষ চেনে বোঝা যাচ্ছে। একটু ভেবে বলল রাজা।

—তবে কি এ জঙ্গলে মানুষের আনাগোনা আছে। চিন্তিত ভাবে বলল হামিদুল।

—নিশ্চয়ই আছে। আর সে মানুষ আমাদের মতন সভ্য। কারণ সে নিশ্চয়ই বন্দুক হাতে করে শিকার করে। আর সেই বন্দুকের ভয়েই পাখিগুলো আমাদের দেখেও ভয় পাচ্ছে। বলল রাজা।

—তবে আর ফেরার কথা ভাবা চলবে না। বলল বিলি। সে লোক কে আমাদের জানতে হবে। আর তা যত তাড়াতাড়ি জানা যায় ততই ভাল।

—বেশ তাহলে চল এগোই। সাহস পেয়ে বলল হামিদুল।

—হ্যাঁ। কিন্তু সাবধান। সে মানুষটা যে কেমন তাই বা কে জানে? বিলি বলল

—মনে রেখ তার হাতে বন্দুক আছে। হঠাৎ মুখোমুখি হওয়া ঠিক হবে না।

রাজা বলল বেশ তো এসো আমরা নিঃশব্দে এগোই। কিন্তু কোন দিকে?

—ঠিক দিকেই তো চলেছি আমরা। বিলি জবাব দিল। নদীর ধারে পৌঁছাতে পারলেই অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাবে। আসেপাশে মানুষ থাকলে বোঝা যাবে।

—সেই ভাল। বলল হামিদুল।

ওরা সন্তর্পণে এগোতে লাগল। বড় গাছগুলো ক্রমেই কমছে। শেষ পর্যন্ত ওরা এসে পৌছাল ঘন ঝোপ জঙ্গলের মাঝখানে। পায়ের নিচের মাটিও যেন কেমন ভিজে ভিজে। জায়গায় জায়গায় একটু যেন পিছলও। তাছাড়া এতক্ষণ কোথাও বড় ঘাসের দেখা মেলেনি। এখন একটু দূরে দূরেই বিরাট ঘাসের ঝোপ। যে কোন জন্তুর আস্তানা থাকতে পারে তার মধ্যে।

এই সব ঘন ঝোপ জঙ্গল ভেঙ্গে এগোনোও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। তবুও মুখ বুজে কাঁটার খোঁচা খেয়েও ওরা এগোতে লাগল। বেশ কিছুটা এগোতেই কানে এল জলের শব্দ। কাছেই কোথাও যেন এক ঘেঁয়ে ভাবে প্রচণ্ড স্রোতে জল বয়ে চলেছে উৎসাহে রাজা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—নদী।

তখনি যেন মন্ত্রবলে সামনের সব ঝোপ জঙ্গল মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঢালু কাদামাটির পাড়ের সামনে এসে ওরা থমকে দাঁড়াল।

সামনে দিয়ে একে বেঁকে বয়ে গেছে নদী। প্রচণ্ড জলের স্রোত তাতে। নদীর এপারে ঘন জঙ্গল ওপারেও জঙ্গল। সে জঙ্গলের শেষে মাইল কয়েক দূরে, আকাশ ছোঁওয়া লম্বা সারি পাহাড়ের দেওয়াল মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। যতদূর দেখা যায় পাহাড় পাহাড়। নদীর এপার ওপার কোন পারেই কোথাও মানুষের বাসের কোন চিহ্ন নেই।

—না একটু ধোঁয়া বা না একখানা ঘর। চারদিকে ছড়িয়ে শুধু গাছের ভিড়। হতাশ হল ওরা। গভীর ঘন জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বোকা বনে গিয়ে রাজা বলল

যাঃ আমরা যে একটা বন্দুকওয়ালার কথা ভাবছিলাম সে গেল কোথায়? এযে দেখছি শুধুই পাহাড় আর জঙ্গল। সব খাটুনি বাজে হল। যাঃ।

বিলি বলল, না তা কেন। এই যে এত সুন্দর জায়গায় আমরা আসতে পারলাম তাও কি কম। তবে হ্যাঁ যা চাইছিলাম এ তা নয়।

হামিদুল বলল—ও সব কথা যাক্। নদীর স্রোত দেখে মনে হচ্ছে এ নদী ঐ কাছের পাহাড় থেকেই বার হয়েছে। পাড় ধরে এগোলে আমরা পাহাড়ে পৌঁছাব।

—তাতে লাভ? বিলি জিজ্ঞাসা করল।

—যদি পাহাড়ে ওঠা যেত তো বুঝতে পারতাম আমরা কোথায় আছি। কাছে কোথাও কোন লোকের বাড়ি আছে কিনা।

—চল, যাবে পাহাড়ে? ব্যস্ত হয়ে রাজা বলল।

—না। বাধা দিল বিলি। মনে রেখ টম বলেছে প্লেন ছেড়ে বেশী দূরে যাওয়া চলবে না। তাছাড়া এ জঙ্গলে মানুষ না থাকলেও যে ভয়ঙ্কর সব জন্তুরা নেই তার তো কোন প্রমাণ পাইনি এখনো। আর কিছু করার নেই এখন আমাদের। চল আমরা ফিরি।

—কিন্তু একথা তো ঠিক একটা ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে পড়েছি আমরা। রাজা বলল।

হ্যাঁ তাতে কি?

—এ জঙ্গলের মধ্যে আমাদের কেউ আর খুঁজে পাবে না। এখান থেকে যেতে গেলে পথ আমাদেরই খুঁজে বার করতে হবে। আর তা করতে গেলে তো ঐ পাহাড়ে উঠতে হবে।

রাজার একথা শুনে বিলি আর হামিদুল মাথা নিচু করল। সত্যি বলতে কি এই ভীষণ জঙ্গল দেখে ওদের ও মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। ওরাও ভাবছিল এ জঙ্গলে কেউ ওদের খুঁজে পাবে কি না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হামিদুল বলল

—যদি তুমি যেতে বল বিলি আমি ঐ পাহাড়ে যাব। কারণ তার ফল হয়ত ভাল হবে, আমাদের সঙ্গের আহতরা কম কষ্ট পাবে। কিন্তু ফিরতে দেরী হলে তো সবাই ভাববে! তার থেকে চল আমরা এখুনি যাই। ফিরে গিয়ে সবার সাথে পরামর্শ করে তারপর যা হয় করব।

কথাটা মন্দ লাগল না বিলির। রাজাও বলল।

—সেই ভাল। চল তাহলে তাড়াতাড়ি ফিরি।

আবার কাঁটার খোঁচা খেতে খেতে ওরা ফিরতে সুরু করল। সবার আগে রাজা। মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ও গাছের গায়ে খোদাই করা পথের নিশানা দেখে নিয়ে পথ ঠিক করতে লাগল। গভীর জঙ্গলে নিশানা খুঁজতে ও যেন হিমসিম খেয়ে গেল। নিশানার দিকে চোখ রাখতে রাখতে বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছে হঠাৎ খেয়াল হল বিলি আর হামিদুলের গলার আওয়াজ তো আর শোনা যাচ্ছে না। এমন কি শুকনো পাতার উপরে পায়ের শব্দও থেমেছে। ফিরে দাড়িয়ে রাজা ডাকল—হামিদুলদা। তোমরা কোথায়?

লক্ষ্য করল ওর ডাকে ডানদিকে একটু দূরের একটা ঝোপের ডালপালা গুলো হঠাৎ নড়তে আরম্ভ করল। শুকনো পাতা মাড়ানর আওয়াজও উঠল। মনে মনে ও ভাবল এ কেমন ব্যাপার। ওরা এমন লুকোচুরি খেলছে কেন! এখন কি এসব করার সময়? বেশ লোক তো ওরা!

—একি করছ তোমরা? বেশ রাগ করেই ও বলল। বলে দুপা এগিয়েই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল ওর। ঝোপের ভিতরে সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যু। —একটা বিরাট গুল বাঘ! জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে ওর দিকে তাকিয়ে তার ল্যাজের ডগা নাড়ছে।

নিজের হাতের গাছের ডালটার দিকে একবার তাকিয়ে অসহায়ের মতন দাঁড়িয়ে রইল রাজা। এক সেকেণ্ড—দু সেকেণ্ড। হঠাৎ ওর কানের কাছে প্রচণ্ড শব্দে কি যেন ফেটে পড়ল। থর থর করে সারা শরীর ওর কেঁপে উঠল। কোন মতে নিজেকে সামলে নিয়ে অবাক হয়ে দেখল ও গুল বাঘটা মাটির উপরে আস্তে লুটিয়ে পড়ল।

চট্ করে একটা কথাই মনে হল ওর—বন্দুক!! বন্দুকের আওয়াজ শুনেছে ও। তবে কি সেই বন্দুক ওয়ালার দেখা পেয়েছে ও? দূরে হামিদুল আর বিলির গলা শোনা গেল। প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে ওরা। বোধ হয় ছুটছেও, ওদের চিৎকার তাই ক্রমে কাছেই আসতে লাগল।

—কোথায় তুমি রাজা? কোন দিকে?

কোন উত্তর দেবার আগেই কে যেন পিছন থেকে বলে উঠল। এই হতভাগা, নড়বে না বলছি। নড়লেই মাথার খুলি উড়িয়ে দেব তোর। হাতে অস্ত্র থাকলে ফেলে দে মাটিতে। হাত তোল মাথার উপরে। অবাক হয়ে রাজা ভাবল এই তাহলে সেই বন্দুকওয়ালা! যাকে ওরা খুঁজে মরছে।

খুঁজেও পাওয়া গিয়েছে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এ কেমন ধরনের কথা লোকটার? কেউকি এমন করে কথা বলতে পারে!

—হতভাগা কথা কানে গেল না তোর! মরবি?

এমন কুৎসিত গলার শব্দ কারও হয় নাকি! কেমন যেন ঘাবড়ে গেল রাজা। লোকটা তো ঠাট্টা করছে না। বাপ্‌রে, এ আবার কেমন লোক? ডাকাত নয়তো? ভয়ে ও আস্তে আস্তে মাথার উপরে তুহাত তুলল। ভাবল একবার চেঁচিয়ে ওদেরও সাবধান করে দেয়। কিন্তু ভয়ে গলা দিয়ে আর কোন কথা বার হলনা।

এইতো বাবা কথা কানে গিয়েছে! এখন চাঁদ আস্তে ঘুরে দাঁড়াওতো দেখি। পিছনের লোকটা কথা-গুলো বিচ্ছিরিভাবে বলে হেসে উঠল। ভয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে দাড়াল রাজা। বুক ওর তখন কাঁপছিল। ভেবেছিল একটা ভীষণ কাউকে দেখতে পাবে। আসল ডাকাত! ইয়া গোঁফ্‌ ইয়া দাড়ি। লাল টকটকে চোখ! হতাশ হল ও। এই লোকটা ডাকাত! এতো মনে হচ্ছে জন্ম থেকেই পেট ভরে খেতে পায় না। তাহোক, লোকটার চোখ তুটো লাল না হলেও কি বিশ্রী। তার থেকেও বিশ্রী ওর গলা। নাঃ লোকটা মোটেই ভাল নয়।

—তুই! অবাক লোকটা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। তুই এতটুকু পুঁচকে ছেলে এখানে কি করছিস!

গলা শুকিয়ে ততক্ষণে কাঠ হয়ে গেছে। তবুও চুপ করে থাকলে যে এমন ভয়ঙ্কর লোকের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না তা বুঝল রাজা। যা-হোক বুদ্ধি করে কিছু বললে হয়ত ও ছাড়া পেতে পারে। তুবার ঢোক গিলে উত্তর দিল রাজা—আমি? আমি হারিয়ে গেছি।

—হারিয়ে গেছিস! লোকটা কেমন করে যেন ওর মুখের দিকে তাকাল। তুই এলি কোথা থেকে?

—ঝড়ে প্লেন ভেঙ্গে পড়েছে জঙ্গলে, ঐ প্লেনে আমি ছিলাম। কোন মতে কথাগুলো বলল রাজা। কপাল বেয়ে তখন ওর ঘাম ঝরছে।

খুব সাবধানে কথা বলতে হবে। মনে মনে ও নিজেকে বারবার সাবধান করতে লাগল। নইলে এ লোকটা হয়ত ভীষণ কিছু খারাপ কাজ করে বসতে পারে। বুঝে সুঝে কথার উত্তর দিতে হবে।

—তুই একাই বেঁচেছিস! না আরও কেউ আছে? ধমকে জিজ্ঞাসা করল লোকটা।

একটু থেমে ঢোক গিলে রাজা বলল—আমি আর আরও তুজন ছেলে শুধু বেঁচেছি। আর কেউ বাঁচে নি।

—লোকটা একথা শুনে হঠাৎ তুপা এগিয়ে এসে হাতের বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে ওর তু কাঁধ ধরে ভীষণ ভাবে নাড়া দিতে স্বরু করল।—তুই মিথ্যা বলছিস না তো?

—না। ঝাঁকানির চোটে তখন ওর প্রাণ যাবার উপক্রম্ তবুও অনেক সাহস করে উত্তর দিল রাজা। এখন এ মিথ্যা কথা না বললে লোকটা যদি অন্ত সবারও কিছু ক্ষতি করে। তবে! ও যে ডাকাত তাতে তো কোন সন্দেহ নেই!

—আমি কাল রাতে আওয়াজ আর আগুন দেখে তাই বুঝেছি। —যাক্ বাঁচা গেল। বলেই লোকটা ওর কাঁধের বন্দুক হাতে তুলে নিল। তু'চার পা পিছিয়ে গিয়ে বলল—তবে তুইই বা আর বেঁচে থাকিস কেন? তোকেও খতম করে দিই। তারপর দেখা পেলে তোর তু বন্ধুকেও—! প্লেনের যা কিছু সব লুট করতে হবে।—বলেই হাতের বন্দুক যেই কাঁধে তুলতে যাবে তখুনি ওর পিছন থেকে এক সাথে ওর পিঠের উপরে লাফিয়ে পড়ল বিল্লি

আর হামিদুল। ওদের এই আচমকা ধাক্কায় লোকটার হাতের বন্দুকে আওয়াজ হয়ে গেল। লোকটাও একটা বিশ্রী রকম আওয়াজ করে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বন্দুকটা ওর ছিটকে পড়ে গেল দূরে। এক লাফে সে বন্দুক হাতে তুলে নিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বিলি বলল।

—এবারে, শয়তান? তুমি নড়লে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। —একটুও মিথ্যা বলছি না।

লোকটা যেন ওকথা শুনতেই পেল না। কপালটা ফুলে আলু হয়ে গেছে। সেখানে হাত বোলাতে বোলাতে উঠে বসল।

—নড়বে না বলছি। ধমকে উঠল হামিদুল।

—খবরদার। উল্টে লোকটাই চেঁচিয়ে উঠল। —বন্দুক দিয়ে দাও বলছি। দাও। দিলে? সত্যি লোকটা উঠেই দাঁড়াল।

হামিদুল রাজাকে ততক্ষণে টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বিলির পিছন দিকে। —বলল—না বিলি দিও না বন্দুক। দিও না। দেখছ না ও শয়তান।

এসব কথা শুনে লোকটা কিন্তু একটুও রাগ করল না। মাটি থেকে টুপিটা তুলে মাথায় পরতে পরতে বলল—কিন্তু কি করবে ও বন্দুক দিয়ে তোমরা? ওটা তো খেলনা নয়। তাছাড়া ওতে গুলিও নেই। কথাগুলো বলে লোকটা দাঁত বার করে হেসে যেন সহজ হতে চেষ্টা করল। দাও, দিয়ে দাও বন্দুক। বুঝলে হে লক্ষ্মী ছেলেরা।

—না। ভীষণ চেঁচিয়ে বলল বিলি। তুমি আর এগোলে কিন্তু তোমাকে গুলি করব। শেষবার বলছি।

থমকে দাঁড়াল লোকটা। কিন্তু ওতে তো গুলি ভরা নেই!

লোকটা কথা শেষ করেছে কি করে নি হঠাৎ বিলির হাতের বন্দুক গর্জে উঠল। লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে একলাফে পাশে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল।

—গুলি আছে কিনা দেখলে? বিলি বলল। এটা যে রাইফেল তা আমি জানি।

—বেশ কি করতে চাও আমাকে নিয়ে তোমরা এখন? শান্ত গলায় লোকটা জিজ্ঞাসা করল। ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল ও।

ব্যস্ত হয়ে হামিদুল বলল—যে আমাদের বন্ধুকে খতম করতে চায় বিনা কারণে—তাকে আমরা বন্দী করব। করে নিয়ে যাব আমাদের ক্যাপ্টেনের কাছে। তারপর সবাই মিলে যা করবার করব।

লোকটা অবাক হল—বলল। ক্যাপ্টেন? সবাই মিলে! তাহলে কি তোমরা ছাড়াও আরও কেউ আছে নাকি? কোথায় তারা—প্লেনে?

—সে দেখব পরে। বলল বিলি।—এখন এগোও মাথার উপরে হাত তুলে আগে আগে। যেদিকে যেতে বলব, যাবে। এগোও।

—বেশ, যো হুকুম। বলে লোকটা দুহাত তুলে ঘুরে দাঁড়াল। —কোন দিকে এগোবো?

—সোজা সামনের দিকে। হুকুম দিল রাজা।

—বেশ তাই সই। লোকটা হাঁটতে সুরু করল। —তোমরাও সঙ্গে আসছ তো?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই! উত্তর দিল বিলি।

হ্যাঁ সঙ্গেই থেকো, এ জঙ্গলে বড় বাঘের ভয়। তোমরা দুজনে দেখনি—এই এখুনি কি ভীষণ একটা বাঘ

মারলাম আমি। জিজ্ঞাসা কর না কেন তোমাদের ঐ ছোট্ট বন্ধুকে।

—হ্যাঁ সে কথা ঠিক। বলল রাজা—কিন্তু ওকথা আবার বলে তুমি কি আমাদের ভয় দেখাচ্ছ নাকি। ওতে আমরা ভয় পাব না আর।

—সে তো ভাল কথা—হেসে বলল লোকটা। —তা তোমাদের কার কি নাম—শুনি?

—কেন বলব? ধমকে উঠল রাজা।—তুমি বন্দী—তুমি চুপ করে থাকবে।

—বলবে না! বেশ।—আমার নাম গ্রাটেনকো। কি সুন্দর নাম বলতো? তবে আমি ডাকাত গ্রাটেনকো। আমাকে জ্যান্ত ধরতে পারলে সরকার তোমাদের অনেক টাকা পুরস্কার দেবে। বুঝলে খুদে সেপাইরা? হো হো করে ভীষণ ভাবে হেসে উঠল ডাকাত গ্রাটেনকো ওর নিজের রসিকতায়।

খবরদার, ঠাট্টা করবে না বলছি। আবারও ধমকে উঠল রাজা। হাসি থামিয়ে বলল গ্রাটেনকো—ঠাট্টা তোমরা বোঝ নাকি? কচু বোঝ। তোমরা এক একটি নিরেট গরু।

—চুপ। এবার ধমকে উঠল বিলি। কি হচ্ছে এসব।

—কচু, কচু, বোঝ তোমরা। নইলে বাঘের মুখ থেকে যাকে বাঁচালাম তাকে কিনা খতম করে দেব ভাবলে! বিশ্বাস করলে সে ডাকাত। লোকটা আবারও হো হো করে হেসে উঠল।—আসলে আমি তোমাদের ভয় দেখাচ্ছিলাম। এটা বুঝলে না?

কেমন যেন ঘাবড়ে গেল বিলি। বোকার মতন চাইল হামিদুলের দিকে। হামিদুলও মাথা চুলকাতে সুরু করল।

—খবরদার। ধমকে উঠল রাজা। তোমার ঐ পচা ঠাট্টা গাধাতেও বুঝতে পারবে। এখন এগোও হাত তুলে বলছি। এগোও।

লোকটা রাজাকে মুখ ভেংচে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। আর চেঁচাতে লাগল। উপকার করে ভারি লাভ হল তো আমার।

তুমি বন্দুক ছুঁড়তে জান? হামিদুলকে জিজ্ঞাসা করল বিলি চুপিচুপি।

না জানি না। ভয়ে ভয়ে খুব চাপা গলায় উত্তর দিল হামিদুল।

—তাহলে এ রাইফেল্ আমার কাছে থাক। বলল বিলি। তুমি আর রাজা একটু পিছিয়ে থাক। আমি বন্দুক ছুঁড়তে পারি বটে তবে তেমন টিপ নেই আমার হাতে।

তাহলে কি হবে? ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করল রাজা। যদি লোকটা তেড়ে আসে?

—গুলি চালাব। আওয়াজেই থামবে লোকটা।

নিজের হাতের গাছের ডালটা বাগিয়ে ধরল রাজা। হামিদুল তুলল সেটা কাঁধে। তারাও সবাই তখন এগিয়ে চলল বন্দীর পিছন পিছন।

—এবারে কোন দিকে যাব? হঠাৎ সামনে থেকে ডাকাতটা জিজ্ঞাসা করল।—ডাইনে না বাঁয়ে? না যাব সোজা?—

তাড়াতাড়ি গাছের গায়ে কাটা দাগ দেখে রাজা বলল—এখনও সামনেই চল। এই কাটা চিহ্ন দেখে দেখে।—চিহ্ন যেখানে ঘুরবে তুমিও ঘুরবে।—মনে থাকে যেন।—

—বেশ। বেশ। নিজের মাথার উপরে দু হাত চাপিয়ে দিয়ে হঠাৎ লোকটা গুনগুন করে গান ধরল। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে নতুন ভাঙ্গা ডাল পালা আর গাছের গায়ের কাটা দাগ দেখে পথ ঠিক করতে লাগল।

ওরা বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছে এমন সময় লোকটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এক জায়গায়।

অনেকক্ষণ কুয়াশা কেটে গিয়েছে। চার পাশের অনেক দূর পর্যন্ত জঙ্গল এখন দেখা যাচ্ছে।—

সেই গভীর জঙ্গলের একদিকে তাকিয়ে লোকটা যেন থমকে গেল। বিলিদের দৃষ্টি এতক্ষণ ঐ ডাকাতের দিকেই ছিল। ওকে অমন করে থামতে দেখে ওরাও থমকে দাঁড়াল। ব্যাপার কি! লোকটা কি কোন চালাকি করছে নাকি? হাতের বন্দুক বাগিয়ে ধরে দাঁড়াল বিলি।—এ কি ওর চালাকি! না সত্যি কোন বিপদের ইঙ্গিত? হামিদুল যখন ওর কাঁধের উপরে হাত রাখল ততক্ষণে ও নিজেও দেখতে পেয়েছে ব্যাপারটা।—দূরে একটা বড় গাছের পাশ দিয়ে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসছে ক্যাপ্টেন, সঙ্গে টম। দূর থেকে ওরাও বোধ হয় এদের দেখতে পেয়েছে মনে হল। নইলে হঠাৎ ওরাই বা অমন করে দাঁড়িয়ে পড়বে কেন! হ্যাঁ তাই। তার পরেই ক্যাপটেন আর টম দৌড়াতে সুরু করল। তাই দেখে ব্যস্ত হয়ে রাজাও একটু এগিয়ে গেল ছুটে। তারপর চেঁচিয়ে বলল—এ পাশ দিয়ে এসো তোমরা সাবধানে।—বন্দীর কাছে যেওনা কিন্তু—।

হাঁপাতে হাঁপাতে ওরা কাছে এসে দাঁড়াল।

ওদের দুচোখ ভরা বিস্ময়।—কোনমতে দম ধরেই ক্যাপটেন বলল—তোমরা কেমন আছ সকলে আগে তাই বল। তারপর বল এ কে!—

কোন কথার কেউ কিছু জবাব দেবার আগেই চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো।

—আমি ডাকাত গ্রাটেনকো। আমার মাথার দাম তিনলাখ। ওদের কিস্সু হয় নি। দেখছ না আমিই বন্দী।—

—সত্যি তোমাদের কিছু হয় নি তো? টম জিজ্ঞাসা করল। দু দুটো গুলির আওয়াজ শুনে আমরা যা ঘাবড়ে গেছিলাম।

—না আমরা ভাল আছি। বলল বিলি—তবে হ্যাঁ আজ রাজার দিনটা খুব ভাল বলতে হবে। তিন তিনবার মরতে মরতে বেঁচে গেল ও।

—সেকি? অবাক হয়ে বলল ক্যাপটেন।

তখন বিলি ওদের—সব কথা খুলে বলল। বিলি থামতেই গ্রাটেনকো চেঁচাতে সুরু করল। সব মিথ্যা কথা। সব মিথ্যা কথা। ও যা বলছে তার সবটুকু মিথ্যা।

—তুমি কি বলতে চাও? গম্ভীর ভাবে ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করল।

—তুমি এদের ক্যাপটেন? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার কিছু বুদ্ধি আছে। আমার কথা শুনলেই তুমি সত্যি মিথ্যা বুঝতে পারবে। আমার কথাও শোনা হোক।

—বেশ বল তুমি কি বলতে চাও।

—কাল রাতে প্লেন পড়ার আওয়াজ আমি পেয়েছিলাম।—আজ সকালে তাই খুঁজতে বার হয়েছিলাম যদি কেউ বাঁচে তাদের সাহায্য করব বলে। পথে হঠাৎ দেখি তোমাদের ঐ পুঁচকে বন্ধুর সামনে দাড়িয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যু গুল বাঘ। গ্রাটেনকো ছাড়া একগুলিতে তাকে খতম করত কে?—তবে হ্যাঁ তোমাদের পুঁচকে বন্ধুকে আমি মিথ্যা কিছু ভয় দেখিয়ে ছিলাম মজা করব বলে। ব্যাস তাই সত্যি ভেবে পিছন থেকে ওই ওরা দুজন আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে আমাকে বন্দী করেছে। তুমিই বলত—আমার যদি বদ মতলব থাকবে তবে আমি কেন ওকে বাঘের হাত থেকে বাঁচাব।—এখন আমার বন্দুক আমাকে ফেরত দেওয়া হোক। এ জঙ্গলে আর কিছু না থাক বাঘের উপদ্রব খুব বেশী যে—আর তোমার ঐ ওর হাতের যা টিপ বাঘ এলে উনি টিপ করে সত্যি মানুষই খুন

করবেন আগে।—

ওর কথা শুনে ভীষণ ভাবনায় পড়ল ক্যাপটেন। লোকটা কে? এলো কোথা থেকে? যা বলছে তার কতটুকুই বা সত্যি!

কোন কথাই জানে না রাণা। তবে এও ঠিক—ওকে ওরা যখন বন্দী করেছে তখন লোকটা যে বদ তাতে কোন সন্দেহ নেই। এদেশ এ জঙ্গল সম্বন্ধে কোন কিছুই জানে না ও জানেনা লোকটারই বা কি মতলব। একে নিয়ে এখন কি করা যায়! সবার মুখের দিকে এক এক করে তাকিয়ে দেখল ও। না—এ বিষয়ে কারও কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য পাওয়া যাবে না। সবারই বুদ্ধি যেন কেমন জট পাকিয়ে গেছে।—যা করতে হবে তা নিজেকেই করতে হবে।—বিলি যা বলেছে—সে সব কথার পর লোকটাকে এতটুকুও বিশ্বাস করা বোধ হয় ঠিক হবে না।

স্পষ্ট করে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে ও বলল—দেখ। তোমাকে যখন আমরা ভাল করে চিনি না। আর যখন তুমি নিজেই বলেছো আমাদের সবাইকে মেরে ফেলে প্লেনটা লুট করবে—তখন তোমার বন্দুক আমি তোমাকে ফেরত দেব না। তবে তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে তুমি আমাদের বন্ধুকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়েছো।—আমরা তোমার সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করব না—যদি তুমি নিজে তা না কর!

ক্যাপ্টেনের উত্তর শুনে গ্রাটেনকো বিশ্রীভাবে গর্জন করে উঠল।

রাজা বলল—তুমি ভাল লোক তো অমন বিশ্রীভাবে চেঁচাচ্ছ কেন। অমন করে কি মানুষে চেঁচাতে পারে?

—খুদে শয়তানের দল—দাঁত খিঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো—আমার বন্দুক আমাকে দেবেন না। এ্যাঃ—এক এক ঘুঁসিতে সবকটার মুণ্ডু আমি ঘুরিয়ে দেব তবেই বুঝবেন বাছাধনেরা কার সাথে লাগতে এসেছেন।

—খবরদার। চেঁচিয়ে উঠল বিলি।—মনে রেখ তোমার রাইফেলে এখনও তিনটে গুলি ভরা আছে। আর আমার টিপ যত খারাপ ভাবছ তত খারাপ নাও হতে পারে। তার থেকে মেনে নাও না ক্যাপ্টেনের কথাটা। তুমিও কিছু করবে না—আমরাও কিছু বলব না।—আমরা তো এখানে চিরকাল থাকতে আসিনি। যাব যখন—তোমরা রাইফেল ফেরত দেব।

চেঁচানো থামাল গ্রাটেনকো। ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল—ফিরে যাবে তোমরা? কেমন করে?

—বাঃ—আমাদের খুঁজতে লোক আসবে না? তারা এলেই তো আমরা ফিরে যাব।

—লোক আসবে—কোথা থেকে?—ব্যস্ত হয়ে গ্রাটেনকো আবারও জিজ্ঞাসা করল।

—কেন টান্টামোরা থেকে। আমরা সবাই তো টান্টামোরা রিপাবলিকের অতিথি। যাচ্ছি সেখানে স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিতে।

—সর্বনাশ। চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো। আমার মাথায় নিশ্চয়ই গোবর পোরা। সারারাত এই সহজ কথাটাকে ভাবিনি। সর্বনাশ! সর্বনাশ!!

টম্ কারপেন্টার এতক্ষণ চুপ করে ছিল এখন বলল—কেন তাতে তোমার ক্ষতি কিসে?

—সে তুমি বুঝবে না। যাক্। একটা কথা বলব—আমার রাইফেলটা দিয়ে দাও আমি এ তল্লাট ছেড়ে চলে যাব কথা দিচ্ছি। আর তোমাদের বিরক্ত করব না। দেবে? দাও।

—না। স্পষ্ট করে বলল—টম। তুমি এখন আমাদের সাথে যাবে প্লেনের কাছে। আমাদের খোঁজ করতে যারা আসবে—তারা এলে তবে তোমার রাইফেল ফেরত পাবে। ততক্ষণ তুমি বন্দী।

—বন্দী ? চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো। বলে কি!! কালকের এক পুঁচ্‌কে ছোঁড়া। গ্রাটেনকো বন্দী! অমন যে অমন শক্ত প্রেসিডেন্ট ব্রোকেনসিল সেও পারলো না আমাকে বন্দী করতে আর তাই করবে কিনা এই পুঁচ্‌কে ছোঁড়াগুলো।…চেঁচানো থামল ওর বিলির হাতের বন্দুকটার দিকে হঠাৎ নজর পড়াতে—আচ্ছা আমিও দেখে নেব। আমিও ছাড়ব না। মওকা আমিও পাব।…বলে ও চুপ করল।

ক্যাপ্টেন হুকুম করল—চল এগোনো যাক—প্লেনে সবাই নিশ্চয়ই খুব ভাবছে এতক্ষণ।

ওরা সবাই আবার হাঁটতে শুরু করল। সবার আগে গ্রাটেনকো। তার দুহাত মাথার উপরে। তার ঠিক কিছু পিছনেই রাজা। ও মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে ওর পথের নিশানাগুলো দেখছে। তার পর বিলি—তার হাতে রাইফেল। বাদ বাকিরা তারপর।

কুয়াশাও ততক্ষণে একেবারে কেটে গিয়েছে।—তবে মাথার উপরে আকাশ ছোঁওয়া গাছের জট থাকাতে আকাশ আর ওরা দেখতে পারছে না। মাঝে মাঝে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলোর ঝিলিক আসছে।

চলছে ওরা। কারও মুখে কোন কথা নেই। সবাই ভাবছে বোধ হয় গ্রাটেনকোর কথা।—নিজেদের এই বিপদের উপরে এ আবার কি ঝঞ্ঝাট। সারাক্ষণ ওকে পাহারা দেওয়াও তো কম কথা নয়।

রাতের বৃষ্টিতে জমির উপরের ঝরা পাতার গাদা ভিজে জ্যাব জ্যাবে হয়ে রয়েছে।—প্যাচ প্যাচেও জায়গায় জায়গায়। জোরে চলতে চেষ্টা করেও চলতে পারছে না ওরা।—একঘেঁয়ে চলার শব্দই সুধু উঠছে। থেকে থেকে রাজা শুধু গম্ভীর ভাবে হাঁকছে।

—এবারে ডাইনে…। এবারে বাঁয়ে। ঐ বড়গাছটার পাশ দিয়ে।—এখন সোজা—তাই শুনেই সবাই চলছে।

একবার হঠাৎ ওর ডাকের মাঝখানে গ্রাটেনকো চেঁচিয়ে উঠল—এই ও। চুপ।

ওর ঐ পিলে চমকানো চিৎকারে সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যাপার কি!

গ্রাটেনকো কানের পিছনে দু হাত রেখে তন্ময় হয়ে কি যেন শুনতে লাগল।—একবার এপাশ ফিরল আর একবার ওপাশ—শেষকালে কিছুক্ষণ আকাশের দিকে মুখ উঁচু করে রইল। ততক্ষণে টম-এর কানেও আওয়াজটা ধরা পড়ল।—কোন সন্দেহ নেই—দূরে আকাশ দিয়ে উড়ে আসছে অন্তত কম করে গোটা দুই প্লেন বা হেলিকপ্‌টার। একটু মন দিয়ে শব্দটা শুনল ও। তারপর ক্যাপ্টেনের কাঁধের উপরে হাত রেখে বলল—শুনতে পাচ্ছ ক্যাপ্টেন ?

—হ্যাঁ পাচ্ছি। আস্তে উত্তর দিল ক্যাপ্টেন রাণা।

—ওরা এসে গিয়েছে।

—হ্যাঁ তাইতো মনে হচ্ছে।

—এখন আমাদের তাড়াতাড়ি ফেরা উচিত প্লেনের কাছে।

শব্দ ততক্ষণে বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।—আওয়াজ কানে যেতেই—রাজা লাফিয়ে উঠল।

—প্লেন—প্লেন। ক্যাপ্টেনদা—প্লেন। নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজতে এসেছে।

—হ্যাঁ—কিন্তু এ ভীষণ জঙ্গলে কি করে আমাদের খুঁজে পাবে।—হতাশভাবে বলল হামিদুল।

—আমি কি বন্দুকের আওয়াজ করব। ওরা শুনতে পাবে।—ব্যস্ত হয়ে বিলি বলল।

—মন্দ কথা নয়।—টম বলল—। কিন্তু এখন নয়। এখন চল তাড়াতাড়ি প্লেনের অন্য সবার কাছে। শব্দ

কাছে এলে তবে আওয়াজ করবে।

—আমরা আর কতদূরে আছি ?—রাণা জিজ্ঞাসা করল।—আমরা পথ হারাইনি তো ?—

—না।—কখনই না।—বলল রাজা।—আমরা এসেও গিয়েছি বলে মনে হচ্ছে।

—তবে চল, তাড়াতাড়ি চল। হুকুম দিল রাণা চলতে সুরু করেই—থমকে দাঁড়াল সকলে কি সর্বনাশ—সেই লোকটা কই ? ডাকাত গ্রাটেনকো !

—বন্দী পালিয়েছে। হতাশ ভাবে বলল বিলি।

—যাক গে। তার চিন্তা আমাদের নয়। বলল টম।

—তাহলে এসো আমরা ছুটতে সুরু করি। শব্দ তো প্রায় কাছে এসে গেল। বলল রাণা।

—হ্যাঁ তাই কর। বলল হামিদুল।

ওরা ছুটতে সুরু করল। জঙ্গল জঙ্গল—কোথাও এতটুকু ফাঁকা নেই। কোথাও আকাশ দেখা যাচ্ছে না। কি হবে তাহলে। সবার মনে ঐ এক চিন্তা।—এক সময়ে মনে হল শব্দ যেন ঠিক মাথার উপরে এসে গিয়েছে।

—থাম।—বলল টম।—বিলি ফায়ার কর। শিগ্‌গির।—শিগ্‌গির।

একটা গাছের গুঁড়ির দিকে লক্ষ্য করে বিলি ফায়ার করল—দুম, দুম,

এবারে ? এবারে কি হবে ? এ শব্দ কি ওরা শুনতে পেয়েছে ?—আওয়াজটা একঘেঁয়ে ভাবে এগিয়ে আসতে লাগল। তারপর একসময়ে ওদের ঠিক মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল অন্য দিকে।—ক্রমে শব্দ যেন কমে আসতে লাগল।—শুনতে পায়নি ওরা। কাঁদ কাঁদ ভাবে বলল হামিদুল।

—এই যে এখানে আমরা। এখানে—শুনতে পাচ্ছ না ? এই যে এখানে।—হঠাৎ আওয়াজের পিছনে ছুটতে ছুটতে চেঁচাতে লাগল রাজা।—চলে যেও না তোমরা। যেও না, যেও না বলছি।

—আর গুলি আছে ? ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল টম।

—হ্যাঁ আছে।—বলল বিলি—

—তবে ফায়ার কর।—ওর কথা শেষ হবার আগেই আওয়াজ হল—দুম।—কিন্তু তবুও শব্দ যেন—দূরেই সরে যেতে লাগল।—

—শুনতেই পায় নি ওরা।—হতাশভাবে আবার বলল—হামিদুল।—তাহলে কি হবে ?

মুহূর্তে নিজেকে শক্ত করল রাণা। না এখন ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। মন খারাপ করার সময় এখন নয়। বলল, মিথ্যা ভাবছ হামিদুল। দেখো ওরা আবার ফিরবে। রাজা, দেখ তো পথ হারালাম নাকি ? চল এগোই আমরা। মনে রেখ ওখানে বড়রা কেউ নেই ! আমাদের তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার।

টম বলল—ঐ শয়তানটার কথাও ভুললে চলবে না। ও যদি আগে প্লেনের কাছে গিয়ে পৌঁছায় তো ভীষণ বিপদ হবে।

বিলি বলল—আর আমার রাইফেলের গুলিও খতম। ও ফিরলে ওকে ঠেকান যাবে না আর কিন্তু।

তার আগে কি ওরা আসবে না ? হামিদুল আকাশের দিকে হাত তুলে দেখাল। ওরা নিশ্চয়ই ফিরবে এখুনি।

রাজা পথের নিশানা ঠিকই দিয়েছিল। আর অল্প এগিয়ে একটা ঢিপি পার হতেই সামনে ওরা দেখতে পেল প্লেনের ধ্বংস স্তূপ। দেখল ওরা রুক্মিনী আর শকুন্তলা বাইরে দাঁড়িয়ে ছটফট করছে। ওরা কাছে আসতেই দুজনে এক সাথে চেঁচিয়ে উঠল—

—প্লেন প্লেন। প্লেনের শব্দ শুনতে পেয়েছো তোমরা।

—শোন শব্দ আবার ফিরে আসছে।

প্লেনগুলো কি ফিরে আসছে !!

সবাই আবার থমকে দাঁড়াল। হ্যাঁ কোন সন্দেহ নেই।

শব্দ আবার ফিরেই আসছে। কাছে। কাছে। আরও কাছে।

শেষ পর্যন্ত শব্দটা যেন মাথার উপরে এসে ঘুরে ঘুরে পাক খেতে লাগল। তারপরেই একটু দূরের গাছ-পালার উঁচু ডালপালায় যেন কেমন একটা শব্দ উঠল। মড় মড় করে কিছু ছোট ডালপালাও ভাঙল। সপাং করে আওয়াজ হলে দড়ির মাথায় কি যেন সেখানে ঝুলতে লাগল।

প্যারাসুটে করে জিনিস ফেলেছে। চেঁচিয়ে উঠল টম।

ঝপাং-ঝপাং-আরও পরপর কয়েকটা আওয়াজ উঠল। তার পরেই মাথার উপরের শব্দ আবার ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগল।

—এসো আমার সাথে। ডাকল টম। কিন্তু সে ডাক শোনার জন্য কেউই ওখানে ততক্ষণ অপেক্ষা করে ছিল না।

রুক্মিণী আর শকুন্তলা ওদের সবাইকে অমন করে ছুটে যেতে দেখে অবাক হল। প্লেনগুলো যে কিছু ফেলে গিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কি ওগুলো খুবই দরকারি জিনিস ? তবে কি বাইরের পৃথিবীর লোকেরা জানে যে এই ঘোর জঙ্গলের মধ্যে ওরা এখনও বেঁচে আছে। একথা ভাবতেই মনটা খুব খুশিতে ভরে উঠল রুক্মিণীর। তবে আর ভাবনা কেন—আজ নয়তো কাল ঠিক লোকজন আসবে ওদের উদ্ধার করতে। তবে ভাবনা একটু আছে বই কি। তিন তিন জন আহত আছে সঙ্গে। সময় ওদের ক্ষতি করতে পারে।

শকুন্তলা বলল—অতগুলো বন্দুকের আওয়াজ শুনে তো আমি ভয়ে মরি। ভাবলাম বাঘ না ভাল্লুক কিসের মুখে পড়েছে ওরা—যাক্ সবাই ভাল আছে তাহলে।

হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তার উপরে প্লেনগুলোও কি যে ফেলে গিয়েছে সেখানে। নিশ্চয়ই ওষুধ পত্র খাবার দাবার। রুক্মিণী বলল।

—চলো বসে না থেকে তাহলে আমরাও গিয়ে ওদের সাহায্য করি! তাতে কাজ তাড়াতাড়ি হবে।

—সেই ভাল।

ওরা দুজনে গাছের ডাল বেয়ে ঢুকল ভিতরে। মুংলি তখন একটা বিলিতি ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে গুরুদিংকে হাওয়া করছিল। ওদের দুজনকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইলো।

—সব খবরই ভাল। বলল শকুন্তলা। সবাই ভাল আছে। বন্দুকের আওয়াজ যে কেন হল তা বুঝলাম না। তবে সবাই ভাল আছে। আর প্লেন এসে প্যারাসুটে করে অনেক কিছু জিনিস ফেলে গেছে। আমরা যাব ওদের জিনিষ নাবাতে সাহায্য করতে ?

লিজা, প্রিয়া আর শান্তা যাবে না। গম্ভীর ভাবে বলল মুংলি—ওরা খুব ছোট। আর কুণাল তোমারও কাজ আছে অনেক এখানে।

—নিশ্চয়ই, বলল কুণাল। সবাই গেলে চলবে কেন ?

বেশ তবে তোমরা দুজনে যাও। দেখ আগে কোন ওষুধের বাক্স পাও কিনা। পেলেই তা নিয়ে ফিরে

আসবে কিন্তু তোমরা। মনে থাকে যেন।

—আচ্ছা। বলে ওরা দুজনে ব্যস্ত হয়ে গাছের ডাল বেয়ে লাফিয়ে নাবল। ওরা চলে যেতেই একটা ভাঙ্গা সিটের আড়াল থেকে উঠে এল লিজা গোমেজ, প্রিয় রায় আর শান্তা বড়দোলুই। মুংলির কঠিন শাসনে এতক্ষণ ওরা ওখানে শুয়ে বিশ্রাম করছিল। ওদের মধ্যে সব থেকে ছোট লিজা বলল। আমরা এখন কি করব মুংলি দিদি? আমরা তো অনেক বিশ্রাম করেছি।

শান্তা বলল—হ্যাঁ, আমরাও কাজ করব দিদি। আমরাও বড় হয়েছি। অনেক কাজ করব।

প্রিয়া ও শান্তা—বলল। ডাক্তার দিদি তোমার হাত ব্যথা করছে। আমি হাওয়া করব, দাও।

—বেশ, তোমরা তাহলে এখানে এসে বস, লিজা তুমি যাও তনুকা দিদির কাছে বসে গল্প কর। সেই তোমার কাজ। প্রিয়া তুমি যাও রাধারানীর কাছে। শান্তা তুমি যাও আমিনার কাছে। ও খুব ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। ওকে গল্প বলে ভুলিয়ে রাখ গিয়ে।

—সেই ভাল। সেই ভাল। ওরা হৈ হৈ করে যে যার জায়গায় গিয়ে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা জায়গাটা কথায় আর হাসিতে ভরে উঠল। এমন কি আমিনা যে এতক্ষণ ব্যথায় ছটফট করছিল, ব্যথা ভুলে হাসতে লাগল।

—কুণাল—ডাকল মুংলি—

—কি বল। এগিয়ে এল কুণাল।

—তুমি একটু বোস তো গুরুদিতের কাছে। আমি একবার নিচে নামবো। দেখবে সত্যি কোন ওষুধ পত্র পেয়েছে কিনা ওরা। একটা মলম চাই নইলে আমিনার কাটা ঘাগুলো পাকতে পারে।

—বেশ আমি বসছি। তুমি যাও।

মুংলি উঠল। এমার্জেন্সি দরজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যেই অমনি হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকল একটা ভীষণ দেখতে লোক। দুচোখ তার লাল। সমস্ত মুখে কি ভীষণ একটা রাগের ভাব। হাতেও লোকটার একটা অস্ত্র। বোধ হয় স্টেনগান হবে।

ভয় পেয়ে মুংলি বলল—কে তুমি?

লোকটা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—এবারে!

—কি চাও তুমি এখানে? কাঁপা গলায় মুংলি জিজ্ঞাসা করল।

—সেই খুদে শয়তান গুলো কোথায়? কোথায় তারা? গর্জন করে উঠল লোকটা। গ্রাটেনকোকে বন্দী করার মজা এবারে বাছাধনদের বুঝিয়ে দেব। কোথায় তারা?

—কাদের কথা বলছ তুমি?

—এই—ও। ধমকে উঠল গ্রাটেনকো—ন্যাকা সাজছিস? জানিসনা কাকে খুঁজছি? ক্যাপ্টেন। তোদের ক্যাপ্টেন। আর তার দলবল। কোথায় তারা?

—বাইরে গেছে।...

—জাহান্নমে পাঠাবো তাদের। —হা হা হা। বিভৎস ভাবে হাসতে লাগল।—আমি বন্দী......বলে কিনা আমি বন্দী। এবারে কে কাকে বন্দী করে দেখিয়ে দেব।

—কি বলছ তুমি? আমিতো কিছুই বুঝতে পারছিনা না! ভয়ে ভয়ে মুংলি বলল।

—চোপরাও। কাউকে কিছু বুঝতে হবে না। এখন বল—তোরা দলে সব সুদ্ধ কজন আছিস। বল শিগগির।

—আমরাতো পনের জন আর তনুকা দিদি। মোট ষোল জন। একটু সাহস করে মুংলি উত্তর দিল।

—বাপরে ষোল জন। এ যে একপাল ভেড়া।······বেশ তাই সই। সব কটাকেই আমি বন্দী করবো। সব কটাকে।······হাঃ হাঃ হাঃ গ্রাটেনকো এবারে ভেড়ার পাল চরাবে মাজিনকোর জঙ্গলে হাঃ হাঃ হাঃ।

—আমাদের তুমি বন্দী করবে? অবাক হয়ে মুংলি জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু কেন? আর তুমিই বা কে? আমি কিন্তু সত্যি কিছুই বুঝতে পারছিনা।

—বুঝিয়ে দিচ্ছি এখুনি। যা চুপ করে গিয়ে ঐ কোণে বসে থাক। নড়বিতো কুকুরের মতন গুলি করব। আমার নাম গ্রাটেনকো। আমার মাথার দাম তিন লাখ। হাঃ হাঃ হাঃ! কিন্তু প্রেসিডেন্ট ব্রোকেনসিল কি জানে এই ষোলটি বিদেশীর মোট দাম কত? খুব বেশী না হলেও একটা গ্রাটেনকোর পক্ষে অনেক অনেক অনেক। যা যা—গেলি, গিয়ে বসলি ঐ কোণে? গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে কথাগুলো বলে ও থামল।

লোকটার যা ভয়ানক কথাবার্তা। সাহস হল না মুংলির ওর কথা উড়িয়ে দেবার। তাড়াতাড়ি চুপ করে বসল এক কোণে। কি চায় লোকটা! ক্যাপ্টেনকেই বা জানল কেমন করে। আর বন্দী করার কথা মানে কি তার, নাঃ লোকটাকেতো মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছে না। ওর কোন কথা তো ভাল করে বোঝাই যাচ্ছে না কিন্তু কি করা উচিত এখন···একা বসে বসে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারল না মুংলি। তাকিয়ে দেখল লোকটাও যেন কি ভাবছে মাথা নিচু করে। হাতের গানটার মুখও নিচু করা। দু তিন মিনিট এমনি করেই কেটে গেল তারপর নিজের সমস্ত শরীরটাকে একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে যেন আবার জেগে উঠল লোকটা। এই। কেউ নড়বিনা। কেউনা। বলে নিজেই এগিয়ে এল ভিতরের দিকে যেখানে অন্য সকলে বসে আছে। ভয়ে অন্য সকলের মুখের কথাতো আগেই বন্ধ হয়েছিল এ চিৎকারে সবার মুখ ফ্যাকাসেও হয়ে গেল।

তনুকা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল লোকের দিকে। লোকটা কিন্তু এসব ভ্রূক্ষেপ না করেই এসে থামল কুণালের কাছে।

—তুই? তুই কি করছিস্ এখানে? কি করছিস?

—এদের দেখা শোনা করছি। ঢোল গিলে উত্তর দিল কুণাল।—এটাই এখন আমার ডিউটি।—

—এরা সব কটা শুয়ে কেন?

—এরা আহত।—এক্সিডেন্টে এদের চোট লেগেছে।

—অত কথা বুঝি না।—বল—এরা হাঁটতে পারবে তো? না যদি পারে তবে ভাল হবে না বলছি।—

—না, বোধ হয় এরা হাঁটতে পারবে না। ভয়ে ভয়ে কুণাল বলল।

—আঃ, তাহলে সেই আমাকে হাত নোংরাই করতে হবে। ছুঁচো মেরে হাত নোংরা। বেশ তাই করব আমি। দরকার পড়লে তাই করব। ঐ কটার জন্য তো আমি আর ধরা পড়তে পারব না।

ওর কথা শেষ হবার আগেই বাইরে অনেকের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। বেশ আনন্দে কথা বলতে বলতে আসছে ওরা। ওদের সে কথা শুনেই চাপা গলায় গর্জে উঠল গ্রাটেনকো চুপ, সবাই চুপ। কেউ কোন রকম কথা বলেছিস তো শেষ করে ফেলব।

কথা বলার মত সাহস অবশ্য কারও ছিল না। দরজার ঠিক পাশে গিয়ে প্লেনের ভাঙা দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল গ্রাটেনকো হাতের স্টেনগানটা বাগিয়ে। দরজা দিয়ে প্রথমেই ঢুকল হামিদুল; পিঠে এক বিরাট

বোঝা নিয়ে। কোন মতে সে বোঝা বয়ে ও উঠে এলো উপরে। তার পরেই ঢুকল রাজা। তারপর বিলি আর টম। সবার শেষে রাণা। ওরা যখন ওদের পিঠের বোঝা নাবিয়ে তা গুছিয়ে রাখতেই ব্যস্ত। তখন হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকল—শকুন্তলা আর রুক্মিনী। ঢুকেই দেখল সকলেই যেন কেমন চুপ করে বসে আছে। নজরে পড়ল মুংলিও তার নিজের জায়গায় বসে নেই। ব্যাপার কি! ব্যস্ত হয়ে রুক্মিনী জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে মুংলি?—তোমরা এমন করে বসে আছ যে? জিজ্ঞাসা করল শকুন্তলা। হাতের জিনিস থেকে মুখ তুলে রাণা বলল, হয়েছে কি? সবাই ভাল তো?

—না ভাল নয়। মুংলি কোন জবাব দেবার আগেই চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো এবারে! হাতের স্টেনগানটা ও তুলে ধরে আবার সেই বীভৎস হাসি হাসল। এ অস্ত্রটাও যে আমার কাছে থাকতে পারে ভাবিস নি তো! জানবি কেমন করে। পথে বার হলে এদুটো অস্ত্রই আমি সব সময়ে সঙ্গে রাখি বিপদের ভয়ে।

সবাই স্তম্ভিত। অনেকক্ষণ কারও মুখে কোন কথাই যোগালো না। তারপর সবাইকে আড়াল করে সামনে এগিয়ে এলো রাণা।—কি চাও তুমি?

—আমার বন্দুক ফেরত দে আগে। দে বলছি।

খালি রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বিলি ওর পায়ের কাছে।

—কেন তুমি এমন করছ আমাদের সাথে? শান্তভাবে রাণা জিজ্ঞাসা করল।

—বেশ করছি। গর্জন করে উঠল গ্রাটেনকো। আমি শুধু আমার ভালই বুঝি। আমার ভালর জন্য আমি যা খুশি তাই করব।

বন্দুকটার দিকে ও ফিরেও তাকাল না।

—তা কর। কিন্তু—আমাদের কষ্ট দিচ্ছ কেন?—কেন তুমি আমাদের ক্ষতি করবে বলেছিলে। তুমি আমাদের কিছু কর না আমরাও তোমার কিছু করব না, তবেই আর কোন গোলমাল থাকবে না।

—ও হো হো হো হো। হেসে গড়িয়ে পড়ল গ্রাটেনকো এই বুদ্ধি নিয়ে তুই ওদের ক্যাপ্টেন হয়েছিস। তবে তো তোরা সবাই এ জঙ্গলে বাঘের পেটেই যাবি। তার থেকে শোন আমি তোদের বন্দী করে রাখব টিবল্লির মরা খাদের গুহায়। এ পৃথিবীতে কেউ সে গুহার কথা জানে না আমি ছাড়া। বাস তারপরে দেখব কি করে প্রেসিডেন্ট ব্রোকেনসিল আমার মাথার দাম ধরে তিন লাখ। তোদের ছাড়ব যদি আমি ছাড়া পাই।

ওর একথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রাণা। তারপর বলল—তুমি কে? কেন তোমার মাথার দাম তিন লাখ?

—সে কথাটাও জানিস না। ও হো, তা তোরা জানবি কেমন করে—তোরা যে বিদেশী। আমি গ্রাটেনকো ছিলাম কারখানার কুলি। কোন গোলমালে নেই। সারাদিন কাজ করি। বিকালে বাড়ি ফিরে মা মরা বাচ্চাটার সাথে খেলা করি। এমন সময় লাগল যুদ্ধ। টান্টামোরার সাথে পুব উত্তরের রাজ্য গ্রেসাকের। সবাই কত বড় বড় কথা বলতে লাগল—দেশের জন্য প্রাণ দাও। মজা, কিন্তু তারা কেউ যুদ্ধে গেল না। ডাক পড়ল আমার। আমি বললাম—যাব। কিন্তু আমার মা মরা বাচ্চাটার কি হবে? কে দেখবে ওকে। সবাই বলল—আইন—আইন। ও সব কথা আইন ভাবে না। বাচ্চাটাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলাম। ধরা পড়লাম। আমার বুক থেকে বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে পাঠান হল যুদ্ধে।

গ্রেসাবোর সাথে যুদ্ধ কেন জান! পিটকিরা মরুভূমির দখল পাবার জন্য! এক দানাও শস্য হয় না সেখানে।

জল নেই কোথাও। লোকও থাকে না। আবার পালালাম যুদ্ধ থেকে। টাণ্টামোরায় ফিরে শুনি বাচ্চাটা মরে গেছে। গেলাম বন্ধু কিম্বুর কাছে সাহায্যের খোঁজে। সে কাজ করে পুলিসে। সে মুখে খুব ভাল কথা বললো কিন্তু রাতের অন্ধকারে দলবল নিয়ে সে ফিরে এল আমাকে ধরতে। মানুষ মারা পেশা আমার নয়। আমি কুলি। কিন্তু সেদিন মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না। একটা গুলি—ব্যাস কিম্বু ঘুরে পড়ে গেল। আর সেই থেকে এই মাঞ্জিনকোর ঘোর জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। আমি ডাকাত গ্রাটেনকো—শয়তান মনুষ্য—আমার মাথার দাম তিন লাখ।

ওর এ গল্প শুনে সবাই চুপ। না:—লোকটাকে যত খারাপ ভাবা গেছিল হয়ত লোকটা ততটা নয়। কেন সবাই ওর সাথেই বা অমন ব্যবহার করল! ও কারখানার কাজ নিয়ে থাকলেই তো সব দিক থেকে ভাল হত; ওর বাচ্চাটাও মরত না। ও এমন ডাকাতও হত না।

—সত্যি দুঃখ হয় তোমার কথা শুনে। বলল রাণা। কিন্তু ভাই আমাদের সাথেই বা তুমি কেন এমন ব্যবহার করছ? আমরা তো সত্যি তোমার কোন ক্ষতি করি নি।

—ভাই! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো—কে বলল ভাই! চোপরাও। আমার কোন ভাই নেই কোথাও। আর দুঃখু টুঃখু ওসব আমার অনেকদিন আগে হত, যখন মানুষ ছিলাম। ডাকাত গ্রাটেনকোর ওসব নেই।

—তবুও একটা কথা শোন—ব্যস্ত হয়ে কি যেন বলতে গেল রাণা।···

—না। আর কোন কথা নয়। হাতের স্টেন গানটা বাগিয়ে ধরল গ্রাটেনকো। বাজে কথায় অনেক দেরী হয়েছে। এখন সবাইকে এক এক করে যেতে হবে আমার সাথে টিবলির মরা খাদের গুহায়। সেখানে তোদের আমি বন্দী করে রাখব। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাকে ওরা ছাড়ে।

—কিন্তু ওরা যে কেউ হাঁটতে পারবে না।···

—তাহলে এখানেই আমি ওদের গুলি করে খতম করে দেব। হাঁটতে হবে সবাইকে যে প্রাণে বাঁচতে চায়। দয়া মায়া ওসব গ্রাটেনকোর নেই।

—কিন্তু ও তিনজন কিছুতেই হাঁটতে পারবে না। অসম্ভব। খুব জোর দিয়ে এসব কথা বলল রাণা। ধাঁই করে গানের কুঁদো দিয়ে রাণার মুখে এক গুঁতো লাগাল গ্রাটেনকো। তবে মরতে হবে।

গল গল করে মুখ দিয়ে রক্ত বার হয়ে এল রাণার। তবুও এক পাও পিছাল না ও। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলল। তবে আমাদের সবাইকে মারতে হবে তোমাকে। আমরা কেউ পায়ে হেঁটে যাব না.

—কি!! চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো। শয়তান। শয়তান। সব কটা শয়তান। গ্রাটেনকোকে চেনে না। আগুন নিয়ে খেলা করছে।

সামনে এগিয়ে এল টম। মারো গুলি। আমরা তৈরী! দেরী করছ কেন?

ওকে আড়াল করে এগিয়ে এল হামিদুল। আর আমার ভয় করছে না। আমাকে আগে না মেরে তুমি কাউকেই মারতে পারবে না।

—উঃ উঃ। এক হাত দিয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে চেষ্টা করল গ্রাটেনকো। সব কটাকেই মারব আমি। সব কটাকেই। খুদে শয়তানের দল। আমি এক দুই তিন গুনব তার পরেও যদি তোরা না উঠিস তো আমি ঠিক গুলি করব। তোদের দিয়ে আমার যদি কোন কাজই না হয় তো তোদের আমি মারব। এক দুই—

সবারই বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। ওর চোখে মুখে যে ছবি ফুটে উঠেছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই

যে ও এখুনি গুলি করবে। বিলি বুঝল ওদের সবাইকে ও বন্দী করে একটা ভীষণ বাজী লাগাতে চায়। তা যদি ও না করতে পারে তবে ও কাউকে এতটুকুও দয়া দেখাবে না। বাঁচার বুদ্ধি আগে করতে হবে। তার পরে নয় পালাবার পথ খুঁজে নিতে হবে।

—একটা কথা বলব? খুব শান্ত গলায় বিলি জিজ্ঞাসা করল। শুনবে আমার কথা?

—কি কথা শুনি? চেঁচালো গ্রাটেনকে। মাথার চুল ছেঁড়া বন্ধ হল ওর। দেরী করবি না। দেরী করলে আমার মাথার ঠিক থাকবে না।

—আমাদের কি সত্যি তুমি বন্দী করবে?

—নয়ত কি আমি তোদের সাথে ইয়াকি করছি! তোদের বন্দী করে আমি ছাড়া পাব!

—তাহলে নয় আমরা স্ট্রেচারে করে ওদের সবাইকে বয়ে নিয়ে যাব। তাতে সবাই যেতে পারবে। আর তোমাকেও গুলি চালাতে হবে না।

ওর কথা শুনে রাণা অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে। একি বলছো বিলি: ওকি ভয় পেয়েছে নাকি! ভাল করে ওর দিকে তাকিয়ে মনে হল। না ওর মুখে চোখে তো তার ছাপ নেই। খুব ভেবেই এসব কথা বিলি। তার নিশ্চয় কোন মতলব আছে ওরা এখন ওকে বাধা দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। লোকটা যে হঠাৎ কি করে বসবে তারও তো কোন ঠিক নেই। মিথ্যা সে ঝুঁকি নিয়ে লাভ? সময় পেলে ভেবে পরে সব কিছু করা যাবে।

বিলির কথা শুনে গ্রাটেনকো চুপ করে রইল কিছুক্ষণ তারপর বলল—স্টেচার? সে আবার কি?

—একটু সময় আমাদের দাও আমরা গাছের ডাল ভেঙ্গে তা এখুনি বানাচ্ছি। ততক্ষণ না হয় প্যাকেটগুলো খুলে দেখা যাক কি কি জিনিস দিয়েছে।

আমাকে ধোঁকা দেওয়া! পালাবার মতলব করা হচ্ছে?

গ্রাটেনকোর কথা শেষ হবার আগেই চেঁচিয়ে উঠিল বিলি।

—বোকার মতন কথা বলনা। সবাই আমরা এক সাথে মরতে পারব। কিন্তু কেউ কাউকে ফেলে কোন দিনও পালাতে পারব না।

তোমার মতন মোটা মাথার হোকই সুধু ওকথা ভাবতে পারে। খবরদার। এবারে চেঁচাল গ্রাটেনকো। আমার মাথা মোটা! আমি সব বুঝতে পারি। শুধু ঠাট্টা করছিলাম। বলেই হো হো করে হেসে উঠিল।

—বাবা তোরা সবাই গিয়ে ইসটেচার বানা। আচ্ছা সাহস বটে তোদের। বাবা। বলে কিনা গ্রাটেনকোর মাথা মোটা। খুব বেঁচে গেলি আজ।

—ধন্যবাদ। বলল বিলি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তুমি বাপু নিজেকে যতই শয়তান বল আসলে তুমি অতটা নয়।

—ভাগ। ভাগ্ এখান থেকে।

—ক্যাপ্টেন। ডাকল বিলি। একবার এদিকে এসো কথা আছে।

মুখের রক্ত মুছে এগিয়ে এলো রাণা।

—এসো আমার সাথে। বলল বিলি!...টম তুমিও এসো।

চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো।—তোরা সবাই যাচ্ছিস যে? কেমন যেন সন্দেহ ওর চোখেমুখে। বিলি বলল—আমরা সবাই যাবনা। নেবে গিয়ে গাছ ঠিক করে আসব—কোনটা থেকে স্ট্রেচার বানান যাবে। আমরা ফিরলে

অন্যদল যাবে স্ট্রেচার বানাতে। ভয় নেই, কেউ না কেউ থাকবে তোমার কাছে।

—যা যা। বলল গ্রাটেনকো। পালালে বাকিগুলোকে আমি খতম করে দেব। মনে থাকে যেন কথাটা।

—তুমি থাক হামিদুল এখানে। বলল রাণা। আমরা আসছি। প্লেন থেকে নেবেই বিলি জিজ্ঞাসা করল—আমরা কি যাব ওর সাথে?

টম বলল—যদি না যাই তবে?

বিলি বলল—ওর চোখ মুখ দেখে আমি বুঝেছি ও এখুনি গুলি করতো আমাদের। কিন্তু মনে রেখ যতক্ষণ আমরা ওর সাথে যেতে রাজী থাকব ততক্ষণ ও আমাদের ভয় দেখালেও প্রাণে মারবে না। কারণ ওভাবে বন্দী করতে পারলে ও গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে অনেক সুবিধা আদায় করতে পারবে। সেটাই ও চায়। না গেলে সে সুযোগ না পাবার রাগে ও যা খুশি তাই করে বসতে পারে। তাছাড়াও যারা আমাদের খোঁজ নিতে আসবে—গুহায় লুকান আমাদের খুঁজে পাবে না। সেখানে ও নিজেও লুকিয়ে থাকবে। আমাদের না খুঁজে পেলেই ও সরকারকে যা খুশি তাই তাই সর্ত মানাতে পারবে। আমাদের ছেড়ে গেলে ও সে সুযোগ পাবে না।—এখন তোমরা কি ভাবছ বল।

টম বলল—আমাদের দলের কেউই এমন কিছু বড় নয় যে আমরা গায়ের জোর দেখাব।

অনেকক্ষণ ভেবে রাণা বলল—আগে সবার বাঁচার কথাই ভাবতে হবে। গুহার থেকে পরে আমরা তো সবাই পালাতে পারি! এমন কি সুযোগ পেলে আবার ওকে বন্দীও করতে পারি।

টম বলল—তাহলে আমরা সবাই যাব ওর সাথে।

—হ্যাঁ। রাণা বলল।—এ ব্যাপারে আমরা সবাই এক মত।

বিলি বলল—চল তাহলে এখুনি ফেরা যাক।

ওদের সবাইকে ফিরে আসতে দেখে গ্রাটেনকো মহা খুশি।

ফিরেই রাণা বলল—বিলি।—তুমি হামিদুল আর রাজা যাও স্ট্রেচার বানাতে। মুংলি আমি আর টম থাকব জিনিসগুলো খুলতে। কুণাল দেখবে আহতদের। বাকি সবাই ওকে সাহায্য করবে।

—ঠিক আছে ক্যাপ্টেন। বলল বিলি।—এসো তোমরা।

ডাক শুনে হামিদুল আর রাজা এগিয়ে গেল দরজার কাছে। ওদের পিছনে বিলি। দরজার কাছে গিয়ে ও ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—আর কতক্ষণ অমন করে বন্দুক উঁচিয়ে দাড়িয়ে থাকবে তুমি ভাল মানুষ গ্রাটেনকো? এবারে একটু বস।

—এই ও। চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো। গালাগাল দেওয়া হচ্ছে আমাকে। সাহস তো তোর কম নয়। দেখবি মজা? গ্রাটেনকো ঘুরে দাঁড়াবার আগেই এক লাফে বিলি প্লেনের নিচে নেবে পড়ল। ওকে অমন করে পালাতে দেখে মহা খুশিতে গ্রাটেনকো আবার হাসতে লাগল। -ভয় পেয়েছে ও। খুদে শয়তানটা ভয় পেয়েছে। পাবেই তো। অমন প্রেসিডেণ্ট ব্রোকেনসিল সে পর্যন্ত আমার ভয়ে কাঁপে। আমার মাথার দাম তিন লাখ। আমি নিজের কথা ছাড়া আর কারও কথা ভাবিনি। ওর শেষ কথাগুলো বিড়বিড় করে বলতে বলতে ও এক জায়গায় ধপ করে বসে পড়ল। হাতের গানটা নিচে ফেলে পা ছড়িয়ে আরাম করে প্লেনের দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসল।

দুচার মিনিট। তার পরেই প্রচণ্ড শব্দে ওর নাক ডাকতে লাগল।—ঘুমিয়ে পড়েছে গ্রাটেনকো।

টম বলল।—দুঃখ হয় লোকটার জন্য।

—হ্যাঁ। বলল রাণা। ওর কথাও আমাদের ভাবতে হবে।

মুংলি বলল। সবার আগে দেখি ক্যাপ্টেন কোথায় তোমার চোট লেগেছে?

—না ও কিছু নয়। বলল রাণা।—ঠোঁটের ভিতরে কেটেছে। ও সেরে যাবে।

—ঠিক তো?

—হ্যাঁ কোন সন্দেহ নেই।

গ্রাটেনকোর দিকে তাকিয়ে তখন মুংলি বলল—আহা, ডাকাতটার বোধ হয় অনেক দিন কিছুই পেট ভরে খাওয়া হয় নি।

রাণা বলল—হামিদুল কিন্তু চলে গিয়েছে।

তাতে কি হয়েছে। বলল মুংলি—তুমি বললে শকুন্তলা আর রুক্মিণীকে ডাকব।

—ডাকো। কিন্তু আস্তে। ওর ঘুম যেন এখন না ভাঙ্গে। ভাঙ্গলেই মিছিমিছি চেঁচাবে।

মুংলি হাতছানি দিয়ে ডাকল ওদের। শকুন্তলা আর রুক্মিণী এলো কাছে।

—তোমরা পারবে কফি বানিয়ে আনতে।

হ্যাঁ পারব। দুজনেই ওরা মাথা নাড়ল।

—সাবধানে যাবে আসবে।

মহা খুশি হয়ে ওরা চলে গেল।

একটার পর একটা প্যাকেট ওরা খুলতে লাগল। প্রথমেই বার হল নানান ওষুধপত্র। তার সাথে লেখা কাগজ। কেমন করে কোনটা ব্যবহার করতে হবে। পরেরটাতে খাবার। আর একটাতে পোশাক। বিছানা পত্র।

টম বলল—আহা একটা বন্দুক দেয় নি।

পরের প্যাকেটটা খুলতেই বার হল একটা যন্ত্র। সেটা দেখেই লাফিয়ে উঠল টম। আরে এযে দেখছি পোর্টেবল রেডিও যন্ত্র। তাড়াতাড়ি বাক্সটা হাতড়াতে সুরু করল ও। এই তো পেয়েছি। বলে একটা ছাপান কাগজের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও! কিছুক্ষণ। তাই পড়েই টান দিয়ে এরিয়ালটাকে লম্বা করে দিল। আর একটা বোতাম টিপেই হেড ফোনটা কানে দিয়ে শুনতে পেল ওদিক থেকে বলছে—ব্রাণ্টালুসির উদ্ধারকারীরা বলছি। তোমরা সাড়া দাও। সাড়া দাও। ব্রাণ্টালুসির উদ্ধারকারীরা বলছি। তোমরা সাড়া দাও। সাড়া দাও। বল।

খট করে আর একটা বোতাম টিপল টম। তারপর উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল।—হ্যালো ব্রাণ্টালুসির উদ্ধারকারীরা, আমরা বেঁচে আছি। শুনতে পাচ্ছ? আমরা বেঁচে আছি। বল।

আবার বোতাম টিপতেই ওদিক থেকে শুনতে পেল।—প্লেন এ্যাক্সিডেন্টের যাত্রী তোমরা?

—হ্যাঁ।

—ভগবানের দোহাই—সবাই বেঁচেছে?

—না দুঃখিত। ষোল জন বেঁচেছি।

—দুঃখিত আমরাও। নাম বল। শিগগির।

মুখস্থের মতন নামগুলো বলে গেল টম।

—আহত ক'জন?

—তিনজন।

—আঘাত গুরুতর কি ?

—হ্যাঁ দুজনের গুরুতর।

—আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা কর শিগগির। যাতে ধোঁয়া হয়। আমরা ডাক্তারকে নাবাবো। কেউ ফাস্ট্‌ এইড জানে ?

—হ্যাঁ জানে। তার সাথে কথা বলুন।

—হ্যাঁ সেই ভাল। এখানেও ডাক্তারের সাথে কথা বল।

মুংলি হেড ফোনটা কানে দিতেই ওদিক থেকে আওয়াজ উঠল—হ্যালো। হ্যালো—ডাক্তার বলছি।

—আমি মুংলি টিরকে। আমি ফাস্ট্‌ এইড জানি। উত্তর দিল মুংলি—তহুক্কা দিদির দুটো পায়েই সিনবোন ভেঙেছে। তবে মনে হয় সাধারণ ভাঙা। কিন্তু উপরের মাংস থেঁতলে গেছে। গুরুদিতের কোথাও আঘাতের কোন চিহ্ন নেই। তবে ও থেকে থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। জ্ঞান ফিরলেও উঠতে পারছে না। হাত-পা নাড়তে পারলেও সমস্ত শরীর ওর অবশ। ওকে নিয়েই সব থেকে ভয়। বাকিজন আমিনা—তার ডান পায়ের আর হাতের মাংস ছিঁড়ে গেছে আমি ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছি। ওর খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

—বেশ। ওদিক থেকে ডাক্তার বলল। এখন খুব মন দিয়ে শোন কি করতে হবে।

সব কথা মন দিয়ে শুনল মুংলি। ওর ডাকে ওর পাশে এসে বসল কুণাল। ওষুধের প্যাকেট খুলে যেই ওষুধ বাছাই করতে যাবে। অমনি ঘুম ভেঙে গেল গ্রাটেনকোর।

—কার সঙ্গে কথা বলছিস তোরা ? ওটা কি ?

—ওটা রেডিও। বলল টম। আমাদের যারা উদ্ধার করতে আসবে তাদের সাথে কথা বলছি।

একথা শুনে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল গ্রাটেনকো। তারপর সুড়সুড় করে এসে বসল ওদের পাশে।

—কি কথা বলছিস তোরা ? কি কথা ?

—আহতদের কেমন করে ওষুধ দেব সেই কথা।

—আর কোন কথা হয়নি এখনো ?

—না।

—বেশ তোরা বলে দে যে তোরা সবাই এখন গ্রাটেনকোর বন্দী। ওরা এ জঙ্গলে তোদের খুঁজতে আসলেই আমি তোদের খুন করব। সব কটাকে খুন করব। বল বল একথা ওদের। এরপর এ জঙ্গলে ঢোকা না ঢোকা ওদের ইচ্ছা।

আবার সবাই থমকে গেল। আসল কথাটা তাহলে ও এখনও ভোলে নি। তবে সত্যিই শয়তান !

—চুপ করে রইলি যে। বল বলছি। এখুনি। ধমকে উঠলো গ্রাটেনকো।

ততক্ষণে ওদিক থেকে ডাকা শুরু হয়ে গেছে। হ্যালো হ্যালো। কি হল হঠাৎ। কি হল। জবাব দাও শিগগির। বল। জবাব দাও। শুনতে পাচ্ছ আমাদের কথা ? হ্যালো—ঝপ করে হেড ফোন কেড়ে নিজের কানে ধরল গ্রাটেনকো কান পেতে কিছুক্ষণ—ঐ তো ওরা শুনতে চাইছে। চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো বল্‌ বল্‌—যা বলতে বললাম বল্‌ বলছি। নইলে এখুনি তোর মুণ্ডু গুঁড়ো করে দেব।

—বেশ বলছি। বলল্‌ টম। নিজের হাতে যন্ত্রটা নিয়ে স্পষ্ট গলায় ও বলল—সব কথাই শুনতে পাচ্ছি আমরা।—সব কথা। এখানে আমরা এখন গ্রাটেনকোর বন্দী ······

এই পর্যন্ত বলার সাথে সাথেই গ্রাটেনকো চেঁচিয়ে উঠল।

—খবরদার—কোথায় তোদের নিয়ে যাব তা বলবি না। খবরদার বলবি না বলছি। শুধু বলে দে লোক খুঁজতে এলেই তোদের খুন করব! বল, বল এ কথা গুলো।

—হালো হালো। আবার বল কথা গুলো। হালো ওদিকের ব্যাকুল ডাক শোনা যেতে লাগল।

—বলছি। এখানে আমরা সবাই এখন গ্রাটেনকোর বন্দী। ও আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে অন্য জায়গায়। লোক এ জঙ্গলে আমাদের খোঁজে ঢুকলেই গ্রাটেনকো আমাদের সকলকেই গুলি করবে।

গ্রাটেনকো আমাদের গুলি করবে।

কথাটা শেষ করেছে কি করে নি টম···অমনি ঝপ করে ওর হাত থেকে রেডিও যন্ত্র কেড়ে নিল গ্রাটেনকো।

—ব্যাস খুব হয়েছে কথা বলা। এখন ওটা আমার কাছে থাক। যখন আমার দরকার পড়বে তখন আবার বলবি। এখন সবাই উঠে পড়। যেতে হবে। জিনিসপত্র যা পারিস তা সঙ্গে নিয়ে নে। বাকি যা সব তা যেমন আছে থাক! ও পরে আমার কাজে লাগবে। সবাই উঠে পড়।

—স্ট্রেচার বানিয়ে তো ওরা এখনও ফিরল না। ব্যস্ত হয়ে রাণা বলল।

—শয়তানগুলো নিশ্চয় পালিয়েছে। ধরতে পারলে ওদের আমি জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব। আমায় চেনে না।

—আবার বাজে কথা। বাধা দিল রাণা। বলেছি তো আমাদের ফেলে আমাদের কেউই কোন দিনও চলে যাবে না। ওরা এখুনি এসে যাবে! তুমি দেখো।

শকুন্তলা আর রুক্মিণী তখুনি ফিরল গরম কফি হাতে নিয়ে।

ক্রমশঃ

নয় সে রাজা, নয় সে রাণী

নির্মলেন্দু গৌতম

নয় সে রাজা, নয় সে রাণী
কেবল তাসের জোকার,
আজকে হঠাৎ বেজায় রকম
বন্ধু হল খোকার

সবাইকে সে এড়িয়ে এসে
বারান্দাটির কোনায়,
নানান রকম গল্প তাকে
দুপুর বেলা শোনায়।

জোকার সে তো খোকার কাছে
দারুণ মজার মানুষ
শুনুক কিছু, নাইবা শুনুক,
ওড়ায় খুশির ফানুষ!

হঠাৎ যদি এসেই পড়,
বুকপকেটে খোকার—
দেখতে পাবে, হাসছে কেবল
সেই সে তাসের জোকার
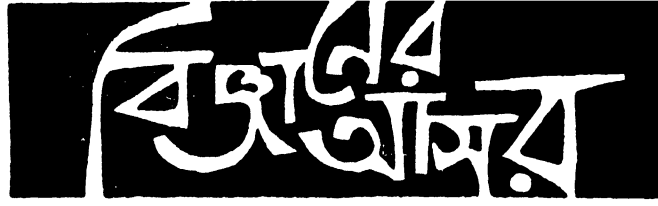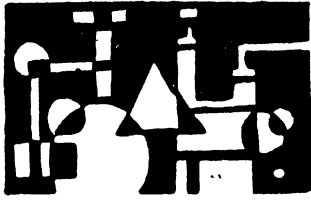
প্রতিরক্ষা

সুনীলরঞ্জন দত্ত

(কারিগরি বিজ্ঞান)

কে জানে কবে আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। দমাদম্ বোমা ফাটবে। শত সহস্র মানুষের প্রাণ নাশ হবে, সমৃদ্ধ নগর জনপদ ধ্বংস হবে, দুর্ভিক্ষ মহামারিতে দেশ ছেয়ে যাবে, ক্ষুদ্র শক্তি সম্পন্ন দেশ পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হবে। ঠিক এই আশংকাতেই পৃথিবীর ছোট বড় সব দেশই প্রয়োজন মত যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করে রাখে। দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সদাসতর্ক দৃষ্টি নিয়ে জেগে থাকে সীমান্তের গা ঘেঁষে, কিন্তু প্রয়োজন মত অস্ত্র তৈরি করার ক্ষমতা পৃথিবীর কটা দেশেরই বা আছে। অনেক দেশ নিজেকে বলশালী করার জন্য বিদেশী রাষ্ট্র থেকে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করে। তবে কম হোক বেশি হোক সব দেশই প্রয়োজন মতো সরঞ্জাম নিজেরাই প্রস্তুত করার চেষ্টা করে। তার কারণ অস্ত্রের ব্যাপারে পরমুখোপেক্ষী হয়ে থাকার বিপদ আছে অনেক। আমাদের দেশ এতদিন যুদ্ধের প্রায় সব রকম অস্ত্রই বিদেশ থেকে আমদানি করত। এখন কিছু কিছু সরঞ্জাম দেশেই প্রস্তুত হয়।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করার অধিকার এখনও লাভ করে নি। সরকারি এবং আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিই এ সব প্রস্তুত করে। জলযুদ্ধের জন্য যুদ্ধজাহাজ অপরিহার্য অঙ্গ। আমি এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি যে প্রতিষ্ঠান যুদ্ধজাহাজ এবং যুদ্ধের কাজে লাগতে পারে এমন সব জাহাজ প্রস্তুত করে। যারা খবরের কাগজ পড় তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ ১৯৬৮তে ২৩শে অক্টোবর 'আই, এন্, এস্ নীলগিরি' নামে একটি যুদ্ধের জাহাজ জলে ভাসানো হয়েছে। এ জাহাজটি আমাদের তৈরি প্রথম যুদ্ধের জাহাজ, সম্পূর্ণ হতে এখনও প্রায় তিন বৎসর লাগবে। তারপর জাহাজটিকে নৌবাহিনীর হাতে অর্পণ করা হবে। এটি সম্পূর্ণ একটি আধুনিক ধরনের যুদ্ধের জাহাজ এবং এর কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে, যেমন—এ জাহাজটি সাবমেরিন আক্রমণ করতে পারবে, আণবিক শক্তি চালিত অস্ত্র বহন করার ক্ষমতাও এ জাহাজটির থাকবে, তাছাড়া এ জাহাজটিতে Guided Missileএর ব্যবস্থা থাকবে। অর্থাৎ স্বয়ংচালিত মিসাইল ক্ষেপণ ও তাকে নির্দেশ দেবার ব্যবস্থা থাকবে। ঐ একই ধরনের আরও দু'খানা যুদ্ধের জাহাজ আমাদের প্রতিষ্ঠানে তৈরি হবে। এ জাহাজগুলি দৈর্ঘ্যে ৩৭২ ফুট প্রস্থে ৪৩ ফুট এবং উচ্চতায় ২৮ ফুট ৩ ইঞ্চি। 'নীলগিরি' হ'ল ভারতীয়দের দ্বারা ভারতে তৈরি প্রথম ভারতীয় যুদ্ধের জাহাজ। তাহলেও এই জাহাজ তৈরির সম্পূর্ণ কৃতিত্ব কেবলমাত্র

ভারতীয়দের নয়। তার কারণ এই আধুনিক যুদ্ধ জাহাজের নক্সাটি আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে নিয়েছি।

নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে ভারত 'আই, এন্, এস্ কাল্‌ভারি' নামে একটি সাব্‌মেরিন রাশিয়া থেকে আমদানী করেছে। সাব্‌মেরিনের কি কাজ তা তোমরা ভাল করেই জান, যুদ্ধের সময় এর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। এ ছাড়া 'আই, এন্, এস্, দীপক' নামে যুদ্ধের কাজে লাগতে পারে মাল ও তেলবাহী এমন একটি জাহাজ জার্মানী থেকে আমদানী করা হয়েছে। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন আমরা 'আই, এন্ এস্ ভাট্‌কাল' নামে একটি ইন্‌শোর মাইন সুইপার (inshore mine-sweeper) তৈরি করে ভারতীয় নৌবাহিনীর হাতে দিয়েছি।

যুদ্ধের খবরাখবর যারা রাখ তারা 'মাইন' কথাটা নিশ্চয়ই শুনেছ। এটি যে কি মারাত্মক অস্ত্র তা বলে বোঝানো যাবে না। স্থলযুদ্ধে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার জন্য যেমন মাটির নিচে 'মাইন' পেতে রাখা হয় তেমনি যুদ্ধের জাহাজ ধ্বংস করার জন্য বিপক্ষীয় সৈন্যরা জলের নিচে মাইন সাজিয়ে রেখে যায়। মাইনের চুম্বকের মত আকর্ষণী শক্তি থাকে। যুদ্ধের জাহাজগুলি সবই লোহার তৈরি, তাই মাইনের নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে জাহাজ এসে পড়লে আকর্ষণী শক্তির জোরে মাইনগুলি জাহাজের গায়ে এসে ধাক্কা লাগে, তার ফলে মাইন বোমার মতন ফেটে যায়। তার কারণ হল মাইন বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে তৈরি। বিস্ফোরণের ফলে জাহাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং জলে ডুবে যায়। 'সুইপ' (sweep) কথাটার মানে তো তোমরা জান—ঝাঁট্ দেয়া, মাইন সুইপারের কাজ হল মাইনগুলিকে ঝাঁট দিয়ে সরিয়ে ফেলা। কথার মানেটা এ রকম হলেও আসল কাজটা একটু অন্য রকম। যুদ্ধ জাহাজের আগে আগে চলে 'মাইন সুইপার', যে পথ ধরে যুদ্ধ জাহাজ যায় সেই পথে যত 'মাইন' সাজানো থাকে সেগুলি তুলে নেওয়া হল 'মাইন সুইপারের' কাজ। মাইন কখনও 'মাইন সুইপারের' ক্ষতি করতে পারে না তার কারণ 'মাইন সুইপারের' দেহটি কাঠ দিয়ে তৈরি। ফলে মাইনের চৌম্বক আকর্ষণী শক্তিটা অকেজো থাকে। 'আই, এন্ এস্ ভাট্‌কাল' সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি। তার যে অংশটা সব সময় জলের নিচে থাকার সে অংশটা 'ফাইবার গ্লাস' (Fibre Glass) দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। তা না হলে বহুদিন জলে থাকার জন্য কাঠ দিয়ে তৈরি দেহটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মাইন সুইপারগুলি আকারে খুবই ছোট হয়, আই, এন্, এস্ ভাটকাল মাত্র ৩২½ মিটার লম্বা।

এক একটা দেশের আর্থিক সম্পদের বিরাট একটা অংশ যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য ব্যয় হয়ে যায়। পৃথিবীর সব দেশই যদি পরস্পর পরস্পরের বন্ধু হত, দ্বেষ, হিংসা ভুলে যেত, দুর্বলের উপর আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্খা মন থেকে মুখে ফেলতে পারত,—সব দেশই যদি যুদ্ধকে পরিহার করে শান্তির পথ বেছে নিত, তাহলে ঐ অর্থ সম্পদ আরো অনেক ভাল কাজে লাগতে পারত, শিক্ষার জন্য আরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হত। ক্ষেত খামারে বেশি ফসল ফলানো সম্ভব হত, সব মানুষই সুখে থাকত। পৃথিবীর চেহারাটাই হয়তো পাল্টে যেত। কিন্তু তেমন দিন কবে আসবে?

বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তর

অমিতানন্দ দাশ

প্রশ্ন: টেলিভিশনে ছবি পাঠানো হয় কি করে? (১৯০২ অভিজিৎ চৌধুরী)

টেলিভিশন কি করে কাজ করে বোঝানোর প্রথম মুস্কিল হলো যে ভারতবর্ষে এখন টেলিভিশন নেই বললেই চলে, যদিও বছর চারেকের মধ্যেই কলকাতাই টেলিভিশন বসার কথা আছে। কাজেই তোমরা যারা মাঝে-মাঝে টেলিভিশন দেখেছো, সম্ভবতঃ কখনো টেলিভিশনের ছবিটাকে বিশদভাবে লক্ষ্য করে দেখোনি। কিন্তু টেলিভিশনে ছবি পাঠানোর একটা গোড়ার কথা পাঠানো ছবিটাকে ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। রেডিওতে নাহয় কথাগুলো একের পর এক পাঠানো হয়, কিন্তু টেলিভিশনে একটা পুরো ছবি একসঙ্গে পাঠানো যায় কি করে? তা পাঠানোর আসলে কোনো উপায়ই নেই। কিন্তু ধর একটা ছাপা পৃষ্ঠাও তো কিছুটা একটা ছবির মতো। এই পৃষ্ঠাটা তুমি কিভাবে পড়ছো? পর পর এক একটা লাইন ধরে বাঁদিক থেকে ডানদিকে পড়ে যাচ্ছো, আবার চট করে বাঁয়ে ফিরে এসে পরের লাইন পড়তে শুরু করছো তো? টেলিভিশন ক্যামেরাও ঠিক তাই করে। টেলিভিশন ক্যামেরা এক ধরনের রেডিও ভাল্‌ভ—এর কাজ হচ্ছে যে ছবিটাকে পাঠাতে হবে সেটাকে এইরকম 'পড়ে যাওয়া।' তাই টেলিভিশনের ছবিটাও অনেকগুলি লাইনে ভাগ করা থাকে—কাছ থেকে একটা টেলিভিশন ছবিকে দেখায় এই পৃষ্ঠাটাকে মিটার পাঁচেক দূর থেকে যেরকম দেখায় সেরকম আরকি। বিভিন্ন দেশের টেলিভিশনে বিভিন্ন সংখ্যায় লাইন থাকে—৫০০ থেকে ৯০০র মধ্যে।

খবরের কাগজের অনেক ছবির তলায় 'রেডিও ফটো' লেখা দেখেছো নিশ্চয়ই। সেই ছবি পাঠানোর সঙ্গেও টেলিভিশন ছবি পাঠানোর কিছু সাদৃশ্য আছে। খবরের কাগজের হাফটোন ছবি দেখবে অনেকগুলি ফুটকির সমষ্টি—রেডিওতে এই ফুটকিগুলি এক এক করে পাঠানো হয়। ফুটকি তো দেখেছো ছবির কালো অংশে থাকে বিরাট বিরাট—তারা একটার ঘাড়ে আরেকটা গিয়ে পড়েছে, কিন্তু ছবির সাদা অংশে তাদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এখন ছবি-প্রেরক যন্ত্রে এক-একটি ফুটকিকে লক্ষ্য করে, ফুটকি যত বড় তত বেশী বৈদ্যুতিক কারেন্ট সৃষ্টি করা হয় এবং এই কারেন্ট অনুযায়ী রেডিও তরঙ্গ পাঠানো হয়। গ্রাহকযন্ত্রে আবার ওই কারেন্ট অনুযায়ী ছোট বড় ফুটকি বসিয়ে ছবিটিকে ফিরে পাওয়া যায়।

টেলিভিশনে প্রায় ঠিক এইরকম ভাবেই ছবিটি পাঠানো হয়—খালি ডাইনে বাঁয়ে পাশাপাশি 'ফুটকি' বলে কিছু থাকে না, সব জুড়ে কখনো গাঢ় কখনো হালকা এক একটা লাইন হয়ে যায়।

টেলিভিশনের মুল সমস্যা হলো যে এক একটি 'ফুটকি'কে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে পাঠাতে হয়। কারণ সিনেমার মতো টেলিভিশনেও অনেকগুলি স্থির ছবি পর পর দেখানোর ফলে আমাদের ধারণা হয় যে ছবিগুলিই নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। এর জন্য সেকেণ্ডে অন্ততঃ ২৫টির মতো ছবি দেখানো দরকার হয়। এখন টেলিভিশনের প্রতি ছবিতে যদি ৫০০টি লাইন থাকে, এবং প্রতি লাইনে যদি ৫০০টি

'ফুটকি' থাকে, তবে প্রতি ছবিতে 'ফুটকি' আছে ৫০০ × ৫০০ = ২৫ হাজারটি। আর প্রতি সেকেণ্ডে ২৫টি ছবি পাঠাতে এক সেকেণ্ডে 'ফুটকি' পাঠাতে হয় ২৫,০০০ × ২৫ = ৬১/৪ লক্ষটি!

বোঝ তাহলে কেন হাজার টাকার কমে টেলিভিশন সেট পাবার আশা কম! ৩ ভাল্‌ভ বা ৫ ট্রানজিস্টারে রেডিও সেট হয়। কিন্তু ১৫ ভালভ বা ৩০ ট্রানজিস্টারের কমে টেলিভিশন সেট বানাতে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। তাছাড়া টেলিভিশন সেটে একটা বিরাট ভাল্‌ভ লাগে, 'পিকচার টিউব', যার গায়ে ছবিটা দেখা যায় অনেকটা টিউনিং ইণ্ডিকেটারের এক বড় সংস্করণের মত—তার একার দামই বেশ কয়েকশো টাকা।

পিকুর অভিজ্ঞতা

দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

পিকু। ও তোমরা বুঝি তাকে চেননা! পাঁচ বছর বয়স তার। সকাল থেকে পিকুর কত্ত কাজ। খাঁচার ময়নার সঙ্গে কথা বলা, কুকুরের সঙ্গে বল খেলা। এমনি ক—ত কি! কিন্তু দাদা দিদি পিকুর কাজের কথা শুনে হেসেই খুন হয়। এজন্য পিকুর মনে ভারী দুঃখ।

একদিন ভোরবেলা, সুয্যিমামা সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন, এমনি সময় পিকুর ঘুম গেল ভেঙে। সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে উঠেই বাগানে দৌড় দিল পিকু। আরে, মালীদাদা এখনও ঘুম থেকেও ওঠেনি; কখনই বা গাছে জল দেবে! আর কখনই বা পিকু কুকুরের সঙ্গে বল খেলবে! পিকু ত ভেবেই পেলনা।

এমন সময়ে পিকু দেখে আমগাছের তলায় চলেছে পিঁপড়ের সারি, তাদের দেখে পিকু মজা করে নিজের বিস্কুট থেকে ভেঙে তাদের বাসার সামনে ফেলল। তখন একটা ছোট্ট পিঁপড়ে সেটা দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসেই একটুখানি বিস্কুটের গুঁড়ো মুখে করে নিয়ে বাসার মধ্যে রাখল। একবারই নয়, বারবার এসে ছোট পিঁপড়েটি বিস্কুটের গুঁড়োগুলি বাসার মধ্যে নিয়ে রাখল। ছোট্ট পিঁপড়ের এই কাজ দেখে পিকুর চোখ ত ছানাবড়া। সে তক্ষুনি মায়ের কাছে ছুটে পিঁপড়ের কথা বলল। মা তখন পিকুকে কোলে নিয়ে 'ছোট হলেও যে প্রত্যেকের কাজই যে বড়' সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

(সমুদ্রের তলদেশ সম্বন্ধে জানবার জন্য স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ পাড়ি দিয়েছিল, তারপরে আর ফিরে আসেনি। এই অভিযানের নেতা ছিলেন মহাপণ্ডিত ডঃ ম্যারাকট ও জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপটেন হাওসি। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত প্রাণিবিদ মিঃ সাইরাস হেডলে, ইঞ্জিনিয়ার বিল স্ক্যানল্যান ও আরো ২৩ জন।

এঁরা এক আশ্চর্য নগরীর সন্ধান পান। সমুদ্রগর্ভে বিশাল এক 'আশ্রয় সদনে' কৃত্রিম বাতাসের সাহায্যে জীবনধারণ করে উন্নত বিজ্ঞান সম্পন্ন এক জাতি—তাদের কাছে আশ্রয় পাওয়া গেল। এরা প্রাচীন আটলান্টিস-বাসীদের বংশধর।

বাইরের দুনিয়ায় সংবাদ পাঠাবার জন্য ম্যারাকট আটলান্টিসের রসায়নবিদদের আবিষ্কৃত অতি হালকা লাঘবজান গ্যাসের সাহায্যে কাঁচগোলকের মধ্যে করে নিজেদের অভিজ্ঞতার আদ্যোপান্ত বিবরণ লিখে ভাসিয়ে দিলেন।

কয়েকটি কাঁচগোলকের সাহায্যে তাঁরা অনায়াসে ভেসে উঠে উদ্ধারকারী 'ম্যারিয়ন' জাহাজে আশ্রয় পান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন 'জলকুমারী' সোনা। তাঁদের কাছ থেকে পৃথিবীর মানুষ সমুদ্রগর্ভের বহু বিচিত্র, ভয়াবহ এবং অদ্ভুত দৃশ্যের কথা জানতে পারল।)

(তেরো)

"তবে সাগরগর্ভে যত অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলাম তার সবগুলিই যে ভয়ানক তা নয়। একটি দৃশ্য মনে পড়ছে যার স্মৃতি কোনোদিন মুছবার নয়। সমভূমির যে অংশ আমাদের বেশ চেনা হয়ে গিয়েছিল সেইখান দিয়ে একদিন আমরা যাচ্ছি, হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলাম অনেকখানি ফিকে হলদে রঙের বালি—বিস্তারে প্রায় আধ একর হবে—যেন কেউ কোথাও থেকে এনে বিছিয়ে রেখেছে। আমরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি কোন অন্তঃসাগরীয় স্রোত বা কি ধরণের ভূকম্পনের ফলে এমনটা হল, এমন সময়ে দেখলাম সেই সমস্ত বালি একটা

বিশাল চাঁদোয়ার মত উপরে উঠে পড়ল আর অল্প অল্প ঢেউ খেলিয়ে আমাদের মাথার উপর দিয়ে যেতে লাগল। সবটা যেতে অন্ততঃ মিনিট দুয়েক লাগল। প্রফেসর বললেন আমরা ইংল্যণ্ডে যে সব মাছ দেখি তারই একটা ছোট জাতের মাছের এটা অতিকায় সংস্করণ।'

'তেমনি আবার ঘূর্ণবাত বা প্রচণ্ড ঘূর্ণি-ঝড়ের সামুদ্রিক সংস্করণ—একে কি বলব, ঘূর্ণ-বারি?—তাও দেখেছি। আমাদের এই উপরের পৃথিবীতে ঘূর্ণবাত যেমন সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে ভেঙে চুরে প্রলয়কাণ্ড বাধায়, সমুদ্রের তলায় ঘূর্ণ-বারিও তেমনি। তবে সব রকম প্রাকৃতিক ব্যাপারে মত এরও একটা উদ্দেশ্য আছে, মাঝে মাঝে জলের মধ্যে এমনি বিরাট তোলপাড় না হলে স্থির জল ক্রমশঃ মজে উঠত।

'স্কার্পার মেয়ে সোনার কথা আগেই বলেছি। একদিন তার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েই প্রথম এই ঘূর্ণ-বারির খপ্পরে পড়েছিলাম। আশ্রয়সদন থেকে মাইল খানেক দূরে একটা উঁচু বাঁধের মত ছিল, তার উপরে নানা রঙের সামুদ্রিক ঝাঁজির মেলা। সেটি সোনার সখের বাগান। বৈজ্ঞানিক ভাষায় তার বর্ণনা দিতে গেলে অবশ্য শুনতে কিম্ভুত লাগবে, যেমন পারুল রঙের উরঙ্গামী, নীল-লোহিত অহিলুমন, রক্তবর্ণ সমুচ্চণ্ড এই সবের ছড়াছড়ি জড়াজড়ি! সেদিন সে আমাকে তার বাগান দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা সেইখানে বসে আছি এমন সময় ঝড়—জলের ঝড়—এসে পড়ল। আমরা দুজন দুজনের হাত শক্ত করে' ধরে' পাথরের ঢিবির পিছনে আশ্রয় নিয়ে বহু কষ্টে নিজেদের ভেসে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচালাম। দেখলাম এই ঝড়ের মত স্রোতের জলটা রীতিমত গরম, আর একটু গরম হলেই হয়ত গায়ে ফোসকা পড়ত। হয়ত সমুদ্রের তলায় আছে কোথাও কোনো জীবন্ত আগ্নেয় গিরি, তারই উৎপাতের ফলে ছুটে আসছে এই স্রোত। সেই স্রোতের তোড়ে সমভূমির পাঁক ঘুলিয়ে উঠে চারিদিক অন্ধকার করে' ফেলল। তাতে আমাদের একেবারেই দিক্ ভুল হয়ে গেল, পথ চিনে ফিরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, তা ছাড়া এমনিতে স্রোতের মধ্যে চলাও প্রায় অসম্ভবই। তার উপর আবার বুকে ভারবোধ আর নিঃশ্বাসের কষ্ট সুরু হল, বুঝলাম আমাদের অক্সিজেনের যোগান ক্রমে ফুরিয়ে আসছে।

'এমনি সময়ে শুনতে পেলাম যেন দূর থেকে খুব বড় একটা কাঁসর পেটার মত কোনো আওয়াজ আসছে। অথচ এমনিতে সাধারণ কোনো আওয়াজ আমাদের কাঁচের পোষাকের মধ্যে প্রায় ঢুকতেই পারত না। যা হোক, সেটা যে কিসের শব্দ আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু দেখলাম সোনা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে। আমার হাত ধরে' সে উঠে দাঁড়াল, কান পেতে যেন সেই আওয়াজ শুনল, তার পর নুয়ে পড়ে' সেই স্রোতের ঝড় ঠেলে চলতে সুরু করল। সে যেন মরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়, প্রতি মুহূর্তে আমার বুকের উপরকার সেই ভয়ানক ভারবোধ আরও অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। সে যেদিকে আমায় নিয়ে চলল আমি টলতে টলতে সেই দিকেই চললাম। তার মুখ আর চলবার রকম দেখে মনে হল তার অক্সিজেন আমার মত অত কমে' যায় নি। এক সময় হঠাৎ আমার চারিদিকে সব কিছু যেন ঘুরতে লাগল, আমি দুহাত মেলে সমুদ্রের গরম মেঝের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।'

'যখন জ্ঞান হল দেখলাম্ আশ্রয় সদনে নিজের কোঠরিটিতে শুয়ে আছি। সেই হলদে পোষাক পরা বৃদ্ধ পাশে দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে ওষুধের শিশি। ম্যারাকট আর স্ক্যান্‌ল্যান্ চিন্তিত মুখে আমার উপর ঝুঁকে রয়েছেন; আর সোনা বিছানার পাশে আমার পায়ের দিকে হাঁটু গেড়ে বসে, তার মুখে স্নেহ আর উদ্বেগ মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। ক্রমে জানলাম দুর্যোগের সময় বাইরে দূরে গিয়ে পড়া লোকদের জন্য আশ্রয় সদনের প্রবেশদ্বার থেকে একটা বিরাট কাঁসর বাজানো হয়।

সোনা সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে এসেছিল তারপর আর কয় জন আর ম্যারাকট ও স্ক্যান্‌ল্যান্‌কে সঙ্গে করে

পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় আমার কাছে। তখন সকলে আমাকে তুলে নিয়ে আসেন। জীবনে আমি এর পরে যাই করি সে জন্য আমি সোনার কাছে ঋণী।

'সোনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে বাস্তবিক কত গভীর তা তার বাবা স্কার্পাই একদিন আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। একদিন তিনি আমাদের দুজনকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের ঘরে। সেখানে সেই চিন্তা-প্রতিফলক রুপালী পট খাটালেন। সোনা আর আমি হাত ধরাধরি করে বসে দেখতে লাগলাম। যা দেখলাম তা হয়ত স্কার্পার আগের আগের জন্মের স্মৃতি। প্রথমে দেখলাম সুন্দর নীল সমুদ্রের মধ্যে আগু হয়ে এসেছে একটা পাথুরে অন্তরীপ। তার উপরে একটা প্রাচীন ছাঁদের বাড়ি। তার চারিদিকে নারকেল বন।

মনে হল কারা যেন সেই নারকেল-বনের মধ্যে তাঁবু ফেলে রয়েছে। পাতার ফাঁকে সাদা তাঁবুর খানিক খানিক দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, আর কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছিল অস্ত্রের চকমকি, মনে হচ্ছিল কোনো প্রহরী তাঁবু পাহারা দিচ্ছে।

একজন মাঝ বয়সী লোক সেই নারকেল-বন থেকে বেরিয়ে এল, তার গায়ে লোহার সাজোয়া, হাতে ঢাল। অন্য হাতে তলোয়ার বা বর্শা কিছু একটা যেন ছিল। সে একবার আমাদের দিকে মুখ ফেরাতেই আমি বুঝলাম সে এই আটলান্টীয়দেরই সমগোত্র, এমন কি তাকে স্কার্পারই যমজ ভাই বলা যেতে পারত, কেবল তার মুখের চেহারা কর্কশ আর হিংস্র, তাতে মানুষ আর পশুর এক ভয়ঙ্কর সংমিশ্রণ। এই যদি স্কার্পার কোনো আগের জন্মের চেহারা হয়ে থাকে তাহলে বুদ্ধির দিক দিয়ে যতনা হোক মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে তিনি সেই পুরাতন স্কার্পার থেকে এখন অনেক উঁচুতে উঠেছেন।

'সাঁজোয়া পরা লোকটি সেই বাড়ির কাছে আসতে একটি অল্প বয়সী মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ভাবে মনে হল সে সেই লোকটিরই মেয়ে। লোকটি কিন্তু অযথা ক্ষেপে উঠে মেয়েকে মারতে গেল। মেয়েটি ভয়ে পিছিয়ে যেতেই সূর্যের আলো পড়ল তার সুন্দর মুখে, দেখলাম সে আর কেউ নয়, সোনা।

'রুপালী পর্দা ঝাপসা হয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে আবার আর একটি ছবি ফুটে উঠতে লাগল। পাহাড়ে ঘেরা এক সমুদ্র। ডাঙা থেকে অল্প দূরে একটা অদ্ভুত গড়নের নৌকা। তার দুদিকের গলুই খুব উঁচু, ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। তখন রাত্রি, জলের উপর জ্যোৎস্নার আলো চকচক করছে।

আমাদের চেনা তারাগুলি সেই আকাশেও জ্বলছিল। আস্তে আস্তে, যেন চুপি চুপি, নৌকাখানা এসে ডাঙায় লাগল। দুইজন লোক নৌকা বাইছিল, আর একজন সারাগায়ে কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে গলুইয়ের উপর বসে ছিল। এখন সে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। সেই উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় আমি তার মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সে আর কেউ নয়, আমি!

'হ্যাঁ আমিই আজকালকার নিউ ইয়র্ক ও অক্সফোর্ডের সাইরাস হেডলে, আধুনিক জগতের মানুষ এই আমিই একদিন পুরাকালের এই বিরাট আটলান্টীয় সভ্যতার অংশস্বরূপ ছিলাম। তখনই আমি বুঝতে পারলাম কেন সাগরতলের সেই রাজ্যে আমার চারিপাশের সাঙ্কেতিক চিহ্ন আর লেখাগুলি আমার অজানা হয়েও একটা নাম-না-জানা পরিচয়ের আভাস এনে দিত। সোনার সঙ্গে প্রথম দেখায় কেন এত আনন্দ হয়েছিল তাও তখনই বুঝলাম। এসবের কারণ ছিল আমার মনের ঘুমন্ত অংশটুকুর গহন অন্তস্তলে, যেখানে সঞ্চিত ছিল বারো হাজার বছরের স্মৃতি।

'একটু পরেই বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। তাকে আমি—সেই আমি—প্রায় তুলেই নৌকার উপর নিয়ে এলাম। এমন সময় একটা গোলমাল উঠল, আমি ক্ষেপার মত প্রাণপণে ইসারা করতে

লাগলাম নৌকা ছেড়ে দিতে। কিন্তু তার মধ্যে বনের ভিতর থেকে দলে দলে লোক এসে পড়েছে। অনেকগুলি হাত এসে পড়ল নৌকার উপর। আমি তাদের মেরে তাড়াবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। তার মধ্যে একজনের কুঠার শূন্যে ঝলকে উঠে আমার মাথায় পড়ল। আমি মরে' পড়ে' গেলাম সেই মেয়েটির গায়ের উপর, সে পাগলের মত চীৎকার করতে লাগল। তার বাবা ছুটে এসে তার লম্বা কালো চুলের মুঠি ধরে' আমার মৃতদেহের তলা থেকে তাকে টেনে বার করল। সেই স্কার্পা, আর সেই সোনা!

"আবার আর এক ছবি জলে উঠল। জাতির চরম বিপদের দিনে আশ্রয় পাবার জন্য সেই মহাজ্ঞানী আটলাণ্টীয় যে বিশাল শরণালয় তৈরী করিয়েছিলেন তারই ভিতরের দৃশ্য। যারা আশ্রয় নিয়েছে তার ভিতর তাদের মুখে কি আতঙ্ক। সেইখানে সোনাকে আর একবার দেখলাম। আর দেখলাম তার বাবাকেও, তিনি তখন আর আগেকার মত নন, তাঁর মুখের ভাব, তাঁর আচরণ, সবই অনেক উন্নত স্তরের। সেই বিশাল বাড়ির সমস্ত ভিতরটা দুলতে আরম্ভ করল, যেমন করে ঝড়ে জাহাজ দোলে। শরণার্থীরা কেউ বা থাম আঁকড়ে রইল, কেউ বা পড়ে' গেল মেঝের উপর। তার পর বাড়িটি বসে যেতে লাগল, ক্রমশঃ নীচে নামতে নামতে শেষে এসে পৌঁছাল সমুদ্রের তলায়। ছবি মিলিয়ে গেল, স্কার্পা আমাদের দিকে ফিরে মৃদু হেসে জানালেন এই শেষ।

'এর কিছু দিন পরে সেখানকার সমাজের এক ঘোর বিপদ উপস্থিত হয় এবং কেবল ডাঃ ম্যারাকটের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বলেই তা দূর হয়। সেই হল প্রভু ঘোরদর্শনের কথা, তাই দিয়েই আমার এই কাহিনী শেষ করব।

আগেই বলেছি শরণালয়টি সমুদ্রের নীচে যেখানে এসে পড়েছিল সেখান থেকে আসল শহরটির ধ্বংসাবশেষ বেশী দূরে নয়। পরে আরও অনেকবার সেখানে গেছি। সেখানকার বাড়িগুলির পাথর কুঁদে তৈরী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর, মস্ত মস্ত থাম মহাসাগরের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে অনুপ্রভার আলোয় নিথর নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেবল সামুদ্রিক আগাছার লতা পাতাগুলি আস্তে আস্তে দুলছে অন্তঃসাগরীয় স্রোতে। আর হয়ত কোন কোন বৃহৎকার মাছ যাচ্ছে আসছে সেই সব বিরাট বিরাট দরজার ভিতর দিয়ে। আমাদের বন্ধু মাণ্ডাকে নিয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুরাকালের সে অদ্ভুত স্থাপত্য নিদর্শন দেখে বেড়াতাম। দেখে দেখে মনে হয়েছিল নিছক বস্তুবাদের দিক দিকে, অর্থাৎ ভাল খাবারটি খাব ভাল বিছানায় শোব ভাল বাড়িতে থাকব যতরকম আরাম আছে তাই করব কেবল এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে, তাদের সভ্যতা আমাদের সভ্যতার চাইতে অনেক উন্নত ছিল। তারা মানুষের দৈহিক সুখ ও আরামের যত রকম ব্যবস্থা করতে পেরেছিল আমরা হয়ত এখনও তা পারিনি।

"কিন্তু কেবল দেহের আরামই তো নয়, অন্য দিক দিয়ে—যাকে বলা যায় তার আত্মিক দিক দিয়ে—আমরা যে তাদের চাইতে অনেক উঁচুতে তার প্রমাণ আমরা কিছুদিন পরেই পেয়েছিলাম। তখন বুঝেছিলাম যে এত বড় সভ্যতার পতনের কারণ কি। কেবল আমি একা নয়, সকলেই সুখী হোক, সকলেরই ভাল হোক—মানুষের ভিতরকার এই ভাবটা যখন তার বুদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না তখনই সভ্যতার সব চাইতে বড় বিপদ। এ বিষয়ে সাবধান না হলে একদিন আমাদের সভ্যতারও পতন হতে পারে।

সেই প্রাচীন শহরের একদিকে একটি প্রকাণ্ড ইমারত। হয়ত এককালে সেটা ছিল কোনো পাহাড়ের চূড়ায়, আমরা দেখলাম সেটা অন্যান্য বাড়ির চাইতে অনেকখানি উঁচুতে। কালো মার্বেল পাথরের চওড়া সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। সেই ইমারতটিও বেশীর ভাগ কালো মারবেলেই তৈরী, কিন্তু এখন তার সারাটা গা হলদে রঙের ছাতায় ঢাকা পড়েছে! দেউড়িটাও কালো পাথরের, উপরে মেডুসার (Medusa) মাথার মত একটি মাথা

আর তার চার দিকে ফণা-তোলা সাপ—সবই সেই পাথরে কোঁদা। দেওয়ালের গায়েও এখানে ওখানে সেই প্রতীকই আঁকা রয়েছে। আমরা মাঝে মাঝে সেই ইমারতের ভিতরে কি আছে দেখতে চাইতাম, কিন্তু মাগুা মহা ব্যস্ত হয়ে উঠে কেবল ইসারা করতেন ফিরে যাবার। এমনি করে' ক্রমশঃ আমাদের কৌতূহল এতই বেড়ে গেল যে শেষে স্ক্যান্‌ল্যান্ আর আমি একদিন পরামর্শ করলাম যে আমরা নিজেরাই একদিন গিয়ে তার ভিতরে ঢুকে দেখে আসব সেখানে এমন কি আছে যার জন্য মাগুা অত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এমন সময়ে ডাঃ ম্যারাকটই এসে ঘরে ঢুকলেন। আমি বললাম, 'আপনার কি এতে কোনো আপত্তি আছে, সার্? আপনিও হয়তো আমাদের সঙ্গে গিয়ে ঐ কৃষ্ণমর্মর প্রাসাদের রহস্য ভেদ করতে ইচ্ছুক আছেন?'

"তিনি বললেন, 'ওটা কৃষ্ণ মায়ার প্রাসাদও হতে পারে। তুমি কখনও প্রভু ঘোরদর্শনের কথা শুনেছ?'

"শুনিনি বলাতে তিনি বললেন, 'আটলান্টিসের কথা আমরা যা কিছু জানতে পারি তা ইজিপ্টের মারফতে। ইজিপ্টের দেবতা স্যাইসের মন্দিরের পুরোহিতরা যেটুকু জানতেন তারই সঙ্গে লোকের কল্পনা মিলে মিশে ক্রমে এক কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়েছে।'

"স্ক্যান্‌ল্যান্ বললে, 'তা কি জ্ঞানগর্ভ বাণী দিয়েছিলেন সেই পুরোহিতরা?'

"তারা অনেক কিছুই বলেছিল, তার মধ্যে এই প্রভু ঘোরদর্শনের কথাও আছে। আমার কেবলই মনে হয় সেই প্রভু ঘোরদর্শনই হয়ত বা ঐ কৃষ্ণমর্মর প্রাসাদের মালিক।'

"স্ক্যানল্যান শুধোলে, 'তিনি কোন ধাঁচের চিজ্?'

"তার সম্বন্ধে যা কিছু জানা যায় তাতে এই কেবল মনে হয় যে তার ক্ষমতাও যেমন দৌরাত্ম্যও তেমনি, দুইই এত বেশী যে মানুষের পক্ষে ততটা সম্ভব নয়। নিজে তো সে চূড়ান্ত মন্দ ছিলই, দেশের লোকেদেরও মন্দ করে' তোলাই যেন ছিল তার ব্রত। শেষটা ভগবান্ যেন চাইলেন সমস্ত মুছে ফেলে আবার নতুন করে' সুরু করতে আর সেই জন্যই যেন সমস্ত দেশটাই ধ্বংস হয়ে গেল। এই হল মোটামুটি প্রভু ঘোরদর্শনের কিংবদন্তী। তার মন্দ প্রভাব থেকে আটলান্টিসের সেই মহাপুরুষ যাদের বাঁচাতে পেরেছিলেন তারা অবশ্য রক্ষা পেয়েছিল এই শরণালয়ে আশ্রয় পেয়ে। তাদের বংশধরেরা তো প্রভু ঘোরদর্শনের আস্থানকে ভয় করবেই।'

'আমি বলে' উঠলাম, 'আর তাইতেই সেখানে ঢোকবার জন্য আমি আরো অস্থির হয়ে পড়েছি।'

'বিল্ বললে, 'আমারও ঠিক তাই হে ইয়ার।'

'প্রফেসর বললেন, 'তাহলে বলি, বাড়িটা ভাল করে' দেখবার ইচ্ছা আমারও আছে। আমাদের এখানকার বন্ধুরা আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক না হলেও আমরা নিজেরাই যদি যাই তাতে তাঁদের কোনো অনিষ্ট হবে বলে' আমার মনে হয় না। সুযোগ পেলেই আমরা যাব।'

সুযোগ আসতে কিছুদিন লাগল। একবার এক পর্ব উপলক্ষ্যে সেখানকার সকলেই ব্যস্ত রইল। প্রবেশ দ্বারের কাছে বিরাট পাম্পগুলির হেপাজতে দুজন লোক মাত্র ছিল, তাদের বুঝিয়ে বললাম আমরা একটু বাইরে বেড়াতে যেতে চাই। জল ঠেলে চলতে চলতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেই রহস্যময় প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছালাম। এবার আর ঢুকতে বাধা দেবার কেউ নেই। আমরা স্বচ্ছন্দে কালো মারবেলের সিঁড়ি বেয়ে উঠে সেই বিরাট দেউড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম।

'দেখলাম সেই প্রাচীন সহরের অন্যান্য বাড়িগুলির চাইতে এই ইমারতটি অনেক ভাল অবস্থায় আছে। তার পাথরের পাঁচীল আর ঘরগুলোর বলতে গেলে কোন ক্ষতিই হয়নি, কেবল সমস্ত আসবাবপত্র অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার জায়গায় প্রকৃতি তাঁর নিজের হাতের তৈরী জিনিস দিয়ে ঘর সাজিয়েছিলেন, যদিও

সে সব দেখতে বড়ই ভয়ঙ্কর। একেই তো জায়গাটি অন্ধকার, তার উপর সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেক পাওয়ালা বিকটদর্শন জীব আর যত কিম্ভুত চেহারার মাছ। বিশেষ করে আমার মনে পড়ে একরকম প্রকাণ্ড নীলচে লাল রঙের শামুক, কিন্তু তার খোলা নেই। সেগুলি সর্বত্র হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া একরকম বড় বড় কালো চ্যাপ্টা মাছ যা ঘরের মেঝের উপর মাদুরের মত বিছিয়ে পড়ে' ছিল। তাদের শুঁয়োর ডগায় যেন আগুনের শিখা কাঁপছে। সারা বাড়িটাই এমনি সব উদ্ভট জীবে ভরা।

"কিন্তু কি কারুকার্য! ঘরগুলির বাইরে, ভিতরে, বারান্দায়, সব জায়গায়। বাড়ির ঠিক মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড জমকালো ঘর। আমাদের টর্চের আলোয় দেওয়ালের কারুকার্য দেখলাম, কত রকম মূর্তি আর নকশা। শিল্পকলার দিক দিয়ে বলতেই হয় সেগুলি সবই অপূর্ব সুন্দর, তারচেয়ে বেশী সুন্দর হয়ত মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু সেগুলির মধ্যে এমন একটা নিষ্ঠুর ভাব যা মানুষের অযোগ্য। শয়তানের পূজার মন্দির যদি কোথাও থাকে তবে সে এই। তারপর এগিয়ে যেতে যেতে ক্রমশঃ দেখলাম ঘরের এক প্রান্তে এক ধাতুর তৈরী চাঁদোয়া, হয়ত সোনারই। তার নীচে লাল মারবেলের সিংহাসনের উপর বসে' এক ভয়ঙ্কর চেহারার দেবতা যেন অ-শিব। শরণালয়ের এক জায়গায় যে বেঅ্যালের মূর্তি দেখেছিলাম এও সেই ধরণেরই, কিন্তু আরো অনেক গুণ বেশী উদ্ভট আর ভয়ানক। কিন্তু তার সেই ভীষণ মুখে মন্দ ভাবের সঙ্গে এমন এক শক্তির ভাব ছিল যার দিকে একবার তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায়না। আমাদের হাতের আলোটা পড়েছিল সেই মুখের উপর, আমরা তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় আমাদের পিছন থেকে কে যেন হাহা করে' বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠল।

"আমাদের কাঁচের পোষাকের ভিতর থেকে কথা বললে তা যেমন কারও শোনবার উপায় ছিলনা তেমনি বাইরে থেকে কারও গলার আওয়াজও তার ভিতরে আসবার উপায় ছিলনা। তাছাড়া জলের মধ্যে হাসবেই বা কি করে? আশ্চর্য হয়ে পিছন ফিরে আমরা যা দেখলাম তাতে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

"ঘরের একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ—হ্যাঁ মানুষই বলতে হবে, কিন্তু মানুষ যে এমন হতে পারে তা কখনও ভাবিনি। মানুষ এই গভীর সমুদ্রের তলায় কোনও যন্ত্রের সাহায্য বিনা স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, শুধু তাই নয় কথাও বলছে, তার কথা আমাদের কানেও স্পষ্ট এসে পৌঁছাচ্ছে এসব দেখেই বুঝতে পারলাম যে আমাদের থেকে একেবারে আলাদা। দেখতে সে অসাধারণ সুপুরুষ। লম্বায় সাত ফুটের কম হবে না, অতি সুঠাম গড়ন, গায়ে সার্কাসের খেলোয়াড়দের মত আঁটো পোষাক, মনে হল সেটা কোনো চকচকে কালো চামড়ার তৈরী ব্রঞ্জের তৈরী মূর্তির মত মুখ, মানুষের মুখে কতখানি শক্তির আর তার সঙ্গে মন্দের ভাব ফোটানো যেতে পারে তাই দেখাবার জন্য যেন কোনো মহাশিল্পী সেই মূর্তি গড়েছে। যেন ঈগলের ঠোঁটের মত ধারালো নাক, কালো কুচকুচে দুই জবরদস্ত ভুরু, ঘনকালো চোখদুটো যেন ছাই চাপা আগুন, থেকে থেকে ঝলকে জ্বলে উঠছে। সেই চোখের চাউনিতে ফুটে বেরুচ্ছে মানুষের মন্দ করবার অহেতুক ইচ্ছা আর নিছক নিষ্ঠুরতার আনন্দ। পাতলা কিন্তু নির্মম ঋজু দুই ঠোঁট, যেন মুখের মাংসের উপর একটা গভীর কাটা দাগ শুধু। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই ঠোঁটের দিকে তাকালে মনে ত্রাস লাগে।

"যেন আমরা সবাই উপরকার পৃথিবীতেই রয়েছি এমনি সহজে, এমনি পরিষ্কার গলায় চমৎকার ইংরাজীতে সে বললে, 'মহাশয়রা, এর মধ্যে তোমরা অনেক নতুন জিনিস দেখেছ, জেনেছ; পরে হয়ত আরো জানবে। অবশ্য তোমাদের সব দেখা সব জানায় হঠাৎ দাঁড়ি টেনে দেওয়ার প্রীতিকর কাজটাও আমায় করতে হতে পারে। আপাততঃ আমাদের আলাপটা এক তরফাই হচ্ছে হয়ত, তবে তোমাদের মনের প্রত্যেকটি কথাই আমি ঠিকঠিক

টের পাই, কাজেই বিশেষ অসুবিধা হবেনা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তোমরা অনেক শিখলেও এখনও তোমাদের কিছু শেখবার আছে।'

"আমরা হতভম্ব হয়ে এ ওর দিকে চাইতে লাগলাম। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল জানতে এ ব্যাপারে কার কিরকম মনে হচ্ছে। আবার সেই বিদ্রূপভরা গলার হাসি জানতে পেলাম—

"ইচ্ছে তো হবেই। তা ফিরে গিয়ে তো কথাবার্তা বলতে পারবে। আমার ইচ্ছা তোমরা ফিরে যাও। তবে তার আগে তোমাদের কয়েকটি কথা বলতে চাই। ডাঃ ম্যারাকট্, তুমি এদের মধ্যে বড়, তোমাকেই বলি। আমি কে তা অবশ্য তোমরা জান। আমার সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে বা ভাবতে গেলেই আমি তা জানতে পারি। আর আমার এই গরীবখানায় দয়া করে' কেউ পা দিলেই আমায় তার কাছে এসে দেখা দিতে হয়। এই জন্যই ওখানকার ঐ বেচারারা এ জায়গাটা এড়িয়েই চলে আর চেয়েছিল যে তোমরাও এড়িয়ে চল। তোমরা তাদের কথা শুনে চললেই ভাল করতে।

"আমাকে তোমাদের একটা হেঁয়ালির মত মনে হচ্ছে, তোমাদের পৃথিবীর এক রতি বিজ্ঞান সম্বল করে' তোমরা তাই নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছ। আমি 'বিনা অক্সিজেনে বেঁচে আছি কেমন করে'? তোমাদের মধ্যেও কোনোকোনো লোক বিনা বাতাসে অনেকক্ষণ থাকতে পারে। সমাধিস্থ অবস্থায় কেউ কেউ নিঃশ্বাস না নিয়ে দিনের পর দিন থাকে। আমি তাদেরই মত, তবে আমি সজ্ঞান ও সক্রিয় অবস্থাতেই থাকি।'

"এইবার তোমরা ভেবে সারা হচ্ছ যে আমার কথা তোমাদের কানে যাচ্ছে কেমন করে'। বৈদ্যুতিক ঢেউকে বাতাসের ঢেউয়ে পরিবর্তিত করাই তো বেতারের গোড়াকার কথা। আমি কথাগুলিকে বৈদ্যুতিক উচ্চারণ থেকে বায়বীয় শব্দে পরিবর্তিত করছি আর সেই শব্দ তোমাদের ঐ মুখোশের ভিতরকার হাওয়া দিয়ে তোমাদের কানে গিয়ে ঢুকছে।

"আর আমার ইংরাজী? আশা করি মন্দ ইংরাজী বলিনা। তা পৃথিবীতে থাকলাম তো কিছু দিন। কত দিন হবে? এগার হাজার বছর চলছে, না বারো হাজার হল? বোধ হয় বারো হাজারই। মানুষের সব ভাষা শেখবারই সময় পেয়েছি আমি। অন্যান্য ভাষার চাইতে ইংরাজী যে বেশী ভাল বলি তা নয়।

"আচ্ছা এবার দরকারী কথা বলি শোন। আমি বেআল-সীপা। আমি প্রভু ঘোরদর্শন। আমিই সেই, যে প্রকৃতির রহস্য এতদূর ভেদ করেছে যে মৃত্যুকেও তুচ্ছ করতে পারে। এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে আমি ইচ্ছে করলেও আর মরতে পারবনা। যদি আমায় কখনও মরতে হয় তাহলে আমার ইচ্ছাশক্তির চাইতে আরও বলবান্ কোন ইচ্ছাশক্তির দরকার হবে। এদিক দিয়ে তোমরা বরং ভালই আছ। মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর মনে হতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবন অনেক গুণ বেশি ভয়ঙ্কর। তোমরা চিরকাল আমায় পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছ, আমি যেন পথের পাশে পড়েই আছি। এমনি করেই তো গোটা মানুষ জাতটার উপর আমার মন বিষিয়ে গেছে, এখন আমি পারলেই তাদের অনিষ্ট করি। কেমন করে' করি? যেখানে মন্দ যেখানে অন্যায় ইচ্ছা, সেখানেই মানুষের মন আমার এক্তিয়ারে, তখন আমি যেমন খুশি তাকে চালাই। হুনরা যখন অর্ধেক ইউরোপ ছারেখারে দিল আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। সারাসেনরা যখন ধর্মের নামে অন্য ধর্মের লোকেদের তলোয়ারের ঘায়ে কোতল করল আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। এমনি আরো কত! সমুদ্রের তলাকার এই ইঁদুরদের কথা এক রকম ভুলেই গিয়েছিলাম। দেখছি অনেক দিনই থেকে গেল, আর না থাকলেও চলে। যার ক্ষমতায় এরা আজ এখানে এসে রয়েছে সে বেঁচে থাকতে আমায় তুচ্ছ করেছিল। যে বিপর্যয়ে তাদের দেশ ধ্বংস হল তার থেকে এদের বাঁচাবার উপায় সেই করেছিল। তার বুদ্ধির জোরে এরা রক্ষা পেল, আর আমার আপন ক্ষমতার জোরে আমি রক্ষা

পেলাম। এখন এদের জীবন-নাট্যে যবনিকা টেনে দেব মনে করছি।'

আমার ভিতর থেকে একটুকরো লেখা বার করে সে বললে, এইটি নিয়ে গিয়ে কলের ইঁদুরদের সর্দারকে দিও। বড় দুঃখের কথা যে তোমরা কয়জন ভদ্রলোকও ওদের সঙ্গে একই অদৃষ্টের ভাগী হবে, তবে তোমরাই যখন এদের এই দুরদৃষ্টের কারণ তখন এটা একরকম উচিতও বটে। পরে আবার দেখা হবে। ততদিন তোমরা এই সব ছবি আর অন্যান্য কারুকার্যগুলি ভাল করে দেখে নাও। তোমরা এগুলিকে যাই মনে কর আমি এগুলি করিয়ে অনেক আনন্দ পেয়েছি, আমার মনে কোনো খেদ নেই। সে সব দিন যদি ফিরে পেতাম তাহলে আবার তাই করতাম, আরো বেশী করে করতাম—কেবল এই মারাত্মক অনন্ত জীবন লাভের চেষ্টাটা আর করতাম না। ও আজ আর যাই হোক এই অমরতা লাভের ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল। সে এখনও পৃথিবীতে আসে বটে কিন্তু সে একটা অশরীরী আত্মা হিসাবে, দেহধারী মানুষ হিসাবে নয়। আচ্ছা, আসি এখন।

'তারপর আমাদের চোখের সামনেই সে মিলিয়ে গেল! যে থামটিতে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল সেটা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। তার শরীরের ধারগুলো ঝাপসা হয়ে এল। চোখ দুটো যেন নিবে এল। তার পরেই দেখলাম সে নেই, শুধু খানিকটা কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠে যাচ্ছে। আমরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে' ভাবতে লাগলাম জীবনের কত বিচিত্র প্রকাশই না সম্ভব। ক্রমশঃ

সর্বনাশ

অশোক চক্রবর্তী

কয়লা-ধোয়া সেই নিশীথে
জ্যাব্ড়া-কালো একটা কি রে
একলা ছাদে হন্‌হনিয়ে
করছে দেখি পায়চারি রে।
ঘাবড়ে গেলাম (ভয়ই পেলাম)—
মানুষ না ও কোন জানোয়ার ?
ঠিক তখনি 'হালুম্' রবে
লাফিয়ে হল ছাদটি পার!

আঁৎকে উঠে সিঁড়ির মুখে
ছিট্‌কে পাশে যাই স'রে ;
আর কোথা যায় সামনে সিঁড়ি-
পড়ল বাছা গড়গড়ে'।
অনেকক্ষণ আর চোখ মেলিনি
লাগল এমন ভীষণ ভয়।
হঠাৎ শুনি গোঙরানি…হায়,
সেজ্‌দা ওযে—জন্তু নয়!!

এল. বি. ডব্লু

প্রসাদরঞ্জন রায়

(বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

'না, আর নয়। এবার খৃস্ট্‌মাসে কলকাতার বাইরে এমন কোথাও যেতে হ'বে যেখানে খেলাধুলোর ঝামেলা নেই। পড়াশুনো করা দরকার।'—ব্যাটটা ঘরের কোণে রাখতে রাখতে বললো শঙ্কর ব্যানার্জী, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের একজন সেরা ব্যাটসম্যান। 'সে কি রে। তুই এ বছরে তিনটে সেঞ্চুরী করেছিস—এর মধ্যেই বৈরাগ্য এসে গেল?' উত্তর দিল তার প্রাণের বন্ধু ও হস্টেলের রুমমেট সুদীপ্ত চন্দ। 'বৈরাগ্য না রে। স্কলারশিপ একটা আমার পাওয়া দরকার আর তার জন্য যা পড়াশুনো দরকার কলকাতায় হৈ চৈ'এ তা হবে না। কাজেই—' 'তবে যা, কোন ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে মাথা গোঁজ গিয়ে' অপ্রসন্ন মুখে সুদীপ্ত ঘর ছাড়ল!

মুখে রাগ করলেও হপ্তাদুই পরে খৃস্টমাসের ছুটিতে শেষ পর্যন্ত সুদীপ্তই শঙ্করের সঙ্গী হ'ল। শুধু তাই নয়—জায়গাটাও ঠিক করল সে। তার এক পিসীমা থাকেন রাণীপুরে। তাঁর হপ্তাদুইয়ের জন্য সুদীপ্তদের বাড়ী বোম্বাই'এ যাবার কথা কিন্তু বাড়ী ফাঁকা রেখে যেতে পারছেন না। রাণীপুর আসানসোলেরই কাছাকাছি। সুদীপ্ত'র মতে অজ পাড়াগাঁ। অতএব বিনা দ্বিধায় দুই বন্ধু রওনা দিল। পিসীমাও খুসি মনে বোম্বাই পাড়ি দিলেন।

ওদের ভুল ভাঙ্গতে বেশী দেরী হল না। স্টেশনে নেমে এদিক-ওদিক দেখেই শঙ্করের চক্ষুস্থির! দিব্যি পাকা রাস্তা, দোতলা বাড়ি, দোকানপাট, স্কুল, হাসপাতাল—রীতিমত শহর! সুদীপ্তও অবাক! সে শেষ আসে বছর সাতেক আগে। এর মধ্যেই গ্রামটা একেবারে শহর না হোক রীতিমত টাউনশিপে

পরিণত হয়েছে। 'যাই হোক, কলকাতার মতন ক্রিকেটের হুজুগ নেই ওদের নিশ্চয়' বলল শঙ্কর। সুদীপ্ত সায় দিল আর দুজনে পা চালাল পিসিমার বাড়ির উদ্দেশ্যে।

বাড়িটা কাছেই। কিন্তু তার আগেই একটা ঘটনা ঘটে গেল। মিনিট পাঁচেক হাঁটতেই কানে এল স্পষ্ট ব্যাটে বল লাগার খটাখট শব্দ। হতাশ মুখে শঙ্কর তাকাল সুদীপ্তর দিকে। সুদীপ্ত সবে বলতে যাবে যে ছোট ছেলেরা খেলছে বোধহয় এমন সময় বাঁদিকের পাঁচীলের উপর দিয়ে একটা ক্রিকেট বল যেন উড়ে এল। কাঁচাপাকা গোঁফদাড়িওলা একটি মুখও উঁকি দিল। এক লাফে বলটা ধরেই ফেরত পাঠিয়ে নিয়ে সুদীপ্ত বলে ওঠে 'হাউজ্ দ্যাট।' গোঁফওলা ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বললেন 'শুনুন, আপনারা কি ক্রি—'। কথা শেষ হবার আগেই শঙ্কর সুদীপ্তর হাত ধরে দে চম্পট।

দিনকয়েক পরে। সন্ধ্যাবেলা রাণীপুরের ডাক্তারখানায় সাত আটজন বসে আছেন। সকলেরই মুখ গম্ভীর। ব্যাপার ভয়ানক সিরিয়াস্। মাত্র দিনতিনেক পরেই রাণীপুর অ্যাথলেটিক ইউনিয়নের ক্রিকেট ম্যাচ—পাশের গ্রাম থুড়ি টাউনশিপ লক্ষ্মীপুরের সি. সি. এল. (ক্রিকেট ক্লাব অব লক্ষ্মীপুর)'-এর সঙ্গে। এই দুই গ্রাম বা শহরতলীর মধ্যে রেষারেষি দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রায় সব বিষয়েই। একের দেখাদেখি অন্যটিতে স্কুল, হাঁসপাতাল সবই হয়েছে। গত বছর পাঁচেক ধ'রে ক্রিকেট ম্যাচটি চালু হয়েছে। শুধু ছেলেছোকরা নয়, বয়স্ক লোকেরাও উৎসাহ দেন ও খেলেনও। আপাততঃ সমূহ বিপদ! —রাণীপুর গতবছর জিতেছিল, এক চোর ধরতে ডান হাতটি ভেঙ্গে বিরস মুখে ডাক্তারবাবু বিনয়বাবু আর অসিতবাবু কাঁচা পাকা দাড়িগোঁফ তাই আলোচনা করছিলেন। অসিতবাবুর লোহার ব্যবসা আছে। ক্লাবের ব্যাট, বল, প্যাড তিনিই কিনে দিয়েছেন। ক্যাপটেনও তিনি। গোমড়ামুখে তিনি বলছিলেন যে খেলাটা পিছিয়ে দেবার কোনো উপায়ই নিই। হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল শিবনাথ, হাইস্কুলের ছাত্র 'শুনেছেন ডাক্তারবাবু, লক্ষ্মীপুর এক সায়েব এনেছে!' সবাই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। প্রকাশ পেল যে হ্যারী ইভান্স ব'লে এক অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সাহেবকে ওরা কলকাতা থেকে আনিয়েছে। সে নাকি ক্যালকাটা ক্লাবে খেলত—ভারী ব্যাটসম্যান। সবাই বিমর্ষ হ'য়ে পড়ল। একে লক্ষ্মীপুরের 'ছোনে' দত্ত'র মত ফাস্ট্ বোলার রয়েছে তায় আবার ইভান্স! এদিকে শেখর বাবুর হাত ভাঙ্গা!

ডাক্তারবাবু বললেন 'কেউ বেড়াতে টেড়াতে আসেনি যে খেলতে পারে? অসিতবাবু বললেন 'হ্যাঁ হ্যাঁ! ধরেছেন ঠিক। সেদিন দুটি ছেলে এসেছে নিকুঞ্জবাবুর বাড়িতে। তারই মধ্যে একজন একটা বল লুফেছিল। কি লোফার কায়দা আর কি তার স্বাস্থ্য! দেখেই মনে হয় ভালো প্লেয়ার। অন্যটি অবশ্য হাড়গিলে-টাইপ।' পোস্টমাস্টারমশায় বললেন, 'হ্যাঁ, সেদিন একটা চিঠি পোস্ট করে গেল, নাম দেখলাম শঙ্কর ব্যানার্জী। ক্রিকেট-টিকেটও কিসব লিখেছিল ছোকরা।' ডাক্তারবাবু লাফিয়ে উঠলেন, 'ইউরেকা! শঙ্কর ব্যানার্জী তো এবছর ইউনিভার্সিটি আর স্পোর্টিং ইউনিয়ন এ খেলছে! ভাল ব্যাটসম্যান।' তিনি কলকাতার ক্রিকেটের খোঁজখবর রাখতেন।

তখনই ডাক্তারবাবু, অসিতবাবু আর শিবনাথ রওনা হ'লেন ওদের বাড়ির দিকে। বাড়িতে

ঢুকেই দেখলেন গেঞ্জী আর সাদা হাফপ্যান্ট পরে একটি ছেলে মুগুর ভাঁজছে। কি তার স্বাস্থ্য! ডাক্তারবাবু বুঝলেন এমন চেহারা যার সে ভাল খেলোয়াড় না হ'য়েই যায় না। তিনি প্রথমেই বললেন 'আপনিই তো প্রেসিডেন্সি কলেজের শঙ্কর ব্যানার্জী? ক্রিকেট খেলেন?' ছেলেটির মুখে একটু দুষ্টু হাসি খেলে গেল। সে সম্মতি জানালে ডাক্তারবাবু তাকে ঘটনাটা খুলে বললেন। সেতো খেলতে তখনই রাজি, তবে বলল 'আমার এক বন্ধু আছে, বুঝলেন—সুদীপ্ত। খেলতে অবশ্য সে খুব ভালো পারে না কিন্তু তাকেও না নিলে আমি খেলব না।' এঁরা রাজী হ'লে সে পাশের ঘর থেকে রোগা, লম্বা, চশমা পরা, ভুরু কোঁচকানো একটি ছেলেকে ডেকে আনল। সে বহু গাঁইগুই ক'রে শেষে রাজি হল। ফেরার পথে অসিতবাবু বললেন, 'ও হাড়গিলেটিকে না নিলেই ভাল হ'ত। অবশ্য ঐ শঙ্করই সেঞ্চুরী-টেঞ্চুরী হাঁকড়াবে।'

যদিও সবাই বললেন যে কাউকে একথা বলা উচিত নয় তবু সবাই সবাইকে বললেন আর কথাটা উঠল লক্ষ্মীপুরের ক্যাপটেন সুনীলবাবু'র কাছে। তিনি মহা ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলেন আম্পায়ার গিরীনবাবুর বাড়ি। ২০৲ হস্তান্তর হল। গিরীনবাবু রাজি হ'লেন শঙ্করের পায়ে লাগলেই এল. বি. ডব্লু. দিতে।

অবশেষে খেলার দিন এল। টসে জিতে সুনীলবাবু ব্যাটিং নিলেন। একদিক থেকে বোলিং শুরু করল শিবনাথ। ওভার শেষ হ'তেই শঙ্কর বলল, 'আমি ফাস্ট বোলিং করতে পারি।' অসিতবাবুতো মহা খুসি, ডাক্তারবাবু খালি বিনয়বাবুকে বললেন, 'কি রকম খটকা লাগছে! শঙ্কর ব্যানার্জী বোলিং করে ব'লে তো শুনি নি।' যাই হোক শঙ্কর বোলিং শুরু করল বেশ জোরে। প্রথম ওভারেই দু দুজন বোল্ড আউট। ডাক্তারবাবু মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'বোলিং 'এর কি ছিরি!' সুদীপ্ত একটু হাসল। বাকিরা নিশ্চয়ই বুঝল হিংসা! যাই হোক, শঙ্কর আর শিবনাথ দুজনেই একটা ক'রে উইকেট নিল। ৪ উইকেটে ৭ রান। ব্যাট করতে এলেন লম্বা দাড়িওয়ালা ইভান্স সাহেব। এসেই শঙ্করের বলে বাউণ্ডারী মারতে আরম্ভ করলেন। ৫টা বাউণ্ডারী মারার পর বোলিং বন্ধ করল। বিনয়বাবু বোলিং করতে এলেন। তিনি স্পিন বোলিং করেন কিন্তু ইভান্সের সঙ্গে পেরে উঠলেন না। অন্যদিকে 'ছোনে দত্ত' শিবনাথ আর অসিতবাবুর বলে বেপরোয়া মারতে লাগল। দেখতে দেখতে ৫০, ১০০, ১৫০ রান উঠে গেল। সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়! হঠাৎ 'ছোনে' দত্ত একটা বল সজোরে মারলে বলটা স্কোয়ার লেগের ভুঁড়িতে লেগে উপরে উঠে যায়। ডীপ ফাইন লেগে এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো সুদীপ্ত। হঠাৎ ছুটে এসে বলটা ধরে ফেলল। হাততালি পড়ল। বিনয়বাবু বললেন, 'ঝড়ে বক মরে—' ৬১ রান ক'রে 'ছোনে' দত্ত আউট হ'লেন। তার একটু পরেই শিবনাথ হ্যারি ইভান্সকে রান আউট করে দিল ৯১ রানের মাথায়। অল্প পরেই ১৮৭ রানে সি. সি. এল. সকলে আউট হ'য়ে গেল। বাকী উইকেটগুলি বিনয়বাবুই পেলেন।

বিশ্রামের পর ডাক্তারবাবু আর পোস্টমাস্টারমশায় নামলেন ইনিংস শুরু করতে। ১ রান ক'রেই 'ছোনে' দত্তর বলে খুঁচিয়ে স্লিপে ক্যাচ দিলেন পোস্টমাস্টারমশায়। ইভান্স জাঁদরেল খেলোয়াড়—

লুফলেন ঠিক। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছোনে দত্ত খেলার ভোল পাল্টে দিল। ৫ উইকেটে ২১ রান ডাক্তারবাবু ১০ ক'রে নট আউট। খেলতে নামল শঙ্কর। সবাই উৎসাহের সঙ্গে দেখতে থাকলেন। 'ছোনে' দ'ত্তর প্রথম বল—সজোরে বোলারের মাথার উপর দিয়ে ছয়। পরের বল আবার ছয়! তৃতীয় বলে বাউণ্ডারী; চতুর্থ বলেও!! সাবাস্ সাবাস্—এই না হ'লে প্লেয়ার। ডাক্তারবাবু মনে মনে বললেন, 'আনাড়ী!' অসিতবাবু বুঝলেন জাত খেলোয়াড়। কিন্তু পরের ওভারে, একটা বল লাগল শঙ্করের প্যাডে। 'হাউজ্ দ্যাট্?'—লাফিয়ে উঠলেন সুনীলবাবু। আম্পায়ার গিরীনবাবু আঙুল তুলে দিলেন। ৩৪ রান ক'রে আউট হ'ল শঙ্কর—এল. বি. ডব্লু.। দেখতে দেখতে ৮টা উইকেট পড়ল।

খেলতে এল সুদীপ্ত। 'ছোনে' দত্ত হেসেই বাঁচেনা—'এ হাড়গিলেটা কি খেলবে হে!!!' প্রথম বলটা হ'ল আস্তে, সুদীপ্ত সেটাকে আস্তে বাউণ্ডারীতে পাঠাল। পরেরটা এল একটু জোরে—সেটা বাউণ্ডারীতেও গেল একটু জোরে। তৃতীয় বল রীতিমত জোরে—সজোরে কাট করে সেটাকে ডীপ থার্ডম্যান বাউণ্ডারীতে পাঠাল সুদীপ্ত। ডাক্তারবাবুর মুখ হাঁ হ'য়ে গেল। অসিতবাবু ঠিক বুঝলেন, 'Fluke!' কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন ডাক্তারবাবু ২২ ক'রে আউট হ'লেন, তখন সুদীপ্ত'র রান ৫৬—মোট ৯ উইকেটে ১২৫। ব্যাট করতে এল শিবনাথ। সে দাঁত কামড়ে উইকেট আঁকড়ে রইল। রান করছিল সুদীপ্ত।

অস্থির হ'য়ে সুনীলবাবু গিরীনবাবুকে বললেন 'আরেকটা এল. বি. ডব্লু! চটপট!!' গিরীনবাবু বললেন, 'প্যাডে বলই লাগছে না!' 'তবে আর কিছু আউট দিয়ে দাও।' 'আর কুড়িটা টাকা স্যার?' —গিরীনবাবুর উত্তর। 'সে পরে পাবে।' বলেন সুনীলবাবু। 'আউটও পরে হবে' গিরীনবাবুর সোজা জবাব। হতাশ হ'য়ে সুনীলবাবু ফিরে এলেন। 'লাস্ট ওভার' গিরীনবাবু হেঁকে বললেন। তৃতীয় বলে চার—সুদীপ্ত'র সেঞ্চুরী হ'ল। পঞ্চম বলে চার, শেষ বলে ছয়। রানীপুর জিতে গেল—৯ উইকেটে ১৯০—সুদীপ্ত ১১৩ নট আউট, শিবনাথ ৮ নট আউট।

খেলা শেষ হ'তেই ডাক্তারবাবু ছুটে এসে বললেন, 'এর মানে কি?' সুদীপ্ত আর শঙ্কর হেসে বলল, 'ঠাট্টা! নেহাৎ হার্মলেস ঠাট্টা!!' ওদিক থেকে অসিতবাবু এসে বললেন 'জানেন শঙ্করবাবু, ওরা ঘুষ দিয়ে আপনাকে এল. বি. ডব্লু. আউট করেছে'—তিনি রাগে কাঁপছিলেন। শুনে আসল শঙ্কর হেসেই অস্থির 'আরে মশাই মিড্ল্ স্টাম্পের উপর ফুল টস বল—সোজা পায়ে লেগেছে। নির্ঘাৎ আউট!' 'নারে—' ব'লে ও প্রতিবাদ করতে যেতেই বন্ধুকে থামিয়ে সে বলল আবার, 'থাম তো! ক্রিকেটের তুই বুঝিস কি?' অসিতবাবুর তো চক্ষুস্থির—হাড়গিলেটা বলে কি! ডাক্তারবাবু হেসে বলেন, 'এবারে শুনুন—যাকে আমরা সুদীপ্ত বলে জানতাম সেই শঙ্কর, আর শঙ্করই আসলে সুদীপ্ত।'

অসিতবাবু কোনমতে সামলে নিয়ে বললেন, 'তা আমি আগেই বুঝেছিলাম।' শঙ্কর সুদীপ্তকে বলল, 'তাড়াতাড়ি চল, পড়া আছে।' অসিতবাবু ভাবলেন, 'অ্যাঁ! ঐ হাড়গিলেটা—!'

শালতোড়া গ্রাম

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

অনেক দূরে শিপ্রা নদীর ধারে
আছে রে ভাই ছোট্ট সে এক গ্রাম
নীল চাঁদোয়া আকাশ যেথা রচে
মিষ্টি মধুর শালতোড়া তার নাম।
সেথায় আছে ছোট্ট রাখাল ছেলে
সবুজ মাঠে বেড়ায় হেসে খেলে
স্বপ্ন ফড়িং ঘাসের বুকে দোলে
বন উতরোল হাওয়ায় অবিরাম
শ্যামলা ছেলে বাজায় বাঁশি সুখে
চাঁদের আলোয় ঘুমায় ছোট গ্রাম।

রাখাল ছেলের দুচোখ ভরা আশা
হাওয়ায় শোনে মুক্ত প্রাণের গান
ঘাসের বুকে শিশির যখন ঝলে
খুসির নেশায় উথলে ওঠে প্রাণ।
বর্ষারাণীর নূপুর যখন বাজে
আকাশ ঘনায় নিথর-নিঝুম সাঁঝে
বিজলি হানে সজল মেঘের মাঝে
রাখাল ছেলের হৃদয়টা আনচান
বন-কুসুমের সুবাস আসে ঘরে
শ্যামলা ছেলে কণ্ঠে ধরে গান।

শিপ্রা নদীর শান্ত-অথৈ জলে
ঢেউয়ের সাথে আপনি করে খেলা।
আবার কখন গাছের ছায়ে শুয়ে
পাতার কাঁপন শুনবে সারা বেলা,
রাঙা ধুলোয় বাতাস গেল বয়ে
ঘাসের ডগা পড়লো হঠাৎ নুয়ে
পাগল হাওয়া কোন কথা যায় কয়ে
রাখাল ছেলের হৃদয়ে দেয় দোলা।
উদাস ঘুঘু বিভোর হয়ে ডাকে
আলোছায়ায় করল শুরু খেলা।

ছোট্ট সে গ্রাম হাতছানিতে ডাকে
শিপ্রা নদী ছন্দে আপন হারা।
রাখাল ছেলে বাঁশীর মোহন সুরে
ছড়ায় সেথা সুরের সুধাধারা।
আকাশ-মাটি মিলন রাখী গড়ে
চাঁদের আলোয় আশিসধারা ঝরে
দখিন হাওয়া মনটি দেবে ভরে
ছন্দে গানে হবেই মাতোয়ারা।
শালতোড়া গ্রাম সোনার স্বপন-ছবি
ঝর্ণা নামে যেথায় কলস্বরা।

লালির মনে ভারি দুঃখ। অন্য মুরগিদের অনেক ছানা হয়েছে,—কেমন গোল গড়ন, সরু ঠোঁট, ছোট ছোট পায়ে তুরতুর করে ছোটে। লালির মোটে একটা ছানা, তাও ধ্যাবড়া গড়ন, চ্যাপটা ঠোঁট, থ্যাবড়া পায়ে ল্যাগব্যাগ করে হাঁটে, সবাই হাসে, বলে—'ছ্যাঃ-ছ্যাঃ-ছ্যাঃ।'

সেদিন মুরগিরা সবাই বাইরে বেড়াতে গেল। সব ছানারা ঘাসে খেলা করছে, আর লালির ছানাটা সোজা গিয়ে পুকুরে নামল। লালি কত চেঁচাল, সে ফিরেও চাইল না, কচি ডানা ঝাপটিয়ে, থ্যাবড়া পায়ে জল ছিটিয়ে মনের আনন্দে স্নান করতে লাগল!

হঠাৎ 'প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক!'—পাশের বাড়ি থেকে একপাল ছানা নিয়ে দুটো হাঁস এসে জলে নামল। লালির ছানাও অমনি 'প্যাঁক-প্যাঁক' করে, সাঁতার কেটে চলল সেই দিকে—এমনি তাদের দলে মিশে গেল যে লালি চিনতেই পারল না কোনটা তার ছানা!

সাদি, কালি, লালি, হলদি, সবাই অবাক হয়ে বলল—'কঁক-কঁক-কঁক? এর মানে কি?'

এর মানে যে কি, তা শুধু ভজুয়া জানে। ভজুয়া দুই বাড়িতেই কাজ করে। সাদি, কালি বসে ডিমে তা দেয়, লালির ডিম নেই, তবু সে ওদের দেখাদেখি বসে থাকে, তাই ভজুয়া চুপিচুপি ও-বাড়ি থেকে একটা হাঁসের ডিম এনে লালির ঝুড়িতে রেখেছিল। ডিম ফুটে যখন ছানা বেরোল, লালি ভাবল ওটা তারই ছানা!

(১) জয়শ্রী তরাত, ২০৮৬, বয়স ১৩

মাঝে মাঝে হয়তো দেখে থাকবে বইয়ের গোড়ার পাতায় লেখা 'সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত'। তার মানে কি জান? তার মানে হল ঐ লেখার মালিক ছাড়া আর যে কেউ ছাপতে পারে না। তুমি যে সব গানের কথা লিখেছ, তার মালিক তো আমরা নই, ভাই।

(২) উত্তমকুমার বটব্যাল, ১৪৮১, বয়স ১২½

তোমরা খুসি হলে, আমরাও আরো খুসি হই। পুরস্কারের চেয়েও তোমাদের খুসিটা বড়। তোমার ছয় ঋতুর ছড়া ভালো হয়েছে, যদিও দু-এক জায়গায় ছন্দ ঠিক নেই। জায়গা পেলেই ছাপার ইচ্ছা আছে।

(৩) সুকন্যা সিংহ. ৪৯৩, বয়স ১১½

জান তো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন যা দেখা যায়, শোনা যায়, বেছে বেছে মনের মধ্যে জমা করে রাখতে হয়। কারণ ঐগুলোই হল সাহিত্য বা শিল্প সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। তাকে অবিশ্যি মনের রস দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হয়। দেখি সত্যিকার জীবনের ছোট ছোট ঘটনা লেখার কতদুর কি করতে পারি।

(৪) শ্রুবাবতী চক্রবর্তী, ২২০৪

বয়স দিতে হয় জান না বুঝি? সর্বদা দিও। 'ম্যারাকট ডীপ' ধারাবাহিকভাবে চলছে, তবু বলছ অনুবাদ ছাপা হয় না, এ কেমন কথা?

(৫) অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭৩১, বয়স ৯ বছর

ভাই তোমার চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নি বলে আমি দুঃখিত। বোধ হয় হারিয়ে গেছে। যাই হোক, এবার দিচ্ছি। লেখা পাঠালে সর্বদা এক পিঠে নিজের হাতে কালি দিয়ে লিখবে। ড্রইং একটু মোটা কাগজে, একটু বড় কালি দিয়ে এঁকে পাঠাবে।. দাগ কাটার দরকার নেই। মন থেকে ছবি এঁকো, কপি করে পাঠিও না। কেমন?

(৬) শান্তনু সেন, ৪১৮, বয়স ১৩

ভাই, ছবি তো ভালই আঁক মনে হচ্ছে, কিন্তু ওরকম কাগজের কুচিতে ওভাবে আঁকলে ব্লক তৈরি করা মুস্কিল। তার উপর কেমন যেন ধেবড়ে গেছে।

(৭) মনামীর পুরো নাম কি? গ্রাহক সংখ্যা কত? বয়স কত?

(৮) সুবীর অধিকারী, ১৪৫৬, বয়স?

বয়স না দিলে ভাই, কোনো লেখা বা ছবি ছাপা হয় না।

(৯) চৈতালি সান্যাল, ২৬১২, সর্বদা বয়স দেবে।

মহাশ্বেতার ধাঁধার উত্তর যতদুর মনে পড়ছে, মাছ ধরার জাল।

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

ঘন বনের জ্ঞাতি

জীবন সর্দার

ছোটবেলায় আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল জাকৃকু। দিনে একবার তার সাথে দেখা না হলে আমার ঘুম আসত না রাতে। সারা সকাল পড়াশুনা, দুপুরে ইস্কুল সেরে বিকেলে ঘরে এসে বই রেখেই ডাকতুম—জাক্‌কু। কোথাও না কোথাও থেকে সে সাড়া দিত: কু উ-উ। তারপর ছাদ থেকে বা গাছ থেকে নেবে এসে কাঁধে চড়ে বসত। তার জন্য বাদাম বা কলা রাখতুম পকেটে! কোন পকেটে কি আছে, কেমন করে বার করে তা খেতে হবে, ছোট্ট হলেও, সে সব জানতো বুঝতো। বড় হয়ে সে কিছুটা বদলে গেল। কথা কম শুনতো। আঁচড়ে দিত, কামড়ে দিত যখন তখন। তাই একদিন, অবাদা, যিনি বাজার করতেন, জল তুলতেন আর জাকৃকুর যত্ন করতেন, রেগে মেগে জাকৃকুকে কোথায় পার করে দিয়ে এলেন।

তারও কিছুদিন পর আমি গ্রাম ছেড়ে নদী পেরিয়ে দেশ ঘুরতে যাই। যেখানেই গিয়েছি, জাকৃকুকে খুঁজেছি। জাকৃকুকে না পাই, জাককুর মত অনেকের দেখা পেয়েছি। জাকৃকুর কথা বললেই অবাদা ভেউ ভেউ করে কাঁদতেন, আর বলতেন, 'তোরা বুঝবিনা, ও যে আমাদের জ্ঞাতি—আদি পুরুষের বংশধর, জ্ঞাতি হারালে কাঁদে না লোকে?' তার কথা শুনে হাসি পেত। আসামের জংগলে একবার 'জ্ঞাতিদের' হাঁকাহাঁকি শুনে আমার মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল।

কাছাড়-পাহাড়ের ভেতর দিয়ে লামডিং থেকে বদরপুর যাবার রেলপথ। সকালের গাড়ীতে চেপেছিলাম দুপাশের ঘন বন আর পাহাড়ের সুড়ঙ্গ আর রেলপুলগুলি দেখব বলে। পথে কি কারণে জানিনা মৈবং এর কিছু আগে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। অনেকেই নেবেছিল, আমিও নাবলুম। গারডের কামরা ছাড়িয়ে পাহাড়ের বাঁকে ঝরণার ধারে আসতেই—মাথার উপর চারধার থেকে হাঁকাহাঁকি শুরু: উলুক-উলুক লুক। আমি হিম হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম, যেন গাছ হয়ে গেছি। ওদের বুদ্ধি আমার চেয়ে বেশি। আমার দিক থেকে একবারও নজর ফেরাল না। লম্বা হাতে গাছের ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে দোল খেয়ে নিরাপদ জায়গায় বসে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কেউ। দু'একটি গাছ বেয়ে নেবে আসতেই তাদের দিকে মুখ করে আমি পিছু ছুটলাম। শাদা ভ্রূ ওয়ালা 'উললুক' গুলো মাটিতে প্রায়

সোজা হয়ে চলে। দেহের তুলনায় হাতগুলো অনেক লম্বা, চলার সময় তার উপর ভর করে যতই এগিয়ে এলো আমি পেছতে পেছতে ততক্ষণে গাড়ির কাছে। জয় হয়েছিল তাদেরই। আনন্দে 'উলু' দিতে দিতে গাছের পাতা ছিঁড়ে মুখে পুরে বিজয় ভোজ শুরু করলো।

এমনি হঠাৎ মুখোমুখি হয়েছিলাম 'সিংহ লেজ বানরের' সাথে। গোয়া যাবার গাড়ি ধরব বলে খুব সকালে গোন্দা স্টেশনে নেবেছি। পুনা থেকে ট্রেনটি আসার দেরী ছিল। হাঁটতে হাঁটতে এমন একটি জায়গায় এসে পড়লাম যারপরই ঘন বন। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই গাছের উপর থেকে কচি বাঁদরের কান্না শুনতে পেলাম। আমাকে দেখে নয়, মায়ের কাছে কোন কিছুর আবদার করছে ছানাটি।

মায়ের নজর ছানার দিকে নয়, আমার দিকে। আমার নজর তার দিক থেকে গাছে গাছে। আরও কয়েকটি মা, তাদের বুকেও ছোট ছানা। আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। বড় গাছের ঘন পাতায় আড়ালে হয়তো রাত কাটিয়ে এই বেলা বনে ফিরবে। এমনি সময়ে আমি গিয়ে হাজির—কথাগুলি ভাবছি আর দেখছি কোন পথে ফিরি।

ছানাটি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গাছ বেয়ে নেবে এলো খানিকটা, তার মা, যার মুখের চারপাশে বড় বড় লোম—যেমন থাকে সিংহের কেশর, আমার দিক থেকে নজর ফিরিয়ে নিলনা। সিংহের লেজের মতই তার লেজের ডগা—তুলির মত, লোমে ভরা।

হাত বাড়িয়ে সে বাচ্চাটাকে বুকে টেনে নিল। লেজটাকে তুলে পিঠের উপর সোজা করে একবার আমার দিকে ঝুঁকি দিয়ে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে ডাল থেকে ডাল ধরে বনের ভেতর চলে গেল। ভয়ে আমি প্রায় চোখ বুজে ফেলেছিলাম। সে চলে গেলেও আর কেউ গেল না। তারা মোট বার চোদ্দটি হবে বসে বসে গাছ থেকে পোকা মাকড় ধরে ধরে খাচ্ছিল। আমার দিকে নজরই নেই। আমিও যেন তাদের দেখিনি এমনি ভান করে যেমন ভাবে সেখানে গিয়ে পড়েছিলাম তেমনি আনমনে চলে এলাম।

যে ধরনের বাঁদরকে বহু খুঁজেও দেখতে পাইনি সেটা আসামের ছোট্ট অসুর। তারা রাতে চলাফেরা করে, যা পায় তাই খায়—পোকা মাকড় ফলমুল। দিনে তাদের দেখা পাওয়া মুশকিল। খুব ধীরে ধীরে ডালে ডালে চলে বলে শব্দ কম হয়। বোঝা যায় না গতিবিধি। বনে যারা কাঠ কাটতে বেত আনতে যায় তাদের একজন আমাকে বলেছিলেন, তিনি দেখেছেন ওদের কবজী সরু বটে কিন্তু হাতের পাণজা খুব চওড়া। গাছের ডালে বাচ্চা নিয়েও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। গাছের তলা থেকে তখন খরগোসের মুখের মত তার মুখটি দেখায়। রাত্রিবেলা চলাফেরা করে বলেই ঘন বনের এই জ্ঞাতিদের দেখা তাদের বাসায় কোনদিন পাইনি। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন বনে আসামের এই নিশাচর বাঁদরদের চেয়েও ছোট একজাতের নিশাচর বাঁদর রয়েছে। হাবভাব চলাফেরায় তাদের খুব মিল। আর তাই তাদের দেখা পাইনি।

দক্ষিণ-ভারতে হরদম চোখে পড়েছে 'টুপি মাথা' বাঁদরগুলোকে। উত্তর ভারতের তীর্থে তীর্থে

যেমন হনুমান, দক্ষিণের 'টুপিমাথা' গুলোও তেমনি মানুষকে কোন তোয়াক্কা করে না। পাহাড়ে বনে ক্ষেতে গ্রামে সবখানে দেখেছি ও গুলোকে। মাথার চুলগুলো এত বড় আর এমন করে থাকে দেখে মনে হয় মাথায় কিছু একটা ঢাকা দিয়ে রেখেছে। লেজটা কিন্তু বেজায় বড়। গাছের ডালে লেজ জড়িয়ে হাত পা ছেড়ে দোল খাচ্ছে এমন একটা ছবি আমি দেখব বলে আশা করেছিলাম। দেখিনি।

আসামের ঘন পাহাড়ি বনের এক ধরনের হনুমানের খবর আমি পেয়েছি তাদের গায়ের লোম গরমকালে থাকে ঘিয়ের রং আর শীতে তা পালটে হয় সোনালী-লাল। খুব সুন্দর। কিন্তু যে যত সুন্দর হোক, যদিও জাকৃকুকে খুঁজতে গিয়েই তাদের দেখা আমি পেয়েছি, তবুও জাককুর চেয়ে বেশি কাউকে আমি ভালবাসিনে।

প্রকৃতি-পড়ুয়াদের পরিবেশ

প্র প, অলকানন্দা চট্টোপাধ্যায় লিখেছে :—আমি থাকি পানিহাটীতে। পানিহাটী আধা শহর আধা গ্রাম। কারণ, শহরের অনেক সুযোগ সুবিধাই আমরা পাই আবার গ্রামের নির্জনতা আর সৌন্দর্যের অভাবও এখানে নেই। আমাদের বাড়ির উত্তরদিকে পুকুর, তার ধারে কলা, কল্কে প্রভৃতি নানারকমের গাছ। পুবদিকে এক বিরাট মাঠ—তার খানিকটা জংগলে ভর্তি। সেই মাঠে প্রচুর আমগাছ। দক্ষিণ দিকে ফুলের বাগান, তার পাশে রাস্তা। বাড়ির পশ্চিমদিকে বেল কল্কে আর কয়েকটা নাম না জানা বড় গাছ। আমাদের বাড়িতে সাত আটটা নারকেল গাছ আছে। প্রত্যেকটা গাছেই টিয়া আসে। চারদিকে গাছপালা থাকায় সবসময়ই আমরা নানারকম পাখি দেখতে পাই। আমাদের বাড়ির খুব কাছেই গঙ্গা।

[অলকানন্দা, যে যে পাখির বিবরণ লিখেছ তা দপ্তরে পাঠাও। আরও দেখ, পাখিদের রং, তাদের ডাক, কি খায় আর কেমন করে ওড়ে। ডানা ঝাপটে না পাশে মেলে দিয়ে বাতাসে ভেসে থাকে ? জী. স.]

প্র. প. শুভময় আর কল্যাণময় চট্টোপাধায় লিখেছে : আমাদের বাড়ির পাশে আছে একটি মাঠ. বর্ষাকালে সেটী পরিণত হয় একটি পুকুরে। তখন সেখানে মাছ ও ব্যাঙের মেলা বসে। সন্ধ্যে হলেই সেখান থেকে ছোট ছোট ব্যাং উঠে এসে আমাদের বাড়িতে ঢোকে। একদিন একটা বিরাট কালো ব্যাংও ঢুকে পড়েছিল। ওই মাঠ-পুকুরের মাছ আমি নিজের হাতে ধরে দেখিনি। পাড়ার ছেলেদের হাতে দেখে মনে হয়েছে ওগুলো ল্যাটা মাছ। উই পোকাগুলো আমাদের খুব কাছাকাছি থাকতে আসে। যেখানে সেখানে, বিশেষ করে দরজার মাথা থেকে তারা বাসা বানাতে শুরু করে দেয় সুযোগ পেলেই বাড়ির আনাচে কানাচে মাঠের মধ্যে অনেক রকম পোকামাকড় দেখতে পাই। পিঁপড়ে প্রভৃতিরও অভাব নেই।

[শুভময়, কল্যাণময়, তোমরা লিখতে ভুলে গিয়েছ জায়গাটির নাম—যার প্রাকৃতিক পরিবেশ জানিয়েছ। জী. স.]

প্র. প মিত্রা রায়চৌধুরী লিখেছ: আমাদের বাড়ির পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া একেবারেই প্রকৃতির মুক্ত আবহাওয়ার মত নয়। আমাদের বাড়ির চারপাশেই বাড়ি। তার ফাঁকে ফাঁকে আম, নিম, জামরুল পেয়ারা নারকেল এমনি কয়েক জাতের গাছ। বাড়িতে রয়েছে বিড়াল, টিয়া বদ্রিকা আর বিভিন্ন ধরনের মুনিয়া। একদিন আমাদের বাড়িতে একটা প্রজাপতি এসেছিল। প্রজাপতিটা প্রায় চারদিন একজায়গায় বসে ছিল। আমি জানতাম প্রজাপতি একদিনের বেশি বাঁচে না। তাহলে এটা কি করে এতদিন বাঁচলে? বিড়ালদের গা পরিষ্কার করার পদ্ধতিটা খুব মজার—লক্ষ্য করেছি। ওরা জলের কাছে যায় না, নিজেদের গা চেটে পরিষ্কার করে। মাথা চাটতে পারে না তাই হাতটা ভাল করে চেটে ভিজিয়ে নিয়ে মাথায় ঘষে, তাতেই মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়।

[মিতা, পরিবেশের কথায় বিশেষ একটা প্রাণীর কথা এনে ফেলেছ। বাড়ির পাখিগুলোর পরিষ্কার হবার পদ্ধতি কি লক্ষ্য করে জানাতে পারবে? জী. স.]

পাখি গোনা: সন্দেশ কার্যালয়ে 'প্রকৃতি পড়ুয়ার পাঠশালায়' প্রতি মাসের প্রথম রোববার যে পড়ুয়ারা আসে তাদের একটা কাজ 'পাখি গোনা'। পাখি গোনা মানে, একমাস ধরে যত জাতের পাখি সে দেখেছে তার তালিকা তৈরী করা। চড়ুই কাক চিল শালিক কিছুই বাদ যাবে না। পাখিটির কি নাম, কোথায় তাকে দেখলে, দিনের কোন সময়ে তাকে দেখলে, সেখানে পাখিটি কি করছিল—সব লিখতে হবে। যদি পাখিটার নাম জানা না থাকে তবে তার রং, তার স্বর, ঠোঁট পায়ের ডানার গড়ন সব লিখতে হবে। আমি ভাবছি শুধু প্র প পাঠশালার পড়ুয়ারাই এই কাজটা করতে পারে—কেননা, পাখি গোনা মানেইত' পাখি চেনার শুরু। তোমার তালিকাটা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম রোববারের আগেই প্র. প. দপ্তর, সন্দেশ কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিও।

পুস্তক পরিচয়

কল্যাণী কার্লেকার

সেদিনকে—শ্রীমান উজ্জ্বল। নীরাঞ্জনা প্রকাশনী—৩৫ সি মতিলাল নেহরু রোড, কলকাতা ২৯। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

এখন যদি উজ্জ্বলকৃষ্ণ গোস্বামীর বয়স সাত বছর হয়, যদি বছর দেড়েকের সংগ্রহ এই আটপাতার ছোট্ট বইখানায় থেকে থাকে, তবে তার শুরু উজ্জ্বলের সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে। তরতরে, ঝরঝরে ভাষা। রচনার বিষয় ও ভাবে ওই বয়সের ছেলের মনটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বড়রা কি ভাববে জানি না, কিন্তু সমবয়সী ছোটরা নিশ্চয়ই আনন্দ পাবে।

আগাগোড়া বড় হরফে ছাপা বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় কেন ছোট হরফ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে? বইয়ের আয়তন আট পৃষ্ঠায় রাখবার জন্য?

ক্রীড়াজগৎ

অজয় হোম

ক্রিকেট

সাহসীরাই একমাত্র ভাগ্যলক্ষ্মীকে বরণ করতে পারে— এই ধরনের কথা কেবল শুনেই এসেছি। সেটা প্রত্যক্ষ করলাম দিল্লীর ফিরোজশাহ কোটলা মাঠে। গোড়াপত্তন অবশ্য হয়েছিল দ্বিতীয় টেস্ট কানপুরের গ্রীন পার্কে। তোমাদের একটা কথা গত ডিসেম্বর সংখ্যায় বলেছি— ক্রিকেটে আত্মবিশ্বাস সাফল্যের এক বড়ো হাতিয়ার। সেই আত্মবিশ্বাস ভারত অর্জন করেছে কানপুরে। আর সাফল্যলাভ করেছে রাজধানী দিল্লীতে! ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্নমুখে হেসেছেন।

দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের নির্বাচকমণ্ডলী প্রথম টেস্ট দল থেকে চারজন খেলোয়াড়কে বাদ দিয়ে সে জায়গায় যখন চারজন তরুণ খেলোয়াড়কে নেন তখন অনেকেই সেই নির্বাচন সমর্থন করেন নি, সমালোচনা করেছেন। 'সন্দেশে'-এর পাতায় সেই নির্বাচনকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। তার ফলে ভারত এমন একজন তরুণ খেলোয়াড় পেয়েছে যার তুলনা হয় না, যার খেলা মনে পড়িয়ে দেয় পুরোনো দিনের কথা, যার নাম— জি আর বিশ্বনাথ। একুশ বছরের ছেলে, মহীশূরে বাড়ি। আর আবিষ্কার করেছে একজন ওপেনিং ব্যাটসম্যান যে খেলেছে প্রথম টেস্টে ওয়ান ডাউন—অশোক মানকড়। একমাত্র তরুণ অশোক গানদোত্রাই কিছুই করতে পারে না।

দ্বিতীয় টেস্টে অশোক মানকড়ের মধ্যে পেয়েছি বিজয় মার্চেন্টের এবং বিশ্বনাথের মধ্যে দেখেছি হাজারের ছায়া। আর একনাথ সোলকারের মধ্যে নাদকার্নির। অবশ্য সোলকার মিডিয়ম পেসার কিন্তু ব্যাটিংএ নাদকার্নির মতো লেগে থাকা এবং পার্টনারকে সাহায্য করার যে সাহস, ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে তা বিস্ময়কর।

তরুণ বিশ্বনাথ টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে পৃথিবীর ৩৪তম এবং ভারতের ষষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেই সেঞ্চুরি করবার গৌরব অর্জন করেছেন। শুধু গৌরব অর্জন নয় অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের বিষ দাঁত ভেঙে দিয়ে যেভাবে বাউণ্ডারির পর বাউণ্ডারি মেরে করেছেন তা কল্পনাতীত। ২৬৮ মিনিটে ২৪টি বাউণ্ডারি সহ ১৩৭ রান। বিশ্বনাথের আগে ভারতের যে পাঁচজন টেস্ট খেলায় নেমেই সেঞ্চুরি করেছেন তাঁরা হলেন— লালা অমরনাথ, দীপক সোধন, এ জি কৃপাল সিং, আব্বাস আলি বেগ এবং হনুমন্ত সিং।

তোমরা জানো কি না জানি নে। কিন্তু এই গ্রীন পার্কে রিচি বেনোর দুর্ধর্ষ অস্ট্রেলিয়া দলকে ভারত ১১৯ রানে হারিয়েছিল। সেটাই ছিল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম জয়। এবারে দ্বিতীয় টেস্ট্ কানপুরে জয়ী না হলেও ড্র করলেও তরুণ বিশ্বনাথের উজ্জ্বল ক্রিকেট আমাদের মনে বহু আশা এবং সুখস্মৃতির আমেজ এনে দিয়েছে। তারা এক-একটি বাউণ্ডারি রেডিও মারফৎ শুনেছি আর আনন্দে মন ভরে উঠেছে।

এই দ্বিতীয় টেস্টে ওপেনিং করতে এসে অশোক মানকড়ের চিত্তাকর্ষক খেলাও সকলের মন কেড়ে নেয়। ইনজিনিয়ার ও অশোক জুটি মাত্র ১১০ মিনিটে ২১১ রান করে। মার্চেন্ট, মুস্তাক আলির পর কোনো টেস্টে ভারত এত ভালো ওপেনিং করেছে কিনা সন্দেহ। রান অবশ্য বেশি হয়েছে। অশোকের বাবা ভিনুর ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৮৮ একক কৃতিত্ব এবং পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে ১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজিল্যণ্ডের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেস্টে ৪১৩ রানের জুটি ভোলবার নয়। কিন্তু এ যে সাক্ষাৎ যম! আর এত দ্রুত! অশোকের প্রথম ইনিংস ৬৪ ও দ্বিতীয়তে ৬৮ রান আগামী দিনের ওপেনিংএর ভিত্তি স্থাপন করল। একনাথ সোলকারের ৪৪ ও ৩৫ রান অনবদ্য। অস্ট্রেলিয়ার পল সিহানও এই টেস্টে প্রথম সেঞ্চুরির অধিকারী হন। বাংলার সুব্রত গুহ পান জীবনের প্রথম টেস্ট উইকেট। সুব্রত মাত্র দুটি উইকেট পান, ক্যাচ মিস না হলে এবং পতৌদি তাঁকে বল করায় আরও বেশি সুযোগ দিলে হয় তো আরও উইকেট পেতে পারতেন।

তৃতীয় টেস্টে বিশ্বনাথের ব্যাট থেকে একটি বিশেষ রান হওয়ায় ভারত জেতে ৭ উইকেটে। তরুণের জয়গান ভারতের আকাশে বাতাসে আজ মুখর হয়ে উঠেছে। অস্ট্রেলিয়ার আত্মবিশ্বাসে ঘা লেগেছে। প্রচণ্ডভাবে। বিল লরির উক্তি আজ মিথ্যা দম্ভ বলে ঠেকছে।

এই টেস্টে গনদোত্রার জায়গায় অম্বর রায়কে নেওয়া হয় কিন্তু সে আমাদের মুখ রক্ষা করতে পারে না। অশোক প্রথম ইনিংসে ওপেন করতে নেমে মাত্র ৩ রানের জন্যে সেঞ্চুরি থেকে বঞ্চিত হন। আর ওয়াদেকার দ্বিতীয় ইনিংসে ৯১ রাণে অপরাজিত থাকেন। ওয়াদেকারের এই রানটা করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ, দেখছিলাম ওয়াদেকার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন।

বেদী আর প্রসন্নর বলে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা দুই ইনিংসেই মোটেই সুবিধে করতে পারেন না। অস্ট্রেলিয়ার পতন হয় মাত্র ২৯৬ এবং ১০৭ রাণে। বেদী ৯টি উইকেট ১০৮ এবং প্রসন্নও ৯টি উইকেট পান ১৫৩ রানে। সুতরাং বুঝতেই পারছ দুই বোলারের স্পিনের ছোবল কেমন হয়েছিল

তার উপর এই টেস্টে প্রসন্ন একশ উইকেট পাবার কৃতিত্ব দেখান। ভারতীয়দের মধ্যে এর আগে টেস্টে শত উইকেট পেয়েছেন ভিন্নু মানকড় এবং এস পি গুপ্তে। প্রসন্নর এই কৃতিত্বকে সম্মান দেখিয়ে ভারত সরকার তাঁকে এবছর অর্জুন পুরস্কার দিলেন।

বিশ্বনাথ রান করে ২৯ এবং ৪৪ নট আউট। ভারত জয়ী হয় ২২৩ এবং ৩ উইকেটে ১৮১ রান করে।

তৃতীয় টেস্টের পর গৌহাটিতে পূর্বাঞ্চলের খেলা হল অম্বর রায়ের নেতৃত্বে। অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ইনিংসে বাগে পেয়েও ক্যাচ ও স্টাম্পিং মিস করার জন্যে খেলা হাত থেকে বেরিয়ে গেল। অম্বর রায়ের উইকেট যখন পড়ল তখন ৫ উইকেটে ১২১ বাকি ৪০ বলে ৫ উইকেট ১০ রানে। এ হারার কিছু মানে হয় কি?

অম্বর রায় এই খেলায় দুই ইনিংসেই বিশেষ কিছুই সুবিধে করতে পারে নি। হয়তো টেস্ট ক্রিকেটের বাইরে যেতে হবে। একবার বাইরে গেলে আর ঢোকা খুবই মুশকিল।

ফুটবল

রাশিয়ান ফুটবল দলের সঙ্গে আই এফ এ একাদশের ইস্টবেঙ্গল-এরিয়ানস্ মাঠে যে খেলায় ৩-০ গোলে হারলাম, তা দেখে মনে হল আন্তর্জাতিক খেলা খেলবার মতো আমাদের চেহারা নেই, দম নেই, কিছুই নেই। রাশিয়ার খেলোয়াড়দের কাছে আমরা সবাই বামন বিশেষ। দেখতে পেলাম আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে হলে আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য দুয়েরই প্রয়োজন।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

কথায় কথায় প্রতিযোগিতার অনেক ভাল ভাল উত্তর পাওয়া গেছে, কিন্তু বিশেষ ভাবে তিনটিকে প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় স্থির করা যায় নি। তাই জন্য, একজনকে প্রথম পুরস্কার হিসাবে ১০৲ টাকা দিয়ে সাতজনকে তিনটাকা হিসাবে দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া স্থির হয়েছে।

এদের উত্তরগুলি ছাপান হল। তাছাড়াও কারো কারো একটা উত্তর খুব ভাল, তাও কয়েকটা ছাপান হল। তোমরা সবাই অভিনন্দন জেনো।

প্রথম পুরস্কার ঃ ২৭ কৃষ্ণকলি সেন।

দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ ২৯৫ শম্পা দত্ত। ৩২১ বন্দিতা ঘোষ। ৮৯০ কারুবাকি ও বিপাশা দত্ত। ১২৩৩ স্বাতী সিংহ। ১২৩৪ অনিন্দিতা সরকার (সচিত্র উত্তর, ছবিও সুন্দর)। ১৯৩৮ লীনা মিত্র। ২৪০৩ সুস্মিতা দাশগুপ্ত।

অন্যান্য খুব ভাল উত্তর—৩২১ অজন্তা ঘোষ, ২০৪০ সন্দীপন দেব, ২৫১৯ জুলু সেন, ২৫৪৭ প্রসেনজিৎ ও মৈত্রেয়ী বসু, ২৯৪৫ অমল বসু, ২৯৬২। মৌসুমী ও শ্রাবণী মিত্র। ২৭ কৃষ্ণকলি সেন গান—সুর-শুঁড়-গজ-কচ্ছপ। বালিশ—তুলা-রাশি-নক্ষত্র চন্দ্র রকেট। রাজা—নবাব-পতৌদি-ক্রিকেট-ফুটবল-শীল্ড-কাপ-চা বিস্কুট। সমুদ্র—পুরী-গয়া-কাশী-কাশি-জ্বর-থার্মোমিটার। ২৯৫ শম্পা দত্ত—গান—পাখি, আকাশ, মেঘ, জল, সমুদ্র, কচ্ছপ। রাজা—রাজভোগ, মিষ্টি, স্যাকারিন, চা বিস্কুট। বালিশ তুলো, সুতো, চরকা, চরকাকাটা বুড়ি, চাঁদ, রকেট! সমুদ্র—ঢেউ, ফেনা, সাবান, স্নান, ঠাণ্ডা, জ্বর, থার্মোমিটার। ৩২১ বন্দিতা ঘোষ—গান—তাল ভাদ্র-আষাঢ়-বর্ষা-জল-জলাশয়-কচ্ছপ। রাজা—রাজ্য-আসাম চা-বাগান চা বিস্কুট। বালিশ—ঘুম-রাত্রি-জ্যোৎস্না-চাঁদ রকেট। সমুদ্র—জল-ঠাণ্ডা-সর্দি-জ্বর-থার্মোমিটার। ৮৯০ কারুবাকি ও বিপাশা দত্ত। গান—বাজনা-বীণা-সরস্বতী-হাঁস-ডিম-কচ্ছপেরডিম-কচ্ছপ। রাজা—প্রজা-প্রজাপতি-বিবাহ-অতিথি-চা-বিস্কুট। বালিশ—বিছানা-বেডিং-ভ্রমণ-মহাকাশ ভ্রমণ-রকেট। সমুদ্র—জল-বাষ্প-মেঘ-বৃষ্টি-ঠাণ্ডা-সর্দি-জ্বর-থার্মোমিটার। ১২৩৩ স্বাতী সিংহ—গান—রেডিও তরঙ্গ-জল-পুকুর-কচ্ছপ। রাজা—সভা-কবি-কলম-কাগজ-মোড়ক মুড়কী-বিস্কুট। বালিশ—মাথা বুদ্ধি-আবিষ্কার-রকেট। সমুদ্র - বালু-মরুভূমি-তাপ থার্মোমিটার।

১২৩৪ অনিন্দিতা সরকার। গান—বাজনা-সানাই-বিয়েবাড়ি-ভোজ সন্দেশ-সন্দেশ (পত্রিকা) সত্যজিৎ রায়—চিড়িয়াখানা কচ্ছপ। রাজা—প্রজা-সাজা-পান-চা-বিস্কুট। বালিশ—পাটী-পাটীগণিত-গণিত-বিজ্ঞান চন্দ্রাভিযান রকেট। সমুদ্র—জাহাজ-সমুদ্রপীড়া-ডাক্তার-থার্মোমিটার। ১৯৩৮—লীনা মিত্র। গান—বাজনা-খোল-কচ্ছপ। রাজা—দেশ-প্রদেশ-আসাম-চা-বিস্কুট। বালিশ—ঘুম-রাত্রি-চাঁদ রকেট। সমুদ্র—জল-বাষ্প তাপ-থার্মোমিটার। ২৪০৩—সুস্মিতা দাশগুপ্ত। গান

—পাখি-আকাশ-মেঘ-জল জলজন্তু-কচ্ছপ। রাজা—রাজ্য-আসাম-চা-বিস্কুট। বালিশ—বিছানা-রোগী-জ্বর-উত্তাপ-সূর্য-আকাশ-রকেট। সমুদ্র—লবণ-রান্না-আগুন-তাপ-থার্মোমিটার।

একটা করে ভাল উত্তর—

১। সমুদ্র—তিমি-চর্বি-মোমবাতি-তাপ থার্মোমিটার (পঙ্কজ চৌধুরী ১৯৬৯)

২। রাজা—প্রজা-প্রজাপতি ফুল-মধু-চিনি-চা বিস্কুট (প্রসেনজিৎ বর্ধন ১৬৮৭)

৩। রাজা—সভা-ধুমধাম-ভোজ-অতিথি-চা-বিস্কুট (মধুজিৎ রায় ১৬১৭)

৪। রাজা—রাজভোগ-সন্দেশ-জলখাবার-চা-বিস্কুট (উত্তমকুমার বটব্যাল ১৪৪৭)

৫। রাজা—রত্ন-সিন্দুক-লোহা-ধাতু-টিন-বিস্কুট (নন্দিনী দত্ত মজুমদার ১২৩২)

৬। বালিশ—বিছানা-সুটকেস-ভ্রমণ-রেলগাড়ি-প্লেন-রকেট (সুগত ঘোষ ১২১৩)

৭। গান—কবিতা-কবি-সুকুমার রায়-আবোলতাবোল-বকচ্ছপ কচ্ছপ (অজন্তা ঘোষ ৩২১)

৮। গান—ভাটিয়ালি-মাঝি-নৌকা-নদী-কচ্ছপ (স্বপন শেখর রায় ৩০৭)

৯। রাজা—রাণী-এলিজাবেথ ব্রিটেন-ব্রিটানিয়া-বিস্কুট (রঞ্জন ও শুভাশীষ ব্যানার্জী ২৬২৯)

১০। বালিশ—তুলো-মেঘ-আকাশ চাঁদ রকেট (চিত্রাঙ্গদা ও চৈতালী বসু ২৬২৯ ও মায়া রায় ২৫৪)

১১। গান—রাগ-মার কান্না-জল-কচ্ছপ (ভাস্কর মিত্র ২৮০৭)

১২। রাজা—সিংহাসন-চেয়ার হাতল-হাত-হাতা-ভাত-রুটি-আটা-ময়দা-এরারুট-বিস্কুট (অমল বসু—২৯৪৯)

১৩। গান—বাজনা-বাঁশী-কৃষ্ণ-অবতার-কচ্ছপ (মনামী রায় ২১৯৪)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ছাপাখানায় কর্মবিরতির জন্য সন্দেশ প্রকাশিত হতে কয়েকদিন দেরী হল।

আমরা এর জন্য বিশেষ দুঃখিত।

নূতন ধাঁধা

(উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১শে জানুয়ারি)

১

'কলিকল অকলক কলষে কালা কয়ে কলিকলি গাকে !'
'হে বরে হরিহারে হরিহাতায় হোরাহুরি হম চরে ?'

কি সর্বনাশ ! সন্দেশের প্রুফ দেখতে গিয়ে দেখি যে দুটো লাইনের কোন মানেই বোঝা যাচ্ছে না—মনে হচ্ছে যেন সব কটা অক্ষরই এলোমেলো ভাবে বসানো হয়েছে !! এদিকে, কপিটাও হারিয়ে গেছে তাই মিলিয়ে দেখতে পারা যাচ্ছে না।

একটু লক্ষ্য করে দেখে কিন্তু বুঝলাম যে ভুলগুলো এলোমেলো ভাবে হয় নি, কেবল দুটো বিশেষ অক্ষরের সঙ্গে অন্য দুটো বিশেষ অক্ষরের বদলাবদলি হয়ে গেছে অন্যান্য সমস্ত অক্ষর আর আকার-ইকার সবই ঠিক আছে। তক্ষুনি আসল কথাটা বুঝে ফেললাম। তোমরা বল দেখি—

(ক) কোন কোন অক্ষরের সঙ্গে কোন কোন অক্ষরের বদলাবদলি হয়েছে ?

(খ) আসলে লাইন দুটো কি ছিল ?

২

বারোটি সমান কাঠি মাটিতে সাজিয়ে একই আকারের সমান আয়তনের ছটা ঘর বানাতে পার কি ?
মনে রেখো—(ক) কোন কাঠি ভাঙ্গতে বা বাঁকাতে পারবে না।

(খ) ঘরগুলি কাঠি দিয়ে ঘেরা থাকবে, কোন দিকে ফাঁক থাকলে চলবে না।

(গ) প্রত্যেকটা ঘরের প্রত্যেকটা দিক পরস্পরের সমান হবে।

(ঘ) প্রত্যেকটা ঘরের প্রত্যেকটা দিক মুল কাঠির সমান হবে। কেমন করে বানাবে এঁকে দেখাও।

৩

শ্রীজগন্নাথ জয়পুরিয়া সন্ধ্যা সম্মিলনীর সভ্য হয়ে প্রথম যেদিন আসরে এলেন, গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই উপস্থিত ছয়জন সভ্য তাঁকে সমাদরে ঘিরে ধরলেন।

একজন এগিয়ে এসে বললেন— আসুন, মশাই, আসুন। আমি কনকেন্দু কর, সংক্ষেপে ক-ক, ইনি খগেন্দ্র খইতান অথবা খখ, আপনার ডানদিকে গজানন গর্গ বা গ-গ, উনি ঘণ্টেশ্বর ঘটক, ঘ-ঘ, আপনার ঠিক পিছনে চন্দন চট্টরাজ চ-চ, বাঁদিকে ছত্রপতি ছত্রী বা ছ-ছ ! আসুন মশাই, জগন্নাথ জয়পুরিয়া বা জ-জ !'

সবাই হেসে উঠলেন।

হাসি থামলে জ-জ উত্তর দিলেন—'আরো একটা মজা লক্ষ্য করেছেন? আপনাদের গাড়ির নম্বর গুলি হল ৬২৫৭, ০২৬৫, ০৭৩৫, ১৯১১, ২০০৪, ৫৮৩৯।

আপনাদের প্রত্যেকের গাড়ির নম্বরের সঙ্গে আমার গাড়ির নম্বরের একটি সংখ্যার এবং অবস্থানের মিল রয়েছে। অথচ আমার গাড়ির নম্বরের চারটে সংখ্যাই আলাদা, কোন দুটো এক নয়।'

বল ত জগন্নাথ জয়পুরিয়ার গাড়ির নম্বর কত?

অগ্রহায়ণ মাসের ধাঁধার উত্তর।

(১)

গল্পের মধ্যে বারোটা পাখির নাম লুকোন আছে—পিক, ময়না, বাজ, কাক, বক, পায়রা, চীল, চড়াই, হাঁস, চাতক, মাছরাঙ্গা আর পাপিয়া।

(২)

ছেলেটি বুদ্ধি দিয়েছিল—বাসের টায়ারের হাওয়া বার করে দিলেই, বাসটা একটু নিচু হয়ে যাবে। তখন অনায়াসে সেটাকে ঠেলে পার করা যাবে। তারপরে আবার হাওয়া ভরে নিলেই চলবে।

(৩)

বসু মহাশয়=অধ্যাপক, তাঁর স্ত্রী=গাইয়ে, বোন চিত্রকর, ছেলে চিকিৎসক আর শ্বশুর সাহিত্যিক।

কার্ত্তিক মাসের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম।

যাদের সব কয়টি উত্তর ঠিক :—

৮৯০ কারুবাকী ও বিপাশা দত্ত, ১৬৫৫ শুভ্রশ্রী পাল, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২৫৪১ দেবোপম চক্রবর্তী, ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত।

যাদের দুইটি উত্তর ঠিক :—

১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ২৮২ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ২৮৮ গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৯৫ শম্পা, শর্মিলা ও শ্রেয়া দত্ত, ৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ৮৮৯ প্রেমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ৮৯৪ তপন ঘোষ, ১২৩২ নন্দিনী দত্ত মজুমদার, ১২৩৪ অনিন্দিতা সরকার, ১৩৪৮ রীতা, রুমা, বাসব, শান্তনু ও গৌতম রায়, ১৪২৫ মিত্রা রায় চৌধুরী, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৪৮১ উত্তমকুমার বটব্যাল, ১৮২৭ অহুতোষ ও অশোক চট্টোপাধ্যায়, ১৮৬৩ সোনালী লাহিড়ী, ১৮৯৪ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ২০৪০ সন্দীপন দেব, ২১৫৯ স্বাহা ও শুভংকর বাগচী, ২৫৪৪ সান্ত্বনা রায়-চৌধুরী, ২৫৪৭ প্রসেনজিৎ ও মৈত্রেয়ী বসু, ২৫৬২ সিদ্ধার্থ রায়।

যাদের একটি উত্তর ঠিক :—

১৭৫ অনিতা রায়, ১০৮৬ তুহিন, অভিজিৎ ও সোমনাথ দাশগুপ্ত, ১৪০১ মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৬২ প্রদীপ পারেখ, ২২১৫ শুভা মজুমদার, ২২২৪ শুভময়, কল্যাণময় ও নন্দিনী চট্টোপাধ্যায় ২২৪৮ দেবকুমার, মিহির-কুমার ও শৈবালকুমার গুহ, ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায়, ২৬৫৩ অসিতনাথ ভট্টাচার্য, ২৮৩৭ অর্পিতা রায় চৌধুরী, অনন্যা (পদবী কি? গ্রাহক সংখ্যা কত?)
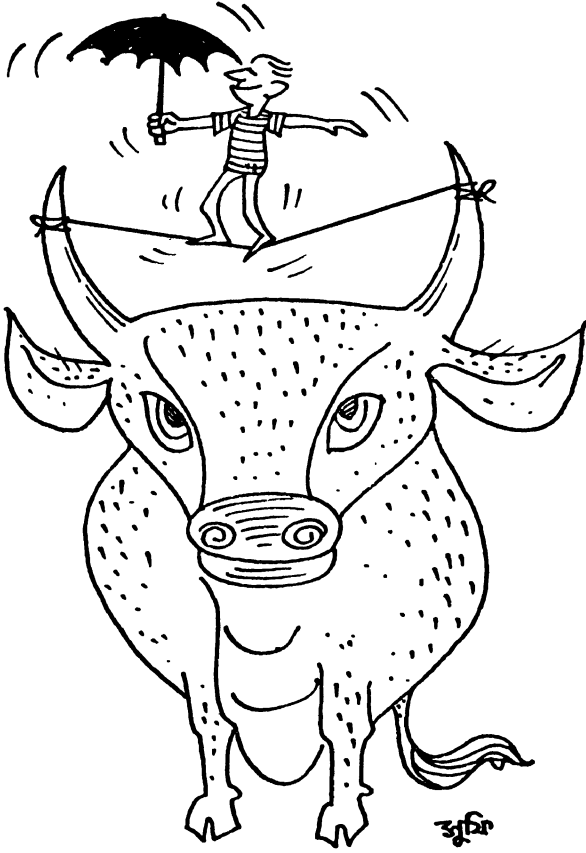
দেখো খেল—

খেল্ দেখো—
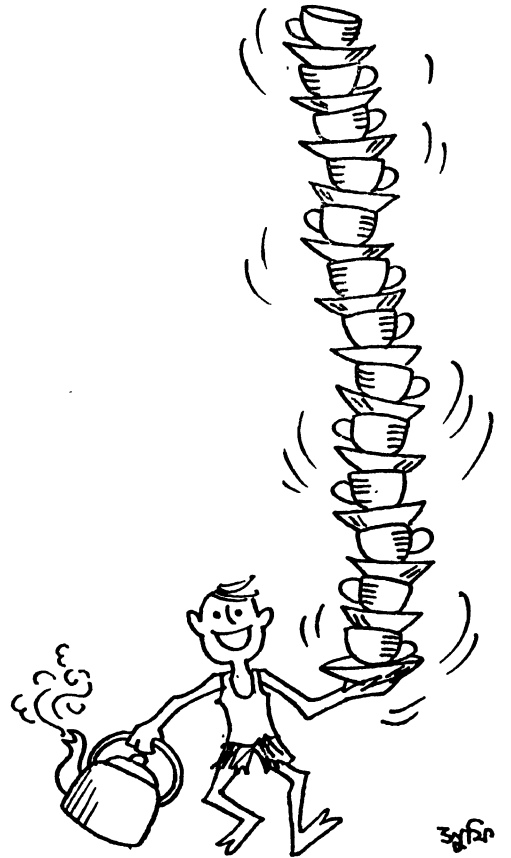
নবম বর্ষ—দশম সংখ্যা

মাঘ ১৩৭৬/ফেব্রুয়ারি ১৯৭০

শীত

করুণাময় বসু

শিউলি বনের শুভ্র হাসি ম্লান হয়েছে, শূন্য ফুলের ডালা ;
দূর আকাশে, সবুজ বনে, রোদের আলোয় কোন পটুয়ার
রঙ ফেরাবার পালা।
সকাল বেলা শিশির ভেজা ঘাসে
টাপুর টুপুর মুক্তোগুলি নোলক হয়ে হাসে
ঝাউ বাগানে ঝিরঝিরিয়ে কচি রোদের আলো
মিষ্টি হয়ে পড়ছে ঝরে, তুতুল, বুতুল সবার চোখে
লাগছে বড়ো ভালো।
পেয়রা বনে দেখি
কাঠ বিড়ালী দুহাত তুলে ডাকছে কাকে, একী!
চাঁপা বরণ ওড়না গায়ে ফুলের মতো কোন মেয়েটি
মাঠের মাঝে, ক্ষেতের মাঝে ঘোরে,
নতুন দিনের স্বপ্ন চোখে নতুন কালের সূর্য ওঠা ভোরে!

ঝাপসা এখন নদীর চর : মাঠের ধারে নানা রঙের দূর বিদেশী
একটুখানি থেমে যাওয়া পান্থ-পাখির মেলা ;
গাছের ছায়া, বনের মায়া আপন মনে মিলিয়ে গেল
শান্ত বিকেলবেলা।
নাম না জানা আঁকন বুড়ো লেখন তুলি ঝোলায় তুলে রেখে
ছবি আঁকা শেষ করে সে মুচকি হেসে মেঘের দেশে
হারিয়ে গেল স্বপ্নটুকু এঁকে।
কাঁঠাল বনে একটু পরে উঠবে জানি ঝিলমিলিয়ে ছোট্ট চাঁদের কণা,
ঘুম কাতুরে তুতুল, বুতুল বলবে মাকে,
অচিন দেশের রূপকথাটি শোনা।

(সমুদ্রের তলদেশ সম্বন্ধে জানবার জন্য স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ পাড়ি দিয়েছিল, তারপরে আর ফিরে আসেনি। এই অভিযানের নেতা ছিলেন মহাপণ্ডিত ডঃ ম্যারাকট ও জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপটেন হাওসি। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত প্রাণিবিদ মিঃ সাইরাস হেডলে, ইঞ্জিনিয়ার বিল স্ক্যানল্যান ও আরো ২৩ জন।

এঁরা এক আশ্চর্য নগরীর সন্ধান পান। সমুদ্রগর্ভে বিশাল এক 'আশ্রয় সদনে' কৃত্রিম বাতাসের সাহায্যে জীবনধারণ করে উন্নত বিজ্ঞান সম্পন্ন এক জাতি—তাদের কাছে আশ্রয় পাওয়া গেল। এরা প্রাচীন আটলান্টিস-বাসীদের বংশধর। বাইরের দুনিয়ায় সংবাদ পাঠাবার জন্য ম্যারাকট আটলান্টিসের রসায়নবিদদের আবিষ্কৃত অতি হালকা লাঘবজান গ্যাসের সাহায্যে কাঁচগোলকের মধ্যে করে নিজেদের অভিজ্ঞতার আদ্যোপান্ত বিবরণ লিখে ভাসিয়ে দিলেন। কয়েকটি কাঁচগোলকের সাহায্যে তাঁরা অনায়াসে ভেসে উঠে উদ্ধারকারী 'ম্যারিয়ন' জাহাজে আশ্রয় পান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন 'জলকুমারী' সোনা। তাঁদের কাছ থেকে পৃথিবীর মানুষ সমুদ্রগর্ভের বহু বিচিত্র, ভয়াবহ এবং অদ্ভুত দৃশ্যের কথা জানতে পারল। সবচেয়ে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হল 'প্রভু ঘোর দর্শনের সঙ্গে পরিচয়। অমর এবং অলৌকিক শক্তিশালী ব্যক্তিটি সমস্ত আটলান্টীয় সভ্যতা ধ্বংস করতে বদ্ধ-পরিকর। তাদের মৃত্যুলিপি তিনি ম্যারাকটদের হাতেই পাঠালেন।)

(চৌদ্দ)

এর মধ্যে একটা সেই নীলচে লাল রঙের শামুক স্ক্যানল্যানের গা বেয়ে তার কাঁধের উপর এসে উঠেছিল। সেটাকে ফেলে দিয়ে সবাই সেই ভয়ানক জায়গা ছেড়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম। সেখানে পা দেওয়ার মত কুবুদ্ধি আমাদের কেন হয়েছিল বার বার এই কথাই মনে হতে লাগল। যা হোক যখন সেই আধ অন্ধকার জায়গা থেকে বেরিয়ে আবার সমুদ্রের অনুপ্রভার আলোয় এসে পৌঁছালাম, চারিদিকে আবার স্বচ্ছ জল দেখতে পেলাম,

তখন মনটা একটু হালকা মনে হল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা আমাদের নিজেদের ঘরে ফিরে এলাম। প্রফেসর আর আমি দুজনেরই যেন মুখে আর তেমন কথা যোগাচ্ছিল না, কেবল স্ক্যানল্যানই দেখলাম তখনও দমেনি। সে বললে, 'এইবার এর সঙ্গে আমাদের টক্কর লাগল। বোধ করি ও আর কেউ নয়, স্বয়ং শয়তান। বড় বড় গুণ্ডারা ওর কাছে এক কানা কড়িও নয়। এখন কথা হচ্ছে কি করে ওকে বাগে আনা যায়।'

"ডাঃ ম্যারাকট্ কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইলেন। তার পর ঘণ্টা বাজিয়ে আমাদের সেই হলদে পোষাক পরা পরিচারককে ডাকলেন। সে আসতে বললেন, 'মাণ্ডা'। একটু পরে মাণ্ডা এসে ঘরে ঢুকলেন। ম্যারাকট্ তাঁর হাতে সেই সাংঘাতিক চিঠিখানি দিলেন।

"সেই সময়ে আমি মনে মনে মাণ্ডার যেমন প্রশংসা করেছিলাম তেমন আর কখনও কারও করিনি। আমরা তাঁদের কেউ নই, সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে তিনি আমাদের বাঁচিয়েছিলেন। সেই আমরা আমাদের অন্যায় কৌতুহলের ফলে তাঁদের গোটা জাতটার এবং তাঁর নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছি। সেই লেখাটুকু পড়তে পড়তে তাঁর মুখ মরার মুখের মত পাণ্ডাশ হয়ে গেল। তবু, যখন তিনি তাঁর বিষাদভরা পিঙ্গল চোখ দুটি তুলে আমাদের দিকে তাকালেন সেই চোখে বিরক্তির কোনও চিহ্ন দেখলামনা। আস্তে আস্তে কেবল মাথা নাড়লেন, মনে হল নিদারুণ নিরাশায় ভেঙ্গে পড়েছেন। 'বেঅ্যাল্-সীপা! বেঅ্যাল্-সীপা!' বলে তিনি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন। দুই হাতে দুই চোখ চেপে ধরে যেন কোনো ভয়ানক দৃশ্য থেকে চোখ আড়াল করতে চাইলেন। ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে খানিক পায়চারি করে' শেষে সমাজের সকলকে সেই ভয়ঙ্কর কথা শোনাবার জন্য ছুটে চলে গেলেন। কয়েক মিনিট পরেই আমরা শুনতে পেলাম সেই বিপুল ঘণ্টাধ্বনি সবাইকে প্রেক্ষাগৃহে আহ্বান করছে।

"আমি শুধোলাম. 'আমরা যাব!'

"ডাঃ ম্যারাকট্ মাথা নাড়লেন। বললেন, 'আমরা কি করতে পারি? আর ওরাই বা কি করতে পারে? দানবের মত যার ক্ষমতা তার কাছে ওরা কি?'

"একটা বেড়ালের কাছে একপাল ইঁদুর যা, তাই,' বলে' উঠল স্ক্যানল্যান্ 'কিন্তু উপায় একটা আমাদের বের করতেই হবে। সাধ করে' শয়তানকে ডেকে এনে শেষে তাকে আমাদের উপকারী বন্ধুদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়তে আমরা পারি না বোধ হয়।"

"আমি উৎসাহিত হয়ে শুধোলাম, 'তুমি কি বল? স্ক্যান্ল্যানের ঠাট্টা তামাশা হালকামোর আড়ালে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম আধুনিক যন্ত্রকুশল মানুষের তীক্ষ্ণ ব্যবহারিক বুদ্ধি।

'সে বললে, 'হয়ত এই মহাত্মাটি নিজেকে যত নিরাপদ মনে করেছেন ঠিক তা তিনি নন।'

'তুমি ভাবছ আমরা তাকে আক্রমণ করলে কেমন হয়?'

'ডকটর বলে উঠলেন, 'পাগল!'

'স্ক্যান্ল্যান্ তার দেরাজের কাছে গেল! তারপর আমাদের দিকে ফিরতে দেখি তার হাতে একটি বড় হরঘরা রিভলভার।

'সে বললে, এটিকে কেমন মালুম হয়? জলে ডোবা জাহাজটাতে যখন আমরা ঢুকেছিলাম তখন আমি এইটি জোগাড় করি। একডজন গুলি আছে, ততগুলিই ছেঁদা যদি করে দিই ঐ কড়া জানওয়ালা মহাত্মাটির গায়ে তাহলে তাঁর খানিকটা ভেলকি বেরিয়ে যেতেও পারে।......হা ভগবান্,বাঁচাও আমায়! একী!'

'রিভালভারটা ঝন ঝন করে মেঝের উপর পড়ে গেল আর স্ক্যান্ল্যান্ বাঁ হাত দিয়ে তার ডান হাতের

কবজিটা চেপে ধরে যন্ত্রণায় মোচড় খেতে লাগল। তার সমস্ত ডান হাতটায় সাংঘাতিক রকমের খিল ধরে' গিয়েছিল, হাতের পেশীগুলি যেন গাছের শিকড়ের মত গুলি পাকিয়ে উঠেছিল। বেচারার কপাল বেয়ে কাল ঘাম ছুটল। একেবারে কাহিল আর বেদম হয়ে সে তার বিছানায় এসে পড়ল।

*বললে, 'নাঃ, পটকে গেলাম।...ধন্যবাদ, ব্যথাটা একটু কমেছে। কিন্তু উইলিয়ম স্ক্যান্‌ল্যান্‌ নক্‌ আউট খেয়ে গেল। যা হোক আমার শিক্ষা হল। ছয়-ঘরা রিভলভার নিয়ে জাহান্নমের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। ওকে ওস্তাদ কবুল করছি।'

"ম্যারাকট বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার শিক্ষা হয়েছে, বড় কঠিন শিক্ষা।'

'তাহলে আপনি মনে করেন আমাদের কোনো আশা নেই?'

'আমাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যখন সে জানতে পারছে তখন আর আমরা কি করতে পারি? কিন্তু তবু আমরা হাল ছাড়ব না।' এই বলে তিনি এক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপর বললেন, 'স্ক্যান্‌ল্যান্‌, তুমি কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকলেই বোধহয় ভাল। যে ধাক্কাটা তোমার উপর দিয়ে গেল সেটা সামলে উঠতে কিছু সময় লাগবে।'

'স্ক্যান্‌ল্যান্‌ তবু দমেনি, বললে, 'যদি কিছু করবেন বলে ঠিক করেন তাহলে আমিও সঙ্গে আছি জানবেন। তবে গায়ের জোর ফলানোটা বোধহয় বাদই দিতে হবে।' তখনও তার মুখের চেহারা আর হাত পায়ের কাঁপুনি দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে কি যন্ত্রণা সহ্য করেছে।'

'তোমার কথা ধরলে বলি কিছুই করব বলে ঠিক করিনি। কিছু করবার ভুল উপায়টা কি সেটুকু অন্ততঃ আমরা শিখলাম। যেমন ভাবেই হোক জোর খাটানো বৃথা। আমাদের শত্রু কাজ করছে চেতনার অন্য এক স্তরে—সেটা আত্মিক স্তর। হেডলে তুমি এইখানেই থেকো। আমি আমার স্টাডিতে যাচ্ছি, একলা থাকলে হয়ত কিংকর্তব্য বুঝতে পারব।'

'স্ক্যান্‌ল্যান্‌ আর আমার দুজনেরই ম্যারাকটের উপর অসীম নির্ভরতা জন্মেছিল। মানুষের বুদ্ধিতে যদি আমাদের মুশকিল আসান হয় তাহলে তাঁর বুদ্ধিতেই হবে।

অথচ এও ঠিক যে আমরা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছি যেখানে মানুষের কোনও ক্ষমতা খাটে না। যে অলৌকিক শক্তির আমরা কোনো কুল কিনারা পাচ্ছিলাম না তার কাছে নিজেদের শিশুর মতই অসহায় মনে হচ্ছিল।

স্ক্যান্‌ল্যান্‌ ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু ঘুমের মধ্যেও সে আরাম পাচ্ছিল না। আমি পাশে বসে কেবল ভাবছিলাম একটি কথা। সেটা এ নয় যে কি করে আমরা এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাব, বরং ভাবছিলাম সে বিপদ কখন কি ভাবে দেখা দেবে। সমুদ্রের গভীরতম তলদেশকে তুচ্ছ করে এতদিন যারা বেঁচে ছিল এইবার যে কোনও মুহূর্তে হয়ত তাদের শেষ দশা এসে উপস্থিত হবে—আর তাদের সঙ্গে আমাদেরও। হয়ত আশ্রয়সদনের ছাদ ধ্বসে যাবে, হয়ত দেওয়াল পড়ে যাবে। এতদিন যে জলকে দূরে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল সেই জল চারিদিক থেকে ঘিরে আসবে।

'হঠাৎ শুনতে পেলাম সেই ঘণ্টা আবার বেজে উঠেছে। সে আওয়াজ শুনে বুকের ভিতরটা যেন কিরকম করে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম, স্ক্যান্‌ল্যান্‌ও বিছানায় উঠে বসল্‌। ঘণ্টা যেন পাগলের মত বেজে চলেছিল তার সেই একরোখা ডাকে সাড়া না দিয়ে যেন উপায় নেই।

'স্ক্যান্‌ল্যান্‌ বললে, এই ধর গিয়ে ইয়ার, এবার বোধ হয় তার সঙ্গে ওদের টক্কর লাগল, আমাদের উচিত হচ্ছে ওদের কাছে যাওয়া।'

'কিন্তু আমরা গিয়ে কি করব ?'

'এই ধর আমাদের দেখেও তো ওরা কিছুটা সাহস পাবে। মোদ্দা, ওরা যেন না মনে করে যে আসল সময়টিতে আমরা কেটে পড়েছি। ডক্ কই ?'

'তিনি তাঁর স্টাডিতে গেছেন। তুমি ঠিকই বলেছ, বিল্, আমাদের ওদের কাছে যাওয়াই উচিত, ওরা যাতে বুঝতে পারে যে আমরা ওদের অদৃষ্টের ভাগ নিতে প্রস্তুত।'

'বেচারারা যেন আমাদের উপরেই নির্ভর করতে চায় মনে হয়। হতে পারে ওরা আমাদের চাইতে বেশী জানে, কিন্তু আমাদের ছাতির জোর বোধ হয় বেশী। তারা পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে যেটুকু পেয়েছিল সেইটুকুই হয়ত নিয়েছে, আর আমরা যা পেয়েছি তা আমাদের নিজেদের খুঁজে বের করতে হয়েছে। যাক্, আমি বলি আসুক প্রলয়—যদি প্রলয় আসতেই হয়।'

'কিন্তু আমরা দরজার দিকে এগোতেই এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম : ডাঃ ম্যারাকট এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন—কিন্তু আমরা যে ডাঃ ম্যারাকটকে জানতাম ইনিই কি তিনি ? সেই শান্ত পণ্ডিত কোথায় অন্তর্ধান করেছেন। তাঁর জায়গায় দেখা দিয়েছেন একজন অতিমানব। এক মহান্ নেতা, একটি অমিততেজা আত্মা যিনি মানব জাতিকে গড়ে নিতে পারেন আপন ইচ্ছানুযায়ী। তাঁর মুখের প্রত্যেকটি রেখায় যেন শক্তি ও সংকল্প ফুটে উঠেছে।

'বললেন, 'হ্যাঁ, এখনও হয়ত সময় আছে। কিন্তু এখনই এস, হয়ত আর রক্ষা থাকবে না। সমস্ত আমি পরে বুঝিয়ে বলব—যদি 'পরে' বলে আমাদের কিছু থাকে।……হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি।'

'শেষের কথা কয়টি বললেন কয়েকজন আটলাণ্টীয়ের উদ্দেশে। তারা দরজার কাছে এসে ব্যাকুলভাবে আমাদের ইশারা করছিল যেতে। আমরা প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সামনের সারিতে আমাদের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে বসলাম। চারিদিকে যে চাপা গুঞ্জন উঠল তাতে বুঝলাম মনে মনে সকলেই এরই মধ্যে একটু আরাম পেয়েছে ভরসা পেয়েছে।

'সত্যিই আমাদের দ্বারা যদি কোনো সাহায্য হয় তবে এই তার সময়। কারণ দেখলাম সেই ভীষণ সুপুরুষ প্রভু ঘোরদর্শন মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে, মহাভয়ে কাতর জনতার দিকে চেয়ে তার চাপা ঠোঁটে এক নিষ্ঠুর পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠেছে। এ দৃশ্য দেখে স্ক্যানল্যানের সেই বেড়াল আর ইঁদুরের উপমা আমার মনে পড়ল।

আটলাণ্টীয়রা এ ওকে আঁকড়ে ধরে ছিল আর ত্রাসে বিস্ফারিত চোখে সেই শক্তিমান্ মূর্তির নির্দয় মুখখানার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে মুখ যেন গ্র্যানাইট পাথর কুঁদে তৈরী। মনে হল তার মুখ থেকে শেষ কথা এদের শোনা হয়ে গেছে। মাণ্ডা তখনও দীনভাবে সকলের হয়ে দু এক কথা বলবার চেষ্টা করছিলেন। তাতে সেই পিশাচের মুখে নির্মম বিদ্রূপের ভাব আরো জমাট বাঁধছিল।

শেষে মাণ্ডাকে থামিয়ে দিয়ে সে ডান হাতখানা শূন্যে তুললে। সকলে তীব্র হতাশায় চীৎকার করে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে ম্যারাকট লাফিয়ে মঞ্চের উপর উঠলেন। তাঁর দিকে চেয়ে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। যেন কোনো অলৌকিক উপায়ে তিনি অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। তাঁর চলন আর ভাবভঙ্গী যুবকের মত সহজ ও সতেজ, আর তাঁর মুখে এমন এক শক্তির ছাপ যা আমি মানুষের মুখে কখনও দেখিনি। তিনি দৃঢ় পদে সোজা সেই দৈত্যের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সে অবাক হয়ে তাঁর দিকে কটমট করে তাকাল।

'বললে, 'কিহে কি বলবার আছে তোমার ?'

'ম্যারাকট বললেন, 'আমার এই বলবার আছে যে তোমার দিন ফুরিয়েছে, তুমি নিপাত যাও! নরক তোমার জন্য অপেক্ষা করছে নেমে যাও সেইখানে। তুমি অন্ধকারের রাজা, অন্ধকারের দেশে যাও।'

'দানবের চোখে আগুন ছুটতে লাগল। সে বলল আমার দিন যদি কখনও ফুরায় তখন মরণশীল মানুষের মুখে আমায় সে কথা শুনতে হবে না। প্রকৃতির গোপন রহস্য আমার মুঠোর মধ্যে। তোমার কি ক্ষমতা আছে যে আমার সামনে এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পার? তোমায় এখনি ভস্ম করে ফেলতে পারি।'

'ম্যারাকট স্থির দৃষ্টিতে তার সেই ভয়ঙ্কর চোখের দিকে চেয়ে রইলেন। মনে হল দানবই চোখ ফিরিয়ে নিলে।

'আমি তোমাকে ভস্ম করে ফেলতে পারি। পৃথিবীকে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ভাল তা তুমি নষ্ট করেছ, তুমি বিদায় হলে মানুষের মনের ভার কমবে, সূর্যের আলো আরো উজ্জ্বল হবে।'

'একি! কে তুমি? এ তুমি কি বলছ? 'দানবের মুখে কথা আটকে যেতে লাগল।'

'তুমি কি জান না কি বলছি? যে স্তরেরই হোক ভাল সব সময়েই মন্দের চেয়ে বলবান্। তুমি এতকাল যে স্তরে রয়েছ আপাততঃ আমিও সেই স্তরে, সেই স্তরের যা ভাল তারই শক্তি আমার মধ্যে। আবার বলি: নিপাত যাও! তুমি নরকের জীব, নেমে যাও সেইখানে। যাও, চলে যাও! নিপাত যাও!'

একটুক্ষণ সেই দুই সত্তা— মানব আর দানব— পরস্পরের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্তির মত। তার পর দানব হঠাৎ তার চোখ ফিরিয়ে নিলে। রাগে তার মুখ বিকৃত হল। দুই হাত শূন্যে কি যেন আঁকড়ে ধরতে চাইলে। চীৎকার করে বলল, 'বুঝেছি-এ আর কেউ নয়; ও আচ্ছা, এ তুমি! এ তোমার কাজ। ওঃ ওথার্জ, তোমার উপর আমার অভিশাপ রইল, আমার অভিশাপ রইল।'

তখন এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটল। ঘোরদর্শনের গলার আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই তার শরীরটা যেন ঝাপসা দেখাতে লাগল, মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল, হাঁটু ভেঙ্গে পড়ল, আস্তে আস্তে সে নিচু হয়ে যেতে লাগল। একটু পরে আর তাকে যেন মানুষ বলে চেনা গেলনা। আর একটু পরে দেখলাম সে আর নেই, তার জায়গায় কেবল কালো কালো নোংরা এক তাল কাদা। তার গন্ধে বাতাস বিষিয়ে উঠল।

'হঠাৎ একটা গোঙানির শব্দ শুনে চেয়ে দেখলাম ডাঃ ম্যারাকট টলছেন, এখনই পড়ে যাবেন। স্ক্যান্‌ল্যান্ আর আমি ছুটে গেলাম মঞ্চের উপর। তখন তিনি অস্ফুট স্বরে কেবল বলছেন, 'আমাদের জিত! আমাদের জিত!' তার পরেই তিনি অজ্ঞান হয়ে মঞ্চের উপর লুটিয়ে পড়লেন।

এমনি করে আটলান্টীয় উপনিবেশের সব চাইতে ভয়ঙ্কর বিপদ চিরদিনের মত দূর হল। ডাঃ ম্যারাকট কয়েকদিন কিছুই বলতে পারলেন না। তারপরে যখন সব কথা বললেন তখন সেটা এতই অদ্ভুত লাগল যে সমস্ত ব্যাপারটা যদি আমাদের চোখের সামনে না ঘটত তাহলে তাঁর কথাগুলিকে তাঁর অসুস্থ অবস্থার প্রলাপ বলেই ধরে নিতাম। আগেই বলে রাখি যে প্রভু ঘোরদর্শনের সম্মুখীন হবার সময়ে ডাঃ ম্যারাকটের মধ্যে যে অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব হয়েছিল তার কাজ ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তি আবার অন্তর্ধান করেছিল, এখন তিনি আবার আমাদের সেই চিরপরিচিত শান্ত আত্মসমাহিত বিজ্ঞানী।

'তিনি বললেন, 'আমারই কিনা এমনটা হল!'

আমি—এই নিছক বস্তুবাদী আমি, যার কাছে অদৃশ্য কোনো কিছুর দাম ছিল না! সারা জীবন দুনিয়াটাকে যেমন ভেবে এসেছি শেষে এখন দেখছি তাই সব নয়।'

'স্ক্যান্‌ল্যান্ বললে, 'কেঁচে গণ্ডূষ! বোধকরি আমরা আবার সবাই পাঠশালে নাম লিখিয়েছি। যদি

কোনোদিন দেশে ফিরতে পারি সবাইকে বলবার মত কিছু হল বটে।'

'আমি বললাম, 'যত কম বলবে ততই কিন্তু ভাল—যদি না আমেরিকার সেরা মিথ্যুক বলে নাম কিনতে চাও। অন্য কেউ আমাদের এসব বললে কি আমরা বিশ্বাস করতাম ?'

'হয়ত না। কিন্তু এই ধরুন গিয়ে ডক্, আপনি ঠিক দাওয়াই দিয়েছিলেন বটে। হুমদো দৈত্যটা সেই যে পড়ল, দশ গোনার মধ্যে আর উঠলই না। এমন পরিষ্কার নক্-আউট আমি আর দেখিনি।'

'ডক্টর বললেন, 'ঠিক একরকমটি হয়েছিল তোমাদের বলি। আমি তো তোমাদের কাছ থেকে চলে এসে আমার স্টাডিতে গেলাম। আমার মনে সামান্যই আশা ছিল। তবে এক সময়ে আমি ইন্দ্রজাল আর গুপ্তবিদ্যা সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছিলাম। আমি জানতাম ভাল সব সময়েই মন্দকে জয় করতে পারে, কেবল যদি মন্দের সমান স্তরে উঠতে পারে। প্রভু ঘোরদর্শন আমাদের চাইতে অনেক উঁচু স্তরে ছিল। আমি তাই আর কোনো উপায় না দেখে কৌচের উপর বসে প্রার্থনা করতে সুরু করলাম। হ্যাঁ, আমি, এই ঝুনো বস্তুবাদী, প্রার্থনা করতে সুরু করলাম—সাহায্যের জন্য। মানুষ যখন আপন শক্তির শেষে গিয়ে পৌঁছায় তখন তাকে ঘিরে আসে যে অনন্ত রহস্যময় শূন্য তার দিকে দুটি অসহায় হাত বাড়িয়ে সাহায্য ভিক্ষা করা ছাড়া সে আর কি করতে পারে ?'

'হঠাৎ দেখলাম ঘরের মধ্যে আমি একা নই। আমার সামনে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘাকার পুরুষ, প্রভু ঘোর-দর্শনের মতই ঈষৎ ঘোরবর্ণ, দাড়িতে ঘেরা মুখখানি কিন্তু করুণা ও সকলের মঙ্গল কামনায় যেন আলো হয়ে রয়েছে। যেন স্পষ্ট অনুভব করলাম তাঁর মধ্যে যে শক্তি আছে সেও সেই দানবের শক্তির মত, কিন্তু তা পুণ্যের শক্তি। আমার মুখে কথা ফুটল না, অবাক্ হয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। আমার ভিতর থেকে কে যেন বললে, ইনিই সেই মহাজ্ঞানী আটলান্টীয়ের দেহ-বিমুক্ত আত্মা যিনি সমস্ত দেশটাকে আর তার সেরা মানুষদের বাঁচাবার উপায় করেছিলেন যদিও দেশশুদ্ধ তাঁরা সকলেই ডুবে যান অতল সমুদ্রে।

হঠাৎ যেন আশার এক বিদ্যুৎ ঝলকের সঙ্গে সঙ্গে এইসব আমার মনে এসে দেখা দিল—এমন স্পষ্টভাবে যেন তিনিই সে সব আমায় বললেন। আমার কাছে এসে তাঁর দুটি হাত রাখলেন আমার মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুভব করলাম তাঁর পুণ্যের শক্তি যেন পবিত্র অগ্নিশিখার মত আমার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে গেল। তখন পৃথিবীতে কিছুই আর অসম্ভব মনে হলনা। সেই মুহূর্তে শুনতে পেলাম ঘণ্টা বাজছে, চরম সময় উপস্থিত। আমি কৌচ থেকে উঠতেই সেই আত্মা অপরূপ হাসি হেসে আমায় উৎসাহ দিয়ে অন্তর্ধান করলেন। তারপর আমি এসে তোমাদের সঙ্গে মিললাম। বাকিটা তোমরা জান।'

'আমি বললান, 'আপনি যেমন অলৌকিকভাবে সকলকে রক্ষা করলেন তাতে ইচ্ছা করলে এখানে একজন দেবতা হয়েই আসতে পারেন।'

'স্ক্যান্‌ল্যান্ একটু মুখ ভার করে বললে, 'আপনি তো বেশ পার পেয়ে গেলেন, ডক্। আপনি কি করছেন না করছেন তা সেই মহাপ্রভুটি টের পেল না কেন ! আমি যখন পিস্তল হাতে নিয়েছিলুম তখন আমার উপর হামলা করতে তো তার একটুও দেরি হয়নি।'

'ডক্টর একটু ভেবে বললেন, 'সেটা হয়ত এইজন্য যে তুমি ছিলে বস্তুর স্তরে আর আমি তখনকার মত ছিলাম আত্মার স্তরে। এমনি সব ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা হয়। আমি যে শিক্ষা পেলাম তা যেন আমার জীবনকে সার্থক করে।'

'এই হল আমাদের চূড়ান্ত অভিজ্ঞতার উপসংহার। এর অল্প দিন পরেই উপরের পৃথিবীতে আমাদের খবর

পাঠাবার কল্পনা আমাদের মাথায় আসে। শেষে লাঘবজান গ্যাসে ভরা কাঁচ গোলকের সাহায্যে আমরা উপরে উঠে এলাম তা তো এখন সকলেই জানেন। ডাঃ ম্যারাকট মাঝে মাঝে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন। মৎসবিদ্যার কি একটা বিষয়ে তিনি আরো একটু বিশদ তথ্য চান! তবে স্ক্যান্‌ল্যান্‌ শুনছি ফিলাডেলফিয়ায় তার সখী সেই জাহাজী মেয়েটিকে বিয়ে করেছে। সে এখন মেরিব্যাঙ্কস্‌-এর ওঅর্কস্‌ ম্যানেজার। আর আমার কথা যদি বলতে হয়, সমুদ্র আমাকে যে অমূল্য রত্ন দিয়েছে তাছাড়া আমি আর কিছু চাই না।

শেষ

পুস্তক পরিচয়

—কল্যাণী কার্লেকার

আমাদের নাটক—হাসি দাশগুপ্তা

পরিবেশক—বাণীরূপ, ৫।১, রামনাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ৯।

দাম ৩৲

বইটা "ছোটদের একাংক নাট্যমালা"। এতে পাঁচ থেকে সাত, ছয় থেকে আট, আট থেকে দশ আর এগারো থেকে চোদ্দ বছর বয়সের ছেলেপিলেদের জন্য চারটি নাটক আছে। এগুলি চিত্তাকর্ষক আর শিক্ষামূলক,—যারা অভিনয় করবে তারা আনন্দ পাবে, পরকে আনন্দ দেবে আর সকলেও কিছু কিছু শিখবে।

লেখিকা শিক্ষকশিক্ষণপ্রাপ্তা এবং শিক্ষিকাশিক্ষণের কাজে নিযুক্ত বলে সুন্দরভাবে বয়সের উপযোগিতা বিচার করতে পেরেছেন। প্রয়োগকারিদের এতে সুবিধা হবে।

লেখিকার সাহিত্য প্রতিভা অবিসংবাদিত। বইয়ের চেহারা যত সুন্দর করা হয়েছে ছাপার ভুল এড়াবার দিকে ততটা দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। প্রথম অংশে ছাপার পরেকার সংশোধনের চিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু শেষদিকের ভুলগুলি রয়ে গেছে।
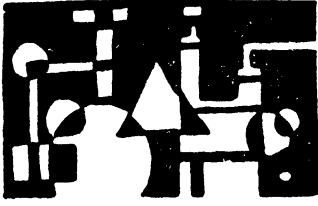
মাছ, ব্যাং ও কীট পতঙ্গের সন্তান বাৎসল্য

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

আমাদের দেশে একটা চলতি কথা আছে—মাছের মায়ের আবার পুত্রশোক কি? বিভিন্ন জাতের স্ত্রী-মাছের ডিম থেকে একসঙ্গে অনেকগুলি করে বাচ্চা হয়ে থাকে। সংখ্যাধিক্যের জন্যেই মায়ের সঙ্গে বাচ্চাদের কোনই সম্পর্ক থাকে না। এই কারণেই অনেক ক্ষেত্রে মা তার বাচ্চাগুলিকে শিকার করে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে থাকে। কাজেই 'মাছের মায়ের আবার পুত্রশোক!'—কথাটার প্রচলন হয়েছে।

কিন্তু কথাটা অনেকাংশে সত্য হলেও এর কতকগুলি অদ্ভুত ব্যতিক্রমও দেখা যায়। তোমরা যাতে নিজের চোখে লক্ষ্য করতে পার, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের কয়েকটি অতি পরিচিত সাধারণ মাছের সন্তান বাৎসল্যের কথা বলছি।

চেতল মাছ হয়তো তোমাদের সকলেরই পরিচিত। বড় বড় অনেক পুকুরে চেতল মাছ জন্মায়। এরা পুকুরের ঘাটলার ফাটল বা জলের তলার কোন আবর্জনার আড়ালে ডিম পেড়ে সর্বদা কাছে কাছে থেকে পাহাড়া দেয়, যাতে কেউ ডিম চুরি করতে না পারে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবার পর অন্যান্য মাছ—এমনকি, মানুষও যদি ওদের বাচ্চার কাছাকাছি গিয়ে পড়ে তাকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করতে ইতস্তত: করে না। বাচ্চাগুলি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার মত উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মা বাচ্চাদের ছেড়ে কখনও দূরে সরে যায় না।

আড় মাছ তোমাদের অপরিচিত নয়। আমাদের দেশে দিঘি, পুকুরের গভীর জলের তলায় বড় বড় গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে। পুরুষ মাছটা গর্তের চারদিকে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবার পর বেশ একটু বড় না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-মাছটা গর্ত ছেড়ে কোথাও যায় না। বাচ্চা ইঞ্চি-খানেক বড় হবার পর স্ত্রী মাছটা সময়ে সময়ে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও বারবার ঘুরে এসে বাচ্চাগুলিকে তদারক করে যায়। গুরুতর কোন বিপদের আশঙ্কা ঘটলে বাচ্চাগুলি মায়ের প্রকাণ্ড মুখের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিপদের সম্ভাবনা দূর হয়ে গেলে মা তার মুখ হাঁ করে রাখে। বাচ্চাগুলি তখন মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় গর্তের মধ্যে গিয়ে একসঙ্গে অবস্থান করে।

ব্যাং তোমরা সবাই দেখেছ। আমাদের দেশে সাধারণত: কুনো ব্যাং, সোনা ব্যাং, কোলা ব্যাং বা ছ্যাচ্ছেড়ে ব্যাং প্রায় সর্বদাই নজরে পড়ে। তাছাড়া কয়েক রকমের পাণ্ডু রঙের ক্ষুদ্রাকৃতির ব্যাং ও

বড় গেছো ব্যাংও দেখা যায়। ব্যাং সাধারণতঃ জলের মধ্যে ডিম পেড়ে রাখে। বাচ্চাদের কোন খবরই নেয় না। কিন্তু কয়েক জাতের ব্যাং আছে, যেমন সুরিনাম ব্যাং—এরা ডিম থেকে বাচ্চা হবার পর সেগুলিকে পিঠের উপর ছোট ছোট পকেটের মত গর্তের মধ্যে রেখে প্রতিপালন করে। স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চাগুলি পিঠ ছেড়ে কোথায় যায় না। ধাত্রী ব্যাং নামে এক রকমের ব্যাং আছে, এদের স্ত্রী-ব্যাং পুরুষ ব্যাঙের পিছনের পায়ে ও কোমরের চারদিকে লালায় তৈরি সূত্রের সাহায্যে তাদের ডিমগুলিকে জড়িয়ে রাখে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত পুরুষ ব্যাং তাদের বয়ে নিয়ে বেড়ায়—এবং ডিম ফোটবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

আমাদের দেশের গেছো ব্যাংগুলিও সন্তান পালনের জন্যে অদ্ভুত এক রকম কৌশল অবলম্বন করে। জলের কিছু উপরে ঝুলন্ত পাতার ডগার সঙ্গে থুথু দিয়ে ডেলার মত বড় বড় গোলাকার বাসা তৈরি করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। বাইরের দিকটা শুকিয়ে গিয়ে বেশ শক্ত একটা আবরণ তৈরি হয়ে যায়। তার মধ্যে তারা ডিম পেড়ে রাখে। ডিম ফুটে বাচ্চাগুলি বেশ কিছুটা বড় হবার পর থুথুর বাসার পর্দা ভেদ করে জলে পড়ে এবং দু-চার দিনের মধ্যেই ব্যাঙাচির জীবন শেষ করে ছোট ছোট ব্যাঙের আকৃতি ধারণ করে।

তোমাদের অনেকেই হয়তো ক্যাঙ্গারু ও অপোসামের সন্তান পালনের অদ্ভুত ব্যবস্থার কথা শুনে থাকবে। সাবালক না হওয়া পর্যন্ত ক্যাঙ্গারু তার বাচ্চাকে পেটের থলিতে করে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। অপোসামের ৫।৬ করে বাচ্চা হয়। অপোসাম তার লম্বা লেজটাকে পিঠের উপর হেলিয়ে দেয়—এবং বাচ্চাগুলি তাদের লেজের সাহায্যে মায়ের লেজটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পিঠের উপর অবস্থান করে। এভাবে বাচ্চাগুলিকে পিঠে নিয়েই অপোসাম গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এদের চেয়ে অনেক নীচু পর্যায়ের প্রাণীদের মধ্যে সন্তান পালনের অনুরূপ ব্যবস্থা দেখলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

কাঁকড়াবিছা তোমরা হয়তো অনেকেই দেখেছ। কাঁকড়াবিছার লেজের প্রান্তভাগে বঁড়শীর মত খানিকটা বাঁকানো একটা হুল থাকে। এই হুলের দংশন খুবই যন্ত্রণাদায়ক। একবারে এদের ২৫।৩০টা করে বাচ্চা হয়। বাচ্চাগুলি বেরিয়ে এসেই মায়ের পিঠের উপর আশ্রয় গ্রহণ করে। মা বাচ্চাগুলিকে পিঠে নিয়েই ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। সাবালক না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চাগুলি মায়ের পিঠ ছেড়ে কোথাও যায় না।

আমাদের দেশের খালে-বিলে, বাদামী ও চিতি কাঁকড়ার অভাব নেই। একটু খোঁজ করলেই তোমরা অনায়াসে এই কাঁকড়া দেখতে পাবে। বর্ষার সময় এরা ডিম পাড়ে। ডিমগুলি মায়ের বুকের ঢাকনাওয়ালা একটা গর্তের মধ্যেই থাকে। ডিম থেকে বাচ্চা বেরুবার পর সেগুলি ঢাকনাটার নীচেই অবস্থান করে। জলের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার মত উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা মায়ের বুক ছেড়ে কোথাও যায় না। বাচ্চাগুলিকে বুকে নিয়েই স্ত্রী-কাঁকড়া অনায়াসেই ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করে থাকে। চিংড়িরাও ডিম বুকে নিয়ে যেখানে সেখানে বিচরণ করে থাকে। তবে ডিম নিয়ে বেড়াবার সময় কখনও এরা জলের বাইরে যায় না।

গরু, ছাগল, গাধা প্রভৃতি জন্তুদের প্রবল সন্তান-বাৎসল্যের ব্যাপার তোমরা অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছ। সবচেয়ে মজার ব্যাপার দেখা যায় ধোপার গাধার ক্ষেত্রে। বাচ্চা সঙ্গে থাকলে মা খুব ভারী বোঝা নিয়েও অতি উৎসাহের সঙ্গেই গন্তব্যস্থলের দিকে চলতে থাকে। কিন্তু কাছ থেকে বাচ্চা সরিয়ে নিলেই তার চলা বন্ধ হয়ে যায়—কাঠের মত অচল অবস্থায় একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। মারধোর করেও নড়ানো যায় না।

কয়েকজাতের মাকড়সার মধ্যেও তাদের ডিমের প্রতি এরূপ প্রবল আকর্ষণ দেখা যায়। আমাদের দেশে ঘরের আনাচে কানাচে বা দেয়ালের গায়ে সময় সময় ধূসর বর্ণের বড় মাকড়সাকে ডিম বুকে করে বসে থাকতে দেখা যায়। কাউকে কাছে আসতে দেখলেই চোখের নিমেষে কোন কিছুর আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করে। কিন্তু কোনরকমে ডিমের থলেটি ছিনিয়ে নিলে, সেটাকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত স্থানত্যাগ করতে চায় না। এই জাতেরই আর একরকমের মাকড়সার ডিম ছিনিয়ে নিলে একই জায়গায় চুপটি করে বসে থাকে। এই অবস্থায় কাগজ বা সোলার ছোট্ট একটি ডেলা পাকিয়ে কাছে ধরলেই সেটাকে ডিমের মত করে আঁকড়ে ধরে নিয়ে ছুটে পালায়। শোনা যায় কোন গতিকে ডিম চুরি গেলে পেঙ্গুইন পাখীরাও নাকি বরফের ডেলা কুড়িয়ে তার উপর বসে দিনের পর দিন ডিমের মতই তা দিয়ে থাকে।

এবার আমাদের দেশের এক রকমের অদ্ভুত প্রকৃতির মাকড়সার কথা বলেই এই প্রসঙ্গ শেষ করবো। বর্ষাকালে নালা, ডোবা ও এঁদো পুকুরের ধারে ধারে জলজ ঘাসপাতার উপর প্রায় এক ইঞ্চি পরিমিত একরকমের কালো ও ধূসর রঙের মাকড়সাকে অনবরত ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। এই জাতের পুরুষ মাকড়সাদের গায়ের রং কালো ও স্ত্রী মাকড়সাগুলির গায়ের রং ধূসর এবং তারা পুরুষ মাকড়সাদের চেয়ে আকারে কিছুটা বড়। যৌন মিলনের পর এই জাতের স্ত্রী-মাকড়সা পুরুষ মাকড়সাটাকে আক্রমণ করে বেমালুম চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। স্ত্রী-মাকড়সার আক্রমণ থেকে কদাচিৎ দু-একটা পুরুষ মাকড়সাকে পালিয়ে বাঁচতে দেখা যায়। বেশ কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে এরূপ ঘটনা তোমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাবে। এই জাতের স্ত্রী-একসঙ্গে প্রায় ৬০।৭০টা ডিম পাড়ে। বড় মটরের মত একটা ফলের মধ্যে ডিমগুলিকে ভর্তি করে সেটাকে শরীরের পশ্চাৎভাগে আটকে নিয়ে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করে। ডিম ফুটে বাচ্চাগুলি বেরিয়ে এসে মায়ের পিঠের উপরই আশ্রয় গ্রহণ করে। স্ত্রী মাকড়সাটা অতগুলি বাচ্চাকে পিঠে করেই স্বচ্ছন্দ গতিতেই শিকারের সন্ধানে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। সামান্য একটু শব্দ হলে অথবা অন্য কোন রকম ভয়ের কারণ ঘটলেই পিঠের বাচ্চাগুলিকে নিয়েই জলের নীচে ডুব দিয়ে আত্মগোপন করে। জলের নীচে জলজ লতাপাতা আঁকড়ে ধরে প্রায় ১০।১২ মিনিট লুকিয়ে থাকবার পর আবার বাচ্চাগুলিকে নিয়ে জলের উপরে উঠে আসে। তোমার চোখের সামনেই হয়তো একটা মাকড়সা বাসা পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমার নজরে থাকলেও হঠাৎ একটা শব্দ করলেই দেখবে—চোখের নিমেষে কোথায় যে সেটা জলের নীচে গিয়ে আত্মগোপন করলো—কোনো রকমেই তার হদিশ পাবে না।

আমাদের দেশে খাল-বিল ও বন জঙ্গলে এছাড়া আরও অনেক রকমের পোকামাকড়ের সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের সন্তান প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাদি খুবই কৌতুহলোদ্দীপক।

(পনেরজন ভারতীয় স্কুলের ছেলেমেয়ে টন্টামোরার স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিতে আসতে গিয়ে ব্রান্টালুসি পর্বত ও ঘন জঙ্গলময় উপত্যকার মধ্যে প্রবল ঝড়ে নিখোঁজ হয়ে যায়।

সাময়িকভাবে সমস্ত আনন্দ উৎসব স্থগিত রাখা হল। পাহাড়ের কোলে তির্নিকা গ্রাম থেকে, হেডমাস্টার আরডনের নির্দেশে মিডি, কিকু ও হকোর নেতৃত্বে তিনটি উদ্ধারকারী দল তিনদিক দিয়ে অনুসন্ধান সুরু করল।

কিন্তু মাজিনকোর গভীর জঙ্গল ঘন কুয়াশায় ঢাকা। তার উপরে আবার সেখানে শয়তান গ্রাটেনকোর উৎপাত।

ওদিকে, তিনজন গুরুতরভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা নিজেদের সামলে নিয়ে উদ্ধারকারী দলের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু স্টেনগান হাতে গ্রাটেনকো তাদের বন্দী করে ফেলল। প্যারাসুটে নামিয়ে দেওয়া রেডিও-যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ধারকারীরা এই খবর পেল।)

॥ ৪ ॥

—হ্যালো হ্যালো ব্রান্টালুসির উদ্ধারকারীরা বলছি। জবাব দাও। হ্যালো জবাব দাও। বল। হ্যালো-বল।

রেডিও অফিসার হোলখ্ কান থেকে হেড ফোন নাবাল।

—না সার কোনই সাড়া আর পাওয়া যাচ্ছে না।

—সর্বনাশ। বললেন প্রেসিডেন্ট ব্রকেনসিল।—এখন কি করা উচিত ?

দাড়ি চুলকে আরডন বললেন।—প্রথমেই আমাদের ভাবতে হবে আহতদের কথা। আচ্ছা ডাক্তার ওদিকের সাথে কথা বলে আপনি কি বুঝলেন ?

ডাক্তার কিটিলোলা তাঁর টাক মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বল্লেন।

—ভয় ঐ গুরুদিৎকে নিয়ে শুধু। মনে হয় ওর মাথায় চোট।

ওকে এখুনি সরান উচিত। বাকি দুজনের আঘাত বেশী হলেও ওরাই সামলাতে পারবে।

—আপনি নাববেন জঙ্গলে? স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলেন আরডন।

—হ্যাঁ রাজি। বললেন ডাক্তার কিটিসোলা।—কিন্তু গ্রাটেনকোর শেষ কথাগুলো একবার ভাববেন। শেষে হিতে বিপরীত না হয়।

—না না। ব্যস্ত হয়ে বললেন প্রেসিডেণ্ট।—জঙ্গলে এখন কাউকে নাবান ঠিক হবে না। শয়তান গ্রাটেনকোকে বিশ্বাস নেই। অনায়াসেই একটা ভয়ানক কিছুও করে বসতে পারে।······ভীষণ চিন্তিত ভাবে ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ পায়চারি সুরু করলেন তিনি। হোলথ্ বলল—রেডিও যোগাযোগ করার চেষ্টা কিন্তু আমরা সমানেই করে চলবো। মনে হচ্ছে জোর করে ওদের যোগাযোগ করতে দিচ্ছে না গ্রাটেনকো। জেনারেল আরস্কেনো বললেন—আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে। ও বোধ হয় ওদের বন্দী করে রেখে নিজে কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে চায়।

—হুঁ! গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন প্রেসিডেণ্ট।

—কিন্তু তেমন পরিস্থিতি হলে আমাদের কি করা উচিত? মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও।—ভীষণ চিন্তিত ভাবে ঘর ময় আবার পাইচারি সুরু করলেন প্রেসিডেস্ট। একটু থেমে বললে—জরুরী মন্ত্রীসভার অধিবেশন ডাকা উচিত এখুনি এই মুহূর্তে এখানে। আপনার কি মত জেনারেল?

আমারও ঠিক তাই মত প্রেসিডেণ্ট।—আমার সেনা-বাহিনীর এ ক্ষমতা আছে যে ঐ মাজিনকোর সমস্ত জঙ্গলটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে শয়তানকে বন্দী করতে পারে। কিন্তু তাতে এ নিশ্চয়তা কই যে ঐ বিদেশী শিশুরা নিরাপদ থাকবে? শক্তি নয় প্রেসিডেণ্ট এখন বুদ্ধির লড়াইয়ে ওকে হারাতে হবে।

আরডন চিন্তিত ভাবে বললেন—কিন্তু একটা বিপদের কথা মনে রাখতে হবে—কিকু বা হকোর দলের সাথে যদি হঠাৎ গ্রাটেনকোর দেখা হয়ে যায় তবেতো সমুহ বিপদ ঘটতে পারে। সুতরাং সে বিষয়ে আমাদের আগে ভাবা উচিত।

—কি করতে চান আপনি। চিন্তিতভাবে প্রেসিডেণ্ট জিজ্ঞাসা করলেন—চকৃমির তাকে মিডিকে আর কিকু আর হকোকে এখুনি রেডিও মারফৎ হুকুম দেব তারা কোন অবস্থাতেই দিনের বেলা চলাফেরা করবে না। যত কষ্টই হোক রাতের অন্ধকারে তাদের চলতে হবে। রেডিও যোগাযোগ রাত বারটার পর এক ঘণ্টা মাত্র। বাকি সময়ে বন্ধ। যাতে গ্রাটেনকো কোন রকম সন্দেহ না করতে পারে।

—আপনার কি মত জেনারেল?

নিখুঁত পরিকল্পনা। উত্তর দিলেন জেনারেল।

হোলথ্ বলল—আমি তাহলে খবরটা এখুনি জানিয়ে দিচ্ছি।

—হ্যাঁ। দিন। বললেন আরডন। আর বিশেষ করে মিডিকে বলুন সে যেন তার জিনিসপত্র বাইরে না বার করে দিনের বেলায়। আলোয় চকচক করলে গ্রাটেনকোর চোখে পড়তে পারে। বিশেষ সাবধানতা নেয় যেন সে। তাছাড়া সারা দিন তার প্রধান কাজ হবে সমস্ত জঙ্গল তন্নতন্ন করে খোঁজা কোন বিশেষ জায়গায় ওদের ও খুঁজে বার করতে পারে কিনা। পারলে তা জানাবে রাত্রে।

হোলথ্ বলল—আচ্ছা আমি এখুনি একথা জানিয়ে দিচ্ছি। এর পরে আমি কেবল চেষ্টা করবো প্লেনের যাত্রিদের সাথে যোগাযোগ করতে।

হোলথ্ তার যন্ত্রের সামনে বসে—কাজ সুরু করে দিল।

জেনারেল বললেন—যদি মিডি সঠিক কোন খবর দিতে পারে তবে রাতের অন্ধকারে লাফিয়ে পড়ার কথা ভেবে দেখতে হ'বে। তবে আমার মনে হয় আপাতত গ্রাটেনকোর সর্ত শোনার জন্য আমাদের অপেক্ষা করা—আর এর মধ্যে জরুরি, মন্ত্রীসভার কাজ সারা ছাড়া কোন কিছুই করার নেই আপাতত।

—হ্যাঁ। বললেন প্রেসিডেন্ট।—আপনার বিমান বাহিনীর কাউকে আমার জরুরী আদেশ নিয়ে এখ্‌নি রওনা হয়ে পড়তে বলুন। ম্‌ননীয় মন্ত্রীদের আসার ব্যবস্থাও করুন জেনারেল।

নিশ্চয়ই।—বললেন জেনারেল

হোলখ্‌ তখন যন্ত্রের সামনে বসে চলেছে।

—প্রেসিডেন্টের বিশেষ আদেশ। প্রেসিডেন্টের বিশেষ আদেশ।—ব্রান্টালুসির উদ্ধারকারীরা বলছি। প্রেসিডেন্টের বিশেষ আদেশ শোন।—বল।

—বড় আস্তে চলছিস তোরা। ধমকে উঠল গ্রাটেনকো। এমন করে চললে পথেই রাত হয়ে যাবে। অন্ধকারে বাঘের পেটে যাবি তোরা। তখন গ্রাটেনকোর বাবাও তোদের বাঁচাতে পারবে না।—নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল গ্রাটেনকো।

কপালের ঘাম ঝরে চোখের মধ্যে পড়ছে হামিদুলের। হাত যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। তবুও মুখ ফুটে একটু শব্দও কোরল না ও। ওর দিকে তাকিয়ে তনুকা কঁকিয়ে উঠল।—এমন করে আর কত দূরে আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে তোমরা ভাই; আমাকে এখানেই ফেলে রেখে যাও। তোমরা বাঁচ।

ধমকে উঠল বিলি—ওকথা আবার বলবে তো সত্যিই তোমাকে আমরা ফেলে দেব। তখন আবার হাতটাও ভাঙবে কিন্তু বলে দিচ্ছি।

—পাগল ছেলের দল। হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলল তনুকা।

দ্বিতীয় স্ট্রেচারে গুরুদিৎ আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছে ঝাঁকানির চোটে। ওখানে আছে মুংলি শকুন্তলা শান্তা আর রুক্মিণী। সমান পা ফেলে চলতে পারছে না ওরা।

পরের স্ট্রেচারের ভার নিয়েছে সব কজন বাচ্চা। ওরা কিন্তু ব্যাপারটাকে বেশ মজা বলেই ধরে নিয়েছে। চেঁচামেচি হট্টোগোল করে আমিনাকে প্রায় ভুলিয়েই রেখেছে তার ব্যথার কথা। ওরা কেউই কিন্তু এখনও বুঝতে পারে নি কি ভীষণ অনিশ্চয়তার মধ্যে গিয়ে পড়ছে ওরা। মাঝে মাঝে ওদের হাসি চিৎকারে বিরক্ত গ্রাটেনকো গর্জন করে উঠছে। তাতে ভয় পেয়ে ওরাও থামছে বটে। তবে সে অল্প কিছুক্ষণের জন্যই।

পরমুহূর্তেই আবার ওদের চিৎকার, হাসি শোনা যাচ্ছে।

—থামো। হঠাৎ মুংলি চেঁচিয়ে সবাইকে হুকুম করল।—থামো সবাই। গুরুদিৎকে একটু বিশ্রাম দিতে হবে।—ওর হুকুম শুনেই রাণা হাত তুলল।

তাই দেখে সবাই থামল। আস্তে স্ট্রেচার মাটিতে নাবিয়ে রেখে পাশে বসে পড়ল। হাঁপাচ্ছে তখন সকলে।

গর্জন করে ফিরে দাঁড়াল গ্রাটেনকো।

—থামলি যে তোরা? কে তোদের থামতে বলেছে শুনি? লাফিয়ে ও বিলির সামনে দাঁড়াতেই বিলি বলল—তুমি কি অন্ধ? দেখতে পাওনি গুরুদিৎ আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছে? থামতে আমাদের হবেই এখন। এমনকি পরেও অনেকবার।

—না। থামবি না তোরা? ধরা পড়বার জন্য গ্রাটেনকো তোদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে না। ওঠ সকলে। চলতে হবে এখুনি। ওঠ বলছি।

—না আমরা চলবো না এখন। স্পষ্ট করে উত্তর দিল বিলি।—আমরা চলবো আমাদের ক্যাপ্টেনের হুকুম পেলে।

সমস্ত মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল গ্রাটেনকোর। ক'মিনিট ও ভেবেই পেল না কি করবে। তারপরে দাঁত মুখ ভেংচে বলল—মরতে চাস তুই?

—হাঁ আমরা সবাই।—সে তো আগেই বলেছি।

সামনে এসে দাঁড়াল রাণা।—বার বার ওকথা বলছ কেন তুমি? ওতে আমরা আর ভয় পাব না।

হাতের স্টেনগানটাকে দুম দুম করে সামনের গাছের গুঁড়িতে বারকতক ঠুকে চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো—কি ভেবেছিস তোরা? কি ভেবেছিস! গ্রাটেনকো কি তোদের মতন কতগুলো অপোগণ্ডকে ইঁদুরের মতন মারতে পারে না? পারে পারে—নেহাৎ একটা মতলব মাথায় এসেছে তাই। নইলে...উঃ উঃ।

কি আর বলবে গ্রাটেনকো তা ভেবেই পেল না।

মুংলি তক্ষুণি বলল—আমরা একবার ডাক্তারের সাথে কথা বলব এক্ষুনি। গুরুদিতের জন্য আমার ভীষণ ভয় করছে। তুমি যন্ত্রটা দাও।

—তোর হুকুমে নাকি।—মুখ আবার ভেংচাল গ্রাটেনকো।

—দিতেই হবে তোমাকে। শক্ত পায়ে এগিয়ে গেল মুংলি।

ঝপ করে স্টেন গানটা আবার বাগিয়ে ধরল গ্রাটেনকো—আর এক পা এগোলেই তোকে গুলি করব। ঠিক গুলি করব।

কাউকে কেউ কিন্তু কোন হুকুম দিল না! তবুও ওরা সবাই এসে দাঁড়াল মুংলির পাশে।

এক মিনিট থামল ওরা। তারপর সবাই শক্ত পায়ে এগিয়ে চলল গ্রাটেনকোর দিকে।

তাই দেখে ভীষণ ভাবে চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো—খবরদার। ওর নাকের মাংসপেশী কুঁচকে গেল চোখ দুটো ছোট কুতকুতে হয়ে পড়ল। ভীষণ ভাবে হাঁপাতে লাগল ও। নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে লাগল।—একটা হিংস্র পশুর মতন দেখাতে লাগল ওকে।—তবুও কেউ ভয় পেল না। ধীরে ধীরে এগিয়েই চলল সকলে।

হঠাৎ এক ঝটকায় নিজেকে কেমন যেন শক্ত করে ফেলল গ্রাটেনকো। পরমুহূর্তেই ওর হাতের স্টেন-গানটা গর্জে উঠল—দুম্ দুম্ দুম্।

কান ঘেঁসে এক ঝাঁক গুলি বার হয়ে গেল অনেকেরই। মুংলি ফিরে দেখল কেউ মাটিতে লুটিয়ে পড়েনি। আর কোন কিছু—ভাবতে পারল না ও। সোজা এগিয়ে গিয়ে দুহাত দিয়ে ধরল রেডিও যন্ত্রটাকে। স্পষ্ট অথচ কাঁপা গলায় বলল।—দাও এটা। একজনের বাঁচা মরা এর উপরে।—

বাধা দেওয়ার কোন ক্ষমতাই ছিল না গ্রাটেনকোর। কেমন যেন বোকার মতন ও দাঁড়িয়ে রইল। রেডিও যন্ত্রটা খুলে এনে টমের হাতে দিল মুংলি।

সবাই ঝুঁকে পড়ল ওটার উপরে। টম চাবি ঘুরিয়ে ওটাকে চালাতে যাবে যেই, হঠাৎ পিছন থেকে চিৎকার করে উঠল তমুক্কা। রেডিও ছেড়ে সবাই চট করে উঠে দাঁড়াল। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল—যে গুরুদিৎকে নিয়েই এত গোলমাল, সেই টলতে টলতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

মুংলি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে। বাঃ এই তো ভাই তুমি বেশ হাঁটতে পারছ। তুমি ভাল হয়ে গেছ। হাঁপাতে হাঁপাতে গুরুদিৎ বলল—আমাকে নিয়েই যখন এত গোলমাল ডাক্তার দিদি তখন আর আমি শুয়ে যাব

না। আমি হেঁটেই যাব—

—পারলে নিশ্চয়ই যাবে। হেসে উত্তর দিল মুংলি।

টম রেডিওর চাবি ঘুরিয়ে ডাকতে লাগল—হ্যালো হ্যালো ব্রাণ্টালুসি উদ্ধারকারীরা······

ওদিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল—তোমরা অতক্ষণ চুপ করে ছিলে কেন। ভাল আছ তো সবাই।

—হ্যাঁ ভাল আছি। জানো ত আমরা বন্দী······

ছুটে এলো গ্রাটেনকো। নিজেকে ও সামলে নিয়েছে। চেঁচিয়ে বলল -বল্ বল্ গ্রাটেনকো শুধু নিজের মুক্তি চায় আর তার বদলেই কেবল তোরা ছাড়া পাবি। নইলে এই গ্রাটেনকোর মতনই তোদেরও সারা জীবন এই জঙ্গলে ঘুরে মরতে হবে। এ জঙ্গলের ত্রিসীমায় কেউ ঢুকলে আমি তোদের খুন করবো। করে গাছের ডালে লটকে দেবো। আর বল আমার খাবার চাই। অনেক খাবার। রোজ রোজ। নইলে আমি তোদের উপোস করিয়ে রাখবো ও সব কথা বলে গ্রাটেনকো প্রাণখুলে হেসে উঠল।—বল বল। গ্রাটেনকো আর এখন বন্দী নয়। এ জঙ্গলে সেই রাজা। বন্দী এখন তোদের প্রেসিডেন্ট। সে আমার মেয়েটাকে মিছিমিছি মেরেছে। তার বদলা নেব আমি।

টমকে আর এসব কথা বলতে হল না। রেডিও খোলাই ছিল। ওদিকে সব কথাই প্রেসিডেণ্ট নিজের কানে শুনতে পেলেন। শুনে শিউরে উঠলেন।

তবুও টম বলল—আমি আর কি বলব গ্রাটেনকো। তুমি নিজেই স্পষ্ট করে বল না কি চাও। এই নাও রেডিও।

ওর কথা শুনে কেমন যেন ঘাবড়ে গেল গ্রাটেনকো। এক দু মিনিটেই সে ভাব কাটিয়ে বলল—বলবই তো। আমি কি আর কাউকে ভয় করি নাকি? দে রেডিও দে।

যন্ত্রের বোতাম টিপে টম সেটা দিল ওর হাতে। ওটা হাতে নিয়েই গ্রাটেনকো চেঁচাতে সুরু করল—সোজা কথা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। আমাকে এমন কুকুর বানিয়েছে কে? তাদের কেন সাজা হবে না? তাদের বেলায় মাফ্ আর আমার গলায় দড়ি? আমাতে ছেড়ে দিতে হবে। সে কথাই আমি শুনতে চাই। নইলে এদের আমি ছাড়বো না। কখনো ছাড়বো না।

বোতাম টিপে দিয়ে হেডফোন কানে দিল টম। কিছুক্ষণ ওদিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না—তারপর স্পষ্ট শোনা গেল—তোমার কথা শুনেছি গ্রাটেনকো। তোমার কথা ভেবে দেখা হবে।······

মুখস্থের মতন টম সে কথা শোনালো গ্রাটেনকোকে। শুনে সে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চেঁচিয়ে উঠল—ফাঁকা কথা। মিথ্যা কথা। ওসব আমি শুনতে চাই না। কি ভাববে ওরা আমার সম্বন্ধে। কে ভাববে? ঐ মাথা মোটা প্রেসিডেণ্ট। ওর মাথায় কোন বুদ্ধি নেই। ওই তো জোর করে আমাকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিল। আমি ছাড়বো না। কাউকে ছাড়বো না। ওরা মিথ্যা কথা বলে আমাকে আরও ফাঁসাতে চায়। অত বোকা গ্রাটেনকো নয়।

ওর চিৎকার থামার সাথে সাথেই ওদিক থেকে স্পষ্ট করে রেডিওতে বলল—গ্রাটেনকোকে প্রেসিডেণ্ট বলেছেন ওর কথা তখনই ভাবা হবে যখন সবাইকে ও ছেড়ে দেবে। আগে ওদের ছেড়ে দাও। প্রেসিডেণ্ট নিশ্চয়ই মন্ত্রী-মণ্ডলীর কাছে ওর হয়ে বলবেন। কবে কোথায় ওদের ছাড়বে জানাও। আমাদের হেলিকপ্টর যাবে সেখানে। ওর হুকুম মত প্রচুর খাবার ও অন্য জিনিসপত্র এখুনি ফেলা হবে।

কোথায় ফেলবে জানাও। ঠিক নিশানা দাও। নইলে জিনিস নাবাতে কষ্ট হবে। একথাগুলোও গ্রাটেনকোকে জানাল টম।

—ঘাস খায় লোকগুলো সব ঘাস খায়। ভেবেছে কি ওরা? যেখানে খুশি জিনিস ফেলুক! বলে লাফাতে লাগল গ্রাটেনকো।

—আমাকে কি অতই বোকা ভেবেছে? আগে ছেড়ে দেব সবাইকে তারপর গিয়ে সোজা ঝুলবো দড়িতে! ঐ মাথা মোটা প্রেসিডেণ্ট আর তার মন্ত্রীগুলো এর বেশী আর কি ভাববে আমার সম্বন্ধে। সোজা বলছি—স্পষ্ট কথা শুনতে চাই আমার সম্বন্ধে! হেঁয়ালী বুঝিনা। নইলে বাছাধনরা পচে মরুক আমার সঙ্গে। বলেছে বাজে কথা বকার সময় আমার এখন নেই। রাতে কথা হবে। আবার ততক্ষণ ঐ মোটা বুদ্ধির লোকগুলো ভাবুক কি করবে ওরা।

টম রেডিওর বোতাম টিপে এই কথা গুলোই গুছিয়ে ওদের বলল। আরও বলল—গুরুদিৎ এখন ভাল আছে। ও হাঁটতে পারছে। ওদিক থেকে আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল ওরা। ধমকে উঠল গ্রাটেনকো—বন্ধ কর ওটা এখুনি। নইলে ওটাকে আমি গুঁড়িয়ে দেব।

ভয়ে ভয়ে রেডিওটা বন্ধ করল টম।

মুংলি বলল। আমার যে ডাক্তারের সাথে কথা বলার ছিল।

—তোর রুগীতো ভাল হয়ে গেছে। হাঁটতে পারছে। বাকি যত বাজে কথা তোর রাতে বলবি। এখন হাঁটতে সুরু কর আবার।

ধাক্কা দিয়ে সবাইকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে লাগল গ্রাটেনকো।

—চল চল! চল বলছি!!

ওর ধাক্কা খেয়েও কেউ কিন্তু নড়ল না। তা দেখে আরও ক্ষেপে গেল গ্রাটেনকো। চেঁচিয়ে উঠল।—চল বলছি নইলে…

রাণা বলাতেই আবার সবাই হাঁটতে সুরু করল। গুরুদিৎ কারও কথা শুনল না। জোর করে হেঁটেই চলল। মুংলিও ওর পাশে পাশে চলল। যদিও ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল তবুও গুরুদিৎ সবার কষ্টের কথা ভেবে জোর করেই হেঁটে চলল। বলল—কিছু ভেব না ডাক্তার দিদি। আমি পারব।

—এ আমরা কোথায় চলেছি? চুপিচুপি হামিদুল জিজ্ঞাসা করল।

—মনে হচ্ছে গাছপালা যেন ক্রমে কমে আসছে! বলল বিলি।

—পথ কেমন নীচের দিকে নেবে যাচ্ছে দেখ। বলল রাজা।

—হ্যাঁ তাইতো দেখছি। মাটির চেহারাও বদলাচ্ছে। বলল রাণা।

—আসে পাশে জল কোথাও নেই মনে হচ্ছে। বলল টম।

ক্রমে ঝোপ, ঝাড়, গাছপালা একেবারেই কমে গেল। মাটির উপরে ছড়ানো নুড়ি পাথরে জায়গাটা ভরা এসে ঢুকল বৃষ্টি ধোওয়া ভাঙ্গাচোরা এবড়ো খেবড়ো খদের ভিতরে। সে খদও গোলক ধাঁধার মতন। চারদিকে ছড়ান। যত এগোও ততই ওর মুখ নানান দিকে বার হয়ে গেছে। কি যেন কি চিহ্ন দেখে গ্রাটেনকো সেই চালু খদের গোলকধাঁধার মধ্যে পথ খুঁজে নেবে যেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে গভীর হল সে খদ। শেষে এক সময়ে ওরা এসে পড়ল এমন একটা জায়গায়—যেখান থেকে আর উপরের পৃথিবী দেখা যায় না। চারপাশ ঘিরে শুধুই খদ আর খদ। রুক্ষ কাঁকুড়ে জমি। কোথাও এতটুকু ঘাস বাঁশঝাড় নেই শুধু ছোট ছোট কাঁটা গাছে

ভরা চারদিক। জলেরও কোন চিহ্ন কোথাও দেখা গেল না।

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল রাণার। এ ভীষণ গোলকধাঁধা থেকে পথ খুঁজে বার করা অসম্ভব। গ্রাটেনকোকে ফাঁকি দিয়ে পালানো আর যাবে না আর তার জন্যই এর মধ্যে ওদের এনেছে গ্রাটেনকো। কারও মুখে কোন কথা নেই। স্ট্রেচার টানার ফলে সবাই হাঁপাচ্ছে। সবাই যেন কেমন থমকে গেছে।

আস্তে আস্তে দিনের আলোও ফুরিয়ে এলো।

খদের ভিতরে অন্ধকার জমতে শুরু করে দিয়েছে। একটুতেই সে অন্ধকার হঠাৎ যেন জমাট বেঁধে গেল। আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পায়ে পায়ে সবাই হেঁটে যাচ্ছে। তবুও থামার কোন লক্ষণ নেই গ্রাটেনকোর। বাচ্চাদের মধ্যে হঠাৎ কে যেন কাঁদতে সুরু করল। তখন আর থাকতে না পেরে রাণা চেঁচিয়ে উঠল—থামো সবাই। থামো।

এই হুকুমের জন্যই যেন সকলে কান পেতে ছিল। ঐ অন্ধকারের মধ্যেই সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। যে কাঁদছিল তার কান্নাও বন্ধ হল। স্ট্রেচার নাবিয়ে সকলে হাঁপাতে লাগল। রাণা ভেবেছিল গ্রাটেনকো চেঁচাতে সুরু করবে কিন্তু অবাক হল—যখন দেখল ও একটা বড় পাথরের ঢিপির উপরে বসে পড়ে মনের সুখে শিষ দিতে সুরু করল। সে শিষের শব্দ সবার কানে পৌঁছাতেই অত ক্লান্তির মধ্যেও সকলে অবাক হয়ে ওর দিকে মুখ ফেরালো। অন্ধকারে কিছুই বোঝা গেল না। বোঝা গেল না কেন হঠাৎ এমন খুশি হয়ে উঠল গ্রাটেনকো।

অন্ধকারের মধ্যেই মুংলি বলল—জল চাই আমাদের।

—আমরা সবাই জল খাব।

কথাটা ও বলেছে গ্রাটেনকোকেই। কিন্তু মনে হল না সে কথা ওর কানে গেছে। ও যেমন শিষ দিচ্ছিল তেমনি দিতে থাকল।

শুনতে পাচ্ছ? রাগ করে চেঁচিয়ে উঠল মুংলি। থামল শিষ। লাফিয়ে উঠল গ্রাটেনকো। ধুপ ধাপ করে মুংলির সামনে এগিয়ে এসে বলল—অত রাগ কেন তোর? জল খাবি তো খা যত পারিস।

—ঠাট্টা করছ? থাকতে না পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুংলি।

—কে বলল? দু পা এগোলেই তো জল। এগো না। এগো।

রাণা বলল—এ আমরা এসেছি কোথায়?

—এমন জায়গায় যেখান থেকে পালাতে গেলে পথ হারিয়ে জল তেষ্টায় মরতে হবে সবাইকে। কেউ পালাতে পারবে না এখান থেকে। আর কেউ তোদের খুঁজেও পাবে না।

ওর কথা শুনে ভয়ে বুক কেঁপে উঠল রাণার। একটু চুপ করে থেকে বলল—বেশ, এখন কোথায় জল বল। আমাদের সবার তেষ্টা পেয়েছে।

—বেশ দাঁড়া দু মিনিট।— বলল গ্রাটেনকো।

—আমি আসছি এখুনি। যত পারিস জল খাস তখন।

অন্ধকারে খদের একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ও। ওর পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই রাজা বলল--ও চলে গেছে। আমরা একলা।

টম বলল—পালাবে?

বিজি বলল—নিশ্চয়ই। ও ফেরার আগেই।

—না—। ধমকে উঠল রাণা। ওসব বাজে কথা ভেবো না এখন। এ ভীষণ খদের মধ্যে থেকে পথ

না জানলে বার হওয়া অসম্ভব। সঙ্গের বাচ্চাদের কথাও তো ভাববে। জল ছাড়া ওরা চলতে পারবে কেন?

সবাই একথা শুনে চুপ করল। সবারই মন খারাপ হয়ে গেল।

—মন খারাপ কর না। বলল রাণা।—দেখো নিশ্চয়ই সব ঠিক হয়ে যাবে। বুদ্ধি করে এক সাথে আমরা যদি চলতে পারি।—

তনুকা হঠাৎ বলল—গ্রাটেনকোকে যত খারাপ ভাব ও কিন্তু তত খারাপ নয়। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে ওকে ভাল করতে পারব। এস আমরা তাই করি। ও ছাড়া এ জঙ্গলে থেকে কেউ আর আমাদের বাঁচাতে পারবে না।

বিলি বলল—কিন্তু, মাঝে মাঝে ও যা ক্ষেপে যায়!

টম বলল—কিন্তু তবুও কোথায় যেন ওর কিছু ভাল আছে। দেখলে না তখন ও স্টেনগানটা এমন করে চালালো যে কেউ যেন এতটুকু ব্যথা না পায়।

বিলি বলল—বলেছে তো আমাদের মেরে ফেলা ওর উদ্দেশ্য নয়।

রাণা বলল—কথা তুমি মন্দ বলনি তনুকা দি। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে কেন পারবো না? ওকে ভালো করতে না পারলে আমরাই বা কেমন মানুষ!

মুংলি বলল—নিশ্চয়ই। ও যত রাগীই হোক না কেন—মানুষ তো। আর মানুষ কত খারাপই বা হতে পারে?

রাজা বলল—চুপ কর সবাই, আমি যেন পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম।

হামিদুল বলল—আমিও তোমাদের দলে ক্যাপ্টেন। ওকে ভাল করতেই হবে। নইলে আমরা কিছুতে এখান থেকে যেতে পারব না।

রাজা বলল—চুপ কর সবাই—ঐ দেখ।

সবাই তাকিয়ে দেখল—দূরে একটা বাঁকের মুখে যেন আলোর আভাষ দেখা যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। বাচ্চারা সবাই আনন্দে এক সাথে চেঁচিয়ে উঠল—আলো আলো। ওরা আসতেই তনুকা চাপা গলায় বলল—মনে থাকে যেন আমাদের কথা। সবাই একসাথে উত্তর দিল—নিশ্চয়ই। একটা বিরাট মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে লাফাতে লাফাতে ফিরল গ্রাটেনকো। মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ অদ্ভুত সব আওয়াজ করে আপন মনে হেসে শেষে চেঁচিয়ে উঠল—ও পালাসনি তোরা খুঁদে শয়তানের দল। পালাসনি কেন? যাক্ বুদ্ধি খুলেছে দেখছি।

—জল কোথায়? জিজ্ঞাসা করল।

—আমার পকেটে। হেসে উত্তর দিল। তারপর বলল।—আয় আমার সাথে। আয়। আয়। সবাই। আমরা পৌঁছে গেছি আমার গোপন গুহায়। ব্যস সেখানেই তোরা থাকবি। তারপর দেখব কে তোদের খুঁজে বার করতে পারে।

—এসো সবাই। রাণা ডাকল।

ওর ডাক শুনে ভীষণ অনিচ্ছাতে সবাই উঠে দাড়াল। আবার হাঁটতে হবে। সে কথা ভেবেই সবার মন খারাপ হল। কিন্তু বেশী দূর যেতে হলনা। গোটা দুই তিন বাঁক এদিক ওদিক ফিরে হঠাৎ এক জায়গায় এসে দাঁড়াল গ্রাটেনকো। ওর হাতের মশালটা একটু উঁচুতে তুলে ধরতেই সবাই দেখল—সামনেই এক পাশে—একটু দূরে খদের দেওয়াল ফুঁড়ে একটা জমাট বাঁধা অন্ধকার যেন হাঁ করে আছে। সবার বুকই যেন কি এক ভয়ে

কেঁপে উঠল। ওই তাহলে সেই ভয়ঙ্কর গুহার মুখ! ঐ ভীষণ অন্ধকারের মধ্যেই তাহলে ওদের বন্দী থাকতে হবে।

—দাঁড়ালি কেন তোরা? চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো। চল চল। তোদের পৌঁছে দিয়েই আমাকে আবার ফিরতে হবে ঐ ভাঙ্গা প্লেনে। জিনিসপত্রগুলো আনতে হবে। নয়ত কাল হয়ত ভীষণ দেরী হয়ে যাবে। কে বলতে পারে ওরা হয়ত ঢুকবে জঙ্গলে তোদের খোঁজে।

কেউই এসব কথার কোন জবাব দিল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল সবাই সামনের দিকে। তাহলে শেষ পর্যন্ত বন্দীই হতে হবে ওদের।

কেন এমন বোকার মতন চলে এলো ওরা? না এলে কি করত গ্রাটেনকো?—মেরে ফেলতো ওদের।

গুহার মুখে হাতের মশালটাকে মাটিকে গুঁজে দিয়ে ভিতরে ঢুকল গ্রাটেনকো। ওর পিছনেই এগোলো রাণা। অল্প অল্প আলো এসে পড়ছে ভিতরে। তাতে ভিতরের কিছুই স্পষ্ট দেখা গেল না। একটু ঢুকেই থামল রাণা।

দাঁড়া তোরা। চেঁচালো গ্রাটেনকো। আরও একটা মশাল জ্বালছি আমি। তবেই সব দিকে আলো হয়ে যাবে। সব কিছুই আছে এ গুহায়। জল-খাবার। আর কিছু চাস না যেন। খুব সুখেই থাকবি তোরা এখানে।

বলতে বলতে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল গ্রাটেনকো। তার কিছু পরেই একটা মশাল ধরিয়ে ফিরল। সেটাকে পুঁতে দিল গুহার ঠিক মাঝখানে। এক নজরে চারদিক দেখে নিল রাণা। না যতটা খারাপ ভাবা গেছিল ঠিক ততটা নয়। বেশ বড় এ গুহায় সবার জায়গা ভাল ভাবেই হয়ে যাবে। তাছাড়া তিন দিক বন্ধ থাকার জন্য হঠাৎ অন্য কোন বিপদের কিছু ভয় নেই।
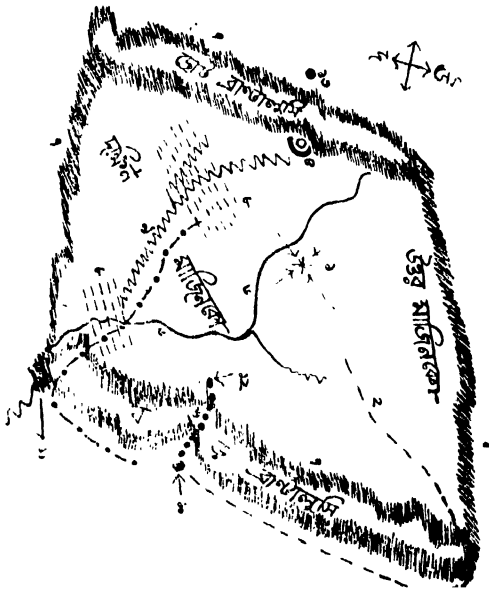
১। প্লেনের ধ্বংসাবশেষ
২। কিকুর যাত্রাপথ
৩। মিডির যাত্রাপথ
৪। হকের যাত্রাপথ
৫। গ্রাটেনকোর গুহা
৬। টিবল্লি নদী
৭। মালভূমি শেষ
৮। ভূমিকম্পে কাটা চৌচির জমি
৯। টিবল্লি নদীর মরা খদ
১০। তির্নিকা গ্রাম
১১। ব্রাকা জলপ্রপাত
১২। চকমির তাক
১৩। টোপকির শেষ পুলিশ চৌকি

সব থেকে ভাল এই যে এক কোণের দেওয়ালের ফাটল বেয়ে সরু একটা জলের ধারা নেবেছে। তার তলায় বড় একটা গর্ত করে সে জল ধরে রেখেছে গ্রাটেনকো।—পরিষ্কার আর মিষ্টি সে জল।—

—সবাই এসো ভিতরে।—গুহার মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকল রাণা।—এসো, কোন ভয় নেই এখানে। জায়গাটা ভালই।

ক্লান্তিতে সবারই শরীর ভেঙে পড়ছে। তার উপরে একটা ভীষণ ভয় আর উত্তেজনায় কেটেছে সারা বিকালটা। এখন হঠাৎ ক্যাপ্টেনের মুখে জায়গাটা ভাল শুনে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

মুংলি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বলল—আগে আহতদের ভিতরে নেওয়া হোক্। তারপরে বাচ্চাদের।

এক এক করে সবাই ওরা ভিতরে এসে ঢুকল। এক পাশ ঘেঁসে স্ট্রেচার নাবাল ওরা। তারপর সবাই বসে পড়ল পাথরের মেঝের উপরে। ছোটরা গেল জলের কাছে। সেখানে গিয়ে সবাই আঁজলা ভরে জল খেতে লাগল।

ওদের সবাইকে বসতে দেখে—খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো—আমার কাজ সারা। এখান থেকে কাউকেই আর পালাতে হবে না। আর কেই বা খুঁজে বার করবে এ জায়গাটা?—ব্যস। এবারে আগে আমার একটা গতি হোক তারপর তোরা ছাড়া পাবি।—এখন আমি নিশ্চিন্ত।—

রাণা ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বলল—আচ্ছা। সুধু জল খেয়ে কি মানুষ বাঁচে? এখানে আমরা খাব কি?—ঐ বাচ্চারা কতক্ষণ না খেয়ে থাকতে পারবে?

—তার আমি জানি কি—দাঁত মুখ ভেংচে বলল গ্রাটেনকো।—আমি তো জানিয়েই দিয়েছি অনেক খাবার পাঠাতে। না পাঠালে এখানে কোথায় তোদের জন্য রাজভোগ যোগাড় করব শুনি!

—তবে কি আমরা না খেয়ে মরবো?

—ইঃ কথা শোন বাবুর। কে বলেছে না খেয়ে মরতে। মারতে হলে তো আমার হাতে বন্দুক আছে। আমি তো তোদের মারবো বলে এখানে আনি নি।

—তবে খাবারের ব্যবস্থা কর। গম্ভীর ভাবে রাণা বলল।—বন্দুক যখন আছে কিছু শিকার করে নিয়ে এসো। আগুনে পুড়িয়ে খাব আমরা।

—হুকুম করছিস আমাকে? চেঁচিয়ে উঠল গ্রাটেনকো।

টম বলল।—আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না। রেডিওতে খবর দিলে ওরা হয়ত কিছু ব্যবস্থা করতে পারে।—আর বিছানাপত্র ওষুধও তো আমাদের চাই আরও।—রেডিও চালাবো?

—তবে এতক্ষণ চুপ করে বসে আছিস কেন? বলল গ্রাটেনকো—বল ওদের সব জিনিস পাঠাতে এক্ষুনি।—

রেডিওর চাবি সঙ্গে সঙ্গে টিপে টম ডাকতে আরম্ভ করল।—হ্যালো হ্যালো···।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আকাশে প্লেনের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাটেনকো ছুটে বাইরে বার হয়ে গেল।—মিনিট কুড়ি বাদে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো পিঠে বিরাট দুটো বোঝা বয়ে। সে দুটো নাবিয়ে দিয়েই আবারো ও বার হয়ে গেল।—ফিরল তেমনি বোঝা বয়ে। সে বোঝা নাবিয়ে দিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে ও হাঁপাতে লাগল।

রুক্মিণী শকুন্তলা শান্তা ততক্ষণে বোঝাগুলো খুলতে সুরু করে দিয়েছে। খাবার। ওষুধপত্র, বিছানা—পোষাক। দরকারি যা সবই পাঠিয়েছে ওরা। এক এক করে সব কিছুই ওরা গুছিয়ে রাখল।

টম রেডিওর চাবি আবার টিপে বলল—হ্যালো। সব কিছুই আমরা পেয়েছি।—ধন্যবাদ।

ওদিক থেকে বলল—আমরা গ্রাটেনকোর সাথে কথা বলতে চাই।—এখুনি।—

গ্রাটেনকো খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল—বেশ বেশ—বলুক কি বলতে চায় ওরা। শুনবো ওদের কথা।—

ওদিক থেকে বলল—প্রেসিডেণ্ট তোমার কথা ভেবে দেখছেন। তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে। তোমার নামে যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে তা তুলে নেওয়া হবে।—তবে তার আগে তোমাকে প্রেসিডেণ্টের একটা কথা মেনে নিতে হবে। তা হল—তুমি আগে বন্দীদের সবাইকে মুক্তি দেবে। কোথায় এবং কখন তুমি ওদের মুক্তি দেবে জানাও। লোক যাবে ওদের নিয়ে আসতে। তাতে রাজী না হলে তুমিই ওদের পথ দেখিয়ে পৌঁছে দাও।—এর পরই তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে।—

আবারও এসব কথা! গ্রাটেনকো যেন ক্ষেপে গেল। ভীষণ ভাবে চেঁচাতে শুরু করল—সেই পুরনো কথা? আগে সবাইকে ছেড়ে দেব? কতবার তো বলেছি ও সব হবে না। তবুও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওদের ঐ এক কথা। আমি ওদের কথার ফাঁদে পড়ব না।— সারারাত ভেবে দেখুক মাথামোটা লোকগুলো। আরও সহজ কিছু ভাবতে পারে কিনা। কাল ভোরে আমি ওদের শেষ কথা শুনতে চাই। তারপর যা করার আমি করব।

ধমকে গ্রাটেনকো টমকে বলল—বন্ধ কর তোর ঐ কথার যন্ত্রটাকে।—দে ওটা আমাকে। ওরা বুঝুক গ্রাটেনকো অত সহজ লোক নয় যে ওদের কথায় নাচবে।—

সত্যি রেডিও যন্ত্রটা টমের কাছ থেকে কেড়ে নিল গ্রাটেনকো। বাইরে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। গুহার ভিতরের মশালটাও নিবু নিবু। বাইরের মশালটা আগেই নিভেছে।—শুয়ে পড় সকলে।—শুয়ে পড়।—নইলে সবাইকে আমি এক এক ঘুঁষি মেরে শুইয়ে দেব।

সারাদিন পথ চলার ক্লান্তিতে সকলের চোখে এমনিতেই ঘুম এসে গেছিল। বাচ্চারা অনেকেই ঢুলতে শুরু করে দিয়েছে।

ধমক শুনে রুক্মিণী শান্তা আর শকুন্তলা উঠে কম্বলগুলো বিছাতে শুরু করে দিল। ওকে সাহায্য করতে এগোলো হামিদুল আর কুণাল।—এক এক করে সবাই শুয়ে পড়ল। শেষ বারের মতন তমুক্কা আর আমিনাকে দেখল মুংলি। ওদের কোন কিছুর দরকার আছে কিনা। ওরও তখন ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে।—ওদের এক পাশেই ও ওর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। বলল—রাত্রিবেলা দরকার পড়লেই আমাকে ডেকো কিন্তু আমিনা।—

বিলি টম রাণা আর হামিদুল পাশাপাশি শুল। চুপি চুপি নিজেদের মধ্যে যেই দুচারটে কথা বলেছে ওরা অমনি গর্জন করে উঠল গ্রাটেনকো।—চুপ করলি তোরা? নইলে তোদের মাথা গুঁড়ো করে দেব।

ওর ও কথায় কিন্তু ওরা কেউই ভয় পেল না। কিন্তু বুঝল গ্রাটেনকোর সামনে কোন কিছুই আলোচনা করা যাবে না।

অগত্যা ওরাও ঘুমাবার চেষ্টা করতে লাগল।—চোখ যখন জড়িয়ে এসেছে শুনতে পেল আপন মনে বিড়বিড় করছে গ্রাটেনকো।—না ছাড়বে তো না ছাড়ুক আমাকে। এই বেশ ভাল হল। এখন বেশ কিছু দিন আরাম করে সরকারি খানা খেয়ে সুখে কাটাব।—আমার তো ভালই হল।—যা চাইবো তাই পাব। তাই দিতে হবে ওদের।—

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল তমুক্কা খেয়াল নেই ওর। কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছে তাও জানে না। রাত এখন কটা? হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল ওর। না পায়ে কোন ব্যথা নেই। মুংলী যে শক্ত করে

বেঁধে দিয়েছে তার জন্য কেমন যেন খারাপ লাগছে সুধু। মেয়েটা না থাকলে কি হত ওর? সুধু ঐ মেয়েটাই বা কেন—আর অন্য সকলে! না—ওরা অসম্ভব কে সম্ভব করেছে।—গ্রাটেনকো তো বোধ হয় ওকে মেরেই ফেলতো। সুধু ওরা সবাই রুখে দাঁড়ালো বলে আজ তা হয় নি। কি সুন্দর এই ছেলেমেয়ে গুলো। ভগবান ওদের তুমি রক্ষা কর এই শয়তানটার হাত থেকে। কেমন যেন হঠাৎ নিজেকে ভীষণ অসহায় বলে মনে হল ওর।—পরক্ষণেই মনে হল সুধু ও কি নিজেই অসহায়—এই সব ছোট্ট ছেলেমেয়েগুলোও কি অসহায় নয়?—কোথায় এসেছিল ছুটিতে বিদেশে আনন্দ করতে। আর তার বদলে আজ তারা বন্দী। প্রতি মুহূর্ত একটা শয়তানের সাথে বুদ্ধির লড়াই করে চলতে হচ্ছে ওদের। একটু ভুলে কি ভীষণ কাণ্ডই না ঘটে যেতে পারে।

রাগ হল ওর দেশের লোকদের ওপরে। তারাই বা কেমন এমন বিপদের দিনে এগিয়ে আসছে না তাড়াতাড়ি একটা লোকের ভয়ে সবাইকেই কি চুপ করে ভাগ্যের ওপরে নির্ভর করে বসে থাকতে হবে।

সারা গুহায় ঘুরঘুটে অন্ধকার। শুধু গুহার মুখের কাছে একটু যেন আলোর সাড়া। সেখানেই শুয়ে আছে শয়তানটা। শিশুদের ভারি নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। নাঃ আর ঘুম আসবে না তনুক্কার। এখন শুধু জেগে থেকে দুশ্চিন্তা করা। আজ যদি পা দুটো ভাল থাকতো ওর তবে একবার দেখে নিত কত বড় শয়তান ঐ গ্রাটেনকো! কিন্তু সে আর হবার নয়।

হঠাৎ বাইরে থেকে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস গুহার মুখ দিয়ে ভিতরে ঢুকে সারা শরীর কাঁপিয়ে দিল ওর। অনেক কষ্ট করে পায়ের কাছের কম্বলটা টেনে নিজেকে ঢাকা দিল তনুক্কা। আচ্ছা ছেলেমেয়েদের এ বাতাসে ঠাণ্ডা লাগবে না তো? ওদেরও ভাল করে ঢাকা দিয়ে দেওয়া উচিত। ভাবল ডাকবে মুংলিকে। ও ছাড়া এ কাজ করবে কে? ডাকতে যাবে এমন সময় হঠাৎ নজর পড়ল গুহার মুখের কাছে যেন কিসের ছায়া। বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল ওর। কোন জন্তু নয় তো? হ্যাঁ ছায়াটা নড়ছে। ভয়ে গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল ওর। বাপ্‌রে! এ ছায়া যে ঢুকছে ভিতরে। শয়তানটাও কি জেগে নেই নাকি। চেঁচিয়ে উঠতে যাবে তনুক্কা। তখুনি বুঝতে পারল—না ভুল করেছে ও। ও ছায়া কোন জন্তুর নয়। ও ছায়া গ্রাটেনকোর। কি মতলব লোকটার? এত রাতে অমন নিঃশব্দে ও ঢুকছে কেন ভিতরে? ক্যাপ্টেনকে ডাকবে নাকি? কি সর্বনাশ করতে চায় ও রাতের অন্ধকারে? হঠাৎ সামনে ঝুঁকে পড়ল গ্রাটেনকো। কি যেন বললও ও বিড়বিড় করে। তার কোন কথাই কানে গেল না তনুক্কার। দেখল—একটা কম্বল তুলে নিয়ে কাকে যেন ঢাকা দিয়ে দিল গ্রাটেনকো। পাশের কাকে যেন ঠিক করে শুইয়ে দিল।

তারপর সারা গুহাময় ঘুরে ঘুরে সবাইকে দেখে বেড়াল গ্রাটেনকো। ওর দিকেও যখন আসতে লাগল তখন চোখ বুজে দম বন্ধ করে পড়ে রইল তনুক্কা। স্পষ্ট বুঝতে পারলো পাশে এসে দাঁড়াল গ্রাটেনকো দু সেকেণ্ড। বিড়বিড় করে বলল—বাঃ বাঃ এ আমার বেশ ভালই হল। ডাকাত গ্রাটেনকো আজ কিনা রাত জেগে—খুদে শয়তানদের পাহারা দিচ্ছে।—কার ঠাণ্ডা লাগবে দেখে বেড়াচ্ছে! জঙ্গলেও ঘরবাড়ি পেতে বসেছে। নিজের ঘরই সইল না যার সে কিনা পরের ঘর সামলাচ্ছে। বাঃ বাঃ!

বিড় বিড় করতে করতে গ্রাটেনকো চলে গেল। ওর পায়ের আওয়াজ সরে যেতেই চোখ মেলল তনুক্কা—ভীষণ অবাক হয়ে গেছে তনুক্কা। এ কেমন হল? এই তো কিছুক্ষণ আগেই লোকটাকে ও শয়তান ভাবছিল। এই রাতের অন্ধকারে ও যা করল তা তো কোন শয়তানের কাজ নয়। সে তো যে কোন সাধারণ মানুষের কাজ। না না—লোকটা আর যাই হোক—শয়তান নয়। এমনও তো হতে পারে—ওর সাথে কেউ কোন দিনও ভাল ব্যবহার করেনি? ওকে কেউ ভালবাসে না? এমন কি কেউ ওর কথাও ভাবে না। যখনই ওর নাম মনে করে তখনই ঘেন্নায় মুখ ভেংচায়। হয়তো তার জন্তুই লোকটা আজ এমন হয়ে গেছে।

তাকিয়ে দেখল তহুক্কা—লোকটা আবার নিঃশব্দে ফিরে গিয়ে দাঁড়াল গুহার মুখের কাছে। দু চার সেকেণ্ড। তারপর বসে পড়ল দেওয়ালে হেলান দিয়ে। কি হয়েছে লোকটার আজ! এত রাতেও ও ঘুমাচ্ছে না কেন! কেন অমন করে বসে পড়ল একপাশে! কারও কথা কি আজ হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেছে! এমন কেউ যাকে ও ভালবাসতো! যার জন্য এমন করে রাত্রে ও জেগে বসে থাকতো। কে সে? কোথায় সে আজ? আহা ওর ও হয়ত বাড়ি ঘর আছে। আছে আপন জন। সবার তাড়া খেয়ে এ জঙ্গলে আজ ও লুকিয়ে আছে ভয়ে। বাড়ির কথা কি ও ভুলতে পেরেছে তাতে? না না লোকটাকে যত খারাপ ভেবেছে ও আজ আসলে ও তত খারাপ নয়। লোকটার মনের কোথাও নিশ্চই একটা ভীষণ ব্যথা লুকানো আছে। সে ব্যথা ও পেয়েছে—মানুষের কাছ থেকে। সব মানুষকেই তাই ও আজ এমন করে ভয় করে। আর বোধ হয় প্রাণপণে চেষ্টা করে ঘেন্না করতে। তহুক্কা দেখতে পেল—কেমন করে যেন ঘুমন্ত শিশুদের দিকে তাকিয়ে আছে গ্রাটেনকো। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ও তেমনি করে। তারপর ওর বুক চিরে বার হয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস।

আস্তে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল গ্রাটেনকো। ওর আর কোন সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না। মনে মনে ভীষণ নিঃশ্চিন্ত হল তহুক্কা। এ লোকটাকে এখন ও ঠিক সামলে নিতে পারবে। আর ওর চিৎকার চেঁচামেচিকে এতটুকুও ভয় করবে না তহুক্কা।—ও তো পশু নয়। ও তো মানুষ। একটা সাধারণ রাগী মানুষ যে কারও কাছে কোন দিন ভাল ব্যবহার পায় নি। এতটুকু ভাল ব্যবহার পেলেই যে খুশি হতে পারতো—

হঠাৎ শুনতে পেল—বাইরের দিক থেকে গ্রাটেনকোর প্রচণ্ড নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে আসছে। লোকটাও তাহলে ঘুমিয়ে পড়েছে। খুশি মনে নিজেও ঘুমাবার চেষ্টা করল তহুক্কা। তখুনি পাশে যেন কেমন একটু শব্দ হল—চাপা গলায় মুংলি জিজ্ঞাসা করল—

—জেগে আছ তহুক্কা দি?

—হ্যাঁ বোন।

—কষ্ট হচ্ছে তোমার?

—না।

— সব দেখেছো তুমি?

—হ্যাঁ। আমরা ওকে মিছিমিছি ভয় করি বোন। ও মোটেই খারাপ নয়। যা কিছু করে ও ভয়ে—আর নিজেকে বাঁচাবার জন্য।

—আমার ও তাই মনে হয় দিদি। ও কিন্তু খুব দুঃখী। না?

—হ্যাঁ। —

তারপর চুপ করল ওরা। আকাশ পাতাল নানান চিন্তা করতে করতে কখন যে ওরা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে তা আর ওদের খেয়াল নেই।

সকাল বেলাই চেষ্টা করেছে হোলখ্। কিন্তু গ্রাটেনকোর শেষ চিৎকারের পরে সেই যে রেডিও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তারপর ওদিকের আর কোন সাড়া নেই। ভয়ানক দুশ্চিন্তায় সময় কেটেছে সবার। অবশ্য এও হতে পারে এত ভোরে হয়ত ওরা কেউ ঘুম থেকে ওঠে নি। কিন্তু গ্রাটেনকো তো বলেছে আজ সকালেই ও শুনতে চায় শেষ কথা। গ্রাটেনকোর নিজেরও তো কৌতূহল থাকতে পারে। অনেক রাত পর্যন্ত প্রেসিডেণ্ট মিটিং করেছে মন্ত্রিমণ্ডলীর সাথে।—এখন কি করা উচিত সে সম্বন্ধে। সবাই এক মত গ্রাটেনকোকে এতটুকুও বিশ্বাস করা চলবে না। অথচ কেউই বলতে পারে নি কি করলে বন্দীদের মুক্ত করা যেতে পারে।

রাত বারটায় মিডি হকো আর কিকুর সাথে রেডিও যোগাযোগ করেও কোন খবর পাওয়া যায় নি।—মিডি সারাদিন চকুমির তাকে বসে সমস্ত জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন মানুষের সাড়া পায় নি। অতগুলো মানুষ যেন একেবারে উবে গেছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে।—

অবশ্য হকো আর কিকুও এগিয়েছে অনেক খানিকটা কিন্তু ওরাও ওদের পথেও কোন মানুষের সাড়া পায়নি। কি করা উচিত এখন এ প্রশ্নটাই সবার মনে। কিন্তু কেউই সঠিক কিছু বলতে পারছেনা।

গরম কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে আরডন ঘরে ঢুকলেন। পেয়ালাটা হোলখ্-এর দিকে এগিয়ে দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলেন।

—না কোন সাড়া নেই ওদিকের। বলল হোলখ্।

—কঠিন সমস্যা। বললেন আরডন।—সব থেকে গোলমাল কোথায় জানেন? গ্রাটেনকোও জানে না সে এখন ঠিক কি চায়। কি সর্ত দিলে সে তা মানতে পারে।

—তাহলে উপায়? প্রশ্ন করল হোলখ্

—আমার তো মনে হয় এখন সব ব্যাপারটাই জেনারেলের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। বুদ্ধি আর গায়ের জোর দুটোই এখন খাটাতে হবে। নইলে অমন শয়তানকে বাগে আনা যাবে না।

—কিন্তু তাতে কি ভয়ানক বিপদের ঝুঁকি নেওয়া হবেনা? গ্রাটেনকো তো যা খুশি তাই করে বসতে পারে।

—পারে। চিন্তিত ভাবে বললেন আরডন।—কিন্তু এওতো ভাবতে হবে সারা বিশ্বের কাছে কি কৈফিয়ত দেব আমরা। অতগুলো শিশু আর আহতের ভাগ্য নিয়ে আমরা ছিনিমিনি খেলছি একটা শয়তানের ভয়ে? আমাদের এত বড় সৈন্য বাহিনী চুপ করে বসে তাই দেখছে!

—সে কথাও ঠিক। হতাশ ভাবে বলল হোলখ তখুনি ঘরে ঢুকলেন প্রেসিডেণ্ট আর জেনারেল। ওঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যায় কি ভীষণ চিন্তায় সময় কাটছে ওঁদের!

—কোন খবর আছে? জানতে চাইলেন জেনারেল।

—না কোন সাড়া নেই ওদিকের।

—আরও ঘণ্টা খানেক চেষ্টা করতে হবে। যদি সাড়া পাওয়া যায় তো গ্রাটেনকোকে বলতে হবে ওকে শেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে ভেবে দেখার জন্য। ও রাজী হলে এখুনি ওর নামের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেওয়া হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লোক নাববে জঙ্গলে বন্দীদের সব ভার নেবার জন্য। ওকেও ধরা দিতে হবে। সবাইকে সুস্থ সবল পেলেই ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে।—এ কথাগুলো বললেন জেনারেল!

—বেশ আমি আবার চেষ্টা করছি। বলল হোলখ্।

ঘণ্টা খানেক ধরে সমানে ও রেডিওর সামনে বসে চেঁচালে। কোথাও থেকে কেউ ওর ডাকের সাড়া দিল না। হতাশ হয়ে ও হেডফোন নাবিয়ে রেখে তাকালো জেনারেলের দিকে।

—নাঃ অসম্ভব। গ্রাটেনকো আমাদের ডাক শুনতে চায় না।

—তার মানে আমাদের সামনে তাহলে একটা মাত্র পথই খোলা।—গম্ভীর ভাবে বললেন প্রেসিডেণ্ট। —যা কিছু করতে হবে তা করতে হবে শক্তি দিয়ে।

—হ্যাঁ প্রেসিডেণ্ট। বললেন জেনারেল।—আর দেরী নয়। আমার সৈন্যদল তৈরী। আজই রাতের অন্ধকারে তারা দলে দলে নামবে জঙ্গলের নানান জায়গায়। গুলির মুখেই তারা মুক্ত করে আনবে আমাদের

অতিথিদের এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

—বেশ তবে তাই করা হোক, বললেন প্রেসিডেণ্ট।—আমার মন্ত্রিমণ্ডলিকে আমি তাহলে একথাই জানাব।

হোলখ্ বলল—যা কিছু করা হবে সে তো রাত্রে। আমি তাহলে সারাদিন কিন্তু ওদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে যাব।

—নিশ্চয়ই। বললেন জেনারেল।—তোমার চেষ্টা তুমি ছেড় না।

—আচ্ছা যদি ফের যোগাযোগ করা যায় তবে কি আমদের কাজের ধারা আমরা পালটাব? জিজ্ঞাসা করলেন আরভন।

—পালটাবো—যদি গ্রাটেনকো আমাদের সর্তে রাজী হয়। নইলে এখন থেকে আমাদের চেষ্টা হবে রেডিও মারফৎ ওকে মিথ্যা কথা বলে ভুলিয়ে রাখা। যাতে নির্বিঘ্নে আমাদের সৈন্যদর নাবতে পারে।—জেনারেল বললেন।

—আমাদের এ মতলবের কথা কি আমাদের বন্দীদের জানাবো। জিজ্ঞাসা করলেন আরভন।

—জানাবেন! কেমন করে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন জেনারেল।—যা বলা হবে রেডিওতে তা যদি গ্রাটেনকোই শোনে তবে? আমার মনে হয় রেডিওটা ও নিজের কাঁছেই রেখেছে। আগে সব কথা নিজে শুনছে পরে ওদের দিচ্ছে। তাহলে?

একটু ভেবে আরভন বললেন—যদি আমরা সংকেতে খবর দিই?

সংকেত? ভাবলেন জেনারেল।—কিন্তু সে সংকেতের মানে কি ওরা বুঝতে পারবে?

—আমার তো মনে হয় পারবে। যদি সহজ সংকেত পাঠানো হয়।

—বেশ তাহলে তাই করবেন। যদি ফল পাওয়া যায়তো তাতে লাভই হবে।

প্রেসিডেণ্টকে নিয়ে জেনারেল বার হয়ে গেলেন। আরভন একটা কাগজ টেনে নিয়ে তখুনি বসে পড়লেন সংকেত বাক্য বানাতে।

হোলখ উঠে গিয়ে আবার বসলো ওর রেডিও যন্ত্রের সামনে—সুরু হল ওর ডাকা—হ্যালো হ্যালো ব্রাটানুসির উদ্ধারকারীরা বলছি।...

কাগজের উপরে অনেকক্ষণ নানান হিজিবিজি কেটে এক সময়ে উঠে দাঁড়ালেন আরভন। দুপা এগিয়ে গিয়ে কাগজটা রাখলেন হোলখের সামনে। ডাক বন্ধ করে কাগজটার উপর ঝুঁকে পড়ল হোলখ। অবাক হয়ে দেখল তাতে লেখা আছে:—

"তোমাদের কজনকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলাম দাঁড়ি সে কথাটাই পড়বে কমা সুরু কিন্তু শেষ দাঁড়ি আমরা রাতেতে ফানুসটা মজা করে গগনে হঠাৎ বেঁধেছি দাঁড়ি লোহার কপাট খুলে রোজ মা কাছে ডাকে দাঁড়ি জলে লঙ্গর খুলে পড়ে গোবিন্দ পদর নয়শ সাতাশ বস্তার ধান ঘুণ দাঁড়ি দাঁড়ি কমার মানে নেই দুটো অক্ষরই বাজে।"

মাথা নেড়ে হোলখ বলল—কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ওরা কি এ পড়ে এর মানে করতে পারবে।

হেসে আরভন বললেন—এটা হল আরভনের জট। আমার তো মনে হয় এর মানে ওরা করতে পারবে। দেখাই যাক।

তেমনি সমানেই মাথা চুলকাতে চুলকাতে হোলখ বলল—বেশ তাহলে যোগাযোগ করতে পারলেই ওদের আমি আপনার এ ছড়া শুনিয়ে দেব।—ভগবান জানেন ওরা কি বুঝবে এর থেকে?

ওর একথা শুনে হেসে উঠলেন আরডন। অনেকক্ষণ বাদে এমন করে হাসতে পারলেন।

হোলখ সে হাসি গায়ে মাখল না রেডিও চালিয়ে দিয়ে আবার ও চেঁচাতে সুরু করল···হ্যালো হ্যালো···

অনেক বেলায় গ্রাটেনকোর চিৎকারে ঘুম ভাঙ্গল সকলের।—নবাব পুত্তুররা সব পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছেন।—এতটুকুও ভয় নেই কারও। সবাই যে বন্দী আমার হাতে—সে খেয়াল আছে।

ঘুম ভেঙ্গে উঠে বলল রাণা।— —আঃ কি বিরক্তই না করতে পারে লোকটা। সারাদিন এমন করে কথায় কথায় চেঁচিয়ে কি লাভ হয় ওর।—ও কি মনে করে সবাই ওর ঐ চিৎকার শুনে ঘাবড়ে যাবে?—

শান্তা এসে বলল—ক্যাপ্টেন তোমাকে ডাকছে শকুন্তলা।

—কেন? কোথায়? জিজ্ঞাসা করল রাণা।

—দেখবে এসে আমরা কি খুঁজে বার করেছি।

—কি হয়েছে? অবাক হয়ে রাণা মুখ তুলে তাকাতেই ঠোঁটের উপরে আঙ্গুল রেখে শান্তা ওকে চুপ করতে বলল। তারপর ইঙ্গিতে গুহার একটা কোণ দেখিয়ে ও এগোলো সে দিকে। অনেক কৌতুহল নিয়েই রাণাও এগোলো সে দিকে। গতকাল অন্ধকার হওয়ার পরেই এ গুহায় ঢুকেছে ওরা। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর তখন সবার ভেঙ্গে পড়েছিল। কেউই কোন রকম কৌতুহল দেখায় নি এ গুহা সম্বন্ধে। আজ দিনের আলোয় রাতের সে গুহাকে যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে। গুহার উপর থেকে সাদা চুনা পাথুরে রঙের হাজার লক্ষ ঝাড় ঝুলছে। ছোট বড় অপূর্ব তাদের চেহারা। এবড়ো খেবড়ো দেওয়াল ও হাজার ফাটলে ভরা। জায়গায় জায়গায় ফাটল-গুলোর এক পাশের দেওয়াল এমনভাবে এগিয়ে এসেছে সামনে যে দেখলেই মনে হয় যেন সে দেয়ালের আড়ালে এ গুহার মতন অন্য একটা গুহা লুকান আছে। তেমনি একটা ফাটলের দিকে এগোল শান্তা। বেরিয়ে আসা দেওয়ালটা বেড় দিয়ে একটু সাম্‌নে এগোতেই অবাক হল রাণা। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। একটু সরু মুখের সুরঙ্গের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। শান্তা বলল—এসো ক্যাপ্টেন ওটার মধ্যে ঢুকব আমরা।

—না দরকার নেই। বলল রাণা।—অন্ধকারে ভিতরে পথ হারাতে পারি।

—কোন ভয় নেই। হেসে বলল শান্তা—শকুন্তলা আর রুক্মিনী ওর ভিতরেই আছে।

—সে কি? ব্যস্ত হল রানা।—কেন ওরা না জিজ্ঞাসা করে গেল ওর মধ্যে? কাজটা ভাল হয় নি।

আর দাঁড়ালো না ও। তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে ঢুকলো গুহার ভিতরে। দুপা এগোতেই সারা দিক যেন অন্ধকারে ছেয়ে গেল। দু'চার সেকেণ্ড থমকে দাড়াল ও। চোখে অন্ধকার সয়ে যেতেই আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। না ভিতরে যতটুকু অন্ধকার ভাবা গেছিল ততটা নয় ফাটলের মুখ দিয়ে যথেষ্ট আলো আসছে ভিতরটাকে সে আলোই আবছায়া করে তুলছে। স্পষ্ট বুঝতে পারলো সুরঙ্গটা যেন বড় হয়ে যাচ্ছে। দুপাশের দেওয়াল গুলো সরতে সরতে হঠাৎ আবার একটা বড় ঘরের মতন জায়গায় এসে হাজির হল ওরা। ঘরেরই কোথায় যেন দাঁড়িয়ে ছিল রুক্মিনী আর শকুন্তলা। ওদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে এগিয়ে এল সামনে।

—এসেছো ক্যাপ্টেন? দেখবে এসো আমরা কি আবিষ্কার করেছি। এসো এদিকে। বলল শকুন্তলা।

সেকথার কোন জবাব না দিয়ে চাপা গলায় ধমকে উঠল রাণা।—এমন করে এ গুহার ভিতরে তোমরা ঢুকেছ যে? জানো এতে বিপদ হতে পারতো। খুব অন্যায় করেছো তোমরা।

—সকাল বেলা হঠাৎ এ সুরঙ্গটা আমার নজরে পড়েছে। বলল শকুন্তলা।—তোমরা সবাই তখন ঘুমাচ্ছিলে। রুক্মিনী উঠতে ওকেও বললাম। শান্তাও শুনলো তখন। আমরা ঠিক করলাম দেখব ভিতরে কি কি আছে।—ঢোকার পথ গোলমেলে হলে আমরা ঢুকতাম না ক্যাপ্টেন।

—বেশ। এখন কি আবিষ্কার করেছ দেখি?—বলল রাণা

—এদিকে এসো। বলে একটা উঁচু পাথরের আড়ালের দিকটা দেখলাম শকুন্তলা

সেখানে গিয়ে সত্যি ভীষণ অবাক হল রানা। উঁচু পাথর আর দেওয়ালের মাঝখানে থাকে থাকে সাজানো রয়েছে মানুষের প্রয়োজনে লাগে এমন সব নানান জিনিস এমন কি সে সব জিনিসের মধ্যে প্লেন থেকে ফেলা গত কালের বহু জিনিসও রয়েছে।

—গুলি বারুদ বন্দুক আছে? ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল রাণা।

—না আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি ওসব কিছু নেই। আছে জামা কাপড়। আগুন জ্বালাবার জিনিস, কিছু ওষুধ পত্র আর বাসন কোসন। বহু জিনিস ব্যবহার না করার জন্য খারাপ হতে বসেছে। বলল রুক্মিনী।

—এটা তাহলে গ্রাটেনকোর গোপন ভাণ্ডার। বছরের পর বছর ওযে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় তা স্রধু এরই ভরসায়।

—তাই মনে হয় ক্যাপ্টেন। বলল শকুন্তলা

—কিন্তু বন্দুক গুলি বারুদ সে সব ও রাখে কোথায়!

—আমি আর রুক্মিনী এতক্ষন সমস্ত গুহাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। এছাড়া আর কোন জিনিস নেই এ গুহায়।

—হতে পারে হয়ত সে সব ও লুকিয়ে রেখেছে অন্য কোন খানে।

—এত জিনিস ও পেল কেথা থেকে? অবাক শান্তা জিজ্ঞাসা করল।

ওর প্রশ্ন শুনে হাসল রাণা। বলল।—এতো অতি সহজ কথা। আস পাশের গ্রামে গিয়ে লুটতরাজ করে এসব ও যোগাড় করেছে।

ক্যাপ্টেনের এ উত্তর শুনে মনে মনে সবাই শিউরে উঠল।

—চল আমরা সবাই ওখান থেকে ফিরি। ওর এসব জিনিষ আমরা কেউ ছোঁব না। কারও আর কিন্তু এখানে আসা হবে না। মনে থাকে যেন। গম্ভীর ভাবে বলল রাণা।

—আরও একটা জিনিস দেখাবার আছে।—হঠাৎ শকুন্তলার গলা যেন কেমন ভারী হয়ে উঠল।

—কি জিনিস দেখি?

সামনে রাখা একটা ছোট কাঠের বাক্সের ঢাকনা তুলে ধরল শকুন্তলা। একটু ঝুঁকে পড়ে দেখল রাণা তার ভিতরে খুব যত্ন করে গুছিয়ে রাখা আছে একটা ছোট্ট মেয়ের পরনের পোশাক। অতি সাধারণ কম দামী পোশাক। বহু পুরনো।

—আচ্ছা বন্ধ কর বাক্স। দু সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল রাণা।—দেখো তোমরা—কেউ যেন এখানে না আসে। না হাত দেয় ওর এই বাক্সে। এটার জন্য ও যা খুশি তাই করতে পারে।

অবাক শান্তা জিজ্ঞাসা করল—এ জামা কার ক্যাপ্টেন?

—ওর মেয়ের।—বলল রাণা। চল আমরা সবাই বাইরে যাই। সবার আগে শান্তা তার পিছনে ওরা এক এক করে বার হয়ে এলো সুরঙ্গ দিয়ে। এত বড় আবিষ্কারেও ওদের কোন লাভ হবে না। অন্যের জিনিষ ওরা ছোঁবে কেন!

ক্রমশঃ

কিমাশ্চর্য

মুক্তা মুখোপাধ্যায় গ্রাঃ সংখ্যা ৭৮৬—বয়স ১৪

লোহিত কণিকার ব্যাস '০০৭ মিমি, ও পুরু '০০২ মিমি। সুস্থ মানুষের দেহে থাকে ১৫,০০০,০০০,০০০,০০০ প্রায়। একটার পর একটা মালার মত সাজালে কণিকার দৈর্ঘ্য দিয়ে পৃথিবীকে আড়াই বার বেড় দেওয়া যেতে পারে।

(২) একজন মানুষের ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত যত জল ও খাদ্য সে উদরস্থ করেছে, ততখানি খাদ্য বস্তু নিয়ে যেতে গোটা কুড়ি ট্রাক লেগে যাবে।

(৩) ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রমণ্ডলীতে একটি তারা আছে যার ওজন সূর্যের ২'৮ গুণ। কিন্তু ব্যাসার্ধ পৃথিবীর অর্ধেক পৃথিবীর ১ গ্রাম জলের ওজন ওই তারার ৪ টন। এটা এমন পদার্থ দিয়ে তৈরী যার এতক্ষণ সেঃ মি ওজন ১৩৩২০০০০০০০০০০ গ্রাম!

সাহায্য—জ্ঞান বিজ্ঞান মার্চ সংখ্যা—সংখ্যাদৈত্য প্রবন্ধ বিদ্যুৎকুমার নিয়োগী।

ক্ষুদে গল্প

বন্দন হালদার। ১৭০৬। বয়স—১৬

শোনা যায় স্কচম্যানরা নাকি বড় কিপ্টে হয়।

কোনো এক স্কচম্যান ছুটিতে বাইরে বেড়াতে যাবে ঠিক করেছে। একজন ট্যাক্সিওলাকে সে জিজ্ঞাসা করল।

"আমাকে স্টেশনে পৌছে দিতে তুমি কত নেবে?"

"মাত্র তিন শিলিং স্যার।" ড্রাইভার বললে। স্কচম্যান আবার বলল, "আমার মালপত্র আছে" সঙ্গে কিছু "মালপত্রের কোন ভাড়া লাগবে না" ড্রাইভার উত্তর দিল।

"তবে তুমি আমার মালপত্রগুলো স্টেশনে পৌছে দাও। আমি হেঁটেই যাব।"

গাছ
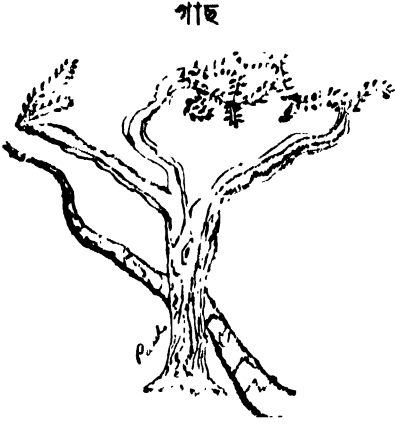
পলা সেনগুপ্ত

গ্রাঃ সং ২০৮৪—বয়স ১১ বছর

ইঁদুর

অনুরাধা সিংহ

গ্রাঃ সং ১৪৪৬—বয়স ১২ বছর

শীত

শুভ্রা বিশ্বাস

বয়স ১৪ বছর গ্রাঃ সং ২০২৯

শীত এলরে শীত এল
ওঠ্‌রে তোরা রাত পোহালো
বসতে দেরে পিঁড়ে
শালবনের ঐ ধারে ধারে
দোপাটিরা দুইছে ভারে
মৌমাছিদের ভিড়ে॥
ভিড় জমেছে খেঁজুর তলায়—
দল বেঁধে সব আগুন পোহায়
হিমেল হাওয়া ভাসে।

এদিক ওদিক ঐ অপরূপ
ঝরছে শিশির টুপ-টুপা-টুপ্
সবুজ ঘাসে ঘাসে॥
কড়াই শুঁটির ক্ষেতে ক্ষেতে
ঐ এলরে শীত যে মেতে
কুয়াসা দিল ঢেকে।
আয়রে শীত আয়রে আয়
সুদূর বনের হিমেল হাওয়ায়
ক্ষেতে আশীষ রেখে।

বুদ্ধ-পূর্ণিমা

অলকানন্দা চট্টোপাধ্যায়

বয়স—১৩½ বছর গ্রাহিকা সংখ্যা—১৪৫৮

নমি গো তোমায় হে বুদ্ধদেব প্রণমি বারংবার
ভারতের বুকে করিলে যে তুমি অহিংসা ধর্ম প্রচার
অজ্ঞ লোকেরে শিখালে যে তুমি "অহিংসা পরম ধর্ম",—
শান্তির নীতি দিয়ে যে সিদ্ধ হয় গো সকল কর্ম ॥
আজি এই শুভ জন্মদিনে তোমাকে আমরা স্মরি
অমর হইয়া রহিয়াছ কাছে, যাওনি কখনও মরি।

রেল চলে

অনিন্দ্য মিত্র

বয়স ১০ বছর গ্রাঃ সং ১৮৩৬

রেল চলে কুউ কুউ
রেল চলে ঝিক্,
রেল চলে ঘচা-ঘচ্
পৌঁছবে ঠিক ॥
মাঠের মধ্যে দিয়ে
চলে রেল গাড়ী।
যাত্রীরা ভাবে সব
যাব নিজ বাড়ি ॥
রেল চলে মাঠ দিয়ে
রেল চলে ঘাসে।
চাষীরা যে মেতে থাকে
নিজেদের চাষে ॥
মেঘেদের সাথে মেশে
কালো কালো ধোঁয়া
বহুদূর উড়ে যায়
নাহি যায় ছোঁওয়া ॥
ছোট ছোট গ্রামগুলি
গাছ দিয়ে ঢাকা।
সরু সরু পথ গুলি
চলে আঁকা-বাঁকা ॥
মাঝে মাঝে থামে গাড়ি
ইষ্টিশানে
আকাশেতে কাল মেঘ
বৃষ্টি আনে ॥

ধাঁধার উত্তর

(১)

দেবাশীষ রক্ষিত

গ্রাহক সং ১৭০৫—বয়স ১১ বছর ৫ মাস।

নিউটন

(২)

উত্তমকুমার বটব্যাল

গ্রাহক সং ১৪৮১—বয়স ১২ বছর।

সজারু

নতুন ধাঁধা

মিত্রা রায়চৌধুরী

গ্রাহক সং ১৪২৫—বয়স ১৩ বছর।

(ক)

এমন একটা মাছের নাম কর যার পেট কাটলে পাখি হয়, মাথা বাদ দিলে নিচে যায় আর ল্যাজ কাটলে শুয়ে পড়ে।

(খ)

এমন একজন বিখ্যাত লোকের নাম কর যার নামের প্রথম দুই অক্ষর এক তীর্থ স্থানের নাম, মাঝের দুই অক্ষর অবতার আর শেষ দুটি চাকর।

(গ)

এমন একটি তরকারি যার প্রথম দু অক্ষর গায় দেয় আর শেষ দুটি শস্য।

'ডিটেকটিভ'

ঝিনুক চৌধুরী

বয়স—১৩ গ্রাহক নং—২৮৬৩

অনেকেরই গোয়েন্দা বা ডিটেকটিভ হবার শখ থাকে—বিশেষ করে যারা গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে। এই রকম আমার একজন বন্ধুরও শখ ছিল। তার নাম নীলাঞ্জন, তাকে নীলু বলেই ডাকি। নীলু সর্বক্ষণই নিজেকে ডিটেকটিভ মনে করত। একটা কথা বলতে হবে যে ডিটেকটিভের যে গুণ থাকা দরকার নীলুর সত্যিই তার কিছু কিছু ছিল। তাই আমরা ওকে সহজে ফাঁকি দিতে কিংবা ঠকাতে পারতাম না। এই ঘটনাটা আমি ওর কাছ থেকেই শুনেছি।

একবার নীলুর মা বাবা একটা বিয়ে বাড়িতে গেলেন। তাঁরা ওকে ঘরের চাবি ইত্যাদি দিয়ে ওর ওপর ঘরের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। ওদের বাড়িটা ছিল দোতলা। নিচের তলায় নীলু, আমি আর আমাদের আরেকজন বন্ধু খেলছিলাম। নীলুর মা বাবা যখন গেলেন তখন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা বাজে।

রাত সাড়ে আটটা বাজতেই আমিও আমাদের অন্য বন্ধুটি বিদায় নিলাম। নীলু ওদের নিচের তলার ঘরগুলো গুছিয়ে যে বই বা 'ম্যাগাজিন'গুলো আমরা ঘেঁটেছিলাম সেগুলো সাজিয়ে ওপর তলায় গেল। ওপরে গিয়ে নীলু ওর ঘরের দরজা খুলতে যাবে এমন সময় শুনতে পেল কারা যেন ঘরের ভেতর চাপা গলায় কি বলাবলি করছে।

নীলু ছাড়া ওদের বাড়িতে আর কেউ ছিল না। নিশ্চয়ই চোর! ঐ ঘরে অনেক মূল্যবান জিনিস পত্র ছিল। নীলু পকেট থেকে ঘরের চাবিটা বার করে দরজায় চাবি দিয়ে দিল। চোরদের পালাবার আর কোনো পথ রইল না। দেয়াল ঘড়িতে নীলু দেখল ন'টা বেজে দশ মিনিট। টেলিফোন তুলে পুলিসকে খবর দেবার মিনিট দশেক পর পুলিস ও নীলুর মা বাবা একসঙ্গে উপস্থিত হলেন।

তাঁদেরকে সব বুঝিয়ে বলার পর নীলু চাবি খুলে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে রইল দু'জন সার্জেন্ট ও

চারজন পুলিস। কিন্তু আশ্চর্যের কথা কাউকেই ঘরে দেখা গেল না। পুলিস সার্জেন্টদের মধ্যে একজন খাটের ওপর একটা চালু অবস্থায় 'ট্রানজিস্টার' পেলেন। নীলুর হঠাৎ মনে পড়ল ওতো নিচে যাবার সময় ভুল করে ওটা চালিয়েই রেখে গেছিল।

তখন বোঝা গেল নীলু যে 'চাপা গলার আওয়াজ' পেয়েছিল তা 'ট্রানজিস্টার'এর থেকেই এসেছিল। সব বুঝে নীলু খুব লজ্জিত হ'ল। ওর মা বাবা সার্জেন্টদের বললেন যে তাঁরা যেন কিছু না মনে করেন। তাঁরা কিন্তু হাসিমুখেই নীলুর অসীম সাহসের প্রশংসা করলেন। তবু এই ঘটনায় নীলু এমন লজ্জিত হয়েছিল যে এরপর আর কখনো ওর 'ডিটেকটিভ' হবার বাসনা প্রকাশ করতে শোনা যায় নি।

তিলাইয়া ভ্রমণ

শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী

গ্রাহক নং—২০১৯ বয়স—৯½

১৯৬৮ সালের পুজোর ছুটিতে আমরা তিলাইয়া গিয়েছিলাম। যাবার কিছুদিন আগে বাবা আমাদের ডেকে বললেন "আমরা এইবার তিলাইয়া যাব"। তখন আমাদের আনন্দ আর দেখে কে টিকিট কাটার দিন থেকেই আমাদের খুব মজা লাগছিল। ভাবছিলাম কবে বুধবার আসবে? শেষে একদিন বুধবার এসে পড়ল, আমরা খেয়ে দেয়ে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ে বসলাম। (আমরা বলতে ছিলাম বাবা, আমি, মা, বোন, পিসি পিসেমশাই, পিসতুতো দাদা, কাকা কাকীমা ও ছোট ভাই বাবুয়া।) যাই হোক আমরা হাওড়া স্টেশনে এলাম, সেখান থেকে ট্রেন চড়ে চললাম তিলাইয়া। পিছনে পড়ে রইল বরানগর রোড, দমদম, বর্ধমান, বরাকর প্রভৃতি স্টেশন। আমরা সঙ্গে যে লুচি তরকারী এনেছিলাম তাই দিয়েই ভোজনপর্ব সারলাম। কোনও একটি বড় স্টেশনে কাটলেট কিনে খেলাম। সবুজ কলার বন, সারি সারি নারকোল গাছ, কুলুকুলু শব্দে ছোট ছোট নদী ও ছোট ছোট গ্রামের দৃশ্য আমাদের মুগ্ধ করেছিল। আমরা যখন বাঙলা দেশ ছাড়িয়ে বিহারে এলাম তখন সেখানে আর সবুজ বনানী নেই, সেখানে শুধু রাঙা মাটি। ক্রমে রাত্রি ৭টার সময় আমরা কোডার্মা স্টেশনে এলাম, সেখানে শুধু চারিদিকে কাঁচের মতন অভ্র। জ্যাঠা ছিলেন তিলাইয়ার বড় ডাক্তার তাঁর জীপ আমাদের নিতে এসেছিল। জীপে করে আমরা যখন যাচ্ছিলাম তখন দুধারে বন ও ঘুট্‌ঘুট অন্ধকার হেড্‌লাইটের আলো ছাড়া আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল না। এই বড় রাস্তার দুধারে শহরের মতো বিজলী বাতি নেই। ক্রমে রাত্রি নটার সময় আমরা রেস্ট হাউসে এসে পৌঁছুলাম, সবাই ক্লান্ত বলে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম, পরদিন সকালবেলা আমরা পাহাড়ের উপরে উঠলাম, দামোদর নদীর সেকি স্রোত। কি অপূর্ব তার দৃশ্য! এই দামোদর নদী বিদ্যাসাগর এক দুর্যোগের রাত্রে পার হয়েছিলেন! তারপর বাড়িতে এসে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে "ডিয়ার পার্কে" গেলাম, সেখানে ডিয়ার থাকে বলে সেইজন্য এই নাম। আমাদের বাড়ির সামনে একটি লন ছিল, সেখানে একটি ফোয়ারা ও অনেক ব্যাঙ ও শালুক ফুল ছিল।

সেদিন ছিল ষষ্ঠী, সেদিন দুপুরবেলা হাজারিবাগে গিয়েছিলাম, যাবার পথে রামগড়ের মহারাজার বাড়ি দেখেছিলাম, সেকি লম্বা প্রাচীর যেন আর শেষ হতে চায় না। তারপর আমরা ক্যানারি হিলসএ গেলাম, সেখানে অনেক ফুল আছে এবং অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছিল, সেখানে আমরা অনেক ছবি তুলেছিলাম পরদিন আমরা পিক্‌নিক্ স্পটে গেলাম, সেখানে অনেক হরিণ ও সুন্দর ফুল আছে, একটি হ্রদও আছে, সেখানে আমরা অনেক ঝিনুক তুলেছিলাম ও দোলনায় দুলেছিলাম বিকেল-বেলা ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম, সেখানে প্রসাদ নিয়েছিলাম। তারপর তিলাইয়ার সৈনিকদের ক্যাম্প দেখে বাড়ী ফিরলাম, অষ্টমীর দিন সমস্ত গোছগাছ করে নবমীর দিন বিকেলবেলা কলকাতায় রওনা দিলাম, তখন খুব মন খারাপ লাগছিল, আবার আমরা যখন কলকাতায় ফিরে এলাম তখন দুর্গাপুজার ঢাকের বাদ্যি বাজছে। তিলাইয়ার এই ভ্রমণ কাহিনী আমার মনে এখনও জ্বলজ্বল করছে।

* তিলাইয়া বাঁধটা দেখ নি ?

রাজছত্র

মেঘমল্লার গুহ মজুমদার

গ্রাহক নং—৯০ বয়স—১৫

রাজামশাইএর একদিন ভীষণ জলতেষ্টা পেল। আর ভয়ানক তেষ্টায় তাঁর ছাতিটা গেল ফেটে।

রাজামশাই মনের দুঃখে ঘুরতে ঘুরতে এসে একটা ইটের পাঁজার ওপর বসলেন। সামনে দিয়ে যাচ্ছিল একটা বাদামওয়ালা, তাকে ডেকে একঠোঙা বাদাম কিনলেন, তারপর খেতে আরম্ভ করলেন।

হঠাৎ তাঁর কানে এল একটা ব্যাঁও ব্যাঁও আওয়াজ, তিনি রেগে উঠলেন, বললেন—'এই কেরে ওরকম আওয়াজ করছিস'।

উত্তর এল 'আমি 'ব্যাঙ, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে বলে তালপুকুরে বসে তানপুরা বাজাচ্ছি। রাজামশাই এই কথায় বাদামওয়ালার কাছ থেকে এক ঠোঙা বাদাম কিনে ব্যাঙকে খেতে দিলেন। ব্যাঙ তো খিদে মুখে তাড়াতাড়ি সেগুলো শেষ করে ফেলল। তারপর এক গেলাস জল খেয়ে তুলল এক ম···স্ত ঢেকুর।

তারপর এসে আহ্লাদে গলায় রাজামশাইকে জিজ্ঞেস করল 'আচ্ছা রাজামশাই আপনি এমন অসময় এখানে বসে কেন'। রাজামশাই বললেন 'আমার দুঃখের কথা আর বল না, তেষ্টায় আমার ছাতিটা ফেটে যাচ্ছে, তাই মনের দুঃখে এখানে বসে আছি'।

ব্যাঙ তখন বললে 'এই কথা, চলুন আমার সঙ্গে আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি'।

এই বলে ব্যাঙ রাজামশাইকে নিয়ে একটা এক চাকার কোণা ভাঙা রিক্সায় চড়ে খুট খুট করে তেপান্তরের মাঠের দিকে চলল।

খানিক পরে রিক্সা এসে পৌঁছল তেপান্তরের মাঠের মাঝে ছাতার কারখানায়। সেখানে ঘর ঘট্টাং ঘরঘট্টাং করে মেশিন চালিয়ে ব্যাঙেরা ছাতা তৈরি করছে।

ব্যাঙ সেখানে নেমে গুদামবাবুকে বলল 'গুদামবাবু, রাজামশাইকে একটা মস্ত ছাতা দিন। গুদামবাবু অনেকগুলো ছাতা এনে হাজির করলেন রাজামশাইএর সামনে। রাজামশাই একটা বড় লাল ছাতা পছন্দ করলেন। তারপর ব্যাঙকে নিয়ে একটা বেবি ট্যাক্সি করে এসে উঠলেন রাজবাড়িতে। তারপর খাজাঞ্চিকে বললেন 'খাজাঞ্চি ব্যাঙকে সব টাকা দিয়ে দাও।' খাজাঞ্চি ব্যাঙকে সব টাকা দিয়ে দিল। ব্যাঙ নাচতে নাচতে তালপুকুরে ফিরে গেল। আমার গল্পটাও শেষ হল।

মাদ্রাজ ভ্রমণ

শ্রীমতী গুপ্ত

গ্রাহক নং—৬৪৩ বয়স—১১ বছর

১৯৬৮ সাল ১৯শে ডিসেম্বর আমি, আমার ঠাকুমা ও আমার একজন দাদার সঙ্গে মাদ্রাজ মেলে রওনা হলাম, ট্রেনে ২ দিনের পথ, আনন্দে সময়টা যেন নিমেষের মধ্যে কেটে গেল। ২১শে ডিসেম্বর ভোরবেলা মাদ্রাজে গিয়ে পৌঁছুলাম, স্টেশনে আমার কাকা গাড়ি নিয়ে নিতে এসেছিলেন, আমরা কাকার বাড়িতে গেলাম কাকীমা আমাদের পেয়ে খুব খুসি হলেন। আমরা কাকিমার সঙ্গে বাড়ি ঘর সব দেখে জল খাবার খেলাম। আমরা রোজ রোজ শহরে ঘুরে ঘুরে কাকিমার সঙ্গে বেড়াতাম। এ দোকান ও দোকান দেখে বেড়াতাম খুব সুন্দর শহর, খুব পরিষ্কার। বাড়িতে আমি, ঠাকুমা ও কাকিমা খুব তাস খেলতাম।

আমার বাবা ও মা কাজের জন্য আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন নি। তাঁরা ১৯৬৯ সালে ১০ই জানুয়ারি হাজারিবাগ থেকে মটরে রওনা হয়ে, ১৩ই জানুয়ারি দুপুর বেলা মাদ্রাজ এসে পৌঁছলেন, সেইদিন বিকেল বেলা আমরা সকলে উডল্যাণ্ড হোটেলে খেলাম, তারপর মেরিনা বিচ দেখে এলাম। খুব ভাল লাগল আমি এর আগে কখনও সমুদ্র দেখিনি।

তার পরদিন আমরা মাদ্রাজে আবাডি বলে একটা জায়গায় গেলাম। সেদিকে যত কারখানা সেই সব কারখানা দেখে এলাম। কারখানার ভেতরে ঢুকতে দেয় না। বাইরে থেকে সব দেখলাম। খুব সুন্দর সুন্দর বাড়ি দেখে এলাম। ২১ তারিখে মা বাবা ও আমি মাইশোর, ব্যাঙ্গালোর, ও উটি বেড়াতে গেলাম মটরে। ব্যাঙ্গালোরে হাইগেট হোটেলে ছিলাম, মাইশোরে রাজার গেস্ট হাউসে ছিলাম উটিতেও রাজার গেস্ট হাউসে ছিলাম। ওখানেও খুব সুন্দর সব দেখলাম, মাইশোরে বৃন্দাবন গার্ডেন অতি চমৎকার সব দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল।

আমরা ওই সব দেখে ২৮ তারিখে মাদ্রাজ ফিরে এলাম। সেদিন আমায় কাকিমার বাড়িতে ছোট ভাইয়ের ষষ্ঠীপুজা ছিল। আমরা তাই নিয়ে খুব আনন্দ করলাম।

তারপর আবার আমরা ঠাকুমাকে নিয়ে ২রা জানুয়ারি মটরে রওনা হলাম ত্রিচি, মাদুরাই, ও ও রামেশ্বর দেখার জন্য। ওই দিন রাত্রে মাদুরাই হোটেলে ছিলাম, মাদুরাইতে মীনাক্ষী মন্দির অতি

চমৎকার। ৯টা চূড়া আছে মন্দিরে। ১০৯ ফিট উচু। এত চমৎকার দেখতে। কত যে ঠাকুরের মূর্তি চূড়ার ওপর বলা যায় না।

পরদিন ভোর বেলা আমরা রামেশ্বর দেখার জন্য রওনা হলাম। আমরা মান্দাপামা ক্যাম্প অবধি মটরে গেলাম, ওখান থেকে ট্রেনে গেলাম, সমুদ্রের ওপর পম্বান চ্যানেল পার হয়ে ট্রেন যায়। বাসের সেতুর ওপর..দিয়ে রেলের ব্রীজটাকে (Adams Bridge) বলে। ওখানে গিয়ে আমরা রামেশ্বরের মন্দির দেখলাম।

ওখানকার সব মন্দির অতি চমৎকার, মন্দিরের সামনে একটা নন্দী বৃক্ষ আছে কি ভীষণ বড় সাদা পাথরের, কি চমৎকার দেখতে। মন্দির দেখে আমরা সমুদ্রের ধারে অনেকক্ষণ বসে, ফের মাদুরাই এলাম। মাদুরাইতে সে রাতটা থেকে, আবার ভোরবেলা রওনা হলাম। আমরা ত্রিচিতে এলাম। ত্রিচিতে রক টেম্পল দেখলাম ৪৭০টা সিঁড়ি আছে। আমরা সবাই পুরোটা উঠলাম। পাহাড়ের মধ্যে কি সুন্দর মন্দির, ঠাকুরও খুব সুন্দর। সবচেয়ে উপরে গণেশের মন্দির। উপর থেকে ত্রিচি শহর দেখা যায়।

ওই দিন রাত ১০টায় আমরা মাদ্রাজ ফিরে এলাম। কদিন মাদ্রাজে থেকে, ঠাকুরমাকে কাকার কাছে রেখে আমরা আবার ১০ই ফেব্রুয়ারি মটরে হাজারিবাগ আসার জন্য রওনা হলাম।

প্রথম দিন আমরা রাত্রে বিজয়বাড়াতে হোটেলে ছিলাম। তার দিন ১১ই জানুয়ারি আমরা ওয়ালটেয়ারে হোটেলে ছিলাম। ১২ই আমরা গোপালপুরে, আমরা পান্থানব্রীজ হোটেলে ছিলাম। গোপালপুরে আমরা খুব সমুদ্রে চান করলাম, খুব আনন্দ লাগল চান করে। ১৩ই তারিখে আমরা ভুবনেশ্বরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলাম। ওখানের মন্দিরে দেখলাম মহাদেব আছেন। ১৪ তারিখ রাত্রি ১টায় আমরা হাজারিবাগের বাড়িতে এসে পৌঁলাম। আমি ১ মাস বেড়িয়ে ঘুরে খুব আনন্দ করে এলাম, এর আগে আমি এত দূরে কখনও বেড়াতে যাই নি।

আজব ভূত

অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

গ্রা: সং ১১২৬—বয়স ১০ বছর

আমার মাসীর কাছে শোনা জ্যান্ত ভূতের গল্প বলছি। মাসী তখন দ্বারভাঙ্গার মেডিকেল কলেজে পড়েন!

......ঢং ঢং করে ঘড়িতে রাত্রি এগারো বাজলো ; তবুও একটানা পড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে হোস্টেলের সব ঘর থেকে। সামনে পরীক্ষা।

কোণের একটি ঘরে একটি ছেলে পড়ে চলেছে। গতবার ভাল পড়া হয়নি তাই মন দিয়ে পড়ে চলেছে। অন্ধকার রাত টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। টেবিলের ওপর আছে একটা ল্যাম্প ; আলোটা যত খাতা ও বই-এর ওপর পড়ছে। আলোটার পাশে রয়েছে একটা মাথার খুলি।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ খুলিটা কেমন নড়ে উঠল। ছেলেটি ভাবল, 'ও কিছু না'! সে নিজের কাজে মন দিল। আবার নড়ল, তার কেমন সন্দেহ হল ও মনে মনে একটু ভয়ও পেল। খুলিটা আরেকবার যেই না নড়েছে, অমনি সে চিৎকার করে উঠল, 'ওরে—বাবারে—এ—যে—ভূত!'

ওর চীৎকার শুনে অন্য ছেলেরা ছুটে এল ওর ঘরে। সব কথা শুনে ওরা বলল, 'যত্ত সব গাঁজাখুরি। আর কারুর কাছে এলনা, তোর কাছেই ভূত এল!'

কিন্তু হোটেলের পুরনো দারোয়ান বলে উঠল, 'এ বাত তো ঠিকই ছে। ইমহর বহুত ভূত ছে।'

একটি ছেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। সে আস্তে আস্তে দারোয়ানের হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে দিল এক বাড়ি খুলিটার ওপর। গেল ওটা উলটে। অমনি তার তলা থেকে ছুটো ইঁদুর তিড়িং করে লাফ দিয়ে পালাল!!

আমার ছোট্ট ভ্রমণ

(ভ্রমণ কাহিনী)

শুভা মজুমদার

গ্রাহক নং—২২১৫ বয়স—১০ বৎসর ৮ মাস

হঠাৎ আমাদের ঠিক হইল যে আমরা বড়দিনের ছুটিতে চিতোর দুর্গ দেখিতে যাইব। ডিসেম্বর মাস। রওনা হইবার দিন খুব মেঘলা ছিল। বিকেলবেলার দিকে প্রচণ্ড বারিপাত শুরু হইল। দিল্লীর প্রচণ্ড শীত তার উপর বৃষ্টি। আমরা ভাবিলাম বুঝি আমাদের যাওয়া বন্ধ হইবে। কিন্তু আমি জেদ ধরিলাম ও অগত্যা বাবাকে যাইতে হইল। স্টেশনে গিয়া শুনিলাম যে বৃষ্টির জন্য ট্রেন একঘণ্টা দেরী করিয়া ছাড়িবে। ক্রমেই আমি অধৈর্য হইতে লাগিলাম। শেষে গাড়ি আসিলে আনন্দিত মনে গাড়িতে উঠিলাম। চলিতে চলিতে ভাবছিলাম যে আজ মনের আকাঙ্খা পূর্ণ করিতে যাইতেছি। পথে জয়পুর প্রভৃতি অনেক স্টেশন পড়িল।

শেষে আমরা আজমীরে আসিয়া পৌঁছিলাম। দেরিতে পৌঁছানের জন্য চিতোরের ট্রেন পাইলাম না। খবর লইয়া জানা গেল এর পর চিতোরের গাড়ী রাত্রে পাওয়া যাইবে। ফলে সারাদিন আজমীরে কাটান যাইবে, ভালই হইল। সঙ্গের মালপত্রগুলি 'লেফ্‌ট্ লগেজ' করিয়া, প্রাতঃরাশ সারিয়া, একটি টাঙ্গা লইয়া বাহির হইলাম। প্রথমে আমরা গেলাম আনাসাগর লেকে। পৃথ্বিরাজের রাজত্বকালে এইখানে বহু রক্তপাত হইয়াছিল বলিয়া রাজপুত আমলে এই হ্রদ প্রথম খনন করা হয়। পরে জাহাঙ্গীর এখানে একটি সুন্দর বাগান তৈরি করেন। শাহজাহান অনেক ছোট ছোট শ্বেতপাথরের ছত্রি নির্মান করিয়া এই জায়গাটিকে অতি মনোরম করিয়া তোলেন। পাহাড় এই হ্রদটিকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে বলিয়া এই জায়গাটির দৃশ্য অতি সুন্দর। ইহার পর আমরা স্বর্ণ মন্দিরে গেলাম। এটি একটি জৈন মন্দির। মন্দিরটি বেশ সুন্দরভাবে সাজানো। দেয়াল হইতে সুতা দিয়া ঝুলান একটি কাঁচের বাক্সে একটি নকল স্বর্গরাজ্য আছে।

ইহার পর আমরা আড়াই দিনেশে ঝোপরাত্রে গেলাম। মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণ কালে মাত্র আড়াই দিনের মধ্যে এই মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। এর পর আমরা গেলাম খাজা মৈমুদ্দিন চিস্তির কবর দেখিতে। প্রত্যহ এখানে বহু গরীব দুঃখীকে খাওয়ানো হয়। কার্ত্তিক মাসে এখানে উৎসব হয়।

সেই রাত্রেই আমরা চিতোর যাত্রা করিলাম ও রাত্রের মধ্যেই পৌঁছিলাম। রাত্রিটা আমরা রিটায়ারিং রুমে থাকিলাম। সকালবেলা স্নান প্রাতরাশ সারিয়া একটি টঙ্গা লইয়া চিতোর গড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

একটি পাহাড়ের উপর চিতোর দুর্গ। একএকটি করিয়া সাতটি ফটক পার হইয়া আমরা চিতোরের ধ্বংস স্তূপে পৌঁছিলাম। তখন একটি নির্দেশক আমাদের ভিতরে লইয়া গেলেন ও সব বুঝাইয়া দিলেন ভিতরে পদ্মিনী মহল, মীরাবাঈরে মন্দির, বিজয় স্তম্ভ, জৈন মন্দির, রাণাকুম্ভের মহল, গোমুখকুণ্ড ও পদ্মিনীকে যে ঘরে আয়না দিয়া আলাউদ্দিন দেখিয়াছিলেন সেই ঘরটি ইত্যাদি সব দেখিলাম যেখানে রমণীরা জহরব্রত করিয়াছিলেন, সেই জায়গাটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে পদ্মিনীর ও বারো হাজার রমণীর আজও আছে বলা হয়। ফিরিবার পথে যেখানে আকবরের গুলিতে চৈত্ত মারা যান ও যেখানে আলাউদ্দিন তাঁবু গাড়িয়া ছিলেন, সেই জায়গাগুলি দেখিলাম।

সারাদিন চিতোরে কাটাইয়া রাত্রে ফিরিবার ট্রেন ধরিলাম। কিন্তু সে রাত্রে ঘুমাই নাই। চোখ বন্ধ করিয়া ভাবিতেছিলাম সেই সব অতীতের কথা যা রাজকাহিনীতে পড়িয়াছি।

(উত্তর দেবার শেষ দিন ২৮শে ফেব্রুয়ারি)

(১)

অম্বরনাথ বাবুর বাড়ি চারটি কারিগর কাজ করতে এসেছে, তাদের নাম বলল পীতাম্বর, শ্বেতাম্বর, নীলাম্বর ও দিগম্বর। তারা কামার-ছুতোর রাজমিস্ত্রি ও রং-মিস্ত্রি, কিন্তু কোন জনের যে কি নাম তা তারা বলল না।

কথায় কথায় অম্বরবাবু জানতে পারলেন যে :—

(ক) শ্বেতাম্বর ও পীতাম্বর ফরসা হলেও দেখতে ভাল না।

(খ) কামারের হাতুড়িটা এমন ভারি যে নীলাম্বর ও পীতাম্বর দুজনে মিলেও সেটা বেশিদূর তুলতে পারে না।

(গ) রাজমিস্ত্রি আর রংমিস্ত্রি সমান রোজকার করে কিন্তু শ্বেতাম্বরের উপার্জন তাদের চেয়ে একটু কম।

(ঘ) রাজমিস্ত্রির পাকা চুলদাড়ি, কষ্টিপাথরের মত কালো রঙ, কিন্তু দেখতে সে সবচেয়ে সুপুরুষ।

(ঙ) কামারের গায়ের জোর সবচেয়ে বেশি কিন্তু শ্বেতাম্বরকে সে পাঞ্জার জোরে হারাতে পারে না।

বল দেখি কার কি নাম ?

(২)

একটা শব্দের বদলে তার প্রতিশব্দ বসালে অনেক সময়ে অদ্ভুত ব্যাপার হয়, শব্দাংশের প্রতিশব্দ বসালে ত কথাই নেই, তখন বনভোজন হয়ে পড়ে জঙ্গলাহার! এইভাবে প্রতিশব্দ বসিয়ে নিচের লেখাটার অর্থ বার করতে পার কি ?

কুঠার পুস্তক-সময়ে আকাশ-শ্রেষ্ঠ অশীতি-ল সর্প মস্ত-শতের দোহন-কর-কর্ণে নবীন সাল মুল্লুক অশীতি-বিদ্যমান। সং-ছাড়া পদই-মহিলা-ত্র আম্র-ই দোহন-কর-কর্ণে গোধূম-ন হস্তি-য়া দে-অর্গল-রসাল-কনিষ্ঠ-প্রকাণ্ড শিব-ইহা-ক প্রকাশিত-ই তা-পরাজয় তস-মহাযোদ্ধা মূল্য-সাল গজ-তেছে।

(৩)

(প্রত্যেক লাইনের দুটি শূন্যস্থানে এমন দুটি শব্দ বসাতে হবে যা পরস্পরের উল্টো, যেমন মাসী ও সীমা

(ক) —পরে থাকে বুড়ো—ব্যথা পাছে হয়।
(খ) ভেজা—কিনি যদি—হবে নিশ্চয়।
(গ) শিখি হেসে ডেকে—বলে—ধ্বনি করে,
(ঘ) হেন—যার, কেন—ডুবে নাহি মরে।
(চ) মামাবাড়ি ভারি—আম—খাই ঢের।
(ছ) হাল—কিবা হাল হবে বল—কের!
(জ) —ফল বেচে যদু, কিছু—পায় রোজ।
(ঝ) —ধন—যাতে পেট ভরে খাবে ভোজ!

পৌষ মাসের ধাঁধার উত্তর।

(১) (ক) কএর জায়গায় 'হ' আর 'ব' এর জায়গায় 'র' বসেছে।

(খ) আসল লাইনগুলি হল :—

হরিহর অহরহ হরষে হারা হয়ে হরিহরি গাহে। কে বলে কলিকালে কলিকাতায় কোলাকুলি কম চলে?

(২)
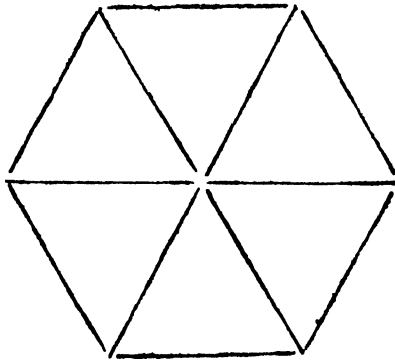
(৩) ১-২-৩-৪।

অগ্রহায়ণ মাসের উত্তর দাতাদের নাম :—

বিশেষ দ্রষ্টব্য—অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ধাঁধার উত্তর লিখতে অনেক গ্রাহকই ১২টা পাখির নাম বার করতে পারেনি। যারা অন্তত: ৮।১০টা বার করেছে তাদের উত্তর 'প্রায় ঠিক' ধরা হল।

তৃতীয় ধাঁধার উত্তরে বেশ কিছু সংখ্যক গ্রাহক লিখেছে—বসু মহাশয় সাহিত্যিক, তাঁর ছেলে চিকিৎসক, স্ত্রী চিত্রকর, বোন গাইয়ে ও শ্বশুর অধ্যাপক। এতেও দেওয়া সর্তগুলি রক্ষা হচ্ছে কিন্তু তবু এই উত্তরটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়।

একটি উত্তরদাতার ভাষায় বলি—'বসু মহাশয়ের ছেলেই যখন সুদক্ষ চিকিৎসক, তখন বসু মহাশয়ের শ্বশুরের নিশ্চয় অনেক বয়স হয়েছে। এত বয়স অবধি অধ্যাপনা করা কি সম্ভব? শ্বশুর নিশ্চয় সাহিত্যিক।'

আমরা বলব একেবারে অসম্ভব না হলেও এরকম ঘটবার সম্ভাবনা খুবই কম। সুতরাং এই উত্তরগুলিকে ঠিক না বলে 'প্রায় ঠিক ধরা হল।'

তিনটি উত্তর ঠিক :—

১৭৫ অনিতা রায়, ২২৬ জয়ন্ত ও প্রবালকুমার নন্দী রায়, ৮৮৯ প্রেমেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ৮৯৮ হিমাদ্রি ও দোলনচাঁপা চৌধুরী, ১৩৬১ অনন্যা সরকার, ১৪২৫ মিত্রা রায় চৌধুরী, ২০৯৩ দেবাশিস দত্ত, ২৫৪৪ সান্ত্বনা রায় চৌধুরী, ২৫৪৭ প্রসেনজিৎ ও মৈত্রেয়ী বসু, ২৬৫৩ অসিতনাথ ভট্টাচার্য, ২৬৭৬ শুদ্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, ২৭৪৯ কল্লোল রায়, ২৭৮৬ দীপঙ্কর রায়, ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত, ২৮৭৫ ডলি দাশগুপ্ত।

দুটো উত্তর ঠিক ও একটি প্রায় ঠিক :—

১ দীপংকর বসু, ৪৯ শর্মিষ্ঠা সেন, ৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ১১৫ অর্পিতা, কিশলয় ও কিশোর চক্রবর্তী, ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ২৫৪ জয়শ্রী রায়, ২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ২৯৫ শম্পা, শর্মিলা ও শ্রেয়া দত্ত, ৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ৩৬২ রাণা মজুমদার, ৩৭৯ অঞ্জনা সেন ও প্রজ্ঞা পারমিতা বসু, ৩৯৩ নন্দিতা, বন্দনা দেবাশীষ ও জ্যোতির্ময় বরাট, ৩৯৭ ভারতী বসু, ৬১৪ স্নেহাশীষ ও দেবাশীষ হালদার, ৬১৬ ভারতী মিত্র, ৮৯৪ তপন ঘোষ, ৯৬২ অঞ্জন ও কুমকুম ভট্টাচার্য, ১১২৬ অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী, ১২৩২ নন্দিনী দত্তমজুমদার, ১৩১০ আশীষ রহমান, ১৪০১ মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪৪৫ পার্থপ্রতিম গুপ্ত, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৪৮১ উত্তম কুমার বটব্যাল, ১৫৮৩ অঞ্জন চ্যাটার্জী, ১৬০৩ নিশীথরঞ্জন নীতীশরঞ্জন, সমীর গুহ, ১৬৫৫ শৃন্বন্তী পাল, ১৮৬৩ সোনালি লাহিড়ী, ১৮৯০ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ১৯৯৪ মালা রায়, ২০২৯ শুভ্রা বিশ্বাস, ২০৭২ মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১৪২ স্বর্ণাভ ব্যানার্জি, ২২০২ শুভাশীষ ধর, ২২১৫ শুভা মজুমদার, ২২২৪ শুভময় ও কল্যাণময় চট্টোপাধ্যায়, ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায়, ২২৮০ নন্দিতা চৌধুরী, ২৪৬৬ অর্ধেন্দু ও মমতা কর্মকার, ২৪৬৭ মহাশ্বেতা ও অমিতবিক্রম ঘোষ ২৪৭৬ শর্মিষ্ঠা সেন, ২৪৮৬ অভিজিৎ ও সরিৎ ভট্টাচার্য, ২৫২৯ দেবাশীষ দাস, ২৫৩৯ সুমিতা মিত্র, ২৫৫৪ দেবাশিষ ভট্টাচার্য, ২৫৯১ প্রবীর কুমার রায় চৌধুরী, ২৬১২ মিতালি সান্যাল, ২৬২৭ ইন্দিরা দাস, ২৬২৯ চৈতালি ও চিত্রাঙ্গদা বসু, ২৬৩০ সংযুক্তা বসু, ২৬৩১ সুতপা বিশ্বাস, ২৬৬৭ সোমা মিত্র, ২৭১৩ সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭৪৭ কেশব সেন, ২৮২৩ প্রসেনজিৎ কর ভৌমিক, ২৮৩৭ অর্পিতা রায়চৌধুরী, ২৯৬৩ মৌসুমী ও শ্রাবণী গিরি, তিনটী নম্বরহীন উত্তর, গ্রাহক কিনা বোঝা গেল না।

যাদের দুটো বা প্রায় দুটো উত্তর ঠিক :—

৯৮৩ ইন্দ্রাণী ও ঈশানী মজুমদার, ১২০৯ সুপর্ণ চৌধুরী, ১২৩৩ স্বাতী সিংহ, ১৪৪৬ অনুরাধা ও অভিজিৎ সিংহ, ১৭৯২ মলয়া ও মল্লিকা পাল, ১৮০৫ দেবাশীষ রক্ষিত, ২১৫৯ স্বাহা ও শুভঙ্কর বাগচী, ২১৭০ অম্লান ভট্টাচার্য, ২৩০৪ শুভব্রত মুখোপাধ্যায়, ২৩৯৩ মোহম্মদ আমীরুদ্দিন চৌধুরী, ২৭৪০ সোনালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৯৫০ অঞ্জন ঘোষ, ২৯৫৫ তাপস শূর রায়।

দুইজন নাম-নম্বর হীন গ্রাহক।

যদিও ১লা জানুয়ারি থেকে নতুন বছর গোনা আমাদের দেশের নিয়ম নয়, তবু নানান্ কারণে ঐ দিনটার একটা বিশেষত্ব আছে। এই সময়ই নতুন ক্যালেণ্ডার, নতুন ডায়রি দিয়ে আমরা নতুন বছর শুরু করি। তার উপর নতুন বই খাতা কিনে তোমরা নতুন ক্লাসে উঠে বস। তোমাদের সকলকে আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। ১লা জানুয়ারির ভারি একটা আনন্দের আব-হাওয়া, সেই আনন্দ ধরে রেখো।

কেউ কেউ কার্ড পাঠিয়েছ, কি সুন্দর সব হাতে আঁকা কার্ড। কত খুসি হয়েছি বলতে পারি না, কত গর্ব হয়েছে।

মিত্রা রায় চৌধুরী, তপনকুমার বসু, নীপা গোস্বামী, দোলনচাঁপা চৌধুরী, সুতপা বিশ্বাস যে কার্ড পাঠিয়েছ আর একটা মোমবাতি আঁকা নাম-না-লেখা চমৎকার কার্ড আমাদের ঘর আলো করে রেখেছে। এবার চিঠির উত্তর।

(১) সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ১৮৯৪, বয়স ১২½

নাঃ, সবটা তাহলে ভালো করে শোননি। ভূতদের রাজার বরের মধ্যে আরো ছিল :—

'যা—চাই পরতে খাইতে পারি,
যেখানে খুসি যাইতে পারি।'

শোন নি বুঝি?

পত্রবন্ধু চাই। শখ :—ছবি সংগ্রহ, গল্পের বই পড়া।

(২) গোপা পাল, ২৭৭৫,

রেগেমেগে বুঝি বয়সটাই দিতে ভুলে গেলে? লেখা ছবি ছাপাবার মতো হলেই তো আমরা ছাপি ভাই।

(৩) প্রদীপ কুমার হোর, ২৭৩৯, বয়স ১০

সে কি কথা! বিশেষ পুজা সংখ্যায় ছবিতে গল্প দেখ নি? আরো দেবার চেষ্টা করব। ভাইকে রাগতে মানা কর।

(৪) অলকানন্দা চট্টোপাধ্যায়, ১৪৫৮, বয়স ১৪

এতদিনে নভেম্বর সংখ্যা পেয়ে গেছ নিশ্চয় ? সত্যিই নানান্ কারণে পাঠাতে একটু দেরি হয়েছিল। কিন্তু তুমি তো আমাদের নিজেদের লোক, তাই নিশ্চয় চটে যাও নি ? কে বলেছে ধারাবাহিক গল্প আর লিখি না ? কেন, মাকুর পরেও গত বছর ধারাবাহিকভাবে 'নেপোর বই' বেরোয় নি বুঝি ? প্রফেসর শঙ্কু আর গোরিলার গল্প ভালো লাগে নি ? লেখা ভালো হলেই ছাপা হয় ভাই।

(৫) অমল বসু ২৯৪৫, বয়স ১২

গ্রাহক কার্ড পাঠিয়েছি, পেয়েছ আশাকরি। হাত পাকাবার আসরে নিশ্চয় গল্প পাঠিও। ভালো হলেই ছাপাব।

(৬) অর্ধেন্দু ও মমতা কর্মকার, ২৪৬৬, বয়স ১৬ ও ১১

ঐ দেখ বোনটিকেও নিয়ে নিলাম। কার্ড পেয়েছ তো ? চিঠি লিখো, যথাসাধ্য উত্তর দেব। তবে যাদের ১৭ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে, তাদের চিঠির উত্তর দেওয়া হয় না।

(৭) সায়ন্তন গুপ্ত, ২১৭৩, বয়স ১৪

তুমি যেমন বলেছ, সেইভাবেই গ্রাহক কার্ড পাঠিয়েছি, পেয়েছ নিশ্চয় ? লেখা ভালো হলেই ছাপাই। একটা না বেরুলে আরো ভালো করে আরো লিখে পাঠাবে। ম্যারাকট দ্বীপ সত্যি ভালো লেখা।

(৮) অমিত বাগচি, ২৬৭৪, বয়স ১৬

চিরকাল গ্রাহক থাকতে পার, তবে ১৭ পূর্ণ হলে আর প্রতিযোগিতা, চিঠিপত্র, হাতপাকাবার আসর ইত্যাদিতে যোগ দিতে পারবে না। স্কুল ও ভালো কলেজও ভালো। পত্রবন্ধু চাই। শখ— ডাক টিকিট, হস্তলিপি (অটোগ্রাফ) সংগ্রহ।

(৯) সুপর্ণ চৌধুরী ১২০৯, বয়স ১১

তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হয়েছিলাম। নিজে লেখো সে তো ভালো কথা। জেনে আরো খুসি হলাম। ছাপার ভুল-চুক মাঝে মাঝে হয়ে যায়, ভাই। ব্রাণ্টালুসির দুর্ঘটনার লেখকের নাম শিশির মজুমদার।

(১০) অর্পণ সেনগুপ্ত ২৭৯৯, বয়স ১৪

ভাই, ছোটদের জন্য কবিতা আরেকটু সহজ করে লেখ না কেন ? হতাশার চেয়ে উৎসাহের কবিতাই তাদের পক্ষে ভালো নয় কি।

(১১) শৃন্বন্তী পাল। ১৬৫৫, বয়স ১০

কার্ড পছন্দ হয়েছে তো ? শারদীয়া সংখ্যা ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম।

(১২) ২৫১৯ জুলু (সেন) নামের অর্ধেক, সংখ্যা কিছুই দাও নি কেন ?

(১৩) সুস্মিতা সেনগুপ্তা ? ১৩৭০, বয়স ১২

গুপী গাইন ভালো লেগেছে খুব ভালো কথা। হাত পাকাবার আসরের জন্য লেখা পাঠাও না কেন ?

(১৪) সুদীপ মৌলিক ২০৬৮, বয়স ১৪

ভাই, চাঁদা পাঠাবার সময় গ্রাহক সংখ্যা দাও নি। কাজেই আমাদের আপিস থেকে তোমাকে নতুন সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে এই নতুন সংখ্যাই ব্যবহার কর। লেখা পাঠিয়ে দেখই না

(১৫) সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়, ২৭৭০, বয়স দাও নি কেন ?

(১৭) শুভ্রা বিশ্বাস, ২০২৯, বয়স ১৪

তুমিও আমাদের সকলের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ কর।

অজয় হোম

ক্রিকেট

কলকাতায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ দেখলাম। টেস্ট খেলা দেখছি সেই জার্ডিনের দলের প্রথম সরকারী টেস্ট ম্যাচ থেকে। আমার একটা বদ অভ্যেস—যখন খেলা দেখি তখন প্রথম বল থেকে শেষ বল পর্যন্ত না দেখে মাঠ থেকে নড়ি না। ভালোমন্দ খেলা, ব্যবস্থাপনার ত্রুটি সবই দেখেছি। বরং বলব এবছর ব্যবস্থাপনায় গলদ ছোটোখাটো দু'একটা থাকলেও মোটামুটি বেশ ভালোই হয়েছিল। কিন্তু এমন মেরুদণ্ডহীন খেলা খুব কমই দেখেছি। বারে বারে মনে হয়েছে এই কি খেলা! এরাই তৃতীয় টেস্ট্ জিতে এল!

ছ'টি তরুণ প্রাণ চলে গেল ভীড়ের চাপে পদদলিত হয়ে তা মাঠে ঢুকে বুঝতে পারি নি। সবাই শান্ত। কর্তৃপক্ষও নীরব। তাদের আত্মার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে দু'মিনিট খেলা বন্ধ করে নীরব শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা উচিত ছিল। মারা যে গেছে তা জানলাম খেলার শেষে দশ উইকেটে হেরে যাবার পর।

তৃতীয় দিনে খেলার শেষে মাঠশুদ্ধ সকলেই বুঝেছিল ভারতের জেতার কোনো আশা নেই। অস্ট্রেলিয়ার শক্তিশালী সীমবোলিং এবং ভারতীয় খেলোয়াড়দের অফস্টাম্পের বাইরের বলে অহেতুক খোঁচা মারার অভ্যেসের জন্যে এই টেস্ট জেতা প্রথম ইনিংসেই অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে গেছে। আর

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি ভারতীয় খেলোয়াড়রা জোর শর্টপিচ বল হুক ও পুল মার মারতে ভুলে গেছে। সেই বলগুলো আটকেছে যেগুলো বাউণ্ডারি পার হবার কথা। এই ম্যাচের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বিশ্বনাথকেও দেখলাম তিনটে ফসকাতে। সে তবু চেষ্টা করেছে। অন্যরা শুধু ব্যাট দিয়ে ঠেকিয়েছে।

ভারতের জেতা সুদূর পরাহত হলেও খেলাটা অমীমাংসিতভাবে শেষ করার মনোবলটা অন্তত আশা করেছিলাম। কোথায় সে দৃঢ়তা? চারদিনে খেলা শেষ!

গত সংখ্যায় তোমাদের কাছে একটু ভুল বলেছি। রেডিওতে গত দুই টেস্টের রিলে শুনে বলেছিলাম অশোক মানকড়ের খেলার মধ্যে বিজয় মার্চেন্টের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। মানকড়ের খেলা দেখে বুঝলাম আমার উক্তি কি নিদারুণ ভ্রমাত্মক। মার্চেন্ট নির্ভুলভাবে সুইংবল খেলতেন। মানকড় কি করে সুইংবল খেলতে হয় তা জানেই না।

বিশ্বনাথ হাজারের ছায়া নয় হাজারের উত্তরসূরী। বহুদিন পর ভারতীয় একজনের খেলা দেখে মন ভরে গেল। কলকাতার মাঠে দু'দলের মধ্যে বিশ্বনাথের ব্যাটিং-ই শ্রেষ্ঠ হয়েছিল। এরকম ভালো স্কোয়ার ড্রাইভ দেখি নি বললেই চলে। ক্রিকেট খেলার যেসব গুণ থাকার দরকার তা বিশ্বনাথের আছে। এখন প্রয়োজন অভিজ্ঞতা। পঞ্চাশ থেকে ষাটের কোঠায় যেতে একটু নার্ভাস হয়। সে সময়ের খেলায় জুত করতে পারে না। সেটা প্রকট হয়েছে পঞ্চম টেস্ট্ মাদ্রাজে। কলকাতায় দ্বিতীয় ইনিংসে বিশ্বনাথ রান করতে না পারার জন্যে ভারতের অন্যান্য খেলোয়াড়রা খেলতেই পারল না। মনে হল নব খেলোয়াড়রা যেন বিশ্বনাথের মুখ চেয়েই ছিল। সে খেলতে পারলেই ভারতের মানমর্যাদা থাকবে। বিশ্বনাথ আউট হল যে বলে সে বলটা যে অত শেষে অমন সুইং করে ঠকবে তা সে আশা করেনি। ব্যাটটা ক্রস হয়ে গিয়েছিল।

অস্ট্রেলিয়ার ওয়ালটার্সের অনেক নাম শুনেছিলাম। ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হয়। আবার কিন্তু মনে হয়েছে ব্র্যাডম্যানের ছায়া কেন নখের যুগ্যিও তিনি নন। আমি অবশ্য বাড্‌ম্যানের খেলা দেখিনি, যা দেখেছি তা সিনেমায় এবং যাঁরা ব্র্যাডম্যানের খেলা চাক্ষুষ দেখেছেন তাঁদেরও এই মনোভাব।

স্ট্যাকপোলের খেলা আমার ভালো লেগেছে। শীহান বেশি রান না করতে পারলেও খেলার বাঁধুনি আছে। চ্যাপেলও অবস্থানুযায়ী খুবই ভালো খেলেছেন।

একথা জেনে রাখো প্রসন্ন ও বেদীর মতো স্পিন বোলার পৃথিবীর কোনও ক্রিকেট খেলার দেশে নেই। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা যেভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ে খেলেছে, যেভাবে পিচের মাথায় গিয়ে বল আটকেছে তা কল্পনাতীত। খেলা দেখতে দেখতে অনেকসময় অস্ট্রেলিয়ার খেলা দেখে হেসে ফেলেছি। অস্ট্রেলিয়ার নামী খেলোয়াড়দের খেলা বেশির ভাগ ডান-পা অর্থাৎ পিছনের পায়ে ভর দিয়েই জানতাম. এবার দেখলাম বাঁ-পা বাড়িয়ে ইংলিশ ক্রিকেট খেলতে।

পঞ্চম টেস্টও ভারত জেতা ম্যাচ হারল শোচনীয়ভাবে মাত্র ৭৭ রানে। জয়লাভ হাতের মুঠোয় এসে ফসকে গেল! অস্ট্রেলিয়ার ম্যালটের স্পিন বলে সকলে অযথা উইকেট হারাল। ইনজিনিয়ারের

দায়িত্বজ্ঞানহীন খেলা ভারতের হারার একটা কারণ। অধিনায়ক পতৌদিও তাঁর অধিনায়কোচিত খেলার কোনো চেষ্টাই করলেন না। মনে হল ভারতের সবাই যেন ফেস্টিভাল ক্রিকেট খেলছে, টেস্টম্যাচ নয়। ভারতের মানমর্যাদার কথা কেউ ভাবলই না। দ্বিতীয় ইনিংসে একমাত্র ওয়াদেকার এবং গুণ্ডাপা বিশ্বনাথই যা কিছু খেলার চেষ্টা করেছিল। তাঁদের বিদায় ৪ উইকেট ১১৯এর পর যে খেলা সবাই খেলল তা আর কহতব্য নয়। বাকি ৫২ রানে ৬টা উইকেট খতম হয়ে গেল। ইনজিনিয়ার-পতৌদি-সোলকার-মহীন্দার অমরনাথ সবাই মিলে মাত্র ১২৯ আর করতে পারল না। মনোবলহীন লজ্জাকর খেলা খেলে ভারতকে নিশ্চিত জয় থেকে বঞ্চিত করল। ৬ দিনের খেলা শেষ হল চতুর্থ দিনের লাঞ্চের ৫৫ মিনিট পরে। এবারের টেস্ট্ পর্যায়ে অস্ট্রেলিয়া ৩-১ খেলায় জয়ী হল।

অস্ট্রেলিয়া ভারত সফরে ৩-১ জয়ে 'রাবার পেলেও বিল লরির দলের খেলা 'ব্রাইট ক্রিকেটের' আওতায় পড়ে না। বরং বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের এই জয়কে বহু কষ্টে অর্জিত বলা যায়। বিল লরি যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেই বলেছিলেন 'আমি সব খেলায় জিততে চাই' সে আত্মবিশ্বাস তাঁদের সামগ্রিক খেলায় ফুটে উঠে নি। তিনটি টেস্ট্র ক্ষেত্রেই অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের কৃতিত্বের চেয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ব্যর্থতাই বেশি ফুটে উঠেছে। অস্ট্রেলীয়রা সেই ব্যর্থতার সুযোগ নিতে পেরেছেন এইমাত্র। শেষ টেস্ট মাদ্রাজে ভারতের খেলোয়াড়দের সেই ব্যর্থতার ছবি আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

অস্ট্রেলিয়া দলের সফর শেষে টেস্ট খেলায় ভারতের বর্তমান অবস্থা দাঁড়িছে এই—১১৬ খেলা ১৪ জয় ৪৯ পরাজয় ৫৩ ড্র।

স্কুলদল

সিংহল থেকে স্কুলদল এসে ভারত সফর করছে। সিংহল দলের সঙ্গে ভারত মোটেই এঁটে উঠতে পারছে না। ইতিমধ্যে তিনটি টেস্ট হয়ে গেছে। চতুর্থ টেস্ট কলকাতায়। একটী ছেলের খেলা দেখার ইচ্ছে আছে। সে উত্তরভারতের হংসরাজ ১৬ বছরের ছেলে। বোম্বাইতে প্রথস টেস্টে সে ১৭২ রান করেছিল। শুনেছি হংসরাজ বিশ্বনাথের স্টাইলে খেলে। স্কুলদলের অধিনায়ক বাংলার রবি ব্যানার্জি।

বোম্বাইতে প্রথম টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। দ্বিতীয় টেস্ট আমেদাবাদে ভারতীয় স্কুলদল হারে এক ইনিংস এবং ৯১ রানে। দিল্লিতে তৃতীয় টেস্টে ভারতীয়দল এই সর্বপ্রথম সিংহলের প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যা ছাড়িয়ে যায়। সিংহল ৮ উইকেটে ৩৩১ রান ক'রে ডিক্লেয়ার করলে ভারত জবাব দেয় ৯ উইকেটে ৪৪২ রান করে। হংসরাজ আবার সেঞ্চুরি করে। তার রান সংখ্যা ১৪২। খেলাটি ড্র যায়।

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

প্রথম প্রাণের সাড়া

জীবন সর্দার

সেদিন কেউ সেখানে হাজির ছিলেন না। কোনো বিজ্ঞানী বলতে পারেন না 'ঠিক কেমন করে' 'প্রথম প্রাণীর' জন্ম হয়েছিল পৃথিবীতে—কেননা কোনো বিজ্ঞানীই সেখানে হাজির হয়ে দেখতে পারেন নি কি করে কি ঘটেছে। পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য বিজ্ঞানীদের কাছে যেমন একটি ধাঁধা, প্রাণের সৃষ্টি রহস্যও তেমনি আর একটি ধাঁধা। এতকাল বিজ্ঞানীরা বাদে আর সবাই অনুমান করে বলছেন কেমন করে প্রাণের শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেন,—প্রাণের শুরু নিজেনিজেই। 'আদি মহাসাগরের' জলে যত ধাতু অধাতু ছিল বজ্রবিদ্যুতের আঘাতে সেই জল 'আয়নিত' হয়ে তা থেকে প্রোটোপ্লাজম বা জেলীর মত প্রথম জীব রূপ পেল। প্রাণী ও উদ্ভিদ সবকিছুই তা থেকে কোটী কোটী বছর ধরে জটিল এক ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে আজকের রূপ নিয়েছে।

যদি জিজ্ঞেস কর, সেই কালের প্রাণীদের গড়ন ধরনের কোন প্রমাণ আজকে হাজির করতে পারি কিনা, তবে বলব হ্যাঁ পারব। মাটি আর পাথরের গায়ে তাদের কিছু ছাপ রয়ে গেছে যে।

জলে যত প্রাণী আছে, মৃত্যুর পর জলের তলায় তাদের দেহ থিতিয়ে পড়ে, এটাই নিয়ম। জলের গাছপালার বেলায়ও সেই নিয়ম। জলের কেন, ডাঙ্গার গাছপালা পশুপাখির মৃতদেহও অনেক সময় বন্যার জলে ভেসে যায়। ডুবে যায়। একসময়ে না একসময়ে তারা জলের তলার কাদামাটির থিতোনো স্তরে চাপা পড়ে যেতে থাকে। আগ্নেয়গিরির গভীর তলায় চাপা পড়েছে এমন প্রমাণও আছে। পশুপাখির দেহের নরম অংশ নষ্ট হয়ে যায় বা অন্য কোনো প্রাণী খেয়ে ফেলে, কিন্তু তাদের হাড়গোড়, দেহের শক্ত অংশ কিংবা গাছের ডালপালা এগুলো নষ্ট হয় না। হাজার, লক্ষ বা কোটী বছর ধরেও বালুমাটি কাদা কিংবা খড়িমাটির স্তরে অবিকৃত থেকে যায়। একসময়ে নদীর গতিপথ বদলে যায় যখন, শুকিয়ে যায় হ্রদের জল কিংবা সমুদ্র সরে যায় তীর ছেড়ে দূরে তখনই খোঁজ পাওয়া যায় ঐ সবের। শুনলে বিশ্বাস করবে না, অনেক উঁচু পাহাড়েও খোঁজ পাওয়া গিয়েছে ঐ সব প্রাণীর নমুনার—যাকে বলে জীবাশ্ম বা ফসিল।

দেখেই বিজ্ঞানীরা বলতে পারেন কোন যুগে কতকাল আগে পৃথিবীর মাটিতে কি ধরনের প্রাণী বা গাছপালা ছিল। কি ভাবে তাদের গড়ন বদলেছে যুগে যুগে। যুগে যুগে বদল হয়ে কি ভাবে সেদিনের প্রাণী আর উদ্ভিদ আজকের রূপ পেয়েছে তাও জানা গিয়েছে ফসিল দেখে। 'প্রথম প্রাণের সাড়া' যেদিন জেগেছিল সেদিন সেখানে হাজির না থেকেও, আজকের বিজ্ঞানীরা, উপকথা, লোকগাথা বা কল্পনার উপর নির্ভর না করেও প্রায় ঠিক ঠিক বলে দিতে পারছেন—পৃথিবী আর প্রাণের সৃষ্টি রহস্য।

ষাট কোটি বছর আগে পৃথিবী কেমন ছিল! তখনকার পৃথিবীর মাটি শূন্য খাঁ খাঁ করছে, বাকিটা অগভীর সমুদ্রের জল ঢাকা। প্রাণী বলতে যা কিছু সব জলের তলায় মাটির কাছাকাছি। ষাট কোটি বছরের পুরনো ফসিল পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সেকালের মাটির গাছপালার আর জীবনের কিছু কিছু পরিচয় তা দেখেই তাঁরা বলতে পারছেন। সে কতকালের কথা, কী অনন্ত সময় পেরিয়ে গিয়েছে সামান্য এক কোষের প্রাণীর পরের ধাপে রূপ দিতে। আজকে যে ধরনের উদ্ভিদ বা প্রাণী দেখি তেমন কিছু তখন ছিল না যেটা থেকে মাছ, মাছ থেকে উভচর, তারপর তা থেকে সরীসৃপ যারপর পাখি আর স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব ঘটেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম মেনে।

সেদিন যেখানে কেউ হাজির ছিল না 'প্রথম প্রাণীটি' যখন আলোয় গড়ে উঠেছিল। এখন আলোয় বা অন্ধকারে আমরা, প্রকৃতি-পড়ুয়ারা, অনায়াসে হাজির হয়ে দেখতে পারি প্রাণের লীলা। যা ছিল তার খবর জানবে যেমন, যা আছে তার খোঁজ নেবে না!

সফর ফ্রেজারগঞ্জ—সমুদ্রতীর

বিবরণ—অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা যারা স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে গেছি, অথবা যাদের ১৬ বছর হয়ে গেছে তারা এক সঙ্গে জীবন সর্দারের সঙ্গে প্র. প. দপ্তরের 'সফরে' বেরোই।

এবার ডিসেম্বরে শীতের সফরে বেরিয়ে ফ্রেজারগঞ্জে এসে পৌঁছলাম। ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ এবং নামখানা হয়ে এখানে পৌঁছেছি। পথে কিছু পাখি চোখে পড়েছে, যেমন, ফিঙে, নীলকণ্ঠ' বাঁশপাতি মেছোবক, কোঁচবক, এবং দু-রকমের মাছরাঙা।

সমুদ্রকে ডানহাতে রেখে তীর ধরে বাঁ দিকে এগিয়ে চলেছি 'বকখালি'র দিকে, এখানকার তীর মাঝারি রকমের শক্ত, অবশ্য কোন কোন জায়গায় পা খানিকটা বসে যাচ্ছে, তীরের রঙ কালচে। মাটির ভাগ বেশি। সমস্ত তীর জুড়েই কাঁকড়ার গর্ত, এবং গর্তের পাশেই বসে লাল রঙের বড় কাঁকড়া। সংখ্যায় এত যে তীর লাল হয়ে আছে। আমরা এগোবার সঙ্গে সঙ্গে গর্তে ঢোকে আবার খানিক পরেই বেরিয়ে আসে, খানিকটা এগোবার পরেই চোখে পড়ল বালিয়াড়ি, মোটামুটি উঁচু। জীবন সর্দার আগে বালিয়াড়ির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন, এখন সেই জিনিস নিজে চোখে দেখে ভাল

লাগল। আমরা বালিয়াড়িতে উঠতে লাগলাম। পুরো মিহি সাদা বালি, উঁচু দিকে কিছু লতা আছে। খাড়া গা বেয়ে উঠতে বেশ লাগছে। দু পা উঠছি, তারপরেই হয়ত তিন পা বালি সমেত নেবে আসছি। একভাবেই ওপরে উঠলাম। ওপর থেকে দেখলাম চারদিকে কিছু 'ক্যাকটাস' গাছ ও ডানদিকে কিছু নারকেল গাছ আছে।

সমুদ্রের অবস্থা বেশ ঠাণ্ডা, জলের রঙ নীলচে সবুজ, বহুদূরে হালকা নীল। দূরে ভাসছে জেলে নৌকো, এতক্ষণে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছি, হঠাৎ ভেসে এল শুঁটকি মাছের গন্ধ। দূরবীণে চোখ রাখতেই চোখে পড়ল সামনেই জেলেদের অঞ্চল। যতই এগোচ্ছি ততই নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে গন্ধের জন্য। আস্তে আস্তে এসে গেলাম সেই অঞ্চলে, সেখানে প্রচুর জেলেনৌকা রয়েছে এবং প্রচুর মাছ। আরো একটা মজার জিনিস দেখলাম, প্রায় মাইলখানেক জায়গা জুড়ে শুঁটকি মাছ শুকোচ্ছে, গাছের ডাল কেটে পুঁতে সারি সারি তাকের মত করে তার থেকে হাজার হাজার মাছ ঝুলছে, কিছু মাছ আবার বালিতে ফেলেই শুকোনো হচ্ছে। এইখানে বহু কাদাখোঁচা জলের ধারে ঘুরছে, ছোট বড় দু'রকমই আছে। আর দেখলাম অসংখ্য গাংচিল। দূরবীণ দিয়ে এবং খুব কাছ থেকে খালি চোখেও লক্ষ্য করলাম। কলকাতার গঙ্গায় যে গাংচিল দেখা যায়, তার পুরো মাথাই কালো এদের মাথায় খানিকটা কালো দাগ আছে। অসংখ্য গাংচিল একসঙ্গে জলে ভাসছে। একটা 'টার্ণ' পাখিও চোখে পড়ল, অনেকটা একরকম দেখতে, তবে লেজটা চেরা।

খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রামের পর ঘুরে দেখতে, নমুনা জোগাড় করতে আর ছবি তুলতে বেরোলাম। কিছু হাঙরের বাচ্চা শুকোচ্ছে দেখে প্রশ্ন করে জানলাম যে, এদের থেকে তেল বার করা হয়। বকখালির খাঁড়ি পেরিয়েই সুন্দরবনের 'বাদা'। সেখানকার গাছপালাও লক্ষ্য করলাম। চারদিক দেখে নিয়ে ফেরবার পথ ধরলাম, ফেরবার সময় দেখি বাঁশের মাথায় শঙ্খচিল বসে, সমুদ্রের ধারে সাদা কালো খঞ্জন পাখির দেখা পেলাম। ফেরবার সময় একটা কাঁকড়াও চোখে পড়ল।

সফর রূপনারায়ন নদীতীর

বিবরণ :—অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

২১।১২।৬৯ এর সফর ছিল প্রপ দপ্তরের ছোট ছোট পড়ুয়াদের জন্য। তাতে আমি ছিলাম। কোলাঘাট থেকে রূপনারায়নের ধার ধরে এসে শরৎ সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। নীচে রূপনায়ায়ণ চওড়া হ'য়ে বয়ে চলেছে! বাঁদিকে বহুদূরে রূপনারায়ণ বাঁকে নিয়েছে! বাঁকের মুখে বেশ বড় একটা পলিমাটির চড়া পড়ে গেছে। নদীর জলে প্রচুর মাটি মিশে আছে, জলের রং একেবারে ঘোলা। জলের স্রোতও খুব কমে গেছে।

কূলের কাছে জলের মধ্যে একফালি চর গজিয়ে উঠেছে, আর সেখানে একটা বক দাঁড়িয়ে।

দুরবীনে চোখ লাগাতেই দেখলাম, বকটার পাশেই একটা কাদাখোঁচা পোকার সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। তীরের নরম পলিমাটির ওপরে প্রচুর কাদাখোঁচা। বড় বড় চারটি আঙ্গুলের ছাপ ফেলে হেঁটে গেছে বক। .

সেতু থেকে নেমে সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। রাস্তার দুধারে ছোট-বড় জলা-জায়গা, আর আশে পাশে নাম না জানা গাছপালায় জঙ্গল হয়ে আছে। চারিদিকে প্রচুর পাখি। দূরে কোথা থেকে একটা বেনে বউ পাখি ডেকে চলেছে—ফিউ—ফিউ। সাদা কালো খঞ্জনগুলো একেবারে রাস্তার ওপর চলে আসছে। ঘাসের মধ্যে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে ধূসর রঙের খঞ্জন। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বাঁশপাতি বা নরুণচেরা পাখি। চকচকে সবুজ গা, লম্বা ঠোঁট।

হঠাৎ দেখলাম, অনেকগুলো পুকুরের মধ্যে একটার জল গাঢ় লাল। ভারী অদ্ভুত লাগল। জীবন সর্দার বললেন, জলে লাল রঙের শেওলা-জাতীয় পানা জন্মানোর জন্যই জলটা লাল দেখাচ্ছে। কাছে গিয়ে হাত দিলাম, পুরু শেওলা লেগে গেল। জীবন-সর্দার বললেন—যদি প্রশ্ন ওঠে এখানকার রাস্তা-ঘাট ও মাঠের ধুলো বালির জন্যই জলের রং লাল হয়েছে, কি যুক্তি এর বিরুদ্ধে দেখানো যেতে পারে?

আমরা আলোচনা করতে লাগলাম। প্রথমত দেখতে হবে, এখানকার সব পুকুরের জলই লাল হয়েছে কিনা, কারণ ধুলো বা মাটি সব পুকুরের জলেই পড়বে। কিন্তু আমরা দেখলাম, লাল পুকুরটির পাশেই রয়েছে সাধারণ জলের পুকুর। দ্বিতীয়তঃ, এখানকার মাটির রং কেমন দেখতে হবে। কারণ, মাটির রং লাল হ'লে তবেই পুকুরের জল লাল হ'বে।

কিছু দূর গিয়ে সাদা কালো মাছরাঙার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। একটা জলার ওপর দিয়ে উড়তে হঠাৎ ডানা বন্ধ করে ঝপ করে পড়ে জলের ওপর মাছধরার জন্য ছোঁ নেয়ে বেরিয়ে গেল।

চারিদিকে প্রচুর ঘুঘু ডাকছে। গাছের ডালে, টেলিগ্রাফের তারে তাদের দেখতেও পেলাম। টেলিগ্রাফের তারে ঘুঘুদের সঙ্গ দিয়েছে ফিঙে। জলের ধারে মেছো বক বসে। হাঁটতে হাঁটতে ফুরিয়ে এলো পথ। আমরা অবশেষে দেউলটি স্টেশনে এসে পৌঁছলাম।

শীত এসে

শ্যামাপ্রসাদ দাস

শীত, শীত, বাতাসেতে খবরটা রটল।
ঠোঁট ফেটে চৌচির অঘটন ঘটলো॥
ঝুর ঝুর হিমকুঁড়ি জোট বেঁধে নামলো।
টিনে ছাওয়া ঘর রাতে দর্‌দর্‌ ঘামলো॥
সরিষার ক্ষেতে ফুল জোয়ারটা ছুটলো।

হাসিখুসি মুখ নিয়ে গাঁদাকলি ফুটলো॥
ছ্যাঁক ছোঁক পিঠেপুলি ঘরে ঘরে চললো।
খেজুরের পাটালিতে শিশুমন ভরলো॥
লেপমুড়ি দিয়ে সবে তোফা ঘুমে জাঁকালো
শীত এসে বুড়োদের হাড়ে হাড়ে কাঁপালো।

মরীচিকা

অজেয় রায়

দিলীপ বলল, একটা বুদ্ধমূর্তি দেখছি ? আগে দেখিনি তো কখনো ?

মাস্টারমশাই বললেন—হ্যাঁ, পাল আমলের মূর্তি। কষ্টি পাথরে তৈরি। তোমাদের দেখাব বলেই আজ এটা বের করে রেখেছি। ভারি সুন্দর না ?

তিনজনে মনোযোগ দিয়ে দেখল।

মাস্টারমশাইয়ের সমনে অর্দ্ধবৃত্তাকার লেখার টেবিলটার ওপর মূর্তিটা বসানো রয়েছে। প্রায় দশ ইঞ্চি উঁচু। পদ্মাসনে বুদ্ধ! চোখের পাতা আধবোজা। ধ্যানমগ্ন। প্রশান্ত মুখে ধ্যানের আবেশ। ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি।

ধন্য, যে শিল্পী এই মূর্তি তৈরী করেছে। কি নিপুণ সুক্ষ্ম কারিগরি। কুচকুচে কালো মসৃণ পাথরের গায়ে বিত্যুতের আলো ঠিকরে পড়ছে। সাত আটশো বছরের পুরণো মূর্তি মনেই হয় না। তবে একেবারে অক্ষত নয়। এক হাতে তিনটি আঙ্গুলের ডগা ভেঙ্গে গেছে। ডান হাঁটুর কাছে চোটের দাগ।

অমর বলল—বাঃ চমৎকার। কোথায় পেলেন ?

এক তিব্বতী লামার কাছ থেকে, মাস্টারমশাই বললেন। আজ আমার কিউরিওর সংগ্রহ ঝাড়পোঁছ করছিলাম, হঠাৎ মূর্তিটা চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল অতীতের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। লামা চিমপোর কাহিনী। তোমরা ত এলেই গল্প গল্প কর, ভাবলাম সেই কথাই আজ বলি—

গল্প! তিনজনে নড়েচড়ে বসল।

আসলে রতনলালবাবু তিন বন্ধু কারোরই মাস্টারমশাই নন। সুনীলের মেজদা তাঁর ছাত্র। সেই সূত্রে তিনি সুনীলের বাড়ির লোকের এবং এই তিন বন্ধুরও মাস্টারমশাই হয়ে গেছেন।

অধ্যাপক রতনলাল রায় একজন প্রত্নতাত্ত্বিক। পুরোনো কালের ইতিহাস খুঁজে বের করাই তাঁর পেশা। এই কাজে কত দেশ ঘুরেছেন, কত যে অভিজ্ঞতা হয়েছে! অমর, সুশীল, দিলীপ তাই মাঝে মাঝে তাঁর কাছে আসে, সেই সব বিচিত্র কাহিনী শুনতে। সাধারণতঃ প্রতিমাসের তৃতীয় রবিবার তারা ওল্ড বালিগঞ্জের রতনলালবাবুর গাছপালা ঘেরা নির্জন বাড়িটার দোতালায় লাইব্রেরী ঘরে এসে হানা দেয়। নেহাৎ আটকে না পড়লে ঐ দিন ঠিক হাজির হবেই হবে।

অন্যদিন গল্প বলাতে মাস্টারমশাইকে কিঞ্চিৎ অনুনয় বিনয় করা প্রয়োজন হয়। আজ কিন্তু মেঘ না চাইতেই জল। মাস্টারমশাই আজ মেজাজে আছেন।

টেবিলের পিছনে রিভলভিং চেয়ারটায় মাস্টার মশাই ছড়িয়ে আরাম করে বসলেন। মাস্টার-মশাইয়ের বয়স যাট ছুঁই ছুঁই। কিন্তু একমাথা এলোমেলো সাদা ধবধবে চুল ছাড়া তাঁর বলিষ্ঠ দেহে জরার কোনো ছাপ পড়ে নি। প্রশস্ত কপালের নিচে একজোড়া তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখ। একটুক্ষণ মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি খোলা জানালা পথে দৃষ্টি ফেরালেন। সে দৃষ্টি যেন বহুদূরে। মন, বহুদিন আগের কোন স্মৃতিকে রোমন্থন করছে—

বাইরে সন্ধ্যের অন্ধকার নেমেছে। ঘরের ভিতর জোরালো নিওন আলো। প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ঘরটায় র‍্যাকের পর র‍্যাক, বই ঠাসা। কাঁচের আলমারিতে সাজানো অজস্র প্রাচীন কিউরিও। সামনে বসে তিনজন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু দেয়াল ঘড়িটার টিক্ টিক্ ধ্বনি সময়কে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

—সে আজ অনেক বছর আগেকার ঘটনা। মাস্টারমশাই তিনজনের মুখের পানে চেয়ে ধীর গম্ভীর স্বরে বলতে শুরু করলেন—

গোবি মরুভূমির দক্ষিণ ধার ঘেঁষে এক ছোট্ট মরুদ্যানে আমরা ক্যাম্প করেছি। আমরা মানে আমি এবং অঁদ্রে ফুশে (Andre Faucher) ফরাসী ফুশে একজন প্রাণি বিজ্ঞানী। আমার অনেক দিনের চেনা। সে গোবি মরুভূমিতে খুঁজতে এসেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীর অস্তিত্ব অর্থাৎ ফসিল। আমার লক্ষ্য পুরনো লুপ্ত সভ্যতা। সেই জনহীন মরুপ্রদেশে একা কাজ করার অনেক অসুবিধা। দু'জনে মিলে দল গড়লে খরচা কম। আপদে-বিপদেও ভরসা পাওয়া যায়। তাই আমরা একসঙ্গে কাজ করছি। মরুদ্যানটি বেছে নিয়েছি এমন জায়গায়, যেখান থেকে আমাদের দু'জনেরই কাজের সুবিধে হয়।

ছোট্ট মরুদ্যান। চারপাশের ধূসর অনুর্বর রাজ্যে যেন একবিন্দু প্রাণ। দুটো গভীর কুয়োকে ঘিরে কিছু ঝোপ-ঝাড় গাছ। কিছু সবুজ ঘাস সেখানে মানুষ বলতে আমাদের লোকজন আর ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা দু'ঘর মঙ্গোল্। জায়গাটা একসময় বেশ বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। অনেক লোক বাস করত। গাছপালা বাগান ছিল যথেষ্ঠ। কিন্তু ক্রমে জল দিনে দিনে তলায় নেমে যায়। বেশীর ভাগ কুয়ো

যায় শুকিয়ে। ফলে সবাই পালিয়েছে। আর কিছুদিনের মধ্যে ঐ দু'ঘরও চলে যাবে। মরুভূমি পুরোপুরি গ্রাস করবে এই মরুদ্যানকে।

আমি খুঁড়ছি একটা ধ্বংসাবশেষ। ক্যাম্প থেকে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে প্রাচীন বাণিজ্য রাস্তা রেশম পথের ধারে। মধ্যযুগে ওখানে এক ছোট খাটো শহর ছিল। সমস্ত ঘর বাড়ি প্রাসাদ এখন মাটি বালির তলায় চাপা পড়েছে।

—কি নাম বললেন? রেশম-পথ! দিলীপ জিজ্ঞেস করে। কেন?

কারণ ঐ পথে রেশম চালান যেত। মাস্টারমশাই বলেন।

এই দেখ ম্যাপ! মাস্টারমশাই একটা লম্বা সরু লাঠি তুলে নিলেন। তারপর রিভলভিং চেয়ারটায় পাক খেয়ে দিলীপদের দিকে পিছন ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ করে বসলেন। দেয়ালে তাঁর মাথার কাছে কয়েকটা বড় বড় ম্যাপ টাঙ্গানো। নানা দেশের মানচিত্র। একটা এশিয়ার ম্যাপের ওপর লাঠির ডগাটা ছোঁয়ালেন। হিমালয় পর্বতমালার একটু উপর অংশে।

—এই হচ্ছে মধ্য-এসিয়া।

পশ্চিম ও উত্তর সীমানায় থিয়েনসান পর্বতমালা, পশ্চিম পামির ও কারাকোরাম, দক্ষিণে কুন্ লুন পর্বত শ্রেণী দিয়ে ঘেরা। লাঠি দিয়ে একটা সীমানা কাটতে কাটতে মাস্টারমশাই বললেন—এই হচ্ছে ভয়ঙ্কর গোবি মরুভূমি। মধ্য এসিয়ার এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। লম্বায় প্রায় হাজার মাইল। চওড়ায় তিনশো—পাঁচ মাইল হবে। আর গোবির মধ্যে এই ছোট্ট নীল ছোপটা হচ্ছে লব-নোর অর্থাৎ লবন হ্রদ।

ম্যাপে এই যে দুটো টানা লাল দাগ দেখছো পুব পশ্চিমে বিস্তৃত এগুলো হচ্ছে সেকেলে বাণিজ্য রাস্তা দেখ, ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমানায় হিন্দুকুশ পর্বতমালা থেকে কয়েকট ছোট ছোট রাস্তা গিয়ে কাশগরে মিলেছে। সেখান থেকে দুটো প্রধান রাস্তা বেরিয়েছে। একটা গেছে গোবি মরুভূমির দক্ষিণ অংশ দিয়ে, অন্যটা উত্তর অংশ দিয়ে। এই দুই রাস্তাকেই বলা হত রেশম পথ। এই দুটো পথ আবার মিলেছে চীনের উত্তর পশ্চিম সীমানার কাছে ইউ-মেল-কোয়ান গিরিপথে। প্রাচীনকালে এই পথে দেশ বিদেশের বণিকরা আসা যাওয়া করত। ভারতবর্ষ, চীন, পারস্য, গ্রীস রোম রাশিয়া ইত্যাদি দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চলত! চীন থেকে চালান যেত অতি উৎকৃষ্ট পৃথিবীর সেরা রেশমী কাপড়। ফলে রাস্তাগুলির নাম হয়ে যায় রেশম পথ। এ সব রাস্তা ছিল বড়ই দুর্গম। কখনও মরুভূমি, কখনও গিরিপথের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। শত শত মাইল ব্যাপী অনুর্বর উষর পথ অতিক্রম করতে হত বণিকদের—কখনও বালির সমুদ্র,কখনও ন্যাড়া পাথুরে প্রান্তর, কখনও বা ছোট ছোট ঘাসের স্টেপ্ ভূমি।

পথে কোন গ্রাম-শহর কিছুই ছিল না বুঝি? অমর প্রশ্ন করে।

—তা ছিল। উত্তর আর দক্ষিণ পথের ধারে ধারে অনেক দূরে দূরে এক একটা মরুদ্যানকে কেন্দ্র করে বা পাহাড়ী নদীর পাশে কয়েকটি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগ অবধি এই রাজ্যগুলি ছিল বেশ সমৃদ্ধিশালী এসিয়া ইউরোপের নানা ধর্ম সংস্কৃতি এই রাজ্যগুলিতে বয়ে এনেছিল বণিক আর

ধর্মপ্রচারকের দল। ভারতবর্ষ থেকে প্রধানতঃ গিয়েছিল বৌদ্ধধর্ম এবং শিল্প-সাহিত্য। কিন্তু ক্রমশঃ মরুভূমির আয়তন বেড়ে যাওয়ার আবহাওয়া দিন দিন শুকনো হয়ে ওঠায় এই রাজ্যগুলি নষ্ট হয়ে যায়। আমি দক্ষিণবাহী রেশমপথের পাশে সে রকম একটা রাজ্যেরই ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে বের করছিলাম। যাক্ মধ্য এসিয়ার ইতিকথা আর একদিন হবে, এখন আসল গল্পে আসা যাক।

আমি এবং ফুশে দু'জনে দুটো টিম করে নিয়েছিলাম। আমার কাজের জায়গায় কথাতো আগেই বলেছি—কাছেই। কিন্তু ফুশে যেত দূরে। মরুদ্যান থেকে কিছু উত্তরে এক নিচু পাহাড়ের সারি পূব-পশ্চিমে ছড়িয়ে আছে ফুশে সেই পাহাড়ের কাছাকাছি, পাদদেশে এবং উপত্যকা অঞ্চলে ফসিলের সন্ধান করছিল। কোন কোন দিন বেশি দূরে চলে যেত তখন সঙ্গে লোকজন, তাঁবু, খাবার নিয়ে বেরত। ফিরে আসত কয়েকদিন পরে।

প্রায় মাস খানেক কাজ চলেছে। একদিন ভোরবেলা। আমি তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। সবে উষার আলো ফুটেছে। চতুর্দিকে দিগন্ত প্রান্তর আর ঢেউ খেলানো বালিয়াড়ি সূর্যের প্রথম রশ্মিতে রক্তিম হয়ে উঠেছে। বড় সুন্দর দৃশ্য।

ভাবলাম থাক আজ আর কাজে বেরব না। ফুশে নেই। সে তার টিম নিয়ে বেরিয়েছে। খুব সম্ভব কাল ফিরবে। ক'দিন পর পর প্রচণ্ড গরমে ধ্বংসস্তূপে খোঁড়াখুড়ি করে আমি ও আমার দলের লোকেরা বেশ ক্লান্ত। তাই একদিন বিশ্রাম নিই। তাছাড়া যে প্রাসাদটি খুঁড়ে বের করছিলাম, সেখান থেকে অনেকগুলো মুদ্রা শিলালেখ পেয়েছি, সেগুলো আজ ক্যাম্পে বসে পরীক্ষা করি !

কাজে ফাঁকি দেবার নামে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ভাবলাম একটু বেড়িয়ে আসি মরুদ্যান থেকে প্রায় দু'মাইল পশ্চিমে একটা নিচু প্রান্তর ছিল। সেই প্রান্তরে এক বিন্দু বালি নেই। শুধু কঠিন ন্যাড়া পাথরে ঢাকা। যেন এক মস্ত বাঁধানো সমতল চত্বর। আর তার ওপর ছড়িয়ে আছে অজস্র গোল গোল নুড়ি। নুড়িগুলির বেশী ভাগেরই রঙ সবুজ। গাঢ় সবুজ, হালকা—নানা রকম। তাছাড়া ছিল হলুদ আর ফিকে লাল রাঙা পাথর। ভারি সুন্দর দেখতে প্রান্তরটা। সূর্যের আলো পড়ে দেখতে যেন একখণ্ড সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি, তাতে, হলদে-গোলাপী রঙের ফুল ফুটে আছে। সময় পেলেই আমি সেখানে যেতাম। দেখে দেখে সুন্দর সুন্দর নুড়ি কুড়তাম, ফুশেকে রসিকতা করে বলতাম—বাগানে চললাম হে বেড়াতে।

আমরা লোকদের বললাম—আজ ছুটি। তারপর দূরবীন ও জলের ফ্লাস্কটা কাঁধে ঝুলিয়ে সেই প্রান্তরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম

একাই গেলাম, সামান্য দূরত্ব পথ হারাবার ভয় নেই। আর ততদিনে ধারকাছও মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে।

—'বাগানের কাছাকাছি পৌছেছি হঠাৎ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল কতগুলো শকুন। বেশ নিচে নেমে এসে চক্রাকারে উড়ছে। সেই বাগান বা প্রান্তর যাই বল, সেইখান থেকে আন্দাজ মাইল খানেক তফাতে।

একটা উচু টিলার ওপর উঠলাম দেখতে।

হুঁ, যা ভেবেছি। একটা দেহ বালির ওপর পড়ে। চোখে দুরবীন লাগালাম।—মানুষ।

কোন হতভাগ্য কে জানে? হয়তো মরুরাজ্যে পথ হারিয়েছিল। জল আর খাবারের অভাবে রাতের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা এবং দিনের বেলায় প্রচণ্ড সূর্যতাপে একটু একটু করে যাতনাময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

একি দেহটা যে নড়ে উঠল। তবেতো প্রাণ আছে। নুড়ির কথা ভুলে দ্রুত লোকটির দিকে পা চালালাম।

দেখে মনে হল কোন বৌদ্ধ শ্রমণ। মুণ্ডিত মস্তক। মঙ্গোলীয় গড়ন। গায়ে একটা লাল রঙা লম্বা আলখাল্লা। বিবর্ণ শতছিন্ন। পাশে একটি কাপড়ের ঝুলি পড়ে আছে। ক্রমশঃ

আমাদের শক্তি শুধু ইস্পাতেই নয়,
মানুষেও। বাঁচার মত বাঁচতে হ'লে শুধু খাওয়া
পরা নয়, তার সঙ্গে চাই সঙ্গীত, নৃত্য ও
অন্যান্য আনন্দের খোরাক। জামসেদপুরের
নাগরিক জীবনে তার সবরকম সুযোগ
সুবিধা আছে।
টাটা স্টীল
TS 7050AR

প্রোফেসর শঙ্কু ও বাগদাদের বাক্স —সত্যজিৎ রায়

নবম বর্ষ—একাদশ সংখ্যা

ফাল্গুন ১৩৭৬/মার্চ ১৯৭০

খুকুর দোকান

দুর্গাদাস সরকার

বাজার কে যান ? একটু দাঁড়ান—হেথায় বসে খুকুর দোকান ;
কম খরচে পয়সা বাঁচান, কিনুন পুতুল, মাছ, মোয়া, পান ।
সবই পাবেন এখান থেকে, দেখুন চোখে, কিনুন চেখে ;
পাল্লা দিয়ে বেচছে খুকু, ফাউ দিতে আর পারবে সে কে ?
বাজারে কি সবই মেলে ? আটা-চিনি-চাল রেশনে
কিনতে হলে 'কিউ' দিতে হয় ছোট-বড় সকল জনে ।
এই দোকানে কেনেন যদি—লাইন-টাইন দেওয়া মানা,
হাত বাড়ালেই এক নিমেষে সব জিনিসের পাই নিশানা ।
খুকুর দোকান ছোট্ট দোকান ? মস্ত মনের ওজন দরে
কাক-চিলেরা পৌঁছে দেবে এক কথাতে ঘরে ঘরে ।
মাঘের মেলা, রথের মেলা, পুজোর মেলার অনেক দ্রব্য
যা মেলেনি সস্তা দরে এখানে তা সহজলভ্য ।
ভারী জিনিস ছোট জিনিস গানে ভরা সা রে গা মা,
সবই পাবেন এই দোকানে, পাবেন গোটা চাঁদা মামা ।
চরকা বুড়ি ঝুড়ি ঝুড়ি খেলনা দিয়ে খুকুর দোকান
সাজিয়ে রাখেন । ভালোবেসে এলেই পাবেন,—যা খুশি চান ॥

(পনেরজন ভারতীয় স্কুলের ছেলেমেয়ে টন্টামোরীর স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিতে আসতে গিয়ে ব্রান্টালুসি পর্বত ও ঘন জঙ্গলময় উপত্যকার মধ্যে প্রবল ঝড়ে নির্খোজ হয়ে যায়।

সাময়িকভাবে সমস্ত আনন্দ উৎসব স্থগিত রাখা হল। পাহাড়ের কোলে তির্নিকা গ্রাম থেকে, হেডমাস্টার আরডনের নির্দেশে মিডি, কিকু ও হকোর নেতৃত্বে তিনটি উদ্ধারকারী দল তিনদিক দিয়ে অনুসন্ধান সুরু করল।

কিন্তু মাজিনকোর গভীর জঙ্গল ঘন কুয়াশায় ঢাকা। তার উপরে আবার সেখানে শয়তান গ্রাটেনকোর উৎপাত।

ওদিকে, তিনজন গুরুতরভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা নিজেদের সামলে নিয়ে উদ্ধারকারী দলের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু স্টেনগান হাতে গ্রাটেনকো তাদের বন্দী করে ফেলল। প্যারাসুটে নামিয়ে দেওয়া রেডিও-যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ধারকারীরা এই খবর পেল।

গ্রাটেনকোর গুহায় ছেলেমেয়েরা বন্দী। গুহার এক কোণে গ্রাটেনকো ডাকাতের একটা বাক্সে তার মরা মেয়ের জামা সযত্নে রাখা দেখল এরা কজন।)

॥ ৫ ॥

ওরা বার হয়ে আসতেই টমের সাথে দেখা।

—কোথায় ছিলে তোমরা এতক্ষণ? কি যে ভাবনা হয়েছিল!

—গ্রাটেনকো জানতে পেরেছে নাকি? জিজ্ঞাসা করল রাণা।

—না। সে কোথায়? প্লেনের আওয়াজ শুনেই ছুটেছে বাইরে জিনিস কুড়াতে, এখুনি ফিরবে।

—বিলি আর হামিদুলকে দেখছিনা যে?

—সঙ্গে নিয়ে গেছে মাল বয়ে আনতে।

—রেডিও চালিয়েছো? ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল রাণা।

—না—অত বোকা নয় গ্রাটেনকো। সে যন্ত্র ও সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।

—বিলি আর হামিদুল কি পালাবার পথ চিনতে পারবে?

—বলে দিয়েছি পথের সব কিছু যেন খুঁটিয়ে দেখে আসে ওরা তা পারবে বলেই আমি ওদের যাওয়াতে আপত্তি করিনি। বলল টম।

—আমরা গ্রাটেনকোর গোপন ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছি।

—কোথায়? বন্দুক-গুলি-বারুদ কিছু আছে?

—না নেই। শুধু জামাকাপড় আর অন্য জিনিস।

—আমাদের কি তা কাজে লাগবে?

—না, ওসব আমরা ছোঁব না।

—ছোঁব না! বেশ! তাহলে আমরা যে ওর গোপন ভাণ্ডারের কথা জেনেছি সেকথা যেন ও জানতে না পারে।

সবাই মাথা নাড়ল এক সাথে। শকুন্তলা নিজে থেকেই রাজি হল ও সুড়ঙ্গে বাচ্চারা যাতে কেউ না ঢোকে সে দিকে খেয়াল রাখার।

প্রায় এক ঘণ্টা বাদে হাঁপাতে হাঁপাতে বিরাট বোঝা বয়ে নিয়ে ফিরল গ্রাটেনকো। সে বোঝা নাবিয়ে দিয়েই বার হয়ে গেল তখুনি। ফিরল কিছু পরে অন্য বোঝা নিয়ে। সঙ্গে হামিদুল আর বিলি। ওরা দুজনে তখন এমন বেদম হয়ে গেছে যে কোন মতে গুহায় ঢুকেই হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল একটা কম্বলের উপরে। ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে ওরা। সে দিকে তাকিয়ে প্রাণ খুলে হেসে উঠল গ্রাটেনকো। তারপর দেওয়ালের একপাশ ঘেঁসে বসে পড়ে নিজেও হাঁপাতে লাগল।

মুংলি তার দলবল নিয়ে গেল মালগুলো খুলতে। প্রচুর খাবারের সাথে আরও অন্য অনেক কিছু পাঠিয়েছে ওরা। সে দিকে তাকিয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল টম। চুপিচুপি বলল—এ বোঝা বয়ে এনে খুশি হবেনা বিলি। একটাও বন্দুক নেই এতে। বেচারা!

সবাইকে খাবার ভাগ করে দিল মুংলি। ভীষণ খিদে পেয়েছিল সবারই। সবার থেকে বেশী খেল কিন্তু গ্রাটেনকো। ওর খাওয়া দেখে ভয় পেল রাণা। লোকটা না শেষ পর্যন্ত অসুখে পড়ে। তৈরি খাবার পেয়ে গ্রাটেনকো কিন্তু খুব খুশি—বলল।

—বাঃ এতো বেশ ভালই হল আমার। রোজ রোজ তৈরি খাবার খাওয়া যাবে!

খাওয়া শেষ করে মুংলি গেল আমিনার কাছে। ওর আঘাতগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে নতুন করে আবার ওষুধ লাগিয়ে দিল।

—কেমন আছ তুমি এখন? জিজ্ঞাসা করল ও।

—ভাল। করুণ ভাবে বলল আমিনা। আমি বাড়ি যাব ডাক্তার দিদি!

—হ্যাঁ যাবে নিশ্চয়ই। সাহস দিয়ে বলল মুংলি।—আমরা সকলে বাড়ি যাব।

—কবে?

—দু এক দিনের মধ্যেই।

এক পাশে শুয়েছিল তনুকা—সেও বলল—

—দু এক দিনের মধ্যেই সব লোকজন এসে যাবে। তখন আমরা সবাই যাব বাড়িতে।

—কিসের এত কথা হচ্ছে তোদের? হঠাৎ গ্রাটেনকো ওদের কথার মাঝখানে জিজ্ঞাসা করল।

—আমিনা বাড়ি যেতে চাচ্ছে। বলল তমুক্তা।

—বাঁড়ি!! —হা হা করে হেসে উঠল গ্রাটেনকো।

—কেন তোর এ জায়গাটা ভাল লাগছে না? ভয়ে ভয়ে আমিনা বলল—না। বিচ্ছিরি এ জায়গাটা। আমার একটুও ভাল লাগছে না।

—কিন্তু কি করে বাড়ি যাবি তুই! ওরা যে তোদের সবার কথা ভুলে গেছে।

—তুমি আমাকে বাড়ি দিয়ে আসবে। —থাকতে না পেরে আমিনা বলল।

—আমি দিয়ে আসবো! হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল গ্রাটেনকো। কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ তারপর বলল—আমি যে ডাকাত। আমি কাউকে তো বাড়িতে দিয়ে আসতে পারবো না। বাড়ি যাওয়া হবে না।

একথা শুনে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল আমিনা। কান্না জড়ানো গলায় বলল—তুমি কেন আমাদের এমন করে ধরে রেখেছ? আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা সবাই বাড়ি যাব। মার কাছে যাবো। সমস্ত মুখের চেহারা বদলে গেল গ্রাটেনকোর। লাফিয়ে উঠে হঠাৎ শূন্যে দুচারবার হাতগুলো ছুঁড়লো ও। তারপর ছুটে চলে গেল গুহার মুখের কাছে।

মুংলি আমিনার মাথার কাছে বসে পড়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—ছিঃ কেঁদনা। দেখো ঠিক আমরা সবাই বাড়ি ফিরে যাব।

আমিনাকে কাঁদতে দেখে এক এক করে ছোটরা ওর চার পাশে এসে বসেছিল। লিজা বলল—এসো আমরা এখানে বসে মজার একটা খেলা খেলি। আমিনা তুমি শুয়ে শুয়ে খেলবে, কেমন?

প্রিয়া বলল—তারপর আমি তোমাকে একটা ভারি সুন্দর গল্প বলব। মা আমাকে বলেছে। শুনবে?

রাজা বলল—এসো তার থেকে আমরা সবাই মিলে একটা গান গাই। তুমি গান গাইতে পার?

আস্তে সেখান থেকে উঠে এল মুংলি। আমিনার জ্বর হয়েছে। সুধু মলম দিয়ে কি আর ওর ব্যথা কমানো যাবে? ওর এখুনি হাসপাতালে যাওয়া উচিত।

সমস্ত গুহার মধ্যে তখন যেন কেমন একটা থমথমে ভাব নেমে এসেছে। এক জায়গায় বসে কি যেন ভাবছে ক্যাপ্টেন। তার পাশে চুপ করে বসে আছে বিলি টম আর হামিদুল। গুরুদিৎ অন্য পাশে বসে গুহার ছাদের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। আসলে ও ওর মুখের ভাব কাউকেই দেখাতে চায় না—তাই।

ভয়ে অন্যদিকে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে রাধারাণী, তার পাশেই আছে রুক্মিনী, শান্তা আর শকুন্তলা। কুণাল ঝুঁকে পড়েছে ফার্স্ট এইড বাক্সটার উপরে। কি যেন খুঁজছে সেখানে।

আস্তে আস্তে ক্যাপ্টেনের সামনে এসে দাঁড়াল মুংলি।

—কিছু বলবে তুমি?

—আমিনার জ্বর হয়েছে। জ্বরের ঘোরেই ও অমন চুপ করে আছে।

—জ্বর হয়েছে!

—হ্যাঁ। এখুনি একবার ডাক্তারের সাথে কথা বলতে পারলে ভাল হতো। ভয় করছে আমার।

লাফ দিয়ে উঠল টম। বলল—এসো আমার সাথে।

গুহার মুখের কাছে বাইরে কেমন যেন ক্লান্তভাবে বসে আছে গ্রাটেনকো আকাশের দিকে তাকিয়ে। ওদের পায়ের সাড়া পেয়ে মুখ ফিরালো।

—কি চাস?

—রেডিও যন্ত্রটা।

—কেন?

—আমিনার জ্বর হয়েছে। ডাক্তারের সাথে কথা বলবো।

—জ্বর হয়েছে! কেন হল?

—তুমি দেখনি কি ভীষণ চোট লেগেছে ওর।

—ওষুধ তো দেওয়া হয়েছে! তবে?

—ওতে কি সারে?

—নে। গলা থেকে যন্ত্রটা খুলে এগিয়ে ধরল গ্রাটেনকো।

—যা খুশি তোরা বল। ঐ মাথা-মোটা লোকগুলোর কি এ সবে হুঁশ আছে? ওরা শুধু চেনে গ্রাটেনকোকে আর ফাঁসির দড়ি। না না অত সহজে সে দড়ি গলায় পরবে না গ্রাটেনকো। গ্রাটেনকোর দয়া নেই, মায়া নেই। ও শয়তান। আস্ত শয়তান।—নিজে বাঁচার জন্য ও সবাইকেই মারতে পারে।—

যন্ত্রের চাবি টিপতেই শুনতে পেল টম ওদিক থেকে কি যেন সব আবোল তাবোল বলছে ওরা। অবাক হল ও —এর মানে?

—ক্যাপ্টেন। ও ডাকল ভয় পেয়ে।—তুমি শোন তো।—

তাড়াতাড়ি যন্ত্রটা হাতে নিল রাণা। মন দিয়ে শুনল কিছুক্ষণ তারপর বলল!—কাগজ কলম আছে কারও কাছে?

গুরুদিৎ এগিয়ে এসেছিল সামনে। ও তাড়াতাড়ি ওর পকেট থেকে কলমটা এগিয়ে দিল। এত গোলমালেও বাবার দেওয়া জিনিসটাকে ও ঠিক সামলে রেখেছে। খাবারের মোড়ক একটা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি তাতে লিখতে লাগল রাণা—যা যা শুনতে পেল ঠিক তাই। সে লেখার উপরে ঝুঁকে পড়ল সকলে। অসম্ভব! এর তো কোনই মানে হয় না।

কিন্তু বারবার ওরাই বা একথা গুলো বলছে কেন? হঠাৎ নীচু হয়ে ফিসফিস করে গুরুদিৎ বলল।—সংকেত!

—বুঝছো না। এ সংকেত। গ্রাটেনকো যাতে বুঝতে না পারে তাই এমন করেছে। বলে হাত বাড়িয়ে দিল—দাও কাগজটা আমাকে দাও।

যন্ত্রটা টমের হাতে ফেরত দিল রাণা। টম চাবি টিপে ডাকলো—হ্যালো হ্যালো······শুনেছি তোমাদের কথা। ডাক্তার চাই।

ডাক্তার এলো—বলল—তুমি ভয় পেওনা বোন। ওষুধের বাক্সে সিরিঞ্জ আছে। ওষুধ আছে এখুনি একটা ইনজেকশন দিয়ে দাও।

বারবার জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিল মুংলি কি করতে হবে। তারপর নিজের মনকে শক্ত করে আমিনাকে ইনজেকশন দিল।

ওদিক থেকে ততক্ষণে প্রেসিডেন্টের শেষ অনুরোধ গ্রাটেনকোকে জানানো হয়েছে। গ্রাটেনকোর স্পষ্ট উত্তর

চলে গেছে।—ওর দয়া মায়া নেই। ও আগে মুক্তি চায়!

ওকে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে দিলেই তবে ও জানাবে বন্দীদের ও কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। তার উত্তরে ওদিক থেকে বলেছে—বেশ কঘণ্টা বাদে ওকে জানানো হবে প্রেসিডেণ্টের উত্তর।

রাগ করে আবার যন্ত্রটাকে কেড়ে নিল গ্রাটেনকো।

তারপর পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল আমিনার মাথার কাছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখল মুংলি কেমন করে ইনজেকশন দিল। ইনজেকশন দেওয়া হয়ে যাবার পর জিজ্ঞাসা করল—এখন একটু ভাল লাগছে তো তোমার? সবাই অবাক হয়ে ভাবল—কি আশ্চর্য। গ্রাটেনকোর মুখে তুমি!

প্রশ্নে কিন্তু আমিনা কোনই উত্তর দিল না। দুচোখ বেয়ে ওর শুধু দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তাই দেখে আবার পাগলের মতন দুচার বার শূন্যে হাত ছুঁড়ল গ্রাটেনকো। তারপর একরকম ছুটেই গুহা থেকে বাইরে চলে গেল।

টম বলল—কিছু বুঝতে পারলে গুরুদিৎ?

বলল—যে কোরেই হোক এর মানে আমাদের বুঝতে হবে।

কাগজটা মাটিতে পাতল গুরুদিৎ।

—একটা কথার মানে আমি করতে পেরেছি—তোমাদের কজনকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলাম মানে কি জানো—তিন। আমরা তো পনের জন আছি সব সুদ্ধ। তমুক্কা দিদি আর গ্রাটেনকোকে বাদ দিলে।

বিলি বলল—তারপর?

—সে কথাটাই পড়বে। কিন্তু প্রতি তৃতীয় নম্বর কথাটা পড়লেও তো কোন মানে হয় না!

টম বলল—সুরু কিন্তু শেষ—লিখেছে কেন?

—সুরু মানে যদি ধরি—আসল সংকেতের সুরু এখান থেকেই—তবে কি হয়?

—তবে শেষ কথাটার কি মানে!

সবাই ভাবতে বসল। হঠাৎ গুরুদিৎ বলল।

—হয়েছে। আচ্ছা দেখ শেষ লাইনটা লিখছে—দাঁড়ি কমা লেখা গুলো কেটে দি তাহলে কি দাঁড়ায়। রাণা কাগজটা তুলে নিয়ে বলল, কিন্তু কোনখান থেকে পড়তে আরম্ভ করব?

—ঠিক—সুরু কিন্তু শেষ দাঁড়ির পর থেকে। বলল গুরুদিৎ রাণা পড়ল,—আমরা রাতেতে ফাহুষটা মজা করে গগনে হঠাৎ বেঁধেছি লোহার কপাট খুলে রোজ মা কাছে ডাকে জলে লঙ্গর খুলে পড়ে গোবিন্দ পঁদর নয়শ সাতাশ বস্তার ধান ঘুণ।

গুরুদিৎ বলল—আচ্ছা এবারে আমরা আবার প্রথম লাইনে ফিরে যাই—তিন সংখ্যাটার কি মানে হচ্ছে? প্রতি তিন নম্বর কথা ধরলেও তো কোন মানে হয় না।

টম বলল—আরও একটা লাইন তোমরা ছেড়ে যাচ্ছ। শেষ লাইনে লিখেছে—দুটো অক্ষরই বাজে। এর মানে কি?

—দাঁড়াও দাঁড়াও। ব্যস্ত হয়ে বলল গুরুদিৎ। গুঁতো খেয়ে মাথাটা এখনও আমার ঝিম ঝিম করছে। নইলে এ সংকেতের মানে খুঁজে পেতে এত দেরী হয়!

বলে ও লেখা গুলোর দিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ খুশিতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—হয়েছে!

—কি হল ? সবাই এক সাথে জিজ্ঞাসা করল।

—কি মোটা মাথা আমার ! আরে প্রতি দিন নম্বরের অক্ষরটাই ধর না তাহলে তো সামনে ছুটো করে অক্ষর একেবারে বাজে হয়ে যাবে। দেখ এবারে নিশ্চয়ই কোন মানে খুঁজে পাওয়া যাবে।

রাণা আবার কাগজটা তুলে নিয়ে থেমে থেমে পড়'ল—রাতে সজাগ হবে। লোক খুঁজছে জঙ্গলে।

গোপন ! সাবধান !!

—সাবাস গুরুদিৎ। বলল হামিদুল। —আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছিল না।

টম বলল—শিগ্‌গির এর একটা উত্তর লেখ সংকেতে। কঘণ্টা বাদেই তো প্রেসিডেন্টের মতামত শুনতে হবে। তখুনি আমাদের উত্তরটাও দিয়ে দেব।

রাণা বলল—এসো গুরুদিৎ এর উত্তরটা আমরা বানাই এখুনি। গ্রাটেনকো ফিরল বলে। তার আগেই লেখা শেষ করতে হবে।

গুরুদিৎ বলল—ওরা যে নিয়মে লিখেছে সে নিয়মেই আমরা লিখব। তাতে ওরা বুঝতে পারবে যে ওদের কথা আমরা বুঝতে পেরেছি।

—সে তো নিশ্চয়ই। বলল—রাণা।

দুজনে বহুক্ষণ ভেবে বহু কাটাকুটি করে শেষ পর্য্যন্ত লিখল—সিনেমা এখানেই সবুজ দাঁড়ি মাঝে মাঝে ছিল কি নীল কমা কচু বা গাজর তুমি খাও দাঁড়ি রস বা গুড়ের হালুয়ায় যদি বল ফন্দী আছে—তা হাওড়ার আতা বা বড়ি নিয়ে এসো দাঁড়ি বোসো দাঁড়ি।

গুরুদিৎ বলল—ঠিক হয়েছে। এখন এখবর পাঠাতে হবে। আর রোজ রাতে আমাদের পালা করে জেগে থাকতে হবে।

টম বলল—ক্যাপ্টেন এখুনি এসো আমরা ঠিক করে ফেলি—কে কখন রাত জেগে পাহারা দেবে। আর কারা কারা দেবে।

এ কাজে সবাই রাজি। কিন্তু ক্যাপ্টেন ছোটদের একেবারে বাদ দিল। ঠিক হল এ দায়িত্ব ভাগ করে নেবে টম বিলি রাণা আর হামিদুল। গুরুদিৎকেও এর থেকে বাদ দিতে হবে। কারণ মুংলি রাজি নয়। ও যে সম্পূর্ণ সুস্থ তার প্রমাণ কই ? শেষে আবার যদি কোন কিছু হয় ?

রুক্মিণী শকুন্তলা আর শান্তার উপরে ভার পড়ল, ওরা সব বাচ্চাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেবে রাত্রি বেলা যদি ডাকা হয় তো কেমন করে চুপচাপ সবাই উঠে চলে আসবে। রাণা বলল—চল এখবর তহুকাদিদিকে শোনানো যাক তার সঙ্গেও এ নিয়ে পরামর্শ করতে হবে। হাজার হোক বয়সে উনি অনেক বড়।

* * *

খবর শুনে মহা খুশি তহুকা।—বলল—আজ না হয় কাল নিশ্চয়ই আমরা ফিরতে পারবো। আর যদি ওরা নাও আসে তবুও।—তা কি করে হবে। বলল রাণা।—আমি বলছি গ্রাটেনকোই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। এ বিশ্বাস আমার হয়েছে।

—কি করে।

—কাল রাতের কথা জিজ্ঞাসা কর মুংলিকে। ও জানে সব। যে মানুষের মনে এখনও দয়ামায়া আছে—সে কখনও আমাদের এত কষ্ট দিতে পারবে না। লক্ষ্য করনি তোমরা—গ্রাটেনকো এখনি কত বদলে গেছে। ও নিজেও আর আমাদের সবার এ কষ্ট সইতে পারছে না।

—কিন্তু ও ফিরে গেলে তো শুনেছি ওর ফাঁসি হবে। তা হলে কি ও ফিরতে পারবে?

—পারবে। খুব নিশ্চিন্ত ভাবে বলল তনুকা—এতগুলো শিশুর জীবনের কাছে ওর জীবনের দামটাকে ও বড় করে দেখতে পারবে না। আমি ওকে ফেরাবো। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রাণা তারপর বলল—কিন্তু ও মরুক এতো আমরা কেউ চাইনা।

এ কথার পর আর কোন কথাই বলতে পারল না তনুকা। সবার মনে যে আশা জেগেছিল তা আবার মিলিয়ে গেল। টম বলল—যদি আপনি ওকে রাজী করাতে পারেন তনুকাদিদি তবে আমরা বাধা দেব না। আমিনার ও আপনার এখুনি হাসপাতালে যাওয়া উচিত।

বিলি বলল—আর আমাদের ভাল করলে আমরা সবাই ওর জন্য এদেশের প্রেসিডেণ্টকে বলবো ওকে ছেড়ে দিতে। উনিও হয়ত শুনবেন আমাদের কথা।

এমন সময় বাইরে থেকে ফিরল গ্রাটেনকো। ফিরে সোজা গিয়ে দাঁড়াল আমিনার কম্বলের কাছে। কেঁদে কেঁদে আমিনা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আস্তে নীচু হয়ে ও হাত রাখল আমিনার কপালে। জ্বর আছে বুঝতে পেরে কেমন যেন অসহায়ের মতন তাকাল। এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজে বার করল মুংলিকে--জিজ্ঞাসা করল-এখন কেমন আছে ও?

একথার কোন উত্তর দিল না মুংলি। মুখ ফিরিয়ে চলে এলো ওখান থেকে। তাই দেখে স্প্রিংএর মতন সোজা হয়ে দাঁড়াল গ্রাটেনকো। ভীষণ ভাবে চিৎকার করে উঠল—কেউ তোরা কথা বলছিস না কেন? কেমন আছে ও এখন?

কাউকে কিছুই বলতে হল না। আপনা থেকেই সবাই মুখ নীচু করে সরে গেল ওর সামনে থেকে।—কেউ কথা বলবে না আমার সাথে! কেউ না?—মজা দেখিয়ে দেব আমি সবাইকে।

হাতপা ছুঁড়ে গর্জন করতে লাগল গ্রাটেনকো। অবাক হয়ে দেখল ও কেউ ওকে আর এতটুকুও ভয় করে না। এমন কি ঐ বাচ্চাগুলোও না। সবাই ওর কাছ থেকে সরে চলে গেছে।

সব কটাকে আমি গুলি করে মারবো কুকুরের মতন। সব কটাকে। দেখিয়ে দেব এ জঙ্গলে গ্রাটেনকোর কথা না শোনার ফল।

হাতের স্টেনগানকে ও সত্যিই বাগিয়ে ধরল। কিন্তু ভীষণ ঘাবড়ে গেল দেখে যে ঐ পাগল ক্যাপ্টেনটা তার বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এসেছে সব কটা গুলিকে একাই বুকে নেবে বলে। ধাঁই করে স্টেনগানটা ছুঁড়ে ফেলে দিল গ্রাটেনকো। কি হবে আর ওটা দিয়ে ওর? এ ছেলেগুলো যখন ওটাকে আর ভয়ই করে না। একি অপমান! এ কি লজ্জা! একি ভীষণ হার ডাকাত গ্রাটেনকোর! মনে হল ওর ও ছুটে এখুনি পালিয়ে যায় উত্তর মাজিনকোর ঘন জঙ্গলে। সে জঙ্গলই ওর ভাল। কোন মানুষের সাড়া সেখানে নেই। নেই মিনিটে মিনিটে মিনিটে এমনি করে কতগুলো খুঁদে শয়তানের হাতে হার মানা। না হয় নাই পাবে ও মুক্তি সারা জীবন ভোরে। ডাকাত গ্রাটেনকোকে তো তবু ভয় করবে সারা দেশ!

পালিয়ে হয়তো সে সত্যিই যেত। কিন্তু থেমে গেল কতগুলো ছোট ছোট ব্যথার আওয়াজ শুনে।

—আঃ আঃ উঃ। আমি জল খাব।—ঘুম ভেঙ্গে গেছে আমিনার স্টেনগানটা পড়ার শব্দে।

ছুটে গিয়ে গ্রাটেনকো জল নিয়ে এলো একটা ছোট পাত্রে। মাটিতে বসে মহা যত্ন করে তুলে ধরল আমিনাকে এক হাতে নিজের বুকের মধ্যে। অন্য হাতে জলের পাত্রটা ধরল ওর মুখের সামনে।

গুহা সুদ্ধ ছোট বড় সবাই তখন অবাক। এক নিশ্বাসে সবটুকু জল খেয়ে ফেলল আমিনা।

আস্তে ওকে আবার শুইয়ে দিল গ্রাটেনকো। উঠে দাঁড়িয়ে ওর গলায় ঝোলানো রেডিও যন্ত্রটা খুলে এগিয়ে ধরল টমের দিকে। দেখতো ঐ মাথা মোটা লোকগুলোর মাথায় নতুন কোন বুদ্ধি খেলল নাকি।

চাবি টিপে ডাকল টম—হ্যালো হ্যালো উত্তরে শুনতে পেল ওদিক থেকে তখনো সমানে বলে চলেছে সেই সংকেত। আর একটুও দেরী করল না টম। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কাগজটা বার করে স্পষ্ট গলায় আস্তে আস্তে পড়ে গেল সব সংকেতটা। একবার দুবার তিনবার। বেশ কিছু সময় ধরে।

—হচ্ছে কি এসব? অবাক গ্রাটেনকো চেঁচিয়ে উঠল। —মাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো তোর?

—না আমি ভালই আছি। বলল টম।

—তবে বন্ধ কর এ ছেলেখেলা। জিজ্ঞেস কর ওরা আমার সর্ত মানতে রাজী কিনা। আমাকে ছেড়ে দিলেই আমি তোদের ছেড়ে দেব।

ওদিক থেকে ওরা স্পষ্ট করে আবার ও বলল: কোথায় লোক নাববে বলতে বল আগে। তাদের হাতে সবাইকে ফেরত দিলেই গ্রাটেনকো ছাড়া পাবে। এর বেশী আর কোন কিছুই বলার নেই।

—তার মানে ওরা আমাকে প্রাণে মারতে চায়। মরতে আমি চাই না। ছটফট করে উঠল গ্রাটেনকো। ওরা কেন একটু সামান্য কিছু বলছে না যাতে আমি বুঝতে পারি আমাকে ওরা দড়িতে ঝোলাবে না। তবেই তো আমি তোদের সবাই কে এখুনি ফেরত দিতে পারি।—আমার প্রাণের দামটা কি এতই বেশী? উঃ উঃ।

ওদিক থেকে ওরা আবার ও বলল—শেষ বারের মতন বলছি সবার সাথে ধরা দিক গ্রাটেনকো। তার পরেই তাকে নিশ্চয়ই মুক্তি দেওয়া হবে।

—না না না। পাগলের মতন চিৎকার করতে লাগল গ্রাটেনকো। মরুক সবাই মরুক। তাই চায় ঐ মাথামোটা লোকগুলো। আমাকে তো মারবে না ওরা মারবে তোদের। বন্ধ কর ঐ কথা বলা কলটা ওটা আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

কেউ বাধা দেবার আগেই। এক লাফে যন্ত্রটা টমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গুহার দেওয়ালে আছাড় মারলো ওটাকে। চুর চুর হয়ে ভেঙ্গে গেল যন্ত্রটা। ফিরে দাঁড়িয়ে মাটি থেকে স্টেন গানটা তুলে নিয়ে ঝড়ের মতন বাইরে চলে গেল গ্রাটেনকো।

প্রেসিডেণ্ট ভাবেন নি যে এত তাড়াতাড়ি ছেলেরা সংকেতের উত্তর দিতে পারবে।

* * *

আরডন বললেন—আমার কিন্তু এ বিশ্বাস বরাবরই ছিল। এখন বলুন কি করা উচিত।

প্রেসিডেণ্ট বললেন।—গ্রাটেনকোর শেষ কথায় বোঝা যাচ্ছে ও নিজে থেকে স্বেচ্ছায় বন্দীদের মুক্তি দেবেনা। সারা দেশের কাগজগুলো এমন কি বিদেশের কাগজগুলো পর্যন্ত আমার গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে যা তা লিখছে। এ অবস্থায় আর আমরা গ্রাটেনকোর দয়ায় বসে থাকতে পারি না।

জেনারেল বললেন। আমার সৈন্যদলও তৈরী হয়ে বসে আছে প্রেসিডেণ্ট হুকুমের অপেক্ষায়। বাকি কাজটা তাদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হোক।

—বেশ তাই হোক। আজ রাতেই এ নাটকের শেষ করা চাই। গম্ভীর ভাবে বললেন প্রেসিডেণ্ট।

—তাই হবে। আজ রাতের অন্ধকারে আচম্কা হামলা করবে ওরা। এখন আসুন ম্যাপ দেখে কোথায় ওদের নাবান হবে তাই ঠিক করা যাক।

আরডন তাঁর ম্যাপটা পাতলো টেবিলের উপরে। তার উপরেই সবাই ঝুঁকে পড়লেন।

আরডন বললেন ওরা যে সংকেত পাঠিয়েছে তার থেকে আমরা জানতে পারছি ওদের বন্দী করা হয়েছে নীচু জমির গুহায়। সেটা কোন জায়গা হতে পারে? আমি যতদূর জানি মাজিনকোর মালভূমিতে কোন নীচু জায়গা নেই। বাদে টিবল্লি নদীর মরা খাদ। সেখানে আমি নিজে যাইনি বটে তবে বহুদিনের বুড়ো কাঠুরে যারা এখনও বেঁচে আছে তারা বলে কয়েকশো মাইল লম্বা ঐ মরা খাদের গোলক ধাঁধায় কোথাও একটা গুহা থাকা সম্ভব। ও গোলক ধাঁধায় মানুষ ঢুকলে বের হওয়া মুস্কিল। লুকাবার পক্ষে ও জায়গাটা খুবই চমৎকার।

জেনারেল বললেন—সংকেতে উত্তর মাজিনকোর কোন জায়গাকে বোঝাতে পারে কি?

—না। বললেন আরডন। উত্তর মাজিনকো আমার ভাল করে ঘোরা আছে সেখানে কোন নীচু জায়গায় গুহা থাকা সম্ভব নয়।

—তাহলে টিবল্লি নদীর দক্ষিণেই আমরা জোর দেব বেশী।

—হ্যাঁ বিশেষ করে মরা নদীর খদে—বললেন আরডন। আমার বিশ্বাস ওখানেই গ্রাটেনকো লুকিয়েছে।

—বেশ একথা আমার মনে থাকবে।

প্রেসিডেন্ট বললেন—আমার কিন্তু একটা অনুরোধ আছে জেনারেল।

—বেশ বলুন।

—আপনার সৈন্য বাহিনী যদি বিনা যুদ্ধে কাজটা উদ্ধার করতে পারে তবেই আমি সব থেকে বেশী খুশি হব। একথা শুনে একটু হাসলেন জেনারেল—বললেন। সে কথাও আমার মনে থাকবে প্রেসিডেন্ট। তবে আপনিও ভুলবেন না শয়তানটার হাতে সব রকমের অস্ত্রই আছে। কদিন আগেই সে টপকীর পুলিশ চৌকী লুট করেছে।

—তা জানি। কিন্তু আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারছিনা অনেকগুলো শিশুর জীবনমরণ নির্ভর করছে কি ঘটবে তার উপরে: সে শয়তান আমার কথা শুনবেনা। আপনার সেনাবাহিনী যেন মনে রাখে আমার অনুরোধ।

দু পায়ের গোড়ালি একসাথে ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন জেনারেল। শান্ত গলায় বললেন—আপনার অনুরোধ আমাদের কাছে আদেশ প্রেসিডেন্ট।

আরডন বললেন—আমারও একটা অনুরোধ আছে জেনারেল।

—বলুন।

—আপনার সেনা বাহিনীর সাথে আমিও নাবব জঙ্গলে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জেনারেল বললেন—বেশ। দ্বিতীয় দলের সাথে আপনি যাবেন হেলিকপ্টরে। সে ব্যবস্থা আমি করব

* * *

প্লেনটা আবার মাথার উপর দিয়ে ঘুরে গেল। বোধ হয় বিকেলের জন্য জিনিসপত্র ফেলে গেল। কিন্তু গ্রাটেনকোর দেখা নেই। সেইযে সে বার হয়ে গেছে তারপর আর ফেরেনি।

এখন কি করা উচিত তা ভাবতে বসল রানা আর টম।

হামিদুল বলল। তুমি হুকুম দিলে আমি আর বিলি যাব দেখতে।

বিলিও তাতে রাজী। কিন্তু ভেবে পেলনা রাণা যাওয়া উচিত হবে কিনা।

পথের খবর যা শুনেছে ওদের কাছ থেকে তাতে মনে হয় ওরা হয়ত বাইরে বার হয়ে যেতে পারবে কিন্তু

ফিরে আসতে পারবে কি চিনে ?

বিলি বলল—একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি।

যদি কাছে পিঠে কোথাও জিনিসগুলো ফেলে থাকে তবে হয়ত সন্ধ্যে হবার আগেই ফিরে আসতে পারবো। তনুক্কা এতক্ষণ চুপ করে ছিল—বলল। আমার মনে হয় তোমাদের যাওয়া ঠিক হবে না। যদি পথ খুঁজে না পাও তবে বিপদ হবে। তাছাড়া আমাদের যখন লোক আসছে—তখন আমাদের সকলেরই এখন এক সাথে থাকা উচিত।

টম বলল—কিন্তু যারা খুঁজতে আসবে তারাও কি এ ভীষণ গোলক ধাঁধার পথ খুঁজে পাবে? হয়ত ওরা এদিকে আসবেই না।

রাণা বলল—সে ভয় আমারও।

বিলি বলল—একটা কাজ করলে হয় না। এসো আমরা গুহার বাইরে আগুন জেলে ধোঁয়া করি। অনেক দূর থেকে সে ধোঁয়া দেখা যাবে। তাতে হয়ত ওরা পথ খুঁজে আসতে পারে।

তনুক্কা বলল—এটা মন্দ বুদ্ধি নয়।

—কিন্তু গ্রাটেনকোও তো সে ধোঁয়া দেখতে পারবে। বলল রাণা—ওকি তখন ক্ষেপে যাবে না?

টম বলল—ওকে আর ভয় করলে আমরা সব সুযোগই হারাবো। আগুন জ্বালানো হোক।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তনুক্কা বলল। গ্রাটেনকোকে সামলাবো আমি। তোমরা আগুন জ্বালো। বেশ বড় আগুন যেন খুব ধোঁয়া হয়।

—বেশ এসো তাই করি আমরা।

যেখান থেকে যা কিছু পেল তাই এনে ওরা জড়ো করল গুহার বাইরে একটা জায়গায়। শুকনে কাঁটা ঝোপ ভেঙ্গে এনে তার উপরে চাপালো হামিদুল। বিরাট একটা স্তূপ হলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল টম। পট পট শব্দ করে আগুন জ্বলে উঠল। বাইরে তখন বেলা পড়ে এসেছে। আগুন একটু জ্বলে উঠতেই একটা ভিজে কম্বল এনে তার উপরে ফেলল টম। দেখতে দেখতে ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগল আকাশের দিকে। তাই দেখে মহা আনন্দে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল বাচ্চার দল।

—আরও যা কিছু পারো এনে ফেল আগুনে। ব্যস্ত হয়ে বলল রাণা।

সবাই ছুটল হাতের কাছে যা পায় তাই এনে আগুনে ফেলতে। আগুনকে এখন নিভতে দেওয়া হবে না। বন্ধ যেন না হয় ধোঁয়ার কুণ্ডলি। আকাশের অনেক দূর পর্যন্ত যেন তা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে পারে। তবেই না দেখতে পারবে বাইরের জগতের লোকেরা।

সবাই ব্যস্ত আগুন নিয়ে। কারও কোন দিকে খেয়াল নেই। ধোঁয়ায় সকলের চোখ জ্বালা করছে। ছুটে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়েই আবার দাঁড়াচ্ছে তারা আগুনের পাশে। খিদের কথা ভুলে গেছে ওরা। ভুলে গেছে গ্রাটেনকোর কথা। সবার মনে এক কথা—প্লেন আসছে না কেন? কেন কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না বাইরের লোকদের? তবে কি সব চেষ্টাই ওদের মিথ্যে হয়ে গেল? আগুন ক্রমে নিভু নিভু হয়ে এলো। ধোঁয়ার কুণ্ডলিও ছোট হতে হতে এক সময়ে হাওয়ায় মিশে গেল। প্রায়নিভন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে সবার মন খারাপ হয়ে গেল। কেউ তাহলে এ আগুন দেখতে পায় নি।

দুহাতে চোখ মুছে শেষ বারের মতন আগুনের দিকে চোখ ফেরালো রাণা। আগুন পেরিয়ে সোজা সামনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই বুকের রক্ত ওর ভয়ে জমে গেল। আগুন পেরিয়ে ঠিক সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে

গ্রাটেনকো। যেন একটা পাথরের মূর্তি। হাতে ধরা ওর স্টেনগান। কি করবে ভেবে পেল না রাণা। আস্তে হাত দিয়ে ঠেলা দিল ও পাশেদাঁড়ান টমকে। চমকে টম ফিরে তাকিয়ে থমকে গেল। একে একে সবাই দেখল গ্রাটেনকোকে। কারও মুখে কোন কথা নেই। কেউ জানে না এখন কি ঘটবে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে রাণা বলল। সকলে ভিতরে চল। আর বাইরে থাকার দরকার নেই। এসো আমার সাথে।

নিঃশব্দে সবাই ভিতরে ঢুকল। এত চিৎকার এত কথাবার্তা হঠাৎ এমন করে থেমে গেল কেন। ঘাড় ঘুরিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে চেষ্টা করল তনুক্কা। তবে কি গ্রাটেনকো ফিরেছে? নিশ্চয়ই। নইলে অমন করে সবাই ফিরে আসতো না।

ভিতরে ঢুকে রাণা সোজা এসে দাড়ালে তহুক্কার পাশে।

—ফিরেছে গ্রাটেনকো? জিজ্ঞাসা করল তহুক্কা।

—হ্যাঁ। ছোট্ট করে একটা উত্তর শুধু দিল রাণা।

—উঃ এখন যদি আমার পা দুটো ঠিক থাকত। ছটফট করে উঠল তহুক্কা।—তোমরা সবাই ভিতরে এসে এদিকে বস। আগে আমি কথা বলব গ্রাটেনকোর সাথে। তোমরা সবাই চুপ করে থাকবে।

সবাই ওর হুকুম মতন গুহার অনেক ভিতরে সরে এল। ঠিক তখনি নিঃশব্দে গ্রাটেনকো গুহার মধ্যে ঢুকল।

গানটা অবহেলায় দেওয়ালের একপাশে নাবিয়ে রেখে শান্তভাবে এসে দাঁড়াল আমিনার বিছানার পাশে।

মুংলি সাহস করে বলল—ও এখন একটু ভাল আছে। ইনজেকশনে কাজ দিয়েছে।

এসব কথার ও কোন জবাবই দিল না। একটু ঝুঁকে আমিনার কপালের উপরে হাতটা রাখল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর নিঃশব্দেই আবার বার হয়ে গেল।

সবাই অবাক? এ কেমন হল। কোন কথাই গ্রাটেনকো জিজ্ঞাসা করল না! চেঁচালো না। তাতেই যেন ওকে বেশী মানাতো। এ গ্রাটেনকোকে তো ওরা কেউ চেনে না।

তহুক্কা ডাকল—ক্যাপ্টেন।

—হ্যাঁ বলুন।

—একটু সাহস করে একটা কাজ তোমাকে করতে হবে।

—কি কাজ?

—বাইরে গিয়ে দেখ গ্রাটেনকো কোথায় গেল। ওকে বল আমি ডাকছি। আমার মনে হয় ও আসবে।

—আমি যাচ্ছি এখুনি।

বাইরে এসে গ্রাটেনকোকে কোথাও দেখতে পেল না রাণা। এত অল্প সময়ের মধ্যে ও গেল কোথায়? কিছুটা এগিয়ে এদিক ওদিক একটু খুঁজে দেখল ও। না কোথাও ত নেই। অনেক দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরে এল রাণা।

—ওকে কোথাও পেলাম না।

সে কি? ও গেল কোথায়? অবাক হয়ে তনুক্কা বলল।

টম বলল—আমার মনে হয় ও গেছে প্লেনের মালগুলো নিয়ে আসতে, এখুনি ফিরবে ও।

—হয়তো তাই। বলল তহুক্কা।—যাই হোক ও ফিরলে আগে আমি কথা বলব ওর সাথে, মনে থাকে যেন একথা।

—আচ্ছা। বলল রাণা।

টম যা বলেছিল ঠিক তাই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গ্রাটেনকো ফিরল বোঝা বয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বোঝাটা গুহার এক পাশে নামিয়ে ও বোধ হয় আবার বাইরেই চলে যাচ্ছিল।

তহুক্কা ডাকল—শোন গ্রাটেনকো।

ডাক শুনে দাঁড়াল গ্রাটেনকো।

—তোমার সাথে কথা আছে আমার। দরকারি কথা।

—আমার সাথে দরকারি কথা? গ্রাটেনকো ফিরে বলল। আমার সাথে তো কেউই কথা বলে না।

—আমি বলব। এসো এদিকে। এসে বোস। একটু ইতস্তত করল গ্রাটেনকো। সে শুধু কিছুক্ষণের জন্য। তারপর হঠাৎ এগিয়ে এসে ধপ করে বসে পড়ল মাটির উপরে তহুক্কার কাছে।

—কোথায় যাচ্ছিলে তুমি?

—তাতে তোমার কি দরকার?

—আমাদের ফেলে তুমি যেতে পারবে না।

—থেকেই বা কি করব আমি? আমাকে আর কিসের দরকার তোমাদের?

—অনেক দরকার আছে। তোমাকে ছাড়া আমাদের চলবে না।

—আমি ডাকাত আমাকে দিয়ে তোমাদের কোন কাজই হবে না।

—গ্রাটেনকো আগে তুমি মানুষ তারপর তুমি যাই কিছু হওনা কেন।

—মানুষ! আমি!

—হাঁ গ্রাটেনকো। আমরা ফিরে যাব না বাড়ি?

—হাঁ যাও। আর আমি বাধা দেব না।

—কিন্তু যাব কেমন করে? সে কথাটা ভেবেছো?

—ধোঁয়ার নিশানা দেখে ওরা এসে যাবে। ওদের সাথে ফিরে যেও তোমরা।

—যদি না আসে? যদি ওরা এ গুহায় আমাদের খুঁজে না পায়, তবে?

একথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল গ্রাটেনকো তারপর বলল—আমাকে তুমি কি করতে বল?

—কাল সকালে তুমিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তুমিই তো আমাদের এনেছো এখানে।

—তা হবে না। আমি বাঁচতে চাই। আমি বাঁচতে চাই।

আমরাও বাঁচতে চাই। আমরা বাঁচলে তুমিও বাঁচবে।

—কেমন করে! ফাঁসির দড়িতে ঝুলে?

—না গ্রাটেনকো, ও তোমার মিথ্যা ভয়।

—ভয়! হাঁ সে ভয় আমার আছে। তবে তা মিথ্যা নয়। ভুলে যেওনা, আমি খুনী আসামী। আমার মাথার দাম বহুটাকা।

—গ্রাটেনকো সে কথা আমরা বহুবার শুনেছি। কিন্তু তবুও বলছি তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। তাহলে আমরা বাঁচব। আমরা বাঁচলে তুমিও বাঁচবে। আমরা সবাই বলব প্রেসিডেন্টকে দয়া করতে। তিনি শুনবেন সে কথা।

—বিশ্বাস করিনা আমি এ ছেলেমানুষি কথা। অন্য কিছু বল।

—এত ভয় তোমার! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল তহুক্কা। তাকিয়ে দেখ তো একবার এই সব শিশুগুলোর

দিকে। দেখ ভাল করে গ্রাটেনকো। এদের সবার জন্যও তোমার মরতে ভয় করে? বেঁচে আছ তুমি এখন? এই কি বেঁচে থাকা? এমন করে মানুষ বাঁচে? এতো জঙ্গলের পশুর জীবন। তাড়া খেয়ে তাড়া করে বেঁচে থাকা। .এমন পশুর মতন বেঁচে থাকার চেয়ে না হয় মরলে এই সব ছোট্ট শিশুগুলোর জন্য। তাহলে তো অন্তত এই সব শিশুগুলোর মনের মধ্যে চিরকাল তুমি বেঁচে থাকতে পারবে। এখন সবাই তোমাকে ভয় করে, ঘেন্না করে। তখন এরা তোমাকে ভালবাসবে। তোমার জন্য কাঁদবে।

—চুপ কর চুপ কর। এসব কথার কোন মানেই আমি বুঝিনা। আমি ভুল করেছি তোমাদের বন্দী করে। আমার সব কিছু তোমরা গোলমাল করে দিয়েছো। এখন চাইছো আমাকে মারতে।

—না গ্রাটেনকো এরা তোমাকে বাঁচাতে চায়। এরা তোমাকে ভালবাসে।

—মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা! সবাই আমাকে ঘেন্না করে। সবাই ঘেন্না করে। ভয় পায় আমাকে।

অমন ভীষণ ডাকাতটা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। চুপ করল তনুক্কা। মুংলি ওর দল বল নিয়ে বোঝাটা খুলে ফেলেছিল এরি মধ্যে। তাড়াতাড়ি খাবারের বোঝাটা থেকে সবাইকে খাবার দিতে সুরু করে দিল। কারও মুখে কোন কথা নেই—নিঃশব্দে সবাই খেতে সুরু করল? বাইরে কখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বাতি জালার সময়ও হয়েছে। কিন্তু কে জ্বালাবে? কান্না থামিয়ে গ্রাটেনকো দুইহাটুর মধ্যে মাথা গুঁজে সেই যে বসেছে ওর নড়া চড়া নেই।

তনুক্কাই ডাকল—গ্রাটেনকো। ওঠো। তোমার খাবার খেয়ে নাও। আমরা জানি আমাদের খোঁজে আজ রাতে লোক আসতে পারে। এলে ভালই। না হলে কাল সকালে তুমি আমাদের নিয়ে রওনা দেবে। মুংলি ওর সামনে খাবার নিয়ে এসে দাঁড়াতেই গ্রাটেনকো উঠে বার হয়ে গেল গুহা থেকে। ওকে বার হয়ে যেতে দেখে রাণা চেঁচিয়ে উঠল।

—যেওনা গ্রাটেনকো। শোন—অন্তত তোমার খাবার নিয়ে যাও।

ফিরেও তাকাল না গ্রাটেনকো। বাইরের অন্ধকারের মধ্যে হন হন করে মিলিয়ে গেল ও।

—যাব আমি ওকে ডাকতে? জিজ্ঞাসা করল রাণা।

—না। বলল তনুক্কা। এ অন্ধকারে আর বাইরে যেতে হবে না তোমাকে। ও ফিরে আসবে দেখো।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে গ্রাটেনকোর লুকান ভঁাড়ারে ঢুকল রাণা আর হামিদুল কতগুলো মশাল বানাতে। কোন কিছুর অভাব রাখেনি গ্রাটেনকো। বেশ কয়েকটা মশাল বানিয়ে তার একটা জ্বালিয়ে নিয়ে ফিরল ওরা।

সেটাই গুহার মুখে পুঁতে শোবার ব্যবস্থা করল ওরা।

রাণা বলল—আজ রাত থেকেই আমরা পালা করে জাগবো। প্রথমেই আমি।

টম বলল—আমাদের প্রধান কাজ হবে মশালটাকে জ্বালিয়ে রাখা যেন পথ খুঁজে পায় অন্ধকারে যারা আসবে তারা।

ঠিক হল রাণার পর জাগবে হামিদুল। তার পর বিলি। সবার শেষে টম।

গ্রাটেনকোর ফেলে যাওয়া স্টেনগানটা ওরা লুকিয়ে রাখল একটা দেওয়ালের ফাটলে। ওটা ছুঁড়তে পারে এমন কেউ নেই। কিন্তু ফিরে এসেও যাতে গ্রাটেনকো ওটা খুঁজে না পায় তার জন্য।

বলা তো যায় না কখন ওর মাথায় কি বুদ্ধি খেলবে।

সবাইকে শুয়ে পড়তে বলল রাণা।

তনুকা বলল—দরকার পড়লে আমাকে যেন ডাকা হয়। রাণা গিয়ে বসল গুহামুখের কাছে' বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ও যেন কেমন হতাশ হয়ে গেল। এই গোলক ধাঁধার মধ্যে কি বাইরের লোক ঢুকতে পারবে? কারা আসবে ওদের খোঁজে? তারা কজন? অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসবে কি তারা? ডাক্তার থাকবে কি তাদের সাথে? গ্রাটেনকোই বা গেল কোথায়? কি মতলব আছে তার মাথায় কে জানে? একটুখানি আকাশ দেখা যাচ্ছে উঁচু জমি পার হয়ে। সেখানে হাজার তারার আলো মিট মিট করে জ্বলছে। সে দিকে তাকিয়ে নানান কথা ভাবতে লাগল রাণা। ক্রমশঃ

একটি বিরাট চিন্‌তে

চুনী দাশ

সাহুর বড় ইচ্ছে করে
দোকানেতে যায়
বিস্‌কুট টফি লজেন্‌স কিনে
সাধ মিটিয়ে খায়!

পয়সাও যে জমলো অ-নেক
এক দুই তিন চার
উল্‌টে পাল্‌টে ওদের সাহু
গুন্‌ছেই বারে বার!

রোজই খালি বলছে সবে,
বড় হলেই যেও
যা খুশি তাই কিনে তখন
ইচ্ছে মতন খেয়ো।

জামা জুতো হচ্ছে ছোট
বুঝছে সাহু পষ্ট,
তবু ওকেই—বলছে ছোট
ওই তো সাহুর কষ্ট!

সাহুর মনে তাই ত এখন
একটি বিরাট চিন্‌তে,
বিস্‌কুট টফি লজেন্‌স্ সাহু—
কখন যাবে কিন্‌তে!!

পাপের সাজা

'বিশ্বপ্রিয়'

বক্ বকম পায়রাদের আস্তানা-রায় বাড়ির বার দেউড়িতে। এদিকে একটানা লম্বা কার্নিশ। নিচেয় গোটা চার বড় বড় থামের খিলান। তারই ফাঁকফোকরে জোট বেঁধে থাকে ওরা।

মুক্কি, লোটন, গোলা, গেরুবাজ—সব কটার নামও ছাই জানে না রিন্টু। এ বাড়ির জানালা খুললে ও বাড়ির ছাদ দেখা যায়। সকাল বিকাল ঐ ছাদের ওপরেরই ঘোরে পায়রাগুলো।

ঝাঁক ঝাঁক পায়রা। কত রঙের—কত রকমের। সাদা, কালো, খয়েরি বুটিদার, ছিট্, পাঁশুটে, চাঁদ কপালী, নীল-কণ্ঠী। কোনোটার পেখম মেলা,—কোনোটার আবার ঝুঁটি বাঁধা। ঘুরছে ফিরছে। ঠোঁটে করে ঠুকে ঠুকে দানা খুঁটছে। নয়তো, ইচ্ছে হলতো—দল বেঁধে ফড় ফড় করে উড়ে
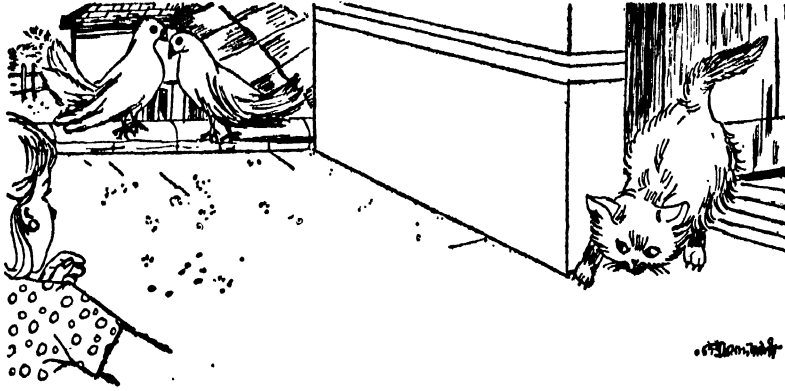
গেল আকাশে। গোটা দুই চক্কর দিয়ে এপাশ থেকে ওপাশের আল্‌সেতে গিয়ে বসল আবার।

রিন্টু লক্ষ্য করে এ সব। আর লক্ষ্য করে রায়গিন্নীর গালগলাফোলা, দুধসাদা লোমে ঢাকা ম্যাও ম্যাওকে। বেড়ালতো নয়—রায় বাড়ির সোহাগী পোষ্য। বাড়িতে বাটি ভর্তি ভর্তি দুধ খায়। খায় তাজা মাছের ভাজা পেটি। এত খেয়ে খেয়েও—ঐ ছোঁচাটার রাক্ষুসে খিদের আশ মেটেনা। ও চায় তাজা রক্ত। কাঁচা মাংস।

তাই লোভী দৃষ্টিজোড়াকে আধবোজা করে সব সময়ে বক্ বকমদের লক্ষ্য করে। আর মাঝে মাঝে আল্‌সেমির হাই তুলে এমন ভাব দেখায়—যেন, আমি কিছুই দেখছি না অথচ মনে মনে মতলব—সুযোগ মত একটাকে যদি পায়তো এক্ষুনি ঘাড় মুটকে ধরে রক্ত চোষে। হাড় মাংস মুড় মুড়িয়ে চিবিয়ে খায়।

সেদিন সকালে—বক্ বকমরা ছাদে ঘুরে ঘুরে দানা খুঁটছিল। এমন সময় ম্যাও ম্যাও কানিসের ধার ঘেঁসে ঘেঁসে চুপিসাড়ে এগিয়ে আসে। যেই না ওকে দেখা—বক্ বক্‌মরা সবাই ভয়ে ভয়ে জড়সড়। বক বক্‌মদের সর্দার তা' বুঝতে পেরেই চেঁচিয়ে ওঠে,—

বক্‌ম্‌ বকম—রকম সকম দেখে মনে হয়—
ম্যাও ম্যাওটার মনের গতি মোটেই ভাল নয়।
বাঁচতে যদি, সাধ থাকে,
পালাই রে চ' এই ফাঁকে :
নয়তো বিপদ ঘটবে কিছু—নেই তাতে সংশয়।

সর্দারের সতর্কতায় সজাগ হয় সকলে। ঝট্‌ পট্‌ ডানা মেলে দিয়ে উড়ে যায় আকাশে। গোটা ছাদটা জুড়ে চক্কর দেয় ঝাক বেঁধে বেঁধে।

বাড়াভাতে ছাইপড়া অবস্থা তখন ম্যাও ম্যাওয়ের। তবু নিরীহ, কত যেন ভাল মানুষটির মত গলায় বলে,—

বকম বকম পায়রা ভাই—
ঘরে থাকায় সুখ যে নাই,
তাই এসেছি খেলতে তোদের সনে :
আমায় দেখে ফুরুৎ করে—
দল বেঁধে সব পড়লি সরে,
ভয়টা তোদের কিসের এত মনে ?

কয়েকটা সাহসী পায়রা উড়ে গিয়ে চিলে কোঠার ছাদে বসেছিল। তাদের মধ্যে একজন উত্তর

ম্যাও ম্যাও ম্যাও হতচ্ছাড়ি :
গোম্‌দা মুখী কেলে হাঁড়ি, তোর চাতুরীর ধারা—
পাখ্‌পাখালী সবাই বোঝে
কেউ ভেড়ে না তাই সহজে—তোর কাছেতে তারা

তাই না শুনে এক বিঘৎ লম্বা জিব্‌ কেটে ম্যাও ম্যাও—বলল—

ছিঃ ছিঃ ছিঃ এমন কথা শুনলেও পায় হাসি—
নিন্দুকেরা দোষে আমায়, জেনে বাঘের মাসি।
বকম্‌ বকম্‌ পায়রা জুটি :
তোরা তো ন'স হিংসেকুটি,
তবে কেন খেলতে কি দোষ থেকে পাশাপাশি ?

ম্যাও ম্যাওয়ের মিষ্টি কথা শুনেও কারো মন গলেনা। সকলেই জানে ওর স্বভাব। ইঁদুর ছুঁচোরা তো ওকে সব সময়েই এড়িয়ে চলে। আর পাখিরা ? তারাও ভয় পায় যথেষ্ট। ঠিক যমের মত। তাই বক্‌ বকম্‌দের একজন ওকে মুখ ভেংচে বলে ওঠে,—

থাক থাক থাক—বড়াই জাহির
করিস নে আর পাজি :
সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে—
চলবে না কারসাজি।

এই না বলেই সে চত্বর থেকে সবাই দে চম্পট। একেবারে ম্যাও ম্যাওয়ের নাগালের বাইরে!

ফাঁকা ছাদ। মনের ক্ষোভ মনে ঢেকে-'মিঁয়াও' করে একটা করুণ ডাক ছাড়ে ম্যাও ম্যাও। শেষে গুটি গুটি পায়ে নিচের তলার দিকে পা বাড়ায়।

ম্যাও ম্যাও চোখের আড়াল হতেই-বক্ বকমরা নিশ্চিন্তি। আবার এক সময় আকাশ ছেড়ে নেমে আসে ছাদের ওপর। 'বকম্ বকম্ আওয়াজ তোলে গালগলা ফুলিয়ে। চাল গমের ছড়ানো দানাগুলো খুঁটে খুঁটে খায়।

রিন্টু লক্ষ্য করে—মোটা সোটা ধাড়ীগুলো চার ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাচ্ছাগুলো আছে, মাঝখানে। ওদের মধ্যে দুটোর জুটি, কখন এক সময় যেন দল ছেড়ে একটু নিরিবিলিতে সরে এসেছে। বসেছে কার্নিশের একেবারে ধার ঘেঁসে। আদর করে কখনো কখনো এ ওর গা মাথা চুলকে দিচ্ছে।

এই সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল ম্যাও ম্যাও। নিচেয় ও নামেনি। লুকিয়ে তাক করে বসেছিল সিঁড়ির মুখোমুখি দরজাটার আড়ালে। এখন নিরিবিলিতে-আনমনা দুটো পায়রাকে বসে থাকতে দেখে, ওখান থেকেই লাফ দিয়ে ওদের ঘাড়ে পড়বার চেষ্টায় উঠে দাঁড়ায়। আনন্দে ফোলানো লেজটাকে এপাশে ওপাশে দোলায়।

রিন্টু ভাবল-এই যা,! গেল বুঝি নিরীহ প্রাণী দুটো। রায়গিন্নীর ঐ সোহাগী বেড়াল এক্ষুনি হয়তো ছিঁড়েকুঁড়ে খাবে ওদের! ইস্! না, কখনোই হতে দেবে না রিন্টু। হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায় একটা মজার কথা! শিমুলতলার বাড়িতে রাঙাদা'কে কতদিন দেখেছে হাততালি দিয়ে পায়রা উড়িয়ে দিতে। চটাচট্ হাততালি দিলেই পায়রারা কেমন চমকে ওঠে। হয়তো ভয় পায়। সঙ্গে সঙ্গে তাই ঝাঁক বেঁধে ডানা মেলে দেয় আকাশে।

রিন্টু বুঝল—এই হচ্ছে ওদের বাঁচাবার একমাত্র উপায়। যেই ভাবা সেই করা। চটা চট্ আওয়াজ তুলে সজোরে হাততালি দেয় রিন্টু। সেই মুহূর্তে ম্যাও-ম্যাও দেয় জোর লাফ।

এদিকে হাততালির আওয়াজে চমকে উঠেই—কিছু না বুঝেই পায়রা দুটো ঝট পট্ উড়ে যায় সেই সঙ্গে ছাদের আর আর পায়রারাও। আর ম্যাও ম্যাও? আহা বেচারী! তাক্ কষে লাফ দেওয়াটাই তার ফস্কে যায়। শিকার ধরতে তো পারেই না—উল্টে, কার্নিশ টপ্কে, ছিট্কে গিয়ে পড়ে নিচের তলার বারান্দায়। ফলে সামনের একটা পা যায় বেমকা মুচ্কে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ককিয়ে ওঠে ম্যাও ম্যাও।

শয়তানটার দুরবস্থা দেখে ভারি মজা পায় রিন্টু। তাই ওকে শোনাতে হাততালি দিতে দিতে চেঁচিয়ে ওঠে,—

ঠিক হয়েছে—বেশ হয়েছে—যেমন তুমি পাজি:
হাতে হাতেই দুষ্টুমিটার ফলটা পেলে আজি।

রিন্টুর কথা শুনে ম্যাও ম্যাও কিছুই বলেনা। একবার শুধু করুণ চোখদুটো তুলে রিন্টুর দিকে একটু তাকায়। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোথায় যেন চোখের আড়ালে সরে পড়ে।

রিন্টু তখনো চ্যাঁচায়—

কেয়া মজা-ফুড়ুৎ হল বক্ বক্‌মের জোড়া—
মাঝের থেকে ম্যাও ম্যাও টার, ঠ্যাঙ্ হল খোঁড়া॥
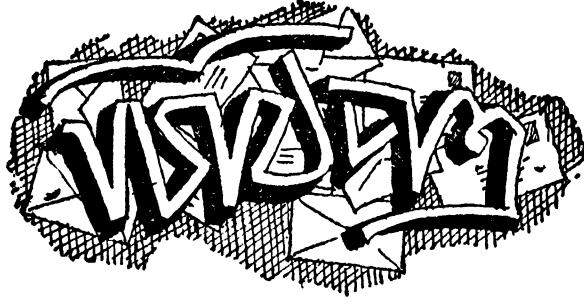
এ মাসেও সন্দেশ বেরোতে দেরী হল। এক-একটা সন্দেশ ছাপতে ত মাসখানেক সময় লাগে। কাজেই একবার দেরী হয়ে গেলে আর সহজে সেটা ঠিক করে নেওয়া যায় না। বৈশাখ মাসের মধ্যে ঠিক করে নিতে চেষ্টা করছি। চৈত্রমাসের সন্দেশও তোমরা কয়েকদিন দেরীতে পাবে।

(১) অঞ্জন ভট্টাচার্য ২৩৬১, বয়স ১৩

শুনেইছো তো ব্রাণ্টালুসি দুর্ঘটনার লেখক হলেন শিশির মজুমদার। ওটা ছাপার ভুল। হ্যাঁ, ভাই, ছবি নীল কালিতেও চলবে। কিন্তু কুচি কুচি কাগজে ছবি এঁকে কেউ কেউ পাঠায়, তা কর না।

(২) তাপস শূর রায়, ২৯৫৫, বয়স ১১

'কবিতা স্যার' ভালো লেগেছে শুনে খুশি হলাম। লেখক অজেয় রায়ের বেশি বয়স নয়। তোমাদের কি ভালো লাগে না লাগে তাও যেমন জানেন, আবার তেমনি ফাঁকতালে তোমাদের অনেক চিত্তগ্রাহী নতুন বিষয় শিখিয়েও দেন।

(৩) শালা সাহা,

না ভাই, ধাঁধাটি চলল না। তার কারণ যে বাদ্য-যন্ত্রের কথা লিখেছ, সেটি "বিনা" নয়, "বীণা"। আরো লিখতে থাকো।

(৪) অণুতোষ ও অশোক চট্টোপাধ্যায়, ১৮২৭, বয়স ১৬, ১৪

ভাদ্র আশ্বিন মিলে যে মোটা সংখ্যা বেরিয়েছিল, সেটিই মহালয়ার আগে বেরিয়েছিল, যাতে তোমরা পুজার ছুটিতে আনন্দ করে পড়তে পার। পরবর্তী সংখ্যাটিতে পূজার জন্য পাঠানো ও সংগৃহীত কয়েকটি ভালো লেখা বেরিয়েছিল, কাজেই ওকেও একটি বিশেষ সংখ্যা বলা চলে। এটিও একটু বড়-ই বলতে হবে। লেখা পাঠিও, ভালো হলে ছাপব, তবে কবে ছাপা হবে সেটা জায়গার উপর নির্ভর করছে।

(৫) লীনা, ১৯৩৮, পদবী কি, বয়স কত না দিলে কি করে উত্তর দিই? তবে পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্যও খুসি হয়েছি বলা বাহুল্য।

(৬) মিত্রা রায়চৌধুরী ১৪২৫, বয়স ১৩½ তোমার শুভেচ্ছা পেয়ে আমরা খুসি।

(৭) সৌমিত্র সেনগুপ্ত, ২৮১৯, বয়স ১০ ছবি ভালো হলেই ছাপানো হবে। বাঁ হাতে কাজ কর লিখেছ, কিন্তু জানতো পৃথিবীর সব যন্ত্রপাতিই যারা ডান হাতে কাজ করে তাদের জন্য তৈরি। সঙ্গে সঙ্গে ডানহাতেও অভ্যাস কর।

(৮) চৈতালী সান্যাল, ২৬১২, বয়স দাওনি কেন ?

(৯) নিশীথরঞ্জন, নীতীশরঞ্জন, সমীর ও মিতালী গুহ ১৬০৩, বয়স ১৩, ১২, ১০, ৬।

তোমরা ছুটিতে বেড়িয়েছ শুনে খুসি হলাম। যেখানে যখনি যাবে সর্বদা দেখবার মতো কিছু থাকলে ভালো করে লক্ষ্য করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কেউ দেখে না এমন ছোটখাটো জিনিস থেকেও অনেক সময় খুব মজা পাওয়া যায়।

(১০) অর্পিতা রায়চৌধুরী, ২৮৩৭, বয়স ১১ পূজার সন্দেশ ভাল লেগেছে শুনে যেমনি খুসি হলাম, মলাটের ছবি কেন অন্যান্য বইয়ের মতো চকচকে হয়নি, একথা শুনে তেমনি হতাশ হলাম। যখন হাতে সময় পাবে, একটু মন দিয়ে মলাটটাকে দেখো তো। যদি কিছু পাও।

(১১) শুভা বিশ্বাস, ২০২৯, বয়স ১৫

তোমাদের তিন বোনের কৃতিত্বের জন্য আমাদের অভিনন্দন জানাই। কিন্তু কৃতী হওয়ার আনন্দে যেন ব্রতী হতে ভুলে যেও না।

(১২) কুশল সেনগুপ্ত, ২৮৯৫, বয়স ৯½।

তোমার ধাঁধার উত্তর 'অপর পৃষ্ঠায় দেখুন' লিখেছ, কিন্তু অপর পৃষ্ঠায় তো দেখতে পেলাম না, ভাই। নতুন করে লিখে পাঠিও।

(১৩) শুভ্রা সান্যাল, ২৫৯৯, বয়স ১২।

অরু-মিতুর কথা আর ব্রান্টালুসি দুর্ঘটনা, দুটি দুরকমের গল্প, কিন্তু দুই-ই উপভোগ্য, এ-কথা সত্যি। কিন্তু ১২ বছর বয়স হল, এর মধ্যে মনে রাখার মতো কোনো ঘটনা ঘটে নি, কাউকে দেখ নি, কোথাও যাও নি, তাই বা কি করে সম্ভব হতে পারে ?

(১৪) সন্দীপন দেব, ২০৪০, বয়স ৭।

আগের লেখার কথা তো বলতে পারছি না, ভাই। ভালো হলেই ছাপাই। নতুনটা লিখে পাঠাও না কেন ? খুব বেশি বুড়ো তো আর হও নি।

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

রাসনা, নীলাঞ্জন আর আমি

জীবন সর্দার

বহুদিন আমার বন্ধু নীলাঞ্জনের খোঁজখবর না পেয়ে তাকে খুঁজতে তাদের গ্রামে গিয়েছিলাম।

আমগাছে নতুন পাতা হলে সে বছর তাতে আর মুকুল আসে না—কথাটা সত্যি কিনা তার কাছ থেকে শুনে তা' যাচাই করতে চেয়েছিলাম। তার ঘরে তার দেখা না পেয়ে, একটি চিঠিতে—'আমি এসেছিলাম' লিখে রেখে বেরিয়ে এলাম।

তাদের গ্রামের শেষে পথের ধারের বড় আমগাছটার তলা দিয়ে যেতে যেতে দেখি মগডালে বসে নীলাঞ্জন একমনে কি দেখছে। আমি তাকে ডাকলুম। সে বললে, ভয় নেই উঠে এসো।

ডাল বেয়ে অনেক কষ্টে তার কাছে পৌঁছে দেখি আতস কাঁচ দিয়ে সে 'রাসনার' শেকড় দেখছে। বললে, আরও কিছুদিন আগে এলে এই অরকিডের ফুলগুলো দেখতে পেতে।

বললাম, অরকিড! সে তো হয় পাহাড়ে বনে। এখানে গ্রামের ভেতর সে জিনিস কেমন করে পেলে।

'রাসনা'ও একজাতের অরকিড, জান না বুঝি? শেকড় শুদ্ধু রাসনার একটি ডাল তুলে এনে আমার সামনে ধরে বললে, কি দেখছ?

বললাম, 'লম্বা লম্বা, পুরু সবুজ পাতায় একদম ঢাকা কোমল একটি কাণ্ড। পাতাগুলির গোড়া একটির উপর অন্যটি এমন করে ঢেকে আছে যার ফলে কাণ্ডটি দেখাই যাচ্ছে না।'—'এই যে শেকড়টি', আমার কথার মাঝখানেই সে বলতে শুরু করলে, 'এটি 'অবরোহ'—কাণ্ডের গা থেকে বেরিয়ে হাওয়ায় দুলছে, হাওয়া থেকেই এটি জল শুষে নিতে পারে। গরম দেশের অরকিড মাত্রেই পরগাছা কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ দেশে মাটিতেও অরকিড হতে দেখবে।

তাই নাকি! রাসনা যে অরকিড কোনকালেই আমার মনে হয়নি। অরকিডের কথা শোনার জন্য তার পাশে ডালের উপর ভাল করে বসলাম। বললাম, 'এত কিছু দেখার রয়েছে, সব ফেলে গাছের ডালে বসে অরকিড দেখার ঝোঁক এলো কেন তোমার।'

'অরকিডের ফুল আমাকে আকর্ষণ করে। ফুলগুলোর রং, গড়ন এমন হঠাৎ দেখে মনে হয়

ওগুলো কোনজাতের মৌমাছি কিংবা প্রজাপতি। এই ধরণের ফুলের জন্যেই হয়তো একসময়ে দেশ-বিদেশে অরকিডের আদর বেড়ে গিয়েছিল। অরকিড জোগাড় করতে দূরদুরান্তে চলে যেত মানুষ। আমি তাঁকে থামিয়ে জিগগেস করলাম, 'দূরদুরান্ত থেকে সজীব অরকিড ফুল নিয়ে আসা কি করে সম্ভব হোতো? গাছ থেকে ফুল ঝরে যেত না'!

'ফুল যাক, গাছ নিশ্চয়ই থাকতো। 'রাসনার' মুল আর কাণ্ড দেখেই বুঝতে পারছ বাতাস থেকে জল শুষে বেশ কিছুদিন সে বেঁচে থাকবে'—নীলাঞ্জন বললে। 'রাসনার কথা বাদ দাও, আরও অনেক রকম অরকিড তুমি দেখতে পাবে আসাম আর হিমালয়ের জংগলে যাদের নরম কাণ্ড আলুর মত ডুমো ডুমো। যে অরকিড মাটিতে জন্মায় তাদের শেকড়গুলোও ঐ রকম। তাতে দূরদুরান্ত থেকে আনার সময় অরকিডের রসের জোগান বন্ধ হোতো না। কিন্তু ঘরে নিয়ে এলেই কাজ ফুরিয়ে যায়না, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, বাড়িয়ে তুলতে হবে। তাতে ফোটা ফুল দেখতে হবে। ছায়ায় ঢাকা ঠাণ্ডা ভেজা ভেজা আবহাওয়ায় অরকিডগুলো হয় বেশি। তাই একটি ঘরের পরিবেশ এমন করতে হবে যেমনটি ছিল সেখানে যেখান থেকে গাছটিকে আনা হয়েছে'।

আমি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়েই বললাম, 'বুঝেছি বুঝেছি, যেমনটি দেখেছি দার্জিলিংএর 'অরকিডহাউসে'। সেখানে আমি পঞ্চাশ ষাট ধরণের ফুলও দেখেছি। সবচেয়ে ভাল লেগেছে 'সিপরিপেডিয়াম' আর 'সিমবিডিয়াম'-এর ফুলগুলি। ওগুলো মৌমাছির মত দেখতে। আর 'ওদোনতোগ্নসাম'-এর ফুলগুলি দেখে মনে হয়েছে একঝাঁক খুদে প্রজাপতি। নীলাঞ্জন খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছিল। চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ আমার কথা শেষ হবার পরেও। তারপর বললে, 'অরকিড ফুল তুমি তা'হলে দেখেছ। কিন্তু ফুলে মাছিজাতীয় পোকাদের বসতে দেখেছ? আমি দেখেছি, রংগীন অরকিড ফুলের দিকে একটা মৌমাছি উড়ে এসে সবার নীচের বড় পাপড়িটায় গিয়ে বসলো। তার কাছে পাপড়িটা যেন বারান্দা, তার উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেখানটায় 'মধু-গর্ত' সেদিকে এগিয়ে গেল। মধু-গর্তে মাথা ঢোকাতে যেতেই গর্তের উপরের ঠোঁটের মত ছোট্ট ঢাকনাটা পরাগরেণু সহ ভেংগে গিয়ে তার মাথায় জড়িয়ে গেল। মধু সে খেয়ে গেল কিন্তু মাথায় বয়ে নিয়ে গেল ফুলের রেণু। তারপর, যখন সেই মৌমাছিটা আর একটা ফুলে মধু খেতে গেল তখন তার মাথায় লাগা রেণুর সাথে ফুলটার রেণু মাখামাখি হয়ে গেল। ব্যাপারখানা দেখে আমার মনে হল, অরকিড ফুলের নমুনা বিশেষ অর্থে আর সব ফুল থেকে একদম আলাদা। আলাদা এই অর্থে, প্রায় সব অরকিড ফুলই রেণুবিনিময়ের জন্য মৌমাছিনির্ভর। প্রজাপতি ডানা সোজা তুলে বসে বলে 'মধু-ভাণ্ডের' কাছাকাছি এগোতে পারেনা, অন্য পাপড়িতে ডানা বাধা পায়। ছোট ছোট মাছিরাও মধু ভাণ্ডের উপরকার শুঁয়ো এড়িয়ে এগোতে পারে না। যে ফুলে যে ধরণের মৌমাছি এসে মধু খেতে পারে. দেখে মনে হয়, ফুলের গড়নই এমন যে তারই সুবিধা শুধু, অন্য জাতের মৌমাছির সাধ্য নেই সেটা থেকে মধু খায়। উল্টো ভাবেও ভেবেছি—যেমন, মৌমাছি গুলো এমন জাতের অরক্ষিত ফুলই বেছে নেয় যেটার গড়ন এমন যে তার নিজের গড়ন যাই হোক, মধু খেতে অসুবিধা হয়না।

মোটমাট বিশেষ ধরণের অরক্ষিত ফুল বিশেষ ধরণের মৌমাছির উপর নির্ভরশীল—পরাগ বিনিময়ের জন্য। তাতে দুয়েরই লাভ।'

নাবতে নাবতে বললে, 'একটা কাজ করবে'?

বললুম, 'কি'?

'এবার মার্চএপরিলে চলো পশ্চিমসিকিমে যাই। সেখানে নাকি অনেক জাতের অরকিড দেখা যায়। আমরা শুধু দেখব কেমন অরকিড ফুলে কেমন মৌমাছি আসে। কি রাজি'?

শেষ ডালটায় দোল খেয়ে মাটিতে নেমে বললাম, 'রাজি'!

প্রকৃতি পড়ুয়াদের মেঠো-খসড়া থেকে ঃ

(প্র, প, উজ্জ্বলকুমার চক্রবর্তী আর উৎপলকুমার চক্রবর্তী গত বর্ষায় দিনের পর দিন সূর্যাস্তের সময় মেঘ ও আকাশের রংফেরা লক্ষ্য করে লিখে রেখেছে। তাদের মেঠোখসড়া থেকে দু'দিনের)

২২শে শ্রাবণ ৭৬ঃ আজ সকাল থেকেই আকাশটা খুবই মেঘলা। বিকেলে দেখলাম পশ্চিমাকাশ একেবারে বাদল মেঘে লেপা। কোথাও হালকা ছাই রং কোথাও গাঢ়। সূর্যাস্ত কখন হয়ে গেল বুঝতে পারলুম না। আকাশের রংএর কোনও হেরফের নেই।

৩০শে শ্রাবণ (১৫ই আগষ্ট): আজ সূর্যাস্ত হলো ছ'টার আগে। আকাশ আজ পরিষ্কার। বাদল মেঘ কম। মেঘগুলো কিরকম ছাড়া-ছাড়া হাল্কা হয়ে অন্যান্য মেঘের তুলনায় অনেক নীচু দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। এটা আজকের আকাশের একটা বিশেষত্ব। অবশ্য এই বিশেষত্বটা পশ্চিমাকাশের।

দুদিন বৃষ্টির পর আজ আকাশের রং দেখলাম। সূর্যাস্তের ঠিক পরেই সূর্যের জায়গাটিতে দারুণ ঘন হলুদের সঙ্গে একটু লাল রং মেশালে যে রং হয় সেই রং হয়েছে। রংএর ঘনত্ব অস্তবিন্দু থেকে যত দূরে ছড়িয়েছে তত রংটা ক্রমশঃ হাল্কা হচ্ছে। সূর্যের বাঁয়ে আর ডাইনে বহু দূরে গিয়ে রং ক্রমশঃ মিলিয়ে গেছে। আজ বাদল মেঘের অনেক পিছনে কয়েকটা সাদা মেঘ উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত অবস্থার ছিল। সেগুলো সূর্যাস্তের পর সামান্য লাল মেশানো হলুদ হলুদ হয়ে গেল। ভেসে যাওয়া বাদল মেঘগুলো অস্তগামী সূর্যের কাছে আসতেই তাদের ওপর লালচে হয়ে উঠছে। এ সময়ে পুবের আকাশ লালচে। সময় যেতে যেতে রং কমে এলো। তারপর রং আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল আকাশ থেকে।

[প্রকৃতি-পড়ুয়ার পাঠশালা প্রতি মাসের প্রথম রোববার সন্দেশ কার্যালয়ে এখন থেকে বিকেল চারটের বদলে বিকেল পাঁচটায়, মনে রেখ। জীঃ সঃ]

মরীচিকা অজেয় রায়

(মাস্টার মশাই, বা প্রত্নতাত্ত্বিক রতনলাল রায় ফরাসী প্রাণিবিজ্ঞানী অঁদ্রে ফুশের সঙ্গে গোবি মরুভূমিতে ক্যাম্প ফেলে লুপ্ত সভ্যতা ও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর অনুসন্ধান করছিলেন। একদিন দূর থেকে তিনি বালির উপর এক লামাকে পড়ে থাকতে দেখলেন—মঙ্গোলীয় গড়ন, মুণ্ডিত মস্তক পরনে বিবর্ণ লাল আলখাল্লা এবং পাশে কাপড়ের ঝুলি।)

॥ ২ ॥

আমি কাছে যেতেই সে একবার চোখ মেলে তাকাল। দৃষ্টি ঘোলাটে। কি যেন বলতে চাইল অস্ফুট স্বরে।

তারপরই মাথাটা কাত হয়ে হেলে পড়ল।

তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করে দেখি—না, প্রাণ আছে। মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। তবে নাড়ি খুব ক্ষীণ, দুর্বল।

তার মাথায় জলের ঝাপটা দিলাম। জল খাওয়াবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু জ্ঞান ফিরল না।

কি করি? একে এতটা পথ বয়ে নিয়ে যাওয়া সোজা নয়।

কিন্তু ক্যাম্পে গিয়ে লোক ডেকে আনব, তারপর নিয়ে যাব অনেক দেরি হয়ে যাবে যে। অতএব লোকটিকে কাঁধে তুললাম। তার ঝুলিটিও সঙ্গে নিলাম।

দেহটি ছোটখাট। হাল্কা। তবু সেই উঁচু নিচু পথে, পাথর আর বালির ওপর দিয়ে চলতে কষ্ট হচ্ছিল। মরুদ্যানে যখন পৌঁছলাম, রীতিমত হাঁপাচ্ছি। ক্যাম্পের লোকেরা দেখে দৌড়ে এল সাহায্য করতে।

আমার তাঁবুতে ক্যাম্পখাটে তাকে শোয়ানো হল।

অচেতন দেহ। গলা দিয়ে মাঝে মাঝে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা জল তার মুখের মধ্যে ঢেলে দিতে লাগলাম। মুখ, মাথা, ঘাড় মুছে দিলাম ঠাণ্ডা জলে। আরও নানারকম সেবাশুশ্রূষা চলল।

জ্ঞান হল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে।

কিন্তু ঘোর কাটেনি। কেমন আচ্ছন্ন ভাব। উদভ্রান্ত দৃষ্টি। কণ্ঠস্বর বেরুচ্ছে না। হাত-পা নাড়ার শক্তি নেই।

সামান্য গরম দুধ খাওয়ালাম।

বিকেল থেকে এল প্রবল জ্বর। ভুল বকছে। ছটফট করছে।

নিজেই সাধ্যমত ওষুধ-পত্র দিলাম। কাজের খাতিরে অনেক সময় নানা অজানা দেশে মাসের পর মাস কাটাতে হত বলে নিজে কিছু কিছু ডাক্তারি শিখে রেখেছিলাম। সারারাত জেগে বসে রইলাম অসুস্থ লোকটির পাশে।

ভোর বেলা দেখলাম—জ্বর একটু কম। রোগী শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও বিশ্রাম নিতে গেলাম। সারারাত ঠায় জেগে বসে পিঠ টনটন করছে। চোখ টানছে।

বেলা চারটে অবধি সে অঘোরে ঘুমল।

জেগে উঠলে দুধ ও খানিকটা সুপ খেতে দিলাম। দেখে মনে হল অবস্থা অনেকটা ভাল। তবে জ্বর রয়েছে। খাটের পাশে একটা টুল টেনে বসলাম।

আমার মুখ পানে একটুক্ষণ চেয়ে সে হঠাৎ পরিষ্কার ইংরেজীতে বলে উঠল—আপনি কি ভারতীয়?

চমকে উঠলাম। এর মুখে ইংরেজী শুনব আশা করিনি। বললাম—হ্যাঁ।

—ঠিক বুঝেছি। সে ক্ষীণ স্বরে বলে।

—কি করে বুঝলেন?

—আমি ভারতীয় চিনি। ভারতবর্ষে যে ছিলাম অনেকদিন।

লোকটির সম্বন্ধে আমার কৌতূহল উদগ্র হয়ে উঠল। বুঝলাম লোকটি শিক্ষিত। নেহাৎ হেঁজি-পেঁজি ভবঘুরে নয়। বললাম—আপনি কোথা থেকে আসছেন? মরুভূমিতে এ অবস্থায় পড়লেন কি করে?

লোকটি অল্পক্ষণ চোখ বুজে রইল। একটু দম নিল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল—আমার নাম চিম্-পো।

আমি একজন তিব্বতী লামা। লব-নোর থেকে তুন হোয়াংয়ের দিকে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে পথ হারাই। দু'দিন ধরে একফোঁটা জল পাইনি খেতে। মরেই যেতাম, আপনি বাঁচালেন। তথাগত বুদ্ধ আপনার মঙ্গল করুন।

—সে কি, লব-নোর থেকে আসছিলেন? একা! মরুভূমি পেরিয়ে, পায়ে হেঁটে? সে যে

ভীষণ বিপদজনক রাস্তা ?

লামা চিম-পো নিঃশব্দে হাসল।

—পথের বিপদকে আমি ভয় পাই না। আর আমার মত নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর একা হাঁটা ছাড়া উপায় কিং ? সব সময় সঙ্গী পাব কোথা ? গাড়ি-ঘোড়া-উট চড়ার পয়সা কৈ ? তা ছাড়া পায়ে হেঁটে ঘোরাই আমার লক্ষ্য। আমার তীর্থযাত্রা। কত দিন ধরে ঘুরছি। কত দেশ দেখলাম। বিপদেও কম পড়িনি। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের করুণা যার ওপর আছে, সে ঠিক রক্ষা পায়। যেমন এবারও বেঁচে গেলাম।

লামা আমার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাইল।

দেখলাম অনেক কথা একসঙ্গে বলে তার কষ্ট হচ্ছে। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে।

বললাম—আপনি আর কথা বলবেন না। পরে শুনবো আপনার কাহিনী। এখন বিশ্রাম নিন। আমি বাইরে থাকছি। বিছানার পাশে এই কলিং বেলটা রাখলাম দরকার হলে বাজিয়ে ডাকবেন।

ফুশে তার দলবল নিয়ে ফিরল রাত দশটা নাগাদ।

আমার কাছে লামার বৃত্তান্ত শুনে সে তখুনি চলল তাকে দেখতে।

লামা চিম-পো বোধহয় চোখ বুজে শুয়েছিল। আমরা দু'জন তাঁবুতে ঢুকতে চোখ মেলল। আমার সঙ্গে একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোককে দেখে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর আমায় হাতজোড় করে নমস্কার জানাল। বুঝলান ভারতীয় রীতিনীতি সে জানে।

পরিচয় করিয়ে দিলাম—আমার বন্ধু আঁদ্রে ফুশে।

ফুশে লামাকে পরীক্ষা করল। চিকিৎসা বিদ্যায় সে আমার চেয়ে ঢের পটু। দেখে শুনে বলল, নাঃ ভয় নেই। জ্বরটা এসেছে অতিরিক্ত পরিশ্রমএবং অত্যাচারের্ জন্য। তুমি ঠিক ওষুধই দিয়েছ। তবে আসল ওষুধ হচ্ছে ক'দিন কমপ্লিট্ রেস্ট। তাহলেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

রাতে তাঁবুর বাইরে খোলা আকাশের নিচে টেবিল চেয়ার—সাজিয়ে খেতে বসেছি। শুক্লপক্ষ চলছে ফট্‌ফটে জ্যোৎস্না। রুপোলী চাঁদের আলোয় মরুরাজ্য প্লাবিত। সে সৌন্দর্য কেমন জানি অপার্থিব, কেমন গা ছমছম করে।

আমাদের লোকজনরা কিছুদূরে আগুন জ্বেলে রাতের খাবারের আয়োজন করছে। ওরা জাতিতে চীনা এবং মঙ্গোল। তাদের হাসি ও গল্পের আওয়াজ ভেসে আসছে। ফুশের লোকেরা আমার দলের লোকদের কাছে তাদের গত দু'দিনের অভিযানের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করছিল। এরা খুব আড্ডাবাজ। আর গল্প করে বেশ খানিকটা রঙ চড়িয়ে।

আমরা খাচ্ছি তিনজন।

আমি, ফুশে এবং আমাদের সেক্রেটারী-কাম্-দোভাষী তানুচুং। তানুচুং জাতে চীনা। বছর পঁচিশ বয়স। মোটামুটি লেখাপড়া জানে। চালাক চতুর। মঙ্গোলিয়ার বিভিন্ন উপজাতিদের ধরন-ধারন, ভাষা খুব ভাল বোঝে। আমাদের লোকজন, খাবার, গাড়ি-ঘোড়া উট জোগাড় করা তাঁবু ফেলা

ইত্যাদি বন্দোবস্তর যাবতীয় ভার থাকে তার ওপর। সে নিপুণ ভাবে তার দায়িত্ব পালন করে।

তবে চুংয়ের একটি দোষ আছে। বড় হামবড়াই আর বাজে বকে। সব ব্যাপারে তার নাক গলানো স্বভাব। এ জন্য আমার কাছে প্রায়ই বকুনি খায়। ফলে আমায় সে কিঞ্চিৎ এড়িয়ে চলে। ফুশের কাছে আস্কারা পায়, তাই ফুশের সঙ্গে তার দহরম-মহরম। এবার ফুশের দলের সঙ্গে সে সার্ভেতে গিয়েছিল।

তবে ইদানীং ফুশেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে।

বার তিনেক ফুশের সঙ্গে ফিল্ডে গিয়েই চুং প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে লম্বা বুলি ঝাড়তে আরম্ভ করেছে। মাঝে মাঝে সে ফুশেকেও প্রাণিবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান দিতে কসুর করে না।

খাবার টেবিলের কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে লি। আমাদের রাঁধুনী, সে সজাগ ভাবে আমাদের খাওয়া লক্ষ্য করছে। দরকার মত এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছে। পরিবেশন করছে।

খেতে খেতে হঠাৎ চুং বলল—ঐ মাঙ্কটা আসছিল কোত্থেকে? যাচ্ছিলই বা কোথায়?

—তুন-হোয়াং যাচ্ছিল। আমি বলি। আসছিল লব-নোর থেকে।

—এঁ্যা। লব-নোর থেকে—বলেন কি? একা? পায়ে হেঁটে? পাগল নাকি লোকটা?

—তা জানিনা। আমি বললাম। তবে ও নাকি অনেকদিন ধরে দেশ বেড়াচ্ছে। একাই ঘুরছে, হেঁটে। বলল, তীর্থ করতে বেরিয়েছে।

—তা মরুভূমিতে একটা উট-টুট ভাড়া করলেও তো পারত। কিংবা কোনো ক্যারাভানের সঙ্গ ধরত।

—বোধহয় কোনো সাথী জোটেনি, তাই একলা আসছিল। আর উট ভাড়া করার ওঁর পয়সা নেই।

—তাই বলেছে বুঝি। শ্রেফ বাজে কথা।

লামাকে দেখে এবং তার কথাবার্তা শুনে আমার তাকে সৎ ও ধর্মপ্রাণ লোক বলে ধারণা হয়েছিল। তার সম্বন্ধে এমন কটু মন্তব্য করতে আমি চটে গেলাম। তানচুং নিজেকে ভাবে নব্য আধুনিক যুবক। সন্ন্যেসী টন্ন্যেসীতে তার ভক্তি নেই। কৌতূহলবশতঃ আমাদের পিছন পিছন গিয়ে একবার উঁকি মেরে লামাকে দেখেও এসেছে। কিন্তু তার স্বাস্থ্য নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় নি। এখন আবার গায়ে পড়ে তার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করছে—

দৃঢ়স্বরে বললাম—প্রমাণ না পেয়ে কাউকে মিথ্যেবাদী বলা উচিত নয়। আমার বিশ্বাস সে সত্যি কথাই বলেছে। ওর চেহারা জামা-কাপড় দেখেই বোঝা যায় লোকটা কপর্দকহীন।

ফুঃ। চুং নাক দিয়ে একটা অবজ্ঞা সূচক শব্দ করে। ওদের চেহারা দেখা কিসৃসু বোঝা যায় না। আমি জানি একটা সরাইখানায় এই রকম একজন মাঙ্ক হঠাৎ পটল তোলে। তাকেও দেখে মনে হয়েছিল হত দরিদ্র। তারপর তার ঝুলি থেকে কি বেরল জানেন?—গোছা গোছা নোট। দামী দামী পাথর। সোনারূপার মুদ্রা। জেড্ পাথরের কতগুলো পাত্র। প্রায় বিশ-হাজার টাকার সম্পত্তি।

একবার ওর থলিটা ঝেড়েই দেখুন না কিছু বেরোয় কি না।

—আমরা বাটপাড় নই যে ওর অজান্তে ওর ঝুলি হাতড়াব। ও যা বলেছে, আমাদের উচিত ভদ্রলোকের মতো তাই মেনে নেওয়া।

আমায় রাগতে দেখে চুং আপাততঃ চুপ করে গেল। কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হল সে নিঃসন্দেহ যে লামাটা ডাঁহা মিথ্যুক এবং ওর ঝুলি ঝাড়লেই সোনারূপো, নোট বৃষ্টি হবে।

সেদিন রাত্তিরে এক কাণ্ড ঘটল।

খাওয়ার পর ক্যাম্পে ঢুকেছি। আমার তাঁবুতে লামা রয়েছে, তাই ফুশের তাঁবুতে আমি একটা বিছানা পেতে নিয়েছি।

ফুশে আমায় কতগুলো টুকরো টুকরো হাড় দেখাচ্ছিল। ফসিল হাড়।

একটা মস্ত দাঁত—সেটাও জমে পাথর, হয়ে গেছে।

ফুশে বলল—এটা কোনো বিরাট প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর দাঁত। তবে প্রাণীটা কি তা ঠিক বলা যাচ্ছে না।

মধ্যএসিয়া এবং গোবি মরুভূমিতে এ যাবৎ কি কি প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে, তাদের চেহারা, স্বভাব চরিত্র কি রকম ছিল—তা নিয়ে ফুশে সবে মাত্র একখানা লেকচার শুরু করেছে এমন সময় কানে এল তুমুল হট্টগোল। উচ্চৈস্বরে কথাবার্তা, হৈচৈ চেঁচামেচি।

লাফ দিয়ে দু'জনে বেরিয়ে এলাম।

প্রথমে মনে হল আমাদের লোকজনদের মধ্যে দু'দলে হাতাহাতি আরম্ভ হয়েছে।

দৌড়ে কাছে গিয়ে দেখি তা নয়—

মারামারির উপক্রম হয়েছে দু'জন লোকের মধ্যে। বাকিরা তাদের জাপটে ধরে আছে। লড়াই ঠেকাচ্ছে।

একজন আমাদের রাঁধুনী লি। অন্যজন উটচালক পো। লির হাতে ছোরা, পোর হাতে লাঠি। দু'জনেই সমান তড়পাচ্ছে।

—কি ব্যাপার?

শুনলাম লি আসল দোষী। সে পোর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিল। শোধ করছে না। আজ পো একটু কড়া ভাষায় তাগাদা দিতেই সে পোকে গালাগালি করতে থাকে।

ধার শোধ দেবার নাম নেই উল্টে গালিগালাজ করবে! স্বভাবতই পোর মেজাজত গরম হয়ে যায়। সেও দু'কথা শোনায়। তখন লি ফস্ করে ছুরি বের করে। মেরেই বসত, ভাগ্যিস অন্যেরা ধরে ফেলে।

লিকে নিয়ে এই এক ঝামেলা। ও যখন মাসখানেক আগে চাকরির জন্য আসে তখন নাম জিজ্ঞেস করতে সগর্বে বলেছিল—

—আজ্ঞে 'সুস্বাদু লি।'

—সে আবার কি ?

—আজ্ঞে ঐ নামেই আমায় লোকে ডাকে কিনা। আমার রান্নার গুণ।—

সত্যি তার রান্নার হাত ছিল অপূর্ব। সেই ধেধ্ধেরে গোবিন্দপুরে বসে মাঝে মাঝে কিসব রান্না খাওয়াত। আহা! শহরে খুব দামী হোটেলেও ওমন রান্না মেলে না। কিন্তু তার অন্য গুণগুলির পরিচয় ক্রমে পাওয়া গেল।

লোকটা দারুণ জুয়াড়ী এবং নেশাভাঙের অভ্যেস আছে। ফলে সর্বদাই ধার করে। তার বিরাট চেহারা এবং দুর্দান্ত স্বভাবের জন্য অন্যরা বাধ্য হয়ে ভয়ে ধার দেয়। সে ধার শোধ করতে লির বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। বরং ক্রমাগত আরও ধার নেবার চেষ্টা করছে। এই নিয়ে তার সঙ্গে অন্যদের প্রায়ই ঝগড়া বাঁধে। তবে এতটা বাড়াবাড়ি কোনদিন হয়নি।

ফুশে লিকে আচ্ছা করে ধমকাল।

—খবরদার, ফের যদি এমন বেয়াদপি দেখি তবে সেই মুহূর্তে তোমায় জবাব দেওয়া হবে। মনে রেখ।

ঋণদাতারা ধরল—আমাদের ধার শোধের একটা ব্যবস্থা করুন। আমরা গরিব মানুষ।

কার কাছে কত ধার তার একটা মোট হিসেব নিলাম। মোটা টাকা ধার। ঠিক হল লিকে তার প্রত্যেক সপ্তাহের মাইনে থেকে কিছু কিছু ধার শোধ দিতে হবে। ফুশে লিকে মাইনে দেবার সময় সে টাকা কেটে নেবে। তারপর নিজে হাতে পাওনাদারদের দেবে।

লি গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখন অবশ্য কোন উচ্চবাক্য করল না। তবে ব্যবস্থাটা মোটেই মনঃপুত হয় নি তার মুখ দেখেই মালুম হল।

দিন কয়েক পরে।

লামার তাঁবুতে ঢুকে আমি ও ফুশে দুটো টুল টেনে বিছানার পাশে বসলাম।

লামা শরীরে কিছুটা জোর পেয়েছে। আমাদের দেখে বিছানায় বালিসে ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসল।

আমি বললাম—আপনার তীর্থযাত্রাকাহিনী শুনতে এসেছি। সেদিন বলছিলেন।

লামা চিম্‌পো বলল—সে কি আর তোড়জোড় করে বলার মতো। আপনারা পণ্ডিত। কত দেশ দেখেছেন। আমার অভিজ্ঞতা সামান্য।

—খুব সামান্য নয় তা আমরা বেশ বুঝেচি। ফুশে বলল। একা পায়ে হেঁটে গোবি পেরোবার দুঃসাহস খুই বেশি লোকের থাকে না। নাউ প্লিস্ স্টার্ট।

—বেশ তবে শুনুন। লামা মৃদু হাসল।

একটুক্ষণ চুপ করে ভাবল। তারপর বলতে আরম্ভ করল—

আগেই বলেছি আমি একজন লামা। আমার বাস ছিল তিব্বতের এক গুম্‌ফায়। এক সময় আমাদের গুহামন্দিরের বেশ নামডাক ছিল। ঘটা করে বুদ্ধের আরতি হত। অনেক লামা ও শিষ্যরা থাকত। কিন্তু একবার ভূমিকম্পে গুহাটার অনেকখানি অংশ ভেঙে পড়ে। অন্যরা সেখান থেকে চলে যায়। মাত্র আমি এবং আমার এক শিষ্য গুম্‌ফার মায়া কাটাতে পারি না।

অল্প বয়স থেকেই আমার ইচ্ছে এসিয়ার প্রাচীনকালের বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলি দেখব। ফা-হিয়ান, হিউয়েন্-সাং, ইৎসিং প্রভৃতি বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের লেখায় বহু প্রাচীন বৌদ্ধ সংঘারাম, বিহারস্তূপের বর্ণনা পড়েছিলাম। অতীত বৌদ্ধজগতের পীঠস্থানগুলির গৌরবময় ছবি সর্বদা আমার কল্পনায় ভাসত। অবশ্য আজ তারা মৃত। অবশেষে মনস্থির করে ফেললাম। চলে গেলাম লাসায়।

সেখানে কয়েক বছর প্রাচীন ও আধুনিক কালের মানচিত্র পরীক্ষা করলাম। ভারতবর্ষ, চীন, দক্ষিণ পূর্ব-এসিয়া মধ্যএসিয়া প্রভৃতি যেখানে যেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, সেখানকার বিখ্যাত প্রাচীন সংঘারামগুলির ভৌগোলিক অবস্থান এখন কোথায় হতে পারে, তা নিয়ে গবেষণা করলাম। কোন্ রাস্তা দিয়ে, কোন কোন্ দেশের মধ্য দিয়ে যাওয়া যায় তা স্থির করলাম। কয়েকটা ভাষাও শিখে নিলাম ইংরেজী, চীনা, হিন্দী। প্রস্তুতি সমাপ্ত হলে এক দিন ঝুলি কাঁধে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

—কিন্তু সে সমস্ত প্রাচীন সংঘারাম, বিহারের ধ্বংসাবশেষ আপনি এখন দেখবেন কি করে? আমি প্রশ্ন করি। সেগুলির বেশির ভাগ এখন লুপ্ত, মাটির তলায়। অনেকগুলো ঠিক কোথায় যে ছিল তারই হদিস করা যায় নি।

—হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। লামা চিম্‌পো বলল। ভাবলাম যে কটির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাই, দেখব। যেখানে মাটির নীচে কবরে আজও কোনো সংঘারাম চাপা পড়ে লুকিয়ে আছে সেই যায়গাটি দেখাও তো পুণ্যকর্ম। তাই দেখি। ভ্রমণ কাহিনী পড়ে আমি প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ সংঘারামগুলি কোথায় ছিল তা মোটা মুটি ঠিক করে নিয়েছিলাম।

তবে এ কথা সত্যি অনেক বড় বড় সংঘারামের বর্ণনা পড়েছি কিন্তু সেগুলো যে কোথায় ছিল তা আজ সঠিক জানাই যায় না। আমার ঝুলির মধ্যে একটা প্রকাণ্ড মানচিত্র আছে 'আধুনিক এসিয়ার ম্যাপ। আমি নিজের হাতে এঁকেছি, যেখানে যেখানে যেতে চাই ম্যাপে দাগ দিয়ে নিয়েছিলাম।

প্রথমে নেপাল হয়ে ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে প্রবেশ করলাম। সমস্ত পূর্বভারত ঘুরলাম—আসাম বিহার, উড়িষ্যা বাংলা।

—আচ্ছা বাংলা দেশেও অনেক বৌদ্ধবিহার ছিল নাকি? দিলীপ গল্পের মাঝে হঠাৎ প্রশ্ন করে বলে।

নিশ্চয়ই! মাস্টারমশাই বললেন। হিউয়েন সাং বাংলায় সত্তরটি সঙ্ঘারাম বা বিহার দেখেছিলেন। তখন অবশ্য বঙ্গদেশের সীমানা ছিল অনেক বড়।

—কোনগুলো বিখ্যাত ছিল? সমর বলে।

সব চেয়ে নাম করা ছিল পো-চি-পো রক্তমৃত্তিকা, সোমপুরী জগদ্দল পিটিকোরক ইত্যাদি মহাবিহার।

—নালন্দার চেয়েও বিখ্যাত? দিলীপ বলে।

—না। মগধের নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারত কেন, সারা এসিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধবিহার। তার সঙ্গে কিছুর তুলনা হয়না। তবে মগধ অর্থাৎ এখনকার বিহার প্রদেশে অবস্থিত অন্যান্য বিখ্যাত বিহার, যেমন বিক্রমশীল বা ওদন্তপুরীর তুলনীয় বৌদ্ধমঠ বাংলাদেশে ছিল।

হ্যাঁ, তারপর শোন, লামা চিম্‌-পো বলল—

পূর্বভারত ভ্রমণ করলাম। নালন্দা দেখেছি। সেই বিরাট ধ্বংসাবশেষের কক্ষে কক্ষে সাতদিন ধরে ঘুরেছি। কল্পনা করেছি, হয়তো বহুজন্ম পূর্বে আমিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। আচার্য শীলভদ্রের

পায়ের কাছে বসে শাস্ত্র শিখেছি। তথাগতের পুণ্যস্মৃতিজড়িত রাজগৃহ, বুদ্ধগয়ার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমার জীবন ধন্য হয়েছে।

তারপর গেলাম বর্মা। মনিপুর হয়ে উত্তরবর্মার পথে। কিন্তু সে পথ তো ভীষণ দুর্গম। শুধু জঙ্গল আর পাহাড়। ফুশে বলল।

—পথ খুব খারাপ। অনেকবার বিপদেও পড়েছি।

বর্মা থেকে যাই কম্বোডিয়া। ওঙ্কাটভাট দেখতে। গভীর বনের মধ্যে ওঙ্কার-ভাটের পরিত্যক্ত মন্দির। পাথরে তৈরি। কি বিশাল! একদিন খমেরা এই মন্দির গড়েছিল। সেখানে বিরাট আকারের বুদ্ধ ও মহাকাল শিবের মূর্তি দেখলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়।

তারপর যাই—যবদ্বীপ। জাভা। বরোবুদর দেখতে।—হেঁটে নাকি? ফুশে দুষ্টুমিভরা সুরে প্রশ্ন করে।

—আজ্ঞে না। জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার অলৌকিক ক্ষমতা আমার নেই। গেলাম জাহাজে। আমি কিছু টোটকা জানি। এক জাহাজী মেটের মাথার যন্ত্রণা সারিয়ে দিই। বছর খানেক ধরে তার সেই মাথাধরা সারছিল না। সে আমাকে তাদের জাহাজে একটা কাজ জোগাড় করে দেয়। জাভা থেকে সোজা ফিরে আসি সিংহলে, অন্য এক জাহাজে।

সিংহল থেকে আবার এলাম ভারতে। দক্ষিণ, পশ্চিম, মধ্য ভারত ঘুরে পৌঁছলাম কাশ্মীরে। ছবিতে অজন্তাইলোরা দেখেছিলাম। নিজের চোখে সেই অপূর্ব শিল্প দেখে জীবন সার্থক হল।

কাশ্মীর থেকে যাই আফগানিস্তান। সেখানে একদা ছিল বিখ্যাত তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়। আরও অনেক বৌদ্ধবিহার। দেখলাম তক্ষশিলা এবং আরও কিছু কিছু লুপ্ত বিহারের কংকাল এখন মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে। এই অবধি এসে আমার ভারতবর্ষ দেখা শেষ হল। ইতিমধ্যে আট বছর কেটে গেছে পথে পথে।

—আট বছর? সুনীল আশ্চর্য হয়ে বলে।

—তাতো হবেই। পায়ে হেঁটে ঘুরেছ কিনা।

—আচ্ছা মাস্টারমশাই, আফগানিস্তান কি ভারতের মধ্যে ছিল? সমর প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, প্রাচীনকালে আফগানিস্তানকে মোটামুটি ভারতের মধ্যেই ধরা হত।

তারপর শোন, লামা বলল—আফগানিস্তানে সব চেয়ে আশ্চর্য হয়েছি বামিয়েনের বৌদ্ধ গুহামন্দির দেখে। ভেঙ্গেচুরে গেছে, জন-প্রাণী থাকে না। গুহার ভিতরে ঢুকে দেখেছি, দেয়ালে দেয়ালে সুন্দর ছবি আঁকা। আর বাইরে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বিরাট বুদ্ধমূর্তি। পাহাড়ের ধার কেটে তৈরি। কি ভীষণ উঁচু। কোনো কোনোটা একশো-দেড়শো ফুট হবে।

বামিয়েন থেকে নানা গিরিপথ ধরে হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে আমি মধ্য এসিয়ায় ঢুকলাম।

—কি, বিরক্ত লাগছে বোধ হয়? লামা হঠাৎ আমাদের মুখপানে চেয়ে বলে। একঘেঁয়ে পথযাত্রার কাহিনী শোনাচ্ছি? এবার আমি শেষ করছি।

—না না সেকি! দারুণ ইন্টারেষ্টিং। আমরা দু'জনেই সরবে জানাই।

তবে লামার মুখচোখ দেখে মনে হল একটানা কথা বলে সে ক্লান্তি অনুভব করছে। তাই বোধ হয় থামতে চায়।

—গিরিপথ এবং উপত্যকার ভিতর দিয়ে পথ চলে কাশগর অবধি আসতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। পথে সঙ্গীও পেয়েছিলাম। সমস্ত পথে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন বৌদ্ধজগতের অজস্র স্মৃতি চিহ্ন।

কাশগর থেকে দক্ষিণবাহী বাণিজ্যপথ ধরি। ইয়ারকন্দ, খোটান হয়ে নিয়া অবধি এলাম। এ সব দেশ এক সময় সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল ছিল। এখন দেখলাম হতগৌরব।

নিয়া থেকে পুবমুখো যেতে আরম্ভ হল মরুভূমি—

মাইলের পর মাইলব্যাপী কখনো বালির সমুদ্র, কখনো রুক্ষ পাথুরে প্রান্তর। আমার লক্ষ্য মরুশহর তুন হোয়াং। সহস্রবুদ্ধের গুহা।

সহস্রবুদ্ধের গুহা? অদ্ভুত নাম! সুনীল বলে।

মাস্টারমশাই বললেন—হ্যাঁ নামটার কারণ আছে। এই ম্যাপে দেখ—

মাস্টারমশাই লম্বা লাঠিটা তুলে নিলেন—এই হচ্ছে ইউ-মেনকোয়ান গিরিপথ, সেখানে উত্তর আর দক্ষিণ রেশম পথ এসে মিশেছে। তার কাছেই এই ফুটকিটা হল—তুন-হোয়াং। একটা বড় মরুদ্যান। ছোটখাট শহর বলতে পার।

তুন-হোয়াং-এর কাছে পাহাড়ের গায়ে অজস্র গুহা আছে। এদেরই নাম চিয়েন-ফো-তোং অর্থাৎ সহস্র বুদ্ধের গুহা। এগুলি ছিল বৌদ্ধ গুহামন্দির। এক সময় নাকি এক হাজার বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল গুহাগুলিতে। সহস্রবুদ্ধের গুহা ছিল মধ্যএসিয়ার বৌদ্ধধর্মচর্চার এক শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। গুহাগুলির দেয়ালে আঁকা হয়েছিল অপূর্ব সব ছবি, বুদ্ধের জীবনী অবলম্বন করে। এককালে অজন্তার নকলে সহস্রবুদ্ধ, বামিয়েন ইত্যাদি গুহামন্দিরগুলি তৈরি হয়।

লামা বলল—আমি একা নই। একদল ব্যবসায়ীর সঙ্গ ধরেছিলাম। কিন্তু দলছাড়া হলাম নিজের বোকামিতে।

লব-নোরে কাছে আসতে আমার খেয়াল চাপল, মিরানে প্রাচীন বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠানের ধ্বংসস্তূপ দেখব।

আমাদের ক্যারাভান পথের পাশে তাঁবু ফেলেছিল। কথা হল আমি একদিনের মধ্যে ফিরে আসব।

কিন্তু পারলাম না। ঝড় উঠল—আঁধি। দিকভ্রম হয়ে ফিরে আসতে দেরি হয়ে গেল। এসে দেখি সবাই এগিয়ে গেছে। আমার মতো নগণ্য এক সন্ন্যাসীর জন্যে তারা সময় নষ্ট করবে কেন? যাবার সময় রেখে গেছে কিছু খাবার ও জল। যদি ফিরে আসি।

এবার আমি সম্পূর্ণ একা। চারপাশে যেদিকে চোখ যায় জনহীন মরুরাজ্য। কোথাও প্রাণের কোনো আভাস অবধি নেই। বাণিজ্যপথ ধরে আন্দাজে এগিয়ে চলি—

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝলাম পথ ভুল করেছি। এ রাস্তায় কোনো মানুষ পশু বা গাড়ি চলার চিহ্ন নেই। ক্রমে সামান্য খাদ্য ও জলটুকু ফুরিয়ে গেল। দিশাহারার মতো ঘুরেছি। ক'দিন ঘুরেছি? কোথায় গেছি? হুঁস নেই।—তারপরের ইতিহাস তো আপনারাই ভাল জানেন। লামা চিম্‌পো তার দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনী শেষ করল। কথা বলার শ্রান্তিতে তার চোখ বুজে এল।

লামা চিম্‌পো তার গল্প বলেছিল তিন ঘণ্টার ওপর। মাস্টার মশাই বললেন। আজ সময় কম। তাই সে কোথায় কোথায়, কি কি দেখেছিল, সে সব খুঁটিনাটি অনেক বাদ দিয়ে গেলাম। অন্য কোনোদিন শোনাবো।

সেদিন বাইরে প্রকাণ্ড গোল চাঁদ উঠেছিল। বোধহয় পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নাধোয়া মরুপ্রান্তর। আমরা দু'জনে স্তব্ধ হয়ে রহস্যময় প্রকৃতির পানে চেয়ে অনেকক্ষণ বাইরে বসে রইলাম। গল্পের রেশ তখনও কাটেনি। হঠাৎ ফুশে বলে ওঠে—রয়, কি বিচিত্র জীবন! নেহাৎ লোকটাকে স্বচক্ষে দেখলাম। সামনে বসে শুনলাম, নইলে এ কাহিনী অন্য কারো মুখে শুনলে ভাবতাম, বানানো। উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা।

এরপর থেকে প্রায়ই আমরা লামার কাছে গিয়ে বসতাম গল্প শুনতে। কত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। লামা আমাকে ডাকত বাবুজী। ফুশেকে—সাহেব। কথা বলত কখনো ইংরেজীতে কখনো হিন্দীতে। অসুবিধা নেই। ফুশে হিন্দী বোঝে।

ফুশে বলত—রয় ও কিন্তু তোমাকে বেশী ফেভার করে। দেখেছো, তোমায় দেখলে ওর চোখ-মুখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কথাটা মিথ্যে নয়। আমার ওপর লামার বিশেষ স্নেহ জন্মেছিল।

লামার কাছে শোনা দু'একটা গল্প আজও মনে আছে।

একবার আরাকানের জঙ্গলে লামা হাতির পালের সামনে পড়ে। সে কাঠের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর সেই বিরাট প্রাণীগুলি তার চারপাশে চরে বেড়ায়। মট্‌মট্ করে ডাল ভাঙে। কিন্তু তাকে কিছু বলে না। যেন দেখতেই পায়নি। ধীরে ধীরে তারা দূরে চলে যায়।

হিন্দুকুশ পর্বতের উপত্যকায় সে ডাকাতের হাতে পড়েছিল। তার কাছে মূল্যবান কিছু না পেয়ে ডাকাতরা চটেমটে লামাকে ক্রীতদাস করে রাখে। লামাকে দিয়ে তারা জল তোলাতো, বাসন মাজাতো—খুব খাটাতো। একদিন আর একদল ডাকাতের সঙ্গে সেই দলের লড়াই হল। ফলে তাদের দলের একজন বন্দুকের গুলিতে ভীষণ জখম হয়। লামা-চিম্-পো আহতকে দিনরাত্রি শুশ্রূষা করে তার প্রাণ বাঁচায়। ডাকাতরা তখন অনুতপ্ত হয়। বারবার ক্ষমা চেয়ে তাকে মুক্ত করে দেয়! যাবার সময় সঙ্গে দেয় প্রচুর খাবার-দাবার। টাকাকড়িও দিতে চেয়েছিল, লামা নেয় নি।

লব-নোরের কাছে লামা নাকি ভূতের খপ্পরে পড়ে। তার চারধারে সারাদিন জীন-পরীরা বাজনা বাজায়। গান গায়। হাসি-কান্না দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ শোনে। তখন সে একমনে ভগবান বুদ্ধের নাম জপতে শুরু করে। প্রভু রক্ষা কর এই মায়াজাল থেকে।

আস্তে আস্তে বিপদ কেটে যায়। অশরীরীরা দূরে সরে যায়। সব শান্ত হয়।

—সত্যি সত্যি মরুভূমিতে ভূতটুত আছে নাকি? প্রশ্নটা করে সুনীল কিন্তু অন্য দু'জনের চোখেও ঐ এক জিজ্ঞাসা।

—আরে না না। ওর বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। মাস্টার মশাই বলেন। বাতাসের ঘায়ে বালির স্তূপ ধ্বসে পড়ে অনেক অদ্ভুত আওয়াজ সৃষ্টি হয়। নানা রকম সুরেলা শব্দ। মনে হয় যেন হাসি-কান্না, বাজনা শুনছি।

—লামার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হচ্ছিল। অধিকাংশ সময় সে বিছানায় বসে থাকে, তবে তখনও ভাল হাঁটা চলা করতে পারে না। কারণ পায়ের তলায় ক্ষত। চলতে চলতে তার জুতো ছিঁড়ে যায়। খালি পায়ে গরম বালির ওপর দিয়ে হেঁটে পায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়েছিল। তাই থেকে—যা।

—লামা প্রায় আমার গবেষণার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করত। জানতে চাইত। একদিন বলেছিল—বাবুজী, এত দূর দেশে এসেছেন। এই দেশের প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার করছেন কিন্তু নিজের দেশে কাজ করেন না কেন? সেখানেও তো কত পুরনো মূল্যবান ইতিহাস মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে।

বললাম—কথাটা ঠিক। তবে মধ্যএসিয়ার ইতিহাস আবিষ্কার করলে ভারতেরও অনেক প্রাচীন ইতিহাস জানা যাবে। আপনি তো জানেন এককালে ভারতের সঙ্গে মধ্যএশিয়ার কত যোগাযোগ ছিল। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম শিল্পরীতি এখানে প্রভাব বিস্তার করে। অনেক ভারতীয় বৌদ্ধপণ্ডিত এখানকার রাজ্যগুলিতে এসেছিলেন। মধ্য এসিয়ার ধ্বংসস্তূপে অনেক পুঁথি পাওয়া গেছে প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় লেখা। সে সব ভাষা

এখন লুপ্ত। এমন কি ভারতেও তাদের নমুনা পাওয়া যায় না! কাজেই এখানে বসে আমি ভারতবর্ষেরই প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার করছি মনে করতে পারেন।

—লামা মাথা নেড়ে সায় দেয়—ঠিক বলেছেন। খাঁটি সত্যি কথা। এ কাজ আরও কঠিন।

সে কিছুক্ষণ নিজের মনে গভীর চিন্তায় ডুবে রইল, তারপর—মাথা তুলে বলল,—বাবুজী আমার কাছে একটা জিনিস আছে, এক মহামূল্যবান সম্পদ। আমার আর এটা কিসের দরকার? কেন মিছে এই ভার বহন করে বেড়াই? বরং এ বস্তু আপনার হাতে পড়লে তার উপযুক্ত ব্যবহার হবে। আপনিও লাভবান হবেন। আপনি আমার প্রাণ দিয়েছেন, ঋণশোধ আপনার পাওনা আছে। কি—ন—তু। আচ্ছা এখন থাক্। আর—কটা—দিন ভাবি। নিজের মনকে বোঝাই, তারপর যা হয় কর্তব্য স্থির করব।

ছ্যাঁৎ করে উঠল মনটা। সত্যি কোনো দামী পাথর-টাথর আছে নাকি ওর সঙ্গে?

যাক্, এ নিয়ে আমি আর কথা বাড়ালাম না। কাউকে কিছু বললামও না। জানলে চুং নির্ঘাৎ লামার ঝুলি হাঁটকাবে।

—ফুশে সার্ভেতে বেরল।

—লম্বা ট্যুর। ফিরল তিনদিন পরে। এসেই আমায় জড়িয়ে ধরল—রয়, আমার বরাত খুলে গেছে। কি পেয়েছি দেখবে?

ফুশে প্যাকিং খুলে বের করল একটা মস্ত ডিমের ভাঙ্গা খোলা। জমে শক্ত পাথর হয়ে গেছে!

—এত বড় ডিম! কোন পাখির?

—হোপলেস্। পাখি ছাড়া-বুঝি কেউ ডিম পাড়ে না? কোন পাখির ডিম নয়। এটা হচ্ছে সরীসৃপের ডিম। ডাইনোসরের! কোটি কোটি বছরের পুরনো।

—এ্যাঁ, বল কি হে! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাল করে দেখলাম খোলাটা। বললাম—

—তুমিই প্রথম পেলে নাকি এ বস্তু?

—না আগেও পাওয়া গেছে। ফুশে বলে। বৈজ্ঞানিকরা এ পর্যন্ত পৃথিবীকে কেবল মাত্র এই গোবি অঞ্চলেই ডাইনোসরের ফসিল-ডিম পেয়েছেন। তবে মাত্র কয়েকটি।

আরো আছে। দেখো—

ফুশে বের করল কয়েকটা ছোটবড় ফসিল। কংকালের অংশ।—এইটে হচ্ছে চোয়ালের হাড়। কিসের জান? খুব সম্ভব বেলুচিথেরিয়ামের। এরা ছিল ডাঙ্গার বৃহত্তম প্রাণী। স্তন্যপায়ী জন্তু। গণ্ডারমার্কা চেহারা, আর হাতির কয়েকগুণ বড় সাইজ। আশ্চর্য, উপত্যকাটা কেন যে এত দিন আমার চোখে পড়েনি? অথচ ধারে কাছে ঘুরেছি।

—ডাঙ্গার সব চাইতে বড় জন্তু? আমি বলি। কেন? সেই যে বিশাল, ডাইনোসরদের ছবি দেখেছি। দৈত্যের মতো চেহারা। উঁচু উঁচু গাছের ডগা থেকে পাতা খাচ্ছে। তাদের চেয়েও বড়? কি জানি সব নাম—ডিপ্লোডকাস্, ব্রন্টোসরাস্—ভাল মনে নেই।

ফুশো বলল—খুব বিরাট ডাইনোসর, ডিপ্লোডকাস্ বা ব্রন্টোসরাস্ বেলুচিথেরিয়ামের চেয়ে আকারে বড় ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের ঠিক ডাঙ্গার প্রাণী বলতে পারি না। কারণ তারা থাকত জলাভূমিতে।

শুকনো ডাঙ্গায় স্তন্যপায়ী বেলুচিথেরিয়ামকেই সব চেয়ে বড় জন্তু বলা যায়।

ফুশে মহাখুশি হয়ে বলল—দেখ রয়। তোমার লামা কিন্তু দারুণ পয়া। এদ্দিন ধরে খুঁজেছি। কৈ তেমন কিস্‌সুতো মেলে নি। আর ও আসতে না আসতেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক কবরখানা আবিষ্কার করে ফেললাম! ওকে খবরদার ছেড়না। ভাল করে যত্ন-আত্তি করে আটকে রাখ। বলা যায় না, ওর কৃপায় হয়তো একটা আস্ত বেলুচিথেরিয়াম পেয়ে যেতে পারি।

—জীবিত না মৃত? আমি গম্ভীর গলায় বলি।

—মৃত। মৃত পেলেই আমি বর্তে যাই। জ্যান্ত বেলুচির মুখোমুখি হতে আমার কোনো বাসনা নেই। সেই দিনই আমার দলের লোক সব ভাগবে।

আমি বললাম—লামাকে আটকে রাখার কথা বলছো বটে কিন্তু জানি তা সম্ভব নয়।

—কেন?

—ওর হাব-ভাব দেখে আমি বুঝেছি ও ভিতরে ভিতরে বড় অস্থির হয়ে পড়েছে। পা সেরে গেলেই ও রওনা দেবে। আসলে কি জান, পথ চলার নেশা ওকে পেয়ে বসেছে। ভবঘুরেমি ওর রক্তে প্রবেশ করেছে। সেদিন আমায় কি বলছিল জান—

বাবুজী চিয়েন-ফো-তোং দেখে দেশে ফেরার ইচ্ছে আছে! কিন্তু দেশে বেশিদিন থাকতে পারব কিনা জানি না। চুপচাপ এক জায়গায় বাস করতে আমার আর আজকাল মন চায় না। পথ আমায় টানে। মনে হয় কেবল ঘুরি। নতুন নতুন দেশ দেখে বেড়াই।

চার-পাঁচ দিন কেটে গেছে। লামা এখন হাঁটতে চলতে পারে। তার সঙ্গে আমাদের গল্প হয় সন্ধ্যের পর, কাজের শেষে ফিরে।

সেদিন সবে মাত্র আমরা ফিরেছি। হঠাৎ শুনি—বাবুজী। তাঁবুর দরজায় লামার গলা।

বিস্মিত হলাম। কারণ লামা কখনো আমাদের তাঁবুতে আসত না! আমরাই সুযোগ মতো তার কাছে যেতাম।

—আসুন আসুন, ভিতরে আসুন। দু'জনে অভ্যর্থনা জানালাম তাকে।

—লামা একটা চেয়ার টেনে বসল। বলল—আপনাদের একটা জিনিস দেখাব বলে আজ অপেক্ষা করছিলাম। তাই নিয়েই চলে এলাম।

—বেশ করেছেন। বেশ করেছেন। আমাদের সৌভাগ্য। দেখান আপনার জিনিস। ফুশে বলল।

আমার হৃৎপিণ্ডটা কিন্তু উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠেছে। নিশ্চয় সেই দামী জিনিসটা। যার ইঙ্গিত ও একদিন দিয়েছিল।

আমাদের আগ্রহ-ভরা দু'জোড়া চক্ষুর সামনে লামা তার জোব্বার কয়েকটা বোতাম খুলে ফেলে। তারপর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আগে—একটা লম্বা চ্যাপ্টা কাঠের বাক্স। অতি সাধারণ বাক্স। কারুকার্যহীন।

কিন্তু ওর মধ্যে কি আছে? কোন্ অমূল্য নিধি? যা সে এত যত্নে লুকিয়ে রেখেছিল।

—লামা বাক্সের ঢাকনাটা খুলল। দেখলাম খুব প্রাচীন লম্বা লম্বা তালপাতার ওপর কালি দিয়ে লেখা। ধুত্তেরি মনটা একটু দমে গেল। কোথায় আশা করেছিলাম মণি-মুক্তো বা কোনো দামী পাথরের মূর্তি। তার

বদলে কি না এই।

—লামা পুঁথিগুলি সাবধানে বের করে টেবিলের ওপর রাখল। আট-দশটি পাতা। অক্ষর- সংস্কৃত।

এ পুঁথি কার জানেন? লামা বলল। তার গলা কাঁপছে। চিরশান্ত লামাকে এমন উত্তেজিত দেখে অবাক হলাম।

—কার?

—পণ্ডিতকুলশিরোমনি আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের। তাঁর নিজের হাতে লেখা।

—এ্যাঁ। আমরা একেবারে হতভম্ব। বিশেষত আমি। চমকটা এ ভাবে আসবে কল্পনাও করিনি।

—প্রমাণ কি? কোত্থেকে পেয়েছেন এ পুঁথি? আমি উত্তেজিত হয়ে বলি।

—এ পুঁথি ছিল আমাদের গুম্ফায় এক গোপন কুঠুরির মধ্যে। আমিই আবিষ্কার করি। কে পুঁথিটা সেখানে এনেছিল? কবে এনেছিল? জানি না। পুঁথি আমি আর কাউকে দেখাই নি। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের হাতে লেখা। এই পরমপবিত্র স্মৃতি চিহ্ন আমি সযত্নে নিজে কাছে রেখে দিই।

—কি করে জানলেন এ লেখা দীপঙ্করের? ফুশে বলে।

—এই দেখুন নাম। শেষ পাতার নিচে স্বাক্ষর। —পুঁথির রচয়িতা আচার্য অতীশ দীপঙ্কর।

—আমি দীপঙ্করের হাতের লেখার নমুনা জোগাড় করেছিলাম। মিলিয়ে দেখেছি—হস্তাক্ষর হুবহু এক।

—পুঁথিটা তো আপনি পড়েছেন, এর বিষয়টা কি? কোনো শাস্ত্র-গ্রন্থ নাকি?

—না। উপদেশাবলী। ক-দং-প সম্প্রদায়ের আচার আচরণ সম্বন্ধে অতীশ কিছু উপদেশ দিয়েছেন। এই পুঁথিটি কোনা পুরো গ্রন্থ নয়। কোনো গ্রন্থের অংশ—একটি অধ্যায় মাত্র। আমি অন্যান্য অংশের জন্য তিব্বতে অনেক খুঁজেছি। অনেক গুম্ফায়, অনেক সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুঁথি ঘেঁটেছি কিন্তু অন্য কোনো অধ্যায়ের সন্ধান পাইনি। হয়তো বাকি অংশগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে। এমন কি কোন অনুবাদও আমার চোখে পড়ে নি।

—সুনীল বলল—ক-দং-প কি মাষ্টার মশাই?

—এক তিব্বতী বৌদ্ধসম্প্রদায়। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সৃষ্টি। দীপঙ্করের জীবনী তোমরা জানতো?

—'জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর।' অমর সত্যেন দত্ত আওড়ায়।

—রাইট্। দীপঙ্কর বাঙ্গলার গৌরব। তিব্বতে ধর্মপ্রচার ওঁর এক মহৎ কীর্তি। তিনি ছিলেন রাজপুত্র। আগের নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। অল্পবয়সে জ্ঞানের সন্ধানে তিনি ঘর ছাড়েন। নানা গুরুর কাছে বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং অবশেষে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। নতুন নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। কেউ ডাকেন অতীশ দীপঙ্কর। চতুর্দিকে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। গৌড়ের রাজা মহীপালের আমন্ত্রণে তিনি বিক্রমশীল মহাবিহারে যোগ দেন। এবং ক্রমে তিনি আচার্যপদ লাভ করেন।

দীপঙ্কর তখন বিক্রমশীলের প্রধান আচার্য। তিব্বতের রাজা লা-লামা-ভেসে এবং তার পরের রাজা চানচুব বার বার দূত পাঠান তাঁকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানিয়ে। তিব্বতে কলুষিত, বিকৃত বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করতে দীপঙ্করের চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি তখন বৌদ্ধজগতে কেউ নেই। ক্রমাগত সবিনয় অনুরোধে অবশেষে দীপঙ্কর রাজি হল। ১০৪০/৪২ খ্রীষ্টাব্দে, প্রায় ষাট-বাষট্টি বছর বয়সে তিনি তিব্বত যাত্রা করেন। আর তিনি দেশে ফিরতে পারেন নি। প্রায় তিয়াত্তর বছর বয়সে তিনি তিব্বতেই দেহত্যাগ করেন। তাঁর চেষ্টায় সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার হয়। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ক-দং-প নামে এক বৌদ্ধ সম্প্রদায় তৈরি করেন।

—আমি ও ফুশে গভীর আগ্রহে পুঁথির ওপর ঝুঁকে পড়লাম।

হঠাৎ তাঁবুর পরদাটা নড়ে ওঠে।

—কে?

—আজ্ঞে আমি লি, আপনাদের কফি এনেছি।

তাইতো, মশগুল হয়ে এতক্ষণ আমাদের সান্ধ্য কফির কথা ভুলে রয়েছি।

—এস, ভিতরে দিয়ে যাও।

লি কফির ট্রেটা টুলের ওপর নামিয়ে রেখে চলে যায়।

পুঁথি পড়তে চেষ্টা করি—

সংস্কৃত ভাষা। ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর। কোথাও অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পাতাগুলি জীর্ণ মুড়মুড়ে। হাত দিতে ভয়, ভেঙ্গে যাবে। কয়েকটি পাতা ভাঙ্গা। লামা বলল ডাকাতদের কীর্তি।

তারা সার্চ করে বাক্সটা বের করে। ভিতরে মণি-মাণিক্যের বদলে কতগুলো বাজে লেখা দেখে চটে পাতাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ফলে এই অবস্থা।

অনেক কষ্টে কয়েক লাইন পড়লাম। ভাল মানে বুঝতে পারলাম না। আমাদের সংস্কৃত জ্ঞান মন্দ নয়—রীতিমত খটমট।

তাঁবুর দোরগোড়ায় পায়ের শব্দ।

পরদা সরিয়ে তান্-চুংয়ের মুখ উঁকি মারল।

এ মুহূর্তে এই লোকটির উপস্থিতি সব চেয়ে অবাঞ্ছিত। বললাম—কি চাই?

তান্-চুং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে টেবিলের দিকে চাইল। তারপর বলল—একজন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। খুব পেটের যন্ত্রণা। আপনারা কেউ আসুন।

—ঠিক আছে যাচ্ছি। তুমি যাও, ফুশে বলল।

তান্-চুং কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখ সরিয়ে নিল না। তির্যক-চোখে আর এক দফা পুঁথি পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে বলল—তাড়াতাড়ি আসুন স্যার। বড্ড কাতর হয়ে পড়েছে।

—চল। ফুশে ওষুধের বাক্স নিয়ে তানচুংয়ের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। ফিরল মিনিট দশেক পরে।

আবার কিছুক্ষণ পুঁথি পরীক্ষা চলে। কঠিন কর্ম। সাত্-তাড়াতাড়ি হবে না। যত্ন নিয়ে ধৈর্য ধরে পড়তে হবে।

লামা এতক্ষণ যেন ধ্যানমগ্নের মতো বসে ছিল। হঠাৎ ধীরস্বরে বলল—বাবুজী, এ পুঁথি আমি আপনাকে দিয়ে যেতে চাই।

তাঁবুর মধ্যে বজ্রপাত হলেও এত চমকাতাম না। ঘাবড়ে গিয়ে চেয়ে থাকি। মুখ দিয়ে শুধু বেরোয়—হ্যাঁ, সে কি?

—লামা চিম্-পো বলল—বুঝতে পারছি আমার শরীর আর জোড়া লাগবে না। আমার জীবনীশক্তি ফুরিয়ে এসেছে। তুল হোয়াং থেকে তিব্বত যাবার পথ বড় খারাপ। চড়াই উৎরাই পাহাড়। প্রচণ্ড শীত। হয়তো পথেই মরে যাব। মারা গেলে আমার দুঃখ নেই। আমার জীবনের ব্রত সফল হয়েছে কিন্তু ভয় হয় আমার সঙ্গে সঙ্গে যে এই অমূল্য সম্পদও নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি বাঙালী ভারতবাসী। বুদ্ধের দেশের লোক। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের দেশের লোক। এ পুঁথির আপনি উপযুক্ত মর্যাদা দেবেন।

দেশ-বিদেশে ঘুরে আমার জ্ঞান জন্মেছে। বুঝেছি, এমন ঐতিহাসিক সম্পদ আমার মতো অশিক্ষিতের কাছে থাকা বা কোনো গুম্ফার অন্ধকারে বন্দী থাকা উচিত নয়।

এ পুঁথি আমি পড়েছি বটে। কিন্তু অনেক জায়গায় অনেক জটিল দার্শনিক আলোচনা আছে, তাদের মানে আমি ভাল বুঝি নি। উচিত আপনাদের মতো পণ্ডিত এই পুঁথি নিয়ে গবেষণা করবেন। ব্যাখ্যা করবেন। সকলে জানবে—দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বাণী। তবেই একে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হবে।

বাবুজী, না করবেন না। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। মনে করুন এ হচ্ছে দরিদ্র ভিক্ষুর সামান্য ঋণশোধ। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলে রাখছি। আমি আর দু'এক দিনের মধ্যেই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব।

—চলে যাবার জন্যে অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আর কিছুদিন থাকুন বিশ্রাম নিন। শরীরটা পুরোপুরি সারুক। ফুশে বলল।

—না সাহেব। বাধা দেবেন না। আপনাদের সেবা যত্ন আমি কখনও ভুলব না। কিন্তু এক জায়গায় বসে থাকতে আর আমার মন চাইছে না শরীর আমার সেরে গেছে। তা ছাড়া তাড়াতাড়ি দেশে ফেরা দরকার

—কেন?

—বেরুবার সময় আমার ভক্ত শিষ্য লামা-ছো-র কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যদি পর্যটন সমাপ্ত করে তুন হোয়াং অবধি আসতে পারি তাহলে দেশে ফিরে তার সাথে দেখা করব। সে হয়তো আজও সেই ভাঙ্গা-চোরা গুহায় আমার অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছে।—কি বাবুজী, পুঁথি নেবেন তো।

কি বলব? এ দান প্রত্যাখানের শক্তি আছে আমার? এ যে অতি দুর্লভ বস্তু, এমন একটা পুঁথি পেলে আমার মত যে কোন ঐতিহাসিক বর্তে যাবে, জীবন সার্থক মনে করবে!

তিব্বতে দীপঙ্করকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করে। তাঁর স্মৃতি' তাঁর নিজের হাতে লেখা পুঁথি একজন তিব্বতী বৌদ্ধর কাছে যে কত প্রিয়, কত পবিত্র জিনিস তা কি আমি জানি না? কৃতজ্ঞতায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। কোন রকমে উচ্চারণ করলাম—

আপনার দান আমি মাথা পেতে নেব। এ পুঁথির উপযুক্ত মর্যাদা দিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কথা দিচ্ছি।

লামা বলল—ধন্যবাদ। আমি জানি বাবুজী আমি জানি, আপনি পারবেন।

সে পাতাগুলি একটি একটি করে বাক্সের ভেতর গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলে—পুঁথি আমি আজ দিচ্ছি না। এখান থেকে বিদায় নেবার ঠিক আগে এ-বস্তু আপনার হাতে সমর্পণ করে যাব। চলি—নমস্কার।

বাক্সটা জামার গোপন পকেটে ঢুকিয়ে রেখে সে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়।

লামা চলে যেতেই ফুশে আমার হাত ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল—

রয় এইবার? ফসিল পাচ্ছিলাম বলে হিংসে করছিলে। তোমার বরাতে নাকি কিছুই জুটল না। এই বার তো বাবা কেল্লা ফতে। দীপঙ্করের পুঁথি আবিষ্কার করে তুমি ফেমাস হয়ে যাবে।

রাতে—খাচ্ছি। ঠিক যে আশংকাটা করছিলাম তাই।

বার কয়েক নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করেই চুং কথাটা পাড়ল—

একটা পুঁথি দেখলাম যেন? মাঙ্কটা দেখাচ্ছিল বুঝি?

—হ্যাঁ। খুব পুরনো পুঁথি, আমি বলি।

—হ্যাঃ। ওরাতো সব পুঁথিকেই বলে—দারুণ পুরনো, দারুণ দুষ্প্রাপ্য, দারুণ দামী। সব বোগাস্ আমি একজন ভিক্ষুকে জানি তার কাছে কয়েকটা পুঁথি ছিল। ব্যাটা বলে বেড়াত, সব কটাই নাকি দারুণ জিনিস। কোনোটা হিউয়েন সাংয়ের লেখা, কোনোটা ফা-হিয়েনের, কোনোটা জিন-গুপ্তের। পরীক্ষা করে জানা গেল—গুল। সব রদ্দিমাল।

নানা এটা খাঁটি জিনিস—ফুশে বলল।

বটে। পুঁথিটা কার শুনি? চুংয়ের কণ্ঠে অবিশ্বাস। মুখে চাপা হাসি।

ফুশে চটল। আমি বাধা দেবার আগেই হাতটাত নেড়ে জোর গলায় বলে উঠল—কার জান? দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম শুনেছ? পুঁথি তাঁর নিজের হাতে লেখা।

—এ্যা, ঠিক বলছেন। তানচুংয়ের রক্তিম চক্ষু বিস্ময়ে মার্বেলের মতো গোল হয়ে ওঠে।

—আলবৎ। আমার কচি খোকা নাই। পুঁথি আসল না নকল চেনার বিদ্যে আমাদের আছে। আমি ও দু'জনেই পরীক্ষা করে দেখেছি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম লেখা আছে—তাঁর নিজের হাতে।

—আরে ব্বাস। অরিজিনাল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান! বলেন কি? তবে যে স্যার বলেছিলেন—লোকটা বেজায় গরিব। খেতে-পরতে পায় না। বই ছাপার পয়সা নেই।

—যাব্বাবা। এর মধ্যি টাকা-কড়ির প্রশ্ন এল কেত্থেকে। লামার—ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের সঙ্গে পুঁথির কি সম্পর্ক?

তার মানে? আমি বলি।

—মানে ও বস্তু যার পকেটে আছে সে তো বড়লোক। অনেক কোটিপতি আছে যাদের নেশা পুরনো পুঁথি জমানো। একখানা, জেন্থইন্ দীপঙ্করের ম্যানুস্ক্রিপ্ট পেলে তারা এখুনি ঝট্ করে বেশ কয়েক হাজার টাকা বের করে দেবে। এইতো আগের বছর। এক বুড়ো আমেরিকান এসেছিল এ-অঞ্চলে। তেলের খনির মালিক। প্রচণ্ড পয়সা। এসেই রটিয়ে দিল—পুরনো জিনিস চাই। দামের জন্য পরোয়া নেই।—লোকটা রাম বুদ্ধু ছিল। আসল-নকল ফারাক্ চিনত না। অনেকে তাকে প্রচুর বাজে মাল গছিয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু লামা মোটেই তার পুঁথি বিক্রি করতে চায়না। ফুশে বলল। ও বরং—

আমি গোপনে ফুশেকে চোখ টিপি। আমায় পুঁথি দানের বৃত্তান্ত না আবার বলে বসে।

তান্-চুং বলল—ও না চাইলেও অন্যরা কিন্তু চাইবে। আমি পিকিং, সাংহাইয়ে অনেক ব্যবসারীকে জানি পুরনো জিনিসের কারবার করে। এ রকম দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন জিনিস পেলে মোটা টাকা দিয়ে—কিনে নেয়। চোরাই মাল হলেও মাথা ব্যথা নেই, বরং সুবিধেই। কিছু কমে পাওয়া যায়। তারপর সে সব জিনিস তারা বেচবে—ইউরোপ, আমেরিকার কিউরিও পাগল বড়লোকদের কাছে—বহুগুণ লাভে।

—ন্যাই লি, তা করে দাঁড়িয়ে আছে কেন? রুটি দাও, মাংস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

লি প্রথামতো কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে কিছু ভাবছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তান্-চুংয়ের প্লেটে কয়েকখানা রুটি দেয়।

খেতে খেতে তান-চুং আর একবার পুঁথি প্রসঙ্গে আসে—

আপনাদের লামাকে সাবধান করে দেবেন—যেন যেখানে সেখানে পুঁথির গল্প. না করে। এ বড় খারাপ দেশ। মাত্র কটা টাকার জন্যে মানুষ খুন হয়ে যায়।

ক্রমশঃ

(উত্তর দেবার শেষদিন ৩১শে মার্চ)

(১)

বাৎসরিক পরীক্ষার অঙ্কের নম্বর জানবার পরে ইলা-নীলা লীলা ও শীলা, নিজের নম্বর সঠিক না জানিয়ে, অন্যদের নম্বর জানবার চেষ্টা করছিল।

কথাবার্তায় বোঝা গেল যে:—

(১) ওদের চারজনের নম্বরের যোগফল হল ৫০০।

(২) ২০০র মধ্যে প্রত্যেকেই ১০০র বেশি পেয়েছে।

(৩) নীলা আর লীলা সমান নম্বর পেয়েছে,—প্রত্যেকেই ১২০র বেশি।

(৪) শীলা পেয়েছে সবচেয়ে বেশি।

(৫) যে সব চেয়ে কম পেয়েছে, সে তার আগের জনের চেয়ে মাত্র ৭ নম্বর কম পেয়েছে!

(৬) যেই শীলা বলেছে যে তার নম্বর একটি বর্গসংখ্যা (square number)। নীলা বলে উঠল যে সে সকলের নম্বর বুঝে ফেলেছে!

তোমরা বলতে পার কে কত নম্বর পেয়েছিল?

(১)

গোবর গণেশ গড়গড়ি নিলামে দুখানা পুরোন মটরগাড়ি কিনেছিল, কিন্তু মেরামত করতে গিয়ে, খরচের বহর শুনে তার চক্ষু চড়ক গাছ!

আবার সে গাড়ি দুটো নিলামে বিক্রি করে দিল। প্রত্যেকটি ৬০০০৲ টাকায় বিক্রি করার ফলে, একটা গাড়িতে ২০% লাভ ও অন্যটায় ২০% লোকসান হল। মোট তার লাভ বা লোকসান কিছু হল কি? হয়ে থাকলে, কত?

(৩)

মজার———শোন, হে———ভাই,
——রাজে রোজ——খাওয়ায় সবাই !
———বসিয়া সুখ———কি তাঁর
সারা——মাছ——পোলাও আহার !
ঘীয়ে——চপ, ফ্রাই, ——, কাটলেট,
—কি, ইলিশ, চিংড়ি আসে রোজ——
সর্ষে——য় রাঁধা——মাছ ঝাল,
——রাবড়ি মাথা পক্ক—— !
মন——ক্ষীর, দৈ যত চায়——,
না মানে——যেন মত্ত——— !

(প্রত্যেক লাইনের দুটি শূন্যস্থানে এমন দুটি শব্দ বসাও যা ঠিক একরকম কিন্তু ভিন্ন অর্থ, যথা—পত্র = পাতা আর পত্র = চিঠি)।

মাঘ মাসের ধাঁধার উত্তর :—

শ্বেতাম্বর = ছুতোর, পীতাম্বর = রং মিস্ত্রি, নীলাম্বর = রাজমিস্ত্রি, দিগম্বর = কামার।

(২)

পরশু বৈকালে খবর আসিল নাগমহাশয়ের দোকানে নতুন সন্দেশ আসিয়াছে। খবর পাইবা-মাত্রই আমি দোকানে গমন করিয়া দেখিলাম ছোটবড় হরেক ব্যক্তি তাহার তসবীর দর্শন করিতেছে।

(৩)

(ক) জামা পরে থাকে বুড়ো মাজা ব্যথা পাছে হয়।
(খ) ভেজা কাঠ কিনি যদি ঠকা হবে নিশ্চয়।
(গ) শিখি হেসে ডেকে কাকে বলে কেকা ধ্বনি করে
(ঘ) হেন লেজ যার কেন জলে ডুবে নাহি মরে !
(চ) মামাবাড়ি ভারি মজা আম জাম খাই ঢের !
(ছ) হাল বিনা কিবা হাল হবে বল নাবিকের !
(জ) কাটা ফল বেচে যদু কিছু টাকা পায় রোজ,
(ঝ) হেন ধন নহে যাতে পেট ভরে খাবে ভোজ !

পৌষমাসের ধাঁধার উত্তর-দাতাদের নাম :—

যাদের সব কয়টি উত্তর ঠিক :—

১১৫ অর্পিতা, কিশলয় ও কিশোর চক্রবর্ত্তী, ১৭৫ অনিতা রায়, ১৯২ অম্বরা ও ফুল্লরা সেন, ২৫৪ জয়শ্রী রায়, ২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ৬১৬ ভারতী মিত্র, ৮৫৫ পিয়া

বোস, ৮৮৯ প্রেমেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, ৮৯৮ হিমাদ্রি ও দোলনচাঁপা চৌধুরী, ১২৩২ নন্দিনী দত্ত মজুমদার, ১২৩৪ অনিন্দিতা সরকার, ১৪১৮ শেখর নাহার, ১৪৮১ উত্তমকুমার বটব্যাল, ১৬৫১ হাম্বির মজুমদার, ১৬৭২ শুভ্রাশিস গুহ, ১৬৯৩ শ্যামলকুমার পাইন, ১৭৮৮ পলাশবরণ পাল, ১৮৬৩ সোনালী লাহিড়ী, ১৮৯৪ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ১৯৭১ মৃণালকান্তি মণ্ডল, ১৯৭৫ নীলাঞ্জনা সেন, ১৯৯৭ অনসূয়া বসু, ২০৭২ মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮৪ ইন্দ্রনীল ও পলা সেনগুপ্ত, ২০৯৩ দেবাশিস দত্ত, ২১৫২ সুরজিৎ, অনুপ। ও শিপ্রা কর-পুরকায়স্থ, ২২১৫ শুভা মজুমদার, ২২২৪ শুভময়, কল্যাণময় ও নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়, ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায়, ২২৬১ অরুন্ধতী ব্যানার্জী, ২৩৫৯ শোভনকান্তি সাহা, ২৩৯৬ চিন্ময় ভট্টাচার্য, ২৪০৩ সুস্মিতা দাশগুপ্ত, ২৪৬৬ অর্ধেন্দু ও মমতা কর্মকার, ২৪৬৭ মহাশ্বেতা ও অমিতবিক্রম ঘোষ, ২৪৭১ শর্মিলা মিত্র, ২৫৫৪ দেবাশিস ভট্টাচার্য, ২৬১২ চৈতালী সান্যাল, ২৬২৮ রঞ্জন ও শুভাশিস ব্যানার্জী, চিত্রাঙ্গদা ও চৈতালী বসু, ২৭১৩ সৌমিত্র ব্যানার্জী, ২৭১৮ রুমঝুম রায়চৌধুরী, ২৭৬৩ শর্মিলা ও সব্যসাচী বসু, ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত, ২৮৩৭ অর্পিতা রায় চৌধুরী, একজন নামনম্বর হীন, দুইজন পাঠক।

দুটো উত্তর ঠিক ঃ—

৪৯ শর্মিলা সেন, ৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ২২৬ জয়ন্ত ও প্রবাল নন্দী রায়, ৩৯৩ নন্দিতা, বন্দনা ও জ্যোতির্ময় বরাট, ৬৯৩ ঋত্বিক ও ঋতা গুপ্ত, ৮৩৮ সুপ্রতীক বাগচী, ৮৯৪ তপন ঘোষ, ৯৩৮ আলোকময় দত্ত, ১২১৩ সুগত, স্বাতী ও সোমা ঘোষ, ১৪০১ মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪২৫ মিত্রা রায়চৌধুরী, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৬০৩ নিশীথরঞ্জন, নীতীশরঞ্জন, সমীর ও মিতালী গুহ, ২০৪৭ তনিমা ও তনুশ্রী বসাক, ২১৫৯ স্বাহা, শুভঙ্কর বাগচী ও সুচ্ছন্দা চৌধুরী, ২৩৩১ অমিতাভ চৌধুরী, ২৪৪১ দেবোপম চক্রবর্তী, ২৫৪৪ সান্ত্বনা রায়চৌধুরী, ২৫৪৭ মৈত্রেয়ী ও প্রসেনজিৎ বসু, ২৫৬১ সিদ্ধার্থ রায়, ২৬৭৬ খোকন সমু, আশু, খুকু ও টুটু (গ্রাহকের নিজের কি হল ?) ২৭৩৫ উৎপল ও সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য, ২৭৮২ সুপ্রভাত, সুমিতা ও সুবীর মৈত্র, ২৯৭৭ মিতা সেনগুপ্ত।

একটি উত্তর ঠিক—

১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ৫৭৬ মনিদীপা চৌধুরী, ২২০২ শুভাশিস ধর।

পুরী, ভুবনেশ্বর, কোনারক ভ্রমণ

শ্রীউত্তমকুমার বটব্যাল

গ্রাহক নং—১৪৮১ বয়স ১২—বছর

২৭শে ডিসেম্বর তোমাদের কাছে স্মরণীয় না হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে ঐ তারিখটা মজা, হৈ-হুল্লোড় আর আনন্দের দিন। কলকাতার এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমরা হচ্ছি গ্রামের ছেলে, কলকাতা দেখাও আমাদের সবসময় হয়ে ওঠে না। তাই আমি ও দাদা বিকেল বেলায় কলকাতার কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দেখে রাত ৮টার সময় ফিরলাম।

কিন্তু কলকাতা দেখাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা যাব পুরী, ভুবনেশ্বর ইত্যাদি নানা তীর্থস্থানে। তাই সেদিন রাত ৯½ টায় হাওড়াপুরী এক্সপ্রেস ধরে পাড়ি দিলাম সুদূরের অভিযানে। যেতে যেতে কি আনন্দ, কি মজা হচ্ছিল তা লেখার দ্বারা বোঝানো মুস্কিল। প্রায় সারা রাস্তাই ঘুমাইনি। আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি, দাদার সঙ্গে কলকাতার এক বন্ধুও ছিল। সে আর দাদা এক কলেজে পড়ে। সেও নাকি পুরীতে তার আত্মীয়বাড়ি যাবে। যাক্ ভালোই হল। ট্রেনে যেতে বেশ মজা লাগছিল।

পরদিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে আমরা পুরী পৌঁছলাম। থাকবার ব্যবস্থা হল দাদার সেই বন্ধুর বাড়িতে। পুরীর সমুদ্রে মজা করে স্নান করলাম। দিগন্তপ্রসারী এই সমুদ্রকে সেদিন প্রথম দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। স্নান করে আমরা হোটেলে খেয়ে এলাম। বিকালের দিকে জগন্নাথের মন্দির ঘুরে এলাম। তীর্থযাত্রীদের সমাগমে জগন্নাথদেবের মন্দির একবারে গম্‌গম্। জগন্নাথদেবের মন্দিরের

গাত্রে ও ফটকের অপূর্ব শিল্পের কাজ দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। অতীতের এই শিল্পীদের মনে মনে শ্রদ্ধাও জানালাম। পাথরের উপর খোদাই করা এই অপূর্ব কারুকার্য সবাইকে আকৃষ্ট করবে। জগন্নাথ দেবের' মন্দিরের ফটোও তুলে এনেছি আমরা। পরদিন প্রাতে সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখলাম। সমুদ্রের অসীম তল থেকে কে যেন একটা লাল বুদ্‌বুদ্‌ ছেড়ে দিল অসীম দিগন্তে। আকাশটা লাল হয়ে গেল। কেউ যেন আকাশের গায়ে আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। সূর্যদেব একটু একটু করে যেন সমুদ্রের তলা থেকে উঠছেন। এই সূর্যোদয়ের স্মৃতি আমার অন্তরে চিরদিন গাঁথা থাকবে।

বেলা পড়লে দোকানে জল খাবার কিনে খেলাম। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল আবার আমরা সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম সূর্যাস্তের ছবি। ধীরে ধীরে লাল সূর্য যেন সমুদ্রের তলায় ডুব দিল। এই সমস্ত দেখে মনে কি আনন্দই না পেয়েছিলাম প্রকাশ করা যায় না। আমরা সেদিন পুরীর শহরেও গিয়েছিলাম বেশি বড় নয়, ছোট্ট শহর। পুরীর অধিকাংশ স্থানেই মন্দির। সেখানে দু'একটা ঝিনুকের তৈরি জিনিসপত্রও কিনেছিলাম।

পরদিন সকালে ভুবনেশ্বর পাড়ি দিলাম। পুরী থেকে ভুবনেশ্বর প্রায় ৩।৪ ঘণ্টার পথ। ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখলাম। আবার বিস্মিত হলাম মন্দিরের গাত্রের সূক্ষ্ম অপূর্ব কারুকার্য দেখে। প্রাচীনকালের দেবদেবীদের সব মূর্তি। অনেক অপ্সরার মূর্তিও রয়েছে। যাঁরা এই সমস্ত কারুকার্য করেছেন তাঁরা যে কত বড় শিল্পী তা এই সমস্ত চিত্র থেকেই বোঝা যায়।

আমরা উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতেও গিয়েছিলাম! সেখানে প্রকৃতির মনোরম শোভা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ভুবনেশ্বর 'বিন্দু সরোবর' দেখলাম। কোনারকের মন্দির দেখতে গেলেন।

কোনারকের মন্দির থেকে সমুদ্র এখন ৩।৪ মাইল দূরে। শুনলাম আগে নাকি মন্দির সমুদ্রের তীরেই অবস্থিত ছিল। আমরা প্রথমে গেলাম নাটমন্দিরে। সামনে দুটি সিংহমূর্তি।

আসল মন্দিরটা রথের মতো। নাটমন্দিরের কিছু দূরেই এই সূর্য মন্দির। প্রতিটি মন্দিরেই অপূর্ব কারুকার্য। সবচেয়ে বিস্মিত হলাম সূর্যমন্দির দেখে। সূর্যমন্দির প্রায় ৬'৭টি বিশাল চাকা রয়েছে। দু'পাশে দুজোড়া করে ঘোড়া সূর্যমন্দির টানছে। বিশাল চাকাগুলির মধ্যেও রয়েছে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য। অনেক চাকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। মন্দিরের ভিতর তখন মেরামত হচ্ছিল। মন্দিরের চারিদিকেই সুনিপুণ শিল্পীর হাতের কারুকার্য। মন্দিরের এই সমস্ত কারুকার্য দেখে সবাই অবাক হয়ে যাই।

আমরা সেদিন সন্ধ্যা ৮টায় পুরী পৌঁছলাম। পরদিন জগন্নাথদেবের মন্দিরে পূজা দিলাম সমুদ্রে স্নান করেছিলাম। ঢেউয়ের মাতামাতিতে স্নান করতে খুব মজা লাগছিল। সেইদিন সন্ধ্যা ৬টায় পুরী এক্সপ্রেস ধরে কলকাতা পৌঁছলাম পরদিন বেলা ১০½টায়। এসে চিড়িয়াখানা যাদুঘর ইত্যাদি দেখলাম। আমরা সব জায়গায় ফটোও তুলেছিলাম। এখন সেই সমস্ত কোনারকের সূর্যমন্দির পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ইত্যাদি ফটোগুলি দেখি। আর মনে পড়ে যায় সেই ভ্রমণ কাহিনী।

আমার গ্রাম

অনীতা চট্টোপাধ্যায়

গ্রাহক নং—২২৩৯ বয়স—১৩ বৎসর

আমরা থাকি অনেকদূর
চেনো বোধ হয় আলিপুর।
গ্রামের নাম কুমারগ্রাম
খুব নিকটে আছে আসাম।
নামের শেষে আছে দুয়ার
চোখে পড়ে ভোটান পাহাড়।
ভীষণ নদী যে রায়ডাক
বর্ষাকালে বড় হাঁকডাক।
আর এক পাশে নদী সংকোশ
বানের জলে দেখায় রোষ।
জেলা হল জলপাইগুড়ি
চায়ের বাগান ভুরি ভুরি।

যেদিক তাকাই বনশোভা
বড়ই মধুর মনোলোভা।
হাতি বাঘ জানোয়ার যত
গভীর বনে বেড়ায় শত।
আপন মনে সাপের চলা
বুঝিয়ে সব যায় না বলা।
সুধাকণ্ঠের পাখির গীতি
গ্রাম্যলোকের সহজপ্রীতি।
খোলা আকাশ মুক্ত বাতাস
নানা ফুলের গন্ধে সুবাস।
সবার তরে রইল প্রীতি
এইখানেতে করলাম ইতি।

চিঠি

অলকানন্দা চট্টোপাধ্যায়

বয়স ১৪, গ্রাহক নং ১৪৫৮

'সম্পাদক', 'সম্পাদিকা' একটা কথা শোন,
দিলাম তোমাদের অনেক চিঠি উত্তর যে নেই কোন।
আমার একটা দুঃখের কথা বোঝনা কেন হায়!
কতদিন যে বসে থাকি উত্তরের আশায়!
অনেক কবিতাই পাঠালাম প্রিয় পত্রিকায়
'অমনোনীত' বললেই পার, খেদ নেই মোর তায়।
যাহোক, ছোট্ট চিঠি এবার এইখানে শেষ করি
'সন্দেশে'র এ গ্রাহিকাটিরে যেওনা বিস্মরি।
১৪৫৮ গ্রাহিকা সংখ্যা অলকানন্দা নাম,
চট্টোপাধ্যায় পদবী মোর পানিহাটী ধাম।
আর এক শুনে রাখ বয়স আমার চোদ্দ।
প্রণাম নিও তোমরা দুজন। শেষ করি এই পদ্য॥

মিনিমার দুঃসাহসিক অভিযান

(ইংরাজী গল্পের অনুবাদ)

মিত্রা রায়চৌধুরী গ্রাহক সংখ্যা ১৫২৫, বয়স ১৩

নদীর ধারের মাঠটায় ইঁদুরদের একটা ঘাস আর পাতায় মোড়া পরিষ্কার বাড়ি ছিল। ওদের বাড়িতে অনেক শস্য জমা ছিল আর ওদের বাড়ির বাচ্চারা দিনে দু'বার করে দাঁতে ধার দিত। ওদের সবচেয়ে ছোট মেয়ে মিনিমা জমিদার বাড়ির ধনী ইঁদুরদের মতো গান গাইতে পারত। ওর বাবা মা

ভাবতো ও বড় হয়ে এক পেশাদার গাইয়ে হবে। কিন্তু মিনিমা ওরকম কোন স্বপ্ন দেখত না। সে নির্ঝরের কুলুকুলু ধ্বনি শুনতে শুনতে সবুজ বনভূমির উপর খেলা করতে ভালবাসত আর আগন্তুকদের সাথে গল্প করতে ভালবাসত। কিন্তু একদিন ওর মা ওকে ডেকে নিষেধ করাতে মিনিমা ক্ষুব্ধস্বরে বলল, 'কিন্তু মা, আমাদের তো প্রতিবেশিদের সঙ্গে গল্প করা উচিত', মা বললো, 'হ্যাঁ, উচিত, কিন্তু তোমার এত বোঝা দরকার উচিত কোথায় সীমারেখা টানবে। যাও, এখন বেড়াতে যাও।'

মিনিমা যখন নলখাগড়ার বনে গিয়ে সুর ভাঁজছিল, তখন ও দেখতে পেল একটা খুব সুন্দর পাখি এসে উঠলো গাছের ডালে বসল। পাখিটার মাথা আর পিঠ নীল, বুকটা লাল। মিনিমা ওকে দেখে ভাবল যে ও নিশ্চয় ভারত বা আফ্রিকার মত সূর্যের দেশ থেকে এসেছে। সেখানে সূর্যের আলোকে ওর রত্নের মতো শরীরটা ঝলমল করে ওঠে।

ও যখন এইসব ভাবছিল, তখন হঠাৎ পাখিটা কথা বলে উঠল, 'এই, তুমি কি জান নোয়ার জাহাজটা কোথায়?' মিনিমা বলল, 'না, জানিনা, কারণ আমি তো একটা সামান্য ইঁদুর। তবে তুমি বুড়ো ব্যাঙকে জিজ্ঞাসা করতে পার, সে খুব জ্ঞানী আর সব কথা জানে।' পাখি বলল, 'এই নদীতে নোয়ার জাহাজ পাওয়া যাবে কিনা কে জানে, যাও না, একবার আমার হয়ে বুড়ো ব্যাঙকে জিজ্ঞাসা করে এস।'

মিনিমা নলখাগড়ার ডাল ছেড়ে যে গর্তে বুড়ো ব্যাঙ বাস করত সেখানে ছুটে গেল। 'ব্যাঙভায়া ও ব্যাঙভায়া' সামনের দরজার নীল ঘণ্টাটা নাড়িয়ে মিনিমা ডাক পাড়তেই দরজাটা খুলে গেল। মিনিমা বলল, 'ওখানে উইলো গাছের গালে একটা খুব সুন্দর পাখি এসেছে, ও জিজ্ঞাসা করছে নোয়ার জাহাজটা কোথায়?' ব্যাঙ বলল, 'হুম্, খুব সুন্দর পাখি—গায়ের রঙ লাল আর নীল-সবুজ। আর বিদ্যুতের চমকের মতো উড়ে বেড়ায়—তাই না?' 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি কি চালাক, সব জান' মিনিমা প্রশংসার কণ্ঠে বলল, 'ওর নাম হচ্ছে মাছরাঙা, ও সবসময় নোয়ার জাহাজ কোথায় জানতে চায়। তবে হ্যাঁ, খুব সাবধান, ওর সামনে কখনো ঘুঘু পাখির কথা বলবে না' 'কেন?' 'নোয়া প্লাবনের পর একটা ঘুঘুকে কোথাও ডাঙা আছে কিনা দেখবার জন্য পাঠিয়েছিলেন, ঘুঘু ফিরে আসবার পর মাছরাঙাকে পাঠিয়েছিলেন, তখন কিন্তু ও এত সুন্দর ছিল না ওর গায়ের রঙ ছিল ধূসর। ও এত উঁচুতে উঠে গেছিল যে আকাশের রঙে ওর পিঠের রঙ নীল হয়ে গেছে আর সূর্যের রশ্মিতে বুকটা লাল হয়ে গেছে। ও যখন কোথাও মাটি খুঁজে পেল না তখন ও জাহাজে ফিরে আসবে ঠিক করল। কিন্তু ওর ফিরে আসতে এত দেরি হয়েছিল যে ইতিমধ্যে নোয়া আর তার লোকজন পৃথিবীতে ফিরে এসেছে আর জাহাজটাও ভেঙে ফেলেছে। কিন্তু ঐ বোকা পাখিটা এখনো নোয়ার জাহাজ খুঁজছে।'

দয়ালু মিনিমা দুঃখিত মনে গল্প শুনল। তারপর ও আবার নলখাগড়ার বনের কাছে ফিরে এল। হঠাৎ মাছরাঙাটা জলের উপর উড়ে গিয়ে একটা মাছ ধরে নিয়ে এসে খেয়ে ফেলল। এই না দেখে মিনিমা ভীষণ ভয় পেয়ে ঠিক করল বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু মাছরাঙা ওকে দেখতে পেয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হে, নোয়ার জাহাজের খোঁজ পেয়েছ নাকি। পাবে না যে তা আমি জানতাম। ও

বাড়ি যাচ্ছ বুঝি? আচ্ছা, কাল আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তোমার চায়ের নেমন্তন্ন রইলো। ওরা বাড়িতে লোক এসে ভীষণ খুশি হয়।'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই, মাছরাঙা আবার নদীর দিকে উড়ে গেল। অগত্যা মিনিমা বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি ফিরে সব কথা মাকে বলার পর মা বলল 'হুম, মাছরাঙা' 'কিন্তু মা, ও খুব সুন্দর পাখি। ওর গায়ের পালকগুলো যে কি সুন্দর তা যদি তুমি—' 'যা কিছু চকচক করে তাই সোনা হয় না' মা বাধা দিয়ে বলল। মিনিমা বলল, 'কিন্তু ওরা খুব প্রাচীন পরিবার, কারণ ওদের পূর্বপুরুষ নোয়ার জাহাজে ছিল।' 'আমরাও ছিলাম মা গর্বের সুরে বলল, আমাদের অনেকেই, যাক আমি তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করব কাল তুমি যাবে কিনা, এখন দাঁতে ধার দিয়ে শুতে যাও।'

কিন্তু মিনিমা অনেকক্ষণ ধরে আকাশের তারা দেখতে লাগল আর ভাবতে লাগল আকাশের নীল রঙ পাওয়া কি ভাগ্যের কথা।

পরদিন আর সকলের ঘুম ভাঙার আগে ও জেগে উঠে সটান বুড়ো ব্যাঙের বাড়ি চলে গেল। ব্যাঙ তখন সবেমাত্র সকালের জলযোগ করছিল। 'কি একটা পোকা খাবে নাকি? খাবে না, আচ্ছা তবে ডাবাতে এক ব্যাগ মাছি আছে, ওর থেকে খাও। এত তাড়াতাড়ি যে?'

'কারণ, আমি খুব উত্তেজিত হয়ে আছি। যদি বাবা আমায় অনুমতি দেয়, তবে আমি আজ মাছরাঙাদের সঙ্গে চা খাব। আচ্ছা, ওরা কি আমায় গান করতে বলবে? তুমি কি জান ওরা কোথায় থাকে? আমি জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি। উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই' ব্যাঙ একটা পাতা চিবোতে চিবোতে বলল, 'ওরাতো গর্তে থাকে। গ্রীকরা বলে ওরা এক বিশেষ শ্রেণীর পাখি। আমি যদি লাল আর নীল হতাম আর আকাশে উড়তে পারতাম, তবে আমি নিশ্চয়ই বিশেষ শ্রেণীর পাখি হতাম, 'বাস্তবিকই তুমি তাই হতে' মিনিমা বলল, 'গ্রীকেরা কি নোয়ার জাহাজের কথা ও বলেছে? মোটেই না, ওরা অন্য গল্প বানিয়েছে। ওরা পাখিটাকে 'হ্যালসিয়ন, বলে ডাকো ওরা ভাবতো ও ভগবানের পোষা। এই পাখি খুব শান্ত বলে এখনো অনেক লোক শান্তিপূর্ণ সময়কে 'হ্যালসিয়ন দিন' বলে, 'আমি কি করে চা খেতে যাব?'

একথা শুনে ব্যাঙ্ একটু ফিকফিক শব্দ করল। 'নদীর তীরে উইলো গাছের পাশে, খরগোসের দ্বিতীয় গর্তে ওরা থাকে' ব্যাঙ বলল।

বিকালে বাবার অনুমতি না নিয়েই মিনিমা বেরিয়ে পড়ল। ও গর্তের কাছে পৌঁছে ভাবল নিশ্চয়ই ও ভুল ঠিকানায় এসেছে। কারণ, গর্তের মুখে যে আধ ডজন বাচ্চাপাখি ছিল তাদের গায়ে কোনো রঙের বাহার নেই। এদের দেখতে ঠিক জীবন্ত পিনকুশনের মত। 'হ্যাল্লো বাচ্চাগুলো বলল, 'এস, এস, মা মাছ নিয়ে এলেই আমরা খাব।' মিনিমা ওদের অনুসরণ করে পিছনে পিছনে যে ঘরে ঢুকল সেটা ওর জীবনে সবচেয়ে ভয়পূর্ণ ঘর। মেজেতে নরম পাতা জাতীয় কিছু থাকার বদলে, কত-গুলো কাঁটার মত কি সব ছিল। তছোড়া পচা মাছের মতো কি সব ছিল। তোমার নাম কি? কোথায় থাক? তোমাদের বাড়ি কি এত সুন্দর! তুমি কি জান নোয়ার জাহাজ কোথায়!' একনাগাড়ে প্রশ্ন করে

গেল বাচ্চারা, মিনিমা ঢোক গিলে বলল, 'আমার নাম মিনিমা, আমাদের বাড়িটা যদিও খুব সুন্দর, তবে এরকম নয়। এমন সময় মা বাবাকে আসতে দেখে বাচ্চারা দরজার কাছে ভীড় করলো। মিনিমা তখনই আবিষ্কার করল যে ও যার উপর বসে আছে, সেগুলো মাছের হাড়। এমন সব মাছের হাড় যারা। আকারে ইঁদুরদের থেকেও বড়।

হঠাৎ বাচ্চাগুলো চেঁচাতে লাগল 'ওকি, কোথায় যাচ্ছ', কারণ' ওরা দেখতে পেল সবুজ মাঠের উপর দিয়ে মিনিমা পালাচ্ছে!

'ও নিশ্চয়ই সব মাছ খেয়ে নিয়েছে' এইরকম একটা মন্তব্য করে বাচ্চারা মার কাছে গিয়ে আবদার ধরল, 'মা, একটা গল্প বল—'

'অনেক দিন আগে' মা পাখি বলল, 'নোয়া বলে একটা লোক ছিল, তার একটা জাহাজ ছিল…. ..

দীঘা ভ্রমণ

অতীন্দ্র ঘোষ—গ্রাঃ সংখ্যা ২৪২২ বয়স—১৪

ভ্রমণের নামেই মন বলে ওঠে, আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী। তাই যখন ঠিক হল আমরা দীঘাভ্রমণে যাব তখন স্বভাবতই আমার মন আনন্দে ভরে উঠল।

১লা মে কলকাতা থেকে আমরা রওনা হ'লাম। কলকাতার এসপ্লানেড থেকে যে এক্সপ্রেস বাসটি ছাড়ে তার চারটে সিট রিজার্ভ করা হ'ল। ১লা মে, সকাল ৭টায় আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু। আমি, বাবা, মা আর দিদু—৪জন দীঘা অভিমুখে যাত্রা করলাম। বাসে করে আমরা ১টা নাগাদ পৌঁছুলাম দীঘায়। বাসটা রাস্তা দিয়ে গিয়ে হঠাৎ ডানদিকে ঘুরতেই এক পলকের জন্য সমুদ্র দেখতে দেখতে পেলাম। (পলকের জন্য এই কারণেই যে তার পরেই দোকান পাট ও Reception officeটি) আর সেই এক পলকের দৃষ্টিতেই সমুদ্রের প্রথম রূপ দেখলাম, মনে পড়ল Wordsworthএর কবিতা yarrow visited তফাৎ এইটুকু যে কবি দেখেছিলেন নদী আমি দেখলাম সমুদ্র। আমরা একটি 'টুরিস্ট কটেজ' ভাড়া করেছিলাম, সেইখানে গেলাম, দুপুরের খাওয়া সেরে আমরা গেলাম সমুদ্রতীরে 'ঝাউবন'-এর ভেতর দিয়ে। সমুদ্রকে কল্পনা করেছিলাম, আকাশের মত নীল আর তিনতলা সমান ঢেউ। কিন্তু হায় সমুদ্র মোটেই তা নয়। সমুদ্রের রঙ কাছে একেবারে গঙ্গাজলের মত, তবে দিগন্তের পানে তা কিছুটা সবুজ আর নীল বর্ডার দেওয়া। আর ঢেউ? তাতে বুঝি একটা মানুষও ডোবে না! নাই হোক, যা দেখলাম না, তার জন্যে আক্ষেপ রইল না, যা দেখলাম তাই যথেষ্ট বলে মনে হ'ল। দীঘার সমুদ্রের বৈশিষ্ট এই যে এখানকার বেলাভূমি অনেক বেশী প্রশস্ত। তার পরদিন পূর্ণিমা, সেদিন ভরা জোয়ার, সমুদ্রের ঢেউ আর গর্জন আর চাঁদের আলো সব মিলিয়ে যে আবহাওয়া ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

পরদিন আশা করেছিলাম সূর্যোদয় দেখার সুযোগ ঘটবে, কিন্তু রাত্রে বৃষ্টি ও মেঘের ফলে দেখা হল না। সকালবেলায় সমুদ্রের তীরে গিয়ে দেখলাম সমুদ্র জোয়ারের সময় অনেক কাছে এসেছে, বেলাভূমি আর দেখা যায় না। সমুদ্রে স্নান করলাম, কিন্তু আমার এটা ভাল লাগলনা। পাঠক পাঠিকারা নিশ্চয়ই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ। কারণটা খুলেই বলি। তোমাদের কারও যদি তালপাতার সেপাই শব্দের অর্থ অজানা থাকে আমাকে দেখলে সেটা জানা হয়ে যাবে। খালি গায়ে, মেঘলা আবহাওয়ায়, আর সমুদ্রের হাওয়ায় আমার লাগল শীত। তাও নাবলাম, কিন্তু জলের ঢেউ লাফিয়ে পার হলেও শরীর গরম হ'ল না। সমুদ্রে শুয়েই পড়লাম হাতের ওপর ভর দিয়ে। তাহলে কি হয়, সেই ঢেউয়ের তাড়নায় আমি একেবারে উল্টো দিকে ঘুরে গিয়ে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিলাম, আর নোনা জল চোখে মুখে গিয়ে, সে কি অবস্থা!

সন্ধ্যাবেলা আবার সমুদ্রের তীরে গিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আর চাঁদের আলো উপভোগ করলাম, কিন্তু বারেবারে মেঘ ঢেকে দিচ্ছিল চাঁদকে।

পরদিন সকালে দীঘা থেকে কিছু দূরে, হেঁটে যাওয়া যায়, আমাদের পক্ষে, বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্তে গেলাম, সেখানে দেখার কিছুই নেই তবে মানসিক আনন্দ—'আমরা উড়িষ্যা ঘুরে এলাম।'

এখানকার সব লোকেরা ওড়িয়া ভাষায় কথা বলে। কারণ জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল, সীমান্ত এলাকায় অনেকদিন বাসের ফলে তাদের মাতৃভাষা ওড়িয়ায় পরিণত হয়েছে, কি মজা বলতো?

৩ তারিখ সন্ধ্যাবেলায় যখন সমুদ্রের তীরে গেলাম তখন মনে হল দীঘায় আজ শেষ সন্ধ্যা। কথাটা ভাবতেও কেমন বুকের ভেতরটা টন টন করে ওঠে উঠল। কী আছে এই ছোট্ট জায়গায় জানিনা কিন্তু তবু ভাবতেই দুঃখ হল। সেদিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত সমুদ্রতীরে বসে রইলাম, জলের খেলা দেখলাম। রাত্রে খেয়ে উঠে আবার ঝাউবনের ধারে বেড়াতে গেলাম। তখন রাত্রি ১১টা, সমুদ্রতীর ধরে এগিয়ে গেলাম—গেলাম আবার সেই বাজারের ধারের বেলাভূমিতে। দাঁড়িয়ে চাঁদের আলো উপভোগ করলাম।

পরদিন সকালে গোছগাছ করার ফাঁকে ফাঁকে সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখছি। একবার গেলামও সমুদ্রতীরে। আশ্চর্য, আগের দিন রাত্রে মনটা যে ভারাক্রান্ত হয়েছিল, আজ সকালে তা একদমই নেই। অবাক হলাম। তবু সমুদ্রকে দেখে দেখেও যেন একঘেঁয়ে লাগেনা। প্রতিবারই মনে হয় নতুন কিছু দেখতে পাব, নতুন কোন স্বাদ পাব। পাই কিনা জানি না, কিন্তু আবার আসতে ইচ্ছে করে। অনেকক্ষণ বসে রইলাম।

বেলা ১-৩০ মিনিটে বাস ছাড়বে কলকাতা অভিমুখে। মালপত্র বাসে তুলে দিয়ে, আর একবার এলাম সমুদ্রতীরে। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে সমুদ্রতীর বেশী দূর নয়।

চললাম সমুদ্রতীরে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে মনে বললাম আবার এখানে আসব এই সমুদ্রকে দেখতে।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, সমুদ্র সেইরকম খেলছে, ঢেউগুলি আছড়ে পড়ছে পাড়ে, এ দৃশ্য যেন ভোলবার নয়।

চোখ ফিরিয়ে নিলেও চোখের সামনে ভাসে, দূরে গেলেও মনের মধ্যে বাজে তার গান। কিছুক্ষণ পর বাসে ফিরে এলাম।

ধাঁধার উত্তর

মিত্রা রায়চৌধুরী গ্রাহক সং ১৪২৫—বয়স ১৩ বছর।

(ক) চিতল (খ) কাশীরাম দাস (গ) শালগম।

অজয় হোম

কলকাতায় ক্রিকেট মরশুম প্রায় শেষ। সি এ বি-র অন্তর্ভুক্ত খেলাগুলিই খালি চলছে। আর বাকি আছে রণজি ট্রফির সেমিফাইনাল বাংলার সঙ্গে রাজস্থান ও রেলদলের বিজয়ীর। হকি সবে শুরু হয়েছে। জলন্ধরে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় লীগ কাম নকআউট প্রতিযোগিতার খেলায় ৪টি গ্রুপের মধ্যে 'সি' গ্রুপে সারভিসেস, গুজরাট, ভুপাল, বিদর্ভ ও কেরালার সঙ্গে বাংলাকে প্রায় একটানা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। ইনামুর রেহমানের নেতৃত্বে ১৮ জনের একদল গেছে জলন্ধরে। মার্চ মাসের শেষে শুরু হবে কলকাতায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা।

বোম্বাইতে সাতটি দেশের আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতের ব্যর্থ ভূমিকায় ভারতীয় হকির ভবিষ্যৎ ভেবে কর্তৃপক্ষ ভাবিত হয়ে পড়েছেন। কেবলমাত্র ভাবিত হলেই কর্তব্য শেষ হবে না সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।

সত্যিই আশ্চর্য লাগে ভারতের মাটিতে প্রতিযোগিতা, তাও পৃথিবীর এক নম্বর হকি দেশ পাকিস্তান, দু'নম্বর অস্ট্রেলিয়া আসে নি। তাছাড়া স্পেন (৬নং), নিউজিল্যাণ্ড (৭নং), কেনিয়া (৮নং), ফ্রান্স (১০নং), পূর্ব জার্মানি (১১নং), ব্রিটেন (১২নং), মালয়েশিয়া (১৫নং) এবং মেক্সিকো (১৬নং) এরাও আসেনি। তাতেই ভারতের বড়ো দল ডার্ক ব্লুজ যথাক্রমে এবং অনেক কষ্টে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। সামনেই এসিয়ান গেমস, তারপর অলিম্পিক।

ক্রিকেট

কলকাতায় ইডেনে ভারতীয় স্কুলদলের চতুর্থ টেস্ট খেলা দেখে খুবই হতাশ হলাম। বড়ো আশা নিয়ে গিয়েছিলাম। পায়ের তলা দিয়ে বল গলানো, ক্যাচ ফসকানো, অক্লেশে বল ছেড়ে দেওয়া, এইসব ব্যাপার বারবার দেখে অস্থির হয়ে উঠেছি। বারে বারে মনে হয়েছে এই স্কুলদল একসময় অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যণ্ড সফর কি সুনামের সঙ্গে খেলে এসে সিংহলের সঙ্গে এভাবে খেলছে কেন? যে সিংহল এখনও কমনওয়েলথ ক্রিকেট কনফারেনসের সভ্য নয় সেই সিংহলের স্কুলের খেলোয়াড়দের লাগছে যেন নেংটি ইঁদুর। কোথায় হেমু অধিকারী যিনি ইংল্যণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফরকারী দলের ম্যানেজার ছিলেন? দল গড়ার ক্ষেত্রে যে প্রয়াস ও প্রস্তুতি দেখা গিয়েছিল ইংল্যণ্ড অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে এবার তার অভাব হল কেন? শুনলাম সিংহলের ছেলেরা নাকি বলে গিয়েছে, 'আমাদের তোমরা আণ্ডার এস্টিমেট করেছিলে বলেই কোনও খেলায় জিততে পারলে না।' বিপক্ষকে অবহেলা করার কি বিষময় ফল! আত্মবিশ্বাস অবশ্যই থাকবে কিন্তু প্রতিপক্ষকে অবহেলা করা কখনও উচিত নয়। হেম অধিকারীর এইসব উপদেশ ছেলেরা ভুলল কি করে?

সিংহলের ছেলেরা পাঁচ টেস্ট সিরিজের খেলায় ৩টি ড্র করে ২টি খেলায় জিতে রাবার নিয়ে ফিরে গেল। আঞ্চলিক ৫টি খেলার মধ্যে ৪টি খেলায় জয়লাভ। সুতরাং সমগ্র সফরে ১০টি খেলার মধ্যে সিংহল স্কুলদল ৬টি খেলায় বিজয়ী, ৪টি খেলা ড্র। অপরদিকে ভারতীয় স্কুলদলের জয়ের ঘরে ০ শূন্য

ব্যাডমিনটন

চার-চারবার হার স্বীকারের পর বাংলার ছেলে রেলওয়ের প্রতিনিধি দীপু ঘোষ এবার ব্যাডমিনটনে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছে। ফাইনালে তিনবার হার স্বীকার করতে হয়েছে সুরেশ গোয়েলের কাছে। এবার কলকাতায় ইডেনে প্রায় ২০ বছর বাদে আয়োজিত জাতীয় প্রতিযোগিতার ফাইনালে সেই সুরেশ গোয়েলকেই স্ট্রেট গেমে হারিয়ে বিজয়ী হল দীপু ঘোষ। সুরেশ গোয়েল তাঁর খ্যাতি অনুযায়ী মোটেই খেলতে পারেন নি। তাঁর সেই একই অ্যাকশনে স্ম্যাশ ও ড্রপ মারার যে মারাত্মক শট তা ফাইনালের দিন কেমন যেন নিষ্প্রভ ছিল। মোটেই খুলছিল না।

কেবলমাত্র সিঙ্গলসের চ্যাম্পিয়নশীপ নয় ভাই রমেন ঘোষকে নিয়ে ডাবলসেও বিজয়ী হয়ে দীপু ঘোষ দ্বিমুকুটের সম্মান পেয়েছেন।

বড়ো ভালো লাগল উত্তরপ্রদেশের দময়ন্তী সুবেদারের খেলা দেখে। চ্যাম্পিয়নশীপ পেল সেই। গতবারেও পেয়েছিল। কি সুন্দর ব্যাকহ্যাণ্ড স্ট্রোক, তেমনি ফোরহ্যাণ্ড স্ম্যাশ ও ড্রপ শট। ফাইনালে দময়ন্তীর কাছে হেরে গেল যে মেয়েটি মহারাষ্ট্রের শোভা মুর্তি সে খুব সুন্দর খেলে। আর আনন্দ দিয়েছে জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন মরিন ম্যাথিয়াস।

ফুটবল

কোচ বদল করলে যে কি হয় তার ফল দেখলাম মোহনবাগান-ক্যালকাটা মাঠে চেকোস্লোভেকিয়ার

ইণ্টার ব্রাডিস্লাভা ও আইএফএ-র খেলায়। বছর কয়েক আগে চেকোস্লোভেকিয়ার স্লোভান ব্রাডিস্লাভা দল রবীন্দ্র সরোবরে খেলে গিয়েছিল তারা এর চেয়ে অনেক শক্তিশালী ছিল। সেই দলে ছিল প্রোফেশনাল ফুটবলে বিশ্ব একাদশের অন্যতম খেলোয়াড় পপ্ লুহার। অত বড়ো খেলোয়াড় বিদেশ থেকে ভারতে কোনদিন আসে নি।

বর্তমান ইণ্টার ব্রাডিস্লাভা ইওরোপের খুবই মাঝারি একটা দল। খুবই যে ভালো খেলল বা শক্তিশালী দল তাও নয়। অবশ্য এদের আক্রমণ করার পদ্ধতি, পারস্পরিক যোগাযোগ ও রিসিভিং বেশ ভালো। এই মাছারি বিদেশী দলের বিরুদ্ধে আমাদের জাতীয় ফুটবলের বিজয়ী বাংলার খেলোয়াড়দের ভূমিকা দেখে অবাক। ৩-১ গোলে হারাটাই বড়ো কথা নয়। কিন্তু খেলার কি রকম! আক্রমণের তীব্রতা কোথাও দেখা গেল না। সবটাই পদ্ধতির গণ্ডগোল। আধুনিক ফুটবলের একেবারে অনুপযোগী খেলা। নিজেদের মধ্যে বল দেওয়ানেওয়া করার সময় পিছন দিকের খেলোয়াড়দের কাছে বল ঠেললে আক্রমণ কখনই তীব্র হতে পারে না। বল পিছনে ঠেলাতে প্রতিপক্ষ সহজে রক্ষণব্যূহ সাজিয়ে নিয়েছে। তার পরে পায়ে যত কাজই থাক তখন আর রক্ষণব্যূহ ভেদ করা যায় না। তাছাড়া তারা দীর্ঘদেহী খেলোয়াড়, চটুলগতিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে পিছিয়ে খেলে, তাদের প্রতিরোধ গড়ে নেওয়া কিছুই নয়। আই এফ এ-র পিছনে বল ঠেলা খেলা দেখে অবাক হলাম। এ খেলা কে শেখাল?

টেনিস

ডেভিস কাপের খেলায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়দীপ মুখার্জিকে বাদ দিয়ে অল ইণ্ডিয় লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশন খুবই বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। বেশ কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছিল তাঁর খেলায় অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস অথচ তার প্রস্তুতি নেই একদম। বিশ্ব টেনিস খেলতে গেলে যে সংযম ও অনুশীলন এবং যেভাবে শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন তা তাঁর মধ্যে একান্ত অভাব এই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। এটা শুরু হয় কৃষ্ণানকে হারাবার পর থেকেই। কৃষ্ণানকে হারানো যেন একমাত্র লক্ষ্য, তারপর আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। এই নিষ্ক্রিয়তা অলসতার ব্যাধি ভারতের প্রতিটি শীর্ষস্থান অধিকারী যে কোনও খেলোয়াড়েরই সংক্রামক ব্যধি। এদিকে প্রেমজিৎলাল ধৈর্য অধ্যবসায় ও অনুশীলনের ফলে অসম্ভব উন্নতি করে চলেছেন। শশী মেনন ও গৌরব মিশ্র ভারতের দুজন উঠতি-খেলোয়াড় এবার পূর্ণ সুযোগ পাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার।

সত্যজিৎ রায়

১৯শে নভেম্বর

গোল্ডস্টাইন এই মাত্র পোস্ট আপিসে গেল কী একটা জরুরি চিঠি ডাকে দিতে। এই ফাঁকে ডায়রিটা লিখে রাখি। ও থাকলেই এত বক্ বক্ করে যে তখন ওর কথা শোনা ছাড়া আর কোন কাজ করা যায় না। অবিশ্যি প্রফেসর পেত্রুচিও আমার সঙ্গেই রয়েছেন, আমার সামনেই বসে, কিন্তু কাল হোটেলে তার হিয়ারিং এড'টা হারিয়ে যাবার ফলে তিনি শব্দটব্দ বিশেষ শুনতে পাচ্ছেন না, ফলে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা একরকম বন্ধই করে দিয়েছেন। এদেশের ভাষাটা তার বেশ ভালো ভাবেই জানা আছে, এবং আপাতত তিনি একটি স্থানীয় খবরের কাগজ মুখের সামনে খুলে বসে আছেন।

আমাদের বাসার জায়গাটা হল বাগ্দাদ শহরের একটা রেস্টোরাণ্ট। দোকানের বাইরে ফুটপাথের উপর ফরাসী কায়দায় চাঁদোয়া টাঙিয়ে তার তলায় টেবিল-চেয়ার পাতা, এবং তারই একটাতে আমরা বসেছি। কফি অর্ডার দেওয়া হয়েছে, এই এলো বলে।

বাগ্দাদে আসার কারণ হল-আন্তর্জাতিক আবিষ্কারকসম্মেলন অর্থাৎ ইণ্টারন্যাশনার ইন্ভেণ্টরস কনফারেন্স। বৈজ্ঞানিক সম্মেলন বহুকাল থেকেই পৃথিবীর নানান জায়গায় হয়ে আসছে, কিন্তু আবিষ্কারক সম্মেলন এই প্রথম। বলা বাহুল্য এখানে যাঁরা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে আমার স্থান খুবই উঁচুতে। পৃথিবীর কোন একজন বৈজ্ঞানিক এর আগে আর কখনো এতরকম জিনিস অবিষ্কার করেনি। যারা এসেছেন, তার সকলেই তাদের লেটেস্ট ইনভেনশনটি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, এবং এই সম্মেলনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য হল এই সব আবিষ্কারের খবর পৃথিবীতে প্রচার করা। আমি এনেছি আমার 'অম্নিস্কোপ' যন্ত্র, এবং এটা বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে। যন্ত্রটা হল

একরকম চশমা যাতে টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ ও এক্স-রে-এই তিনটে জিনিসেরই কাজ চলে।

কন্‌ফারেন্স কাল শেষ হয়ে গেছে! বাইরে থেকে যারা এসেছিলেন, তাদের অনেকেই আজ সকলে যে যার দেশে ফিরে গেছেন। আমরা তিনজন আপাতত, আরো কিছুদিন থাকব। আমি প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলাম হপ্তা-খানেক থেকে যাব সঙ্গে যে আরো দুজনকে পেয়ে গেলাম সেটা কপাল জোরে। আমি নিজে কাউকে কিছুই বলিনি কাল রাত্রে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিনার ছিল, খাওয়া সেরে হোটেলে ফেরার পথে গোল্ডস্টাইন জিগ্যেস করল: 'তুমি কি কালই ফিরে যাচ্ছ নাকি?' আমি বললাম 'হারুণ অল্‌-রশিদের দেশে মাত্র সাতদিন থেকে ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। ভাবছি দেশটিকে আরকটু ঘুরে দেখব। এখানকার প্রাচীন সভ্যতার কিছু নমুনা চাক্ষুষ দেখে তারপর দেশে ফিরব।'

গোল্ডস্টাইন উৎফুল্ল,বলল, যাক, তাহলে একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। আর, শুধু হারুন-অল্‌-রশিদের দেশ বলছ কেন? হারুণ তা মাত্র হাজার বছর আগের কথা। তার আগের কথাও ভাবো!

আমি বললাম। 'ঠিক কথা! আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে গর্ব করি কিন্তু এযে তার চেয়েও অনেক পুরোনো। সুমেরীয় সভ্যতার যেসব চিহ্ন মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে, সে তো আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগেকার ব্যাপার। ঈজিপ্টেও এতদিনের সভ্যতার কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি।'

গোল্ডস্টাইন বলল, 'আবিষ্কারক সম্মেলন এদেশে হবার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে সেটা খেয়াল করেছ নিশ্চয়। এদেশের প্রথম লেখার আবিষ্কার হয় প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে আর এই লেখা থেকেই সভ্যতার শুরু।'

প্রাচীন কালে যাকে মেসোপটেমিয়া বলা হত, তারই অন্তর্গত ছিল ইরাক। মেসোপটেমিয়া টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর ধারে। এখন যেখানে বাগদাদ শহর, তার আশে পাশে পৃথিবীর প্রথম সভ্য মানুষ দেখা দেয়। এই সভ্যতার নাম সুমেরিয় সভ্যতা। পাথরের গায়ে খোদাই করা পৃথিবীর আদিমতম লেখার অনেক নমুনা প্রত্নতাত্ত্বিকরা বাগদাদের আশে পাশেই আবিষ্কার করেছেন। শুধু তাই নয়, বৈজ্ঞানিকদের পরিশ্রমের ফলে এই সব লেখার মানে বার করাও সম্ভব হয়েছে।

এই প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে অনেক উত্থান পতন লক্ষ্য করা যায়। আজ থেকে চার হাজার বছর আগে সুমেরিয়দের আক্রমণ করে সেমাইট জাত। যুদ্ধে সুমেরিয়দের পরাজয় হয়। এর পরে ইতিহাসে আমরা ব্যাবিলন ও অ্যাসেরিয়ার উত্থানের কথা জানতে পারি। আর তার সঙ্গে সঙ্গে পাই জাঁদরেল সব রাজাদের উল্লেখ—নেবুচাদনেজার, বেলসজোর, সেনাচোরিব, অসুরবানিপাল। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন মহৎ ও উদারচেতা, আবার কেউ কেউ ছিলেন দুবৃত্ত, অত্যাচারী।

তখনকার দিনেও ব্যাবিলন শহরের সবচেয়ে বড় প্রাসাদের উচ্চতা ছিল প্রায় ১০০ ফুট।

প্রাসাদে প্রাসাদে শহর এমন ছেয়ে ছিল যে দূর থেকে দেখে মনে হত যেন দেবপুরী। রাত্রেও এ শহরের শোভা কিছুমাত্র কমত না, কারণ দু হাজার বছর আগেই ব্যাবিলনিয়রা তাদের মাটি থেকে পেট্রোলিয়াম আহরণ করে তাকে কাজে লাগাতে শিখে গিয়েছিল। পেট্রোলিয়ামের আলোয় গভীর রাতেও সারা শহর ঝলমল করত।

আড়াই হাজার বছর আগে পারস্যসেনা এসে ব্যাবিলন আক্রমণ করে, এবং সেমাইটদের পরাজিত করে। এই পারস্যদের মধ্যেও আশ্চর্য পরাক্রমশালী রাজাদের নাম আমরা পাই—দারিয়স, সাইরাস, জেরক্সেস—কেউ মহৎ, কেউ বা প্রচণ্ড ভাবে নৃশংস। এই সময়ই পারস্যদের অন্তর্গত একটা ভবঘুরে জাত বেলুচিস্তানের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছায়। এদেরই বলা হয় এরিয়ান বা আর্য। আসলে এরিয়ান ও ইরাকীয়তে কোন তফাৎ নেই।

এই সব কারণে এ-দেশটার সঙ্গে আমাদের ভারতীয়দের যে একটা বিশেষ আত্মীয়তা আছে সেটা ত অস্বীকার করা যায় না। আর ভারতবর্ষে কটা শিক্ষিত লোক আছে যারা আরব্যোপন্যাস পড়ে মুগ্ধ হয় নি? আর হারুণ-অল্‌-রশিদের বাগদাদের যে বর্ণনা আমরা আরব্যোপন্যাসে পাই, তাতে বেশ বোঝা যায় সে সময় বাগদাদ একটা গম্‌গমে শহর ছিল। আজকের শহরের সঙ্গে গল্পের সে-শহরের বিশেষ মিল নাও থাকতে পারে, কিন্তু যাদের কল্পনাশক্তি আছে, তারা এখানে এসে সেই সব গল্পের কথা মনে করে একটা রোমাঞ্চ অনুভব না করে পারে না।

গোল্ডস্টাইন ফিরছে। সঙ্গে একটা অচেনা বৃদ্ধকে দেখতে পাচ্ছি। স্থানীয় লোক বলেই ত মনে হচ্ছে। পরণে কালো স্যুট, কিন্তু মাথায় লাল ফেজ টুপি। এ আবার কার আবির্ভাব হল কে জানে।

১৯শে নভেম্বর, রাত ১১টা

আমার এই পঁয়ষট্টি বছরের জীবনে কত রকম অদ্ভুত লোকের সঙ্গে যে আলাপ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এইসব লোক সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। যদিও এদের অনেকের সঙ্গেই একবারের বেশি দেখা হয়নি। তবুও এদের কারুর কথাই কোনদিনও ভুলতে পারব না।

এইরকম একজন অদ্ভুত লোকের সঙ্গে আজ সকালে আলাপ হল। এঁকেই গোল্ডস্টাইন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। ভদ্রলোক হবারী, নাম হাসান অল্‌-হাব্বাল। বয়স আমার চেয়েও হয়ত কিছুটা বেশি, কিন্তু গতিবিধি রীতিমত চটপটে ও চোখের চাহনিও আশ্চর্যরকম তীব্র।

গোল্ডস্টাইন আলাপ করিয়ে দিতে ভদ্রলোক হাসিমুখে কুর্নিশ করে পাশের চেয়ারে বসে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার জীবনে আপনিই প্রথম ভারতীয় যার সঙ্গে আমার আলাপ হল। এ আমার পরম সৌভাগ্য, কারণ ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের যে ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে, সে কথা আমি কখনও ভুলিনা।'

আমি একটা উপযুক্ত মোলায়েম উত্তর দিয়ে মনে মনে ভাবছি গোল্ডস্টাইন হঠাৎ এঁকে আমাদের

মধ্যে এনে হাজির করল কেন, এমন সময় ভদ্রলোক নিজেই এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেললেন। তিনি বললেন, 'সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের এই বাগদাদ শহরে এসেছেন জেনে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছিল। আপনাদের ছবি কাগজে দেখেছিলাম, ইচ্ছে ছিল আলাপ করি, কিন্তু কী ভাবে করব বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ পোস্ট আপিসে এঁকে দেখতে পেয়ে আমি নিজেই এগিয়ে গিয়ে আলাপ করি।'

ওয়েটার দেখে আর এক কাপ কফির জন্যে বলে দিলাম, কারণ ভদ্রলোক যেভাবে বসেছেন, তাতে তার যাবার খুব তাড়া আছে বলে মনে হল না। দুহাতের আঙুলে আংটির নমুনা দেখে মনে হচ্ছিল লোকটি বেশ অর্থবান্। পোশাকেও সে ইঙ্গিত রয়েছে।

একটা সোনার কেস খুলে কালো রঙের সিগারের প্রথমে আমাদের অফার করে, তারপর নিজে ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমাদের যে-প্রশ্নটা করার ইচ্ছে ছিল সেটা হচ্ছে এই—আপনারা সব বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক, কিন্তু আমাদের দেশে কতরকম জিনিস যে হাজার হাজার বছর আগেই আবিষ্কার হয়ে গেছে সেটা কি আপনারা জানেন?'

উত্তরে আমি বললাম, 'তা—প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৌলতে কিছু কিছু জানতে পেরেছি বৈকি। ধরুন, আপনাদের প্রাচীন লেখা, প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র, আপনাদের চার হাজার বছর আগের পেট্রোলিয়াম বাতি, আপনাদের—'

অল্ হাব্বাল হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বলল, 'জানি জানি জানি—এ সবই বইয়ে লেখে সাহেবরা—প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের বই! আমি জানি। আমি পড়েছি। কিন্তু এতো কিছুই না!'

'কিছুই না?' আমি আর গোল্ডস্টাইন সমস্বরে বলে উঠলাম। পেক্রচিও দেখি হাতের কাগজ ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসে অল্-হাব্বালের ঠোঁটের দিকে চেয়ে আছে; বোধহয় তার ঠোঁট নড়া দেখেই কথাগুলো বুঝে ফেলতে চায়।

অল্-হাব্বাল একবার চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'রেষ্টোরাণ্টে বড় ভীড়, আর রাস্তার গোলমালে গলা নামিয়ে যে কথা বলব তারও উপায় নেই। আপনাদের কফি খাওয়া হয়ে থাকলে চলুন নিরিবিলি কোথাও যাই।'

গোল্ডস্টাইন ওয়েটারকে দেখে পয়সা দিয়ে দিল। আমরা চারজনে উঠে নদীমুখো হাঁটতে শুরু করলাম।

টাইগ্রিস নদীর পাশ দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত একটা চমৎকার বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে, তার একপাশটায় পাম-জাতীয় গাছের সারি। সেই গাছের ছায়া দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অল্ হাব্বাল তার বাকি কথাগুলো বললেন।

ভদ্রলোক প্রথমেই জিগ্যেস করলেন, 'তোমরা আরব্যোপন্যাস পড়েছ ত?'

আমি বললাম, 'সে আর কে পড়েনি বলুন। এমন গল্পের সম্ভার ভারতবর্ষের বাইরে এক

আপনাদের দেশেই আছে। ছেলেবুড়ো সবাই এ গল্প জানে। অন্তত কয়েকটিত জানেই।'

অল্‌-হাব্বাল মৃদু হেসে বললেন, 'কী মনে হয় গল্পগুলো পড়ে?'

আমি বললাম, 'মানুষের কল্পনাশক্তি যে কত মজার ও কত রংদার কাহিনী সৃষ্টি করতে পারে, সেটা এসব গল্প পড়লে বোঝা যায়।'

অল্‌-হাব্বাল আবার সেই অদ্ভুত খিলখিল হাসি হেসে বললেন, 'কল্পনা?—তাই না? সকলেই তাই ভাবে। কল্পনা ছাড়া আর কী হবে—এমন অদ্ভুত সব ব্যাপার কী আর বাস্তবে ঘটতে পারে। অথচ তোমরা যে এখানে কন্‌ফারেন্স করলে, তোমরা সকলেই একটা করে নিজেদের আবিষ্কৃত জিনিস নিয়ে এসেছ, তার মধ্যে অনেকগুলি ভারী অদ্ভুত—একেবারে তাক্‌ লেগে যাবার মতো। কিন্তু কই—সে গুলোকেত কেউ কল্পনা বলছে না। যেহেতু চোখে দেখছে, সেহেতু সেটা বাস্তব বলে মেনে নিচ্ছে। তাই নয় কি?'

আমি আর গোল্ডস্টাইন পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। নদী দিয়ে একটা বাহারের পালতোলা নৌকা যাচ্ছে—চট্ করে দেশের কথা মনে পড়ে গেল। অল্‌-হাব্বাল বলল, 'চলুন—ওই বেঞ্চিটায় বসা যাক্।'

ঘড়িতে দেখি সাড়ে এগারটা।

লোকটা হয়ত ছিটগ্রস্ত। সন্দেহটা কিছুক্ষণ থেকেই আমার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। নাহলে ওরকম অদ্ভুতভাবে হাসে কেন?

বেঞ্চিতে বসে আরেকটা কালো সিগারেট ধরিয়ে অল্‌-হাব্বাল বললেন, 'তোমরা যদি প্রতিজ্ঞা কর যে আমি যা দেখাব তা তোমরা কোথাও প্রচার করবেনা, আর আমার দেখানো কোন জিনিস তোমরা নিতে চাইবে না—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'কী আশ্চর্য কথা! তোমার জিনিস আমরা চাইব কেন?'

অল্‌-হাব্বাল আর একটা ক্রুর হাসি হেসে বলল, 'তোমার কথা বলছি না, কিন্তু'—এবারে তার দৃষ্টি গোল্ডস্টাইনের দিকে—'পশ্চিমের অনেক যাদুঘরেইত আমাদের দেশের অনেক ভালো জিনিসই চলে গেছে কিনা! বেশির ভাগইত বাইরে, তাই ভয় হয় নিজের জন্য না চাইলেও, যদি যাদুঘরের লোক লেলিয়ে দাও!'

গোল্ডস্টাইন কোনরকমে তার অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'না-না-তা কেন করব! কথা দিচ্ছি, তোমার জিনিসের কথা কাউকে বলব না। কিন্তু জিনিসটা কী?'

আমি মনে মনে জানতাম, যাদুঘরের লোক লেলিয়ে না দিলেও জিনিসটা যদি তেমন লোভনীয় হয়, তাহলে গোল্ডস্টাইন হয়ত নিজেই সেটার ওপর চোখ দিতে পারে। কারণ প্রথমত, ভদ্রলোক প্রচুর পয়সাওয়ালা মার্কিন ইহুদী, বিজ্ঞান তার শখের ব্যাপার; দ্বিতীয়তঃ, তার আসল বাতিক হচ্ছে পুরোন জিনিস সংগ্রহ করা। বাগদাদে এসে এই কদিনের মধ্যেই আমার চোখের সামনে সে প্রায় হাজার ডলারের খুঁটিনাটি পুরোন জিনিস কিনে ফেলেছে।

অল্‌-হাব্বাল্‌ এবার অল্পাধিক রকম গম্ভীর স্বরে বলল, জিনিস একটা নয়—অনেক। খৃষ্টপূর্ব যুগের সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এখন থেকে সত্তর মাইল দূরে যেতে হবে। গাড়ির ব্যবস্থা আমি করব। আমার নিজের গাড়ি আছে।'

এর বেশি আর অল্‌-হাব্বাল বলল না।

কাল সকালে সাড়ে আটটায় ওর গাড়ি নিয়ে আসার কথা আছে। ভদ্রলোককে বিদায় দেবার পর গোল্ডস্টাইন ও পেত্রুচিওর সঙ্গে কথা হয়েছে। ওদের দুজনেরই ধারণা অল্‌-হাব্বাল্‌ একটি আস্ত পাগল যেমন পাগল পৃথিবীর সব শহরেই কয়েকটি করে থাকে। গারদে পাঠানোর অবস্থা। এখনো হয়নি, তবে ভবিষ্যতে হবেনা একথা জোর দিয়ে বলা চলে না।

সব শুনে আমি বললাম, 'পরের গাড়িতে বিনি পয়সায় যদি বাগদাদের আশপাশটা ঘুরে দেখা যায় তাহলে মন্দ কী?'

হোটেলে ফিরে লাঞ্চ খেয়েছি প্রায় দেড়টায়। দুপুরে একটু গড়িয়ে নিয়েছি। এখানকার ক্লাইমেট খুবই ভালো; শরীরে রীতিমত শক্তি ও মনে প্রচুর উৎসাহ অনুভব করছি।

২০শে নভেম্বর

বাগদাদের মত আজব শহরে আজব অভিজ্ঞতা হবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কিন্তু ঠিক এতটা আশা করিনি। রূপকথা কল্পনার জগতের জিনিস। সেটা শুনে বা পড়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় সেটা একটা বিশেষ ধরনের আনন্দ। কিন্তু হঠাৎ যদি দেখা যায়, সে রূপকথার অনেক কিছুই বাস্তব জগতে রয়েছে, তাহলে হঠাৎ কেমন জানি সব গণ্ডগোল হয়ে যায়।

থাক্‌গে—এবার আজকের ঘটনায় আসা যাক্‌।

হাসান অল্‌-হাব্বাল্‌ তার কথামত ঠিক সাড়ে আটটার সময় তার একটি সবুজ সিত্রোঁয় গাড়ি নিয়ে হোটেলে এসে হাজির হলেন। শুধু গাড়ি নয় গাড়ির ভিতর আবার একটা বেতের বাস্কেট। তার সেই অদ্ভুত হাসি হেসে ভদ্রলোক বললেন, 'তোমাদের দুপুরের লাঞ্চটা। আমার সঙ্গে রয়েছে। আজ সারাদিনের জন্যে তোমরা আমার অতিথি।'

নটার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পেত্রুচিও কাল সারা বিকেলে বাগদাদের দোকানে দোকানে ঘুরে একটা কানের যন্ত্র জোগাড় করেছে, তার ফলে আজ তার মুখের ভাবই বদলে গেছে। গোল্ডস্টাইন এমনিতেই আমুদে লোক—গাড়িতে ওঠার সময় বলল—'ছেলেবেলায় দলে বলে গাড়িতে করে পিকনিকে বেরোতাম—সেই কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।'

কথাটা বলেই সে আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপল। বুঝলাম সে অল্‌ হাব্বালের একটা কথাও বিশ্বাস করে নি। তার অন্য কোন কাজ নেই বলেই সে আমাদের সঙ্গ নিয়েছে, এবং আউটিং এর যে আনন্দ, তার বেশি সে কিছুই আশা করছে না।

টাইগ্রিস নদীর উপর একটা ব্রিজ পেরিয়ে আমরা পশ্চিমদিকে চললাম। এদিকটায় গাছপালা

বিশেষ নেই—রতকটা শুক্‌নো মরুভূমির মত। তবে নভেম্বর মাস বলে গরম একদম নেই।

গাড়ি চালাতে চালাতে অল্‌-হাব্বাল্‌ বলল, 'আমরা যে জায়গায় যাচ্ছি সেখানে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যে ব্যবধান মধ্যে পঁচিশ মাইল। দুটো নদী এত কাছাকাছি হওয়াটা ব্যাবিলনের সমৃদ্ধির একটা কারণ ছিল।'

একটা প্রশ্ন কাল থেকেই আমার মাথায় ঘুরছিল, এখন আর সেটা না জিগ্যেস করে পারলাম না।—

'তুমি কি বৈজ্ঞানিক? মানে, প্রত্নতাত্ত্বিক, বা ওই জাতীয় একটা কিছু?'

অল্‌-হাব্বাল্‌ বলল, 'বৈজ্ঞানিক বলতে যদি ডিগ্রিধারী বোঝায়, তাহলে আমি বৈজ্ঞানিক নই। আর প্রত্নতাত্ত্বিক বলতে যদি মাটি খুঁড়ে প্রাচীন সভ্যতার নমুনা আবিষ্কার করা বোঝায়, তাহলে আমি অবশ্যই একজন প্রত্নতাত্ত্বিক।'

এদিকে গাড়ি দেখি সমতলভূমি ছেড়ে চড়াই উঠতে আরম্ভ করেছে। দূরে পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। অল্‌-হাব্বাল্‌ বলল, 'ওই পাহাড়গুলোই ইরাকের সীমানা নির্দেশ করেছে। ওর পিছন দিকে পারশিয়া।'

চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যও ক্রমে বদলাতে বদলাতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের গাড়ি একটা গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করল। দুদিকে খাড়াই পাহাড়ের মধ্যে রাস্তা দিয়ে আমরা চলেছি। বাগদাদে আসবার আগে আমি ইরাক সম্বন্ধে খানিকটা পড়াশুনা করে নিয়েছিলাম। জিগ্যেস করলাম, 'আমরা কি আবু গুয়াইবে এসে পড়েছি। অল্‌-হাব্বাল্‌ মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক বলেছ। আর দশ মাইল গেলেই আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাব।'

গিরিবর্ত্মের মধ্যে সূর্যের আলো প্রায় পৌঁছোয় না, তাই বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছিল। আমি গলার মাফলারটাকে বেশ ভালো ভাবে জড়িয়ে নিলাম। পেক্রচিও এখনো পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। লোকটাকে চেনা ভারী মুশকিল। গোল্ডস্টাইনকে দেখে মনে হল তার ঘুমের আমেজ এসেছে।

গিরিবর্ম পেরোতেই দেখি প্রাকৃতিক দৃশ্য আবার বদলে গেছে। কিছুদূরে সবুজ রং দেখে বুঝলাম এদিকটায় গাছপালার অভাব নেই। তারই মাঝে মাঝে আবার ছাই রং-এর পাথরের টিলা মাথা উঁচিয়ে রয়েছে।

গাড়ি মেইন রোড থেকে বাঁ দিকে মোড় নিল। অল্‌-হাব্বাল্‌ গুন্‌ গুন্‌ করে ইরাকী সুর ভাঁজছে—তার সঙ্গে ভারতীয় সুরের আশ্চর্য মিল। কত বয়স হবে লোকটার? দেখে আন্দাজ করার কোন উপায় নেই। হাসলে পরে চোখের কোনে অসংখ্য কুঁচকোন লাইন দেখা দেয়। তাই দেখে এক এক সময় মনে হয় বয়স নব্বই ও হতে পারে। অথচ কী আশ্চর্য এনার্জি লোকটার ষাট মাইলের উপর গাড়ি চালিয়ে এলো-এখনো ক্লান্তির কোন লক্ষণ নেই।

আরো মিনিট দশেক চলার পর গাড়িটা একটা ঝাউ গাছের পাশে এসে থামল। অল্‌ হাব্বাল্‌ বলল, 'বাকি পথটুকু আমাদের হেঁটে যেতে হবে। বেশি না—সিকি মাইল পথ।'

অদ্ভুত নির্জন নিস্তব্ধ পরিবেশ। গাছপালা রয়েছে অনেক—উইলো, ওক, ঝাউ, খেজুর ইত্যাদি—প্রায় বনই বলা যেতে পারে, অথচ তারই ফাঁকে ফাঁকে এক একটা বিরাট পাথরের ঢিবিও রয়েছে। মাঝে মাঝে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, তার মধ্যে বুলবুলের ডাকটা শুনে দেশের কথা মনে পড়ে গেল। জায়গায় জায়গায় গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে, আর সে রোদটা গায়ে পড়লে বেশ আরামই লাগছে।

এবার চোখে পড়ল আমাদের সামনেই একটা বেশ বড় পাথরের ঢিপি। অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে ঢিপিটা, আর তার সবচেয়ে উঁচু জায়গাটা প্রায় একটা চারতলা বাড়ির সমান।

টিলাটার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় অল্‌-হাব্বাল্‌ হঠাৎ থেমে বলল, 'এসে গেছি।'

কোথায় এসে গেছি? বাঁ দিকে ঝাউ বন, আর ডান দিকে টিলার খাড়াই অংশ—এ ছাড়া আর কিছুই নেই। এখানে দেখবার কী থাকতে পারে?

অল্‌-হাব্বালের দিকে চেয়ে দেখি তার মুখের ভাব একদম বদলে গেছে। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, সারা শরীর কেমন যেন একটা উত্তেজনার ভাব, যার ফলে সে তার হাতদুটোকে স্থির রাখতে পারছে না। হঠাৎ সে তার অদ্ভুত কায়দায় খিল খিল করে হেসে আমাদের তিনজনের উপর তার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে চাপা গলায় বলে উঠল—'তোমরা না সব আবিষ্কারক—ইনভেন্টার্স? বিংশ শতাব্দীর সব বড় বড় বৈজ্ঞানিক? বেশ—তাহলে ছাখো এবার প্রথম শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের কারসাজি!—'চিচিং ফাঁক্‌!'

আমি বাংলায় চিচিং লিখলেও অল্‌-হাব্বাল্‌ অবিশ্যি আরবী 'সিম্‌ সিম্‌' শব্দটাই ব্যবহার করেছিল, কিন্তু এই শব্দ উচ্চারণের ফলে যে ঘটনাটা ঘটল সেটা আজকের দিনের মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা খুব কঠিন।

টিলার গায়ে একটা বিরাট আলগা পাথরের অংশ একটা গম্ভীর ঘড় ঘড় গর্জনের সঙ্গে এক পাশে সরে গিয়ে গহ্বরের ভিতরে যাবার একটা পথ করে দিল। আমরা তিনজন থ হয়ে দাঁড়িয়ে এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটতে দেখলাম।

অল্‌-হব্বল্‌ আমাদের এই অবাক বোকা-বনে-যাওয়া ভাবটা কয়েক মুহূর্ত উপভোগ করে নিয়ে, কুর্নিশ করে, তার বাঁ হাতটা থিয়েটারী ভঙ্গীতে গহ্বরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আলিবাবার গুহায় প্রবেশ করতে আজ্ঞা হোক্‌!'

[ক্রমশঃ

যে ট্রাম/ট্রেন থামবে না

অদ্রীশ বর্ধন

ট্রাম বা ট্রেন বার বার থামে বলেই তো সময় নষ্ট হয়। যাত্রীরাও বিরক্ত হন। সেইসঙ্গে ট্রাম-ট্রেনের দুই তৃতীয়য়াংশ শক্তি নষ্ট হয় বারবার থেমে আবার চলার জন্যে। এ সমস্যার কি সুরাহা নেই? আছে। ট্রাম অথবা ট্রেন না থামলেই হল। কিন্তু যাত্রীরা ওঠানামা করবে কি করে? তারও সমাধান আছে।

মনে করা যাক ঃ—

ক আর খ দুটি স্টেশন। দুটি স্থির চাকতি। কিন্তু তাদের ঘিরে আংটির মত প্ল্যাটফর্মদুটি যেন রিভলভিং স্টেজ। অনবরত ঘুরছে। পাশেই ট্রাম অথবা রেল লাইন। একই গতিতে স্টেশন-দুটিকে বেড় দিয়ে ট্রাম অথবা ট্রেন যাচ্ছে—থামছে না। থামবার দরকারও হচ্ছে না। কেননা, ট্রাম বা ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আংটি-প্ল্যাফর্মদুটিও ঘুরছে। সমান গতিতে ঘোরার দরুন মনে হচ্ছে যেন কেউ ঘুরছেনা। যেন ট্রাম স্থির, ট্রেন স্থির, প্ল্যাটফর্ম স্থির। ফলে, চলন্ত গাড়ি থেকে যাত্রীরা অনায়াসে প্ল্যাটফর্মে ওঠানামা করছে।

গাড়ি থেকে নেমে যাত্রীরা এগোবে স্থির চাকতি ক আর খ-য়ের দিকে। কোনো অসুবিধে হবে না। কেননা, ঘুরন্ত চাকার কিনারা যত জোরে ঘোরে, তার মাঝের অংশ তার চাইতে অনেক আস্তে ঘোরে। স্থির চাকতির কাছে ঘুরন্ত আংটি-প্ল্যাটফর্মের গতি প্রায় নেই বললেই চলে। তাই যাত্রীরা টুপকরে ক আর খ-য়ে পা দেবে। সেখান থেকে বাইরে বেরোনো খুব সহজ। ওভারব্রীজ দিয়ে ঘুরন্ত প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে গেলেই হল।

আকাশ হ'য়ে

কার্ত্তিক ঘোষ।

ছবুন যেমন অবুঝ, তেমন
দুষ্টু, সবাই মানো...
জান্‌লা দিয়ে কি ছাখে রোজ
কেউ কি সে সব জানো?
ঐ যেখানে মাঘের শেষে
শুধুই জবড় জং...
গাছ-গাছালির গায়ে মাথায়
সবুজ-সবুজ রং!
ঐ খানেতেই ছোট্ট নদী
যেন গলার চিক্...

যেমনি সরু-তেমনি রোদে
করে সে ঝিক মিক্!
তার ওপরেই হুমড়ি খেয়ে
ঐ যে আকাশ নীল,
মাঠ-নদী আর গাছের সঙ্গে,
ওর যেন খুব মিল।
ছবুন ছাখে আর ভাবে ঐ—
আকাশ হ'য়ে কবে...
অমনি সে-ও মাঠ-নদী-গাছ
সবার বন্ধু হবে॥

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা
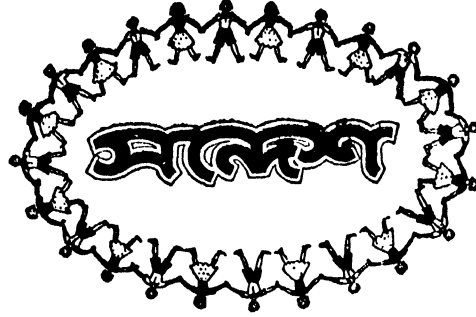
নবম বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা

চৈত্র ১৩৭৬—এপ্রিল ১৯৭০

সম্পাদক—লীলা মজুমদার ও সত্যজিৎ রায়

শিশু
মনস্তত্ত্ব

নবম বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা চৈত্র ১৩৭৬/ এপ্রিল ১৯৭০

এমন যদি হয়

করুণাময় বসু

চিকন সোনা ময়ূরকণ্ঠী মেঘে
হালকা রোদের একটু ছোঁয়ায় স্বপ্ন আছে লেগে :
ঘুমভরা এই মিষ্টি দিনের দুপুর বেলার আলো
ছোট্ট ছেলে পুপুর চোখে লাগছে বড়ো ভালো।
ফুল বাগানের একটি কোণে বসে
'বিনিসূতোর মায়ায় বোনা স্বপ্নখানি উড়িয়ে দিয়ে ভাবছে একা ও সে ;-

এমন যদি হয়,
প্রজাপতির পাখার নাচন নীল আকাশে নয়,
দোতলার ওই শোবার ঘরে একটা আছে কাঁচের রঙিন শিশি,
আমের আচার পাঠিয়েছিল অনেক দূরের ফয়জাবাদের পিসি।
রাখবে ধরে ফুলবাগানের প্রজাপতি ওই শিশিতে পুরে,
ঝিলমিলিয়ে রঙীন ডানা নাচবে ঘুরে ঘুরে।

এমন যদি হয়,
পাখির গানে গাছের পাতা, বনের ছায়া ভরবে, সে তো নয় :
আনবে ডেকে সবুজ টিয়ে, হলুদ পাখি, বুলবুলিদের মাঠের ধারে গিয়ে,
আদর করে রাখবে তাদের খাঁচার ভিতর নিয়ে।
খাঁচার ভিতর গাইবে তারা আপন মনে গান,—
সেই সুরেতে রোদের খুসি ছড়িয়ে যাবে, বাতাস হয়ে দুলিয়ে দেবে
ছলছলিয়ে মাঠের কচি ধান।
রাতের বেলা জ্যোৎস্না হয়ে, স্বপ্ন হয়ে মিষ্টি গানের সুরে
ঘুমের ভিতর পুপুর কানে চম্পাবতীর রূপকথাটি বাজবে ঘুরে ঘুরে।

শীতের দিনে শম্ভুকাকা সুদূর বনে গেলে,
বলবে তারে আনতে হবে একটা ছোট হরিণ ছানা পেলে,
রাখবে তারে ঝিলের ধারে, সাঁকোর কাছে, কচি ঘাসের পাশে,
ভালোবাসায় ভুলিয়ে দেবে মনের ব্যথা, মায়ের কথা, বনের কথা,
মনেই নাহি আসে

রাতের বেলা বাবার কাছে এসব কথা বললে পুপু হেসে।
বললে বাবা একটু ভেবে, অল্প একটু কেশে,
আচ্ছা, এমন যদি হয়,
সোনার খাঁচা গড়িয়ে দিলাম, তার ভিতরে ছোট্ট পুপু রয় :
হেসে নেচে কাটিয়ে দেবে বেলা,
খাঁচার ভিতর আপন মনে সঙ্গীবিহীন খেলা।
বাবা, মা কেউ থাকবে না তার কাছে,
সন্ধ্যে বেলা অন্ধকারে দৈত্যছানা দুলবে তারা দোলন চাঁপা গাছে

ওরে ববা-বা উঠল কেঁদে ছোট্ট পুপু : কক্ষণো তা নয়।
একটু হেসে বললে বাবা, তবে?
উড়িয়ে দেব নীল আকাশে প্রজাপতি, বনের পাখি, বনের হরিণ
বনেই ছাড়া রবে।

ঐতিহাসিক গল্প

ভাঙ্গাগড়া

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরা তিন ভাই। তিন রাজপুত্র।

পিতার মৃত্যুর পর শত্রুশক্তির চক্রান্তে তারা আর সিংহাসনে বসতে পেল না। তাই পশ্চিমদেশ থেকে তারা পালিয়েই এল আমাদের দেশে। কোথায় জান? বীরভূম অঞ্চলে।

ওখানে তখন বন আর বন! কিছু কিছু আদিবাসীদের বাস। সেই আদিবাসীদের সঙ্গেও অল্প বিস্তর লড়তে হয়েছিল এই তিন রাজপুত্রকে। কারণ আদিবাসীরাও চায় না যে, কোন বিদেশী শক্তি এসে তাদের ওপর প্রভুত্ব করুক।

কিন্তু না চাইলে কি হবে? আদিবাসীদের হার হল। তিন রাজপুত্রের সঙ্গে কোন রকমেই এঁটে উঠতে পারল না তারা।

এই তিন রাজপুত্রের নাম বীরসিংহ, চৈতন্যসিংহ এবং ফতেসিংহ।

এই বীরভূম অঞ্চলেই ক্রমে ওরা তিন ভাই তিনটি পৃথক রাজ্য স্থাপন করলেন। সৈন্য-সামন্ত, পাইক-কোতয়াল সবই হল। বড়ভাই বীরসিংহ নিজের নামানুসারে তাঁর রাজধানীর নাম রাখলেন বীরসিংহপুর।

বীরসিংহ কিন্তু খুব বীর ছিলেন। শোনা যায় তিনি এত বীর ছিলেন যে, স্নানের সময় একমুঠো সরষে নিয়ে দু'হাতে পিষে তা থেকে তেল বের করে গায়ে মাখতেন আর প্রত্যেকদিন বীরসিংহপুর থেকে ঘোড়ায় চড়ে কাটোয়ায় এসে গঙ্গাস্নান করে যেতেন।

ক্রমে তাঁর শক্তির কথা সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। বাংলার সুবাদার ছিলেন তখন গিয়াসউদ্দিন। তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

তখন ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দ।

গিয়াসউদ্দিন বীরসিংহপুর আক্রমণ করলেন।

তুমুল যুদ্ধ হল।

খবর পেয়ে চৈতন্যসিংহ ও ফতেসিংহ সসৈন্যে ছুটে এলেন বীরসিংহপুর রক্ষা করতে। তিনভাই একসঙ্গে গিয়াসউদ্দিনের বিরুদ্ধে লড়তে লাগলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গিয়াসুউদ্দিন পরাজিত হলেন ও পালিয়ে গেলেন।

এই পরাজয়ের অপমান গিয়াসউদ্দিনকে আরও ক্রুদ্ধ করে তুলল। যেমন করেই হোক বীরসিংহপুর দখল করতেই হবে। তার জন্যে চাই আবার আক্রমণ। না, তাতেও হয়ত ফল হবে না। ওরা যে তিন ভাই।... ওদের তিন ভাইএর সঙ্গে যুদ্ধ করা খুব সহজ কথা নয়।

অনেক ভাবতে লাগলেন গিয়াসুউদ্দিন। অবশেষে তিনি চতুরতার আশ্রয় নিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, ওদের তিন ভাইএর মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করতে না পারলে কিছুতেই ওদের যুদ্ধে হারানো যাবে না। যখন ওরা একে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসবে না তখনই ওদের পরাস্ত করা যাবে।

করলেনও ঠিক তাই। কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে গিয়াসউদ্দিন তিন ভাইএর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করলেন। তাঁরা পরস্পরকে শত্রু ভাবতে লাগলেন।

ঠিক তখনই সুযোগ বুঝে একদিন গভীর রাত্রে গিয়াসউদ্দিন সৈন্যদলের আগে আগে একদল গরু নিয়ে বীরসিংহপুর আক্রমণ করলেন।

বুদ্ধিটা কিন্তু ছোটভাই ফতেসিংহেরই দেওয়া। তিনি জানতেন যে, তাঁর দাদা বীরসিংহ গরুকে ভগবতী জ্ঞানে ভক্তি করেন। সুতরাং গরু দেখলেই তিনি নিশ্চয়ই আর অস্ত্রধারণ করবেন না।

এমন বুদ্ধিতে গিয়াসউদ্দিন কেন, যে কেউই বীরসিংহকে পরাস্ত করতে পারত।

যুদ্ধ আর হল না।

সৈন্যের আগে আগে একদল গরু আসতে দেখে বীরসিংহ নিজের সৈন্যদলকে বললেন, তোমরা কেউ অস্ত্র ধর না। যে যেদিকে পার চলে গিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাও!

এদিকে শত্রুসৈন্যও দ্রুত এগিয়ে এল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বিষাক্ত তীর বীরসিংহের বুকে এসে বিঁধল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

মাটিতে লুটিয়ে পড়েও বীরসিংহ অস্ফুটস্বরে বললেন, গিয়াসউদ্দিন! এই মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও তোমার চতুরতার প্রশংসা না করে পারছি না। তুমি আমাদের তিন ভাইএর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। নইলে তোমার সাধ্য কি যে, বীরসিংহপুরের মাটিতে পা রাখ?

মরীচিকা

অজেয় রায়

(মাস্টার মশাই, বা প্রত্নতাত্ত্বিক রতনলাল রায় ফরাসী প্রাণিবিজ্ঞানী অঁদ্রে ফুশের সঙ্গে গোবি মরুভূমিতে ক্যাম্প ফেলে লুপ্ত সভ্যতা ও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর অনুসন্ধান করছিলেন। একদিন দূর থেকে তিনি বালির উপর এক লামাকে পড়ে থাকতে দেখলেন—তাঁকে ক্যাম্পে নিয়ে এসে সেবাশুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুললেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ লামা চিমপে তাঁকে দিতে চাইলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের স্বহস্তে লেখা এক বহুমূল্য পুঁথির অংশ, যার সংবাদ কারো জানা নেই। এদিকে রাঁধুনী লিকে নিয়ে বড় অশান্তি, সকলের কাছে সে ধার করেছে, শোধ দেবার নাম নেই। অপর দিকে তানচুংএর লোলুপ দৃষ্টি প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য জিনিসের দিকে।)

॥ ৩ ॥

পরদিন ভোরবেলা।

—ভোর ঠিক পাঁচটার সময় আমরা এককাপ কফি খাই।

এলার্মের শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাঁচটা বাজতে দশ। এখুনি কফি নিয়ে ঢুকবে লি।

আমার চোখে তখনও তন্দ্রা। চোখ বুজে কফির প্রতীক্ষা করতে থাকি—

ফুশে বলল ব্যাপার কি রয়? পাঁচটা বেজে দশ মিনিট হল। এখনও লির দেখা নেই কেন?

সত্যিতো। লির কোন দিন দেরি হয়না।

—নিশ্চয় রাত জেগেছিল। এখন ঘুমচ্ছে। দাঁড়াও ডাকি।

—ফুশে তাঁবু থেকে বেরল।

মিনিট পনেরোর মধ্যে ফুশে ফিরে এল। তার চোখে মুখে উদ্বেগ।—রয় লি নেই। কোথাও দেখতে পেলাম না তাকে।

—তার মানে? আমি বিছানায় উঠে বসি। গেল কোথায়?

—জানিনা। উনুনে আগুন পড়েনি। জল ফুটছে না। তাছাড়া ওর টেন্টে দেখেছি। সেখানেও নেই।

অন্যদের জিজ্ঞেস করলাম—কেউ দেখেনি লিকে। অল্পক্ষণের জন্যে কোথাও গেলে উনুনে আগুন দিয়ে যাবে না ? কি রকম রহস্যময় লাগছে যেন ব্যাপারটা।

—চলতো দেখি। আমিও লিয়ের তাঁবুতে গেলাম।

—ঠিকই বলেছে ফুশে। কোন চিহ্ন নেই লোকটার শ্রেফ উধাও।

তাহাই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে কয়েকটা ব্যাপার নজরে পড়ল—লির বিছানা পরিপাটি। নিভাঁজ। মনে হয় রাতে ব্যবহার করা হয় নি। কতগুলো চেনা জিনিস নেই—যেমন তার মস্ত রঙ চঙা ঝুলিটা। তার মরুভূমিতে চলার মোটা উলের জুতো। আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস নেই বলে মনে হল।

—পালাল নাকি ?

—কিন্তু খামকা পালাতে যাবে কেন ?

—তবে কি নেকড়েতে টেনে নিয়ে গেছে ? কিন্তু লি বাচ্চা ছেলে নয়। নেকড়ের পাল আক্রমণ করলে চেঁচাতো নিশ্চয়ই। তার জুতো থলি এসবই বা গেল কোথায় ?

—কে তাকে শেষ দেখেছে ? প্রহরী ?

প্রত্যেক দিন রাতে পালা করে পাহারার ব্যবস্থা আছে। সে রাতের পাহারাদার জানাল—রাত তিনটের সময় সে লিকে দেখেছে। তাঁবুর বাইরে বসে লি নাকি পাইপ টানছিল। তাকে বলে—হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাই এক রাউণ্ড পাইপ খেয়ে নিচ্ছি।

—তারপর ?

প্রহরী আমতা আমতা করে। বোঝা গেল রাত্র তিনটের পর সে পাহারাদারীতে ক্ষান্ত দিয়ে নিদ্রা গিয়েছিল।

—হঠাৎ আমার মনে এল লামার কথা। সে খুব ভোরে ওঠে। পায়ের ঘা সেরে যাওয়ার পর থেকে তাকে দেখেছি কাকভোরে উঠে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে পুবমুখো চেয়ে থাকে। সূর্যোদয় দেখে। লিকে হয়তো সে দেখে থাকবে।

লামার তাঁবুতে উঁকি মেরেই আমাদের চক্ষু ছানাবড়া।

লামা বন্দী। খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে। তার মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা। চার হাত-পাও বাঁধা, খাটের গায়ে শক্ত করে। বেচারা কাতর চোখে চেয়ে আছে।

মেঝেতে লামার ঝুলিটা পড়ে। ভিতরের জিনিস-পত্র ইতস্তত: ছড়ানো। তার গায়ের আলখাল্লার বোতাম খোলা।

তাড়াতাড়ি লামাকে মুক্ত করি।

লিয়ের কীর্তি !!

শুনলাম, শেষরাতে লি গোপনে তার তাঁবুতে ঢোকে। জিনিস হাতড়াতে থাকে। লামা জেগে ওঠামাত্র তার মুখ বেঁধে ফেলে। ক্ষীণ দুর্বল লামা লির মতো দুষমন জোয়ানের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন ?

লি জিজ্ঞাসা করে পুঁথি কোথায় ? উত্তর না পেয়ে তার পোশাক খুঁজে বাক্সটা বের করে নেয়।

দেখা গেল, পুঁথির বাক্স ছাড়া লি অন্য কিছুই নেয় নি। আর পাবেই বা কি লামার কাছে ?

লামার মুখ দেখে কষ্ট হচ্ছিল। পুঁথি হারাবার শোকে সে তখন মুহ্যমান।

তুমুল হট্টগোল লেগে গেল।

দলের সবাই উচ্চৈস্বরে পরামর্শ দিচ্ছে নানারূপ কটুবাক্য নিক্ষেপ করছে লির উদ্দেশ্যে। হতভাগাটা যে শুধু পুঁথি নিয়ে পালিয়েছে তা নয়—তাদের ধার শোধ না করে ভেগেছে। রাগে সবাই তেলে বেগুনে জলতে থাকে।

তানচুং কপাল চাপড়ে বলল—আমারই দোষ। আমি একটি গর্দভ। কেন কাল ওর সামনে পুঁথির কথা বলতে গেলাম। পুঁথির দাম নিয়ে আলোচনা করলাম। শুনেছি দেনায় লোকটার চুল সব বিকিয়ে আছে।—দেশে ধার, প্রত্যেক মরুদ্যানের সরাইখানায় ধার। এখানে সঙ্গীদের কাছে ধার। অবস্থা অতি শোচনীয় নেশা আর জুয়ায় লোকটা ডুবেছে। আজ দু'বছর বাড়ি যায়নি। শূন্যহাতে বউ-বাচ্চাদের কাছে মুখ দেখাবে কোন্ লজ্জায়। কাজেই এমন সুযোগ হাতছাড়া করবার লোভ সামলানো ওর পক্ষে মুস্কিল। টাকার জন্য ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

আর একটা খবর জানা গেল—লির দোস্ত চ্যাংয়ের কাছে।

গত রাতে লি নাকি চ্যাংকে বলে—সে শিগগিরি অনেক টাকা পাচ্ছে। এবার সে মরুভূমির কাজ ছেড়ে দেবে। দেশে গিয়ে ব্যবসা করবে।

নেশার ঘোরে যাতা বকছে ভেবে চ্যাং দোস্তের কথায় কান দেয় নি। শুধু রসিকতা করে বলেছিল—

বড়লোক হলে আমার টাকাটা ভাই শোধ করে দিও কিন্তু।

লি বলেছিল—জরুর দেগা। কত সুদ চাই?

বড়লোক হবার সহজ পন্থাটা কি সে এঁচে রেখেছিল এখন বোঝা গেল।

ফুশে হঠাৎ বলল—রয় আমরা ওকে ফলো করব। এক্ষুনি বেরতে হবে। এ দেশে থানা পুলিশ করার কোন উপায় নেই। যা করার নিজেদেরই করতে হবে। তান্‌চুং তুমি তিনটে সবচেয়ে দ্রুতগামী উট সাজাও। আর ইব্রাহিম খাঁ তুমি আমার সঙ্গে হেঁটে এস—পথ বাতলাবে। আমি, রয়, চুং, ইব্রাহিম এবং চিয়াং—ব্যস্ এই পাঁচজন যাব।

চিয়াং একজন উটচালক, খুব দ্রুত হাঁটতে পারে। ফুশে তাড়া দিল--চুং কুইক্। মাত্র দশমিনিট সময় দিচ্ছি। রেডি হয়ে নাও—

ইব্রাহিম নামকরা ট্র্যাকার। মরুভূমির পথে মানুষ বা পশুর চিহ্ন চিনে তাকে অনুসরণ করতে সে ওস্তাদ। মরুরাজ্যের প্রত্যেক পথঘাট তার মুখস্ত। ফুশে বলল—ইব্রাহিম বল, কোন পথে লি যেতে পারে? চটপট্।

ইব্রাহিম একটুক্ষণ ভাবল তারপর বলল—এই মরুদ্যান থেকে দুটো পথ বেরিয়েছে। একটা মিশেছে বাণিজ্যপথের সঙ্গে দক্ষিণ দিকে। সে পথে ও যাবে না। ও পথে ব্যবসায়ীরা সব সময় যাতায়াত করে। সবাই লিকে চেনে। সুতরাং তাদের কাছ থেকে আবার আমরা তার হদিশ জেনে যেতে পারি। অতএব ওপথ নিরাপদ নয়, তা লি জানে।

আর একটা পথ গেছে উত্তরে।

ঐ যে নিচু পাহাড়ের সারি যেখানে সাহেব হাড়গোড় খুঁজতে যান সেই পাহাড় ভেদ করে একটা গিরিপথের ভিতর দিয়ে পথটা ওপাশে গেছে। তারপর আবার মরুভূমি। মরুপথে উত্তর-পশ্চিমে অনেকটা গেলে পড়বে উঁচু পাহাড়। সারা বছর সে সব পাহাড়ের মাথায় বরফ জমে থাকে। ঐ দূর পাহাড়ের কোলে লির গ্রাম। লি খুব সম্ভব এখন গ্রামে ফিরে যাবার চেষ্টা করবে। তাই মনে হয় ও উত্তরের পথ ধরেছে। তবে সাহেব গিরিপথে পৌঁছবার আগেই কিন্তু ওকে ধরতে হবে। ও যদি একবার পাহাড়ে লুকোতে পারে তাহলে কিন্তু

ধরা দুঃসাধ্য ব্যাপার। লি হয়তো কিছুদিন এখন পাহাড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। তারপর আমরা খোঁজাখুঁজি শেষ করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলে, বিপদ কেটে গেছে দেখে গ্রামে ফিরবে।

—এখান থেকে সেই গিরিপথ কতদূর?

—প্রায় কুড়ি মাইল হবে।

—লির পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?

—ধরুন প্রায় সাতঘণ্টা!

—বেশ তার আগেই ওকে ধরা চাই। ফুশে দৃঢ়স্বরে বলল। তুমি শুধু লিকে ফলো করে আমাদের ঠিক পথে নিয়ে চল। পথ ভুল করে দেরি হয়ে গেলে কিন্তু সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

যাবার আগে লামা হঠাৎ জেদ ধরল সেও আমাদের সঙ্গে যাবে।

কিছুতেই বোঝাতে পারি না।—বলি, আমরা প্রাণপণে ছুটব। একটু পরে রোদ উঠবে। আপনার এই শরীর, বড্ড স্ট্রেন হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি—

কিন্তু লামা নাছোড়বান্দা।

অগত্যা তাকেও উটের পিঠে তুলে নিলাম।

আরো অনেকেই আমাদের সঙ্গে যেতে চায়। বিশেষতঃ লির পাওনাদাররা। এই সুযোগে বেইমানটিকে দু'ঘা কষাতে পারলে তাদের প্রাণ জুড়োয়—ধার শোধের তো আশা নেই জানি।

ফুশে কিন্তু আর কাউকে সঙ্গে নিতে রাজি হল না।

* * * *

হন্ হন্ করে এগোচ্ছি।

কোনো মুখে কোনো কথা নেই।

সকলের সামনে হেঁটে চলেছে ইব্রাহিম—গাইড। তার পিছনে হাঁটছে চিয়াং। চিয়াংয়ের পিছনে পর পর তিনটি উট। প্রথম উটের পিঠে আমি ও ফুশে। তারপরের দুটোতে চড়েছে তানচুং এবং লামা। চিয়াংয়ের হাতে প্রথম উটের লাগাম।

ইব্রাহিমের শ্যেন দৃষ্টি পথের ওপর। এপাশ ওপাশ নজর করতে করতে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে নিজের মনে মাথা নাড়ছে, হুঁ হা করছে।

বালির ওপর পায়ের ছাপ তাড়াতাড়ি মুছে যায়। শক্ত পাথুরে জমি আর ধুলোতে পায়ের দাগ ভাল পড়ে না। কাজেই এ পথে পায়ের চিহ্ন ধরে অনুসরণ করা খুবই কঠিন কাজ।

উটগুলোও যেন বুঝতে পেরেছে আমাদের আজ ভীষণ তাড়া। আমরা এক বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে ছুটছি। গলা বাড়িয়ে, লম্বা লম্বা পা ফেলে উটগুলো এগোচ্ছে।

মাইলখানেক যাবার পর ইব্রাহিম হঠাৎ নিচু হয়ে পথ থেকে কি কুড়লো?

—এই দেখুন এক টুকরো কাঠ-কয়লা। নিশ্চয় লি পাইপ ধরিয়েছিল।

আরও দু'মাইল বাদে সে আবার পথের পাশে ছুটে গেল। হাত পনেরো দূরে, একটা টিবির গায়ে কি দেখে!

কয়েক টুকরো তরমুজের খোলা! টাটকা!

—নিশ্চয় যেতে যেতে লি খিদে মিটিয়েছে। দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তরমুজের খোলাগুলো, কিন্তু

ইব্রাহিমের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারে নি।

—ক্রমশঃ রোদের তেজ বাড়তে থাকে।

পায়ের তলায় বালি-পাথর উত্তপ্ত হয়। এক নাগাড়ে এগিয়ে চলেছি। ক্ষণকালের জন্যও বিশ্রাম নিই নি বা চলার গতি শ্লথ হয় নি।

বেলা আটটার মধ্যেই মরুভূমি তেতে আগুন হয়ে উঠল। আশ্চর্য ক্ষমতা বটে ঐ দুই মরুবাসীর। যেন কলের মানুষ। আমরা উটের পিঠে বসে ক্লান্তি অনুভব করছি কিন্তু ওদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। উটের সাথে সমান তালে হেঁটে চলেছে।

তিনঘণ্টার ওপর কেটে গেছে। পাহাড়ের সারি সামনে। থাকে থাকে পাথরের খাঁজ। ঝোপঝাড় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ ফুশে বলে উঠল—আরে ঐ তো লি!

—কোথায়? আমি বলি।

—ফুশে আমার হাতে দূরবীণটা দেয়।

সত্যিতো! লি প্রায় দু'মাইল দূরে একটা মস্ত পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে ছায়ায় বসে। আমাদের দিকে পাশ ফিরে রয়েছে।

দলের সবাই দূরবীণ দিয়ে লিকে একবার দেখে নিল।

লি বোধহয় নিশ্চিন্ত ছিল। ভাবেনি সে কোন পথে গিয়েছে আমরা বুঝতে পারব। তাকে ফলো করব। তাই একটানা অনেকক্ষণ হেঁটে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল।

ইব্রাহিম বলল—লি যেখানটায় রয়েছে ওটা হচ্ছে রাস্তার মোড়। রাস্তাটা এরপর বাঁ দিকে বেঁকে গেছে। পাহাড়ের সমান্তরাল প্রায় চারমাইল গিয়ে গিরিপথে ঢুকেছে।

আমরা নিঃশব্দে এগোলাম। শুধু দ্রুত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ। উত্তেজনায় ধক্‌ধক্ করছে হৃৎপিণ্ড।

আমি ফুশের কানে কানে বললাম—

—ধর লি যদি সারেণ্ডার করে। ধর, যদি আর কোন ঝামেলা না বাড়িয়ে পুঁথি ফেরত দেয়, তবে কি করবে?

—তাহলেও ছাড়ছি না। এতো ভোগালো, কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম ওর প্রাপ্য আছে।

আমি কিন্তু মনে মনে স্থির করলাম—যদি ভালয় ভালয় পুঁথি হাতে পাই তো মারধোরের দরকার নেই। লিকে তাড়িয়ে দেব। গরিব মানুষ, লোভে পড়ে দোষ করেছে। আচ্ছা, আগে তো হাতে আসুক পুঁথি তখন ফুশেকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ঠাণ্ডা করা যাবে।

মাইলখানেকের ওপর এগিয়েছি, লি আমাদের দিকে মুখ ফেরাল। সঙ্গে সঙ্গে সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল—আমাদের সে দেখতে পেয়েছে।

—তারপরই দে ছুট।

ফুশে বলল—কতক্ষণ দৌড়বে বাছাধন, এই গরমে? পাহাড়ে পৌঁছবার আগেই তোমায় ঠিক ধরব।

আমরা তখন লিকে খালি চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম।—সে দৌড়চ্ছে। হাঁটছে। বারবার পিছনে ফিরে আমাদের দিকে দেখছে ভীত ত্রস্ত ভাবে।

মাঝে মাঝে সে ঢিবির আড়ালে অদৃশ্য হচ্ছে।—তারপর আবার তাকে দেখতে পাচ্ছি।

ইব্রাহিম হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—আরে ও চলল কোথায় রাস্তা ছেড়ে?

সত্যি তো। দেখলাম—পাহাড়ের সমান্তরাল রাস্তাটা ছেড়ে দিল, সোজাসুজি পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছে। সর্ট-কাট্ করছে। ওখান থেকে সোজা পথে পাহাড় দু'মাইলের কম।

ইব্রাহিম বলল—লির বোধ হয় ভয় হয়েছে, রাস্তা বেয়ে গিরিপথে পৌঁছবার আগেই আমরা ওকে ধরে ফেলব। তাই এই মতলব। কিন্তু ও-ধারটায় তো কোনো রাস্তা নেই। উঁচু উঁচু বালিয়াড়ি, তারপরই পাহাড়ের ঢাল। সেখানে ছড়ানো রয়েছে অজস্র ছোট বড় পাথরের চাঁই। আর ঐ সব পাথরের নিচে গর্তে গর্তে ভয়ঙ্কর বিষধর বোড়া সাপের আড্ডা। মানুষ-পশু কেউ কখন ভুলেও ও জায়গা মাড়ায় না। এমনকি বুনো গাধা বা হরিণের দলও রাস্তার ডানপাশ দিয়ে চলাফেরা করে না। সবাই যমের মতো ভয় করে—

—থাক্‌গে সাপ। ফুশে বলল। ওকে ছাড়ছি না। ফলো কর। জোরে পা চালাও—

লিকে একবার দেখা গেল একটা উঁচু বালিয়াড়ির মাথায়। তারপর সে নেমে গেল নিচু ঢালুতে। আমাদের চোখের আড়ালে—

হঠাৎ এক তীব্র আর্তনাদ ভেসে এল! আবার একবার। আবার। কে যেন নিদারুণ আতংকে বার বার চেঁচিয়ে উঠল। শুনলাম—বাঁচাও বাঁচাও, রক্ষা কর!!

সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবলে পড়লেই মানুষ এমন কাতর কণ্ঠে সাহায্য চায়।

লির গলা! কি ব্যাপার? আমরা স্তব্ধ হয়ে পড়ি। সাপের কামড় খেল নাকি লোকটা?

ফুশে বলল—চল চল, থেম না। টেণ্টে সাপের বিষের ওষুধ আছে। হয়তো বাঁচানো যাবে।

সেই উঁচু ঢিবিটায় উঠলাম, যেখান থেকে লিকে শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল। জায়গাটা পুকুরের মতো—চারিধারে উঁচু পাড়, মাঝখানে ঢালু। অবশ্য জল নেই। শুকনো খট্‌খটে বালির পুকুর।

চারদিকে তাকালাম—কৈ? লি কৈ? গেল কোথায় লোকটা? যাদুমন্ত্র বলে অদৃশ্য হল নাকি?

আরে ওটা কি? দেখলাম, প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে ঢালের মাঝখানে এক টুকরো নীল চকচকে কাপড় পড়ে আছে। ওটা সবাই চিনি—লির রুমাল। শেষ যখন লিকে দেখি ঢিবির ওপর তখনও ওর মাথায় জড়ানো ছিল রুমালটা।

এক অজানা আশঙ্কায় মন ছম ছম করে উঠল। রুমাল লক্ষ্য করে উট চালালাম।

কিন্তু কয়েক পা গিয়েই উটগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল। আর এক পাও এগোবে না। যত মারি, তাড়া দিই, কিছুতেই না। মুখ উঁচু করে কি জানি শুঁকছে—

উট অতি গোঁয়ারগোবিন্দ জীব। একবার না বললে হাঁ করায় কার সাধ্য! অতএব আমরা নামলাম।

এগোতে যাচ্ছি— দাঁড়ান।—ইব্রাহিম বাধা দিল।

তার মুখ গম্ভীর। ভ্রূ কুঞ্চিত। তারপর যা করল দেখে আমরা অবাক।

সে একটা ভারি পাথর কুড়িয়ে নিল। সেটা ছুঁড়ল রুমাল লক্ষ্য করে।

অবাক কাণ্ড। পাথরটা রুমালের কাছে বালির ওপর পড়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠিক যেমন জলে ঢিল পড়লে ডুবে যায়।

ইব্রাহিম আবার ছুঁড়ল—এক খণ্ড বড় পাথর।

সেটাও রুমালের কাছে পড়েই বালির মধ্যে টুপ্ করে ডুবে গেল।

ইব্রাহিম আমাদের সম্বোধন করে বলল—দেখছেন, চোরাবালি! চিৎকারের কারণটা বুঝলেন? লি চোরাবালিতে পড়ে ডুবে গেছে।

এত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম যে কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারলাম না। তারপর সবাই উপলব্ধি করলাম কি ঘটেছে।

ছি ছি তীরে এসে তরী ডুবল। এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ। লোকটা নিজে তো মরলই। অমন দুষ্প্রাপ্য পুঁথিটা অবধি টেনে নিয়ে গেল চোরাবালির অতলে। রাগে দুঃখে হতাশায় আমার তখন চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে।

লির মূর্খতা নিয়ে আমরা সরবে আলোচনা করতে থাকি। লোকটা হঠকারিতার ফলে শুধু যে নিজের প্রাণটা হারাল তাই নয়, ঐতিহাসিক জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি করে গেল। তাকে যে একবার ঘাড়ে ধরে নিয়ে এসে আচ্ছা করে শিক্ষা দেব তারও উপায় নেই। সে এখন সবার নাগালের বাইরে। সব দোষারোপের উর্ধ্বে।···

—আমার কনুইয়ে হঠাৎ এক মৃদু খোঁচা অনুভব করলাম। ফুশে ঠেলছে।—কি?

ফুশে আঙুল দিয়ে দেখাল—লামাকে।

দেখি সে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রুমালটার পানে চেয়ে আছে। আর তার দু' চোখ দিয়ে জল ঝরছে—

লামা চিম্-পো আস্তে আস্তে আমাদের দিকে তাকাল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল—হতভাগ্য লি! লোভের কি ভীষণ পরিণাম! ভগবান তথাগতের কাছে প্রার্থনা করি ওর আত্মার কল্যাণ হোক। ওকে আপনারা ক্ষমা করুন।

বড় লজ্জা হল মনে। আমার কাছে পুঁথির মূল্য কি?

একটা মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল। ইচ্ছে ছিল—ঐ দলিল আবিষ্কার করে বাহাদুরি নেব। নাম হবে সেই সুযোগটা নষ্ট হল, তাই পুঁথিচোর লির ওপর এত চটেছি। এত আক্ষেপ।

কিন্তু স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের কথাই চিন্তা করছি। জলজ্যান্ত মানুষটা যে প্রাণ হারাল তার জন্যে তো কৈ দুঃখ করছি না?

আর লামার কাছে এ পুঁথি পরমপবিত্র, পূজনীয়। তারই নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু পুঁথি হারানোর জন্য সে তো কৈ উত্তেজিত নয়। বরং যে হতভাগ্য প্রাণ দিল তার কথা ভেবেই ওর হৃদয় আকুল হয়ে উঠেছে। তার কাছে পুঁথি হারানোর ব্যথা ছাপিয়ে উঠেছে হতভাগ্য লির শোচনীয় পরিণামের বেদনা।

ইব্রাহিমদের ডাকলাম—চল ফিরি।

ক্যাম্পে ফুশেকে বললাম—মরীচিকা দেখেছ?

—দেখেছি। কেন?

—মরীচিকা কি করে? পথিককে লোভ দেখায়। কাছে টানে—তারপর আচমকা মিলিয়ে যায়। তখন হয় নিদারুণ আশা ভঙ্গ। পুঁথির ব্যাপারটাও যেন তাই—

কোথাকার এক অখ্যাত লামা এসে হাজির হল। সঙ্গে দুর্মূল্য এক পুঁথি। আবার সে কথা দিল পুঁথিটা আমায় দান করবে। তারপর কত জল্পনা কল্পনা।—

ঐ পুঁথি নিয়ে রিসার্চ করব। পেপার লিখব। আমার নাম ছড়াবে সারা দুনিয়ায়। কিন্তু ঠিক হাতের মুঠোয় আসার আগে—ব্যস্, ফস্কে গেল।

মরুভূমির বুকে চিরদিনের মতো নিখোঁজ হল। মরীচিকা নয় তো কি?

মাস্টারমশাই গল্প থামিয়ে উদাসনয়নে জানালার দিকে তাকালেন। বাইরে তখন ঘন অন্ধকার নেমেছে

তারপর? লামার কি হল?—তিনজনে উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করে।

—লামা চিম্-পো পর দিনই বিদায় নেয়। আর তার কোন খবর পাই নি। যাবার আগে সে এই কষ্টি পাথরের বুদ্ধমূর্তিটা আমায় দিয়ে যায়। পুঁথিতো পেলাম না তার বদলে এই স্মৃতি উপহার।

মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর শহরের কাছেই ছিল প্রাচীন রক্তমৃত্তিকা বিহার। এখন মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে। সেই ধ্বংসস্তূপের কাছে লামা মূর্তিটা কুড়িয়ে পেয়েছিল।

সমাপ্ত

পুস্তক পরিচয়

কল্যাণী কার্লেকার

১

'ছড়াপিদ্দিম জ্বলে' জ্যোতিভূষণ চাকী রচিত, সীতেশ রায় চিত্রিত', প্রকৃতি দেবী প্রকাশিত। দাম দুই টাকা। প্রাপ্তিস্থান বুকস্ট্যাণ্ড। **৮১ কাঁকুলিয়া রোড, ১৯।**

নিপুণ ছড়াকার হিসেবে জ্যোতিভূষণ চাকীর নোতুন পরিচয়ের দরকার নেই। 'ছড়াপিদ্দিম জ্বলে' তাঁরই উপযুক্ত সংকলন। প্রথমদিকের কয়েকটি ছড়া অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে পাঠকের কাছে অসম্পূর্ণ লাগে কিন্তু পরের গুলি ভাবে-রসে নিটোল। খাঁটি বাংলার ভাবভংগি আগাগোড়াই ফুটে উঠেছে।

পটের ছবি আর রথের মেলার মাটির পুতুলের আকারের ছবিগুলি আর সবুজ রেশমি ফিতের আটকানো নোতুন ধরণের বাঁধাই বইখানিকে বিশেষ সৌন্দর্য দিয়েছে।

২

'সাতরাজ্যির হেঁয়ালি" সংকলন—আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ১১ সি-আই-টি রোড,। **কলকাতা ১৪। দাম আড়াই টাকা।**

নানা দেশ থেকে হেঁয়ালি সংগ্রহ করে' বাংলা কবিতায় 'ছোটদের বড়দের উৎসর্গ করা হয়েছে। লেখা ছোটদের উদ্দেশ্যে কিন্তু বড়রাও পড়ে' খুশি হবেন, কেননা, হেঁয়ালির মোহ মানুষের কোনো বয়সেই যায়না। ধাঁধার মধ্যে কয়েকটি কষ্টকল্পিত হ'লেও অধিকাংশই সার্থক। বইয়ের 'গোড়ার কথা' হেঁয়ালির যে ইতিহাস দেওয়া হয়েছে সেটাও হেঁয়ালিগুলোর সমান উপভোগ্য। সংগৃহীত হেঁয়ালিগুলোর কোনটা কোন 'রাজ্যি' থেকে নেওয়া তার উল্লেখ থাকলে বইটা সর্বাংগসুন্দর হ'ত।

অযোগ্য

(বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

প্রসাদ রঞ্জন রায়

'অশোক', হেঁকে বললেন প্রদীপবাবু; 'অঙ্কটার উত্তর কত হয়েছে?'

অশোক বলল '৭ ফুট, স্যার!' প্রদীপবাবু ফেটে পড়লেন, '৭ ফুট! জানো, অঙ্কটার উত্তর ৩১ টাকা! তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?' একটু থেমে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে বলতে থাকেন, 'ইতিহাস ক্লাসে তুমি বলেছিলে পানিপথের যুদ্ধে জিতেছিল ইস্ট্‌বেঙ্গল ক্লাব, প্রশান্ত সিংহ'র অধিনায়কত্বে! পরশু দিন বিজ্ঞান ক্লাসে তুমি প্রমথবাবুকে বলেছিলে 'পরমাণু' মানে পায়স! গত কাল বলেছ হাম্মুরাবি বাবরের ছেলে ছিলেন! আজ আবার এই! তোমার চালাকি আমি বন্ধ করছি।'

ক্লাস এইটের ছেলেরা গোমড়া মুখে এ ওর দিকে তাকায়। সবাই জানে অশোক ছেলে খুবই ভাল কিন্তু ছেলেবেলায় শক্ত অসুখ হয়ে ওর বুদ্ধিসুদ্ধি খুব কমে গেছে। কিন্তু প্রদীপবাবু শুনবেন না— রোজ ওকে বকাবকি মারধোর করেন। আর অশোকটাও তেমনি! মারধোর খেয়েও সে প্রদীপবাবুর অন্ধ ভক্ত। অবশ্য হবে নাই বা কেন! কে না জানে ওদের নতুন টিচার প্রদীপবাবু মস্ত ক্রিকেটার! আর ক্রিকেটারদের ভক্তিশ্রদ্ধা করে না এমন ছেলে ওদের স্কুলে অন্তত: নেই।

প্রদীপবাবু বলেন 'তোমাকে মেরে কোনো ফল হয় না। ঠিক আছে কাল ছুটির পর তুমি আটকা থাকবে, যতক্ষণ না তুমি ২০টা বুদ্ধির অঙ্ক কর।' স্তম্ভিত হয়ে অশোক বলল 'স্যার্! কাল যে ১১৷৷০ টায় ছুটি তারপর টিচারদের সঙ্গে ছেলেদের ক্রিকেট ম্যাচ! আপনার খেলা দেখব বলে আমি কবে থেকে আশা করে আছি।' কোনো লাভ হ'ল না, উল্টে অশোক ধমক খেল, 'পাকামী করো না।'

অথচ প্রদীপবাবু যে মস্ত প্লেয়ার সেটা অশোকেরই আবিষ্কার! তিনি দাঁড়িয়ে নেট প্র্যাকটিস দেখছিলেন দেখে অশোক জিজ্ঞাসা করেছিল, 'স্যার্, আপনি ক্রিকেট খেলতেন?' প্রদীপবাবু বললেন 'উ—হুম্—মানে—হ্যাঁ।' 'ভালো খেলতেন স্যার্?' আবার প্রশ্ন। উত্তর এল 'হুঁ—মানে আর কি বেশ ভালোই!' হঠাৎ অশোকের মনে পড়ল যে পি. বোস ব'লে একজন ইউনিভার্সিটি আর রাজস্থান ক্লাবে খেলতেন। বার দুই রঞ্জি ট্রফিও খেলেছেন। আর ইউনিভার্সিটিতে খেলার বছরগুলোও মিলে যাচ্ছে প্রদীপবাবুর সঙ্গে। বাড়ি গিয়েই অশোক পুরনো খবরের কাগজ থেকে কাটা ছবিগুলো মেলে বসল। হ্যাঁ, পি. বোসের ছবির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে প্রদীপবাবুর চেহারা। ছবিটা ক্লাসে আনতে

সবাই বলল যে যদিও ছবিটা একটু ঝাপসা তবু ওটা নিঃসন্দেহে প্রদীপবাবুরই। অবশ্য একটু লম্বা আর মোটা দেখাচ্ছে। অশোকের বন্ধু রজত বলল, 'খবরের কাগজের ছবি তো! কত আর ভাল হবে! কথাটা জানাজানি হতেই ক্লাস নাইনের ছেলেরা বলল—'ওতো আমরা জানি।' অবশ্য ওরা সব কিছুই নাকি আগে থাকতে জানে।

যাই হোক, পরের দিন সকাল থেকেই স্কুলে সাজসাজ রব। প্রত্যেক বছরই এই খেলাটা দিয়ে Season শুরু হয়। এই খেলায় কে কি রকম খেলে তার উপর নির্ভর করে স্কুল টিম নির্বাচন করা হয়। আর একটা আকর্ষণ, স্কুল ক্যাপটেন সুবীর সরকারের বাবা লেফটেনাণ্ট জেনারেল সরকার এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র; তিনি বলেছেন যে এই খেলার শ্রেষ্ঠ ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে তিনি একটি ব্যাট পুরস্কার দেবেন। বলা বাহুল্য, স্কুল টিমের ৭ জন ব্যাটসম্যানের ধারণা যে ব্যাট সে নিজেই পাবে। অবশ্য এবারে স্কুল টিম বেশ শক্তিশালী। অবশ্য টিচারদের দলেও ভালো খেলোয়াড় আছেন। গেমস্ টিচার আছেন। গেমস্ টিচার শামশের সিং, বলা বলা বাহুল্য, ভালো খেলেন। অঙ্কের টিচার ভুবনবাবু প্রৌঢ় বয়সেও ভালো খেলেন। কিন্তু এবছর তার উপরে আছেন প্রদীপবাবু—রঞ্জি ট্রফি প্লেয়ার।

সাড়ে এগারোটায় স্কুল ছুটি হল—সবাই ছুটল মাঠে। প্রদীপবাবু অশোককে বললেন, 'বস, অঙ্কগুলো কর। কি, চুপ করে বসে যে!' অশোক বলল, 'অঙ্ক যে আমি পারি না, স্যার্!' 'ওঃ, অঙ্ক পার না। তুমি কি পার শুনি? পড়াশুনো কেন, কোন কাজই তুমি পার না। তুমি সব কিছুরই অযোগ্য। অঙ্ক না করা অবধি তুমি আজ আটকা থাকবে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রদীপবাবু।

'আরে অশোক যে! আজ পড়াশুনো থাক না।' তাকিয়ে দেখে সাদা সার্ট-প্যান্ট প'রে হেডমাস্টার মশাই। ঘটনাটি শুনে তিনি মনে মনে বললেন, ছেলেমানুষের উপর এত জোর করা ঠিক নয়। অশোককে বললেন 'অঙ্কগুলো করেই ফেল না!' 'পারছি না যে, স্যার্!'—অশোকের উত্তর। 'আরে, এই দেখ—' —দেখতে দেখতে ২০টা অঙ্ক হ'য়ে গেল। 'এবার চল মাঠে, বলেই তিনি হঠাৎ বলেন 'অশোক, তুমি ক্লাস এইটের ক্রিকেট টিমে খেল না?' একটু লজ্জা পেয়ে অশোক বলে, 'হ্যাঁ, সার্।' 'খেলবে আজকে?' অশোক অবাক্! স্কুল টিমেতো শুধু ক্লাস টেন—ইলেভেনের ছেলেরা খেলে। তাকে থামিয়ে হেডমাস্টারমশাই বলেন, 'স্কুলের হ'য়ে নয়, আমার দলে। রাজেনবাবু অসুস্থ, সত্যেনবাবুর'ও হাতে ব্যথা। টিমে একটা জায়গা রয়েছে।' অশোক যেন হাতে স্বর্গ পায়।

স্কুল টিম টসে জিতে নামল ব্যাট করতে। ক্লাস এইটের সকলকে অবাক ক'রে দিয়ে অশোক ফিল্ডিং'এ নামে। স্কুলের ওপেনিং ব্যাটসম্যানেরা এ ওকে আশ্বাস দিচ্ছিল, 'ভয় কি! ভুবনবাবুতো একা দুদিক থেকে বোলিং করতে পারবেন না!' হঠাৎ তাদের মনে পড়ে গেল প্রদীপবাবুর কথা। আসামের বিরুদ্ধে ৬টা উইকেট নিয়েছিলেন পি. বোস। হেডমাষ্টারমশায়'ও সেই আশাতেই ছিলেন। কিন্তু প্রদীপবাবুকে বল দিতে যেতেই তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, স্যার্! বোলিং করতে পারব না। আমার-ইয়ে-গেঁটে বাত হ'য়েছে।' 'সে কি কথা! এই বয়সে গেঁটে বাত!! আমি যে তোমার উপর নির্ভর করছিলাম!!!'

ক্ষুণ্ণ মনে হেডমাষ্টার মশায় নিজেই বোলিং করতে আসেন। তাঁর ঝোলানো বলে পরপর ৫টা চার মেরে শেষটায় অহীন বোল্ড হ'য়ে গেল। খেলছিল শ্যামসুন্দর আর প্রশান্ত। একটা বল কাট ক'রে ছুটতে আরম্ভ করল প্রশান্ত। বলটা ধরেই সোজা ছুঁড়লেন প্রদীপবাবু। উইকেট ভেঙ্গে গেল—রান আউট! অশোক মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখল—এমন নইলে আর রঞ্জি ট্রফি প্লেয়ারের ফিল্ডিং! শুধু ভুবনবাবু মাথা নাড়লেন—তিনি প্রদীপবাবুর অন্যান্য বলগুলো ধরার ব্যর্থ চেষ্টা দেখেছিলেন।

যাই হোক, একটু পরেই ভুবনবাবু একটা উইকেট নিলেন। একসঙ্গে খেলতে লাগল প্রবীর আর সঞ্জীব—দুই ভাই। দ্রুতবেগে রান উঠতে লাগল। প্রবীর উইকেটের চারদিকে মেরে খেলছিল। দেখতে দেখতে ১৫০ রান উঠে গেল। তারপর প্রবীর ভুবনবাবুর একটা বল না দেখে ড্রাইভ করতে গেল। অশোক ছুটে এসে ক্যাচ লুফে নিল। তখন প্রবীরের রান ৮৯। ভুবনবাবু মিঃ সিংকে বললেন, 'দেখুন, এ ছেলেটি ভবিষ্যতে ভালো প্লেয়ার হ'বে। প্রবীরের পর নামল ক্যাপ্‌টেন—সুবীর সরকার। সে ২৫ রান করে আউট হ'লে পর ভুবনবাবুর বলে বাকি উইকেটগুলি চটপট পড়ে গেল। মোট রান হ'ল ২৩১—সঞ্জীব ৭১ নট আউট। সঞ্জীব বলল, 'প্রবীর, ব্যাটটা তুই পাবি।' প্রবীর বলল 'নারে, তুই নট আউট ছিলি—তোরই পাওয়া উচিত।'

হেডমাস্টারমশায় বললেন, 'প্রদীপবাবু, আপনি আর মিঃ সিং আগে নামুন।' ভয়ানক ব্যস্ত হ'য়ে প্রদীপবাবু বললেন, 'না, স্যার্—আমার গেঁটে বাত—' হেডমাস্টার মশায় এবারে বেশ বিরক্ত হ'লেন—ব্যাটিং করবে না, বোলিং করবে না—এই আবার রঞ্জি ট্রফি প্লেয়ার! এই বয়সে আবার গেঁটে বাত কি!! যখন তিন নম্বর বা চার নম্বর নামতেও প্রদীপবাবু আপত্তি করলেন, তখন বিরক্ত হ'য়ে তিনি বললেন 'তবে সব শেষে নামবেন।' প্রদীপবাবু যেন একটু আশ্বস্ত হ'লেন।

গোমড়ামুখে হেডমাস্টারমশায় নামলেন। জেতার আশা এখন আর নেই। কিন্তু আশাতীত ভালো খেললেন তাঁরা। হেডমাস্টার মশায় ৩৬ আর মিঃ সিং ৭২ করে আউট হলেন। যখন অশোক নামল রান তখন ৬ উইকেটে ১৯৯—ভুবনবাবুর রান ৮৩। অশোক গার্ড নিয়ে দেখেশুনে প্রত্যেকটি বল খেলছিল। এক বন্ধু ঠাট্টা করে বলল, 'সাবাস! কপিবুক ক্রিকেট!! ব্যাটটা দেখছি তুই-ই পাবি!!!' কিন্তু পরের ওভারে সুবীরের প্রথম বলেই ভুবনবাবু কট আউট হ'য়ে গেলেন। বয়স হয়েছে—টাইমিং ঠিক মত হয় না।

খেলতে এলেন মৌলভী সায়েব। এসেই সজোরে ব্যাটটা ঘোরালেন বলটা সোজা লাগল মিড্‌ল স্ট্যাম্পে। ম্লান হেসে বললেন, 'বারো বছর খেলছি আজ অবধি একটাও রান করতে পারিনি।' পণ্ডিত মশায় এলেন—এসেই কট অ্যাণ্ড বোল্ড। হ্যাটট্রিক। ৯ উইকেটে ১৯৯। চারদিকে হাততালি পড়ছে। তার মধ্যে নামলেন প্রদীপবাবু। সুবীর ভাবল, এই রে! এইবার আমার বোলিং ছাতু হয়ে যাবে। নেমেই তিনি অশোককে ডেকে কি যেন বললেন। হেডমাস্টার মশায় বললেন, 'যাক্, অশোককে একটু উপদেশ দিচ্ছে। এক্সপিরিয়েন্সড লোক—'

শুনলে অবাক্ হয়ে যেতেন যে প্রদীপবাবু অশোককে বলছেন 'অশোক একটু পিটিয়ে খেল—

আমায় যেন বেশী বল খেলতে না হয়।' তিনি গার্ড নিলেন না (ব্যাপারটার অর্থই তাঁর বোধগম্য হয়নি)। যেভাবে কোনোক্রমে তিনটে বল তিনি ঠেকালেন যে সুবীর প্রায় হেসেই অস্থির। পরের ওভার খেলতে গিয়ে অশোকের মনে হল প্রদীপবাবুর গলা, 'তুমি সব কিছুরই অযোগ্য।' অযোগ্য! দেখাচ্ছি মজা! রাগের মাথায় অশোক স্কুল টিমের ফাস্ট বোলার অমিতের বলে দুটো বাউণ্ডারী মারল। শেষ বলে নিল এক রান। পরের ওভারে সুবীরের বলেও তাই। দর্শকরা অবাক্। দেখতে দেখতে রান উঠল ২২৫। অমিত বোলিং করতে এল। প্রথমেই বোলারের পাশ দিয়ে স্ট্রেট ড্রাইভ বাউণ্ডারী! পরের বলটা স্টাম্প ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। তৃতীয় বলটা সে হুক করল—আবার বাউণ্ডারী! খেলা শেষ। অশোক ৩৩ নট আউট।

ক্লাস এইটের ছেলেরা ভেবেছিল যে প্রদীপবাবুর উপর রাগেই অশোক তাঁকে একটাও বল খেলতে দেয়নি। কিন্তু অশোক চুপ। শুনে সুবীর আর অমিত হাসল—তারা লক্ষ্য করেছিল প্রদীপবাবুর হাঁটু কাঁপছিল ভয়ে! শুধু যে অন্যান্য ছেলেরাই অবাক্ হল তা নয়—অবাক হল অশোকও। প্রবীর আর সঞ্জীবের সঙ্গে কথা বলছিলেন জেনারেল সরকার। অশোককে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, 'কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্। কি ব্যাট চাই তোমার? হ্যাঁ, প্রাইজটা তুমিই পেলে। সবাই আমার সঙ্গে একমত। 'ঠাট্টা করে যা বলা হয়েছিল তাই শেষে সত্যি হল।'

এরপর থেকে, প্রদীপবাবু অশোককে মারধোর আর করেন নি। অশোকেরও অন্ধ ভক্তিটা কমে গিয়েছিল। তবে, স্টাফ স্টুডেণ্ট ম্যাচে প্রদীপবাবু আর কোনোদিন খেলেন নি। ভুবনবাবুর কথাও সত্যি হয়েছিল—পড়াশুনোয় খারাপ হলেও অশোক কালক্রমে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি আর বাংলা রাজ্যদলের নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় হয়েছিল।

ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, ম্যাচটা শেষ হবার পরের দিন আনন্দবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছিল, 'বাংলা দলের রঞ্জি ট্রফি খেলোয়াড় শ্রীপ্রদীপ বোস এবছর অক্সফোর্ড দলে খেলবেন। তিনি গত দুই বছর অক্সফোর্ডে আছেন।' ক্লাস নাইনের ছেলেরা বলেছিল, 'এতো আমরা আগেই জানতাম। ছবিটার সঙ্গে চেহারাটা হঠাৎ মিলে গেছে—খবরের কাগজের ছবি তো!'

॥ ছড়া ॥

অরবিন্দ কুমার দে

হঠাৎ সেদিন উঠল ঝড়ের নৃত্য
দীন মজুরের কাঁপল ভয়ে পিত্ত
ভাঙল কুঁড়ে, হারাল সব বিত্ত
দালান কোঠায় ঠাণ্ডা বাবুর চিত্ত

ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি সব কাঁপল
প্রাসাদগুলো ভীষণ রবে ভাঙল
নয়ন জলে ধনীর বুক ভাসল—
দীন ভিখারী একটু শুধু হাসল॥

(পনেরজন ভারতীয় স্কুলের ছেলেমেয়ে টন্টামোরার স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিতে আসতে গিয়ে ব্রান্টালুসি পর্বত ও ঘন জঙ্গলময় উপত্যকার মধ্যে প্রবল ঝড়ে নিখোঁজ হয়ে যায়।

সাময়িকভাবে সমস্ত আনন্দউৎসব স্থগিত রাখা হল। পাহাড়ের কোলে তির্নিকা গ্রাম থেকে, হেডমাস্টার আরডনের নির্দেশে মিডি, কিকু ও হকোর নেতৃত্বে তিনটি উদ্ধারকারী দল তিনদিক দিয়ে অনুসন্ধান সুরু করল। মাজিনকোর গভীর জঙ্গল ঘন কুয়াশায় ঢাকা। তার উপরে আবার সেখানে শয়তান গ্রাটেনকোর উৎপাত।

ওদিকে, তিনজন গুরুতরভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা নিজেদের সামলে নিয়ে উদ্ধারকারী দলের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু স্টেনগান হাতে গ্রাটেনকো তাদের বন্দী করে ফেলল। প্যারাসুটে নামিয়ে দেওয়া রেডিও-যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ধারকারীরা এই খবর পেল।

তারা সংকেতে খবর পাঠাল যে রাত্রে উদ্ধারকারী লোক নামবে। ছেলেমেয়েরা সংকেত বুঝে উত্তর দিল। ওদিকে ধীরে ধীরে ডাকাত গ্রাটেনকোর মনের পরিবর্তন হচ্ছে।)

॥ ৬ ॥

সারাদিন চোখে দূরবীণ লাগিয়ে বসে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল মিডি। সামনের ধুধু ঘন জঙ্গলের কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। সমস্ত জঙ্গলটা যেন মানুষগুলোকে একেবারে গিলে ফেলেছে।—এমন করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে বিরক্তি লাগছিল ওর। অনেক আশা নিয়ে এসেছিল ও। ভেবেছিল চকমির তাকে বসে সমস্ত উদ্ধার কাজটাকে ও সাহায্য করতে পারবে।—ওর চেষ্টায় মানুষগুলো বাঁচবে।—কিন্তু শয়তান গ্রাটেনকোর শয়তানিতে মানুষগুলো সব হারিয়ে গেছে আজ। চুপচাপ দূরবীণ চোখে দিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ নেই তাই ওর। বেলা পড়ে এলো। গাছের মাথায় পাখিরা ফিরতে শুরু করেছে। দলের

লোকেরা গরম চায়ের পাত্র এগিয়ে দিয়ে গেল সামনে। দূরবীণ নাবিয়ে রেখে তাই হাতে তুলে নিল ও! মন ওর ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। আজও রাত বারটার সময় যখন রেডিও যোগাযোগ করবে ওরা তখন সেই একই কথা বলতে হবে ওকে।—কোন খবর নেই।

এ খবরে কারও কোন উপকার হবে না। চুমুক দিয়েছে কাপে। হঠাৎ দক্ষিণ মাজিনকোর দিকে নজর গেল ওর। ওটা কি! টিবল্লি নদীর মরা খদের প্রায় দক্ষিণ ঘেঁসে ওকি দেখা যাচ্ছে? তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ নাবিয়ে রেখে দূরবীণ হাতে তুলল ও। আরে—এতো যেন মনে হচ্ছে ধোঁয়া! কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে আকাশের গায়ে। ভাল করে আবার ও দেখল। না কোন সন্দেহ নেই—ধোঁয়া। ওখানে কোন জঙ্গল নেই। দাবানল নয় এটা। এ ধোঁয়া মানুষের হাতের কাজ। খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল মিডি। ওর চিৎকার শুনে এগিয়ে এল দলের অন্য কজনে।

—কি দেখছ ওখানে?

সবাই বলল—ধোঁয়া। ধোঁয়া যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—তার মানে কি?

—মানে একটাই। ওখানে লোক আছে। বলল একজন।

—এখবর এখুনি তবে ওদের জানাতে হবে।

—কিন্তু রাত বারটার আগে রেডিও যোগাযোগ করা বারণ। মনে থাকে যেন।

—না, এ হুকুম আমি মানবো না! বলল মিডি। কেন যে ধোঁয়া তার কারণ কি কিছু বুঝতে পারছ?

—না।

—এমনও তো হতে পারে শয়তান গ্রাটেনকো একটা কিছু ভীষণ সর্বনাশ ঘটাচ্ছে। চুপ করে রাত বারটার জন্য বসে থাকা উচিত হবে না। হয়ত তাতে ভীষণ দেরী হয়ে যাবে।

চাবি টিপে রেডিও যন্ত্র তখুনি চালিয়ে দেওয়া হল।

—হ্যালো হ্যালো। মিডি বলছি।

হোলখ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—মিডি! এমন সময়ে যে?

—সে কথা পরে—শোন এখন একটা ঘটনা ঘটেছে যে এখুনি খবর দেওয়া দরকার।

হোলখের ডাক শুনে আরডন ছুটে এলেন। এলেন প্রেসিডেন্ট। এলেন জেনারেল।

—জরুরী খবর স্যার—মিডির কাছ থেকে।

—কি খবর? ব্যস্ত হয়ে প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করলেন।

মিডি বলল—টিবল্লি নদীর মরা খদের ভিতর থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। কাছে কোথাও জঙ্গল নেই। দাবানল নয়। এ আগুন মানুষের করা। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মনে হয় শয়তান গ্রাটেন কিছু সর্বনাশ ঘটিয়েছে!

তাড়াতাড়ি ম্যাপ বিছিয়ে ঠিক কোথা থেকে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে সে জায়গাটা চিহ্নিত করে নিলেন আরডন।

—তোমার মতে কি করা উচিত এখন? মিডিকে জিজ্ঞাসা করলেন আরডন।

—সঠিক যখন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তখন এখুনি প্লেন উড়িয়ে ভাল করে সন্ধান নেওয়া উচিত বলে করি। বলল মিডি।

—বেশ, তুমি সারাক্ষণ নজর রাখ ভাল করে। নতুন কিছু দেখলেই জানাবে। আমরা আলোচনা করে যা করার করব। বললেন আরডন।

পাশের ঘরে মিটিংয়ে বসলেন সকলে। কি করা উচিত এখন এটাই তাঁদের আলোচনা। এ ধোঁয়া যে মানুষের হাতের করা আগুনের তাতে কারও কোন সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারটা নতুন। তবে সব দিক ভাল করে ভেবে দেখেই কাজ করা উচিত। নইলে বিপদ হতে পারে।

জেনারেল বললেন—যাক একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমার সেনাবাহিনীকে আর আন্দাজে কোন কাজ করতে হবে না। তাদের নাবার জায়গা আমি ঠিক করে ফেলেছি। ঐ সন্দেহজনক জায়গার চার পাশে নাবাই হবে তাদের প্রধান কাজ।

—কিন্তু তাদের নাবার সময় কি এর ফলে এগিয়ে যাবে? প্রশ্ন করলেন আরডন।

—আর কি দেরী করা উচিত হবে? পাল্টা প্রশ্ন করলেন জেনারেল।

—প্রথমে আমাদের ভাবতে হবে এ ধোঁয়া কেন। এ কি গ্রাটেনকোর কাজ, না অন্য কিছু? বললেন প্রেসিডেণ্ট।

—যদি তাই হয়। তবে কি যে সে করেছে বোঝার কোন উপায় নেই। যদি খারাপই কিছু ঘটে থাকে তবে তো সৈন্য নাবানোর প্রশ্নই আর নেই।

—তা কেন—বললেন আরডন। একটা কথা ভুললে চলবে না। আমাদের সংকেত ওরা বুঝতে পেরেছে। সে সংকেত বোঝার পরেই এই ধোঁয়া। এমনও তো হতে পারে—ওরাই কোন মতে গ্রাটেনকোর চোখে ধুলো দিয়ে এ সংকেত আমাদের দিচ্ছে শুধু কোথায় তারা আছে বোঝাবার জন্য।

জেনারেল বললেন—তাই যদি হয় তবে সে সংকেত আমরা দেখতে পেয়েছি তা তো এতক্ষণে গ্রাটেনকোর নজরেও পড়েছে। সে কি তবে আর চুপ করে বসে থাকবে? তার প্রতিহিংসা যে কি হতে পারে ভাবা যায় না। আমার মনে হয় আর দেরী করা উচিত হবে না।

প্রেসিডেণ্ট বললেন—আপনি কতক্ষণের মধ্যে আপনার কাজ সুরু করতে পারেন জেনারেল?

—ঘণ্টা চারেক সময় লাগবে আমার। তবে আমি চেষ্টা করব সে সময় কমিয়ে দিতে।

—বেশ এখুনি তবে আপনি আপনার আদেশ জারি করুন।

—আরডন বললেন—এ চার ঘণ্টা তো গ্রাটেনকো বসে থাকবে না। আমার মনে হয় আরও কিছু আমাদের করা উচিত।

—কি করতে চান আপনি? জিজ্ঞাসা করলেন প্রেসিডেণ্ট।

—হকোর শেষ খবরে জেনেছি সে প্রায় টিবল্লি নদীর মরা খদের কাছ বরাবর পৌঁছেছে। সে খবরও কাল রাতের। এতক্ষণে সে আরও এগিয়েছে। এখুনি তাকে হুকুম করা হোক সে যেন তার দল নিয়ে ছুটে যায়। সৈন্যবাহিনীর আগেই সে বোধ হয় পৌঁছোতে পারবে সেখানে।

—এখুনি এ খবর তাকে দেওয়া হোক,—স্থির গলায় প্রেসিডেণ্ট হুকুম দিলেন। তবে সবার কাছে আমার এ অনুরোধও যেন পৌঁছে দেওয়া হয়। অস্ত্রের সাহায্য ছাড়া একাজ উদ্ধার হলে আমি সব থেকে বেশী খুশি হব। কখনও আমরা যেন না ভুলি—বহু বিদেশী শিশুর জীবনমরণ নির্ভর করছে আমাদের সবার উপরে। গ্রাটেনকো আমাদের লক্ষ্য নয়। তাদের ফিরিয়ে আনাই আমাদের উদ্দেশ্য।

হোলখ্ আবার রেডিও চালিয়ে দিল। একবার চেষ্টা করেই মিডির সাথে আবার যোগাযোগ করল ও।

তাকে সমস্ত ঘটনা জানাল। শুনে খুশি হল মিডি।

কেউ কোথাও নেই দেখে হোলিখ বলল—এখুনি হকোকে রেডিওতে চাই। বলতে পার কি করে তাকে ডাকা যাবে?

—অসম্ভব—বলল মিডি। রাত বারটার আগে তো তার সাথে আমার যোগাযোগ হবেনা। কি করে তাকে বোঝাব এখন? সে যে কোথায় আছে তাও জানি না।

স্তম্ভিত ভাবে হোলখ বলল—একটা বেআইনি কাজ করতে পার? দেখো সে কথা যেন আবার কারও কানে না যায়। তবে মুস্কিল হতে পারে।

—কি করতে চাও বল?

—তোমার বন্দুক থেকে ঘন ঘন বেশ ক রাউণ্ড গুলি চালাও শূন্যে। সে আওয়াজ নিশ্চয়ই নীচে হকোর কানে যাবে। ও তা হলেই, নিশ্চয়ই নিয়ম ভেঙ্গে আমার সাথে যোগাযোগ করবে ব্যাপার কি জানতে চাইবে। ব্যাস তাতেই আমার কাজ হবে।

—তাকে কি তোমার খুব জরুরী দরকার?

—নিশ্চয়ই। এখুনি তাকে দরকার।

—বেশ। বলল মিডি। আমি এখুনি আট দশটা ফায়ার করছি। দেখ তাতে তোমার কাজ হয় কি না।

—ধন্যবাদ। বলল হোলখ্।

শুরু থেকেই কোন রকম নিয়ম মানে নি হকো। রাতে চলা খাতে সয়না ওর। তাছাড়া, যে ব্যাপারে ও এসেছে তাতে যে সময়ের দাম কত তা কি বোঝে না ওরা? হুকুম যখন এলো দিনের আলো এড়িয়ে চলতে হবে তখন থেকে ও অবশ্য যতদূর সম্ভব তা মেনে চলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে শুধু নিয়ম মানার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এতগুলো পুরোদস্তুর সেনা বাহিনীর লোক রয়েছে ওর সাথে আর ও কিনা ভয় করে চলবে একটা খুনে ডাকাতকে?—তবে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ও আদেশের পিছনে ভীষণ কোন কারণ আছে। তাই যতটুকু না মান্‌লেই নয় ততটুকু ও মেনেছে। এর ফলে মোট লাভ হয়েছে এই যে ও এগিয়েছে অনেকখানি। আসপাশের সন্দেহ জনক বহু জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেও।

দায়িত্বের দুঃশ্চিন্তা থাকলেও—এর জন্য মনে মনে ও বেশ গর্বিত। ফিরে গিয়ে সবাইকে এ নিয়ে বেশ বড় করে গল্প করতে পারবে। আর সত্যি যদি ঐ বিদেশী শিশুদের খুঁজে বার করতে পারে—তবে:?

তবে নিশ্চয়ই সারা দেশ ওকে মাথায় তুলে নাচবে।

হকোর বয়স খুবই কম। সে তুলনায় যে দায়িত্ব ও পেয়েছে তা খুবই গুরুতর। সাধারণত এমন হয় না। কিন্তু মাস্টারমশাই আরডন তাঁর ছাত্রকে ভাল করেই চিনতেন। জানতেন যত ছেলেমানুষিই ওর মধ্যে থাকুক না কেন—ওর দায়িত্ববোধ ভীষণ। এবং তার জন্যই শেষপর্যন্ত ওর সব কাজই সুষ্ঠুভাবে করতে পারে। নিয়ম মানুক না মানুক—হকো এগিয়ে চলেছে ঠিক।—সমস্ত সন্দেহজনক জায়গাগুলোকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে ও—যদি ডাকাত গ্রাটেনকোর সাথে সত্যিই দেখা হয়, ওর—তবে সৈন্যদলের সবাইকে ও সরে থাকতে বলবে। একাই লড়বে গ্রাটেনকোর সাথে।—আর সে লড়াই যত ভয়ঙ্কর হবে ততই ও দেশের লোকের

কাছে বীর বলে পরিচয় পাবে। তবে হ্যাঁ—সবার আগে ঐ বিদেশী শিশুদের কথা।—তাদের প্রয়োজনে যা করা দরকার আগে তাই করতে হবে ওকে। তাতে লড়া হোক বা না হোক।

সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। নিয়ম ভেঙ্গে সারা দিন একটানা পথ চলার পর সমস্ত দলই ক্লান্ত। তার উপরে প্রতি পদে লুকিয়ে চলতে হয়েছে নিজেদের। তার দায়ও কম না। সবার মনে তখন এক চিন্তা সর্দার থামার হুকুম দেবে কখন? —সবার মনের কথা হকো পড়তে পারে বোধ হয়। হঠাৎ ও হুকুম জারী করল—থামো। সবাই পিঠের বোঝা ফেলে বসে পড়ল।

যেখানে থামল ওরা সেখান থেকে মাইল চারেক দূরেই চৌচির হয়ে ফাটা জমির সুরু। শুনেছে হকো ভূতত্ত্ববিদরা গবেষণা করে বলেছেন আগে টিবল্লি নদীর ধারা এদিক দিয়েই বয়ে যেত। ১১০৬ এর বিরাট ভূমিকম্পের পর ছোট ব্রাণ্টালুসিতে যে ধ্বস নাবে তাতে টিবল্লি নদীর প্রবাহ সম্পূর্ণ দিক পরিবর্তন করে। এখনকার এই নদী সেই পরিবর্তনের ফল। এছাড়াও দক্ষিণ মাজিনকোর বুকের উপরে দুজায়গায় বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয়। তেমন একটা জায়গা পেরিয়ে এসেছে হকো আগেই।

সামনে দেখা যাবে—দ্বিতীয়টা। হকোকে খুঁজে বেড়াতে হবে ঐ সব ফাটলগুলোর ভিতরে। তার পরেই ওর ফিরতি যাত্রা সুরু হবে টিবল্লির মরা খদ ধরে।

সঙ্গিরা খাবারের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। হ্যাভারস্যাক নাবিয়ে একটা ছোট পাথরে হেলান দিয়ে বসল হকো। পকেট থেকে ম্যাপটা বার করে বিছাল সামনে। ঘণ্টা দুই বিশ্রাম। তার পরেই আজ রাতের মতন যাত্রা শেষ করতে হবে ঐ ফাটা জমির ধারে পৌঁছে। হুঁসিয়ার হকোর বোধহয় একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল—হঠাৎ চমকে উঠল ও। ওকি !!! চকমির তাক থেকে পর পর ভেসে এল ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ !! না কোন সন্দেহ নেই তাতে। মিডি বিপদে পড়েছে। ভীষণ বিপদে—এ তারই সংকেত। নিশ্চয়ই ওর রেডিও যন্ত্র খারাপ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই গ্রাটেনকো ওকে আক্রমণ করছে। নয়ত এমন কিছু বিপদ ঘটেছে যা ওকে অসহায় অবস্থায় ফেলেছে। দলের অনেকেই এসে দাঁড়াল পাশে। তারাও শুনেছে শব্দ। এক সেকেণ্ডেই মন ঠিক করে ফেলল হকো।—রেডিও চালিয়ে এখুনি হোলখের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করতে হবে। যোগাযোগ হলে তাদের মতামতের উপরে নির্ভর করতে হবে। নইলে দল ভেঙ্গে এক দলকে পাঠাতো এখুনি চকমির তাকে।—

—হ্যালো, হ্যালো…

হোল্‌খ বলল—তোমাকেই খুঁজছি হকো।

—মিডির ভীষণ বিপদ হয়েছে :…

—না। আমার হুকুমেই ও আওয়াজ করেছে তোমাকে সজাগ করবে বলে।

—কেন? ব্যাপার কি?

—ধোঁয়া দেখ নি তুমি?

—না। কোথায় ধোঁয়া? কিসের ধোঁয়া?

—টিবল্লি নদীর মরা খদে। উত্তর ফাটল জমির আন্দাজ ছ সাত মাইল দক্ষিণে।—

—সে জায়গা আমরা পার হয়ে এসেছি দুপুরে।

—এখুনি ফিরে যাও সেখানে। ধোঁয়া মানুষের করা। দেখ গিয়ে কি হয়েছে সেখানে।

—এখুনি আমরা যাত্রা করছি।

ভাল করে জিজ্ঞাসা করে ম্যাপের উপরে মোটামুটি জায়গাটাকে ঠিক করে নিল হকো।—

—আর কোন হুকুম আছে?

—আছে। প্রেসিডেণ্টের হুকুম—গুলি চালানো চলবে না। মনে রেখ বহু বিদেশী শিশুর জীবন নির্ভর করছে তোমার কাজের উপরে।—

—মনে থাকবে একথা আমার।—দরকার হলে আমি প্রাণ দেব তাদের জন্য।

—ধন্যবাদ। তোমার ভাল হোক।

গরম জলের পাত্র উল্টে ফেলে দিল ওরা। হাভারস্যাকগুলো উঠল পিঠে। সবাই প্রস্তুত। একটা কিছু ঘটার সম্ভাবনায় সবাই যেন কেমন গম্ভীর হয়ে পড়েছে হঠাৎ। খাওয়া পরে হবে। বিশ্রাম? তার এখন দরকার নেই। ক্লান্তি? ও কিছু না। শিশুদের উদ্ধার করে, ও কথা ভাবা যাবে। গ্রাটেনকো? হাজার গ্রাটেনকোকেই ওরা এখন আর ভয় করে না—এসো, এগোও সকলে—

সবার আগেই এগোলো হকো তার পিছনে অন্য সকলে। কোনরকম শব্দ করবে না। কথা একদম বন্ধ। এমন কি নিশ্বাসও যেন জোরে না নেওয়া হয়। শয়তান গ্রাটেনকো বড় সজাগ! থামাও চলবে না! চলতে হবে জোরে। হাতের বন্দুকগুলোর কথাও ভুলে থাকতে হবে। হোলখকে শেষ খবর দিয়েছে হকো—আশা করি সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসার আগেই আমরা সেখানে পৌঁছাতে পারব। সে কথার যেন বিশেষ নড়চড় না হয়। চল চল-যত জোরে পার সবাই চল।

ও ধোঁয়া কিসের? ওকি গ্রাটেনকোর কাজ? তবে তো সর্বনাশও হতে পারে। অন্য কোন কারণও থাকতে পারে! তাই যেন হয়। আর যাই হোক ও ধোঁয়া মানুষের কাজ। সে মানুষ এ জঙ্গলে ঐ বিদেশী শিশুরা ছাড়া আর কে হতে পারে?

—চল চল তাড়াতাড়ি চল। দেরি হয়ে গেলে সারা দেশের কাছে আর কোন কৈফিয়তই দেওয়ার থাকবে না। সে লজ্জায় পড়ার থেকে মরা ভাল।

সন্ধ্যা এড়ানো গেল না। সন্ধ্যার মুখোমুখি নদীর খদের ঢালু জমির পাড়ে এসে পৌঁছাল ওরা। একটু থামল হকো। এর পর কোন দিক বেয়ে নাববে ওরা? সামনের আধমাইল জায়গা ঘুরে ডান দিকে বাঁদিকে যত দূর নজর যায় আঁকাবাঁকা টিবল্লির মরা খদ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কোন দিকে ওদের খোঁজ পাওয়া যাবে? বেশী ভেবে কোন লাভ নেই। হাতে এমন কোন সঠিক নিশানা নেই যা থেকে ঠিক জায়গাটাকে খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং মিথ্যা চিন্তা না করে কাজে নেবে পড়াই উচিত।

তাই করল হকো। মরা খদের ঢালু কিনারা দিয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করে দিল ওরা। একবার ভেবেছিল ও সারা দলটাকে ছোট ছোট করে নানান জায়গায় ছড়িয়ে দেবে! কিন্তু তাতে লাভের চেয়ে বিপদ বেশী বলেই মনে হয়েছে ওর। এক সাথে থাকলে হয়ত কিছু দেরী হবে, তবে তাতে কাজ হবে ভাল।

অল্প কিছুদূর নেবেই বুঝতে পারল হকো কাজটা খুব সহজ হবে না। সারা খদটা বছরের পর বছর বৃষ্টির জলে ধুয়ে ধুয়ে ভীষণ রূপ নিয়েছে। মাটি নেই কোনখানেই। বালি বা নুড়িতে ভরা সমস্ত জায়গাটা। ছোট শুকনা কাঁটা ঝোপের জঙ্গলে ছাওয়া চারদিক। প্রতি পদক্ষেপে ডাইনে বাঁয়ে মাটি ধুয়ে যাওয়ার ফলে হাঁ করে থাকা এঁকাবেঁকা গভীর ফাটল। কতদূর যে চলে গেছে তা কে জানে? কোন কোনটা তার এত চওড়া যে তার মধ্যেও গ্রাটেনকোর মতন শয়তানের লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়। শুনে এসেছিল টিবল্লি নদীর মরা খদ গোলক

ধাঁধার মতন। একবার ঢুকলে সারা জীবনেও পথ খুঁজে বার হওয়া যাবে না। আজ নিজের চোখে দেখে সে কথা মিথ্যা বলে মনে হল না হকোর। খদের ভিতরে রাত ঘনিয়ে আসছে। উপরের পৃথিবী এতক্ষণে নিশ্চয়ই অন্ধকার হয়ে গেছে।

অন্ধকারে মানুষকে একেবারে অন্ধ করে না। কিন্তু এ ভীষণ গভীর খদের অন্ধকার ওদের সবাইকে যেন একেবারে অন্ধ করে দিল। এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। প্রতিপদে সকলেই হোঁচট খেতে লাগল। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। উপরের পৃথিবীতে নিঃশব্দেরও যেন কেমন একটা সুর শোনা যায়। এ গভীর খদ নিঃশব্দ, যেন মরা। সেই মরা নিঃশব্দের মাঝখানে শুধু ওদের ভারি বুটের একঘেঁয়ে আওয়াজ খদের দুপাশের ঢালু দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলে উপরের দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে, সে আওয়াজ বিরক্তিকর।

হকোর মনে হল ধরা পড়ে যাবে ওরা। থামলে মনে হয় সারা পৃথিবী মরে গেছে। চললে পায়ের আওয়াজ গোপন করা যায় না।—

চাপা গলায় হকো বলল—মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালতে হবে। আমরা কোথায় যাচ্ছি কিছুই বুঝতে পারছি না। আর সাবধান। গ্রাটেনকোর সাথে আচমকা দেখা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়—বন্দুক সামনে রাখবে সকলে। কেউই একথায় সাড়া দিল না। চলার তালে বলার কথা ওরা ভুলে গেছে।—শুধু গ্রাটেনকোর নামটা ওদের কানের মধ্যে বিঁধে গেল যেন।—বন্দুকের মুখ নাবিয়ে ও লোকটাকে কি বশ করা যাবে?

আরও কিছুক্ষণ কাটল। হকো তখন ভাবছে—দু মিনিটের জন্য সবাইকে একটু বিশ্রাম করার সময় দেবে নাকি।—ঠিক তখনি একটু দূরে পাশের ঢালু পাড় বেয়ে গড়িয়ে পড়ল বেশ কতগুলো বড় বড় পাথরের নুড়ি। তার পরেই কেমন যেন কতগুলো শব্দ হল ফাটলটার মধ্যে, ধপ করে কি যেন পড়ল সেখানে। আন্দাজে বুঝল হকো—ঠিক সামনের ফাটলের মধ্যেই ঘটল যা কিছু। এক পাও আর না এগিয়ে সেখানেই থেমে পড়ল হকো—বলল দাঁড়াও সকলে।

গ্রাটেনকো! নইলে কোন জানোয়ার—বন্দুক বাগিয়ে দলের সকলে এগিয়ে এল কাছে।

—হুকুম দাও আমরা এগোবো।—

—না। দাঁড়াও সকলে। বলল হকো। কেউ এগোবে না। যাই হোক না কেন, যাব আমি একা আগে অস্ত্র ছাড়া। আমার ডাক শুনে পরে যাবে তোমরা।—এ আমার হুকুম। অন্য কোন রকম কিছু করা হয় না যেন!—

বড় টর্চটা জ্বালাল হকো। সামনে আলো ফেলে দেখল কোথাও কিছু নেই। শুধু ডান দিকে ফাটলের অন্ধকার মুখটা বিভৎস দেখাচ্ছে।—বিপদ তার মধ্যেই। সেখানেই ঢুকতে হবে ওকে—বন্দুক নাবিয়ে রাখল হকো নাবাল হ্যাভারস্যাকটা। টর্চটা হাতে নিয়ে দুপা এগিয়ে গিয়ে স্পষ্ট গলায় চেঁচিয়ে উঠল—আমি একলা আসছি গ্রাটেনকো আমার হাতে কোন অস্ত্র নেই। বিশ্বাস তোমাকে করতেই হবে আমার কথা। আমাকে মারতে হলে তুমি মারবে, কেউ বাধা দেবে না তোমাকে। তবুও আমি আসবো। তোমার সাথে আমার দেখা হওয়া দরকার। তাতে দুজনেরই ভাল হবে গ্রাটেনকো।

দলশুদ্ধ সবাই বন্দুক হাতে নিয়ে শুম্ভিত হয়ে দাড়িয়ে রইল। ধীর অথচ শক্ত পায়ে এগোলো হকো। শুধু ওর উপরেই নির্ভর করছে ঐ ভীষণ ডাকাতটাকে বশ করা। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এখনও তো কেউ জানে না কোথায় আছে বন্দীরা। ফাটলের মুখে এসে আলো ঘোরানো হলো। সামনেই একটা বাঁক। তারপরে আর কিছুই দেখা যাবে। জোরে জোরে পা ফেলে এগোলো হকো, বাঁক ফিরেই আলো সোজা ফেলল। সামনে কয়েক গজ দূরেই বুকের উপরে দুহাত মুড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। আলোয় তার চোখে স্পষ্ট

দেখা গেল। একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল হকো—তুমি গ্রাটেনকো?—

চুপ করে রইল লোকটা কিছুক্ষণ, তারপর বলল—

—এসো আমার সাথে, বন্দীরা কোথায় আছে দেখিয়ে দিচ্ছি।—এসো তাড়াতাড়ি।

—তোমার পরিচয় দেবে না?

—তার কি কোন দরকার আছে? বন্দীদের ভাল যদি চাও তো এসো।—

—আমার সঙ্গে আরো লোক আছে!

—জানি। তাদেরও ডাক।

—তারা সেনাবাহিনীর লোক। আমার মতন এত সহজে তোমাকে নাও ছাড়তে পারে।

লোকটা বিরক্তির সাথে বলল—এত কথা কেন? কাজ কর। তার জন্যই তো তোমাদের পাঠানো হয়েছে। জানো কি বন্দীদের মধ্যে এমন আহত আছে যাকে এখুনি হাসপাতালে নেওয়া উচিত।

এর পর আর কোন কথা চলে না। আলোয় ভাল করে দেখেছে হকো লোকটার হাতে কোন অস্ত্র নেই। সুতরাং একে ভয় করার কোন মানেই হয় না। অন্য কোন বদ মতলব আছে ওর তাও মনে হয় না। থাকলে সবাইকে ডাকতে বলত না।

এমন লোকের পরিচয় দিয়ে কি হবে আর। আর সে কথা তো আগে নয়। আগে আহতদের কথাই ভাবা উচিত।

তারপর না হয় চেষ্টা করা যাবে তার পরিচয় খুঁজে বার করার। লোকটাই যে গ্রাটেনকো—তাতে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই হকোর।

হকো বলল—আচ্ছা তুমি এসো আমার সাথে। সামনেই আমার লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। ভয় নেই তুমি যেই হও না কেন তারা তোমার কোন ক্ষতি করবে না—

একথা শুনে লোকটা হটাৎ হেসে উঠল ভীষণ ভাবে। ওর হাসির শব্দে চমকে উঠল হকো—বাপ্‌রে মানুষেও এমন করে হাসতে পারে নাকি!

লোকটা বলল—কে আমার কি ক্ষতি করবে সে ভয় আর আমার নেই, যা হবার তা হয়ে গেছে।

এখন তুমি এগোও তাড়াতাড়ি—

আর কোন কথা না বাড়িয়ে এগোলো হকো। ফাটলের মুখেই সকলে ছটফট করছিল ওর অপেক্ষায়। ওদের দুজনকে বার হতে দেখেই বন্দুকের ট্রিগারে হাত রাখল সকলে তা বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারল হকো।—ও কিন্তু কাউকেই কিছু বলল না। লোকটাও কোন কিছুর দিকে ফিরেও দেখল না।

—এসো তোমরা। বলে বড় বড় পা ফেলে এক দিকের খদ ধরে হাঁটতে সুরু করে দিল।

কতবার যে ডাইনে বাঁয়ে ফিরতে হল ওদের তার হিসাব আর থাকল না কারও। অসম্ভব গোলমেলে পথে লোকটা চলেছে কেমন নিশ্চিন্ত মনে। অন্য সবার মনে তখন ভীষণ দুঃশ্চিন্তা।

কি মতলব লোকটার কে জানে।—কোন অদৃশ্য বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে না তো সবাইকে?

ঘণ্টা খানেক সমানে চলে হঠাৎ যেন সবার মনে হল—সামনের বাঁকের মুখে আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। লোকটাও এগোলো সেই দিকে। একটা বাঁক ফিরতেই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল সে আলোর আভাস। আরও ক'পা এগোতেই দেখা গেল ভীষণ চওড়া হয়ে গেছে মরা নদীর খদ। এক পাশের দেওয়ালের গায়ে এক গুহা মুখের সামনে দাউ দাউ করে এক মশাল জ্বলছে সে, আলোর সামনে বসে একজন—

দলের সবাই হঠাৎ ছুটতে সুরু করে দিল। পাথুরে জায়গায় জুতোর আওয়াজ যেন কাঁপিয়ে তুলল চারদিক। অবাক হয়ে দেখল লোকটা কিন্তু এ সুযোগে পালাবার চেষ্টাও করল না। চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল শুধু। আলোর সামনে যে বসে ছিল হঠাৎ এত লোকের পায়ের আওয়াজ শুনে সে চমকে উঠে দাঁড়াল। তারপর তার গলা দিয়ে বার হল এক অদ্ভুত আনন্দের চিৎকার। লোকটার চিন্তা মন থেকে দূর হলো। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সামনে। ততক্ষণে চিৎকার শুনে গুহার ভিতরে থেকে দলে দলে সবাই বাইরে বার হয়ে আসতে সুরু করেছে। যেন সবাই এরই জন্য জেগে বসেছিল। সৈন্য দল গিয়ে তাদের ঘিরে ধরল। কেমন আছো তোমরা ?

—কার কার আঘাত লেগেছে ?

—তোমার নাম কি ?

—ডাকাতটা কোথায় ? এখুনি বাঁধবো তাকে !

কিছুক্ষণ কেউই কারও কথা শুনল না। অনেক চেষ্টা করে সবাইকে শান্ত করল হকো।

রাণা বলল—আসুন আপনারা সবাই ভিতরে। অনেক জায়গা আছে। নিশ্চয়ই সবাই আপনারা ক্লান্ত। এখুনি চায়ের ব্যবস্থা করা হবে। হকো বললো—কিন্তু গ্রাটেনকো ? তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হবে ? কথ বলতে বলতে ওরা সবাই গুহার ভিতরে ঢুকল।

—সে তো এখানে নেই এখন, রাণা বলল।

—আছে। সেই তো আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে।

—সেই পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে ? অবাক রাণা।

—হ্যাঁ তাই মনে হয়। নইলে এ জঙ্গলে পথ দেখাতে আসবে কে আর ?

—কোথায় সে ?

—বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি রাণা বাইরে গেল। এদিক ওদিক খুঁজল। না, কোথাও গ্রাটেনকো নেই। ফিরে এসে, জানালো সে কথা।

—সে কি ? তবেতো সে পালিয়েছে।

তনুক্কা বলল তার কথা যাক। এখন আমাদের তাড়াতাড়ি এখান থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বলল হকো। আমি এখুনি রেডিও যোগাযোগ করে সব ব্যবস্থা করছি।

তখুনি হকো রেডিও চালিয়ে দিল—

—হ্যালো। হ্যালো

ঘুম জড়ানো গলায় হোলখ্ উত্তর দিল—খবর কি তোমার হকো ? সন্ধ্যে তো অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে।

প্রেসিডেন্টকে জানানো হোক আমারা বন্দীদের উদ্ধার করতে পেরেছি। গ্রাটেনকোকে বন্দী করা যায় নি। এখুনি হেলিকপ্টর পাঠানো হোক।

ওদিকে চেঁচিয়ে উঠল হোলখ্—ধন্যবাদ। ধন্যবাদ হকো, আমি এখুনি এখবর জানিয়ে দিচ্ছি। তবে তুমিও শুনে রাখ হকো দেরী দেখে আমাদের সৈন্যদলও রওনা হয়ে গেছে এই কিছুক্ষণ হল। হয়তো তুমি প্লেনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ। ওরাও এখুনি নাববে। গ্রাটেনকোকেও আর পালাতে হবেনা। ও ধরা পড়বেই।

তখুনি হকো শুনতে পেল মাথার উপরে প্লেনের গর্জন। বলল—হ্যাঁ আমি প্লেনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। তুমি আমাদের এখুনি এখান থেকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে বল। বিশেষ করে আহতদের।

খবর পৌঁছল প্রেসিডেন্টের কাছে। খবর শুনলেন জেনারেল। হুকুম দিলেন তিনি যে করে হোক গ্রাটেনকোকে বন্দী করতেই হবে। তার বিচার চাই। সে আদেশ দিল তার সৈন্যবাহিনীর সকলকে সারা জঙ্গল মরা নদীর সমস্ত খদ ঘিরে তন্ন তন্ন করে ওরা খুঁজে চলল।

* * *

সৈন্য বাহিনীর সাথে এলো ডাক্তার এলনাসা, এলেন আরডন। এলো নানান জিনিস। ওষুধপত্র, খাবার। সারা গুহা জুড়ে বিরাট যেন একটা হাসপাতাল বসে গেল।

মনে মনে সকলেই খুশি হলেও কেন যেন সবার মন খারাপ হয়ে গেল। গ্রাটেনকোর সম্বন্ধে এরা এতটুকুও দয়া দেখাতে রাজী নয়!

রাণা, টম, বিলি হামিদুল আর মুংলি গিয়ে দাঁড়াল তহুক্কার সামনে—একি হল? আমরা তো বলেছিলাম ওকে—ওর কিছুই হবে না।

তহুকা বলল—দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়।

ওদের কেমন যেন মনে হল তহুক্কাদিদি আর যেন ঠিক আগের মতন নেই। হাসপাতালের কড়া শাসনে ওদের সবাইকেই শুয়ে পড়তে হয়েছিল। ঘুমিয়েও পড়েছিল ওরা।

হঠাৎ বাইরে গোলমালের শব্দ উঠতেই সবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কারও কোন বারণ না শুনে রাণা উঠে পড়ল। তার দেখাদেখি অন্য অনেকে।

বাইরে গিয়ে দেখল—নতুন একদল সৈন্য ফিরেছে টহল দিয়ে এখুনি। সঙ্গে তারা ধরে এনেছে গ্রাটেনকোকে। বিরাট শক্ত শিকল দিয়ে বাঁধা গ্রাটেনকো দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে মাথা নীচু করে। আর সৈন্যবাহিনীর সকলেই ওকে টিটকিরি দিচ্ছে।

কেমন যেন বিচ্ছিরি লাগল রাণার। এগিয়ে গিয়ে গ্রাটেনকোর সামনে দাঁড়াল ও। ফিরে দাঁড়িয়ে সমস্ত লোকদের দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল!

—কি করছ তোমরা? ওকে বেঁধেছো কেন? খুলে দাও। খুলে দাও এখুনি।

ওর কথা শুনে অবাক হয়ে সকলে থমকে গেল। এমন যে হবে তা কেউই ভাবতে পারেনি। কেউ কোন উত্তরই দিতে পারল না।

রাণা চেঁচিয়ে উঠল—কোথায় তোমাদের দলপতি? ডাকো তাকে—ওকে এখুনি খুলে দিতে হবে। ওর কথার মধ্যে এমন জোর ছিল যে একজন সত্যি ছুটে গেল মেজরের খোঁজে। তখন ভোর হয়ে গেছে। খদের ভিতরেও দিনের আলো ঢুকেছে। সৈন্যদলের আলোগুলোও নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। খবর পেয়ে মেজর ছুটতে ছুটতে এলো।

—এখুনি হেলিকপ্টর নাববে খবর পেলাম। যাও তোমরা তৈরী হয়ে নাও গিয়ে। আগে যাবে আহতরা তারপর তোমরা।

রাণা বলল—একে ছেড়ে দিন এখুনি।

—সে ক্ষমতা আমার নেই। বলল মেজর।

—ও তো কোন দোষ করে নি!

—সে বিচার আমি করব না। আমার উপরে অন্য হুকুম আছে। আমাকে তাই মানতে দাও।

—কিন্তু এতো অন্যায়। ভীষণ অন্যায়…।

হঠাৎ গ্রাটেনকো বলল—ক্যাপ্টেন…তুমি যাও। আমার জন্য তুমি ভেবো না। এই বোধ হয় ঠিক হল। শয়তান গ্রাটেনকোর শেষ—যা সকলেই চায়। আমার পাওনা আমাকে নিতে দাও।

—কিন্তু…রাণার কথা শেষ হল না। আকাশে সারি সারি হেলিকপ্টর দেখা গেল।

মেজর বলল—আর দেরী কর না! তুমি যাও। তোমার দেরী হলে মিছিমিছি সবাই আটকা পড়ে যাবে। যাও তুমি।

ফিরতে হল রাণাকে।

—কি হল? এক সাথে সবাই জিজ্ঞাসা করল ওকে।

—না, ওকে ছাড়া হবে না। বলল রাণা। ওকে অমন করে শিকলে বেঁধেই রাখা হবে।

সবার মন খারাপ হয়ে গেল।

* * *

সারা পৃথিবীতেই খবরটা রটে গেল। হকো—বীর হকো বন্দীদের উদ্ধার করেছে। আর কোন ভয় নেই। আগামী কাল সকালেই তাদের ফিরিয়ে আনা হবে। গ্রাটেনকোকে বন্দী করার সব রকমের চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করা যায় সেও ধরা পড়বে।

পরদিন সকাল থেকেই তির্নিকা গ্রামে মেলা বসে গেল। সারা রাত ধরে পথ চলে এসেছে এমন লোকও যুটল সেখানে। আর এল দেশ বিদেশ থেকে সাংবাদিকরা। এলো তাদের হাজার রকমের ক্যামেরা আর—নানান প্রশ্ন। মাঝ রাতে গুজব রটল গ্রাটেনকো ধরা পড়েছে। তবে তার আগে অন্তত কম করে সে পঁয়তাল্লিশ জনকে ঘায়েল করেছে!! দৌড়াদৌড়ি পড়ে গেল সাংবাদিকদের মধ্যে। কেউ ঘুমল না সে রাত্রে তির্নিকা গ্রামে একটু পরেই পাকা খবর এলো—না বাজে কথা ধরা পড়ে নি গ্রাটেনকো। তবে জোর লড়াই চলেছে—দ্বিতীয় ফাটা চৌচির জমির ভিতরে। কি হয় বলা যায় না। আবার ছুটোছুটি সুরু হয়ে গেল সাংবাদিকদের। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সে খবরও বাজে। শেষ রাতে কারা যেন লাউডস্পিকারে চেঁচাতে সুরু করল—শয়তান গ্রাটেনকোকে জনতার হাতে তুলে দিতে হবে, তারাই তার বিচার করবে জ্যান্ত পুড়িয়ে। পুলিশ তাদের থামিয়ে দিল অনেক কষ্টে। প্রথম কাক ডাকল যখন—তখন জানা গেল—আহতেরা ভালই আছে। সবাই ফিরবে সকালেই এ খবর দিলেন—গভর্ণমেণ্টের মুখপাত্র।

সাংবাদিকেরা তাকে ধরল—গ্রাটেনকো? তার খবর কি?

—না তার কোন খবর নেই।

ভোর হয়ে গেল। মেলা জমে উঠল তির্নিকাতে। তির্নিকা না ঘুমাক কাল রাতে, সমস্ত টাণ্টামোরা রিপাবলিক কাল কিন্তু ঘুমিয়েছে আরামে।

সকাল থেকেই—হকো, মিডি, আরডন আর কিকুর ফটো বিক্রি সুরু হয়ে গেল। সবার ভিড় হকোর ফটোর জন্য। সে আজ সারা টাণ্টামোরার বীর। কিছু পরেই হেলিকপ্টর উঠল আকাশে।

কিছুক্ষণেই সে গুলো পেরিয়ে গেল বড় ব্রান্টালুসির চূড়া। মাইকে ঘোষণা করা হল স্কুল ময়দানের মাঠে সবাইকে নাবানো হবে। সবাই যেন শৃঙ্খলার পরিচয় দেয়। রেডক্রসের গাড়ির পেছনে ব্যাঘাত না করে যেন। ব্যাস ভীড় আস্তে আস্তে জমা হতে সুরু করল—স্কুলের মাঠে। কিছুক্ষণ পরেই প্রেসিডেণ্ট জেনারেলকে সঙ্গে নিয়ে

হাজির হলেন সেখানে। সাংবাদিকরা ছুটোছুটি করে ছবি তুলল টেলিভিসনের ক্যামেরাগুলো মাথা তুলে দাঁড়াল চারদিকে। প্রেসিডেন্ট আর জেনারেলের মুখে আজ হাসি। জনতার উদ্দেশ্যে তাঁরা হাত নাড়লেন।

ঠিক তখুনি কোথা থেকে যেন মাইকে ঘোষণা করা হল। আপনাদের সবাইকে একটা সুখবর দেওয়া হচ্ছে। এই মাত্র জানা গেল আমাদের বীর সেনাবাহিনী শয়তান গ্রাটেনকোকে বন্দী করেছে।...ঘোষণার বাকি কথাগুলো আর শোনা গেল না। পাগল হয়ে সবাই তখন লাফাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে! সে চিৎকার থামতে না থামতেই আকাশের গায়ে সারি সারি হেলিকপ্টর দেখা গেল।

মুহূর্তে শান্ত হল জনতা। ছুটে এলো রেডক্রসের গাড়ি। প্রথমটা থেকে নামল স্ট্রেচার। তোলা হল তা এ্যাম্বুলেন্সে। ছুটে চলে গেল এ্যাম্বুলেন্স। হাজার ছবি উঠল। নানান কথাও উঠল ভিড়ের মধ্যে

কে? কি হয়েছে ওদের?

তহুক্কা। আমাদের বীর এয়ার হোস্টেস ঐতো প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়েছে এদের।

—আর কে সঙ্গে?

—আমিনা খাতুন।

—গ্রাটেনকোর গুলিতে আহত হয়েছে?

—শয়তানটকে ছিঁড়ে ফেলা উচিত।

—ওর ফাঁসি হবে দেখিস।

দ্বিতীয়টা থামল এসে। নামল তার থেকে একদল ছেলে মেয়ে। ঠিক তেমনি করে ছবি তোলা হল। তেমনি করে কথার ঢেউ উঠল জনতার মধ্যে।

—দেখেছিস কি হাল করেছে গ্রাটেনকো ওদের।

এগিয়ে এলেন প্রেসিডেন্ট। কারা যেন মালা পরিয়ে দিল সবাইকে। প্রেসিডেন্ট বললেন—বীর তোমরা। এই দেশের সবার পক্ষ থেকে আমি তোমাদের সবাইকে সাদরে গ্রহণ করছি।

জনতার আনন্দ চিৎকারে আর কোন কথাই শোনা গেল না। কারা যেন এগিয়ে এসে ওদের সবার হাত ধরল—কারা যেন গাড়ি নিয়ে এলো। সমস্ত ভীড় দুপাশে সরে গিয়ে পথ করে দিল।—কিন্তু ভাল করে বোঝার আগেই দেখল ওরা একটা বড় গাড়িতে বসে আছে সকলে। আর সে গাড়ি ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে পাহাড়ি পথের ঢল বেয়ে রাজধানী টান্টামোরার দিকে।

—আমরা ফিরে এসেছি। বিড়বিড় করে বলল রাণা।

—হ্যাঁ। বলল টম।—কিন্তু ভাল লাগছে না।

—গ্রাটেনকো কি লোক খারাপ ছিল? বিলি জিজ্ঞাসা করল।

—না। আমাদের সে কি করেছে? বলল হামিদুল।

—তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। বলল মুংলি।

—আমরা প্রেসিডেন্টকে বলব। বলল গুরুদিৎ।

—সেই ভাল। ওরা সবাই এক সাথে বলল।

বাসের হর্ন বেজে উঠল। ওরা সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল—সামনে অল্প দূরে সহর দেখা যাচ্ছে—মস্ত সহর। টণ্টামোরা রিপাবলিকের রাজধানী টণ্টামোরা।

সেখানে তখন চলেছে উৎসবের আয়োজন—স্বাধীনতা উৎসব কদিন পরেই॥—

—শেষ—

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর।

দিগদর্শী প্রকৃতি-পড়ুয়া ডারউইন

জীবন সর্দার

'জুনোমিয়া' বইটি লিখেছিলেন ডাক্তার ইরেসমাস ডারউইন। তিনি চার্লস রবার্ট ডারউইনের দাদু। বইটির একজায়গায়, বিবর্তনের কথা ভেবেই হয়তো তিনি লিখেছিলেন, 'যে সব প্রাণীর রক্ত 'গরম' তারা সবই একই সূত্র থেকে এসেছে—একথা ভাবলে কি খুব সাহসের পরিচয় দেওয়া হবে?'

দাদুর লেখা বইটির কথা চার্লস তাঁর বাবার মুখে শুনেছিলেন। চার্লস ডারউইনের জন্ম, তোমরা জান, ফেব্রুয়ারী মাসের বারো, আঠারশ' ন' সালে। পড়াশুনা করার চেয়ে তাঁর নুড়ি কুড়োনো, পোকামাকড় ধরা, পাখির ডিম খোঁজ করায় ঝোঁক ছিল বেশি। তাঁর বাবা এসব অপছন্দ করতেন না, অপছন্দ করতেন পরীক্ষায় পাওয়া তাঁর খারাপ নম্বরগুলোকে। তাঁর বাবা ডাক্তার রবার্ট ওয়ারিং ডারউইন চাইতেন না আট বছর বয়সে মাতৃহারা ছেলেটি পড়া ফেলে সারাদিন প্রকৃতি-পড়া আর খেলা নিয়ে মেতে থাকে। সময়মত চার্লসকে তিনি ডাক্তারী পড়তে পাঠালেন। পড়া ছেড়ে পালিয়ে এলেন চার্লস—অপারেশন টেবিলে ছোট্ট একটি ছেলের কান্না শুনে। এবার ঠিক করলেন যাজক হবেন।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাজকবৃত্তি পড়ার সময় শিকারে বেরতেন দলবেঁধে, আর পোকামাকড় ধরে দেখতেন। আর উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক রেভারেণ্ড হেন্‌স্‌লর সাথে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতি বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতেন। জুনোমিয়া বইটি আবার পড়লেন। সৃষ্টিরহস্য নিয়ে গ্রীক দার্শনিকদের কি মত তা পড়লেন, লামার্কের লেখাও পড়লেন। নিঃসন্দেহে এই সব চিন্তা ভাবনা তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল। কি মনে করে কে জানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষার শেষে দক্ষিণ সমুদ্রে বেড়াবার একটি সুযোগ পেয়ে তিনি নেচে উঠলেন।

ডেভেনপোর্ট বন্দর থেকে 'বিগল' জাহাজটি নোঙর তুলে রওনা হলো ১৮৩১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর! ডাঙা ছেড়ে দূরে যেতে না যেতেই ডারউইন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে সময় কাটাতে একখানি বই তুলে নিলেন। বইখানি চার্লস লিলের লেখা প্রিনসিপ্‌ল্‌স্‌ অব জিওলজি। বইটিতে প্রাকৃতিক শক্তিগুলি, বৃষ্টি, ঝড়, হাওয়া ভূমিকম্প এগুলিই ভূপৃষ্ঠের রূপ বদলে দিচ্ছে আর কিছু নয়, কথাটি পড়ে ডারউইন অভিনব এক চিন্তার খোরাক পেলেন। নতুন যেখানেই জাহাজ ভেড়ে, ডারউইন

চার্লস লিলের বই পড়ে সেখানকার অতীত ভূপ্রকৃতি জানার চেষ্টা করেন। বর্তমানকে বুঝতে চেষ্টা করেন।

জাহাজ যখন চলে, ডারউইন জাহাজের পেছনে মাছ ধরার একটি জাল বেঁধে দিতেন। তাতে যা কিছু ধরা পড়তো তুলে নিয়ে দেখতেন। খুব আশ্চর্য হতেন অজানা কিছুর দেখা পেলে আর নতুন পাওয়া জিনিসের সাথে অতীতের কোন প্রাণীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখে। ঠিক বছর খানেক বাদে বিগল দক্ষিণ আমেরিকার টেরা-ডেল-ফিউগোতে বাঁধলো। সেখানকার ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে খালি গায়ে মানুষগুলো যেভাবে বেঁচে রয়েছে, তাদের দেখে ডারউইনের মনে হলো প্রকৃতি ভুল করেনি। জাহাজটি যতই দ্বীপ থেকে দ্বীপে কূল থেকে কূলে ভিড়লো, ততই নতুন নতুন অভিজ্ঞতার চমক ডারউইনকে চমকে দিয়ে 'নতুন কোন কিছুর' সূত্রের সন্ধান দিয়ে যেতে লাগলো। গালাপাগোস দ্বীপ-গুলোতে গিয়ে সবচেয়ে অবাক হলেন তিনি। আগ্নেয়শিলার দ্বীপগুলি, তিনি ভেবেছিলেন, নির্জন জনপ্রাণীশূন্য। না, তাতো নয়। কোথাও দেখা পেলেন অতিকায় কচ্ছপের, পৃথিবীর আর কোথাও অমনটি দেখা যায় না। কোথাও দেখলেন তিন চার ফুট লম্বা অতিকায় সব গিরগিটি। কোন দ্বীপের সমুদ্রতীরে কালোপাথরের পিঠে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে কালো কালো অতিকায় গিরগিটি। সাগর থেকে দূরে ডাঙার ভেতরে লালচে বাদামী আর এক জাতের গিরগিটির দেখা পেলেন। এদের মত দেখতে গিরগিটিদের দেখা আর কোথাও তিনি পান নি।

ডারউইন পোকা মাছ শামুক গাছ সব কিছুরই একটি করে নমুনা জোগাড় করে নিলেন। পাখিও বাদ গেল না। ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে এক জাতের কীট পতঙ্গ গাছপালা কচ্ছপ আর পাখির ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখে কেউ কি অবাক না হয়ে পারে?

২রা অকটোবর, ১৮৩৬। বিগল জাহাজটি ইংলণ্ডে এসে ভিড়ল। ডারউইন যা কিছু দেখে-ছিলেন লিখে রেখেছিলেন তাঁর নোট বইয়ে। সেখানকার মাটি গাছ ফুল কীটপতঙ্গ মাছ পাখি সব কিছুরই কথা, তাদের হাবভাব, গড়ন ধরণ এসব নিয়ে লিখতে পারতেন। তিনি তা লিখলেন না। তার মাথায় এমন একটি চিন্তা ঘন হয়ে রূপ নিচ্ছিল যেটি প্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বদলে গেল মানুষের ধ্যান ধারণা—সৃষ্টি তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা এতকাল শুনে এসেছে সবাই মিথ্যা হয়ে গেল তা।

ভেবনা, ঘরে ফিরেই চার্লস তাঁর মতামত লিখতে বসে গেলেন। ক্রমবিবর্তনের ফলেই আজকে আমাদের এই রূপ—এই চিন্তা তাঁর মাথায় তখন মাত্র এসেছে। ১৮৩৭ সালের মার্চে তাঁর প্রথম বই 'দা ভয়েজ অব দা বিগল' (বিগল জাহাজের সমুদ্রযাত্রা) বইটি বেরয়। বইটি সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে গিয়ে অতীত আর বর্তমানের প্রাণী আর উদ্ভিদের মিল বা গরমিল আরো ভালো করে নজর করলেন।

মিলের মূলসূত্রটি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু বোঝাতে সাহস পাচ্ছিলেন না। তাঁর জোগাড় করা তথ্যগুলো থেকে তিনি একটি তত্ত্বে হাজির হয়েছিলেন। ছোট করে লিখে সেটি প্রকাশ করলেন ১৮৪২ সালে।

দু'বছর পর আরও একটু বড় করে তাঁর মতামত আবার প্রকাশ করলেন। ঐ কথাই ১৮৫৯

সালে, অভিব্যক্তি বা ক্রমবিবর্তনের তত্ত্ব, তাঁর অরিজিন অব স্পিসি বইটিতে প্রকাশ করে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মহলকে চমকে দিলেন। কাল্পনিক নয়, চোখে দেখে হাতে নেড়ে পরীক্ষা করে সৃষ্টিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখা প্রকাশ করলেন চার্লস রবার্ট ডারউইন।

বইটি বেরবার সঙ্গে সঙ্গে সব কখানা বিক্রী হয়ে গেল। বইটির শেষ অধ্যায়ে তিনি একটি বাক্য জুড়েছিলেন, যার মানে—মানুষের উৎপত্তি আর ইতিহাস জানায় ঐ বইখানি সাহায্য করবে। মানুষের জন্ম ইতিহাস নিয়ে তাঁর লেখা বই 'দা ডিসেনট অব ম্যান' বেরয় ১৮৭১ সালে। সেখানা পড়লে কোথা থেকে কেমন করে এলাম, একথা বুঝতে এখন আমাদের আর কোন অসুবিধা হবে না।

তোমার কি ইচ্ছে করে না প্রকৃতি-পড়ুয়া হয়ে খুঁজে বেড়াই পৃথিবীর যেখানে যত পশুপাখি গাছপালা আছে আর দেখি তাদের হাবভাব। তারপর সবার জন্য পৃথিবীটাকে আরও সুন্দর আর সুখের করে তুলি ?

আগে ও এখন

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আগে যখন ছোট ছিলাম
ঠিক বুবুনের মতো
তখন আমি রোজ কাঁদতাম
দিনে রাতে কত,
পাশের বাড়ির বুবুন যেমন
ওঙা ওঙা কাঁদে···
আগে যখন ছোট ছিলাম
ঠিক বুবুনের মতো।
চাঁদ দেখিয়ে মা আমাকে
গল্প বলতো কত,
মা ও আমি গল্পে গানে
পৌঁছে যেতাম চাঁদে।

এখন আমি বড় কিনা
কাঁদি-না আর তাই,
খাইয়ে দিতে হয়-না এখন
নিজের হাতেই খাই ;
যেমন করে বাবু হয়ে
লালটুদাদা খায়···
এখন আমি পড়তে বসি
সকাল-সন্ধ্যা হলে,
খেলার সময় খেলি গিয়ে
থাকি-না মা'র কোলে ;
বড় হলে কেউ কি আবার
কোলে উঠতে চায় !
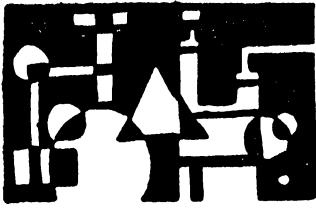
মানুষ-খেকো মাছ

মোহিত রায়

মানুষ মাছ খায়। আবার আজব দুনিয়ায় মানুষখেকো মাছও আছে। ইংরেজিতে এই ভয়ংকর হিংস্র মাংসাশী মাছের নাম Piranha characid. তবে আমাদের দেশে এই মাছ নেই। আছে আমেরিকা আর আফ্রিকার সমুদ্র অঞ্চলে। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীতে এবং ব্রেজিলের সানফ্রানসিসকো নদীতেও এই মাছ দেখা যায়।

মাছের আকার নানারকম। দুই ইঞ্চি থেকে পাঁচ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। আকারের ভেদ হলেও এরা সকলেই হিংস্র এবং মাংসাশী। গোলাকার এদের গঠন। দেহের দুপাশে আছে পাখনা মুখের দুপাশে আছে সারিসারি করাতের মতো তীক্ষ্ণ দাঁত। এদের দাঁত ক্ষুরের মতো ধারালো। জলের যে কোনো প্রাণীর দেহ থেকে সহজে মাংস কেটে খেতে পারে—এমন কি কুমীর—হাঙর—তিমির মাংসও এরা খায়। এদের রং কালো। এরা কখনও একা থাকে না। দল বেঁধে থাকে।

দলে সব সময়েই দশ থেকে পনের হাজার মাছ থাকে। এদের গতি তীব্র—রক্তের গন্ধ পেলেই তীরবেগে হাজার হাজার মাছ সেখানে ছুটে যায়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল যে এরা যে প্রাণীকেই আক্রমণ করুক না কেন—এক মিনিটেরও কম সময়ে তার দেহের সমস্ত মাংস খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলে। কল্পনা করা যায় না এদের কাণ্ড! বড় তিমি-মাছ যার ওজন একশো পাউণ্ড—তাকে খেতে এদের সময় পোনে এক মিনিটের বেশি লাগে না।

এদের হাতে প্রাণ হারায় আমেরিকার আদিবাসীরা। মাছ ধরতে জলে নামামাত্রই এদের দল এসে আক্রমণ করে নিমেষেই খেয়ে শেষ করে ফেলে। পরে কেউ এসে তার কোন চিহ্নই খুঁজে পায় না। কিন্তু কি অদ্ভুত যে আমেরিকার অধিবাসীরা এই মাছ ধরে রান্না করে খায়! এই মাছের মাংসে বেশ স্বাদ আছে। তারের জালে এই মাছ তারা ধরে। তোলার সময় সময় জাল টপকিয়ে এবং জাল কেটে অনেক মাছ বেরিয়ে যায়। কয়েকটা থাকে। তারা অনেক সময় অধিবাসীদের আঙুল কামড়ে দেয়।

এই মাছ জলের বড় ছোট মাঝারি সব রকমের মাছ খায়। তাই এই মাছ যেখানে থাকে সেখানে আর কোনো মাছ থাকে না! এছাড়া; জলজ উদ্ভিদও এই মাছের এক জাত খায়। এরা কখনও এক জায়গায় থাকে না—শিকারের খোঁজে দলবেঁধে ঘুরে বেড়ায়।

এরা ডিম পাড়ে—পাঁচদিনের ভিতরে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।

আমেরিকার মৎস্যাগারেও এদের পালন করা হয়।

বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তর

অমিতানন্দ দাশ

২৮০৪ সন্দীপ সেনগুপ্ত : আণবিক বোমার সঙ্গে আণবিক রিয়াক্টরের তফাৎ কি? আণবিক শক্তি কিভাবে কাজে লাগানো হয়?

উত্তর :—প্রথম কথা হলো যে খুঁটিয়ে দেখলে আণবিক শক্তি, পারমাণবিক বোমা, এ্যাটম বম্ব সব কথাগুলিই ভুল—বলা উচিত নিউক্লিয়ার শক্তি আর নিউক্লিয়ার বোমা।

কারণ পরমাণু বা এ্যাটম হলো যে কোনো বস্তুকে রাসায়নিকভাবে ভেঙ্গে পাওয়া ক্ষুদ্রতম কণা। বিভিন্ন ধরনের পরমাণু হয়, বোধহয় আপাততঃ ১০৫ রকমের—মানে অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে নতুন নতুন কৃত্রিমমৌলিক পদার্থ যেমন ধড়াধ্বড় আবিষ্কার হয়ে চলেছে তাতে সঠিক হিসাব রাখা একটু মুস্কিল। আর অণু তো হলো আরো বড় কণা—পরমাণুগুলি সাধারণতঃ যে ভাবে জোট বেঁধে থাকে—কার্বন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণু জুড়ে ভিনিগার হতে পারে, (ঘর ধোয়ার) ফিনাইল হতে পারে, আবার চিনিও হতে পারে। বলতে কি কয়লা পুড়িয়ে কার্বনের অণুকে কার্বন-ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত করে রাসায়নিক উপায়ে যে তাপ পাওয়া যায় তাকেই বলা যেতে পারে আণবিক শক্তি! (পরীক্ষায় তা লিখো না অবশ্য!)

মানুষ প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে আন্দাজ করে এসেছে অণু-পরমাণুর অস্তিত্বের কথা, কিন্তু একশো বছর আগেও পরমাণুর ভিতরে যে আরো কিছু থাকতে পারে তা ছিল মানুষের কল্পনার বাইরে। তবে এখন জানা গেছে যে যে কোনো পরমাণুর কেন্দ্রে আছে অতি ক্ষুদ্র কিন্তু অত্যন্ত ভারি নিউক্লিয়াস (nucleus)—যার চারদিকে চক্কর মারছে ইলেকট্রনের ঝাঁক। ভারি মৌলিক পদার্থগুলির পরমাণুর নিউক্লিয়াসও বেশী ভারি এবং তার চারদিকে ঘোরা ইলেকট্রনের সংখ্যাও বেশী। লোহার পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ওজন সবচেয়ে হালকা হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ওজনের প্রায় পঞ্চাশগুণ। লোহার চেয়ে ভারি পরমাণুগুলির নিউক্লিয়াসকে যথেষ্ট জোরে ঠিকভাবে ধাক্কা মারতে পারলে সেগুলিকে প্রায় সমান দুটি ছোট নিউক্লিয়াসে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব একে বলে ফিশন (fission) প্রণালী। নিউক্লিয়ার শক্তির প্রধান উৎস ইউরেনিয়াম-২৩৫এর নিউক্লিয়াসকে ফিশন প্রক্রিয়ায় ভাঙ্গা যায় সহজে এবং তার ফলে প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি পাওয়া যায়।

নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন কণা এবং নিউক্লিয়াসের ফিশন ঘটানো হয় সাধারণতঃ তাকে একটি নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে। একটি পদার্থ নিউক্লিয়ার জ্বালানী হিসাবে উপযোগী হতে গেলে আরো দরকার যে তার একটি নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে দুটি ছোট নিউক্লিয়াস ছাড়া আরো কয়েকটি ছুটকো নিউট্রন বেরিয়ে আসবে, যার সাহায্যে আরো কয়েকটি জ্বালানী নিউক্লিয়াসের ফিশন ঘটানো সম্ভব হবে।

এইরকম চেইন রিয়াক্‌শনের (chain reaction) ফলে কিছু পরিমাণ নিউক্লিয়ার জ্বালানীর মধ্যে অল্প কয়েকটি নিউট্রন ছেড়ে দিলেই, নিউট্রনগুলি ক্রমান্বয়ে বংশবৃদ্ধি করে এক সেকেণ্ডের এক ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই সবকটি নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে বিপুল পরিমাণে তাপ উৎপন্ন করবে। নিউক্লিয়ার 'আণবিক' বোমা এইভাবেই কাজ করে।

নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর্স কতকটা 'পোষমানা বোমার' মত। একটি ইউরেনিয়াম—২৩৫ নিউক্লিয়াসের ফিশনের ফলে গড়ে প্রায় তিনটি ছুটকো নিউট্রন বেরোয়। বোমায় এক সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশের ভিতর সব জ্বালানী নিউক্লিয়াসের ফিশন ঘটা দরকার, কিন্তু রিয়াক্টরে তা ঘটবে হয়তো এক বছর ধরে, যাতে নিউক্লিয়ার প্রক্রিয়ার উদ্ভূত তাপ হঠাৎ এক বোমার অগ্নিপিণ্ড সৃষ্টি না করে আস্তে আস্তে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগতে পারে। রিয়াক্টরে চেইন রিয়াকশনকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় বাড়তি নিউট্রন শুষে নেবার ব্যবস্থা রেখে। ঠিক সেই পরিমাণ নিউট্রন সরিয়ে ফেলা হয় যাতে একটি ফিশনে বেরিয়ে আসা নিউট্রনগুলির মধ্যে গড়ে ঠিক একটিই ফিশন ঘটাতে পারে। এর ফলে প্রতি সেকেণ্ডে যে সংখ্যায় ফিশন ঘটে তা অপরিবর্তিত থাকে এবং ক্রমান্বয়ে সমপরিমাণে তাপ নিস্কৃত হয় ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন সম্ভব হয়।

তারপর তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রণালী সব থার্মাল পাওয়ার স্টেশনেই (thermal power station) মোটামুটি একই রকম—তা সেই তাপ কয়লা থেকেই উৎপন্ন হোক কি ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াস ভেঙ্গেই পাওয়া যাক। সর্বক্ষেত্রেই তাপের সাহায্যে জল বাষ্পীভূত করে তা দিয়ে স্টিম টারবাইন (steam turbine) ঘুরিয়ে, টারবাইনের সঙ্গে জোড়া জেনারেটর (generatar) থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়। এই টারবাইন ও জেনারেটরের কিছুটা সাদৃশ্য আছে সাধারণ বৈদ্যুতিক পাখার যথাক্রমে পাখার ব্লেড ও মোটরের সঙ্গে। পাখার বৈদ্যুতিক মোটর বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে পাখার ব্লেডগুলির ঘোরার শক্তি দেয়, আর বৈদ্যুতিক মোটরেরই জাতভাই জেনারেটরের কাজ ঠিক তার উল্টো—তার সাহায্যে পাখা ঘোরার শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা সম্ভব। ধর একটা বৈদ্যুতিক পাখার মোটরের বদলে এক জেনারেটর লাগানো আছে, এখন জোর হাওয়া দিলে যদি এই পাখাটি ঘুরতে শুরু করে তবে ওই জেনারেটর থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হবে। টারবাইন ও জেনারেটরের কাজ আর ঠিক বৈদ্যুতিক পাখার কাজের উল্টো—বাষ্পের চাপে ফ্যানের জাতীয় টারবাইনটা ঘুরতে থাকে, আর একই ডাণ্ডার ওপর লাগানো জেনারেটর বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করে। অবশ্য একটি বৈদ্যুতিক পাখার ওজন যেখানে হয়তো দশ কিলো, সেখানে একটি বড়সড়ো টারবাইন জেনারেটর সেটের ওজন তার এক লক্ষগুণেরও বেশী হতে পারে।

ভারতে নিউক্লিয়ার শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজন খুব বেশী। কারণ প্রথমতঃ ভারতে খুব বেশী কয়লা পাওয়া যায় না, আবার দিল্লী-বোম্বাই অঞ্চলে তো একেবারই না ; তার উপর আবার অন্ততঃ রাশিয়া ও চীনের তুলনায় ভারতে ভালো জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করার মতো বরফগলা নদীর সংখ্যা বেশ কম। বম্বের কাছে তারাপুরে ভারতের প্রথম নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন চালু হয়েছে।

আরো দুটি তৈরী হচ্ছে রাজস্থানে কোটার কাছে আর মাদ্রাজের কাছে কালকাপ্পমে। এছাড়া নিউক্লিয়ার শক্তির আরো উন্নততর ব্যবহারের জন্য চাই গবেষণা-বিষয়ক নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর। আলকাপ্পমে এক নতুন গবেষাণাগারে তৈরী হচ্ছে আরো দুটি। দিল্লী আই. আই. টি তে নিউক্লিয়ার এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে—সেখানেও থাকবে একটি ছোটখাটো গবেষণা রিয়াক্টর।

ফিশন ছাড়া নিউক্লিয়ার শক্তির আর এক উৎস হলো ফুশন (fusion)—যে প্রক্রিয়াতে দুটি ছোট নিউক্লিয়াস খুব উঁচু তাপমাত্রায় জোড়া লেগে একটি অপেক্ষাকৃত বড় নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে এবং প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন করে। হাইড্রোজেন বোমা এইভাবেই কাজ করে, আবার সূর্য থেকে আমরা আলো, তাপ যা কিছু পাই সে সবের এইভাবেই উৎপত্তি হয়—সূর্যকেও বলা যেতে পারে একটি বিশাল ফুশন বোমার অগ্নিগোলক, আবার বোমার অগ্নিগোলক যেখানে জ্বলে থাকে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র সেখানে সূর্য জ্বলে আছে কয়েকশো কোটি বছর।

হাইড্রোজেন বোমাতে একটি ফিশন (বা 'আণবিক') বোমা ফাটিয়ে প্রায় এক কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা সৃষ্টি করে বোমার ভিতরে রাখা ভারী হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসগুলিকে ফুশন প্রক্রিয়ায় হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিবর্তন করে প্রচুর তাপশক্তি পাওয়া যায়।

সাধারণ জলের মধ্যে হাইড্রোজেন পরমাণুর কিছু অংশ ভারী হাইড্রোজেন পরমাণু, যার ওজন সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় ডবল। যদি এই ভারী হাইড্রোজেনের ফুশন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয় তবে সভ্যতার এক বিরাট অগ্রগতি হবে, কারণ তখন সমুদ্রের জল থেকে প্রায় বিনা পয়সাতেই ভারী হাইড্রোজেন জ্বালানী পাওয়া যাবে—যার যত চাই। আর কয়লা খনির দরকার পড়বে না ইউরেনিয়াম খনিরও না। তবে বাদ সাধছে ওই এক কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। পাওয়ার স্টেশনে ক্রমান্বয়ে এক কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা রেখে ফুশন ঘটানো নিঃসন্দেহে খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক এই সমস্যার সমাধান করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। আশা করা যাচ্ছে ১৯৯০ নাগাদই ফুশন প্রক্রিয়া চালিত প্রথম পাওয়ার স্টেশন চালু করা সম্ভব হবে।

ডিকি

স্মরজিৎ চৌধুরী

বয়স—৫ বছর ৪ মাস গ্রাহক সংখ্যা—২৬০৭

আমার কুকুরের নাম ডিকি। বয়স ছয়। দুধ রুটি মাংস খায়। ভীষণ রাগী। আমি সামলাই বাবাকে ভয় পায়। মাকে মানে না।

মিমি তার বাচ্চারা

সুবীর ঘোষ

বয়স—৭ বছর ৫ মাস গ্রাহক সংখ্যা—১২৯২

একদিন আমরা দেখলাম একটা রোগা কুকুর আমাদের বাড়ির সিঁড়িতে বসে আছে। মা কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন, বাবা বললেন, 'থাক। এখানে কুকুরটা মরে যেতে পারে'। পরে দেখলাম পাপড়িদিরা কুকুরটাকে খাবার দেয়।

তারপর আস্তে আস্তে কুকুরটা বড় হয়ে গেল! একদিন পাপড়িদিরা বিদেশে চলে গেল। আমরা তখন কুকুরটাকে খাবার দিতাম। তারপর কুকুরটা আমাদের পোষা হয়ে গেল। আবার পাপড়িদিরা ফিরে এল, তারপর আমরা আর পাপড়িদিরা কুকুরটাকে খাবার দিতাম। আমরা কুকুরটার নাম দিলাম মিমি, আর ওর ল্যাজের নাম সুবর্ণলতা। গতকাল কুকুরটার আটটা বাচ্ছা হয়েছে। একটা ধপধপে সাদা বাচ্ছা মরে গেছে। আমরা একটা সাদা কালো রঙের বাচ্ছা পুষবো। গতকাল পিতুদিরা না জেনে ওই বাচ্ছাগুলোর ওপর জল ফেলে দিয়েছিল, আমি তখন অঙ্ক করছিলাম। মিমি খালি কুঁই-কুঁই করছিল। আমি তখন ছুটে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি মিমি খালি কি জিনিস শুঁকছে

আর কুঁই-কুঁই করছে। প্রসুন-কাকু দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে?' উনি বললেন। 'পিতুদিরা না জেনে জল ফেলে দিয়েছে'॥ তারপর দেখলাম বাচ্ছাগুলো চুপ-চুপে ভিজে হয়ে গেছে আর মিমি খালি কুঁই-কুঁই করছে। প্রসুনকাকু আর মা বাচ্ছাগুলোকে রোদে ছেড়ে দিলেন। তারপর সন্ধেবেলা আবার বাচ্ছাগুলোকে তুলে দিলাম যেখানে ছিল। রোজ ভাবছি বাচ্ছাগুলোর চোখ ফুটবে, কিন্তু এখনও তো কই ফোটেনি। হঠাৎ একদিন দেখি বাচ্ছাগুলো একটু তাকাচ্ছে।

ধাঁধা*

মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রাহক নং ১৪০১—বয়স ৮ বৎসর ২ মাস

ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা (বিদ্যাসাগর) অনূদিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র কোন এক কাহিনী থেকে—বজ্রমুকুট নামে এক রাজপুত্রের সঙ্গে এক সরোবরের তীরে কোন এক রাজকন্যার দেখা। কিন্তু রাজপুত্রের পক্ষে রাজকন্যার নাম জিজ্ঞাসা করা সম্ভব ছিল না। রাজকন্যাও মুখে নিজের পরিচয় না দিয়ে একটি সঙ্কেতে পরিচয় দিয়েছিল। কাহিনীতে এইভাবে সঙ্কেতটি ছিল :—'রাজকুমারী শিরঃস্থিত পদ্ম হস্তে লইলেন। অনন্তর কর্ণসংযুক্ত করিয়া দন্তদ্বারা ছেদনপূর্বক পদতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন…।'

এই সঙ্কেত থেকে রাজকন্যার নাম ও পরিচয় কি করে জানা যাবে?

উদয়ন মুখোপাধ্যায়

বয়স—১১ বৎসর ২½ মাস—গ্রাহক নং—২২৩৭

(১) এমন একটি তিন অক্ষরের শব্দ বার কর—যার বাংলা এবং ইংরাজী দুটিই সোজা দিক থেকে পড়লেও যা হয়, উল্টো দিক থেকে পড়লেও তাই হয়।

(২) এমন একটি দ্বীপের নাম বল যার প্রথম অক্ষর ছাড়লে 'শেষ' বুঝায়, মাঝের অক্ষর ছাড়লে একটি 'চতুষ্পদ জন্তুর' নাম হয় এবং শেষের অক্ষর ছাড়লে 'অবসাদ জনিত বিশেষ শারীরিক প্রকাশ' বুঝায়।

"পাখির স্বপ্ন"

মধুমিতা দাস

বয়স ১১ বছর গ্রাহক সংখ্যা ২৯৭

ছোট্ট পাখি যাবে বহু দূরে,
রূপকথার ঐ স্বর্ণপাহাড় চূড়ে।
নয়বা সুদূর দেশে রাজপুত্তুর বেশে
স্বপ্নমাখা কোন্ সে অচিন পুরে॥

সেথায় আছে ফুলপরী আর জলপরীদের মেলা,
তাদের সাথে মনের সুখে করবে অনেক খেলা।
সবুজ নরম ঘাসে মুক্তো শিশির হাসে,
রঙবেরঙের ফুলের মাঝে কাটবে সারা বেলা॥

---

* হাতপাকাবার আসরের শেষ পৃষ্ঠা দেখ।

মজার ব্যাপার

মিলিন্দ চক্রবর্তী
বয়স ৬ বৎসর ১১ মাস
গ্রাহক নং ২০৬৬

কলেজের হচ্ছে যে স্পোর্টস্,
দেখছি বসে বাবার পাশে,
হঠাৎ একটা পাগলী দেখি
আমার দিকে দৌড়ে আসে।
বললে এসে হাতটি ধরে,
'এই তো আমার ছেলে,
এমন ভাবে কে গিয়েছে
এইখানেতে ফেলে।'

আমি তখন বাবাকে ধরি
বেজায় ভয় পেয়ে।
পরে শুনি পাগলী নয় সে,
ঐ কলেজের মেয়ে
ছদ্মবেশের খেলাতে সে
পাগলী সেজেছে,
শেষে দেখি ফার্স্ট প্রাইজটা
সেইই পেয়েছে !!

প্রজাপতি

শৃণ্বন্তী পাল
গ্রাহক নং—১৬৫৫ বয়স—১০

প্রজাপতি উড়ে চলে কতদূর কতদূর
বাতাস বইছে আজ ফুরফুর, ফুরফুর।
গায়ে সে মেখেছে আজ মিঠে সোনা রোদ্দুর
ডানায় ডানায় তার ফুর্তিটা ভরপুর।
প্রজাপতি উড়ে চলে কতদূর কতদূর ॥
প্রজাপতি মেলে দিয়ে চঞ্চল পাখ্‌না
ওড়ে প্রান্তর জুড়ে চেয়ে চেয়ে দ্যাখ্‌না,
সবুজ মাঠের মাঝে দেখতে কি অদ্ভুত,
এল পৃথিবীর বুকে বুঝি কোনো নবদূত

ছয় ঋতুর ছড়া

উত্তমকুমার বটব্যাল
গ্রাহক নং—১৪৮১
বয়স ১২ বছর

গ্রীষ্মেতে চারিদিক রোদ্দর ধুধু,
বর্ষায় শুরু হয় রিমিঝিমি শুধু।
শরতে প্রকৃতি আনে শ্যামলডালি।
হেমন্ত শিশিরকণা প্রাতে দেয় ঢালি
শীতকালে কাঁপে সবে শীতের ভয়ে,
বসন্তে বনরাজি ভরে কিশলয়ে।

'রাতের রেলগাড়ী'

অনিতা চট্টোপাধ্যায়

বয়স—১৩, গ্রাহক নং—২৫৭৮

ট্রেন চলে ঝম্‌ঝম্‌, রাত্রি গভীর।
ছুঁয়ে যায় মাঠ, বন, গ্রাম, নদীতীর।
উপরে আকাশ তার কালো কালিমাখা,
তারি কোণে নিশাচর পাখি মেলে পাখা।
শন্‌ শন্‌ রব ওঠে তালের পাতায়—
চাঁদের মলিন মুখ বনের মাথায়।
ট্রেন চলে একলাই, শোনো দিয়ে মন—
ঝন্‌ঝন্‌ ধ্বনি ওই তারি ক্রন্দন।
লাইনের শৃঙ্খল বাঁধা তার পায়,
পথে পথে ঘুরে সেই ব্যথা বয়ে যায়।
জীবনটা বাঁধা তার লাইনের পথে।
ক্লান্ত চরণ, তবু চলে কোনোমতে।
ঝন্‌ঝন্‌ ডাক ছেড়ে ছোটে রেলগাড়ি—
আরো বহুদূর তাকে—দিতে হবে পাড়ি

ছড়া

শুভব্রত মুখোপাধ্যায়

গ্রাহক সংখ্যা—২৩০৪ বয়স—৯ বছর ৪ মাস

ঝুপঝাপ ঝুপঝাপ জল পড়ে জোরে,
বনবন বনবন রথচাকা ঘোরে।
টিকটিক টিকটিক ঘড়ি চলে ডেকে,
ভোঁ পিপ পিপ মোড়ে গাড়ি যায় হেঁকে।
ঘটাং ঘটাং ঘট ট্রেন ছুটে চলে,
কলকল ছলছল নদী কথা বলে।
ডানা ঝটপট করে পাখি যায় উড়ে,
'গুড়ুম' বোমা ফাটে, যায় সব পুড়ে॥

রবি ঠাকুর

হেদায়তুল্লা

গ্রাহক নং—২৫৬৩ বয়স—১৩ বছর

রবি ঠাকুর, রবি ঠাকুর
কোথায় তোমার ছবি,
অন্ধকারে হারিয়ে গেছি
কোথায় মোদের রবি!
দিনের আলো যুগের আলো
সর্বকালে তাই,
এমনিদিনে আমরা সবে
তোমার যশ গাই।
যুঁই-চামেলি পড়লো খসে
লক্ষ ফুলের হাসি,
চাঁদামামা বলছে হেসে
তোমায় ভালবাসি।
রবি ঠাকুর রবি ঠাকুর
কোন আলোকে ছিলে
ক্ষণেক এলে, ক্ষণেক গেলে
লক্ষ হাসি দিলে।
হৃদয়মাঝে আছ তুমি
আছ শিশু মনে,
তোমার গলায় মালা দিতে
ফুল ফুটেছে বনে।

গাজন

লিপি ঘোষ

গ্রাহক নং—২৩০০ বয়স—১১

বাজনা বাজে শিবতলাতে নাক কুড়া-কুরকুর
গাজন এল বাংলা দেশে তাইতো এত সুর।
সন্ন্যেসীরা পথে পথে গাইছে শিবের গান
উপোস করে ঘুরছে পথে জল না করে পান।
একটি দুটি পয়সা পেয়ে ভরছে আপন থলি।
শিবের নামে করে গান পথে পথে চলি।

চড়ক মেলা

শুভ্রা বিশ্বাস

গ্রাহক নং—২০২৯ বয়স—১৪ বছর

চৈত্রমাসে চড়ক মেলা চড়াক্ চড়াক্ চড়াক্
নবাব দিঘীর ওপারেতে বাজছে মাদল ঢাক,
কতই খেলা সারাবেলা চলছে ছুটোছুটি,
সোনা, বাবুল, বুকান, তপুর আজই স্কুল ছুটি
আজকে তাই বাধা মানে না মায়ের শাসন ধমক
পরাণে ভাই লেগেছে ওদের চড়ক মেলার চমক।

গরম দিনে

স্নিগ্ধা বিশ্বাস

গ্রাহক নং—২০২৯ বয়স—৮

চৈত্রমাসে আঃ কি গরম
ঘরের ভিতর বন্ধ দম!
তবুও পড়া হয় না শেষ
আমার অতি প্রিয় সন্দেশ।

সাইকেল

সঙ্ঘমিত্রা দে চৌধুরী

গ্রাহক সংখ্যা—৭৬৭ বয়স—৯½

ক্রিং ক্রিং বাজে বেল,
ওই চলে সাইকেল।
হ্যাণ্ডেল হাতে ধরি
রায়বাবুদের হরি।
চাকা ঘোরে বন্‌বন্,
গাড়ি চলে সন্‌সন্।
ওরে ভুলো যারে সরে
চাপা পড়লে যাবি মরে।

খাপছাড়া

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়স—১২½ বৎসর গ্রাহক সংখ্যা—১৬১৯

নির্জন সমুদ্রতীর—চারিধারে বালু
দাঁড়িয়ে কে যেন একা খাচ্ছে সেদ্ধ আলু!
ফুলের সাথে মৌমাছিদের আড়ি কি হয় কভু?
ত্রৈরাশিক অঙ্কটা মোর মিলছে না তো তবু!
ঘাসের পরে শিশিরবিন্দু মুক্তাসম ঝলমলে,
ফুচকা-আলুকাবলি খেতে সদাই আমার মন বলে!
তারার দলের মাঝে বসে চাঁদেরই দরবার,
পা পিছলে ঠ্যাং ভাঙ্গে—কি বিশ্রী ব্যাপার!
নীল আকাশের মাঝে পাখি কেমন পাখা মেলে—
সাপের পেটে ব্যাঙ ডেকেছে—কেষ্টা সেদিন বলে
মেঘের খেলা দেখে দেখে মন হল উদাসী,
বলতো ভাই কেমন লাগে শুনতে ঘোড়ার হাসি!
কোথায় বল সোনার হরিণ বেড়ায়ে হেথা-হোথা
রাম ছাগলে করলে তাড়া পালাই বল কোথা!
ভোরের পাখির সুরের মোহে সূর্য কি দেয় দেখা
একটু বরং নিই ঘুমিয়ে থাক্ কবিতা লেখা!

সব থেকে ভাল

তানিয়া দাশ

বয়স—১০ বৎসর ১১ মাস গ্রাহক নং—১৯২৩

সন্দেশ খেতে ভাল আর ভাল দই,
এ সবের থেকে ভাল। 'সন্দেশ' বই
প্রতি পাতা গল্পে ও ছবিতে ভরা,
শিশুমন সেইখানে দেয় যে ধরা
জানবার কথা আর ছড়া যে প্রচুর,
হাসি ও আনন্দেতে মন ভরপুর।
প্রতি মাসে একখানি 'সন্দেশ' চাই
'সম্পাদক সন্দেশ' প্রণাম জানাই।

আবু-বেন্-আদেম

অলকনন্দা চট্টোপাধ্যায়

বয়স—১৩ বৎসর ৯ মাস গ্রাহিকা সংখ্যা—১৪৫৮

আবু-বেন্ আদেম (তাঁর বংশ বিশাল হোক)
একদা রাত্রে তন্দ্রা হইতে মেলিলেন দুই চোখ।
ঘরভরা সেই চাঁদের আলোয় দেখিলেন তিনি চাহিয়া,
দেবদূত এক স্বর্ণপুঁথিতে চলেছেন কিছু লিখিয়া।
জিজ্ঞাসিলেন আবু তাঁরে, 'প্রভু, কহ মোরে দয়া করে,
স্বর্ণপুঁথিতে কি লিখিছ তুমি শ্রবণ করাও মোরে।'
দেবদূত ধীরে তুলিয়া মস্তক কহেন গভীর স্বরে,
'লিখি তাঁহাদের নাম যাঁদের প্রীতি আছে ঈশ্বরে।'
আবু শুধালেন, 'ভগবন্, মোর নাম কি হোথায় আছে?'
দূত কহিলেন, 'না বৎস, তব নাম আসেনি আমার কাছে।'
বলিলেন আবু নামাইয়া স্বর, 'এই কথা লেখ তবে,
ভালোবাসি আমার মানুষ ভাইদের যত আছে ভবে।'
নাম লিখে নিয়ে দেবদূত ফিরে গেলেন নিজ কাজে।
পর রাত্রিতে তাঁহার মুরতি আবুর ঘরেতে রাজে।
দূতের তালিকা দেখিয়া সবার বিস্ময় মানিতে হয়;
'ভগবানের প্রিয়' হিসাবে আদেম সবার উপরে রয়।**

Leigh Hunt রচিত—'ABOU-BEN-ADHEM' কবিতার অনুবাদ।

স্বপনের দেশে

জয়ন্তী রায় চৌধুরী

বয়স—৯ বছর ৩ মাস গ্রাহক নং—১৩৬৫

জান সেদিন আমার ঘরে
মধু বাতাসে ভর করে
ঢুকল ছোট্ট এক পরী—
গায়ে চাঁপার সুগন্ধ
তার মনে কি আনন্দ
পরনেতে দেখি রাঙা শাড়ী—
সেতো থাকে বুঝি আকাশেতে
তার চাঁপাফুলী ওড়নাতে
আকাশের তারা বুঝি জ্বলে—
ওই আকাশের চাঁদ বুঝি
আজ ঘোরে শুধু পথ খুঁজি
মেঘের মতন তার চুলে
একি ভোর হয়ে এল যেই
দেখি রাঙা পরী আর নেই
জোনাকী হয়ে সে উড়ে যায়—
আমি কোনখানে নাহি জানি
উড়ে চলে জোনাকীর রাণী
কোথা নীল গগনের গায়- -।

শমীন্দ্র পাঠাগার

নন্দিতা সেনগুপ্ত বয়স ১২, গ্রাহক নং ২০৭১

শান্তিনিকেতনে আমাদের পাঠভবনের একটি পাঠাগার আছে, তার নাম শমীন্দ্র পাঠাগার, ওখানে দেশবিদেশের নানারকম সুন্দর সুন্দর বই আছে। আমাদের যখন ছুটি থাকে তখন আমরা ওই পাঠাগারে পড়তে যাই।

কয়েক বছর আগে এই পাঠাগারটি হয়েছে, আমি প্রথমে বুঝতেই পারিনি যে এটি একটি পাঠাগার, দেখতাম অনেকে ওখানে ঢুকে কি যেন করে, আমি রোজই ভাবতাম ওখানে ঢুকবো। কিন্তু ঢোকা আর হত না, খুব ভয় করত।

একদিন সাহস করে ঢুকলাম, ঢুকেই মন আনন্দে ভরে উঠল, দেখি তাকে তাকে বই সাজানো। তখনই আমি গল্পের বই পড়তে আরম্ভ করে দিলাম। তারপর থেকে যখনই ছুটি পাই তখনই বই পড়ি।।.

একদিন লক্ষ্য করলাম দুটি বিরাট বিরাট আলমারি। একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এই দুটি আলমারির মধ্যে একটি আলমারি বৌঠান (প্রতিমাদেবী) এই পাঠাগারকে উপহার দিয়েছেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গুরুদেবের ছোটছেলে শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বারো বছর বয়সে মুঙ্গেরে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান, তাঁরই স্মৃতিতে এই পাঠাগারটির নাম 'শমীন্দ্র পাঠাগার হয়েছে। এই পাঠাগারটি আমাদের কাছে, বিশেষ করে আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় স্থান।

আমার চাঁদ যাত্রা

নূপুর ভট্টাচার্য

বয়স ৯ বছর· গ্রাহক সংখ্যা ১৮৫১

আমেরিকার তিনজন আকাশচারী নাকি চাঁদের উদ্দেশ্যে অভিযান করেছে। চারি দিকে হৈ হৈ পড়ে গেছে। আমি কেবল শুনছি আর অবাক হয়ে ভাবছি যে কি করে এসব সম্ভব, মা বললেন আজ রাত্রিতেই নাকি আমেরিকার আকাশচারীরা চাঁদে অবতরণ করবেন, মা বাবারা সারারাত ধরে রেডিওতে কমেনটারি শুনতে লাগলেন।

আমি রূপকথার চাঁদের কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমি চেয়ে দেখি যে কে আমার খাটটা বাইরে টেনে এনেছে। চোখ রগড়ে ভাল করে চেয়ে দেখি যে আমার সামনেই একটা বিরাট বড় রথ তাতে একটা মানুষ চড়তে পারে। আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছিল যে আমি রথটায় চড়ি, হঠাৎ পায়ের শব্দে চমকে উঠে দেখি একটি পরী, তার হাতে সোনার দণ্ড, সে আমায় দণ্ড দিয়ে ইঙ্গিত করলে রথে চড়তে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত রথে চড়লাম, পরীটিও আমার সঙ্গে রথে চড়ল।

রথটা খুব জোরে উপরে উঠতে লাগল। তারায় ছাওয়া আকাশ ক্রমে আমার কাছে আসতে লাগল। মনে হচ্ছিল আমি যেন হাত দিয়ে তারাগুলি ধরতে পারি, কিন্তু তা পারছিলাম না।

চারিদিকে কি অপরূপ দৃশ্য তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কিছু পরে রথটা চাঁদে এসে পৌঁছল, পরী আমাকে অদ্ভুত রকম পোষাক পরিয়ে দিয়ে নিচে নামতে বললে, আমি নিচে নামলাম। চারি দিকে কেমন ছায়া ছায়া অন্ধকার কোথায় পা ফেলছি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে বিরাট গর্ত, আমি নিচু হয়ে চাঁদের পাথর কুড়িয়ে নিলাম। তার রঙটা অনেকটা কাঠকয়লার মতো। হঠাৎ আমি কি ভেবে উপরের দিকে তাকালাম কোথায় বা পরী কোথায় বা রথ, কিছুই দেখতে পেলাম না, ভয়ে আমি কাঁপতে লাগলাম।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি সকাল হয়েছে।

মা বললেন যে পৃথিবীর মানুষ চাঁদে নেমে গেছে, আমি অবাক হয়ে আমার স্বপ্নের কথা ভাবতে লাগলাম।

বিচিত্র রাত

অম্লান ভট্টাচার্য—বয়স ১০, গ্রা: নং ২১৭০

রাত বারোটাও হতে পারে, ঘুমোচ্ছিলাম প্রাণ ভরে। কিন্তু, কড়ানাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। এত রাতে আবার বিরক্ত করে কে! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেহে তুমি এত রাতে বিরক্ত করছ।'

বাইরে থেকে উত্তর এল 'আমি চোর দরজা খোল।' আমি অবাক হলাম। কোন চোর বাড়ির মালিককে এভাবে ডাকে কিনা তা আমার জানা নেই। আমি প্রশ্ন করলাম 'কি করতে এসেছ?' এবার বাইরে থেকে রাগান্বিত গলা শোনা গেল। 'কেনরে মুখ্যু, রাতদুপুরে চোর কি ঘাস খেতে আসবে, দরজা খোল' আমি ভাবলাম একী আপদ!

তবুও বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে দিতেই—আমি ভীষণ আশ্চর্য হলাম, আর কেই বা আশ্চর্য বোধ না করবে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পাঞ্জাবীধুতি পরা এক ভদ্রলোক। তাঁর সারা শরীর থেকে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে। আমি ধন্য হলাম এমন চোরের দর্শন পেয়ে। চোর মহারাজ আমার পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

তারপর আমার নতুন কেনা ইজি চেয়ারটার ওপর শুয়ে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'টাকার থলি-টলি নিয়ে এস', আমার চোখ কপালে উঠে গেছে। একটু দেরী হতেই অবোর হুংকার ছাড়লেন, শিগগির নিয়ে এস নাহলে—

কিন্তু কিন্তু করে টাকার থলি আনতে হল। নাহলে তিনি কি করবেন, কে জানে? ড্রেসিং টেবিলটা নিয়ে এস, আবার হুংকার ছাড়লেন তিনি। আর দেখ আয়নাটাও আনতে ভুলো না। সব টানাটানি করে নিয়ে আসার পর তিনি হুকুম করলেন, একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে আয়। খালি পায় যেতে হল। কারণ, জুতোটাও তিনি দখল করেছেন। ১০ মিনিট পরে গালাগালিসহ রিক্সাওলা আর রিক্সাকে নিয়ে এলাম। ঘরে ঢুকে দেখি তিনি ধূমপান করছেন, তামাকের সুবাসে আমার ঘর ভরপুর। আমাকে তিনি উঠে বললেন, জিনিসপত্র সব নিয়ে আয় বলে তিনি রিক্সায় চেপে বসলেন। আমাকে ঘাড়ে করে সব কিছু রিক্সায় তুলে দিতে হল। বাড়িতে ঢোকার সময় শুনলাম, চোর মহারাজ বলছেন রিক্সাওলাকে, ফিরে এসে এর কাছ থেকে রিক্সার ভাড়াটা নিয়ে নিও বুঝলে?

হারান বন্ধু

সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়

বয়স ১০ বছর গ্রাহক নং ২৭৭০

আমার বাড়ির সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড নিমগাছ আছে। ঐ গাছে বাসা করে থাকত দুটি শালিক পাখি আর তাদের দুটি বাচ্চা। তাদের কিচির মিচির শব্দ শুনলে আমার মনে আনন্দ ভরে উঠত। ইচ্ছা হত ছোট্ট পরিবারের সঙ্গে আমিও তাদের একজন বন্ধু হয়ে খেলা করি। খুব ভাল লাগত তাদের।

আমি আর আমার ভাই প্রতিদিন খোলা জানালার ধারে বসে একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম আর বেশ আনন্দ পেতাম। যত দিন যায় পাখিগুলিকে আমি ততোই ভালোবেসে ফেললাম। দিনে অন্তত একবার না দেখলে মন খারাপ হয়ে যেত। আমায় ছোট ভাই ওদের বন্ধু বলে ডাকত।

ইস্কুলে যাবার সময় এবং ফিরে এসে তাদের একবার দেখতেই হত। যত দেখতাম ততই ভাল লাগত।

তারপর একদিন বাবা আমাদের নিয়ে একটা স্কুলে ভর্তি করে দিলেন! সেখানে গিয়ে আমি অনেক বন্ধু পেলাম বটে কিন্তু মনটা ঐ শালিক পাখির কাছেই পড়ে থাকত। ক্লাসে আসার আগে একবার তাদের দেখে আসতাম কিন্তু বাড়ি ফিরে সন্ধ্যার সময় আর তাদের দেখতে পেতাম না।

এইভাবে দিনকয়েক কাটার পর গত কয়েকদিন ভীষণ বৃষ্টি পড়ে সব গোলমাল হয়ে গেল। রাস্তাঘাট জলে ডুবে গেল। বাড়ির দরজা বন্ধ থাকত পাখিগুলোর জন্য আমাদের মন বড় খারাপ হয়ে গেল। কেবলি মনে হত তারা কি করছে কোথায় আছে।

চুপি চুপি জানলা খুলে দেখতে চেষ্টা করলে মা বকে উঠতেন। বৃষ্টি থামতেই ছোট ভাই বলল 'চল্ দাদাভাই পাখিদের দেখে আসি।'

সেখানে গিয়ে দেখি বাচ্চা দুটি মাটিতে পড়ে আছে। তাদের মা, বাবা পাশেই ছটফট করছে আর কিচ্‌মিচ্ করছে কিন্তু এই কিচ্‌মিচ্ শব্দের মধ্যে আছে তাদের কাতর আর্তনাদ।

ছুটে গিয়ে দাঁড়াতেই বাচ্চাদের মা বাবা একবার আমাদের পায়ের ওপর পড়ে ঠোকরাতে লাগল, আর একবার বাচ্চাদের কাছে ফিরে যেতে লাগল। এইভাবে তারা তাদের বাচ্চা দুটিকে বাসায় ফিরিয়ে দেবার জন্য আমাদের জানাল।

আমাদের মনে বড় দুঃখ হল। চিন্তা করতে লাগলাম কেমন করে আমরা নিমগাছে উঠব, আমরা তো ছোট।

এই দৃশ্য দেখতে অনেক লোক জড় হয়েছিল। তার মধ্যে একটি বড় ছেলে একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে বাচ্চা দুটিকে নিম গাছের বাসায় রেখে এল। মা ও বাবা তাদের কাছে ফিরে গেল। কিন্তু পরের দিন গিয়ে দেখি তারা আর সেখানে নেই। নিমগাছ ফাঁকা।

মনে হলো যেন আমাদের মতো নিম গাছেরও খুব কষ্ট হচ্ছে।

ধাঁধার উত্তর

মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়

রাজকুমারী পদ্মপুষ্প মস্তক হইতে নামাইয়া কর্ণে সংযুক্ত করিয়াছিল—ইহার অর্থ 'আমি কর্ণাট-নগর-নিবাসী।' দন্ত দ্বারা ছেদন করা—ইহার অর্থ 'আমি দন্তবাট রাজার কন্যা।' পদ্ম পদতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন—ইহার অর্থ 'আমার নাম পদ্মাবতী।'

উদয়ন মুখোপাধ্যায়

(১) নয়ন—eye

(২) হাইতি

ফাল্গুন মাসের ধাঁধার উত্তর :

(১)

বাৎসরিক পরীক্ষায় ২০০র মধ্যে ওরা নম্বর পেয়েছিল :—শীলা—১৪৪, নীলা ও লীলা প্রত্যেকে ১২১ আর ইলা ১১৪। মিলিয়ে দেখ, সব কয়টি সর্তই রক্ষা হয়েছে।

(২)

গড়গড়ি মশাইয়ের মোট লোকসান হয়েছিল ৫০০৲ টাকা। প্রথম গাড়িটা ৬০০০৲ টাকায় বিক্রি করে যখন ২০% লাভ হয়েছিল, সেটা কেনা হয়েছিল নিশ্চয় ৫০০০৲ টাকায়। দ্বিতীয় গাড়িতে। ৬০০০৲ টাকা বিক্রয়মুল্যে ২০% লোকসান হল মানে সেটার ক্রয়মুল্য ছিল ৭৫০০৲ টাকা। সুতরাং মোট ১২৫০০৲ টাকার দুটো গাড়ি কিনে গোবর গণেশ গড়গড়ি বিক্রি করলেন ১২,০০০৲ টাকায়। লোকসান হল মোট ক্রয়মুল্যের ৪%। গোবর গণেশ আর কাকে বলে !!

(৩)

মজার **সন্দেশ** শোন হে **সন্দেশ** ভাই,
ভোজ রাজে রোজ **ভোজ** খাওয়ায় সবাই !
আহারে বসিয়া সুখ **আহারে** কি তাঁর,
সারা **মাস** মাছ-**মাস** পোলাও আহার !
ঘীয়ে **চপ** চপ ফ্রাই, **চপ**, কাটলেট।
ভেটকি, ইলিশ, চিংড়ি আসে রোজ **ভেট**।
সর্ষে **বাটা**য় রাঁধা **বাটা** মাছ ঝাল।
রসাল রাবড়ি-মাখা পক্ক **রসাল**।
মন-মন ক্ষীর, দৈ যত চায় **মন**।
না মানে **বারণ** যেন মত্ত **বারণ**।

(সমস্ত সর্ত রক্ষা করে এবং ছন্দ-মিল ঠিক রেখে যারা অন্য শব্দ বসিয়েছে, তাদেরও নম্বর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সর্ত-রক্ষা না হলে ঠিক ধরা হয় নি। অনেকে ভুলে গেছ যে একই শব্দ একই অর্থে দুবার ব্যবহার করা চলবে না।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য

(১) পৌষমাসের প্রথম ধাঁধার উত্তরে একটু ছাপার ভুল ছিল, "'হ'-এর জায়গায় 'ক' আর 'র'-এর জায়গায় 'ল' বসেছিল" হবে।

(২) মাঘ মাসের দ্বিতীয় ধাঁধার উত্তরেও একটু ভুল আছে, দ্বিতীয় বাক্যের প্রথম শব্দটি হবে 'সংবাদ' ('খবর' নয়)। অবশ্য সংবাদের প্রতিশব্দ খবর, কাজেই কেউ খবর লিখলে সেটাও সম্পূর্ণ ভুল নয়।

এই সব ছাপার ভুলের জন্য অবশ্য তোমাদের নম্বর কাটা যায় না, কারণ, ছাপানো উত্তর দেখে ত আর নম্বর দেওয়া হয় না। দেওয়া হয় মূল পাণ্ডুলিপি থেকে।

তবে মাঝে মাঝে তোমরা অন্যমনস্ক হয়ে ভুল লিখে ফেল, যা ভাব তা লেখ না, তখন নম্বর কাটা যায়। তাছাড়া নাম লিখতে ভুলে গেলে, কিম্বা ডাকে উত্তর হারালে ত কথাই নেই!

কি করব বল? এ সবের উপরে তো আমাদের হাত নেই!

মাঘ মাসের ধাঁধার উত্তর-দাতাদের নাম

যাদের সব কয়টি উত্তর ঠিক :—

৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ৬১৬ ভারতী মিত্র, ১০৮৬ রণেন নাগ ও সোমনাথ দাশগুপ্ত, ১২৩৪ অনিন্দিতা সরকার, ১২৯৮ রুদ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার, ১৬৯৩ শ্যামল কুমার পাইন, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২২১৫ শুভা মজুমদার, ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায়, ২৩৫৫ সুচরিতা রায়, ২৪৬৭ মহাশ্বেতা ও অমিতবিক্রম ঘোষ, ২৭১৩ সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত।

দুটো ঠিক ও একটা প্রায় ঠিক :—

৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ১৩২০ বিজলী ঘোষ, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৬১৯ অঞ্জন ও অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬৫৫ শৃন্বন্তী পাল, ১৮৯৪ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ২০২৯ শুভ্রা বিশ্বাস, ২০৯৩ দেবাশিস দত্ত, ২১৫২ সুরজিৎ, অনুপা ও শিপ্রা কর পুরকায়স্থ, ২১৫৯ স্বাহা ও শুভঙ্কর বাগচী, ২৩৮২ দীপালী, অনামিকা ও বিদ্যুৎ সাহা, ২৫৪৭ প্রসেনজিৎ মৈত্রেয়ী বসু, ২৬২৯ চিত্রাঙ্গদা ও চৈতালী বসু, ২৬৭৬ শুদ্ধেন্দু ও দীপ্তি গঙ্গোপাধ্যায়, ২৭৬৩ সব্যসাচী ও শর্মিলা বসু।

একটা ঠিক ও দুটো প্রায় ঠিক :—

১১৫ অর্পিতা, কিশলয় ও কিশোর চক্রবর্তী, ১৭৫ অনিতা রায়, ৮৮৯ প্রেমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১৮৬৩ সোনালী লাহিড়ী, ২১৪২ স্বর্ণাভ ব্যানার্জি, ২২৩৯ অনীতা চট্টোপাধ্যায়, ২৩০৪ শুভব্রত মুখোপাধ্যায়, ২৪৪১ দেবোপম চক্রবর্তী, ২৫৪৪ সান্ত্বনা রায় চৌধুরী, ২৫৫৪ দেবাশিস ভট্টাচার্য।

দুটো উত্তর ঠিক :—

১০৪ উজ্জয়িনী, সুচরিতা, নবীনতা, সঞ্জয়, পার্থ ও শ্রাবণী ভট্টাচার্য, ২০৬৮ সুদীপ মৌলিক, ২৬৫৩ অসিত নাথ ভট্টাচার্য, ২৯৬৩ মৌসুমী ও শ্রাবণী গিরি।

একটি ঠিক ও একটি প্রায় ঠিক ঃ—

২২৬ জয়ন্ত ও প্রবালকুমার নন্দী রায়, ৪৪৮ অঞ্জনা, নূপুর ও মিলন কুমার বিদ্যান্ত, ৬১৪ দেবাশীষ ও স্নেহাশীষ হালদার, ৮৯৪ তপন ঘোষ, ১৩৩৬ অরূপ শঙ্কর চৌধুরী, ১৪২৫ মিত্রা রায় চৌধুরী, ২৫৪৮ সুদীপ্ত চক্রবর্তী, ২৫৯১ প্রবীর রায় চৌধুরী, ২৭৪০ সোনালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭৬৪ প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একটি উত্তর ঠিক ঃ—

১৪৮১ উত্তম কুমার বটব্যাল, ১৬০৩ নিশীথরঞ্জন, নীতীশরঞ্জন, সমীর ও মিতালী গুহ, ১৭৮০ সুপ্রতীক সনাতনী, ২৩৯৬ চিন্ময় ভট্টাচার্য।

ফাল্গুন-মাসের ধাঁধার উত্তর দাতাদের নাম।

সব কয়টি ঠিক ঃ—

১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ২৫৪ জয়শ্রী রায়, ২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ৩৯৩ নন্দিতা, বন্দনা দেবাশীষ ও জ্যোতির্ময় বরাট, ৮৩৮ সুপ্রতীক বাগচী, ৯৩৮ আলোকময় দত্ত, ১৪৪৪ পূরবী গুপ্ত, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৮৯৪ মুঞ্জিতা কাঞ্জিলাল, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২০৭২ মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১৮৮ মহুয়া সেনগুপ্ত, ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায়, ২৪৬৭ মহাশ্বেতা ও অমিত বিক্রম ঘোষ, ২৫৪৪ সান্ত্বনা রায়চৌধুরী, ২৫৫৭ বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়, ২৬১২ চৈতালী সান্যাল, ২৬২৯ চৈতালী বসু, ২৭১৩ সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭৬৩ শর্মিলা ও সব্যসাচী বসু, ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত, ২৮৬৩ ঝিনুক চৌধুরী, ২৯৪৭ শ্রাবণা গুহ, একজন নাম নম্বর হীন।

দুটো উত্তর ঠিক ও একটি প্রায় ঠিক ঃ—

১ দীপংকর বসু, ১১৫ অর্পিতা, কিশলয় ও কিশোর চক্রবর্তী, ১৭৫ অনিতা রায়, ৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ৮৯৪ তপন ঘোষ, ৯৮৩ ঈশানী ও ইন্দ্রাণী মজুমদার, ১৩১০ আশীষ রহমান, ১৪১৮ শেখর নাহার, ১৪২৫ মিত্রা রায়চৌধুরী, ১৪৮১ উত্তমকুমার বটব্যাল, ১৬৭২ শুভ্রাশিস গুহ, ১৮২৭ অণুতোষ ও অশোক চট্টোপাধ্যায়, ২০২৯ শুভ্রা বিশ্বাস, ২১৫২ সুরজিৎ, অনুপ ও শিপ্রা পুরকায়স্থ, ২১৫৯ স্বাহা ও শুভঙ্কর বাগচী, ২২১৫ শুভা মজুমদার, ২৫৪৭ প্রসেনজিৎ ও মৈত্রেয়ী বসু, ২৫৬৩ হেদায়েতুল্লাহ, ২৫৬৫ সুপ্রিয় ও সুমিতা ঘোষ, ২৫৯১ প্রবীর কুমার রায়চৌধুরী, ২৬৫৩ অসিতনাথ ভট্টাচার্য্য, ২৭০৯ শঙ্কর ঘোষ, ২৭৪২ সুপ্রভাত ও সুমিতা মৈত্র, ২৯৪০ রাণী বিনোদ মঞ্জরী রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের নবমশ্রেণীর ছাত্রীবৃন্দ।

দুটো উত্তর ঠিক ঃ—

৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ৭১ সেঁজুতি ও শিবশংকর চক্রবর্তী, ৩৭৯ অঞ্জনা সেন ও প্রজ্ঞা পারমিতা বসু, ৪৪৮ অঞ্জনা, নূপুর ও মিলন বিভ্রান্ত, ৭৯৩ শম্পা রায়, ৮৩৫ সৌমিল ও সুমিতা রায়, ৮৯০ কারুবাকী দত্ত, ৮৯৮ হিমাদ্রি ও দোলনচাঁপা চৌধুরী, ১৬৫৫ শৃণ্বন্তী পাল, ১৮০৫ দেবাশীষ রক্ষিত, ১৯০০ দীপঙ্কর চক্রবর্তী, ২৩০৪ শুভব্রত মুখোপাধ্যায়, ২৩৯৩ মোহম্মদ আমিরুদ্দীন চৌধুরী, ২৫৪৫ বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত ২৫৫৪ দেবাশীষ ভট্টাচার্য, ২৫৫৮ কুণাল চট্টোপাধ্যায়, ২৮৪৭ শর্মিলা রায়চৌধুরী, ২৮৭২ শ্রীকান্ত নন্দী, ২৯৬৩ মৌসুমী ও শ্রাবণী গিরি একজন নাম নম্বরহীন।

একটা ঠিক ও একটা প্রায় ঠিক ঃ—

৫৭৬ মনিদীপা চৌধুরী, ৮৮৯ প্রেমেন্দ্রনাথ ভটাচার্য, ১২৯৮ রুদ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার, ১৪০১ মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়, ১৬০৩ নিশীথরঞ্জন, নীতীশরঙ্গন, সমীর ও মিতালী গুহ, ১৭৮০ সুপ্রতীক সনাতনী, ১৮৬৩ সোনালী লাহিড়ী, ২২৩৯ অনীতা ও প্রণব চট্টোপাধ্যায়, ২৩৬১ অঞ্জন ভট্টাচার্য, ২৩৯৬ চিন্ময় ভট্টাচার্য, ২৩৯৬ চিন্ময় ভট্টাচার্য, ২৬৭৬ শুদ্ধেন্দু ও সৌম্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়।

একটি উত্তর ঠিক ঃ—

২০৮৭ জয়শ্রী, স্বাগতা ও অরূপকুমার তরাত, ২৩৩২ দেবাশীষ মৈত্র, ২৬৯৫ অমিত পালচৌধুরী, ২৭২৬ শীলা সাহা, ২৮৪১ সুকান্ত দত্ত, ২৯৭৭ মিতা সেনগুপ্ত, ২৯৯২ সত্যকুমার গরাই।

ধাঁধা প্রতিযোগিতার ফলাফল—

সারা বছর ধরে তোমাদের যে ধাঁধা-প্রতিযোগিতা হয়েছে, তাতে কোন গ্রাহকেরই সব কয়টি উত্তর ঠিক হয়নি, কিন্তু অনেকেই খুব ভাল উত্তর দিয়েছে।

(১) মোট ২৪টি ধাঁধার মধ্যে ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত ২৩টি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে। তা ছাড়া তার যুক্তির ধাঁধাগুলিও খুব ভাল হয়েছে, সুতরাং সে প্রথম পুরস্কার ১০'০০ পাবে।

(২) ১৯৩৮ লীনা মিত্র ২১টি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে আর দুটির উত্তরও প্রায় ঠিক। তার যুক্তিও খুব ভাল।

(৩) ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায় ২১টি ধাঁধার সঠিক এবং একটি ধাঁধার প্রায় ঠিক উত্তর দিয়েছে। তারও যুক্তিগুলি খুবই চমৎকার।

যদিও কোন দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরস্কার দেবার কথা ছিল না। কিন্তু লীনা ও উদয়নের উত্তর খুব ভাল হবার দরুণ এদের দুজনকেই ৫৲ টাকা করে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন

পঞ্চম স্থান ৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ৮৯৪ তপন ঘোষ ও ২২১৫ শুভা মজুমদার

ষষ্ঠ স্থানে আছে ১৭৫ অনীতা রায়, ২৮৪, নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ১৪৬০ কেয়া বসু ১৪৮১ উত্তমকুমার বটব্যাল আর ১৫৪৪ সান্ত্বনা রায় চৌধুরী।

তাছাড়াও যাদের উত্তর খুব ভাল হয়েছে, তারা হল্ ৮৮৯ প্রেমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ২১৫৯ স্বাহা বাগচী, ২৫৪৭ প্রসেনজিৎ ও মৈত্রেয়ী বসু। ২৬১২ চৈতালী সান্যাল, ১৮৯৪ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ২৬২৯ চিত্রাঙ্গদা ও চৈতালী বসু, ২৬৭৬ শু[illegible]ন্দু ও সৌম্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, ২৭৬৩ সব্যসাচী ও শর্মিলা বসু। অনেকে সব মাসের উত্তর দাওনি অথবা প্রথম থেকে সুরু করনি বলে, ভাল উত্তর দিয়েও, উল্লেখযোগ্য মোট নম্বর পাওনি।

তোমরা সবাই আমাদের অভিনন্দন জেনো। আগামী বছর আবার ধাঁধা প্রতিযোগিতা করব, আরো বেশি সংখ্যক গ্রাহক প্রথম থেকে যোগ দিও আর সব সংখ্যার ধাঁধার উত্তর দিও, কেমন ?

Particulars about SANDESH

1. Place of Publication—Calcutta
2. Periodicity of Publication—Monthly
3. *Printer's* Name—Shri Ashokananda Das
   Nationality—Indian (Bengali)
   Address—172/3, Rash Behari Avenue, Calcutta-29.
4. *Publishers* Name—Ashokananda Das
   Nationality—Indian (Bengali)
   Address—172/3, Rasshbehari Avenue, Calcutta-29
5. *Editors* Name—(a) Satyajit Ray (b) Sm. Lila Majumder
   Nationality—Indian (Bengali)
   Address—(a) 1/1, Bishop Lefroy Road, Calcutta
   (b) 30, Chowringhee, Calcutta-16
6. *Owner*—Sukumar Sahitya Samavaya Samiti Ltd.

I Asokananda Das, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date—March, 1970 Sd/- A. Das
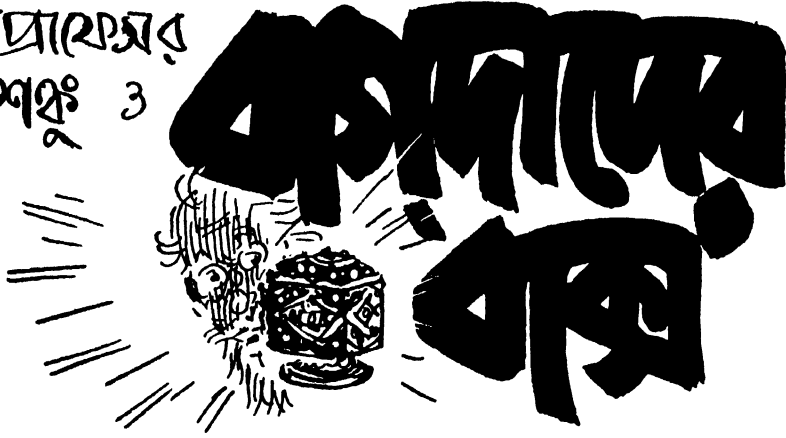
(আন্তর্জাতিক আবিষ্কারক-সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য বাগদাদে এসেছি। সঙ্গে আমা
অমনিস্কোপ যন্ত্র, একাধারে টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ ও এক্সরে।

কনফারেন্স শেষ হলে পরে আমি পেত্রুচিও ও গোল্ডস্টাইন হাসান অল-হাব্বালের সঙ্গে ঘুরে ফি
দেখছি। 'প্রথম শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের কারসাজি' দেখাবার জন্য অল্-হাব্বাল আমাদের নির্জন এ
পাহাড়ে জায়গায় এনেছেন। 'চিচিং ফাঁক' সংকেত উচ্চারণের সঙ্গে টিলার গায়ে একটা বিরাট পাথ
গম্ভীর ঘড় ঘড় গর্জনের সঙ্গে এক পাশে সরে গিয়ে একটা পথ করে দিল।)

(২)

আমরা অল্-হাব্বালের পিছন পিছন গুহায় প্রবেশ করলাম। অল্-হাব্বাল্ এবার বলে উঠল, 'চিচিং বন্ধ্'!

সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ ঘর্ শব্দ করে পাথরের ফটক বন্ধ হয়ে গেল, আর এক দুর্ভেদ্য অন্ধকার আমাদের সকলকে ঘিরে চেপে ধরল। অল্-হাব্বালের মতলব কি? সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কেমন জানি একটা ভেলকীর গন্ধ পাচ্ছিলাম সেটা আমার মোটেই ভালো লাগছিল না।

এবার একটা দেশলাই জ্বালার শব্দ পেলাম, আর তার পরেই গুহার ভিতরটা একটা ম্লান হলদে আলোয় ভরে উঠল। অল্-হাব্বাল একটা ল্যাম্প জ্বালিয়েছে! ল্যাম্পের আলোতে গুহার ভিতরের চারিদিকে চেয়ে দেখে বুঝতে পারলাম, ছেলেবেলার এক কাল্পনিক ছবি আজ আমার চোখের সামনে সম্ভব হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা যার ভিতরে দাঁড়িয়ে আছি, সেটাকে আরব্যোপন্যাসের আলিবাবার গুহা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। গুহার চারিদিকে পাথরের গা কেটে তৈরি করা তাক আর খুপরিতে রয়েছে বিচিত্র জিনিস। বাক্স প্যাঁটরা ঘটি বাটি চেয়ার ফুলদানি কলসী কুঁজো-কত রয়েছে তার হিসেব নেই। এর সবই কোন্-না-কোন্ ধাতুর তৈরি কয়েকটা ত সোনারও হতে

পারে বলে মনে হয়। আর প্রত্যেকটা জিনিসের গায়েই নানান্ রঙের পাথর বসানো—যা থেকে ল্যাম্পের আলো প্রতিফলিত হয়ে গুহার ভিতরটায় একটা অদ্ভুত রঙ-বেরঙের বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করেছিল।

আমরা স্তব্ধ হয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছি, এমন সময় গোল্ডস্টাইন হঠাৎ তার ভারী গলায় চেঁচিয়ে উঠল—'আমাদের কি কচি খোকা পেয়েছ? বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে বুজরুকি?'

আশ্চর্য, এবারে ধমকানি সত্বেও অল্-হাব্বালের মধ্যে কোন বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলাম না। পিদিমের কম্পমান আলোয় দেখলাম যে সে গোল্ডস্টাইনের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে, আর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে। তারপর সে বলল, 'পাঁচ হাজার বছর আগের সুমেরিয়ান লেখা তোমরা কেউ পড়তে পার?'

পেত্রুচিও বলে উঠল, 'আমি পারি। আমি প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলাম। আজ থেকে বারো বছর আগে এই ইরানের মরুভূমিতেই খোঁড়ার কাজ করতে করতে হীট-স্ট্রোক হয়ে আমি প্রায় মারা যাই। তারপর থেকে 'ডিগিং' ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছ তুমি?'

অল্‌হাব্বাল্ পিদিমটা গুহার একটা কোনের দিকে নিয়ে গেল। দেখলাম সেখানে প্রায় আমার সমান উঁচু আর হাত দুয়েক চওড়া একটা ছাই-রঙের পাথর দাঁড় করানো রয়েছে। তার গায়ে খোদাই করে যেন কিছু লেখা। অল্ হাব্বাল্ বলল, 'দেখত কী লেখা আছে এতে।'

পেত্রুচিও হুমড়ি খেয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের হাতে পিদিম নিয়ে লেখাটা পড়তে শুরু করল। প্রথমে কিছুক্ষণ সে শুধু বিড় বিড় করল। তারপর প্রায় দশ মিনিট পরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এ পাথর কোথায় পেলে! এতো এখানকার জিনিস নয়।'

অল্ হাব্বাল্ বলল, 'আগে বলো ওতে কী লেখা আছে।'

পেত্রুচিও বলল, 'একে এই গুহার বর্ণনা আছে, তার অবস্থান বলা আছে, আর তার ফটক খোলার সংকেত আছে। আর বলা আছে—এই গুহার ভিতরে যাদুকর শ্রেষ্ঠ গেমাল নিশাহিরের কবর আছে, আর তার সঙ্গে তার তৈরি একটা আশ্চর্য বাক্সও এখানেই রাখা আছে।'

'আর কিছু বলে নি?' অল্ হাব্বালের শান্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন একটা চাপা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করলাম।

'হ্যাঁ—আরো আছে।'

'কী?'

'বলছে, বাক্সটা নাকি জীবন্ত ইতিহাসের কাজ করবে, এবং এই ইতিহাস যে অবিশ্বাস করবে, বা এই বাক্সের যে অনিষ্ট করবে, তার উপর নাকি জিগুরাৎ-এর দেবতার অভিশাপ বর্ষিত হবে।'

অল্ হাব্বাল্ গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'হুঁ'—আর সঙ্গে সঙ্গে গোল্ডস্টাইন আবার গর্জন করে উঠল, 'ফটক খুলে দাও। বন্ধ গুহায় বেশিক্ষণ থাকা যায়না—এর বায়ু দূষিত!'

আমার মনে হল, গোল্ডস্টাইন একটু বাড়াবাড়ি করছে। অল হাব্বাল ওর চীৎকারে কর্ণপাতে

করল না। পেক্রুচিও বলল, দেখে মনে হয় এ পাথর কিশ অঞ্চল থেকে এসেছে। কিন্তু এটা তুমি কী করে পেলে সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছে।'

অলহাব্বালের উত্তর শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। উদ্বেগ বা উত্তেজনার কিছুমাত্র আভাস না দিয়ে সে বলল সাত বছর আগে স্যার জন হলিংওয়ার্থ কিশ অঞ্চলে যে খননের কাজ করতে এসেছিলেন, সে কথা তোমার নিশ্চয়ই জান। আমি সে দলের সঙ্গে ছিলাম সরকারী দোভাষী হিসেবে সেবারই এই পাথরটি খুঁড়ে পাওয়া যায়, আর স্যার জন এর লেখার মানে করার আগেই আমি গোপনে সে-কাজটা সেরে ফেলি। আর তার পরদিনই আমি পাথরটাকে নিয়ে ধাকে বলে সরে পড়ি। এতে আমি কোন দোষ দেখিনি। এখনো দেখিনা। কারণ এতো আমাদেরই দেশের জিনিস। এ জিনিসটা সাহেবের হাতে পড়লে কি আর বাগদাদে থাকত ? এ চলে যেত হয় বৃটিশ মিউজিয়ম না হয় পশ্চিমের অন্য কোন যাদুঘরে। আমি বরং এটাকে আমাদেরই দেশে রেখে দিয়েছি, এবং এমন একটা নিরাপদ জায়গায় সেখানে এর কোনদিন কোন ক্ষতি হতে পারবেনা।'

গোল্ডস্টাইন এতক্ষণ একটা পাথরের ঢিবির উপর বসে ছিল, এখন হঠাৎ একেবারে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে উঠল 'দুর্বৃত্ত ! ভণ্ড! জোচ্চোর! এই সব পাথরের লেখা আর গুহার অন্যসব জিনিসপত্তরের কথা জানিনা, কিন্তু ফটক খোলার কারসাজিকে তুমি ৫০০০ বছর আগের বৈজ্ঞানিক কীর্তি বলে পাচার করতে চাও ? তুমি বলতে চাও এর পেছনে কোন আধুনিক বৈজ্ঞানিক কেরামতি নেই ? এই সব পাথরের ফাটলের মধ্যে বৈদ্যুতিক কলকব্জা লুকোন নেই ?'

অল্ হাব্বাল্ ডান হাতটা তুলে গোল্ডস্টাইনকে শান্ত হবার ইঙ্গিত করে বললেন, 'আপনি যে ভাবে চেঁচাচ্ছেন, তাতে ভয় হয় যিনি আজ পঞ্চাশ শতাব্দী ধরে এই গুহায় কঙ্কাল অবস্থায় বিশ্রাম করছেন, তিনিও না অস্থির হয়ে ওঠেন। দোহাই, মিস্টার গোল্ডস্টাইন—আপনি অতটা উত্তেজিত হবেন না!'

গোল্ডস্টাইন কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে চাপাস্বরে বলল, 'কঙ্কাল ?'

অল্-হাব্বাল পিদিমটা আবার তুলে নিয়ে পাথরের ফলকটার পিছন দিকটায় এগিয়ে গেল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে দেখি, গুহাটা এখানে একটা চতুষ্কোণ চত্বরের চেহারা নিয়েছে। তার

মাঝখানে একটা প্রায় চার হাত গভীর গর্ত। সেই গর্তের ভিতরে পিদিমটা নামাতেই চীৎ হয়ে শোয়া একটা কঙ্কাল আর তার পাশে ছড়ানো কিছু পোড়ামাটির হাঁড়িকুড়ি দেখতে পেলাম।

অল্-হাব্বাল কঙ্কালের দিকে তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'যাদুকর শ্রেষ্ঠ গেমাল নিশাহির অল্ হারারিৎ।'

পিদিমের আলোয় দেখলাম গোল্ডস্টাইনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে মুখ বিকৃত করে বলে উঠল, 'বাগদাদে এসে এসব বীভৎস তামাসা কেন বরদাস্ত করতে হবে তা আমি বুঝতে পারছি না। তুমি ফটক খুলবে কিনা বলো।'

অল্ হাব্বাল্ শান্ত ভাবে কঙ্কালের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে গোল্ডস্টাইনের দিকে তাকাল।

গোল্ডস্টাইন অল্ হাব্বালের জন্য অপেক্ষা না করেই চীৎকার করে উঠল—

'চিচিং ফাঁক!'

কয়েক মুহূর্ত আমরা স্তব্ধ হয়ে ফটকের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু চীৎকারে কোন ফল হল না। ফটক যেমন বন্ধ তেমন বন্ধই রইল। গোল্ডস্টাইন এবার রাগে কাঁপতে কাঁপতে অল্ হাব্বালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটিটা টিপে ধরল।

'তুমি এক্ষুণি ফটক খুলবে কিনা বল।'

আমি আর পেক্রুচিও দুজনে মিলে কোনমতে গোল্ডস্টাইনকে নিরস্ত করলাম। অল্ হাব্বাল্ তার গলার স্বর গম্ভীর করে বলল, 'প্রোফেসার গোল্ডস্টাইন—আপনি বৃথা উত্তেজিত হচ্ছেন। মন্ত্রটা একটা বিশেষ সুরে উচ্চারণ না করলে ফটক খুলবে না—আর সে-সুর একমাত্র আমারই জানা আছে গুহা আবিষ্কার করার পর ক্রমাগত বিশ দিন ধরে মন্ত্রটা বার্ বার আবৃত্তি করে তবে আমি ঠিক সুরটা আবিষ্কার করতে পেরেছি। সুতরাং—'

গোল্ডস্টাইন অধৈর্য ভাবে বলল, 'তাহলে তুমিই বল। আমি আর এই বদ্ধ গুহায় থাকতে পারছি না।'

অল্ হাব্বাল্ বলল, 'কিন্তু তোমাদের এখানে নিয়ে আসার কারণটা না বলে আমি কী করে ফটক খুলি? তোমরা যদি আমার অনুরোধ রক্ষা না কর?'

'কী অনুরোধ?' আমরা তিনজনে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে উঠলাম।

অল্ হাব্বাল্ এবার প্রদীপটা নিয়ে গুহার মধ্যিখানটায় এগিয়ে গেলেন। প্রদীপের আলোয় একটা চৌকোণা পাথরের ঢিবি দেখতে পেলাম। তারপর আরো কাছে যেতে দেখতে পেলাম ঢিবিটার উপর একটা অদ্ভুত দেখতে বাক্স রাখা রয়েছে। বাক্সটা মনে হল তামার, কিন্তু তার উপর সোনা ও রুপোর কাজ করা রয়েছে। আর রয়েছে নানান রঙের নানান সাইজের পাথর বসানো। বাক্স বলছি, কিন্তু সেটাকে যে খোলা যায়, বা তার যে কোন ঢাকনা বা ডালা বলে কিছু আছে, সেটা দেখে মনে হয় না।

গোল্ডস্টাইন বলল, 'এটা কী?'

পেত্রুচিও বলল, 'এ বাক্সটার কথাই কি ওই পাথরে লেখা আছে?'

অল্ হাব্বাল বলল, 'তাছাড়া আর কী? কারণ এই গুহাটা যখন প্রথম আবিষ্কার করি তখন এর ভিতরে ও কঙ্কাল আর এই বাক্স ছাড়া আর কিছুই ছিলনা।'

আমি বললাম 'কিন্তু লেখায় যে বলছে এর ভিতরে ইতিহাস জীবন্ত ভাবে রক্ষিত হয়েছে—সে ব্যাপারটা কী?'

অল্ হাব্বালের মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বলল—

সেইটেইত আসল প্রশ্ন। সেইখানেই ত মুশকিল। আমার বুদ্ধিতে এর রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হচ্ছেনা। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কৃতকার্য হইনি। এবারে বুঝতে পারছ তোমাদের এখানে আনার কারণটা?

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম অবশেষে গোল্ডস্টাইন বলল, 'তুমি চাইছ আমরা এটার রহস্য উদ্ঘাটন করি?'

অল্ হাব্বাল বলল, 'আমি কাউকে জোর করতে চাইনা সে-ইচ্ছা আমার নেই। আমি কেবল অনুরোধ করতে পারি।'

গোল্ডস্টাইন বলল, 'আমি এর মধ্যে নেই সেটা আমি স্পষ্টই বলে দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস ওর মধ্যে কিছু নেই।'

গোল্ডস্টাইন বাক্সটা হাতে তুলে নিল।

অল্ হাব্বাল বাধা দিলনা, কেবল গম্ভীর চাপা গলায় বলল, 'ওটার অবমাননা করলে জিগুরাৎ-এর দেবতা অসন্তুষ্ট হবেন।'

গোল্ডস্ট্রাইন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব করে বাক্সটাকে রেখে দিল। এবার আমি সেটাকে অতি সন্তর্পণে হাতে তুলে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলাম, পেত্রুচিও আমার পাশে দাঁড়িয়ে।

অল্ হাব্বাল প্রদীপটা নিয়ে আমাদের আরো কাছে এগিয়ে এলো।

বাক্সটা ওজনে বেশ ভারী। হাতটা অল্প নাড়া দিতে ভিতর থেকে সামান্য একটা শব্দ পেলাম। বুঝলাম ভিতরে কিছু আলগা জিনিস আছে।

অবশেষে আমি বললাম, 'গুহার ভিতরে এর রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব হবেনা! তুমি কি এটা আমাদের হোটেলে নিয়ে যেতে দেবে? শুধু আজকের দিনের জন্য? আমি কথা দিচ্ছি এর কোন অবমাননা আমি করব না।'

অল্ হাব্বাল কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'জিগুরাৎ-এর দেবতার অলৌকিক শক্তিতে তোমার বিশ্বাস আছে?

আমি বললাম 'প্রাচীন জিনিসের প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা আছে, বিশেষত সে-জিনিস যদি এত সুন্দর হয়।'

অল্ হাব্বাল একটু হেসে বলল, 'তাতেই হবে!'

আবার আমাদের দিক থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে ফটকের দিকে মুখ করে তার সেই অদ্ভুত সুরেলা গলায় বলে উঠল—'চিচিং ফাঁক্।'

চৌখের সামনে দেখতে দেখতে আবার সেই ঘর ঘর্ ঘর্ শব্দ করে পাথরের ফটক ফাঁক হয়ে দিনের আলো এসে গুহায় প্রবেশ করল। আমরা বাইরে বেরিয়ে গিয়ে হাঁপ ছাড়লাম।

অল্ হাব্বালের লাঞ্চ বাস্কেট থেকে চমৎকার ফল, মিষ্টি, পাঁউরুটি ও চীজ খেয়ে প্রায় সন্ধ্যা সাতটার সময় সে অদ্ভুত বাক্স নিয়ে আমারা হোটেলে ফিরলাম। গোল্ডস্টাইন এখনো গজর গজর থামায়নি। আমরা যে অল্ হাব্বালের কথায় কান দিয়েছি, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছি, তার বাক্সের রহস্য উদ্ঘাটনের ভার নিয়েছি—এর কোনটাই যেন সে বরদাস্ত করতে পারছেনা। হোটেলের ভিতর ঢুকে সে আমাদের সামনেই অল্ হাব্বালকে বলল, 'যদি বুঝতে পারি তুমি আমাদের ধাপ্পা দিয়েছ তাহলে পুলিশে রিপোর্ট করব। তুমি যে চোর, সেটা নিজেই স্বীকার করেছ—সুতরাং তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি পাইয়ে দিতে আমাদের কোনই অসুবিধে হবেনা। একথা যেন মনে থাকে।'

অল্ হাব্বাল্ হেসে বলল, 'বিরাশি বছর বয়সে আর কী শাস্তি দেবে তোমরা? আমার জীবনের শুধু একটি সাধই মিটতে বাকি আছে, সেটা হল ওই বাক্সের গুণ কী সেটা জানা। এটা জানতে পারলেই আমার মোক্ষ। তারপর আমি মরি কি বাঁচি, আমার শাস্তি হয় কি না হয় সে সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র উদ্বেগ বা কৌতূহল নেই।'

তারপর আমার দিকে ফিরে সে বলল, 'আপনাদের পক্ষে আমার খোঁজ করা মুশকিল হবে কারণ আমার টেলিফোন নেই। আমি নিজেই কাল সকালে এসে দেখা করব।'

এই বলেই আমাদের তিনজনকেই কুর্নিশ করে অল্ হাব্বাল হোটেলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এখন বেজেছে রাতে সাড়ে দশটা। গত দুঘণ্টা ধরে আমি আর পেত্রুচিও আমার ঘরে বসে বাক্সটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কেবল একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। এটার গায়ে বসানো অনেকগুলো পাথরের মধ্যে একটা বেশ বড় কার্নেলিয়ান পাথর রয়েছে যেটা প্যাঁচ দিয়ে বসানো। অর্থাৎ, সেটাকে খোলা যায়। পাথরটাকে খুলেওছি আমরা, আর খুলে দেখেছি যে পাথরটার পিছনে একটা ছোট্ট কৌটোর মত জিনিস রয়েছে। সেটার রঙ কালো। গন্ধ শুঁকে মনে হল সেটায় প্যারাফিন বা মোম জাতীয় কোন জিনিস জ্বালানো হয়েছে, যার ফলে ওটার রঙ কালো হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছে ছিল ওখানে একটা সলতে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেখা—কিন্তু এতরাত্রে প্যারাফিন জাতীয় জিনিস কোথায় পাব? কাল সকালে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম জোগাড় করে আবার পরীক্ষা করে দেখা যাবে।

গোল্ডস্টাইন একবারও আমার ঘরে আসেনি। ওকে ফোন করেছিলাম। বলল ওর শরীর ভালো নেই—মাথায় এবং পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। জিগুরাৎ-এর দেবতার যদি সত্যিই কোন অলৌকিক ক্ষমতা থেকে থাকে, তাহলে হয়ত সে এর মধ্যেই গোল্ডস্টাইনের উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে শুরু করেছে, এবং তার ফলেই তার শরীর খারাপ! কে জানে!…

২১ নভেম্বর, সকাল সাড়ে ছটা

আজ এই অল্প কিছুক্ষণ আগে যে আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটে গেল সেটা এই বেলা লিখে রাখি।

আমি এমনিতেই খুব ভোরে উঠি, গিরিডিতে রোজ পাঁচটায় উঠে আমি উশ্রীর ধারে বেড়াতে যাই। আজ মনে একটা উত্তেজনার ভাব থাকার দরুণই বোধহয় আরো সকালে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মুখ ধুয়ে স্নান করে কফি খেয়ে যখন জানালাটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, তখন আকাশ ফরসা হয়ে গেছে। সারা আকাশময় তুলো-পেঁজা মেঘ ; তাতে রঙের খেলা দেখতে দেখতে গতকালের আরব্যোপন্যাসের গুহার কথা ভাবছিলাম। আর ভাবছিলাম যাদুমন্ত্র 'চিচিং ফাঁক-এর কথা। ভাবতে ভাবতে কখন যে গলা দিয়ে মন্ত্রটা নিজেই উচ্চারণ করে ফেলেছি তা জানি না। একবার নয়—বার তিনেক অন্যমনস্ক ভাবে 'চিচিং-ফাঁক' কথাটা বলার পর হঠাৎ একটা খটাং শব্দ শুনে চমকে পিছনে ফিরে দেখতে হল।

বাক্সটা আমার খাটের পাশের টেবিলের উপর রাখা ছিল। এখন সেটার দিকে চেয়ে দেখি তার এক পাশের একটা অংশ ফাঁক হয়ে দরজার মত খুলে গিয়েছে। অবাক হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা আধুলির সাইজের ল্যাপিস ল্যাজুলি পাথর, ঠিক যেমন ভাবে দরজা খুলে যায়, সেইভাবে খুলে গিয়ে একটা ছোট্ট কব্জার সঙ্গে আটকানো ঝুলে আছে। আশ্চর্য—গুহা এবং বাক্স খোলার জন্য একই সংকেত, কেবল বলার সুরে সামান্য একটু তফাৎ।

খুলে-যাওয়া দরজাটার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলাম। ভিতরে এক অদ্ভুত ব্যাপার : অত্যন্ত ছোট ছোট সব যন্ত্রপাতি জাতীয় জিনিস দিয়ে ভিতরটা ভরা। তার মধ্যে ধাতুর তৈরী জিনিস ত আছেই —তাছাড়া আছে পুঁতি বা কাঁচের টুকরো জাতীয় জিনিস। সেগুলো যে কী, সেটা বোঝা ভারী মুশকিল, কারণ এরকম যন্ত্রপাতি এর আগে কখনো দেখিনি। আমার অমনিস্কোপ মাইক্রোস্কোপ হিসাবে ব্যবহার করেও বিশেষ লাভ হল না—আমি যেই তিমিরে সেই তিমেরেই রয়ে গেলাম।

বাক্সটাকে তুলে জানালার কাছে এনে দিনের আলোতে এই প্রথম সেটাকে ভালো করে দেখলাম। যেদিকটায় কার্নেলিয়ান পাথরটা প্যাঁচ দিয়ে লাগানো ছিল, তার ঠিক উল্টোদিকটায় এবার লক্ষ্য করলাম একটা ছোট্ট ফুটো রয়েছে। অম্নিস্কোপ চোখে লাগিয়ে বুঝলাম তার ভিতরে একটা পাথর বসানো রয়েছে। হীরে কি ? তাইত মনে হচ্ছে—তবে এটার যে কী ব্যবহার সেটা ধরতে পারলাম না।

এখন যেটা আসল দরকার সেটা হল বাক্সর ভিতরের বাতিটা জ্বালানো। পেক্রুচিও বলেছে সকালে দোকানপাট খুললেই ও প্যারাফিন সংগ্রহ করে আনবে। তারপর বাক্সর ভিতরের প্রদীপটা জ্বালালে হয়ত এর রহস্য উদ্ঘাটন হতে পারে। আমি জীবনে অনেক উদ্ভট যন্ত্রপাতি ঘেঁটেছি—কিন্তু এরকম মাথা-গুলোন জিনিস এর আগে কখনো আমার হাতে পড়েনি।

২২ নভেম্বর, রাত আটটা

ধন্য হারুণ-অল্-রশিদের বাগদাদ! ধন্য সুমেরিয় সভ্যতা! ধন্য বিজ্ঞানের মহিমা! ধন্য

গেমাল নিশাহির আল্ হারারিৎ !

আমার এ উল্লাসের কারণ আর কিছুই না—আজ একজন এমন বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি যার কাছে আমাদের কৃতিত্ব একেবারে ম্লান হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমি ত ঠিক করেছি এখান থেকে যাবার আগে টাইগ্রিসের জলে আমার অম্নিস্কোপটা ফেলে দিয়ে যাবো। গিরিডিতে ফিরে গিয়েও কাজে উৎসাহ কবে কীভাবে ফিরে পাবো জানি না। আনন্দ, বিস্ময়, হতাশা এবং তার সঙ্গে কিছুটা রোমাঞ্চ ও আতঙ্ক মিলে মনের অবস্থা এমন হয়েছে যেমন এর আগে আর কখনো হয় নি।...

কাল সকালে ডায়রি লিখে শেষ করার আধ ঘণ্টার মধ্যেই অল্ হাব্বাল্ টেলিফোন করেছিল। বলল, 'কী রকম বুঝছ? রহস্য উদ্ঘাটন হল?'

আমি সকালের ঘটনাটা বলতেই ও ভারী উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আমি এক্ষুণি আসছি। সঙ্গে করে প্যারাফিন নিয়ে আসছি। পেত্রুচিওকে বলে দাও ও যেন আর কষ্ট করে বাজারে না যায়।'

আমরা তিন বৈজ্ঞানিক এক সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করলাম। গোল্ডস্টাইনের চেহারা দেখে মোটেই ভালো লাগল না। ও শুধু এক পেয়ালা কফি খেলো। বলল, 'কাল রাত্রে মোটেই ঘুম হয়নি—আর যেটুকু ঘুমিয়েছি, তার মধ্যে সব বিশ্রী বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি।'

পেত্রুচিও একটু ঠাট্টা করে জিগুরাতের দেবতার অভিশাপের কথা বলতেই গোল্ডস্টাইন রীতিমত বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমাদের কুসংস্কারের নমুনা দেখে আর তোমাদের বৈজ্ঞানিক বলতে ইচ্ছে করেনা। আমার শরীর খারাপের একমাত্র কারণ কাল ওই বিদ্ঘুটে গুহায় অতক্ষণ বন্ধ অবস্থায় থাকা। এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই, বা থাকতেও পারে না।'

ওর অন্য কিছু করার ছিল না বলেই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত যখন অল্ হাব্বাল্ প্যারাফিন নিয়ে আমাদের ঘরে হাজির হল, গোল্ডস্টাইনও দেখি তার সঙ্গে সঙ্গে এসে ঘরের সোফাটায় ধুপ্ করে বসে পড়ল। বাইরের লোক যাতে হঠাৎ এসে না পড়ে, তই ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আমরা আমাদের কাজে লেগে পড়লাম।

প্রথমে কার্ণেলিয়ান পাথরটা প্যাঁচ দিয়ে খুলে পিছন থেকে কৌটোটা বার করে তাতে প্যারাফিন ভরলাম। তারপর আমার একটা রুমাল ছিঁড়ে সেটা দিয়ে একটা সলতে পাকিয়ে প্যারাফিনে চুবিয়ে দিয়ে তার ডগটায় আগুন ধরিয়ে দিলাম। গোল্ডস্টাইন আমাদের ঠিক সামনেই বসেছিল। সলতেটায় আগুন দিয়ে কৌটাটা ভিতরে ঢোকাতেই দেখি কোত্থেকে জানি একটা আলো এসে গোল্ডস্টাইনের গায়ে পড়ল। এটা কীরকম হল?

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমার ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কেটে দিয়ে মনে পড়ল বাক্সটার সামনের দিকের ছোট্ট পাথরটার কথা।

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে পাথরটা একটা লেন্স-এর আজ করছে; ভিতরে প্রদীপটা জ্বালানোর

ফলে লেন্‌সের ভিতর দিয়ে আলো বেরিয়ে সেটাই গোল্ডস্টাইনের গায়ে পড়ছে।

আল্‌হাব্বালের চোখ দেখি জ্বলজ্বল করছে। গোল্ডস্টাইনেরও কেমন জানি থতমত ভাব। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এক পাশে সরে গেল। অল্‌হাব্বাল্ দৌড়ে গিয়ে সোফাটাকে একপাশে টেনে সরিয়ে দিল। তার ফলে তার পিছন দিকে যে দেয়ালটা বেরোল, আলোটা স্বভাবতই তারই উপর পড়ল। এবার বুঝলাম আলোর শেপটা একটা টর্চের আলোর মত বৃত্তাকার।

পেক্রুচিও হঠাৎ তার মাতৃভাষায় চেঁচিয়ে উঠল—'লা লানতের্ণা মাজিকা!'

অর্থাৎ ম্যাজিক ল্যানটার্ণ। কিন্তু ছবি কই?

সকালে 'চিচিং ফাঁক' বলার ফলে যে পাথরটা দরজার মত খুলে গিয়েছিল—এবারে সেটার দিকে দৃষ্টি দিলাম। দরজা এখনো খোলাই রয়েছে। অতি সাবধানে আমার ডান হাতের তর্জনীটা তার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতেই একটা পেনসিলের ডগার মত জিনিস অনুভব করলাম। সেটায় অল্প একটু চাপ দিতেই একটা অভাবনীয় জিনিস ঘটে গেল, যেটার কথা ভাবতে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাক্সটার ভিতর একটা আলোড়ন সুরু হল—যেন নানারকম যন্ত্রপাতি ভিতরে চলতে শুরু করেছে। দেয়ালের দিকে চেয়ে দেখি সেই গোল আলোটার ভিতর যেন একটা স্পন্দন শুরু হয়েছে। তারপর আলোর উপর সব বিচিত্র নকসা প্রতিফলিত হতে শুরু করল।

প্রেক্রুচিও দৌড়ে গিয়ে আমার ঘরের জানালাটা বন্ধ করে দিল। ঘর এখন অন্ধকার—একমাত্র বাক্স থেকে বেরোন আলো ছাড়া আর কোন আলো নেই।

আর দেয়ালে? স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলাম যে দেয়ালে সিনেমা হচ্ছে—বায়স্কোপ—চলচ্চিত্র! ছবি অস্পষ্ট—কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না। আর সে ছবি চলমান ছবি। আজকের সিনেমার সঙ্গে তার কোনই তফাৎ নেই—কেবল ছবি চৌকোর বদলে গোল।

কিন্তু এসব কিসের ছবি দেখছি আমরা? কোন্ সহরের দৃশ্য এটা? এই লোকজন সব কারা? এত ভীড় কেন? কিসের উৎসব হচ্ছে?

পেক্রুচিও চেঁচিয়ে উঠল—'শবযাত্রা! কোনো বিখ্যাত লোক মারা গেছে! ওই দ্যাখ তার কফিন!'

সত্যিইত। আর কফিনের পিছনে বয়ে চলেছে জনতার স্রোত। কত লোক হবে? দশ হাজার? অদ্ভুত এইসব লোকের পোশাক—অদ্ভুত তাদের চুলের বাহার! লক্ষ্য করলাম যে অনেকের হাতেই একরকম কারুকার্য করা হাতপাখা রয়েছে যেটা তারা সবাই একসঙ্গে নাড়ছে। আরো দেখলাম—ভীড়ের মধ্যে অনেকগুলো চারচাকার গাড়ি সেগুলো টেনে নিয়ে চলেছে গরু-জাতীয় এক ধরণের জানোয়ার।

পেক্রুচিও আবার চেঁচিয়ে উঠল—'বুঝেছি! উর! উর দেশের কোন রাজা মারা গেছে। এদের কোন রাজা মরলে সঙ্গে সঙ্গে আরো ৬০।৭০ জন লোককে বিষ খেয়ে মরতে হত। আর সবাইকে এক সঙ্গে কবর দেওয়া হত!

আমি যেন আর দেখতে পারছিলাম না। আমার মাথা ঝিম ঝিম করতে শুরু করেছিল। আমি টেবিলের পাশ থেকে সরে গিয়ে খাটের উপর বসে পড়লাম। চার হাজার বছর আগের এই বায়স্কোপ আমার মাথা একেবারে গণ্ডগোল করে দিয়েছিল।

ছবি কতক্ষণ চলেছিল জানি না! হঠাৎ দেখলাম আবার ঘরের বাতি জ্বলে উঠল, আর অল্ হাব্বাল্ ফুঁ দিয়ে বাক্সর বাতিটা নিভিয়ে দিল। তার চোখে মুখে এমন এক অদ্ভুত ভাব. সে যেন কী বলবে কী করবে সেটা ঠিক বুঝতে পারছে না। এদিকে আমরা তিন বৈজ্ঞানিক একেবারে অভিভূত— আমাদের মুখ দিয়েও কোন কথা সরছে না।

অবশেষে অল্ হাব্বাল্ই প্রথম কথা বলল। দুহাত জোড় করে আমাদের তিনজনের দিকে কুর্ণিশ করে সে বলল, 'আমি যে তোমাদের কী ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো তা বুঝতে পারছি না। আমার জীবনের শেষ বাসনা তোমরা পূর্ণ করেছ। আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার একটা অত্যাশ্চর্য নমুনা যে তোমাদের দেখাতে পেরেছি, তার জন্য আমি কৃতার্থ। তবে শুধু একটা কথা—এই যন্ত্রটির কথা তোমরা প্রকাশ করবে না। করলেও, তোমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। ডক্টর গোল্ডস্টাইন আমাকে ভণ্ড বলেছিলেন, তোমাদের লোকে বলবে পাগল। আর প্রমাণও ত তোমরা দিতে পারবে না, কারণ বাক্সটা গত চার হাজার বছর সেখানে ছিল, ভবিষ্যতেও সেখানেই থাকবে। আমি তাহলে আসি! সেলাম আলেইকুম্!'

অল্ হাব্বাল্ সঙ্গে করে তার বেতের লাঞ্চ বাস্কেটটা নিয়ে এসেছিল; তার মধ্যেই বাক্সটা বয়ে নিয়ে সে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ তিনজনেই বোকার মত চুপ করে বসে রইলাম। তারপর পেত্রুচিও গোল্ডস্টাইনের দিকে ফিরে বলল, 'তোমার এখনো মনে হয় লোকটা ভণ্ড?'

গোল্ডস্টাইনকে দেখে মনে হল সে থতমত ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। তার মাথায় যেন অন্য কোন চিন্তা খেলছে—তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। সে এতক্ষণ চেয়ারে বসেছিল, এবার উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অসহিষ্ণুভাবে পায়চারি করে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, 'অমন একটা জিনিস এই গুহার মধ্যে বন্ধ পড়ে থাকবে? এ হতেই পারে না!'

গোল্ডস্টাইনের কথা আমার মোটেই ভাল লাগল না। বললাম, 'সেরকম অনেক আশ্চর্য প্রাচীন জিনিসও ত এখনো মানুষের অগোচরে মাটির নীচে লুকিয়ে আছে। ধরে নাও, আজকের ঘটনাটা ঘটেইনি।'

'অসম্ভব!' গোল্ডস্টাইন গর্জন করে উঠল। 'লোকটা যে চোর সে বিষয় ত কোন সন্দেহ নেই। পাথরটাও ত ও চুরিই করেছিল। ও বাক্সর উপর ওর কোন অধিকার নেই। ওটা আমার চাই। ওটা আমি আদায় করে ছাড়ব—তাতে যত টাকা লাগে লাগুক। টাকার আমার অভাব নেই।'

আমরা কোনরকম প্রতিবাদ করার আগেই গোল্ডস্টাইন ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

পেক্রুচিও গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'ভুল করল...গোল্ডস্টাইন ভুল করল। ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না।'

কিছুক্ষণ পায়চারি করে পেক্রুচিও নিজের ঘরে চলে গেল। আমি যে ভাবে খাটের উপর বসেছিলাম, সেইভাবেই আরো অনেকক্ষণ বসে রইলাম। চার হাজার বছর আগের উরের মৃত সম্রাটের শবযাত্রার দৃশ্য তখনো চোখের সামনে ভাসছে। সুদূর অতীতেও মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি যে কতদূর অগ্রসর হয়েছিল, সেটা আজ যেমনভাবে টের পেয়েছি, তেমন আর কোনদিন পাইনি।

বিকেলের দিকে পেক্রুচিও ফোন করে জানিয়েছে যে গোল্ডস্টাইন তখনো ফেরেনি। আধঘণ্টা আগে আমিও তার ঘরে একবার ফোন করেছিলাম—কোন উত্তর পাইনি। রাত হয়ে গেল। এখন আর কিছু করার উপায় নেই। কাল সকাল পর্যন্ত দেখি। জিগুরাতের দেবতা ইশতারের কথা মনে করে গোল্ডস্টাইনের জন্য রীতিমত ভয় হচ্ছে।

নভেম্বর ২৩

বাগদাদের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার যে এমন অদ্ভুত পরিসমাপ্তি হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। অতিরিক্ত লোভের যে কী পরিণাম হতে পারে তার একটা ভাল নমুনা দেখা গেল! অবিশ্যি আমি না থাকলে আরো বেশি বিপর্যই ঘটতে পারত সেটা ভেবেই যা সামান্য একটু সান্ত্বনা।

আজ ভোরে উঠেই টেলিফোন করে জানতে পারলাম যে গোল্ডস্টাইন রাত্রে হোটেলে ফেরেনি। খবরটা পেয়ে তৎক্ষণাৎ পেক্রুচিওর সঙ্গে যোগাযোগ করে স্থির করলাম যে আমাদের একটা কিছু করতে হবে। দুজনেই বুঝেছিলাম যে আমাদের আবার গুহাতেই ফিরে যেতে হবে। অল্ হাব্বাল্ সেখানেই গেছে, আর গোল্ডস্টাইনও নির্ঘাৎ তাকে ধাওয়া করতেই বেরিয়েছিল।

হোটেলের ম্যানেজার মিঃ ফারুকিকে বেড়াতে যাবার কথা বলতেই তিনি একটা গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিলেন। ঠিক সাড়ে ছটার সময় আমি আর পেক্রুচিও গুহা অভিমুখে যাত্রা করলাম।

৭০ মাইল পথ যেতে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগল। যেখানে গতবার অল্ হাব্বাল্ গাড়ি থামিয়েছিল, এবারও সেখানেই আমার ড্রাইভারকে গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলে আমি আর পেক্রুচিও গুহার দিকে রওনা হলাম।

গুহায় পৌঁছে দেখি ফটক বন্ধ। আমি এটাই আশা করেছিলাম, কিন্তু পেক্রুচিওকে দেখে মনে হল সে যেন মুসড়ে পড়েছে। বলল বৃথাই আসা হল। বোধহয় ডাইনামাইট দিয়ে ভেঙ্গে ফটক খোলা ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই।,

আমি বললাম, 'তার আগে আমার স্মরণশক্তিটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

পেক্রুচিও অবাক হয়ে বলল, 'তুমি বলতে চাও অল্ হাব্বাল্-এর সুর তুমি হুবহু নকল করতে পারবে?'

উত্তরে আমি আমার হাত দুটোকে মুখের সমনে চোঙার মত করে ধরে আমার গলাটাকে আমার স্বাভাবিক পর্দার চেয়ে বেশ কয়েক ধাপ উপরে তুলে বলে উঠলাম, 'চিচিং ফাঁক্!'

কয়েক মুহূর্ত কিছু হলনা। তারপর গম্ভীর মেঘের গর্জনের মত একটা শব্দ শুরু হল। আমার পাশেই একটা টিকটিকি ভয় পেয়ে লেজ তুলে ঘাসের উপর দিয়ে সড় গড় করে পালাল। দেখলাম, গুহাব ফটকটা আস্তে আস্তে খুলে গিয়ে পিছনের হাঁ করা অন্ধকার দেখা যাচ্ছে।

খোলা শেষ হলে আমরা দুজনে দুরু দুরু বুকে গুহার ভিতরে প্রবেশ করলাম।

আমাদের দুজনের সঙ্গে টর্চ ছিল। আলো জ্বালতেই প্রথমে দুপাশে তাকের উপর জিনিসপত্রের গায়ে রং বেরঙের পাথরের চকমকানি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। তারপর মাঝখানে যে পাথরের উপর বাক্সটা রাখা ছিল, সেখানে টর্চ ফেলে দেখি জায়গাটা খালি। বাক্সের কোনি চিহ্ন মাত্র নেই।

পেত্রুচিও ইতিমধ্যে কোনের দিকটায় এগিয়ে গিয়েছিল; হঠাৎ তার অস্ফুট চীৎকার পেয়ে আমিও সেইদিকে ধাওয়া করে গেলাম।

পেত্রুচিওর টর্চের আলো মাটির উপর ফেলা। সেই মাটির উপর চিৎ হয়ে চোখ চাওয়া অবস্থায় পড়ে আছে গোল্ডস্টাইন!

এবার আমার চর্চের আলো ফেলতেই গুহার কোনের সমস্তটা আলোয় ভরে গেল। তার আগে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে রক্ত হিম হয়ে ভাসে।

গোল্ডস্টাইনের হাত তিনেক পিছনে পড়ে আছে অল্ হাব্বাল; সেও চিৎ হয়ে শোয়া তার বুকের উপর দুহাত দিয়ে জাপটে ধরা চার হাজার বছরের পুরোন বায়স্কোপের বাক্স; আর তার ঠিক পাশে পড়ে আছে গেমাল নিশাহিরের কঙ্কাল—যেমন ভাবে আগে দেখে গেছি, ঠিক তেমনি ভাবেই।

গোল্ডস্টাইনের নাড়ী পরীক্ষা করে হাঁপ ছাড়লাম। সে এখনো মরেনি—তবে তার অবস্থা সঙ্গীন—এক্ষুনি তাকে গুহার ভেতর থেকে বার করে নিয়ে তার চিকিৎসা করতে হবে।

অর আল্ হাব্বাল্? তার জীবন শেষ হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ কাল থেকেই সে মৃত—কারণ বাক্সটা তার হাত থেকে ছাড়াতে গিয়ে দেখলাম সেটা আলগা করার কোন উপায় সেই—তার অসাড় হাত দুটো চিরকালের মত বাক্সটাকে বন্দী করে ফেলেছে।

* * * *

গোল্ডস্টাইনকে হোটেলে ফিরিয়ে এনেছি এই ঘণ্টাখানেক হল। তার জ্ঞান হয়েছে। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বলেছে তার মধ্যে শারীরিক কোন গণ্ডগোল নেই। কিন্তু আমরা জানি যে তার মধ্যে একটা বিশেষ রকম কোন পরিবর্তন ঘটে গেছে—কারণ তাকে কালকের ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করতেই সে একগাল হেসে বলল—'চিচিং ফাঁক!'

তারপর থেকে এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তাকে যত প্রশ্নই করা হয়েছে—সবকটারই উত্তরে সে ওই এক ভাবেই হেসে বলেছে—'চিচিং ফাঁক!'

(১) নিশীথ, নীতীশ, সমীর ও মিতালী গুহ ১৬০০ বয়স ১৩, ১২, ১০, ৬½ বোনের নাম ভুল করে বাদ পড়ে গিয়েছিল, ভাই, বেশী রেগো না! মাঝে বেশ কিছুদিন ধরে ছাপাখানায় ধর্মঘট চলেছিল, জান বোধ হয়? তাই ছাপতে দেরি হচ্ছিল। ধাঁধার ফর্দে নাম ওঠেনি শুনে দুঃখিত, নিশ্চয় ডাকের গোলমালে দেরি হয়ে গিয়েছিল। তোমাদের আবীর পেয়ে খুসি হলাম।

(২) অন্তরা, ফুল্লরা সেন, ১৯২, বয়স ১৭ ও ১৪

সব উত্তর খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু ভাই, অন্তরাকে এই হল শেষ চিঠি, কারণ ১৭ হয়ে গেলে গ্রাহক থাকতে পারে, তবে কোনো প্রতিযোগিতা চিঠিপত্র ইত্যাদি আসরে যোগ দিতে পারে না।

(৩) ভারতী বসু, ৩৯৭, বয়স ১৫

ছবির প্রতিযোগিতা মাঝে মাঝে হয় বইকি। তাছাড়া হাতপাকাবার আসরেও ছাপা হয়। ভাই, ডাকে বই হারালে আমাদের করণীয় কিছু থাকে না, কারণ under certificate of posting. পাঠান হয় ওঁদের আমরা জানাই, সব-ই করি। যাদের বই হারায় তারা ডাকবিভাগে চিঠি দিলে অনেক সময়ই চুরি কমে। তোমাব কথায় মনে হচ্ছে ডাকে হারানোর জন্যে তুমি আমাদের দায়ী করছ। তখুনি জানালে আরেক কপি পাঠানো হয়। না ভেবে-চিন্তে কাউকে দোষী না করাই ভালো নয় কি?

(৪) উত্তমকুমার বটব্যাল, ১৪৮১, বয়স ১২

ঐ তো মার্চ মাসে তোমার ভ্রমণকাহিনী বেরিয়েছে। অন্য লেখা মনোনীত হলে কাগজেই দেখবে। এ বিষয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলতে গেলে যে সময় বা জায়গায় কুলোবে না।

(৫) শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী ২৮৪৪, বয়স ১১

পত্রবন্ধু চাই। শখ:—ছবি আঁকা, বইপড়া, কবিতা লেখা। ডাকটিকিট সংগ্রহ।

(৬) অভিজিৎ চৌধুরী, ১৯০২, বয়স ১৩

শুধু ভারতীয়রা মাতৃভূমি বলবে কেন, ইংরেজরাও তো mother land বলে। মাতে বাবাতে কি তফাৎ? ভগবানকেও তো কেউ মাতৃরূপে কেউ পিতৃরূপে চিন্তা করে।

(৭) পুরবী চক্রবর্তী ৩৪০, বয়স ১৫

ছাপাখানার ধর্মঘটের জন্যে সব দেরি হয়ে গেল, ভাই। পুরণো সন্দেশ কিনতে হলে আমাদের আপিসে এসে কেনাই ভালো। কি আছে না আছে দেখতেও পাবে; তাছাড়া পার্সেল পোস্টই বল বা রেজিস্টার করে বুক পোস্ট্ই বল, অনেক খরচ পড়ে যায়।

(৮) দেবাশিস দত্ত, ২০৯৩, বয়স ১৩½।

অরু-মিতু আর ব্রাণ্টালুসি দুই-ই ভালো লেগেছে শুনে খুসি হলাম। এখন থেকেই যদি ভালো লেখার আদর শেখ, পরে দেখবে কত সুবিধা হচ্ছে।

(৯) অতুল্যকণ্ঠ নিয়োগী, ১৫০৯, বয়স ১০

পত্রবন্ধু চাই। শখ :—ডাকটিকিট জমানো, বইপড়া, খেলা।

(১০) নন্দিনী দত্ত মজুমদার, ১২৩২, বয়স ১৬

তাই কখনো হয়! যেখানে গল্প শেষ হয়, সেখানেই তো সব চরিত্রদের জীবন শেষ হয় না। শেষ কথা তা হলে কি করে লেখা যায় বল?

(১১) অভিজিৎ দত্ত, ৪০০, বয়স ১২

এতদিনে কাগজ পেয়ে গেছ নিশ্চয়। দেরির কারণটা শুনলেই তো।

পত্রবন্ধু চাই। শখ :—খেলাধুলা, বইপড়া, খেলোয়াড়দের ছবি সংগ্রহ করা, গান বাজনা।

আশা করি ছবিগুলি একটা স্ক্র্যাপ—বুকে এঁটে, ছোট করে খেলোয়াড়ের বিবরণী লিখে রাখ।

(১২) সুস্মিতা সেনগুপ্ত, ১৩৭০, বয়স ১৩ বছর।

পত্রবন্ধু চাই—শখ :—ছবি আঁকা, গল্পের বই পড়া, জীবজন্তু পোষা ও তাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করা।

॥ মধ্যাহ্নে ॥

অশোক চক্রবর্তী

একটা কিছু লিখতে হবে—
আবহাওয়াটা যোগ্য।
একটা কিছু লিখলে এখন
হবেই উপভোগ্য।

কাব্য-ভরা গন্ধ বড়ো
স্পর্শ বোলায় অঙ্গে;
হায় না-জানি চলতো লেখা
কতো কী এই সঙ্গে।

কিন্তু কিছু পাইনা ভেবে—
বিষম গোলোযোগ গো…
আবহাওয়াটা ছিল রে হায়
বড়োই লেখার যোগ্য।

পাশাপাশি দুই বাড়ি। এ বাড়ির বেবী আর ও বাড়ির বেলা দুজনে খুব ভাব।

রোজ সকালে বেবী বেলাদিদির বাড়িতে খেলতে যায়। বেলার অনেক পুতুল, আর মস্ত একটা পুতুল-বাড়ি। দশটা বাজলে বেলা স্কুলে চলে যায়, বেবীও বাড়ি ফিরে আসে।

বেলার সুন্দর একটা নতুন পুতুল এসেছে, চোখ বোজে, চোখ খোলে আবার 'মা' বলতে পারে! সময় হলে, বেলা স্কুলে গেল। বেবীও বাড়ি রওনা হল।

অনেক পরে বেবীদের ঝি তাকে ডাকতে এল। বেলাদের আয়া বলল—'বেবী ত কখ···ন চলে গেছে!'

বেবী বাড়িতে যায়নি, বেলাদের বাড়িতেও নাই, তাহলে সে কোথায় গেল? রাস্তায় চলে গেল না ত? বাড়ির পিছনে পুকুর, বাগানে কুয়ো আছে। পড়ে গেল না ত? বেবীর বাবা-মা ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে বেরোলেন, দু বাড়ির লোক মিলে কত খোঁজাখুঁজি, ডাকাডাকি, বেবী কোথাও নাই! মায়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছে বাবার মুখ শুকিয়ে গেছে, সকলের ভীষণ মন খারাপ!

হঠাৎ আয়া চেঁচিয়ে উঠল—'এই যে, বেবী এইখানে! পুতুল—ঘরটার ভিতরে ঢুকে গিয়ে, নতুন পুতুলটাকে বুকে নিয়ে বেবী গুটি সুটি হয়ে ঘুমিয়ে আছে! বাড়ি যেতে যেতে কখন যে-সে পুতুলের লোভে ফিরে এসেছিল কেউ জানে না!

মা ছুটে গিয়ে বেবীকে কোলে নিলেন, মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বেবী বলল—'ওমা'! আমাকে জন্মদিনে এমনি একটা পুতুল কিনে দেবে মা?'

সেই রাজা

তপনকুমার চৌধুরী

রাজ্য মোটে নেইকোযে তার
মন্ত্রী ও কি আছে?
নেইকো কোটাল বরকন্দাজ
ছত্রধারী কাছে।

ঝলমলানো রাজবাড়ি নেই,
নেইকো কিছুই হায়—
যায়না তো ঘুম ঝালর দেয়া
ফুলের বিছানায়।

নেইযে মাথায় রত্ন মুকুট
গলায় হীরের হার
তবুও সেতো মস্ত রাজা
নিজেই নিজে তার।

সেই রাজা সে খোকন সোনা—
রাজার পোষাক প'রে
সাজ ঘরেতে বুক ফুলিয়ে
রাজার মতই ঘোরে॥